"বই মনের খাদ্য।
বেশি বেশি বই পড়ুন,
মনকে সুস্থ রাখুন।।"

মোঃ কবিরুল ইসলাম
(DMC K-69)

www.facebook.com/kabiruldmc
kabirul.dmc@gmail.com

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ পরিচালিত সচিত্র মাসিকপত্র

সম্পাদক—শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য

প্রথম ষাণ্মাসিক সূচীপত্র
১৯৬৭

বিংশতি বর্ষ : জানুয়ারী—জুন

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

২৯৪।২।১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড

(ফেডারেশন হল)

কলিকাতা-৯

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

বর্ণানুক্রমিক ষাণ্মাসিক বিষয়সূচী

জানুয়ারী হইতে জুন—১৯৬৭

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

ষাণ্মাসিক লেখক সূচী

জানুয়ারী হইতে জুন—১৯৬৭

চিত্র সূচী

বিবিধ

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

বিংশতি বর্ষ | জানুয়ারী, ১৯৬৭ | প্রথম সংখ্যা

নববর্ষের নিবেদন

১৯৬৭ সাল—জানুয়ারী হইতে 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' নূতন বৎসরে যাত্রা সুরু করিল। বিগত উনিশ বৎসর যাবৎ পত্রিকাটি মাতৃভাষার মাধ্যমে নিয়মিত ভাবে বিজ্ঞান সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ে প্রবন্ধাদি পরিবেশন করিয়া আজ বিংশতি বর্ষে উপনীত হইয়াছে। এই উপলক্ষে আমরা পত্রিকাটির সহায়ক, পৃষ্ঠপোষক ও শুভানুধ্যায়ী প্রত্যেককেই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

আমাদের দেশে বিজ্ঞান-শিক্ষা ব্যবস্থার অসম্পূর্ণতা ও ত্রুটি-বিচ্যুতি সম্বন্ধে প্রত্যেকেই অবহিত আছেন। শীর্ষস্থানীয় উন্নত দেশগুলিতে বিষয়বস্তুর প্রকৃত তাৎপর্য বুঝাইবার জন্য প্রচুর আকর্ষণীয় চিত্রাদি সমন্বিত বিজ্ঞানের পুস্তক ও পত্র-পত্রিকাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে। অধিকন্তু এই সকল বিষয়ে প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভের নিমিত্ত সক্রিয় মডেল প্রভৃতির স্থায়ী প্রদর্শনীরও ব্যবস্থা রহিয়াছে। বিজ্ঞানের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি করিতে হইলে—জনসাধারণকে বিজ্ঞানানুরাগী করিতে হইলে এই সকল ব্যবস্থা যে অপরিহার্য, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ এই সকল বিষয়ের যৌক্তিকতা অনুধাবন করিয়া অনেক কাল পূর্ব হইতেই এই ধরণের বিবিধ পরিকল্পনা প্রণয়ন করিয়া রাখিয়াছে। কিন্তু প্রধানতঃ আর্থিক সমস্যাই এই সকল পরিকল্পনা রূপায়ণের কাজে অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই বিষয়ে সরকার ও জনসাধারণের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইলে পত্রিকাটির উৎকর্ষ সাধনের পথ সুগম হইবে এবং পরিষদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির সম্ভাবনাও বৃদ্ধি পাইবে।

কিন্তু এই সকল পরিকল্পনা রূপায়ণের কাজ সময়-সাপেক্ষ হইলেও পত্রিকাটিকে অধিকতর আকর্ষণীয় করিয়া তুলিবার প্রচেষ্টাই অগ্রাধিকারের দাবী রাখে।

এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য 'জ্ঞান ও বিজ্ঞানে'র লেখক-লেখিকাদের প্রতি পূর্বেও যেরূপ আবেদন করিয়াছি, এখনও সেরূপ আবেদন জানাইতেছি যে, বিজ্ঞানের বিবিধ তথ্য বা তত্ত্বের ব্যবহারিক প্রয়োগ সম্পর্কিত প্রবন্ধাদি এবং প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা এবং পরীক্ষালব্ধ তথ্যাদি, শিল্প ও কারিগরী প্রতিষ্ঠান প্রভৃতির পরিদর্শনলব্ধ বিবরণ আকর্ষণীয় চিত্র ও নক্সা প্রভৃতির সাহায্যে পরিবেশনে যদি তাঁহারা অধিকতর মনোযোগী হন, তাহা হইলে পত্রিকাটির গুরুত্ব যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইবে এবং অধিকতর সংখ্যক পাঠক-পাঠিকার আগ্রহ সৃষ্টিতে সক্ষম হইবে। নববর্ষের সূচনায় আমাদের এই নিবেদন ফলপ্রসূ হইবে বলিয়াই আশা করি।

ক্যান্সার-সমস্যা সমাধানে বিজ্ঞানের অগ্রগতি

বিষ্ণুপদ মুখোপাধ্যায়

ক্যান্সার কি ?

ইংরেজি ক্যান্সার কথাটি কাঁকড়ার গ্রীক শব্দ Karkinos থেকে ব্যুৎপত্তি লাভ করেছে। এটি শুধু একটি মাত্র ব্যাধি নয়, পরন্তু ক্যান্সার শব্দে এক ব্যাপক ব্যাধি-গোষ্ঠীকে বোঝায়। মানুষ ও প্রাণীদের শরীরে দূষিত অর্বুদ বা আবের (Malignant tumours) উপস্থিতিজনিত সব রকম ব্যাধিকে ব্যাপক অর্থে ক্যান্সারের অন্তর্ভুক্ত ধরা হয়। এই সব দূষিত অর্বুদ সাধারণ দেহকোষগত পরিব্যক্তির (Somatic mutation) ফলে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। ক্যান্সারাক্রান্ত এই রকমের অস্বাভাবিক কোষসমূহের অবাধ বৃদ্ধির ক্ষমতা দেখা যায় এবং এরা অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আক্রমণ করে' সেগুলিকে ধ্বংস করে ফেলে। রোগটি যখন অগ্রগতির পর্যায়ে বেশ কিছু দূর এসে পড়ে, তখন প্রাথমিক ছোট ছোট বর্ধিত অংশ থেকে রক্ত বা কোষসমষ্টি ভেঙে গিয়ে লিম্ফের (Lymph) সহায়তায় দেহের দূরবর্তী অংশে পরিবাহিত হয় এবং সেখানে অনুরূপ অর্বুদের (Metastasis) সৃষ্টি করে। যতদিন পর্যন্ত শরীরের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদি পর্যুদস্ত হয়ে রোগীর মৃত্যু না ঘটে, ততদিন পর্যন্ত এই দ্বিতীয় পর্যায়ের বর্ধনশীল কোষসমূহ ক্রমাগত ধ্বংসাত্মক প্রক্রিয়া চালিয়ে যেতে থাকে।

জীবনের অস্তিত্ব যত প্রাচীন, ক্যান্সারও তত প্রাচীন। মানুষের ভিতর কম-বেশী ৩০০ বিভিন্ন ধরণের ক্যান্সার দেখা দিতে পারে, যদিও মানবদেহের ক্যান্সার ৩০টি সাধারণ শ্রেণীতে পড়ে। এদের কতকগুলি খুব ধীরে ধীরে পুষ্টিলাভ করে এবং সীমিত বিস্তারের দ্বারা পার্শ্ববর্তী তন্তুগুলিকে বিনষ্ট করে। অপরগুলি শরীরের দূরবর্তী অংশে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু এর মূলীভূত প্রকৃতি সর্বদাই এক ধরণের--কোষগুলির যথেচ্ছ অনিয়মিত পরিবর্ধন দেহের স্বাভাবিক অনাক্রম্য (Immunological) অথবা প্রাণরসায়নগত (Biochemical) নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ সৃষ্টি করে। সুস্থ মানবদেহে হর্মোন, জারক রস (Enzymes) এবং সম্ভবতঃ আরও কতকগুলি অজ্ঞাত ও অপরিচিত পদার্থ সমানুপাতিক ও সুষ্ঠুভাবে একযোগে কাজ করে' কোষগুলির বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ ও সংস্কার সাধন করে। কিন্তু দেহযন্ত্র যদি একবার বিকল হয়ে পড়ে, তবে সমগ্র ক্রিয়া-পদ্ধতিই কোষের ক্রমবিবর্ধনে অরাজকতার সৃষ্টি করে এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা হয়ে ওঠে অপ্রতিরোধ্য।

ক্যান্সারের ইতিহাস

ক্যান্সারের প্রাথমিক সূত্রপাতের বিবরণ ইতিহাসের কুহেলিকায় আবৃত। হাজার হাজার বছর ধরে এই ব্যাধির কথা জানা ছিল। খৃষ্টজন্মের প্রায় ১০০০ বছর পূর্বের ভারতীয় প্রাচীন চিকিৎসাশাস্ত্রে এমন এক রোগের উল্লেখ রয়েছে, যার লক্ষণ ক্যান্সারের অনুরূপ। খৃঃ পূঃ ৫০০ শতাব্দীর মধ্যে মিশরের ফ্যারাওদের মমির হাড়ে সারকোমার (Sarcoma) অস্তিত্ব ধরা পড়েছিল। ভেষজবিদ্যার জনক হিপোক্রেটিস (আনুমানিক ৪৬০ থেকে ৩৭৭ খৃঃ পূঃ) তাঁর রোগীদের মধ্যে ক্যান্সার রোগের অস্তিত্ব ধরতে পেরে উত্তপ্ত লৌহশলাকার দ্বারা তা পুড়িয়ে দেবার নির্দেশ দেন। প্রাচীন গ্রীসে ক্যান্সারযুক্ত

অর্বুদ অপসারণের নিমিত্ত চিকিৎসকেরা জটিল শল্যচিকিৎসারও আশ্রয় গ্রহণ করতেন বলে জানা যায়। আলেকজেণ্ড্রীয় চিকিৎসক লিওনিডেস (২০০ খৃষ্টশতক) যা সুপারিশ করেছিলেন, শল্যচিকিৎসক কর্তৃক আজও তা অনুসৃত হয়। সেটি হলো, দেহের সুস্থ অংশের ভিতর পর্যন্ত গভীরভাবে অস্ত্রোপচার করে ক্যান্সারযুক্ত তন্তুগুলিকে অপসারিত করা। আশ্চর্যের বিষয়, তাঁদের রোগীদের কেউ কেউ যথার্থই রোগমুক্ত হয়েছিল বলে জানা যায়।

তারপর এই রহস্যময় ব্যাধি সম্বন্ধে দীর্ঘ কাল নীরবতা চলে। রক্ত-চলাচল পদ্ধতি, লাল রক্তকোষ এবং অণুবীক্ষণ যন্ত্র আবিষ্কৃত হবার পর সপ্তদশ শতাব্দীতে আবার তার সুত্রপাত হয়। মানুষের ক্যান্সার রোগ সম্বন্ধে যতটুকু জানা ছিল, তার উপর ধাপে ধাপে আরও মোটামুটি জ্ঞান সঞ্চিত হতে থাকে। ক্যান্সারের বিবিধ লক্ষণ ধরা পড়তে লাগলো এবং এও জানা গেল যে, একবার ক্যান্সারে আক্রান্ত হলে রোগীর আর বাঁচবার কোন সম্ভাবনাই থাকে না।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইংরেজ চিকিৎসকেরা দেখলেন যে, যে সব চিম্‌নির ঝাড়ুদার আল-কাত্‌রার সামনে অনবরত কাজকর্ম করে, অন্যান্যের চেয়ে তাদেরই অধিকতর মাত্রায় ক্যান্সারে আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা থাকে। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ইউরোপীয় বিজ্ঞানীরা ক্যান্সারের মোটামুটি বিবরণ সংগ্রহ করে ফেলেছিলেন। কিছুকাল পরেই ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে জার্মান বিজ্ঞানীরা ক্যান্সারের তন্তুগত আণুবীক্ষণিক বৈশিষ্ট্যের বিবরণ জানতে পেরেছিলেন।

কোষ সম্পর্কিত প্যাথোলজির (Cellular Pathology) প্রতিষ্ঠাতা বিখ্যাত জার্মান চিকিৎসক Rudolf Virchow বললেন—ক্যান্সারের উৎপত্তি হয় সেখানেই, যেখানে যান্ত্রিক, রাসায়নিক অথবা ভৌতিক ধরণের পৌনঃপুনিক উত্তেজনায় আহত তন্তুর পরিবর্তন সাধিত হয়। সম্ভবতঃ উত্তেজিত তন্তুগুলির মধ্যে প্রাণরাসায়নিক (Biochemical) অসঙ্গতি ঘটে থাকে এবং তাদের অক্সিজেন গ্রহণে ব্যাঘাত সৃষ্টির ফলে পচন (Fermentation) ঘটে থাকে। তন্তুর স্বাভাবিক গঠনে পরিবর্তন ঘটে এবং তাদের বিভাজন-প্রক্রিয়া অতিক্রত হারে সুরু হয়ে যায়। প্রতি ১০০ দিনে গড়ে তন্তুর সংখ্যা দ্বিগুণিত হয়ে থাকে।

ক্যান্সার রোগের সমতুল্য কোন রোগের কথা জানা নেই এই হিসেবে যে, বাইরের জীবাণুর দ্বারা যেমন অন্যান্য ব্যাধি সংঘটিত হয়ে থাকে, ক্যান্সার কিন্তু সে রকমের নয়—ক্যান্সার একজনের নিজস্ব তন্তু থেকে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় (বীজকোষ নয়, দেহকোষের পরিব্যক্তির মাধ্যমে) এবং যদি রোগীর চিকিৎসা না হয়, তবে এই তন্তুসমূহের দ্বারা রোগী নিধন প্রাপ্ত হতে পারে; কারণ এই উশৃঙ্খল তন্তুগুলি বাইরে থেকে প্রযুক্ত কোন উত্তেজনা বা প্রতিরোধ মেনে চলে না।

ভারতে ক্যান্সার

হৃদ্‌তন্ত্রী (Cardiovascular) রোগ সমেত আমাদের জনসংখ্যার ভিতর সম্ভবতঃ বেশ কিছু মৃত্যু ঘটে ক্যান্সারে, বিশেষ করে বয়স্কদের। ৪৫ বছর বয়সের ঊর্ধ্বে প্রধানতঃ এই ব্যাধি আক্রমণ করে, তবে কম মাত্রায় অল্পবয়স্কদেরও আক্রমণ করতে পারে। আয়ু বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ক্যান্সার আক্রমণের সম্ভাবনাও বেশী হয়ে থাকে।

ভারতের বৃহত্তর ক্যান্সার হাসপাতালগুলির সংখ্যাভিত্তিক তথ্য থেকে জানা যায় যে, সচরাচর যে রকম মনে করা হয়, ভারতে তার চেয়েও বেশী ক্যান্সারের প্রাদুর্ভাব রয়েছে এবং এই রোগের ব্যাপ্তি ক্রমবর্ধনোন্মুখ।

বোম্বাইয়ের টাটা মেমোরিয়াল হস্‌পিটালে ১২৫,০০০-এরও বেশী ক্যান্সার রোগীর পর্যালোচনায় প্রকাশ যে, দেহের বিভিন্ন অংশ এই রোগে

আক্রান্ত হয় এবং সেখানে রোগ ছড়িয়ে পড়ে। কলকাতার চিত্তরঞ্জন ক্যান্সার হাসপাতালে ১৯৫৭-৬৫ সালের মধ্যে মোট ১৮,৫৩০ জন রোগীকে পরীক্ষা করা হয়। তথ্য বিশ্লেষণে অবগত হওয়া যায় যে, বোম্বাইয়ের রোগীদের মুখবিবর ও কলকাতার পুরুষ রোগীদের ফুস্‌ফুসের ক্যান্সার ও স্ত্রী রোগীদের জননেন্দ্রিয়ের ক্যান্সারের সংখ্যা বোম্বাই হাসপাতালের রোগীর অপেক্ষা অধিক (যথাক্রমে ১.৫% ও ৪২%)। উপযুক্ত পুষ্টি ও সংক্রামক ব্যাধি থেকে মুক্তির দরুণ ভারতবাসীদের

ভারত ও অন্যান্য দেশে ক্যান্সারের প্রাদুর্ভাব
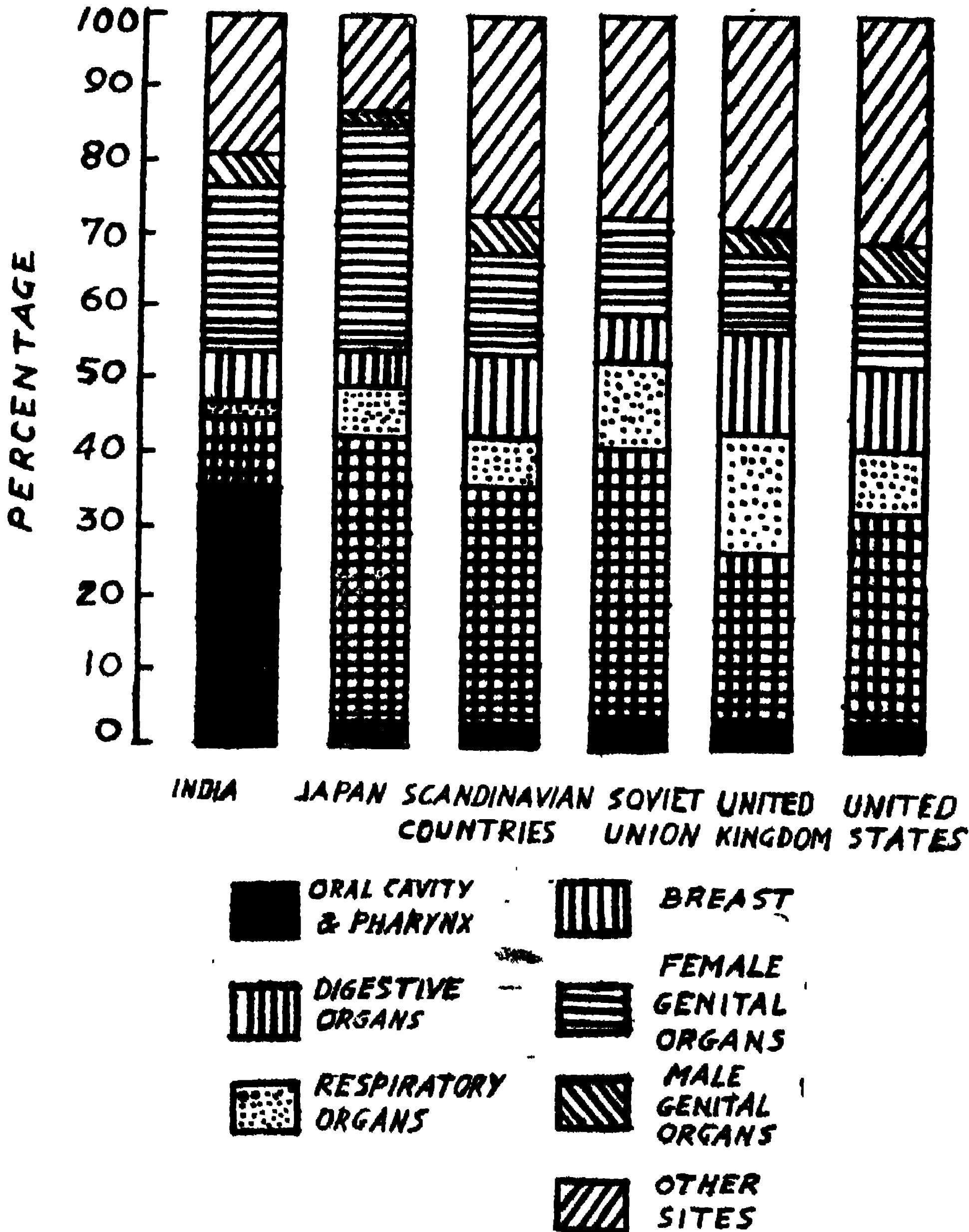
গলার ক্যান্সারগ্রস্ত রোগীর সংখ্যা (পুরুষ ৭০%, স্ত্রীলোক ২৩%) কলকাতার রোগীদের চেয়ে বেশী (পুরুষ ৫৭.৮% স্ত্রীলোক ১১.১%)। বোম্বাইয়ের রোগীদের মধ্যে কণ্ঠনালী (Oesophagus) ও স্তনের ক্যান্সার কলকাতার রোগীদের চেয়ে বেশী। আয়ু বৃদ্ধি পাচ্ছে। এর অর্থ দাঁড়াচ্ছে এই যে, বর্তমানে আমাদের জনসংখ্যার প্রতি ১,০০০,০০০ জনের ভিতর বছরে প্রায় ৮৫ জন নতুন লোক ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়। মনে হয় এই হার ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাবে এবং জনসাধারণ ও

স্বাস্থ্য বিভাগীয় কর্মকর্তাদের কাছে একটা বিরাট সমস্যা হয়ে দাঁড়াবে।

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রের হিসেব থেকে জানা যায় যে, সমগ্র পৃথিবীতে বছরে প্রায় ২০ লক্ষ লোক ক্যান্সারে মারা যায়। ইউরোপের বিভিন্ন অঞ্চলে ও সোভিয়েট ইউনিয়নে বিগত ৩০ বছরে পুরুষের শ্বাসযন্ত্রে যন্ত্রণাদায়ক অর্বুদের দরুণ মৃত্যুহার তিন গুণেরও বেশী হয়েছে, আর ভাগে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে মানবদেহে এই ব্যাধির বিস্তার বিভিন্ন রকমের হয়ে থাকে। এই প্রভেদের জন্যে বহুলাংশে দায়ী হলো পারিপার্শ্বিক অবস্থা, অভ্যাস ও সামাজিক রীতিনীতি; কিন্তু সম্ভবতঃ অপরাপর কয়েকটি অজ্ঞাত কারণও আছে। বিশেষ বিশেষ স্থানে আমেরিকা, ইউরোপ ও এশিয়ার দেশগুলিতে ক্যান্সারজনিত মৃত্যুহারে বেশ তারতম্য

দেহের বিভিন্ন অংশে ক্যান্সারের আক্রমণ

(চিত্তরঞ্জন ক্যান্সার হাসপাতালের রেকর্ড থেকে প্রাপ্ত)
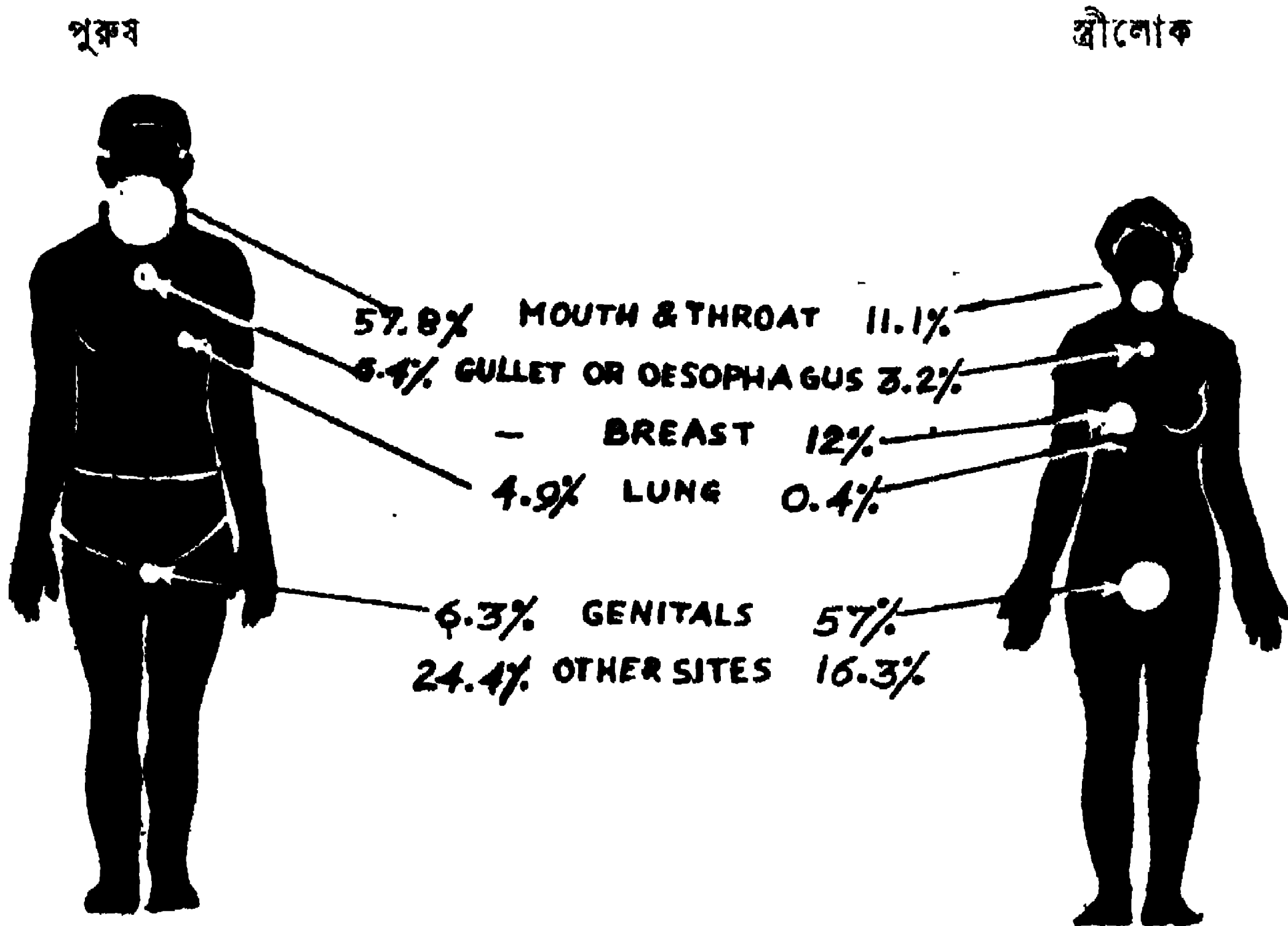
(প্রায় ২,০০০ রোগীর ক্যান্সারের ইতিহাস পর্যালোচনা করে এই তথ্য পাওয়া গেছে)

নারীদের মধ্যে জরায়ু সংক্রান্ত ক্যান্সার দ্বিগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

ক্যান্সার উৎপাদনকারী প্রভাবশালী কারণসমূহ

সব রকম আবহাওয়া এবং সব রকম জাতির মধ্যেই ক্যান্সার হতে দেখা যায়—যদিও এক দেশ থেকে অন্য দেশে এবং দেশের অভ্যন্তর দৃষ্ট হয়। অপেক্ষাকৃত দ্রষ্টব্য বিষয়গুলি হলো:- (১) স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ার দেশসমূহ, আইসল্যাণ্ড এবং জাপানে পাকস্থলীর ক্যান্সারের উচ্চতর হার; (২) দক্ষিণ ও পশ্চিম আফ্রিকার প্রাথমিক যকৃৎ ক্যান্সারের উচ্চতর হার; (৩) চীনে নাসিকা ও কণ্ঠনালী-দেশে (Naso-pharyngeal region) ক্যান্সারের বর্ধিত হার; (৪) মিশরে মূত্রাশয়ের ক্যান্সারের বর্ধিত

হার ; (৫) যুক্তরাজ্যে অধিকতর হারে স্তনের ক্যান্সার ; (৬) ভারতে Oropharyngeal অংশে বর্ধিত হারে ক্যান্সার ; (৭) জাপান ও ভারতে স্ত্রী-জননেন্দ্রিয়ে উচ্চতর হারে ক্যান্সার ; (৮) কৃষ্ণকায় জাতি অপেক্ষা শ্বেতকায় জাতির মধ্যে অধিকতর মাত্রায় চর্মের ক্যান্সার। দেখা গেছে যে, বিশেষ ধরণের ক্যান্সারের বিস্তার কয়েকটি কারণের উপর নির্ভরশীল, যার মধ্যে রয়েছে বয়স, স্ত্রী বা পুরুষ ভেদ, জাতি, বাসস্থল, অভ্যাসাদি, পেশা এবং সামাজিক রীতিনীতি।

(১) বয়সের প্রভাব—২০ বছরের নীচে ক্যান্সারে মৃত্যুহার অপেক্ষাকৃত কম, ৫০-৬০ বছরে এটা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পায় (নারীদের মধ্যে গোড়ার দিকে) এবং তারপর আক্রমণ কিছুটা কম হয়। কিন্তু ক্যান্সারের আরও রকমফের আছে, যা অতি শৈশবে ও অতি বার্ধক্যে সর্বাধিক মাত্রায় ঘটে থাকে। কঠিন লিউকেমিয়া (রক্তের এক রকমের ক্যান্সার), মস্তিষ্ক ও স্নায়ুর অর্বুদ এবং অস্থি-র ক্যান্সারের ক্ষেত্রে এটি সত্য।

(২) স্ত্রী ও পুরুষের প্রভাব—২৫-৫৫ বছর বয়সের নারীদের মধ্যে ক্যান্সারের হার পুরুষদের অপেক্ষা বেশী। নারীদের প্রজনন যন্ত্রাদিতে (জরায়ু ও স্তন) অল্প বয়সে ক্যান্সার সংঘটিত হওয়াই এর কারণ। পুরুষের মধ্যে সবচেয়ে বেশী ক্যান্সার দেখা যায় ত্বক, ফুসফুস, প্রোস্টেট গ্ল্যাণ্ড, পায়ুনালী এবং পাকস্থলীতে। নারীদের মধ্যে স্তন, জরায়ু, ত্বক, অন্ত্র, যকৃৎ, পিত্তনালী এবং থাইরয়েডে প্রায়ই ক্যান্সার হয়ে থাকে।

(৩) বাসস্থলের প্রভাব—কয়েকটি রাজ্যের অবস্থা পর্যালোচনায় জানা যায় যে, গ্রামাঞ্চলের অধিবাসীদের চেয়ে শহরাঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্যে ১৫%-৪০% ক্যান্সারের প্রাদুর্ভাব ও মৃত্যুহার বেশী। শহরাঞ্চলের পুরুষদের মধ্যে শ্বাসযন্ত্রে ঐ বর্ধিত হার বেশী প্রকট। শহরের বাতাস কলুষিত হবার ফলে বাতাসে কার্শিনোজেন (Carcinogen) সমন্বিত পদার্থসমূহ বেশী সঞ্চিত হবার দরুণ এটা হতে পারে।

(৪) সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার প্রভাব—বোম্বাইয়ের টাটা ক্যান্সার হাসপাতালের বিবরণে প্রকাশ যে, মহীশূর রাজ্যের ব্যাঙ্গালোরে পাকস্থলীর ক্যান্সারের সংখ্যা বেশী। কিন্তু গুজরাট রাজ্যের অধিবাসীরা সচরাচর নিরামিষভোজী ও যথেষ্ট মাত্রায় দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্যাদি গ্রহণ করে। সেখানে পাকস্থলীর ক্যান্সার কম। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ সমাজ অপেক্ষা সর্বনিম্ন সমাজে এই হার প্রায় দ্বিগুণ বেশী। আধুনিক গবেষণায় অবশ্য জানা গেছে যে, লিউকেমিয়া শ্রেণীর ক্যান্সার নিম্ন সম্প্রদায় অপেক্ষা উচ্চ সম্প্রদায়ের মধ্যে বেশী।

(৫) অভ্যাসের প্রভাব—ফুস্ফুসের ক্যান্সারের অন্যতম কারণ যে ধূমপান, তা চূড়ান্তভাবে প্রমাণিত না হলেও একথা ঠিক যে, অধূমপায়ীদের চেয়ে ধূমপায়ীদের মধ্যেই ফুস্ফুস ও কণ্ঠনালীর ক্যান্সারের শতকরা হার বেশী। খৈনি-খাওয়া, চুট্টার ধূমপান করা, চুনসহ পান খাওয়ার অভ্যাসই ভারতে ঠোঁট ও গালের ক্যান্সারের নিশ্চিত কারণ। কাশ্মীরে পেটের চামড়ায় যে ক্যান্সার হয়, তার নাম কাংগরি ক্যান্সার। এটা হবার কারণ—শীতের সময় ঐসব স্থানীয় লোকেরা কোমরের নীচে পেটের কাছে নিজেদের গরম রাখবার জন্যে ঝুড়িতে জ্বলন্ত কাঠকয়লা রেখে থাকে। কণ্ঠনালী, পাকস্থলী ও যকৃতের ক্যান্সার অধিক মাত্রায় মদ্যপানের সঙ্গে সম্পর্কিত। প্রোটিন ও ভিটামিনশূন্য (বিশেষ করে "বি" শ্রেণীর ভিটামিন) খাদ্য মুখগহ্বর, গলদেশ, কণ্ঠনালী, পাকস্থলী ও যকৃতের ক্যান্সারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকতে পারে।

পূর্বোক্ত টাটা হাসপাতালে ১২৫,০০০ জন

রোগীর পরীক্ষায় এটা প্রমাণিত হয়েছে যে, ভারতে মুখ ও কণ্ঠনালীর ক্যান্সারে স্থানীয় অভ্যাস নির্দিষ্ট অংশ গ্রহণ করে।

(৬) পেশার প্রভাব—ভারতসহ পৃথিবীর বহু অংশে শিল্পোন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে ক্যান্সার রোগীর সংখ্যা ভয়াবহ মাত্রায় বৃদ্ধি পেয়েছে। হাজার হাজার রাসায়নিক যৌগিক পদার্থ রয়েছে, যেগুলি ক্যান্সার উৎপত্তির কারণ বলে সঠিক-ভাবে প্রমাণিত হয়েছে। ভৌতিক কারণসমূহ, যেমন—অতিবেগুনী রশ্মি, এক্স রশ্মি ও তেজস্ক্রিয় দ্রব্যাদিও খুব জোরালো ক্যান্সার উৎপাদন-কারী পদার্থ। এক্স রশ্মি, অতিবেগুনী রশ্মি এবং তেজস্ক্রিয় আইসোটোপের পরীক্ষামূলক চিকিৎসা এবং ব্যবসায়গত প্রয়োগের ফলে লিউকেমিয়া, অষ্টিয়োসারকোমা এবং ফুস্‌ফুসের ক্যান্সারের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। যে সকল চিকিৎসক তেজস্ক্রিয় চিকিৎসায় (Radiology) লিপ্ত নন, তাঁদের চেয়ে নয় গুণ বেশী মাত্রায় এক্স রশ্মি-বিশেষজ্ঞদের মধ্যে লিউকেমিয়ার প্রকোপ দেখা যায়। দেখা গেছে, লুমিনাস পেন্টের সাহায্যে ঘড়ির ডায়েল রং করবার কাজে নিযুক্ত মহিলা কর্মীদের মধ্যে অস্থি-ক্যান্সারের প্রবণতা বেশী। অনুসন্ধানের ফলে জানা গেছে যে, ঐ সকল কর্মীরা তেজস্ক্রিয় পদার্থ সমন্বিত দ্রবণে তুলি ডুবিয়ে অধর ও ওষ্ঠের মধ্যে চেপে তুলির মুখ সূক্ষ্ম করে নিত। অতি অল্প মাত্রায় হলেও এভাবে তেজস্ক্রিয় পদার্থ দেহাভ্যন্তরে প্রবেশ করে অস্থিতে জমা হয়ে অস্থি-ক্যান্সারের সূত্রপাত করতো। তেজস্ক্রিয় পদার্থ সমন্বিত ভূতাত্ত্বিক স্তরে কার্যরত খনির শ্রমিকদের প্রায়ই ফুস্‌ফুসের ক্যান্সারে আক্রান্ত হতে দেখা যায়। অ্যাজো-ডাই, বিশেষ করে বিটা-ন্যাপথাইলামিন (Betanaphthylamine) শ্রেণীর রঞ্জক পদার্থ উৎপাদনে ব্যাপৃত শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্মিবৃন্দ মূত্রাশয়ের (Urinary bladder) ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়। উৎপাদনের এক বিশেষ পর্যায়ে ৬ মাস ক্রমাগত কার্যরত থাকলেও মূত্রাশয়ের ক্যান্সারে বেশী শতাংশে আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা থাকে। আর্সেনিক, বেনজিডিন (Benzidine), ভূসা, আলকাত্‌রা, ক্রিওজোট তেল, অশোধিত প্যারাফিন তেল, অ্যাসবেস্টস, ক্রোমেট যৌগসমূহ, প্লাস্টিক, নিকেল কার্বনিল (Nickel Carbonyl) প্রভৃতি সম্পর্কিত অন্যান্য শিল্পে নিযুক্ত কর্মীদের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে ক্যান্সার আক্রমণের আশঙ্কা থাকে। সুতরাং প্রশ্ন উঠছে যে, অনুন্নত বা উন্নতিশীল দেশে শিল্পায়ন, বিশেষ করে অহিতকর শিল্পসমূহের অগ্রগতি জনগণের মধ্যে ক্যান্সার আক্রমণের সম্ভাবনা বৃদ্ধির পর্যায় পর্যন্ত চালিয়ে যাওয়া উচিত কি না? মূলতঃ শিল্পে অগ্রগতির পথে ক্যান্সার অভি-শাপস্বরূপ নয়। যথাযথ সতর্কতামূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করলে শিল্পে এর বিপত্তি এড়িয়ে যাওয়া চলে।

(৭) সামাজিক রীতিনীতির প্রভাব—দেখা গেছে যে, ইহুদি ও মুসলমানেরা সচরাচর পুং-জননেন্দ্রিয় এবং জরায়ুমুখের ক্যান্সারে আক্রান্ত হয় না। এই দুই সম্প্রদায়ের লোকের মধ্যে লিঙ্গচ্ছদ কর্তন (Circumcision) বাধ্যতামূলক হওয়ায় এই দুই ধরণের ক্যান্সার খুব কমই ঘটতে দেখা যায়। ইহুদিদের মধ্যে জন্মের ৮ম দিনে এই প্রথা অনুযায়ী কাজ করা হয় এবং তারা এই দুই ধরণের ক্যান্সারে ভোগে না। মুসলমানেরা অপেক্ষাকৃত পরিণত বয়সে এই প্রথা অনুযায়ী কাজ করে। তারা এই দুই ধরণের ক্যান্সারে ভোগে বটে, তবে যে সকল লোকের ভিতর এই প্রথা প্রচলিত নেই, তাদের মত ঘন ঘন নয়। পুং-জননেন্দ্রিয়ের অস্বাস্থ্যকর অবস্থা, বিশেষ করে ঢিলা লিঙ্গচ্ছদ বা Frenum-এর নীচে জীবাণুঘটিত ময়লা জমা হয়ে এই সব অংশে ক্যান্সার উৎপত্তির উপযুক্ত

অবস্থার সৃষ্টি করে। হিন্দুদের মধ্যে এই প্রথা প্রচলিত নেই, সেটাই হয়তো ভারতে জরায়ু-মুখের ক্যান্সারাক্রান্ত রোগীর সংখ্যা অপেক্ষাকৃত বেশী হবার কারণ বলা যেতে পারে। বহুসংখ্যক শিশুর জন্ম জরায়ু-মুখের ক্যান্সারের অপর কারণ বলা হয়। লক্ষ্য করা গেছে—অপুত্রক নারী অথবা দুই-একটি সন্তানের জননী অপেক্ষাকৃত অধিক মাত্রায় জরায়ু-মুখের ক্যান্সার প্রতিরোধে সক্ষম। উপযুক্ত পরিবার নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনার সাহায্যে আমরা এই ধরণের ক্যান্সার উৎপত্তির সংখ্যা হ্রাস করতে পারি। বৃটিশ মহিলা ও ভারতের পার্শি সম্প্রদায়ের মহিলাদের মধ্যে স্তনের ক্যান্সার (প্রায় ১৭%-১৮%) হতে দেখা যায়, শিশুকে স্তন্যদানে বিরত থাকাই এর কারণ। জাপানী মায়েরা তাঁদের শিশুদের দীর্ঘকাল স্তন্যপান করিয়ে থাকেন বলে তাঁদের মধ্যে এই ব্যাধির প্রকোপ অনেক কম (৫.৩%) এবং এই থেকেই স্তন্যদান এবং স্তনের ক্যান্সারের মধ্যে সম্পর্কের বিষয়ে সিদ্ধান্ত করা হয়েছে।

(৮) পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রভাব –মহামারী সংক্রান্ত অনুসন্ধানের ফলে দেখা গেছে যে, কয়েক ধরণের ক্যান্সার পৃথিবীর কয়েক অংশে ব্যাপকভাবে হয়ে থাকে। সাইলেসিয়া ও আর্জেন্টিনার কয়েকটি প্রদেশে ত্বকের ক্যান্সার প্রায়ই দেখা যায়। অনুসন্ধানের ফলে জানা গেছে যে, ঐসব অঞ্চলের জলে আর্সেনিক রয়েছে। এই জল গ্রহণের ফলে ত্বকে আর্সেনিক জমে ক্যান্সারের সৃষ্টি করে। অনুরূপভাবেই দেখা গেছে যে, সুইজারল্যাণ্ডে এক রকমের গলগ্রন্থি (Thyroid gland)-ক্যান্সার প্রায়ই হয়ে থাকে। পানীয় জলে কম অথবা পূর্ণমাত্রায় আয়োডিনের অভাবই এর কারণ বলে ধরা হয়। খাদ্যের সঙ্গে নিয়মিতভাবে আয়োডিনঘটিত লবণ ও জল ব্যবহার করে এই পরিস্থিতি এড়ানো সম্ভব হয়েছে। মিশরে মূত্রাশয়ের ক্যান্সার খুব বেশী মাত্রায় হয়ে থাকে। প্রমাণিত হয়েছে যে, Schistosoma haematobium নামে এক জাতীয় পরজীবি-সংক্রমণই এই ধরণের ক্যান্সার উৎপত্তির অন্যতম মুখ্য কারণ।

(৯) জাতির প্রভাব—যে সকল শ্বেতকায় মানব জাতির ত্বকে রঞ্জক পদার্থ (Pigment) নেই, তাঁরা যদি দীর্ঘকাল গ্রীষ্মপ্রধান দেশে প্রখর রৌদ্রে অবস্থান করেন, তবে প্রায়ই তাঁরা ক্যান্সারে ভুগে থাকেন। সুপরিচিত Sailor's cancer ও Farmer's cancer এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

(১০) বংশগতির প্রভাব—ক্যান্সার কি বংশানুক্রমিক? এই প্রশ্ন প্রায়ই জিজ্ঞাসা করা হয়—কারণ জনসাধারণ, বিশেষতঃ যাঁরা ক্যান্সারের দরুণ এক বা একাধিক আত্মীয়-স্বজনকে হারিয়েছেন, তাঁদের মনে এসম্বন্ধে একটা সাধারণ ভীতি রয়েছে। এক রকমের ক্যান্সার Retinoblastoma (অক্ষিপটের এক রকম বিরল ক্যান্সার), দুটি প্রাক-ক্যান্সারের অবস্থা, যেমন Scleroderma pigmentosum, Multiple polyposis of the rectum এবং Neurofibromatosis—এগুলি লক্ষণীয়ভাবে বংশ-পরম্পরায় পরিচালিত হয়। স্তন, জরায়ু-মুখ, বৃহদন্ত্র এবং পাকস্থলীর ক্যান্সারে কিছুটা বংশানুক্রমিকতা পরিলক্ষিত হয়। উল্লিখিত কয়েকটি ধরণের বিরল ক্যান্সার ও প্রাক-ক্যান্সারের অবস্থা ছাড়া কোনও একজন লোকের পক্ষে, এমন কি একজনের মাতা, পিতা অথবা উভয়েরই যদি ক্যান্সারের ফলে মৃত্যু ঘটে থাকে, তার পক্ষেও ক্যান্সারের আক্রমণ থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার ১০% সম্ভাবনা রয়েছে। ক্যান্সার রোগীর উদ্বিগ্ন আত্মীয়স্বজন অনেক সময়েই ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করেন—ক্যান্সার ছোঁয়াচে রোগ কি না? এর উত্তর হলো—না। মানবদেহের ক্যান্সার ছোঁয়াচে অথবা কোন রকম

স্পর্শজনিত কারণে বিস্তারলাভ করে, এটা প্রমাণিত হয় নি। ইঁদুর, খরগোস, মুরগী এবং ব্যাঙের মধ্যে দৃষ্ট কয়েক রকমের ক্যান্সার তন্তুসমূহের তন্তুমুক্ত ফিলট্রেট (Cell-free filtrate) অথবা কোন ভাইরাসের মাধ্যমে এক প্রাণীর দেহ থেকে অন্য প্রাণীর দেহে পরিচালন করা যেতে পারে, কিন্তু মানবদেহে এভাবে পরিচালন করা সম্ভব নয়।

প্রাক-ক্যান্সার অবস্থাসমূহ

তন্তুসমূহের মধ্যে কিছু কিছু প্যাথোলজিক্যাল পরিবর্তন দেখা যায়, যেগুলি নিজেরা নির্দোষ হলেও অচিকিৎসা বা ভুল চিকিৎসায় গুরুতর আকার ধারণ করতে পারে। শরীরের বিভিন্ন অংশে এই প্রাক-ক্যান্সার অবস্থাগুলি গড়ে ওঠে। এই সব আহত স্থান (Lesions) থেকে রীতিমত ক্যান্সার গড়ে ওঠা বন্ধ করবার জন্যে অচিরাৎ যত্ন লওয়া প্রয়োজন। ভাবী বিপত্তির সম্ভাবনা থাকায় নিম্নোক্ত অবস্থাগুলিতে সঠিক সতর্কতা অবলম্বন করা বিধেয়।

(১) ঠোঁটের খোলা অংশে, জিহ্বায়, গালের ভিতরে, গলদেশে, কণ্ঠনালীতে এবং লিঙ্গ, পায়ু, জরায়ু ও যোনিমুখে শাদা খণ্ড খণ্ড দাগ (Leukoplakia) ক্যান্সারাত্মক অবস্থার প্রাগাভাস বলে জ্ঞাত। এদের সবই যে ক্যান্সারে পরিণত হবে তার কোন মানে নেই, তবে এদের বেশ কিছু সংখ্যক এই পরিণতির দিকে মোড় নেয়।

(২) পাকস্থলী, জরায়ু, কলোন, মলদ্বার এবং মূত্রাশয়ে এক বা একাধিক পলিপ (Polyp) দেখা যায়। যেখানে সম্ভব এগুলি শীঘ্র অপসারণ করা উচিত।

(৩) পুরাতন স্তন-স্ফীতি (Mastitis) এবং স্তনে মাংসপিণ্ড।

(৪) বৃদ্ধবয়সে ত্বকের বিকৃতি (Hyperkeratosis)।

(৫) ক্ষয়রোগাক্রান্ত ত্বক এবং অন্যান্য পুরাতন সংক্রমণ ও ত্বকের স্থায়ী ক্ষত, যেমন—অসম্পূর্ণ পোড়া দাগ প্রভৃতি।

(৬) সিফিলিস এবং ক্ষয়রোগাক্রান্ত জিহ্বা।

(৭) মূত্রাশয়ের Bilharziasis।

(৮) পাকস্থলীর ঘা (Peptic ulcer)—বলা হয় যে, ৫%—১৫% পেপ্‌টিক আলসার ক্যান্সারে পরিণত হয়। সুতরাং যে সব পেপ্‌টিক আলসারে ঔষধ ক্রিয়া করে না, সে সব ক্ষেত্রে যথোপযুক্ত সতর্কতার সঙ্গে শল্যচিকিৎসার ব্যবস্থা করা দরকার।

(৯) জড়ুল বা আঁচিল (Mole)—রঞ্জিত জন্মদাগ বা জড়ুল খুব কম ক্ষেত্রেই দূষিত অবস্থা প্রাপ্ত হয়, তবে এই জড়ুল থেকেই মেলানোমা (Melanoma) নামক এক ভয়াবহ প্রকৃতির ক্যান্সারের উদ্ভব হয়। সুতরাং এর উপর পুনঃ পুনঃ চাপ প্রয়োগ বা অন্য ধরণের উত্তেজনা সৃষ্টি থেকে বিরত থাকা উচিত।

ক্যান্সার ধরবার উপায়

ক্যান্সার সুরু হয় অজ্ঞাতসারে এবং প্রথম অবস্থায় সাধারণতঃ কোন রকম সুনির্দিষ্ট লক্ষণাদিও দৃষ্টিগোচর হয় না। ক্যান্সার বহু প্রকারের, কিন্তু এপর্যন্ত নির্ভরযোগ্য এমন একটি পরীক্ষাও উদ্ভাবিত হয় নি, যার সাহায্যে তাদের ধরা যায়। প্রগতিশীল দেশগুলিতে (যার মধ্যে ভারতও পড়ে) সচরাচর ক্যান্সার নির্ণয় করা হয় তখন, রোগটি যখন বেশ কিছু দূর অগ্রসর হয়ে যায়। সুতরাং রোগী ও ডাক্তার উভয়েরই সর্বদা সচেতন থাকা প্রয়োজন। ক্যান্সার যদি গোড়ায় দিকে ধরা পড়ে, তবে অনেক কিছুই করতে পারা যায়। জনসাধারণের মধ্যে বুদ্ধিজীবি স্ত্রী ও পুরুষেরা যদি নিম্নোক্ত লক্ষণগুলির যে কোন একটি লক্ষণ

(সতর্কতামূলক সঙ্কেত) দেখা দিলে ব্যাপক পরীক্ষার জন্যে ক্যান্সার নির্ণায়ক কেন্দ্রে উপস্থিত হন, তবেই এটা সম্ভব হতে পারে। আন্তর্জাতিক ক্যান্সার বিরোধী সঙ্ঘ সকলের পক্ষে প্রযোজ্য নিম্নোক্ত ৯টি লক্ষণকে ক্যান্সারের পূর্বাভাস বলে স্মরণ রাখতে বলেছেন।

১। বক্ষে একটি পিণ্ড বা শক্ত অংশ (এটা পুরুষের পক্ষেও প্রযোজ্য, যারা অপেক্ষাকৃত অল্প সংখ্যায় হলেও স্তন-ক্যান্সারে ভুগে থাকে)।

২। তিল, আঁচিল বা জন্মদাগের বর্ণ বা আকারের ক্রমাগত পরিবর্তন।

৩। পরিপাক এবং মলত্যাগের অভ্যাসের অনবরত পরিবর্তন, বিশেষ করে ৪০ বছরের উর্ধ্বে।

৪। একঘেঁয়ে কাশি বা স্বরভঙ্গ (Sore throat)।

৫। (স্ত্রীলোকের পক্ষে প্রযোজ্য) অত্যধিক রক্তস্রাব।

৬। কোন স্বাভাবিক ছিদ্রপথে রক্তপাত।

৭। স্ফীতি বা ঘা, যা ভাল হয় না, বিশেষ করে ঠোঁটে, জিহ্বায়, কানে, চোখের পাতায় অথবা জননেন্দ্রিয়ে।

৮। অব্যাখ্যাত ওজন-হ্রাস, দীর্ঘকালীন জ্বর, যার কোন ব্যাখ্যাই খুঁজে পাওয়া যায় না অথবা একটা দুর্বলতার অনুভূতি।

৯। ক্রমাগত মাথাধরা, সাইনিউসাইটিস (Sinusitis) অথবা দৃষ্টিশক্তির অসুবিধা।

এই সব বা অন্য কোন লক্ষণ দেখবার সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসক অনেক সময় ধরে দেহের সকল অংশে নিয়মিত পরীক্ষা সুরু করেন এবং দেহের যে সব অংশে ক্যান্সার আক্রমণের সম্ভাবনা বেশী, সে সব অংশের দিকে বিশেষ মনোযোগ দেন। তাঁর অনুসন্ধানের ফলে একটা মাংসপিণ্ড অথবা ঘা বের হয়ে পড়া সম্ভব। বিশেষ বিশেষ ক্যান্সারের জন্যে পরীক্ষণাগারের বহু প্রক্রিয়া রোগ নির্ণয়ে সহায়ক।

সর্বাধিক পরিচিত হলো—কোষ-পরীক্ষা। এই প্রক্রিয়ায় জরায়ুর মুখ থেকে সংগৃহীত কোষ-সমূহের আণুবীক্ষণিক পরীক্ষা চালানো হয়। প্রক্রিয়াটি দেহের অন্যান্য অংশজাত রসেও প্রযুক্ত হয়ে থাকে ; যেমন—মূত্র, থুথু, নাকের সর্দি, মুখের লালা এবং পাকস্থলী ধৌতকরণে প্রাপ্ত জলীয় অংশ প্রভৃতি। বায়োপ্‌সি (Biopsy) নামক একটি শল্য-পদ্ধতির দ্বারা সঠিকভাবে ক্যান্সার নির্ণয় করা সম্ভব। এই পদ্ধতিতে সন্দেহজনক তন্তুর একটি ক্ষুদ্র অংশ অপসারিত করবার পর রঞ্জিত করে সুশিক্ষিত চিকিৎসক অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে পরীক্ষা করেন। দেহের আভ্যন্তরীণ অংশে এই পদ্ধতি অনুসরণ করা কঠিন। সুতরাং সেখানে এক্স রশ্মি ও সঠিক এণ্ডোস্কোপিক (Endoscopic) পরীক্ষা রোগ নির্ণয়ে সহায়ক হয়ে থাকে।

ক্যান্সারের যথার্থ কারণ কি ? গবেষণালব্ধ জ্ঞান

একথা প্রায় সর্বজনস্বীকৃত যে, আধুনিক কালের জনস্বাস্থ্য সম্পর্কিত সর্বাধিক সমস্যা হলো—লিউকেমিয়া সমেত ক্যান্সারের মূল কারণ কি, তার সঠিক উত্তর পাওয়া। ছড়িয়ে পড়া এবং সংক্রামক রোগের চিকিৎসায় বিগত ৩০ বছরে বিশেষ অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। কিন্তু আন্তর্জাতিক চেষ্টা সত্ত্বেও ক্যান্সারের মুখ্য কারণ আজও বিজ্ঞান আবিষ্কারে সক্ষম হয় নি।

ক) রাসায়নিক যৌগসমূহ (Chemical carcinogenic compounds) — উনবিংশ শতাব্দীতে একজন বিখ্যাত জার্মান বিজ্ঞানী বলেছিলেন — পৌনঃপুনিক ঘর্ষণ ক্যান্সার উৎপত্তির একটি কারণ। কোন কোন শিল্পে নিযুক্ত কর্মীদের মধ্যে সংঘটিত ক্যান্সারের এটাই সাধারণ

ব্যাপার বলে মনে করা হতো। কিন্তু সন্দেহজনক রাসায়নিক পদার্থের সাহায্যে জীবদেহে কৃত্রিম উপায়ে ক্যান্সার উৎপাদন করা সম্ভব হয় নি। তবে ১৯১৫ সালে দু-জন জাপানী গবেষক অনেক মাস ধরে খরগোসের কানে আলকাত্‌রা লাগিয়ে তাদের কানে ত্বকের ক্যান্সারের সূচনা হতে দেখেন। পরে বৃটিশ বিজ্ঞানীরা আলকাত্‌রা থেকে ৩, ৪-বেঞ্জোপাইরিন (3, 4-Benzpyrene) নামে একটি বিশুদ্ধ রাসায়নিক পদার্থ পৃথকীকরণে সক্ষম হন। এই পদার্থটি ইঁদুরের যে অংশে লাগানো হয়েছিল, সেখানে ক্যান্সারের সূত্রপাত দেখা দিয়েছিল।

শীঘ্রই উদ্ঘাটিত হলো যে, পলিসাইক্লিক হাইড্রোকার্বন জাতীয় রাসায়নিক দ্রব্য (৩, ৪-বেঞ্জোপাইরিন যার অন্তর্গত) পাওয়া যায় অনেক প্রকারের আলকাত্‌রা, তেল এবং অসম্পূর্ণরূপে দগ্ধ উদ্ভিজ্জ পদার্থ থেকে উপজাত পদার্থের মধ্যে কার্সিনোজেনস ও কো-কার্সিনোজেনস (Carcinogens and Co-carcinogens)। রসায়ন বিজ্ঞানীরা অতঃপর অনেক বিশুদ্ধ রাসায়নিক পদার্থ উৎপাদন করেছেন, যা জীবদেহে ক্যান্সার সৃষ্টি করে এবং তাঁরা আরো এগিয়ে এগুলির রাসায়নিক সংগঠন ও ক্যান্সার সৃষ্টিকারী কর্মক্ষমতার মধ্যে কিছু সাধারণ সম্পর্ক দেখিয়ে দিয়েছেন। এই সব কার্সিনোজেনের আচরণের মাধ্যমে ক্যান্সার উৎপাদন-সহায়ক প্রক্রিয়া বোঝবার চেষ্টা হয়েছে। এটা এখন সুস্পষ্টভাবে জানা গেছে যে, অল্প মাত্রায় অনেক খাঁটি রাসায়নিক দ্রব্য প্রয়োগে প্রাথমিক প্রদাহজনক পরিবর্তনাদি ছাড়াই ক্যান্সার উৎপাদনের অবস্থা সৃষ্টি করতে পারে। প্রদাহ সৃষ্টিকারী অনেক রাসায়নিক পদার্থ তন্তুগুলিকে ধ্বংস করলেও ক্যান্সার সৃষ্টি করে না। এথেকেই দেখা যায়, কার্সিনোজেনেসিস (Carcinogenesis) প্রদাহ থেকে পৃথক।

(খ) পারিপার্শ্বিক বিপদ (Environmental hazards)—অধিকাংশ লোকের পক্ষে আলকাত্‌রা, দূষিত বাতাস, তামাকের ধোঁয়া ও অশোধিত দ্রব্যাদি সমন্বিত পারিপার্শ্বিক অবস্থার সম্মুখীন হওয়া বিপজ্জনক ব্যাপার। শিল্পে নিযুক্ত মনুষ্যদেহে নিম্নোক্ত ক্যান্সারগুলি হতে দেখা যায়; যথা—ডাই-এর কর্মীদের মধ্যে যারা বিটা-ন্যাপথিলামিন (Beta-naphthylamine) নিয়ে কাজ করে, তাদের মূত্রস্থলীর ক্যান্সার; রেডিয়াম গলাধঃকরণের ফলে অস্থি-ক্যান্সার; ক্রোমেট, তেজস্ক্রিয় খনিজ পদার্থ, অ্যাসবেস্টস, লৌহ প্রভৃতির ঘ্রাণ নেবার ফলে ফুস্‌ফুসে ক্যান্সার; নিকেল খনির কর্মীদের নাসারন্ধ্র এবং ফুসফুসের ক্যান্সার; কয়লা, তেল, অয়েল সেল, লিগ্‌নাইট এবং পেট্রোলিয়ামের কয়েকটি উপজাত পদার্থ ব্যবহারের ফলে চর্মের ক্যান্সার প্রভৃতি।

শিল্পের পরিত্যক্ত পদার্থের দ্বারা দূষিত বাতাস কার্সিনোজেনের কার্যকরী উৎসরূপে পরিগণিত। বাতাসে দূষিত পদার্থ থাকলে আমাদের ফুস্‌ফুস সাধারণতঃ কাশির সাহায্যে বা অন্য জটিল উপায়ে ব্রঙ্কিয়েল নল (Bronchial tubes) বা ফুস্‌ফুস তন্তুর দ্বারা তাদের হাত থেকে নিষ্কৃতি পায়। কিন্তু অতিমাত্রায় অথবা অনবরত এই সব দূষিত পদার্থের শ্বাসগ্রহণে ফুস্‌ফুস ও ব্রঙ্কিয়েল লাইনিং-এ পরিবর্তন সাধিত হয়, যার পরিণতি ঘটে অসুস্থতা ও অক্ষমতায়। এই সব দূষিত পদার্থের মধ্যে ক্যান্সার উৎপাদক কোন কিছু থাকলে তার সঙ্গে দীর্ঘ সান্নিধ্যের ফলে ক্যান্সার সৃষ্টি হতে পারে।

(গ) বিকিরণ—সূর্যরশ্মির অতিবেগুনী রশ্মি ক্যান্সার উৎপত্তির অপর এক কারণ। যে সব লোক প্রখর সূর্যরশ্মি থেকে নিজেদের বাঁচিয়ে চলে, তাদের চেয়ে খোলা জায়গায় কর্মরত নাবিক

ও কৃষকদের মধ্যে ত্বকের ক্যান্সারের প্রাদুর্ভাব সবচেয়ে বেশী।

১৯১০ সালে ত্বকে রেডিয়াম প্রয়োগ করে জনৈক ফরাসী গবেষক কতকগুলি ইঁদুরের ত্বকে ক্যান্সারের সৃষ্টি করেছিলেন। আয়ননকারী-বিকিরণ (Ionising radiation) মানুষ ও জীবদেহে কয়েক ধরণের ক্যান্সারের সৃষ্টি করে। অতিমাত্রায় বিকিরণের সম্মুখীন হবার ফলে রেডিওলজিষ্ট ও অন্যান্যের মধ্যে লিউকেমিয়া শ্রেণীর ক্যান্সারে আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা বেশী থাকে।

(ঘ) ক্যান্সার সৃষ্টিকারী ভাইরাস—১৯৩০ সালের কাছাকাছি দুটি গুরুত্বপূর্ণ ক্যান্সার-ভাইরাস আবিষ্কৃত হয়েছিল। প্রথমে বৈজ্ঞানিকেরা বুনো খরগোসের অর্বুদ (Papilloma) বা তিল (Wart) থেকে নেওয়া কোষমুক্ত ফিলট্রেট গৃহপালিত খরগোসের দেহে প্রবেশ করিয়ে দিতে সক্ষম হন। অধিকন্তু, গৃহপালিত খরগোসে এই সমস্ত তিল আর মৃদু স্বভাবাপন্ন থাকে না, হয়ে ওঠে উগ্রভাবাপন্ন। মুরগীর ছানার Rous sarcoma পরীক্ষা করে দেখা গেছে, ভাইরাস বলে অনুমিত পরিস্রাবণোপযোগী বস্তুটি ঐ অর্বুদ থেকে কদাচিৎ পাওয়া যায়।

আজ বিভিন্ন প্রজাতির জীবজন্তুর মধ্যে অন্ততঃ বারো রকমের ভাইরাস-উদ্ভূত ক্যান্সার দেখা গেছে। এই সব ভাইরাসের গঠন ও রাসায়নিক সংযুতি সম্পর্কে অনেক কিছুই জানা সম্ভব হয়েছে। কোষগুলিতে ভাইরাস আক্রমণের সময় কি অবস্থা ঘটে, জীবকোষের গঠনপ্রণালী বিষয়ক গবেষণার ফলে তার রহস্যোদ্ঘাটন সুরু হয়েছে। উৎকট লিউকেমিয়া, মলদ্বারের পলিপ এবং পাকস্থলীর ক্যান্সারে আক্রান্ত রোগীদের তন্তুজাত রক্তে ইলেকট্রন-অণুবীক্ষণের সাহায্যে আস্ত ক্যান্সার-ভাইরাসের মত কণিকা দেখা গেছে। কিন্তু এরকমের নিদর্শন খুবই কম। শুধুমাত্র ভাইরাসের উপস্থিতিতেই প্রমাণিত হয় না যে, সেগুলি রোগোৎপত্তির কারণ। এই রকমের কণিকাগুলি ক্যান্সার-প্রক্রিয়ার সঙ্গে সম্পর্কহীন ভেজালও হয়ে থাকতে পারে।

ভাইরাস কর্তৃক মানবদেহে কোন কোন রকমের ক্যান্সার উৎপত্তির ঘটনার দেখা মিলতে পারে এবং এই রকমের আবিষ্কার রক্ষাকবচরূপে ভ্যাক্সিন (Vaccine) প্রস্তুতে সহায়ক হবে। যাহোক, এমন কোন বিজ্ঞানসম্মত প্রমাণ নেই, যা থেকে ধরে নেওয়া যায় যে, মানবদেহের ক্যান্সার ছোঁয়াচে এবং ক্যান্সার রোগীর সংস্পর্শে এলে অপরেরও ক্যান্সার হবে।

(ঙ) হর্মোন (Hormone)—ক্যান্সার গবেষণায় আগ্রহের প্রাথমিক ক্ষেত্র ছিল ক্যান্সারের অগ্রগতির সঙ্গে হর্মোনসমূহের সম্পর্ক। ১৯১৮ সালে দেখানো হলো যে, স্ত্রী ইঁদুরের ডিম্বাশয় (Ovary) অপসারণের ফলে স্তনের ক্যান্সার রোধ করা যায়। উপরন্তু পুরুষ ইঁদুরের জননেন্দ্রিয়গুলি অপসারিত করে ত্বকের নীচে ডিম্বাশয় স্থাপিত করে তাদের স্তনের ক্যান্সার ঘটাতে পারা গেছে। পরে দেখা গেছে যে, ইঁদুরের ভিতর স্তনের ক্যান্সার তিনটি কারণের উপর নির্ভর করে: জিনঘটিত প্রবণতা—Genetic susceptibility (এক রকম পারিবারিক দুর্বলতা), অস্বাভাবিক ষ্ট্যাটাস (Abnormal status) এবং দুগ্ধ-পরিচালিত ভাইরাসের সান্নিধ্য।

স্ত্রী-হর্মোন (Estrogen) দীর্ঘকাল অধিক মাত্রায় প্রযুক্ত হলে লিউকেমিয়া এবং অণ্ডকোষ, জরায়ু এবং কোন কোন ইঁদুরের পিটুইটারীতে (Pituitary) অর্বুদের সৃষ্টি করে। কিন্তু চিকিৎসার উদ্দেশ্যে মানবদেহের বিভিন্ন অবস্থায় ক্রমবর্ধিত মাত্রায় হর্মোন প্রয়োগে স্ত্রী অথবা পুরুষের মধ্যে বেশী মাত্রায় কোন বিশেষ ধরণের ক্যান্সারের সূচনা হয় বলে মনে হয় না। মানুষ এবং পরীক্ষাগারে রক্ষিত

প্রাণীদের মধ্যে পুরাতন অর্বুদ বিভিন্ন মাত্রায় হর্মোনের উপর নির্ভরশীল বলে দেখা গেছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, বেশ পরিণত স্তন-ক্যান্সার-যুক্ত কয়েকটি নারীর ডিম্বাশয় (Ovary) অপসারণ করে অথবা যে সব পুরুষের প্রোস্টেটিক ক্যান্সার (Prostatic cancer) আছে, তাদের অণ্ডকোষ অপসারণ করে দেখা যায়, প্রায়ই অর্বুদগুলি সাময়িকভাবে কমে আসে।

(চ) পুষ্টি—পুষ্টি ক্যান্সারের অগ্রগতিতে অংশ গ্রহণ করে থাকে। শিকাগোর জনৈক গবেষক দেখিয়েছেন যে, ইঁদুরের খাদ্যের এক তৃতীয়াংশ বাতিল করে (যে পর্যায়ে এরা তেমন স্থূলকায় না হলেও বেশ স্বাস্থ্যবান থাকে) স্তনের ক্যান্সার শতকরা ৫০ ভাগ কমিয়ে ফেলা সম্ভব হয়েছিল। যাহোক, বিভিন্ন রকম খাদ্যাবস্থায় এমন কি, উপবাসেও ক্যান্সার অগ্রগতি প্রাপ্ত হয়।

ভিটামিন, খনিজ পদার্থ এবং লবণসমূহের দ্বারা প্রাণীদেহের কয়েকটি বিশেষ রকমের ক্যান্সারের বৃদ্ধি এবং পরিবর্তন সাধিত হতে পারে। কিন্তু ইঁদুরের দেহে অন্য কয়েক প্রকারের পরীক্ষামূলক অর্বুদের বিরুদ্ধে ভিটামিন যে রক্ষাকবচের কাজ করে, সেটা প্রদর্শিত হয় নি।

কতকগুলি ক্ষেত্রে ভিটামিন, খনিজদ্রব্য ও লবণসমূহ ব্যবহারে সুফল পাওয়া গেছে, কিন্তু সর্বজাতীয় রোগে এগুলি যে রক্ষাকবচরূপে ব্যবহার করা যেতে পারে, তার কোন প্রমাণ নেই।

কোষ বিষয়ক গবেষণা

উচ্চতর পর্যায়ের প্রাণী, যারা যৌনসংযোগের দ্বারা বংশবৃদ্ধি করে, পুরুষ ও স্ত্রী প্রজনন কোষের মিলনে তার সূত্রপাত হয়। মানুষের ক্ষেত্রে এই মিলনের ফলে এক পূর্ণাঙ্গ অবয়বের সৃষ্টি হয়, যাতে থাকে কোটি কোটি কোষ। প্রত্যেকটি কোষ, সেই ব্যক্তিবিশেষের স্বকীয়তা বজায় রেখে চললেও সেগুলি মস্তিষ্ক, যকৃৎ এবং ত্বক-উৎপাদনকারী তন্তুসমূহের মত পৃথক হতে পারে।

আঘাতের ফলে কিছু কোষ বিনষ্ট হলে উদ্বৃত্ত কোষগুলি সংযোজনের জন্যে বিভাজিত হয়ে সেই ক্ষতি পূরণ করে। যদি ক্ষতির পরিমাণ খুব বেশী হয় অথবা এমন সব কোষ উদ্বৃত্ত থাকে, যেগুলি বিভাজনে অক্ষম, তাহলে বিশেষ ধরণের সংযোগ রক্ষাকারী তন্তু-কোষগুলি তাদের মেরামতের কাজ সম্পন্ন করে। একটি নিষিক্ত ডিম থেকে উদ্ভূত জীবের ক্রমবিকাশ এবং ক্ষত নিরাময়ের প্রক্রিয়া—এই উভয় ক্ষেত্রেই অদ্ভুত ব্যাপার হচ্ছে এই যে, কোষগুলি "জানে"—কখন তাদের বিভাজন-ক্রিয়া থামিয়ে ফেলতে হবে। এই নিয়মানুগ প্রকৃতির বৃদ্ধির ব্যাপারেই স্বাভাবিক কোষ ও ক্যান্সার কোষের পার্থক্য বোঝা যায়।

দীর্ঘ সময়ের প্রাথমিক অনুশীলনের ফলে জীবন্ত কোষের গঠন, সংশ্লেষণ (Synthesis) ও ক্রিয়া সম্বন্ধে যথেষ্ট তথ্য সংগৃহীত হয়েছে। এরূপ কিছু অনুশীলনলব্ধ জ্ঞানের সাহায্যে জানা গেছে যে, কোষের কৃষ্ণবর্ণে রঞ্জিত নিরেট নিউক্লিয়াসের চতুর্দিক ঘিরে রয়েছে বহু কণিকা সমন্বিত তরল সাইটোপ্লাজম (Cytoplasm)। এই ক্ষুদ্র কণিকাগুলিকে বলা হয়, রাইবোসোম (Ribosome)। সম্পূর্ণ সাইটোপ্লাজম ঝিল্লিবদ্ধ

কোষের সূক্ষ্ম পর্দা দিয়ে ঘেরা। নিউক্লিয়াসে রয়েছে ক্রোমোসোম (Chromosome), ডিঅক্সিরাইবো নিউক্লিক অ্যাসিডের (Deoxyribonucleic acid) শক্তভাবে জড়ানো দুই স্তর অণুর সূত্র—সংক্ষেপে যাদের ডি. এন. এ. বলা হয়।

কোষসমূহের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার পরিচালক হিসেবে ক্রোমোসোমের ডি. এন. এ. অপর অ্যামিনো অ্যাসিড সমাবেশ করে' এনজাইমের মত ক্রিয়াশীল প্রোটিনে পরিণত করে।

ক্যান্সার প্রতিষেধক

এপর্যন্ত ক্যান্সারের প্রাথমিক বা পূর্ববর্তী অবস্থার অনুসন্ধানই প্রধান কাজ ছিল। কিন্তু পেশাগত আপৎ, অভ্যাসাদি, খাদ্য এবং বহুবিধ
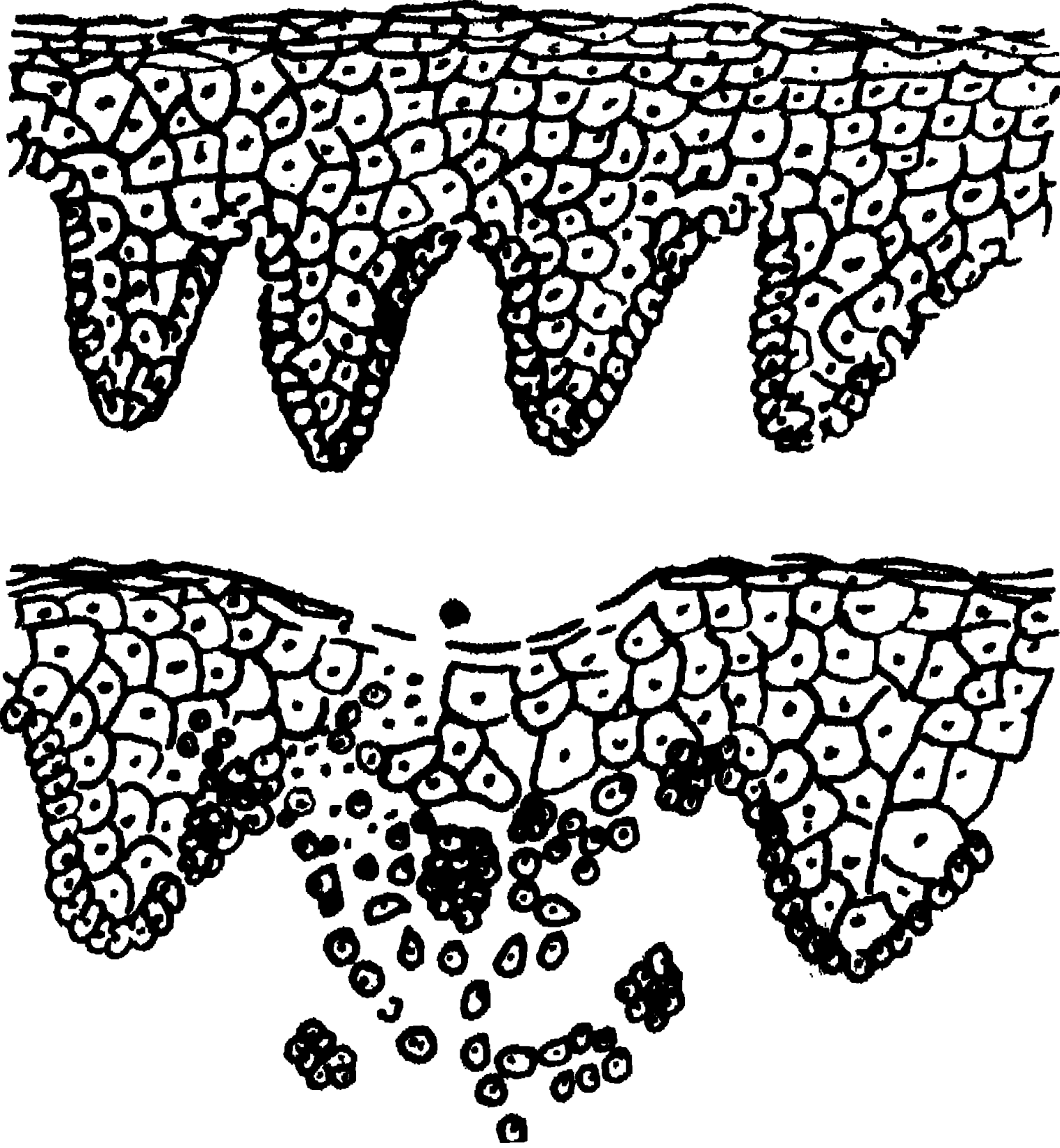
উপরের ছবি: সাধারণ তন্তু নিয়মানুবর্তী—কোথাও বিভাজন-প্রথার গোলমাল দেখা যায় না
নীচের ছবি: ক্যান্সার তন্তু—এলোমেলোভাবে তন্তুর বিভাজন দেখা যাচ্ছে।
(Dr. J. C. Paymaster-এর পুস্তিকা থেকে ছবিটি গৃহীত)

দুটি মূল রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহার করে: এগুলি আর. এন. এ—নিউক্লিক অ্যাসিড ও প্রোটিনের এক সূত্র বিশিষ্ট ভিন্ন প্রকৃতির অণু। নিউক্লিয়াসে ডি. এন. এ-র প্রতিচ্ছবির মত আর. এন. এ. অণুগুলির মধ্যে গঠিত হয়। এগুলি তারপর সাইটোপ্লাজমে প্রবেশ করে এবং অন্যান্য আর. এন. এ. অণুর সহায়তায় কোষ গঠনোপযোগী

পারিপার্শ্বিক ব্যাপার—যার ফলে বিশেষ কোন সম্প্রদায়ের মধ্যে ক্যান্সারের প্রাদুর্ভাব বৃদ্ধি পায়, তৎসংক্রান্ত নতুন জ্ঞান ক্যান্সার নিয়ন্ত্রণে আশাপূর্ণ যুগের উন্মেষ করেছে। অনেক ক্ষেত্রেই এই সব কারণগুলি কিরূপভাবে অংশগ্রহণ করে, মহামারী বিষয়ক অনুশীলনের ফলে তা জানা যাচ্ছে। ভারত, সিংহল, ব্রহ্মদেশ এবং পাকিস্থানের যে সব এলাকায় পান ও তামাক

চিবানোর অভ্যাসের মাত্রাধিক্য রয়েছে, সেখানেই মুখবিবর ও কণ্ঠনালীতে ক্যান্সারের প্রাদুর্ভাব ঘটে। সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত মধ্য এশিয়ার গণতন্ত্রে নাস (Nass) চিবানোর অভ্যাস প্রবল, নাস রক্ষণস্থলে প্রায়ই ক্যান্সার উৎপন্ন হয়ে থাকে। অন্ধ্রের "চুট্ট ক্যান্সার", কাশ্মীরের "কাংগরি ক্যান্সার" এবং মহারাষ্ট্রের "ধুতি ক্যান্সারে"র জন্যে সম্ভবতঃ ব্যক্তিগত অভ্যাসই দায়ী

ইদানীং খাদ্যে ক্যান্সার-সঞ্চারকারী উপাদানের উপর দৃষ্টি রাখবার আগ্রহ দেখা যাচ্ছে। খাদ্য ও ক্যান্সারের সম্পর্ক জানা যাচ্ছে ; যেমন— যে সব এলাকায় খাদ্যে আয়োডিনের মাত্রা কম, সেখানে থাইরয়েড ক্যান্সারের আধিক্য দেখা যায়, পরিণতি হয় গলগণ্ডে (Nodular goitre) অতিরিক্ত মাত্রায় লঙ্কা খেলে নাকি মুখগহ্বরে এক প্রাক-ক্যান্সার অবস্থার সৃষ্টি হয় (Submucous fibrosis)। ইদানীং দেখানো হয়েছে যে, Cycad nut-এর খাদ্যের দরুণ ইঁদুরের যকৃতে অর্বুদ গড়ে ওঠে। গুয়াম এবং অন্যান্য অঞ্চলে এই জাতীয় বাদাম প্রধান খাদ্য। খাদ্য সামগ্রীর উপরে আপনা থেকে গড়ে ওঠা ছত্রাক ও জীবাণু পারিপার্শ্বিক কার্সিনোজেনের অন্যতম উৎস হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, সাম্প্রতিক গবেষণার প্রকাশ যে, ভিজা শস্য ও বাদামের উপর জাত সাধারণ ছত্রাক Aflatoxin নামে এক প্রকার যৌগিক পদার্থের সৃষ্টি করে। হাঁস, মুরগী—বিশেষ করে তাদের বাচ্চা বা টার্কির ছানার যকৃতের পক্ষে এই যৌগিক পদার্থটি অতিমাত্রায় ক্ষতিকর। ইঁদুরকে খাওয়ালে এই পদার্থটি তাদের যকৃতে ক্যান্সার উৎপন্ন করে। অবশ্য কোন্‌টা ক্যান্সার উৎপাদন করবে বা কোন্‌টা করবে না, তা স্থিরীকৃত হয় প্রাণীদেহে পরীক্ষার ভিত্তিতে। লেবরেটরীতে প্রাণীদের উপর পরীক্ষালব্ধ জ্ঞানকে বিজ্ঞানীরা মানুষের উপর প্রয়োগের ক্ষেত্রে কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হন।

ক্যানাডার ক্যান্সার সমিতির তথ্যানুযায়ী দেখা যায়, ৭০% ক্ষেত্রে ক্যান্সার প্রতিরোধ করা সম্ভব। ক্যান্সারের প্রকৃত কারণ জানা না থাকলে প্রাথমিক লক্ষণ সম্বন্ধে অনুসন্ধানই হলো সর্বোৎকৃষ্ট নিয়ন্ত্রণ পন্থা। প্রতিরোধ তিন উপায়ে কার্যকরী করা যায়—(১) নয়টি সতর্কতা-মূলক লক্ষণের যে কোন একটির আবির্ভাবের উপর সর্বদা নজর রাখা ; (২) স্ক্রিনিং টেষ্ট—যেমন জরায়ুর মুখ থেকে সংগৃহীত পদার্থ, যা স্ত্রীলোকের জরায়ু-মুখের ক্যান্সারের লক্ষণ প্রকাশ পাবার আগেই ধরে দিতে পারে। তাছাড়া, (৩) ক্যান্সার উৎপত্তির সম্ভাবনা বাড়িয়ে তুলতে পারে, এমন সব পারিপার্শ্বিক বিকিরণ, খনিজ দ্রব্যের গুঁড়া, কতিপয় পেশাগত আপদ ও সিগারেটের ধূমপান পরিহার করা।

ক্যান্সার চিকিৎসা

প্রাচীন কালে ক্যান্সার আক্রান্ত অংশগুলিকে উত্তপ্ত লৌহশলাকার দ্বারা বা গরম তেল ঢেলে পুড়িয়ে দেওয়া হতো। ঊনবিংশ শতক পর্যন্ত সাধারণভাবে এই ধারণা প্রচলিত ছিল যে, ক্যান্সার কখনও সারে না। ষাট বছর আগেও কোন ক্যান্সার রোগীর প্রাণ বাঁচাবার সম্ভাবনা ছিল সুদূরপরাহত। বিগত ২৫ বছরে প্রতি চার জনের মধ্যে ১ জন রোগীকে বাঁচানো সম্ভব হচ্ছে। এমন কি, ভারতে আধুনিক চিকিৎসার বিশেষ অভাব থাকা সত্ত্বেও প্রতি ৩ জন রোগীর মধ্যে এক জনকে বাঁচিয়ে তোলা সম্ভব হচ্ছে। বিশেষজ্ঞদের অনেকের বিশ্বাস, যদি সব রকমের ক্যান্সার পূর্বাহ্নে ধরা পড়ে, তবে প্রতি ২জন রোগীর মধ্যে এক-জনকে বাঁচিয়ে তুলে এই হারের উন্নতিসাধন করা সম্ভব হবে।

ক্যান্সারের সাফল্যজনক চিকিৎসায় দুটি প্রধান পদ্ধতি রয়েছে—অস্ত্রোপচার (Surgery)

ও বিকিরণ (Radiation)। অস্ত্রোপচারে শল্য-চিকিৎসকের ছুরি দিয়ে ক্যান্সার আক্রান্ত ও সম্ভাব্য আক্রমণের স্থলগুলিকে কেটে বের করে দেওয়া। প্রায় ১৮০০ বছর আগে মিশরীয় চিকিৎসক লিউনিডেস নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, ক্যান্সারাত্মক সমস্ত অংশকে একেবারে সমূলে উচ্ছেদ করে দিতে হবে। সেই বহু পুরাতন প্রথা শল্যচিকিৎসায় আজও অনুসরণ করা হচ্ছে। আধুনিক শল্যবিজ্ঞানের পদ্ধতিসমূহের মধ্যে Anaesthesiology, Prosthesis, Blood-transfusion এবং Antibiotics প্রভৃতি অন্তর্ভুক্ত হওয়ার ফলে যথেষ্ট অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। ফুসফুস, মস্তক ও গলদেশের ক্যান্সারের অস্ত্রোপচারে অনেক উন্নতি সাধিত হয়েছে। হৃৎপিণ্ড-ফুসফুস পাম্প, কৃত্রিম কিড্‌নি, অস্থি-সংস্থাপন প্রভৃতি নতুন পদ্ধতি অদূর ভবিষ্যতে ভারতেও শল্যচিকিৎসায় অগ্রগতি এনে দেবে। আভ্যন্তরীণ ক্যান্সারাক্রান্ত কয়েক শত রোগীকে আজকাল প্রতি বছরে বাঁচিয়ে তোলা সম্ভব হচ্ছে, কয়েক বছর পূর্বেও যেখানে কোন আশাই দেওয়া যেতো না।

এক্স রশ্মি, রেডিয়াম ও অন্যান্য তেজস্ক্রিয় পদার্থ, যথা—কোবাল্ট, সিজিয়াম প্রভৃতি থেকে উদ্ভূত রশ্মির সাহায্যে ক্যান্সারাত্মক কোষসমূহের বিনাশসাধনই বিকিরণ চিকিৎসা। পৃথিবীর সর্বত্র আধুনিক বিকিরণ-যন্ত্রপাতি কর্মরত থেকে শরীরের কয়েকটি অংশের ক্যান্সার দূরীকরণে যথেষ্ট সহায়তা করছে।

অতি আধুনিক কাল থেকে ঔষধ ও হর্মোনের সাহায্যে ক্যান্সার চিকিৎসার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করা যাচ্ছে। যে সব রোগীর দেহের দূরবর্তী অংশে ক্যান্সার বিস্তার লাভ করেছে অথবা যারা লিউকেমিয়া জাতীয় সাধারণ আকারের ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়েছে, তাদের ক্ষেত্রে অস্ত্রোপচার বা বিকিরণ চিকিৎসা সম্পূর্ণরূপে সাফল্য লাভ করে না। সমস্যার সমাধান হলো, রাসায়নিক যৌগিক পদার্থের প্রয়োগ—বিশেষ বিশেষ ক্যান্সার কোষগুলিকে ধ্বংস করে অথবা দেহে এমন শক্তির সঞ্চার করে, যাতে এই রকমের কোষগুলি আর ক্ষতিকারক থাকে না। যদিও এই পদ্ধতিতে আশানুরূপ ফল পাওয়া যায় নি, তবুও ২০ বছরের অপেক্ষাকৃত নতুন এই পদ্ধতি অনেক রোগীর আয়ু বৃদ্ধি করেছে এবং যথেষ্ট পরিমাণে যাতনার উপশম ও ক্যান্সার-অর্বুদের বৃদ্ধিজনিত অস্বস্তির লাঘব করেছে।

ক্যান্সারের চিকিৎসায় নবযুগের প্রবর্তন—অ্যান্টিক্যান্সার ঔষধাদির সন্ধান

ঔষধের সাহায্যে ক্যান্সারের চিকিৎসায় দুটি আবিষ্কার অভিনব আগ্রহের সৃষ্টি করেছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ঘটনাচক্রে দেখা গেল, Sulfur mustard নামে একটা শক্তিশালী বিষাক্ত গ্যাস লিম্ফ্যাটিক সিষ্টেম ও হাড়ের মজ্জার ক্ষতিসাধন করেছে। ভেষজ-বিজ্ঞানীরা সাবধানে লিম্ফ্যাটিক সিষ্টেমের ক্যান্সারে আক্রান্ত রোগীদের Nitrogen mustard নামে অনুরূপ একটি পদার্থ প্রয়োগ করতে লাগলেন। লিউকেমিয়া, লিম্ফোসারকোমা (Leukemia, Lymphosarcoma) এবং হজ্‌কিন্‌স্ ডিজিজে (Hodgkin's disease) অনেক রোগীর মধ্যই আশ্চর্যজনকভাবে সাময়িক উপশম দেখা দিল। Antimetabolites শ্রেণীর ক্রিয়াবিহীন রাসায়নিক দ্রব্যের সাহায্যে কোষসমূহের প্রক্রিয়ায় বাধা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে অনুসন্ধানের ফলে অপর আবিষ্ক্রিয়াটি সম্ভব হয়েছিল। এই ধরণের প্রথম যৌগিক পদার্থগুলি, যাদের নাম Antifolic acids তীব্র লিউকেমিকায় আক্রান্ত শিশুদের পক্ষে উপকারী বলে দেখা গেল। মনে হয়, ক্রিয়াবিহীন ফোলিক অ্যাসিডের গোষ্ঠীবর্গ স্বাভাবিক কোষ অপেক্ষা লিউকেমিয়ায় আক্রান্ত কোষগুলির উপর অধিক মাত্রায় প্রভাব বিস্তার করে।

ক্যান্সার প্রতিষেধক অভিনব ও অমোঘ শক্তি-শালী ঔষধসমূহ উদ্ভাবনে এই সকল প্রচেষ্টা এই ভাবে প্রেরণা জুগিয়েছে। ১৯৫৫ সালের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় ক্যান্সার সংস্থার পৃষ্ঠপোষকতায় সরকার সমর্থিত রাসায়নিক দ্রব্যাদি সহযোগে ক্যান্সার বিতাড়ন ও চিকিৎসার একটি জাতীয় কর্মসূচীর বন্দোবস্ত করা হয়। বৃটিশ কর্মীরা একই সময়ে এই ক্ষেত্রে প্রবেশ করেন এবং বর্তমানে জার্মেনি, সোভিয়েট ইউনিয়ন, ফ্রান্স ও জাপান সহ বহু দেশে রাসায়নিক ঔষধাদির দ্বারা ক্যান্সারের চিকিৎসা ও গবেষণার বহু প্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে।

রাসায়নিক দ্রব্যের সাহায্যে ক্যান্সার নিবারণের গবেষণায় বিশেষভাবে শিক্ষাপ্রাপ্ত বিজ্ঞানীদের দ্বারা পরিচালিত জটিল পরীক্ষা জড়িত রয়েছে। এগুলিকে চারটি প্রধান ধাপে বিভক্ত করা যায়—(১) পরীক্ষণোপযোগী রাসায়নিক ও অন্যান্য দ্রব্যাদি নির্বাচন, (২) জীবদেহের অর্বুদে ঐ সব জিনিষ দিয়ে পরীক্ষা চালানো, (৩) ঔষধের মাত্রা নির্ধারণ, কোন দুর্লক্ষণের প্রকাশ নিরীক্ষণ এবং (৪) ঔষধগুলির রোগ-নিবারণাত্মক মূল্য নির্ধারণ। এই রকমের জিনিষ শুধু রাসায়নিক দ্রব্যের ভিতরই সীমাবদ্ধ নয়। কারণ কয়েকটি অ্যান্টিবায়োটিক্সও কিছুটা ক্যান্সার-বিরোধী হতে দেখা গেছে। Vinca rosea, Podophyllum emodi প্রভৃতি কয়েকটি উদ্ভিজ্জাত দ্রব্যে ক্যান্সার-বিরোধী গুণ আরোপিত হয়। ভারত, চীন, দক্ষিণ আমেরিকা, মিশর, গ্রীস প্রভৃতি প্রাচীন সভ্যতার দেশগুলির লৌকিক কাহিনীতে ক্যান্সার প্রতিরোধক তথাকথিত অনেকগুলি প্রখ্যাত ভেষজের উল্লেখ রয়েছে।

নিম্নোক্ত চার শ্রেণীর রাসায়নিক পদার্থ ক্যান্সারের চিকিৎসার উপযোগী :

(১) অ্যান্টিমেটাবোলাইট—অর্বুদের কোষগুলির বৈশিষ্ট্য হলো কোষ বিভাজনের (Mitosis) তৎপরতা এবং রাসায়নিক দ্রব্য প্রয়োগের উদ্দেশ্য হলো এই রকমের বৃদ্ধি রোধ করা। এই কাজের এক রকম উপায় হলো, মধ্যবর্তী মেটাবলিজমের পরিবর্তন সাধন করা, যা কোষগুলির বৃদ্ধি ও বিভাজনের জন্যে দায়ী। প্রাণরসায়নের দৌলতে বিভাজন সম্পর্কিত কিছু কিছু জ্ঞান আহরণ করা সম্ভব হচ্ছে। অধিকাংশ অ্যান্টিমেটাবোলাইটের প্রধান লক্ষ্য হলো ডি.এন.এ. (ডিঅক্সিরাইবোনিউক্লিক অ্যাসিড)। অনেক অ্যান্টিমেটাবোলাইটের ক্ষেত্রে ডি. এন. এ. ও আর. এন. এ. (রাইবোনিউক্লিক অ্যাসিড) উভয়েরই পরিবর্তন সাধিত হতে পারে।

(২) অ্যালকাইলেটিং দ্রব্যাদি (Alkylating Agents) : এক্স রশ্মির বিকিরণের মতই লিউকেমিয়া বিরোধী নাইট্রোজেন মাস্টার্ড দ্রুত সংখ্যাবৃদ্ধিকারী কোষের পক্ষে ক্ষতিকারক। অন্যান্যের মধ্যে প্রখ্যাত বৃটিশ অর্বুদ-বিশেষজ্ঞ হ্যাডো (Haddow) দেখিয়েছেন যে, অ্যালকাইলেটিং দ্রব্যাদি অনেকাংশে এক্স রশ্মির অনুরূপ ক্রিয়া করে থাকে। ললি ও ওয়ালিক বলেছেন—গুয়ানাইলিক অ্যাসিডের এক বিশেষ বিন্দুতে অ্যালকাইলেশন ঘটে এবং প্রতিক্রিয়া-জনিত পদার্থগুলিও তাঁরা সনাক্ত করেছেন। হেম্ গুয়ানাইলিক অ্যাসিডের গঠনতন্ত্রীর উপর এক্স-বিকিরণের ফলে অনুরূপ দ্রব্যাদির যে বর্ণনা দিয়েছেন, হ্যাডো তাঁর (হেম্-এর) নিজস্ব পরীক্ষালব্ধ ফলের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

(৩) অ্যাক্টিনোমাইসিন (Actinomycins): এই জাতীয় ঔষধগুলি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বিকাশ লাভ করেছে। অ্যাক্টিনোমাইসিন-ডি (যার প্রাথমিক পরীক্ষা বিস্তৃতভাবে করা হয়েছে) নিরেট অর্বুদে কিছুটা সাড়া দেয়, পক্ষান্তরে অ্যাক্টিনোমাইসিন-সি লিম্ফোমার (Lymphomas) বিরুদ্ধে কাজ করে। এদের ক্রিয়া-পদ্ধতি

পরিষ্কারভাবে জানা যায় নি, তবে মনে হয় প্যান্টোথেনিক অ্যাসিডের (Pantothenic acid) বিরুদ্ধাচরণ করে। লিউকেমিয়া এবং লিম্ফোমা পর্যায়ের ব্যাধির বিরুদ্ধে এদের কার্যকারিতা সম্বন্ধে আরো গবেষণা না চলা পর্যন্ত কিছু বলা যায় না।

(৪) উদ্ভিজ্জ পদার্থ: ক্যান্সার নিরোধক ভেষজের জন্যে আমেরিকান ন্যাশন্যাল ক্যান্সার ইনস্টিটিউটে এপর্যন্ত প্রায় ১৫০০০ উদ্ভিজ্জ পদার্থ বা উদ্ভিদনির্যাস পরীক্ষা করা হয়েছে। এর মধ্যে অন্ততঃ ৪৫টি ভেষজের মধ্যে ক্যান্সারের নাশক ক্ষমতা দেখা গেছে। পডোফাইলাম, কলচিকাম, পেরিউইঙ্কল প্রভৃতি ভেষজগুলি বিভিন্ন ক্যান্সারের বিরুদ্ধে কার্যকরী। ভেলবান (Velban)নামক পদার্থটি কোন কোন ক্যান্সার নিরাময়ে বিশেষভাবে সহায়তা করে

(৫) অ্যাড্রিন্যাল স্টেরয়েড (Adrenal steroids): Neoplasia শ্রেণীর ব্যাধিতে প্রভাববিস্তারকারী দ্রব্যসমূহের মধ্যে প্রথম হলো স্টেরয়েড হর্মোন। এই জাতীয় ঔষধের স্বীকৃতি ব্যতিরেকে ক্যান্সার চিকিৎসার বর্ণনা অসমাপ্ত থেকে যাবে। গুরুতর লিম্ফেটিক লিউকেমিয়া শ্রেণীর ব্যাধিতে একক অথবা যুক্তভাবে স্টেরয়েডগুলি এখনও কার্যক্ষম বলে পরিগণিত হয়। এই পদার্থটি শিশু রোগী সমেত Lymphosarcoma রোগে আক্রান্ত অন্যান্য রোগীদের এবং যে সব রোগী Reticulum cell sarcoma রোগে ভুগছে, তাদের পক্ষে হিতকর।

ক্যান্সার নিবারণে রাসায়নিক ঔষধাদির ভবিষ্যৎ

কয়েক শ্রেণীর ক্যান্সার, যেমন—Myelomatosis, Lymphatic leukaemia প্রভৃতিতে এই পদ্ধতিতে রোগীর আয়ু পাঁচ বছর বা আরও বেশী হতে পারে। অন্যান্য ক্যান্সারে, যথা—Leukemia, Polycythemia rubra vera, Multiple myeloma এবং Chorionepithelioma-তে ঔষধই একমাত্র চিকিৎসার উপায়। লিম্ফোমা, হজ্‌কিন্‌স্‌ ডিজিজ, রেটিনোব্লাষ্টোমা প্রভৃতি কয়েক শ্রেণীর ক্যান্সারে এই ঔষধগুলি অন্যান্য চিকিৎসার সঙ্গে সঙ্গে ক্যান্সারের অগ্রগতির সময় যখন অন্য কোন চিকিৎসা-পদ্ধতি প্রয়োগ করা যায় না অথবা যে সব ক্ষেত্রে অন্য চিকিৎসা-পদ্ধতি চালিয়ে সুফল পাওয়া যায় নি, তখন ঔষধই ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।

সুফল লাভের আশায় ক্যান্সার-বিরোধী বিভিন্ন ঔষধ সচরাচর যুক্তভাবে প্রয়োগ করবার চেষ্টা হচ্ছে—সম্প্রতি Freireich আমেরিকায় কঠিন লিউকেমিয়া রোগীকে যে ঔষধ দিচ্ছেন, তা হলো Vincristine, Aminopterin, 6-Mercaptopurine ও Prednisone—এই চারটি ঔষধের সমন্বয়কে সংক্ষেপে VAMP বলা হয়েছে। উক্ত ঔষধ কয়টি পৃথক পৃথকভাবে দেবার চেয়ে এইভাবে এক সঙ্গে দিলে অধিকতর কার্যকরী হয়। আমেরিকার Cancer Chemotherapy National Service Centre-এর Leukemia Chemotherapy Co-operative Study Group সম্প্রতি ৬০ জন রোগীকে ত্রিধা চিকিৎসার বিবরণ দিয়েছেন—তাদের Chlorambucil এবং Methotrexate খাওয়াবার সঙ্গে সঙ্গে Actinomycin-D শিরায় ইনজেকসন দেওয়া হয়েছিল। কয়েকটি ক্ষেত্রে রোগী ২২ মাসের বেশী সময়ের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে সেরে উঠে। কঠিন Granulocytic Leukemia-6-Mercaptopurine ও Methylgyoxal bis (Guanylhydrazone) যুক্তভাবে প্রয়োগ করে খুব ভাল ফল পাওয়া গেছে এবং অপর কয়েকটি ক্ষেত্রে আংশিক সুফলও দেখা গিয়েছিল।

আবার অন্য রকম যুক্তভাবেও চিকিৎসা চলছে—চিকিৎসার সঙ্গে বিকিরণ, সঙ্গে শল্য-চিকিৎসা অথবা রাসায়নিক চিকিৎসার সঙ্গে বিকিরণ চিকিৎসা। এথেকে পরিষ্কার দেখা যায় যে, একক চিকিৎসার চেয়ে যুক্তভাবে চিকিৎসায় অধিক সংখ্যক রোগী সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য লাভ করে। আধুনিক কালে আরও কয়েকটি পদ্ধতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এদের নাম Intrapleural ও Intraperitoneal infusion, Regional perfusion এবং Intra-arterial infusion ইত্যাদি। এই পদ্ধতির দ্বারা ক্যান্সার দমনকারী ঔষধাদি যেখানে অর্বুদ বর্তমান, তারই নিকটে শিরার ভিতর ঔষধ প্রবেশ করানো। এই ভাবে সাধারণ শরীরের ক্ষতিসাধিত হয় না—অথচ অর্বুদের নাশ শীঘ্র সম্পন্ন করা যায়। বিশেষ দ্রষ্টব্যের বিষয় এই যে, ভাল রকমে অক্সিজেনযুক্ত হলে অথবা শরীরের স্বাভাবিক তাপমাত্রা অপেক্ষা বেশী তাপমাত্রায় ক্যান্সার তন্তু অধিকতর সংবেদনশীল। এই জন্যে এক চিকিৎসা পদ্ধতিতে ক্যান্সার তন্তুতে অতিমাত্রায় অক্সিজেন চালিয়ে দেখা হচ্ছে। অপর পক্ষে কৃত্রিম উপায়ে উচ্চ তাপ প্রয়োগ অথবা নিউট্রন রশ্মির সাহায্যে ক্যান্সার চিকিৎসার চেষ্টা চলছে। এছাড়া রাসায়নিক ও বিকিরণ-পদ্ধতির পরিপূরক হিসেবে এখন আল্ট্রাসোনিক (Ultrasonic) ও লেসারের (Laser) গবেষণাও চলেছে।

উপসংহার

ক্যান্সার গবেষণায় দ্বিমুখী অভিযান চালিত হয়—রোগ প্রতিরোধের চেষ্টা এবং তার ঔষধ নির্ধারণ করা। ক্যান্সার সূচনাকারী হিসেবে ভাইরাসের সম্ভাব্য ভূমিকার বিষয়ে যথেষ্ট গবেষণা চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে। অর্বুদের ভাইরাস, প্রাণীদের ভাইরাস ও সাধারণ ভাইরাসের কৃত্রিম সীমা এখন অতীতের অধ্যায়ে পরিণত হয়েছে। এই ভাইরাসগুলিই হয়তো মানুষের দেহকোষগুলিকে দূষিত করে অথবা কোষগুলিতে পরিবর্তন এনে দেয়। কেউ কেউ হয়তো ক্যান্সার ও ভাইরাসের মধ্যে সোজা সম্পর্কের শেষ ধাপ দেখাতে পারবে বলে মনে হয়। যদি শীঘ্রই মানুষের ক্যান্সারে ভাইরাসের প্রাধান্য দেখানো যায়, তাহলে গুরুতর লিউকেমিয়া শ্রেণীর ক্যান্সারে ঔষধ প্রয়োগে সাফল্য প্রথমে দেখা দিতে পারে। মানুষের ক্যান্সারের জন্যে দায়ী ভাইরাসগুলি চিহ্নিতকরণের সঙ্গে সঙ্গে ক্যান্সার প্রতিষেধক ভ্যাক্সিন (Vaccine) তৈরির পথ যে উন্মুক্ত হতে পারে, সেটা এখন আর স্বপ্ন নয়, বাস্তব সম্ভাবনার সমীপবর্তী।

ক্যান্সারের গবেষণা ঠিক বিজ্ঞানের আওতায় পড়ে না—মানব, ভেষজ, বৈজ্ঞানিক ও বস্তুতঃ বৌদ্ধিক সমস্যার নানা বিকাশ এর মধ্যে দেখা যায়। দেশের জনস্বাস্থ্যের জন্যে ব্যয়বরাদ্দের অর্থে ভেষজবিদ্যা, জীববিদ্যা, প্রাণরসায়ন এবং আনুষঙ্গিক বিজ্ঞানের অনুশীলন হওয়া প্রয়োজন; আর Chemical pathology, Pharmacology, Immunology, Virology, Cytogenetics, নিউক্লিক অ্যাসিডের কাঠামো এবং সেই সঙ্গে প্রোটিন ও হিস্টোন সংক্রান্ত গবেষণা পরিচালিত হওয়া উচিত। সম্ভবতঃ এতেই ক্যান্সার সমস্যার সমাধান হবে।

চিত্তরঞ্জন ন্যাশনাল ক্যান্সার রিসার্চ সেন্টার, কলিকাতা। 'Science and the Cancer Problem' প্রবন্ধ থেকে অনূদিত। (Medical Science and Service, July 1966, Vol. II, No. 1.)

আমার স্বপ্ন-দর্শন

শ্রীমৃত্যুঞ্জয়প্রসাদ গুহ

পদার্থ-বিজ্ঞানে অনার্স নিয়ে ভর্তি হয়েছি। আমাদের অধ্যাপক ডাঃ বোস রোজই পদার্থের অণু-পরমাণু সম্পর্কে নতুন নতুন তথ্য এবং তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করছেন, আর আমরা সব মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে শুনছি। অধ্যাপক এত সহজ করে সব কিছু বুঝিয়ে দিচ্ছেন যে, ছাত্রদের মধ্যে প্রবল আগ্রহ সঞ্চারিত হয়েছে।

সেদিন কি একটা কাজে অফিসে একটু দেরী হয়ে গেল। ক্লাসে গিয়ে দেখি, সামনের দিকে একটুও জায়গা নেই। ভাল শুনতে পারবো না ভেবে মনটা খারাপ হয়ে গেল। কিন্তু কি করি, বাধ্য হয়ে একেবারে পিছনের বেঞ্চে গিয়ে কোন রকমে একপাশে একটু জায়গা করে নিয়ে বসলাম।

একটু পরেই অধ্যাপক ক্লাসে এসে পড়াতে সুরু করলেন। আমরা তন্ময় হয়ে শুনতে লাগলাম।

আমার হাতে একটা রূপার আংটি ছিল। অন্যমনস্ক হয়ে কখন যেন সেই আংটিটা খুলে নিয়ে তার দিকে তাকিয়ে আছি, সেই সঙ্গে অধ্যাপক অণু-পরমাণু সম্পর্কে যা বলছেন, তার মর্ম উপলব্ধি করবার চেষ্টা করছি।

হঠাৎ মনে হলো, এক মন্ত্রবলে আমার আশেপাশে সব কিছু যেন অসম্ভব রকম বড় হয়ে যাচ্ছে! দেখতে দেখতে আংটির তারটা মোটা হয়ে একটা বটগাছের গুঁড়ির মত হয়ে গেল। তারপর আরও বড় হয়ে একেবারে আমার দৃষ্টি আচ্ছন্ন করে ফেললো। উপরে, নীচে, আশেপাশে যেদিকে তাকাই, একটা সীমাহীন রূপার দেয়াল ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাই না।

বিস্ময়ের ঘোর কাটতে না কাটতেই বোঝলাম, আমার দেহটা অত্যন্ত হাল্‌কা হয়ে গেছে, আর আমি যেন শূন্যে ভেসে চলেছি। থেকে থেকে আমার গা ঘেঁষে যেন টেনিস বলের আকৃতির, কিন্তু কুয়াশার মত ধোঁয়াটে এক একটা গোলা ভীমবেগে ছুটে যাচ্ছে। প্রতি মুহূর্তেই মনে হচ্ছে, এই বুঝি একটা গোলার আঘাতে ধরাশায়ী হয়ে পড়লাম। কিন্তু জানি না, কি এক অদ্ভুত কায়দায় এদের আক্রমণ এড়িয়ে ভেসে বেড়াতে লাগলাম।

একটু এগিয়ে যেতেই মনে হলো, রূপার দেয়ালটা যেন কেমন সজীব হয়ে উঠেছে, একটু একটু নড়ছে! আরও কাছে গিয়ে দেখলাম, রূপার দেয়ালটা নিরবচ্ছিন্ন নয়। এর মাঝে অসংখ্য মার্বেলের গুলির মত জিনিষ যেন থরে থরে সাজানো রয়েছে, আর তাদের প্রত্যেকটি নিজের নিজের জায়গায় নিরন্তর কেঁপে চলেছে। শূন্যে যেসব গোলা ছুটাছুটি করছে, এগুলিও অনেকটা তাদেরই মত।

আমি অবাক হয়ে ভাবছিলাম, এসবের অর্থ কি?

কি ভাবছ?

চমকে পিছন ফিরে দেখি, প্রশ্নকর্তা একজন সুসজ্জিত এবং সুদর্শন বিদেশী ভদ্রলোক। বেশ লম্বা তাই একটু রোগা দেখাচ্ছে। গায়ের রং বেশ ফর্সা। বড় বড় টানা টানা চোখ দুটি থেকে যেন এক অদ্ভুত দ্যুতি বেরুচ্ছে। আরে এঁকে তো চেনা চেনা মনে হচ্ছে! আমার বইয়ে যেন এঁর ছবি দেখেছি!

আচ্ছা, আপনি কি ইটালীয় বিজ্ঞানী অ্যাভোগ্যাড্রো?

ঠিক বলেছ। তুমি যে সমস্যায় পড়েছ, তার সমাধান করতেই আমার আবির্ভাব। আমিই সর্বপ্রথম অণুর কল্পনা করি এবং অণু ও পরমাণুর মধ্যে সম্পর্ক স্থির করি। অবশ্য এর সবটা কৃতিত্ব আমার একার নয়। ইতিপূর্বে ইংরেজ বিজ্ঞানী ডাল্টন তাঁর পরমাণুবাদের সাহায্যে রাসায়নিক সংযোগ সূত্রসমূহের ব্যাখ্যা করতে সক্ষম হন। কিন্তু তাঁর পরমাণুবাদের সাহায্যে গ্যাস-আয়তন সূত্রের সঠিক ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব হয় নি। এই কৃতিত্ব সম্পূর্ণরূপে আমারই।

তুমি যে মার্বেলের মত জিনিষগুলি দেখছ, সেগুলি প্রকৃত পক্ষে রূপার এক-একটি অণু। এই অণুগুলি অনেক বেশী ঘন সন্নিবিষ্ট, অনেক বেশী স্থির, অনেক বেশী শান্ত। অপর দিকে শূন্যে টেনিস-বলের মত যে জিনিষগুলি ইতস্ততঃ ছুটে বেড়াচ্ছে, এদের কোনটি অক্সিজেনের অণু, আবার কোনটি নাইট্রোজেনের অণু। তুমি নিশ্চয়ই জান যে, বায়ু একটি মিশ্রিত পদার্থ এবং তার প্রধান দুটি উপাদান হলো অক্সিজেন এবং নাইট্রোজেন। গ্যাসের অণু অনেক বেশী চঞ্চল। এরা ইতস্ততঃ ছুটে বেড়ায়, পরস্পরের সঙ্গে ধাক্কা খায়, এবং তারই ফলে এদিক-ওদিক বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে।

আমি প্রশ্ন করলাম—আচ্ছা, উত্তাপ দিলে যে কঠিন পদার্থ গলে তরল হয় এবং আরও উত্তাপ দিলে গ্যাসে পরিণত হয়, এর কারণ কি?

বাঃ, বেশ চমৎকার প্রশ্ন করেছ। তবে এখন যা বলবো, তা আরও মনোযোগ দিয়ে শুনতে হবে, নতুবা ভাল লাগবে না।

ধর, কতকগুলি খেলার মার্বেল যদি একেবারে গায়ে গায়ে সাজিয়ে রাখা যায়, তাহলে দেখবে, তাদের মধ্যে খানিকটা ফাঁক থেকে যায়। যে কোন কঠিন পদার্থের মধ্যে অণুগুলি এভাবে পরস্পরের সঙ্গে সংলগ্ন অবস্থায় সুশৃঙ্খলভাবে সাজানো থাকে। এই অবস্থায় অণুগুলির পরস্পরের মধ্যে বেশ আকর্ষণ থাকে, এর নাম আন্তরাণবিক আকর্ষণী শক্তি (Intermolecular force of attraction)। আর অণুগুলির পরস্পরের মধ্যে যে ফাঁকটুকু থেকে যায়, তার নাম আন্তরাণবিক স্থান (Intermolecular space)। কঠিন পদার্থের ক্ষেত্রে এই ফাঁকের মাত্রা সবচেয়ে কম থাকে। তাপের প্রভাবে এই অণুগুলি কাঁপতে থাকে, কিন্তু নিজেদের মধ্যে আকর্ষণ প্রবল থাকায় এরা স্থানচ্যুত হয় না। সাধারণ অবস্থায় অণুগুলির এই শৃঙ্খলা নষ্ট হয় না। কাজেই তখন কঠিন পদার্থের আকৃতি বা আয়তনে খুব বেশী পরিবর্তন হয় না।

তরল পদার্থের অণুগুলির মধ্যে এই ফাঁকের মাত্রা অনেক বেড়ে যায়। তার ফলে তাদের পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ কমে যায়। তাই তখন অণুগুলি ইতস্ততঃ ছড়িয়ে পড়ে এবং ভেসে বেড়ায়, তাদের মধ্যে কোন শৃঙ্খলা থাকে না। এর অণুগুলি অনেক বেশী চঞ্চল, সর্বদা ইতস্ততঃ ছুটাছুটি করে এবং পরস্পরের সঙ্গে ধাক্কা খায়। অণুগুলি এত ছোট যে, সাধারণভাবে তাদের গতিবিধি প্রত্যক্ষ করা যায় না। কিন্তু এরকম একটা ব্যাপার যে ঘটতে পারে, ব্রাউন তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেন। তিনি অণুবীক্ষণ যন্ত্রের নীচে জলে ভাসমান ফুলের রেণু পরীক্ষা করে দেখেন, সেগুলি জলের বিভিন্ন অণুর সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে ইতস্ততঃ ছুটাছুটি করে বেড়াচ্ছে। এর নাম ব্রাউনীয় সঞ্চরণশীলতা (Brownian movement)। আর একটা কথা, তরল পদার্থে অণুগুলির মধ্যে বাঁধন খুব জোরালো নয়, কাজেই তাদের আকার ঠিক থাকে না। আর কখনও কখনও দু-চারটি অণু ছুটে গিয়ে বায়ুর সঙ্গে মিশে যায়, এর নাম বাষ্পায়ন (Vaporization)। তবে তখনও তাদের মধ্যে কিছুটা আকর্ষণ থাকে বলে অভ্যন্তর ভাগের অণুগুলির আকর্ষণে তরলের উপরিভাগ সমতল থাকে।

পাত্রের ঢাকা খুলে রাখলেও এক সঙ্গে সবগুলি অণু ছুটে পালিয়ে যেতে পারে না। এজন্যেই তরল পদার্থের আয়তন মোটামুটি নির্দিষ্ট থাকে, তবে তাপের প্রভাবে তা বদ্‌লে যেতে পারে। কিন্তু কঠিন পদার্থের তুলনায় তরল পদার্থের অণুগুলির মধ্যে বাঁধন অনেকটা আল্‌গা বলে এটা প্রবাহিত হতে পারে, আর পাত্রে কোন ছিদ্র থাকলে মাধ্যাকর্ষণের প্রভাবে সেখান দিয়ে বেরিয়ে যায়।

গ্যাসীয় পদার্থের বেলায় অণুগুলির পরস্পরের মধ্যে আকর্ষণ একরূপ থাকে না বললেই চলে। কাজেই তারা প্রচণ্ডবেগে ইতস্ততঃ ছুটাছুটি করতে থাকে। এজন্যে তাদের কোন আকার ঠিক থাকে না এবং তাদের খোলা পাত্রে ধরে রাখাও যায় না। একটু ফাঁক পেলেই গ্যাসের অণুগুলি সেখান দিয়ে ছুটে বেরিয়ে যায়। আর একটা কথা, গ্যাসের অণুগুলির মধ্যে ফাঁক অনেক বেশী, তাই সামান্য চাপ দিলেই এই ফাঁকের মাত্রা কমে যায়, এবং তার ফলে গ্যাসের আয়তনও যায় কমে। আবার উত্তাপ দিলে অণুগুলি আরও চঞ্চল হয়ে ওঠে এবং আরও জোরে ছুটাছুটি করতে থাকে। তাই তখন হয় আয়তন বেড়ে যায়, নয়তো আয়তন ঠিক রাখলে গ্যাসের চাপ বৃদ্ধি পায়।

একটানা এতক্ষণ বক্তৃতা করবার পর অ্যাভো-গ্যাড্রো থামলেন, আমিও হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম। একটু ধাতস্থ হলে বললাম—বেশ, এভাবে পদার্থের গঠন এবং অবস্থাগত পরিবর্তন সম্পর্কে যাহোক একটা ধারণা হলো। তবে অণু ও পরমাণুর মধ্যে সঠিক সম্পর্কটা যে কি, তা কিন্তু এখনও আমার কাছে খুব স্পষ্ট হয়ে ওঠে নি।

হ্যাঁ, ঠিকই বলেছ। তাহলে এখন এবিষয়েও একটু আলোচনা করা দরকার।

পদার্থের যে ক্ষুদ্রতম কণা পৃথকভাবে অবস্থান করে ঐ পদার্থের নিজস্ব ধর্মগুলি প্রকাশ করতে পারে, তারই নাম অণু (Molecule)। কিন্তু অণু যদিও পদার্থের প্রতিরূপ, তবুও তা আরও ক্ষুদ্র অবিভাজ্য কণার সংযোগে গঠিত হয়ে থাকে। সুতরাং পদার্থের অণু থেকে প্রাপ্ত যে সব ক্ষুদ্রতম এবং অবিভাজ্য কণা রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় অংশ গ্রহণ করে, তাদেরই পরমাণু (Atom) বলা হয়; অর্থাৎ, বস্তু হলো অণুর সমষ্টি আর প্রতিটি অণু হলো এক বা একাধিক পরমাণুর সমষ্টি।

এই প্রসঙ্গে মনে রেখো, মৌলিক পদার্থের অণু একই জাতীয় পরমাণুর সংযোগে গঠিত হয়। তবে বিভিন্ন মৌলিক পদার্থের অণুতে পরমাণুর সংখ্যা একই রকম থাকে না। কঠিন ধাতব মৌলিক পদার্থ সোনা, রূপা, তামা, লোহা প্রভৃতি, তরল ধাতব মৌলিক পদার্থ মারকারি কিংবা গ্যাসীয় মৌলিক পদর্থ আর্গন, নিয়ন প্রভৃতি প্রকৃতিতে স্বাধীন পরমাণুরূপেই বিরাজ করে। এসব ক্ষেত্রে পরমাণুই এদের অণুও বটে। কিন্তু হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন প্রভৃতি গ্যাসীয় মৌলিক পদার্থের অণুতে দুটি করে পরমাণু থাকে। আবার ওজোনের অণুতে তিনটি এবং ফস্‌ফরাসের অণুতে চারটি পরমাণু থাকে।

অপর দিকে যৌগিক পদার্থের অণু গঠিত হয় দুই বা ততোধিক বিভিন্ন প্রকার পরমাণুর সমবায়ে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, একটি জলের অণুতে আছে দুটি হাইড্রোজেনের পরমাণু এবং একটি অক্সিজেনের পরমাণু। আর কার্বন ডাইঅক্সাইডের অণুতে আছে একটি কার্বনের পরমাণু এবং দুটি অক্সিজেনের পরমাণু।

এতক্ষণ তন্ময় হয়ে শুনছিলাম। হঠাৎ তাকিয়ে দেখি, অ্যাভোগ্যাড্রো কখন যেন অদৃশ্য হয়ে গেছেন। কিন্তু বিজ্ঞানীর জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা শুনে আমার জ্ঞানস্পৃহা আরও বেড়ে গেল। আরও কাছে থেকে অণু-পরমাণুগুলির স্বরূপ

উপলব্ধি করবার উদ্দেশ্যে অসীম কৌতূহল নিয়ে রূপার পাহাড়টার দিকে এগিয়ে চললাম।

এমন সময় হঠাৎ মাটিতে ছড়ি ঠোকবার শব্দ শুনে পিছন ফিরে তাকালাম। দেখলাম সৌম্যদর্শন কেতাদুরস্ত এক ইংরেজ ভদ্রলোক। মুখে বড় বড় গোঁফ, অনেকটা বাংলাদেশের সার আশুতোষের মত। বোঝলাম, ইনি হলেন আধুনিক পদার্থ-বিজ্ঞানের পথিকৃৎ লর্ড রাদার-ফোর্ড।

গোঁফের ফাঁক দিয়ে মৃদু হেসে রাদারফোর্ড বললেন—বৎস, তোমার জ্ঞানস্পৃহা লক্ষ্য করে আমি সন্তুষ্ট হয়েছি। তুমি কি জানতে চাও, আমি বুঝতে পেরেছি। বলাবাহুল্য, পরমাণুর গঠন সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা আমার জন্মেই হয়েছে। এস বৎস, আমরা পরমাণুর ভিতরটা একবার দেখে আসি। এই বলে তিনি ছড়িটি নিয়ে আমাকে একবার ছুঁয়ে দিলেন।

সঙ্গে সঙ্গে এক মায়াবলে আমার দেহটা যেন আরও ছোট হয়ে গেল। তখন রূপার পরমাণু আমার কাছে বিশাল এক সৌরজগৎরূপে প্রতিভাত হতে লাগলো।

বৎস, তুমি যে নতুন সৌরজগৎ দেখছ তা আর কিছু নয়, একটা রূপার পরমাণুর ভিতরটা তুমি দেখতে পাচ্ছ।

আমি অবাক হয়ে দেখলাম, ভিতরের দিকে একেবারে মাঝখানে রয়েছে খানিকটা জমাট-বাঁধা অংশ, আর তাকে কেন্দ্র করে বাইরে অনেক দূর দিয়ে বিভিন্ন বৃত্তাকার অথবা উপবৃত্তাকার পথে ক্ষুদ্রাকার কতকগুলি কণা অবিরত ঘুরে বেড়াচ্ছে। সব মিলিয়ে সে এক বিচিত্র ব্যাপার।

রাদারফোর্ড সম্ভবতঃ আমার বিস্ময়মুগ্ধ মনের কথা বুঝতে পারলেন। তাই বললেন—রূপার পরমাণুর গঠন বেশ জটিল, তাই না? তাহলে এসো, আমরা আগে হাইড্রোজেন পরমাণুর ভিতরটা দেখে আসি। তাহলে রূপার পরমাণুর গঠন সম্পর্কে সঠিক ধারণা করতে পারবে।

ঘুরতে ঘুরতে এক জায়গায় এসে রাদার-ফোর্ড বললেন—বৎস, এই দেখ হাইড্রোজেন পরমাণু। এর কেন্দ্রে আছে একটি মাত্র ধনাত্মক কণা বা প্রোটন, আর তাকে ঘিরে একটি ঋণাত্মক কণা বা ইলেকট্রন ঘুরছে অবিশ্রান্তভাবে —ঠিক যেমন সূর্যকে কেন্দ্র করে গ্রহগুলি নিয়ত ঘুরে বেড়ায়। এর ফলে বৈদ্যুতিক সাম্য বজায় থাকে—সাধারণভাবে সব পরমাণুই নিস্তড়িৎ।

মনে রেখো, একটি ইলেকট্রনের তুলনায় একটি প্রোটন প্রায় ১৮৩৬ গুণ ভারী। আর পরমাণুর অভ্যন্তরে সঞ্চরণশীল ইলেকট্রন এবং তার কেন্দ্রে অবস্থিত প্রোটন পরস্পরের কাছ থেকে কিছুটা দূরত্ব রেখে অবস্থান করে। এই দূরত্ব কতটা, তা নীচের উদাহরণ থেকে আন্দাজ করতে পারবে।

ধর, একটি হাইড্রোজেন কেন্দ্রে যে প্রোটন আছে, তার আয়তন একটি মটর-বীজের আয়-তনের সমান। তাহলে সেই অনুপাতে একটি ইলেকট্রনের ব্যাস হবে ত্রিশ ফুট এবং তা প্রোটন থেকে তিন শত মাইল দূরে থাকবে এবং তাকে কেন্দ্র করে চক্রাকারে ঘুরবে।

অন্যান্য মৌলিক পদার্থের কেন্দ্রে অবশ্য প্রোটন ছাড়াও আছে নিউট্রন কণা। এটা নিস্তড়িৎ এবং এর ওজন প্রোটনের সমান বলা যায়। এর কাজ হলো শুধু পরমাণুর ভর বাড়ানো।

অক্সিজেন পরমাণুর কথা চিন্তা কর। এর পারমাণবিক ভার ষোল, আর পারমাণবিক সংখ্যা (পর্যায়সারণী অনুযায়ী ক্রমিক সংখ্যা) আট। কাজেই এর কেন্দ্রকে আছে আটটি প্রোটন ও আটটি নিউট্রন। আর বৈদ্যুতিক সাম্য বজায় রাখবার

জন্যে এই কেন্দ্রক ঘিরে আছে আটটি ইলেকট্রন ; কারণ সাধারণভাবে পরমাণু নিস্তড়িৎ অবস্থায় থাকে। মনে রেখো, পারমাণবিক সংখ্যা থেকেই কেন্দ্রকের মোট প্রোটন সংখ্যা এবং সেই সঙ্গে বহির্ভাগের ইলেট্রন সংখ্যার নির্দেশ পাওয়া যায়।

এবারে রূপার পরমাণুর কথা চিন্তা কর। এর পারমাণবিক ভার ১০৮, আর পারমাণবিক সংখ্যা ৪৭। কাজেই এর কেন্দ্রে আছে ৪৭টি প্রোটন, আর ১০৮-৪৭ অর্থাৎ ৬১টি নিউট্রন, আর সেই কেন্দ্রককে ঘিরে বিভিন্ন কক্ষপথে বিচরণ করছে মোট ৪৭টি ইলেক্‌ট্রন।

আমাদের জানা সকল পরমাণুই এই নিয়মে গঠিত।

বাঃ, ভারি চমৎকার নিয়ম। আপনার কথায় পরমাণুর গঠন সম্পর্কে বেশ কিছু জানতে পারলাম—আমি উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে ওঠলাম। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে জিজ্ঞাসা করলাম—আচ্ছা প্রকৃতির নিয়মে ধনাত্মকের প্রতি ঋণাত্মক তড়িতের একটা টান রয়েছে, যার ফলে একে অন্যের মধ্যে বিলীন হতে চায়। যতটুকু অঙ্ক শিখেছি তাতে মনে হয়, একটি ইলেকট্রন যদি কেন্দ্রকের চারদিকে এভাবে ঘুরতে থাকে, তবে তার শক্তি ক্রমশঃ ক্ষয় হতে থাকবে। আর তা যদি হয়, তবে চক্রপথের আকারও ক্রমশঃ ছোট হতে থাকবে। কাজেই একটি কুণ্ডলীর (Spiral) মত পথে অগ্রসর হয়ে শেষে তা একেবারে কেন্দ্রে অবস্থিত প্রোটনের সঙ্গে মিলিত হয়ে যাবে। এক্ষেত্রে সেরকম হচ্ছে না কেন?

এই সমস্যার সমাধান করেছেন ডেনমার্কের বিজ্ঞানী নীল্‌স বোর। এই বিষয়ে তিনি কি বলেছেন, তাই এখন শোন। একথা বলতে বলতেই রাদারফোর্ড অদৃশ্য হয়ে গেলেন, আর সেখানে আবির্ভূত হলেন বোর।

তিনি বললেন—বৎস, মেকানিক্সের চিরাচরিত সূত্র এক্ষেত্রে প্রয়োগ করাই ভুল হয়েছে। পরমাণু-জগতের কণাগুলি নতুন আর এক ধরণের নিয়ম মেনে চলে, যার নাম কোয়ান্টাম-সূত্র। তারই ফলে ইলেকট্রন যে কোন কক্ষপথে চলতে পারে না—বিশেষ বিশেষ কতকগুলি কক্ষপথেই শুধু বিচরণ করতে পারে। কেন্দ্র থেকে এদের দূরত্ব নির্দিষ্ট। যে কোন একটি কক্ষপথে বিচরণ করবার সময় ইলেকট্রনের শক্তি অপরিবর্তিত থাকে। কিন্তু বিভিন্ন কক্ষপথে এর শক্তির পরিমাপ বিভিন্ন। কাজেই পরমাণু যখন তেজ শোষণ করে তখন ইলেকট্রন ভিতর থেকে বাইরের কক্ষে চলে আসে, আবার যখন তেজ বিকিরণ করে তখন বাইরে থেকে ভিতরের কক্ষে চলে যায়। কক্ষ থেকে কক্ষান্তরে এই সঞ্চরণের মাত্রা নির্ভর করে শোষিত অথবা বিকিরিত তেজের মাত্রার উপর। অবস্থা-বিশেষে এইভাবে বিকিরিত তেজই প্রকাশ পায় রঞ্জেন রশ্মিরূপে।

আমি বিস্ময়ে হতবাক হয়ে বোরের মুখের দিকে চেয়ে আছি দেখে তিনি একটু মৃদু হেসে বললেন—বৎস, এতেই অবাক হচ্ছো? পরমাণুর অন্তর্লোক সম্পর্কে যে আরও কত কিছু জানবার আছে, তার হিসেব নেই। অবশ্য এসম্পর্কে আজ অবধি যা কিছু জানা গেছে, তার সবটুকু কৃতিত্ব আমার একার নয়। বিশিষ্ট বিজ্ঞানী সমারফেল্ড এবং উইলসন আমারই প্রদর্শিত পথে অগ্রসর হয়ে এই বিষয়ে আরও অনেক মূল্যবান তথ্য সংগ্রহ করেছেন। আমি একে একে সব বলছি, আরও একটু মনোযোগ দিয়ে শোন।

আগেই বলেছি, কোন পরমাণুতে ইলেকট্রনের সংখ্যা তার পারমাণবিক সংখ্যার সমান। সৌরজগতে সূর্যকে কেন্দ্র করে যেমন গ্রহগুলি ঘুরছে, তেমনি ধনাত্মক কেন্দ্রের চারদিকে এই ঋণাত্মক ইলেকট্রন কণাগুলিও অবিরাম ঘুরে বেড়াচ্ছে। গ্রহগুলি যেমন বিভিন্ন কক্ষে বিন্যস্ত রয়েছে, ইলেকট্রনগুলিও তেমনি বিভিন্ন খোসায় বা স্তরে (Shell) বিন্যস্ত

রয়েছে। এই স্তরগুলি K, L, M, N, O এবং P এই অক্ষরগুলির দ্বারা চিহ্নিত করা হয়েছে।

আর একটা কথা। প্রতিটি ইলেকট্রনের 'স্পিন' আছে—বুঝলে? আচ্ছা একটা উপমা দিচ্ছি। তুমি নিশ্চয়ই দেখেছ যে, একটি লাট্টু নিজের পেরেকের উপর পাক খায়, আর সঙ্গে সঙ্গে এগিয়েও যায়। ধরা যাক, একটা ইলেকট্রন তেমনি ক্রমাগত পাক খাচ্ছে আর সেই সঙ্গে নিজের কক্ষপথে এগিয়ে যাচ্ছে।

এই প্রসঙ্গে মনে রেখো, এক-একটি স্তরে কতগুলি করে ইলেকট্রন থাকতে পারে, তার সংখ্যা একেবারে নির্দিষ্ট। যেমন ধর, কোন স্তরের ক্রমিক সংখ্যা এক, তাহলে সেই স্তরে ইলেকট্রনের সংখ্যা হবে দুই ($2\times n^2$, অর্থাৎ $2\times 1^2=2$)। তেমনি ক্রমিক সংখ্যা দুই হলে ইলেকট্রনের সংখ্যা হবে আট, আবার ক্রমিক সংখ্যা তিন হলে ইলেকট্রনের সংখ্যা হবে আঠারো —ইত্যাদি।

কি বিচিত্র এই পরমাণু-জগৎ! আমি অবাক হয়ে ভাবতে লাগলাম। কিন্তু সমস্যার তো শেষ নেই! মনে হলো, এতগুলি ইলেকট্রন বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন কক্ষপথে বিচরণ করছে, কিন্তু কই, তাদের মধ্যে তো ঠোকাঠুকি হয় না! সবগুলি ইলেকট্রন তো কখনও একই স্তরে এসে ভিড় করে না! কি ভাবে তারা এত নিয়ম-শৃঙ্খলা মেনে চলছে? কি করে তারা এমন শান্তি বজায় রেখে চলেছে?

এসব কথা ভাবছিলাম—কতক্ষণ, তা খেয়াল ছিল না। হঠাৎ চেয়ে দেখি সম্মুখে দাঁড়িয়ে রয়েছেন আলখাল্লাধারী ভারিক্কি চেহারার এক সন্ন্যাসী। চমকিত হয়ে প্রশ্ন করলাম—মহাশয়, আপনি কে?

আমাকে চিনতে পারছ না? আমি ফাদার পাওলি। পরমাণু-জগতে যাতে নিয়ম-শৃঙ্খলা ও শান্তি বজায় রাখা যায়, সেটা দেখাই হলো আমার জীবনের একমাত্র ব্রত। এজন্যে আমি নিয়ম করে দিয়েছি যে, কোন একটি কক্ষে দুটির বেশী ইলেকট্রন থাকতে পারবে না। আর দুটি ইলেকট্রন থাকলেও তাদের একটি হবে পুরুষ, অন্যটি প্রকৃতি; অর্থাৎ একটির 'স্পিন' যেদিকে হবে, অন্যটির 'স্পিন' হবে ঠিক তার উল্টো দিকে। এখানে তৃতীয় কারও স্থান নেই। তুমি নিশ্চয়ই জান, মানুষের সংসারেও এই নিয়ম মানতে হয়, তবেই শান্তি বজায় থাকে। সেখানেও তৃতীয় কারও আবির্ভাব হলেই বিপর্যয় ঘটে।

বাঃ, এই নিয়মটা তো ভারি মজার—বিস্ময়ে আনন্দে চীৎকার করে ওঠলাম।

সঙ্গে সঙ্গে মনে হলো, আমি যেন শূন্যে ছুটে চলেছি তীরবেগে। আরে, ব্যাপার কি? আশেপাশে তাকিয়ে দেখি, এই শূন্য-অভিযানে আমি একলা নই। ধোঁয়াটে অস্পষ্ট চেহারার আরও অনেকেই ছুটে চলেছে। আসলে আমরা সকলেই কেন্দ্রে অবস্থিত গোলাকার একটা ভারী বস্তুর চারদিকে চক্রাকারে ঘুরছি। আরে, একি? মহাকাশচারীরা রকেটে করে মহাশূন্যে উঠে যে রকম পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করতে থাকে, আমরাও সেই রকম মহাকাশচারী হয়ে গেলাম নাকি?

বিস্ময়ের ঘোর কাটলে লক্ষ্য করে দেখি, বিভিন্ন কক্ষপথে ওরা সব জোড়ায় জোড়ায় চক্রাকারে ঘুরছে, আমি শুধু একলা। মনে হচ্ছে, ওরা সবাই যেন নাগরদোলায় পরস্পরকে ধরবার জন্যে মরণ-বাঁচন পণ করে একে অপরকে অনুসরণ করে ছুটছে, কিন্তু কেউ কাউকে ছুঁতে পারছে না। কি মজার খেলা! কিন্তু আমার কোন সাথী না থাকায় আমার মনটা খারাপ হয়ে গেল। একজন সাথী পাবার উদগ্র কামনায় আমার মনটা আকুপাকু করে

উঠলো। মনে হলো, এখন এখানে মিনতি থাকলে বেশ হতো।

এখানে বলে রাখা দরকার, আমাদের ক্লাসের মিনতির প্রতি আমার একটু দুর্বলতা আছে। মিনতিরও যে আমার প্রতি টান না আছে, তা নয়। তবে সে একটু ভীরু প্রকৃতির। কতদিন একসঙ্গে সিনেমায় যেতে চেয়েছি, কিন্তু বাবা-মার ভয়ে ও সব সময় এড়িয়ে গেছে।

হঠাৎ চোখ মেলে দেখি, কে একজন খুব কাছ দিয়ে যাচ্ছে। ডেকে বললাম—তোমরা সবাই তো বেশ জোড়ায় জোড়ায় ঘুরছ—একমাত্র আমারই কোন সাথী নেই কেন?

সে উত্তর দিল—জান না বুঝি, তুমিও যেমন আমরাও তেমনি এক-একটি ইলেকট্রন বনে গেছি, আর সোডিয়াম পরমাণুর কেন্দ্রকের চারদিকে চক্রাকারে ঘুরছি। দুর্ভাগ্যবশতঃ সোডিয়ামের পারমাণবিক সংখ্যা বিজোড়, আর তুমি রয়েছ সবচেয়ে বাইরের কক্ষে। তাইতো তোমার কোন সাথী নেই। তবে আমাদের মধ্যে তুমিই হলে সবচেয়ে কুলীন। কারণ, আমাদের এই পরমাণু যে যোজ্যতা (Valency) প্রকাশ করে, সে তো তোমার জন্মেই সম্ভব হয়।

কথাটা শুনে গর্বে আমার বুক ফুলে উঠলো। এই নিরানন্দ অবস্থার মাঝে তবুও যা হোক একটু সান্ত্বনা পেলাম।

এই সময় ফাদার পাওলি আবার সেখানে আবির্ভূত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন—কি হে, কেমন লাগছে?

এমন শূন্যপথে ভেসে বেড়াতে বেশ ভালই লাগছে। কিন্তু ওদের সবারই সাথী আছে, কেবল আমারই নেই—একথা ভেবে মনটা খারাপ হয়ে যাচ্ছে।

তোমার জন্মে আমি দুঃখিত। কিন্তু এখন আর কোন উপায় নেই। যতক্ষণ তুমি সোডিয়াম কেন্দ্রককে আশ্রয় করে থাকবে, ততক্ষণ তোমাকে এমন একলাই কাটাতে হবে। আচ্ছা দেখি, তোমার জন্মে কোন সাথী জোটাতে পারি কিনা।

আমি আশায় বুক বেঁধে আবার ঘুরতে লাগলাম। কিন্তু এমন নিঃসঙ্গ জীবন কারই বা ভাল লাগে? আমার এই কক্ষ-পরিক্রমা নিরানন্দ খাটুনির মত মনে হতে লাগলো।

ফাদার পাওলি এতক্ষণ আমার সঙ্গে সঙ্গেই ভেসে চলছিলেন। হঠাৎ বলে উঠলেন—তোমার বরাত ভাল, এখনি হয়তো তোমাকে একটি সাথী জুটিয়ে দিতে পারবো। ঐ দেখ, আর একটা সৌরজগতের মত কি যেন এদিকে ভেসে আসছে। মনে হচ্ছে, ওটা একটা ক্লোরিনের পরমাণু। আশা করি এখানেই তুমি তোমার মনের মত সাথী খুঁজে পাবে।

তাকিয়ে দেখি, সত্যিই তো! ওখানেও আমাদের মতই অনেকগুলি অস্পষ্ট ছায়া-মূর্তি বিভিন্ন কক্ষপথে ঘুরে বেড়াচ্ছে! ক্লোরিনের পরমাণুটি যত এগিয়ে আসতে লাগলো, ছায়া-মূর্তিগুলি ততই স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হতে লাগলো!

আরে—কি আশ্চর্য! এ যে মিনতি! সবচেয়ে বাইরের কক্ষে একা একা ঘুরে বেড়াচ্ছে। ওকে দেখেই আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেলাম। সঙ্গে সঙ্গে মরণ-বাঁচন পণ করে ঝাঁপিয়ে পড়লাম ক্লোরিনের দিকে।

সাঁই সাঁই করে ছুটে গিয়ে বন্‌বন্‌ করে ঘুরতে লাগলাম। মিনতি যে কক্ষে রয়েছে, ঠিক সেই কক্ষপথে। কিন্তু আমি যতই মিনতির কাছে যাবার চেষ্টা করি, ও ততই দূরে সরে যায়। সে যে কেবলই দৃষ্টি এড়ায়, পালিয়ে বেড়ায়! এ এক রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা। তবুও যা হোক, এতক্ষণে আমার একক নিঃসঙ্গ

জীবনের অবসান হলো। মনের আনন্দে মিনতিকে অনুসরণ করবার এই মজার খেলায় মেতে গেলাম।

এভাবে কতক্ষণ কেটে গেল, জানি না। হঠাৎ চেয়ে দেখি, সোডিয়ামের পরমাণুটা ক্লোরিনের সঙ্গে যেন আঠার মত লেগে রয়েছে। আরে, আমাকে কি আমার পুরনো কক্ষপথে ফিরে যেতে হবে নাকি? রীতিমত ঘাবড়ে গেলাম।

সম্ভবতঃ আমার মনের কথা বুঝতে পেরেই ফাদার পাওলি বললেন—না, বৎস! তোমার আশঙ্কার কোন কারণ নেই। তোমাকে আর ফিরে যেতে হবে না। তবে কি হয়েছে জান? তুমি ওখান থেকে এখানে চলে আসাতে ক্লোরিনের সবগুলি কক্ষ এখন পূর্ণতা লাভ করেছে, অপর দিকে তোমাকে হারাবার ফলে তোমাকে নিয়ে এতক্ষণ যে সমস্যার সৃষ্টি হয়েছিল, তারও সমাধান হয়েছে; অর্থাৎ এখন প্রত্যেকেরই ইলেকট্রন-অষ্টক পূর্ণ হয়েছে। কারও কোন ইলেকট্রনই এখন আর একলা নেই। এটাই নিয়ম।

কিন্তু এর ফলে একটা মজার ব্যাপার হয়েছে। দুটিরই বিদ্যুৎসাম্য বিনষ্ট হয়েছে। তোমাকে হারিয়ে সোডিয়াম ধন-তড়িতাবিষ্ট হয়ে পড়েছে, আর তোমাকে পেয়ে ক্লোরিন হয়েছে ঋণ-তড়িতাবিষ্ট। তুমি নিশ্চয়ই জান যে, ধন-তড়িতের প্রতি ঋণ-তড়িতের স্বাভাবিক আকর্ষণ আছে। তাই এই দুটি পরমাণু এখন জোড় বেঁধে ভেসে চলেছে—পরস্পর মিলিত হয়ে তৈরি করেছে সোডিয়াম ক্লোরাইড, যাকে আমরা নুন বলি।

একথা শুনে ভারি মজা লাগলো। মনের আনন্দে নতুন উদ্যমে আবার সাঁই সাঁই করে ঘুরতে লাগলাম।

হঠাৎ মনে হলো, মিনতি আমাকে দেখেছে, আর আমাকে ডেকে যেন কি বলছে! কান পেতে শোনলাম, ও বলছে—আরে শঙ্কর যে! তুমি এখানে এলে কি করে? ওঃ তোমাকে দেখে যেন ধরে প্রাণ এলো। ইস, একটু আগেই আমি এখন যে ক্লোরিন পরমাণু আশ্রয় করে রয়েছি, তার কাছেই আর একটা ক্লোরিন পরমাণু এসে ভিড়ে পড়েছিল। দুটিতে জোড় বেঁধে গঠন করেছিল ক্লোরিনের অণু। কিন্তু এর ফলে আমার অবস্থা কাহিল। কারণ ঐ পরমাণুটির বাইরের কক্ষে ছিল এক বকাটে ছোকরা। দেখেই মনে হলো সে আমাকে ফলো করছে। হঠাৎ সে লাফ দিয়ে একেবারে আমার কক্ষে চলে এলো। তখন কি করি? আমিও লাফ দিয়ে ওরই পরিত্যক্ত কক্ষে গিয়ে আশ্রয় নিলাম। কিন্তু ও কিছুতেই আমার সঙ্গ ছাড়ে না! ও আবার লাফ দিয়ে এদিকে ফিরে এলো, অগত্যা আমাকেও আবার আমার পুরনো কক্ষেই ফিরে যেতে হলো। ও আমাকে ক্রমাগত বিরক্ত করতে লাগলো। কাজে কাজেই আমরা দু-জনে যেন দু-নৌকায় পা দিয়ে ক্রমাগত এদিক-ওদিক লাফালাফি করতে লাগলাম। সে এক প্রাণান্তকর অবস্থা। ভাবছিলাম ক্লোরিন পরমাণুটা একটু দূরে সরে গেলে বাঁচা যেত। কিন্তু ওটা যেন একেবারে আঠার মত লেগে রয়েছে, কিছুতেই সরে না। ভগবানকে ডাকছি, আর মনে মনে ভাবছি- কি করে ওর হাত থেকে উদ্ধার পাওয়া যায়?

এমন সময় দেখি, কোন এক মন্ত্রবলে ঐ বকাটে ছোকরাকে নিয়েই ওদের ঐ পরমাণুটা আমাদের কাছ থেকে অনেক দূরে সরে গেল। মনে কর, দুটা নৌকা পাশাপাশি চলছে। এখন কেউ যদি একটাকে জোরে ধাক্কা দেয়, তাহলে নিশ্চয়ই দূরে সরে যাবে। আমাদের এখানেও কি যেন প্রবল শক্তি ঐ পরমাণুটিকে হঠাৎ দূরে ঠেলে দিল। আমিও হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। আরও মজার কথা এই যে, আমাকে

বেশীক্ষণ একলা থাকতে হলো না। এখানে এসেই মনের মত সাথী পেয়ে গেলাম।

মিনতির কথা শুনে আমার খুব আনন্দ হলো, তাই উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে উঠলাম—কি মজা, কি মজা।

এমন সময় সেখানে হঠাৎ মূর্তিমান গুরু-মশায়ের মত ফাদার পাওলি আবার আবির্ভূত হলেন। তারপর গম্ভীর স্বরে বললেন, কি হে ছোকরা, খুব যে স্ফূর্তি দেখছি। ব্যাপার কি? সাবধান, বেশী বাড়াবাড়ি করো না। যেমন ঘুরছ, তেমনি ঘুরতে থাক। ওকে বেশী জ্বালাতন করলে ফল ভাল হবে না, তা আমি আগেই বলে রাখছি। মনে রেখো, খৃষ্টান সন্ন্যাসিনীদের মত (Nun) একটা মহান ব্রত উদযাপনের উদ্দেশ্যে ওর জীবনটাও উৎসর্গীকৃত হয়েছে।

এসব শুনে আমি লজ্জায় অধোবদন হয়ে রইলাম। কিন্তু আমার এমন করুণ অবস্থা দেখেও ফাদার পাওলি নিরস্ত হলেন না। শাসনের সুরে বলতে লাগলেন—তুমি নিশ্চয়ই জান, একটু আগেই যে দুটি ক্লোরিন পরমাণু পরস্পরের কাছা-কাছি থেকে ক্লোরিনের অণু গঠন করতে পেরেছিল, সে তো ওর জন্যেই সম্ভব হয়েছিল। অবশ্য ও তখন মানসিক যন্ত্রণায় ছটফট করেছে, আর এই প্রাণান্তকর পরিস্থিতি থেকে উদ্ধার পাবার জন্যে সতত কামনা করেছে। তাইতো তাকে এখন আর একটি মহান ব্রত উদযাপনের জন্যে নিযুক্ত করা হয়েছে। ওরই সহায়তায় গঠিত হয়েছে সোডিয়াম ক্লোরাইডের অণু। অবশ্য স্বীকার করছি যে, একাজে তুমিও ওকে সহায়তা করছো বলে ও এখন একাজে বেশ উৎসাহ পাচ্ছে—একটা নিরানন্দ কর্তব্য সম্পাদনের মধ্যেও বেশ আনন্দ খুঁজে পেয়েছে। তবে তুমিও তোমার কর্তব্য করে যাও। তোমার জ্বালায় অস্থির হয়ে ও যদি এই দেশ ছেড়ে পালাতে চায়, তাহলে খুবই মুস্কিল হবে। ও যাতে একলা থাকতে পারে, তারই ব্যবস্থা তখন করতে হবে। বিদ্যুতের চাবুক মেরে তোমাকে আবার ফেরৎ পাঠানো হবে, তোমার পুরাতন কক্ষপথে। অতএব সাবধান।

* * *

হঠাৎ একটা ঠেলা খেয়ে চমকে জেগে উঠলাম। জানি না কখন, পিছনের বেঞ্চে হেলান দিয়ে একেবারে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। অধ্যাপক চলে গেছেন, ক্লাসও একেবারে ফাঁকা, আমিই শুধু একলা ঘুমিয়ে রয়েছি। বেয়ারা এসে ঠেলছে, আর বলছে—ও শঙ্করবাবু, উঠুন। বাড়ী যাবেন না? সন্ধ্যা যে হয়ে এলো!

চোখ রগড়ে ধড়মড় করে উঠে পড়লাম। তারপর আমার এই অদ্ভুত স্বপ্ন-দর্শনের কথা ভাবতে ভাবতে বাড়ীর দিকে রওনা হলাম।

সঞ্চয়ন

অতল জলের আহ্বান

মনে করুন সমুদ্রের ৪ হাজার ফুট বা তারও বেশী নীচে একটি গ্রাম, আর সেই গ্রামের একটি কুটিরে আপনি গিয়েছেন সপ্তাহান্তিক ছুটিটা কাটিয়ে আসবার জন্যে। খুবই অবিশ্বাস্য মনে হয়, তাই না? কিন্তু সে দিনের আর খুব বেশী দেরী নেই, যখন আমরা এই নতুন দেশে অবসর যাপন করতে যেতে পারবো।

জাপানের অদূরে স্বল্প গভীর এক জলাশয়ে ইতিমধ্যেই জলতলে একটি হোটেল নির্মিত হচ্ছে। হোটেলটির পরিকল্পনা এমনভাবে প্রস্তুত করা হয়েছে, যাতে হোটেলের বাসিন্দারা সেখান থেকে মাছ প্রভৃতির খেলাধূলা উপভোগ করতে পারে। সমুদ্রের তলদেশে অবসর নিবাস নির্মিত হতে আর খুব বেশী দেরী নেই। এই অবসর নিবাসের চারদিক পরিবেষ্টিত থাকবে প্রবালের উদ্যানে, আর থাকবে বর্ণাঢ্য সামুদ্রিক প্রাণী-জীবনের এক বিচিত্র পরিবেশ। কেমন করে এই অবসর নিবাসে যাবেন? সেটাও কোন সমস্যা হবে না। হয়তো কোন বেসরকারী কোম্পানী এজন্যে ডুবোজাহাজ চালু করবেন।

যাঁরা অতি উৎসাহী, দুঃসাহসিক অভিযানে যাঁদের রুচি আছে, তাঁরা এই অবসর নিবাস থেকে বেরিয়ে পড়তে পারবেন সমুদ্র-সন্ধানে। আর যাঁরা অত উৎসাহী নন, তাঁরা জলতলের বালুকাবেলায় বা পাহাড়ের উপত্যকায় ঘুরে আসতে পারবেন গাইডের সাহায্য নিয়ে।

জলতলে এই ধরণের গৃহনির্মাণ আজ আর কোন সমস্যাই নয়। জলের নীচে ভিত্তি তৈরি করে তাতে এই ধরণের গৃহ নোঙর করে রাখা হবে। এই গৃহ এমনভাবে স্থাপিত হবে যে, ঝঞ্ঝা-বিক্ষুব্ধ আবহাওয়া এর কোন ক্ষতি করতে পারবে না। তাছাড়া প্রবালের শিখরগুলি একে সুরক্ষিত ভাবে রাখবে।

সমুদ্র মানুষের কাছে একটা রহস্য হয়েই রয়েছে। পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশের তিন-চতুর্থাংশে যে ৩৩ কোটি ঘন মাইল জল রয়েছে, তার তমসাবৃত তলদেশে যে অনাবিষ্কৃত সম্পদের অজস্র সঞ্চয় রয়েছে, তার সন্ধানের উপযুক্ত সময় এসেছে।

সমুদ্রের অতলতলে যে অফুরন্ত সম্পদ রয়েছে, তা আধুনিক অর্থনীতিকে প্রভূত শক্তিশালী করে তুলতে পারে। সোনা, তামা, লোহা, তেল প্রভৃতি খনিজ পদার্থে সমুদ্রের ভাণ্ডার পরিপূর্ণ। এছাড়া আছে গাছ-গাছড়া ও প্রাণীসম্পদ। আরও মজার কথা, সমুদ্রের তলদেশকে প্রাকৃতিক সম্পদের এক নিরাপদ গুদাম বলা যেতে পারে। বাতাসের সংস্পর্শে এলে কয়লায় ক্রমাগত অক্সিজেন মিশতে থাকে এবং ক্রমে এমন একটা বিপদজনক অবস্থায় এসে পৌঁছায় যে, যথোপযুক্ত সতর্কতা অবলম্বন না করলে তা আপনা থেকেই প্রজ্জ্বলিত হয়ে উঠতে পারে। কিন্তু জলের নীচে কয়লার এক নিশ্চিন্ত আশ্রয়।

মানুষের আহার্যের সংস্থানে সমুদ্রের অবদান বিস্ময়কর হতে পারে। শামুক, কাঁকড়া, চিংড়ি প্রভৃতি বহু রকম জলজ প্রাণী বিরাজ করছে সমুদ্রের জলতলে। চাষ করলে এই সম্পদ বহুগুণে বৃদ্ধি পারে। প্রাকৃতিক শত্রুর হাত থেকে এই সব প্রাণীদের রক্ষা করতে হবে এবং এদের খাবারেরও ব্যবস্থা করতে হবে। এভাবে একদিন এরা মানুষের খাদ্যের প্রয়োজন মেটাবে।

সামুদ্রিক আগাছাও মানুষের খাদ্য তালিকায় স্থান পেতে পারে। বস্তুতঃ, জাপানীরা এবং আরও কেউ কেউ সামুদ্রিক আগাছা খাদ্যরূপে ব্যবহার করছে। এত সম্ভাবনা সত্ত্বেও সমুদ্রতলের সম্পদ উদ্ধারে মানুষ এখনও তেমন যত্নবান হয় নি।

মাত্র এই সেদিন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বার্টন আবিষ্কার করলেন বেনথোস্কোপ—বেথিস্ফিয়ারের একটি নতুন সংস্করণ এটি। এই দুটির মধ্যে পার্থক্য এই যে, বেনথোস্কোপ সমুদ্রের অনেক বেশী নীচে নামতে পারে এবং এর তলদেশে একটি বৃহৎ জানালা থাকায় আরও বেশী স্থান দৃষ্টিগোচর হয়। প্রায় এই সময়েই অগাষ্ট পিকার্ড আবিষ্কার করেন বেথিস্কাফি। এটি মূলতঃ একটি গ্যাসের থলি সমন্বিত বেলুন। জলের চেয়ে অনেক হাল্কা বলে এটি সহজেই জলের মধ্যে ভেসে থাকে এবং 'গণ্ডোলা' গবেষণা জাহাজ এর সঙ্গে ঝুলে থেকে জলের নীচে অবস্থান করতে পারে।

যাহোক, এই সবই হলো অগভীর জলে গবেষণার ব্যাপার। অগাষ্ট পিকার্ড ও জ্যাক্স পিকার্ড কর্তৃক 'বেথিস্কাফি ট্রিয়েষ্ট' আবিষ্কৃত না হওয়া পর্যন্ত গভীর জলে অনুসন্ধান চালানো সম্ভব হয় নি। বিজ্ঞানীর কাছে কোন সমুদ্রই গভীর নয়—পিকার্ড একথা প্রমাণ করবার অল্পদিনের মধ্যেই প্রায় ডজনখানেক গভীর সমুদ্রযান নির্মিত হয়েছে। পিকার্ড নিজে তৈরি করলেন 'মেসোস্কাফি'। এই যান বহুসংখ্যক বিজ্ঞানী ও প্রচুর যন্ত্রপাতি নিয়ে দীর্ঘ সময় জলতলে অবস্থান করতে পারে।

এর পরে এল অ্যালুমিনিয়ামের তৈরি ডুবোজাহাজ 'অ্যালুমিনট'। এটি জলের ১৫ হাজার ফুট নীচে নামতে পারে।

১৯৬৩ সালে ক্যাপ্টেন কাষ্টো পাঁচজন সঙ্গীকে নিয়ে লোহিত সাগরের ৩৬ ফুট নীচে একটি ইস্পাত গৃহে এক মাস কাল বাস করেন। বর্তমানে তিনি ওয়েস্টিংহাউস ইলেকট্রিক কর্পোরেশনের পক্ষে ডীপষ্টার ডুবোজাহাজ নিয়ে কাজ করছেন। এই জাহাজটি তিনজন লোক নিয়ে জলের ১৩ হাজার ফুট নীচে নেমে যাবে। ওয়েস্টিংহাউস বর্তমানে নানা ধরণের ডীপষ্টার নির্মাণের পরিকল্পনা নিয়েছেন। গবেষক বিজ্ঞানীসহ জলের ২০ হাজার ফুট নীচে নামিয়ে দেবার জন্যেও গবেষণা চলছে।

'ডীপষ্টার ৪০০০' সমুদ্রের ৪ হাজার ফুট নীচে নেমে গিয়ে ২৪ ঘণ্টা অবস্থান করতে পারে।

এতদিন ধারণা ছিল, ডুবুরীরা জলের ২৫০ ফুটের বেশি নীচে যেতে পারে না। কিন্তু বাতাসের নাইট্রোজেনের স্থলে হিলিয়াম ব্যবহার করে ডুবুরীদের শ্বাস-প্রশ্বাসের কাজ অনেক সহজ হয়েছে এবং ডুবুরীদের পক্ষে জলের অনেক নীচে নামা সম্ভব হয়েছে। শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ ব্যবস্থার উন্নতি সাধন ও যন্ত্রপাতি নিখুঁত করবার জন্যে গবেষণা করে চলেছে ওয়েষ্টিংহাউস প্রতিরক্ষা ও মহাকাশ কেন্দ্রের সমুদ্র গবেষণা বিভাগ।

ওয়েস্টিংহাউসের ইঞ্জিনীয়াররা হিলিয়াম অক্সিজেনের আবহাওয়ায় মানুষের কণ্ঠস্বর নিয়েও গবেষণা করছেন। জলের তলায় শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্যে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ নতুন ধরণের যন্ত্র পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে। শুধুমাত্র এই যন্ত্রটির সাহায্যেই মানুষ একদিন জলের ৩ হাজার ফুট নীচে নেমে যেতে পারবে।

জেনারেল ইলেকট্রিক সিলিকেন রবারের একটি মেমব্রেন আবিষ্কার করেছেন, যা জলের মধ্যে থেকে শুধু অক্সিজেন টেনে বের করে নিতে পারে। ফলে জলের নীচে জল থেকে সরাসরি অক্সিজেন নিয়ে মানুষ বেঁচে থাকতে পারে।

এসব থেকেই উপলব্ধি করা যায়, মানুষ

বিনা বিপদে জলের নীচে বসবাস করতে পারে। হয়তো একদিন জলের নীচে একটা রাজ্য গড়ে উঠতে পারে, আর সে রাজ্যে মানুষ গড়ে তুলবে নানা পল্লী। বস্তুতঃ সমুদ্র সন্ধানের কাজে এই রকম উপনিবেশ গড়ে তোলবারই প্রয়োজন হবে।

এজন্যে প্রাথমিক প্রয়োজন হলো জলতলে বিদ্যুৎ সরবরাহ। ওয়েস্টিংহাউস সে অভাবও মেটাতে চলেছেন। জলের নীচে ব্যবহারোপযোগী একটি অভিনব পারমাণবিক চুল্লী এঁরা নির্মাণ করেছেন। এই চুল্লীটি ৬ হাজার জনের উপযোগী বিদ্যুৎ-শক্তি উৎপাদন করতে পারে। মানুষের সাহায্য ছাড়াই এই চুল্লী ১৮ মাস পূর্ণ শক্তিতে কাজ করতে পারে।

ওয়েস্টিংহাউসের ডিরেক্টর ডাঃ ডব্লিউ ইজনসন সঙ্গত কারণেই এই আশা প্রকাশ করেছেন যে, মানুষ অচিরেই সমুদ্রতলে স্থায়ী বসতি স্থাপন করতে পারবে। অতল জলের আহ্বানে সাড়া দেবার সময় সত্যিই মানুষের সামনে এসেছে।

কলেরা রোগ দূরীকরণে বিজ্ঞানীদের ভূমিকা

পাঁচ গাঁয়ের মধ্যে সবচেয়ে বলিষ্ঠ মানুষটির মাত্র কয়েক ঘন্টার মধ্যে যে এরকম পরিণতি ঘটবে, তা কি কেউ জানতো? পরিষ্কার রান্নাঘর। রান্না হয়েছিল শাকসব্জী, ডাল, ভাত। ভরপেট খেয়েই সে ঘুমিয়েছিল। খাওয়ার সময়ে মাটির কলসীতে রাখা পরিষ্কার ঠাণ্ডা জল সে খেয়েছিল। কাকচক্ষুর মত সে জল। সে দিনের সন্ধ্যায়ই আরও দশজন মেয়ের সঙ্গে তার স্ত্রীও ছোট্ট নদী থেকে কলসী করে সেই জল নিয়ে এসেছিল। ভোর থেকেই পেটে ব্যাথা কেবল ঐ ঘরের মানুষদেরই নয়, প্রায় ঘরে ঘরেই দাস্ত, তারপরে সব শেষ। একের পর এক লোক মরতে লাগলো, লোক পালাতে লাগলো। সারা গাঁ উজাড় হয়ে গেল।

এই ঘটনা কেবল আজকের নয়, কেবল বাংলা দেশেরই নয়, এই ঘটনা পৃথিবীর বহু দেশের। আদিম যুগ থেকে আজ পর্যন্ত এরকম ঘটনা ঘটেছে, কোন কোন অঞ্চলে এখনও ঘটছে। ইউরোপও এই মহামারীর কবল থেকে কিছুদিন আগে পর্যন্ত মুক্ত ছিল না। তবে পৃথিবীর আর্দ্র ও উষ্ণ অঞ্চলেই এই রোগের প্রকোপ সবচেয়ে বেশী হয়ে থাকে। কলেরা বা ওলাওঠার জীবাণুর বৃদ্ধি ও বিকাশের পক্ষে ঐ পরিবেশই সবচেয়ে অনুকূল। ৪৪ বছর আগে এই রোগ সমগ্র পৃথিবীতে মহামারীরূপে দেখা দিয়েছিল। তখন ভারতের গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র নদের উপত্যকাবাসীরা এই রোগে আক্রান্ত হয়েছিল। এ হলো ১৮৯৯ সালের কথা। ১৯২২ সালের মধ্যে সেই মহামারীর প্রকোপের উপশম ঘটে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পূর্ব ও পশ্চিম উপকূলেও ঐ সময়ে এই রোগের ছোঁয়া লেগেছিল।

আজ আবার এই রোগের সমগ্র বিশ্বেই মহামারীরূপে প্রাদুর্ভাবের আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। এই মারাত্মক শত্রুর বিরুদ্ধে মানুষের সংগ্রামের ইতিহাস যতটুকু জানা আছে, তাতে মনে হয় এ হবে ওলা দেবীর সপ্তম আবির্ভাব।

এই রোগটি যে আবার প্রায় অর্ধশতাব্দী পরে মহামারীরূপে আত্মপ্রকাশ করবে, তা তো কল্পনাও করা যায় না। আর এই যুগে একটি মাত্র ভ্রাম্যমান পথিক সমগ্র পৃথিবীতে যে কত দ্রুত গতিতে এই রোগটি ছড়িয়ে দিতে পারে, তা একটি বিশেষ ভীতিপ্রদ ব্যাপার।

পল্লী অঞ্চলের কোন ব্যক্তি যখন এই রোগে আক্রান্ত হয়ে থাকে, তখন এই রোগ সংক্রমণের আশঙ্কা তার প্রতিবেশী অথবা পল্লীর মধ্যেই

সীমাবদ্ধ থাকে। কিন্তু বড় বড় সহরে এই রোগ ছড়িয়ে পড়লে বিমানযাত্রীদের মাধ্যমে কয়েক ঘন্টার মধ্যেই বিশ্বের নানা স্থানে এই রোগ সংক্রামিত হবার আশঙ্কা থাকে।

১৮৯৯-১৯২২ সালের পরে নানা ধরণের কলেরা রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটলেও তা মহামারী রূপে দেখা দেয় নি—বেশীর ভাগ স্থলেই আক্রান্ত এলাকায়ই তা সীমাবদ্ধ ছিল। এমন কি, সাম্প্রতিক কালে নিউগিনি থেকে মধ্যপ্রাচ্য এলাকায় এই মহামারী ছড়িয়ে পড়তে ত্রিশ বছর লেগেছে। শাসকবর্গের সতর্কতামূলক ব্যবস্থা অবলম্বনের ফলে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই এই ব্যাধি নিয়ন্ত্রণাধীনে এসেছে। দৃষ্টান্ত হিসাবে তুরস্কের কথা বলা যেতে পারে। ঐ দেশের সরকার গত মে মাসে ৭০ লক্ষ তুর্কী নাগরিকের কলেরা রোগের টিকা দেবার ব্যবস্থা করে। কেবল তাই নয়, পূর্ববর্তী মাসের ভূমিকম্পের পর সেখানে বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহ এবং এই রোগের চিকিৎসা সম্পর্কে চিকিৎসকবর্গের জন্যে বিশেষ শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করে। এছাড়া সংক্রামক ব্যাধি সম্পর্কে দু-জন মার্কিন বিশেষজ্ঞ তাদের এই উদ্যোগে সাহায্য করেন। সাম্প্রতিক কালে অন্যান্য দেশেও, যেমন—ফিলিপাইন্সে ১৯৬২ সালে, জর্ডনে ১৯৬৩ সালে এবং ইরানে ১৯৬৫ সালে সংক্রামক ব্যাধি নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করবার জন্যে মার্কিন বিশেষজ্ঞদের প্রেরণ করা হয়েছিল।

কলেরা রোগের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ঠিক ম্যালেরিয়া রোগের বিরুদ্ধে সংগ্রামের মতই প্রাত্যহিক ব্যাপার। এই রোগ দূরীকরণে, যে সব দেশে ঐ রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটে, কেবলমাত্র সেই সব দেশের সরকারই নয়, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এবং আঞ্চলিক চিকিৎসা কেন্দ্রসমূহও এজন্যে উদ্যোগী হয়ে থাকেন এবং এই ব্যাপারে বিশেষভাবে সাহায্য করে থাকেন।

কিছুদিন হয় এই রোগ নিয়ন্ত্রণ ও নির্মূল করবার জন্যে তথ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে পূর্ব পাকিস্তানে ঢাকা সহরের উপকণ্ঠে একটি গবেষণা কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। সেখানে ৪০০ বিজ্ঞানী এই রোগ নিয়ে গবেগণা করছেন।

তবে একটা কথা, কলেরা রোগ সম্পর্কে আজ যেটুকু আমাদের জানা আছে, হাজার হাজার বছর আগেকার মানুষদের ততটুকুই প্রায় জানা ছিল। যেমন—এই রোগের নিদানসমূহ ভারতে ২৩০০ বছর আগে একটি পাথরের উপর উৎকীর্ণ হয়েছিল। আর এই ভারতেই ৪০০ বছর আগে এই রোগের প্রথম আধুনিক বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাও বিশ্লেষণ করা হয়েছিল। এটি করেছিলেন একজন পর্তুগীজ চিকিৎসক।

কলেরা রোগে রোগীর দেহে যে জলীয় পদার্থ নির্গত হয়, তা পূরণ না করা হলে রোগীর কয়েক ঘন্টার মধ্যে মৃত্যু ঘটে। খাদ্য-পানীয়ের মাধ্যমে মানুষের দ্বারা আন্ত্রিক সংক্রমণের ফলেই এই রোগ দেখা দেয়।

সুতরাং এই রোগের আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা করতে হলে প্রথমেই খাদ্য ও পানীয়ের বিশুদ্ধতা রক্ষার দিকে এবং নদীনালা ও জলসরবরাহের ব্যবস্থা যাতে ওই রোগ-জীবাণুর দ্বারা সংক্রামিত হতে না পারে, তার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখতে হবে। তাছাড়া যে অঞ্চলে ঐ রোগের আশঙ্কা দেখা দেয়, সেখানে সকলেই যাতে কলেরার টিকা নিতে পারে, তারও ব্যবস্থা করতে হবে। কিন্তু এই সব খুবই ব্যয়সাপেক্ষ ব্যাপার। তাহলেও বিশ্বের বিজ্ঞানীমহল এই বিষয়ে মোটেই হতোদ্যম হন নি, তাঁরা এপথে এগিয়ে চলেছেন। কলেরা রোগের টিকা নিলে ছয় মাসের জন্যে এই রোগে আক্রান্ত হবার কোন আশঙ্কা থাকে না। এমন দিন হয়তো আসবে, যখন এমন একটি ঔষধ আবিষ্কার হবে, যা একবার খেলে সারা জীবনেও আর এই রোগের কোন ভয় থাকবে না।

দূরে বহু দূরে

দেবব্রত চট্টোপাধ্যায়

রাতের আকাশের চেহারা খালি চোখে দেখতে সর্বদা প্রায় একই রকম মনে হয়—নক্ষত্রগুলির অবস্থান ও গতিবিধির মধ্যে খুব একটা পরিবর্তন দেখা যায় না। স্বভাবতঃই মনে প্রশ্ন জাগতে পারে—আকাশের চেহারা কি চিরকাল এই রকমই ছিল? বৈজ্ঞানিকেরা এই প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন—আমরা আকাশের যে চেহারা দেখছি, চিরকাল এই রকম ছিল না। অনেক পরিবর্তন হয়েছে, এখনও হচ্ছে এবং ভবিষ্যতেও হবে।

দূরের আকাশের তারকা সম্বন্ধে কোন গবেষণা করতে হলে তারকার আলোর বর্ণালীর অনুশীলন করতে হয়। অবশ্য সূর্য বা তারকা থেকে শুধু আলোই আসে না, আরও অনেক কিছু আসে।

সবাই জানেন, সূর্যের আলো কোন প্রিজমের মধ্য দিয়ে গেলে সাতটি বিভিন্ন রঙের আলোতে বিশ্লিষ্ট হয়ে যায়। ঐ সাতটি রঙের গুচ্ছকে বর্ণালী বলা হয়। সূর্য বা তারকা থেকে বিকিরণের সাহায্যে অন্য আরও অনেক অদৃশ্য আলোক আসে। ঐ সব আলোর সম্মিলিত নাম বিদ্যুচ্চুম্বকীয় তরঙ্গ। এগুলি ইথার তরঙ্গ-রূপে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে পরিচালিত হয়।

যদি কোন উৎস প্রতি সেকেণ্ডে n-টি তরঙ্গ উৎপাদন করে তখন বলা হয়—ঐ তরঙ্গের ফ্রিকোয়েন্সি n। একটি তরঙ্গের শীর্ষ থেকে পরবর্তী তরঙ্গের শীর্ষের দূরত্বকে তরঙ্গের দৈর্ঘ্য বলা হয়। সুতরাং কোন উৎস থেকে প্রতি সেকেণ্ডে যদি n-টি তরঙ্গ উৎপন্ন হয় এবং তরঙ্গের দৈর্ঘ্য যদি x হয়—তাহলে এক সেকেণ্ডে ঐ তরঙ্গের সঞ্চার কত দূর হবে? নিশ্চয়ই nx হবে। nx-কে বলা হয় তরঙ্গের গতি।

সব রকমের বিদ্যুচ্চুম্বকীয় তরঙ্গের গতিবেগ সমান এবং ১,৮৬০০০ মাইল বা ৩×১০¹⁰ সেণ্টিমিটার প্রতি সেকেণ্ডে। এই গতিকে বিজ্ঞানের বইয়ে c-এর দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

যেহেতু c একটি স্থির রাশি (Constant) এবং c অবশ্যই nx-এর সমান, সেহেতু যখন n কমবে তখন x বাড়বে, আর যখন n বাড়বে তখন x কমবে।

যত বিদ্যুচ্চুম্বকীয় তরঙ্গ আছে, তাদের আলাদা আলাদা গুণ ও ধর্ম-বিশিষ্ট হবার একমাত্র কারণ তাদের তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের তফাৎ। যে আলো আমরা দেখতে পাই, সম্পূর্ণ বিদ্যুৎ-চুম্বকীয় তরঙ্গগোষ্ঠীর তা একটি সামান্য ভগ্নাংশ মাত্র।

বিদ্যুচ্চুম্বকীয় তরঙ্গের সম্পূর্ণ তালিকা নীচে দেওয়া হলো।

১নং তালিকা

নাম	ফ্রিকোয়েন্সি প্রতি সেকেণ্ডে	তরঙ্গের দৈর্ঘ্য
কস্‌মিক রশ্মি	10^{23}-এর চেয়ে কম	10^{-11} cm-এর চেয়ে বেশী
গামা রশ্মি	6×10^{20} to 6×10^{18}	10^{-10} to 10^{-8} cm
রঞ্জেন রশ্মি	6×10^{19} to 6×10^{15}	10^{-9} to 10^{-5} cm
আল্‌ট্রাভায়োলেট	2×10^{16} to $7{\cdot}5\times10^{14}$	$1{\cdot}4\times10^{-6}$ to 4×10^{-5} cm
দৃশ্য-রশ্মি (আলো)	$7{\cdot}5\times10^{14}$ to 4×10^{14}	4×10^{-5} to 8×10^{-5} cm
ইন্‌ফ্রা রেড	4×10^{14} to 3×10^{11}	8×10^{-5} to ·04 cm
বেতার তরঙ্গ	10^{13} to 10^{3}	·01 cm to 100 Km

মাউণ্ট উইলসন অবজারভেটরীর জ্যোতির্বিদ ই. হাবল (E. Hubble) সর্বপ্রথম লক্ষ্য করেন যে, দূরবর্তী নক্ষত্রমণ্ডলীর (Galaxies) আলোর বর্ণালী সাধারণ আলোর বর্ণালীর চেয়ে একটু থাকে, সেখান থেকে সামান্য উপরের দিকে ওঠানো। একে বলা হয় রেড সিফ্‌ট্ (Red Shift) (১নং চিত্র দ্রষ্টব্য)।

এর কারণ কি? এটিকে ব্যাখ্যা করবার
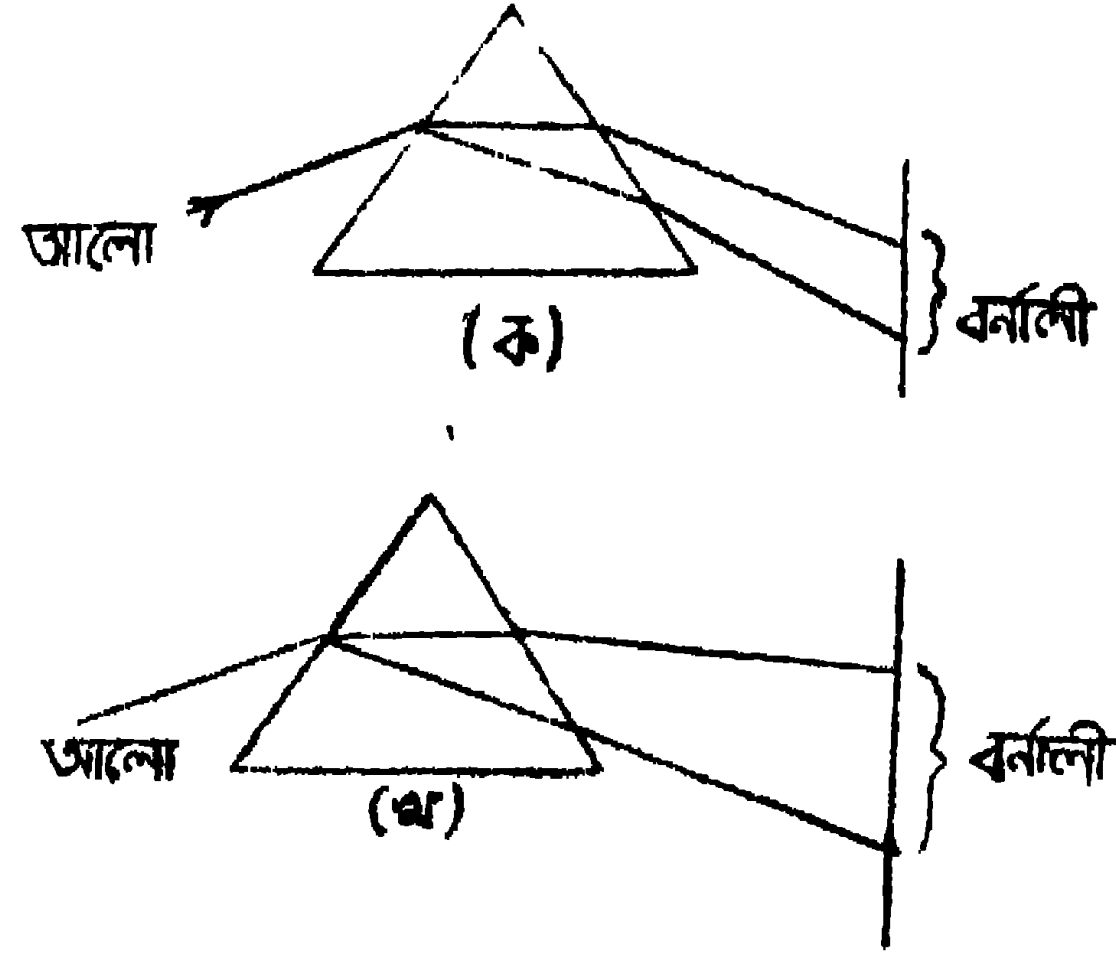
১নং চিত্র
(ক) সাধারণ আলোর বর্ণালী. (খ) দূরের নক্ষত্রমণ্ডলীর আলোর বর্ণালী

অন্য প্রকার। সাধারণ আলোর বর্ণালী যেখানে থাকে, ঐ নক্ষত্রমণ্ডলীর বর্ণালী একটু উপরের দিকে ওঠানো; অর্থাৎ যেখানে লাল আলো একমাত্র উপায়—আমাদের ধরে নিতে হবে যে, দূরের নক্ষত্রগুলি আমাদের পৃথিবী থেকে দূরে সরে যাচ্ছে, কিন্তু এরূপ ধারণা করবার কারণ কি?

২নং তালিকা (আলোর তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য)

আলোর রং	তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য, সেণ্টিমিটারে	ফ্রাকোয়েন্সি
লাল	7.5×10^{-5} to 6.3×10^{-5}	4×10^{14} to 4.8×10^{14}
কমলা	6.3×10^{-5} to 6×10^{-5}	4.8×10^{14} to 5×10^{14}
হলদে	6×10^{-5} to 5.8×10^{-5}	5×10^{14} to 5.2×10^{14}
সবুজ	5.8×10^{-5} to 5.1×10^{-5}	5.2×10^{14} to 5.9×10^{14}
নীল	5.1×10^{-5} to 4.6×10^{-5}	5.9×10^{14} to 6.5×10^{14}
ইণ্ডিগো	4.6×10^{-5} to 4.2×10^{-5}	6.5×10^{14} to 7.1×10^{14}
বেগুনী	4.2×10^{-5} to 4.0×10^{-5}	7.1×10^{14} to 7.5×10^{14}

ব্যাপারটা পুরাপুরি বুঝতে হলে ডপ্‌লার এফেক্ট কি, সেটা বুঝতে হবে। ধরা যাক—একটি জায়গা থেকে চোখে লাল আলো এসে পড়ছে। তখন ইথার তরঙ্গ চোখকে ৪,০০০,০০০,০০০,০০০,০০ থেকে ৪৮০০,০০০,০০০,০০০,০০ বার আঘাত করছে। এখন ধরা যাক—কেউ ঐ আলোর উৎসের দিকে ছুটে চলেছে। যদি তার ছোটবার গতি যথেষ্ট বেশী হয়, তাহলে আলোর তরঙ্গ তার চোখকে আরও তাড়াতাড়ি আঘাত করতে সুরু করবে। এই আঘাত করবার রেট যদি ৪৮০০,০০০,০০০,০০০,০০ বারের চেয়ে বেশী হয়—তখন সে আর লাল

আলো দেখবে না, দেখবে কমলা রং। তার গতিবেগ যদি আরও বেড়ে যায়, অর্থাৎ ইথার তরঙ্গ যদি তার চোখকে ৫,০০০,০০০,০০০,০০০,০০ বারেরও বেশী বার আঘাত করতে সুরু করে, তাহলে লাল আলো-কে তার হলদে হয়ে যেতে পারে। প্রথম অবস্থায় আল্ট্রাভায়োলেট রশ্মিকে বেগুনী রঙের মনে হবে এবং দ্বিতীয় অবস্থায় ইনফ্রা রেডকে লাল বলে মনে হবে।

হাবল যখন দেখলেন যে, দূরের তারকার আলোর বর্ণালীর লাল রং উপরের দিকে ওঠানো—
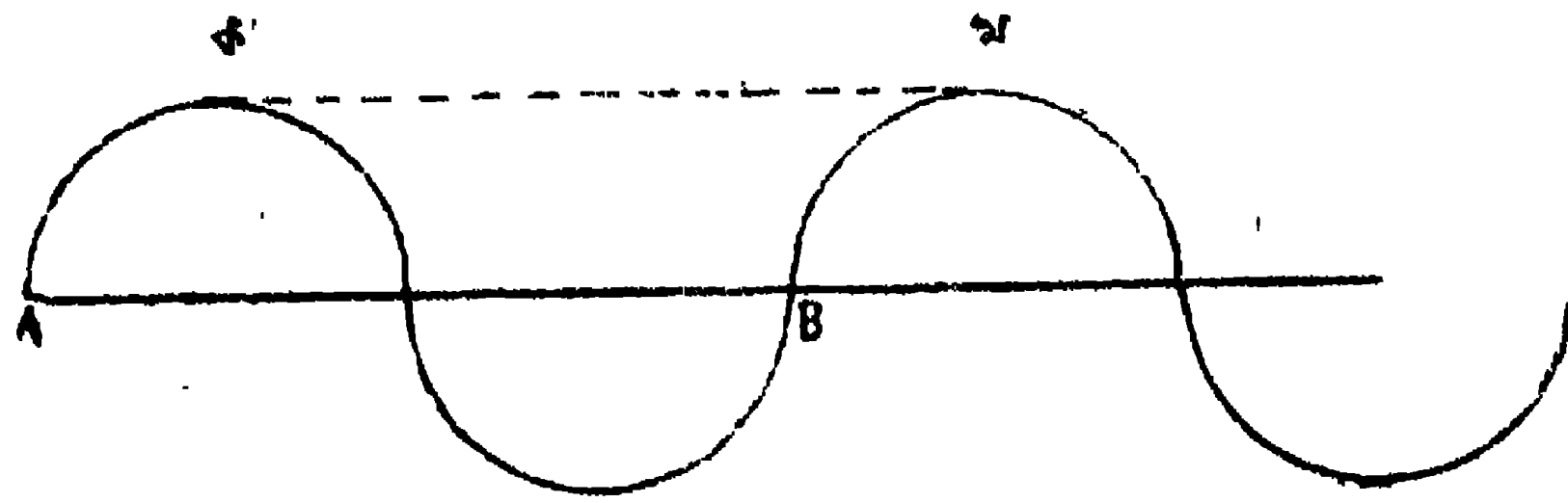
২নং চিত্র
A B একটি পূর্ণ তরঙ্গ। ক খ তরঙ্গের দৈর্ঘ্য

আলো বলে মনে হবে। একে বলে ডপ্‌লার এফেক্ট।

অর্থাৎ ডপ্‌লার এফেক্টের মূল বক্তব্য হলো এই যে, যদি কেউ কোন আলোর উৎসের দিকে ছুটে যায়, তাহলে আলোর রং বদ্‌লাবে। অবশ্যই এজন্যে গতিবেগ যথেষ্ট বেশী হওয়া দরকার।

শুধু তাই নয়, সমস্ত বর্ণালীটাই একটু উপরের দিকে উঠে গেছে, তখন এথেকে তিনি সিদ্ধান্ত করলেন যে, আলোর উৎস দূরে সরে যাচ্ছে; অর্থাৎ দূরের নক্ষত্রমণ্ডলী আমাদের নক্ষত্রমণ্ডলী (ছায়াপথ বা Milky way) থেকে ক্রমাগত দূরে চলে যাচ্ছে। কিন্তু কেন ?

ভাল ভাবে পরীক্ষা করবার পর বোঝা গেছে
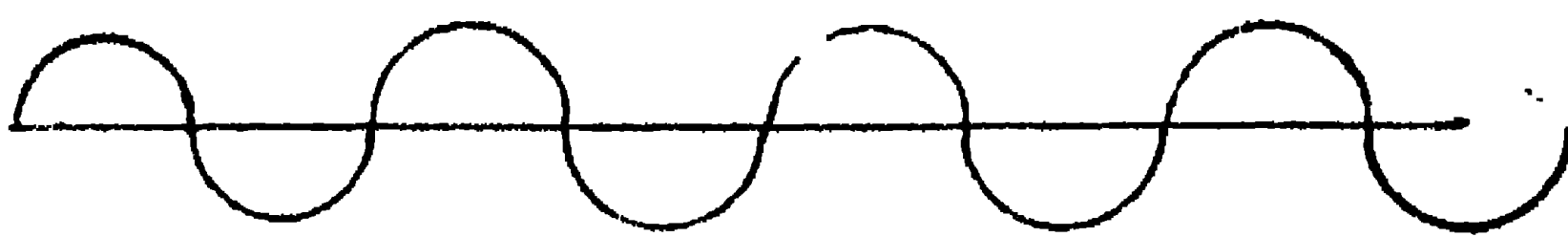
৩নং চিত্র
যদি ২নং চিত্রটি লাল আলোর তরঙ্গ ধরা হয়, তাহলে এটি বেগুনী আলোর তরঙ্গ। বেগুনী আলোর তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য লাল আলোর তরঙ্গের প্রায় অর্ধেক

এর উল্টোটাও হতে পারে; অর্থাৎ উৎসের কাছ থেকে সে যদি দূরে সরে যেতে থাকে, তাহলেও রং বদ্‌লাবে উল্টোদিক থেকে। অর্থাৎ তখন ছোট তরঙ্গের আলোকে বড় তরঙ্গের আলো বলে মনে হবে। তখন হলদে রঙের জায়গায় হয়তো সে কমলা কি লাল রং দেখবে। শুধু তাই নয়—এরকম অবস্থায় অনেক অদৃশ্য তরঙ্গও দৃশ্য-রশ্মির তরঙ্গে পরিণত

যে, আসলে সমস্ত নক্ষত্রমণ্ডলীই একে অন্যের কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। যদি একটা সাধারণ বেলুনকে ফুঁ দিয়ে ফোলানো যায় এবং বেলুনের উপরে যদি কোন নক্সা আঁকা থাকে—তাহলে দেখা যাবে, বেলুনটি ফোলবার সঙ্গে সঙ্গে ঐ নক্সার প্রত্যেকটি অংশই পরস্পরের কাছ থেকে ক্রমশঃ দূরে সরে যাচ্ছে।

সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডই বেলুনের মত ক্রমাগত ফুলে

চলেছে, আর নক্ষত্রগুলি ঐ নক্সার ভিন্ন ভিন্ন অংশের মত একে অন্তের কাছ থেকে ক্রমাগত দূরে সরে যাচ্ছে।

নক্ষত্রমণ্ডলীগুলির গতি এবং যে ভাবে তাদের দূরত্ব বাড়ছে—তাথেকে হিসেব করা গেছে যে, নক্ষত্রগুলির এই দৌড় সুরু হয়েছে মাত্র ২০০ থেকে ৩০০ কোটি বছর পূর্বে।*

এই কাহিনীর সূত্রপাত সেই ২০০ থেকে ৩০০ কোটি বছর আগে সুরু হয়েছিল, যখন কোন অজ্ঞাত কারণে মহাজাগতিক যাবতীয় পদার্থ (অর্থাৎ এখন যা কিছু আকাশে দেখা যায়—সূর্য চন্দ্র, তারকা, ধূমকেতু প্রভৃতি) সবাই এক স্থানে মিলিত হয়ে একটা বিরাট সূর্য তৈরি করেছিল। তখন যে পরিমাণ তাপ ও চাপ উৎপন্ন হয়েছিল, তাতে আমাদের জানা কোন পদার্থের অস্তিত্ব থাকা সম্ভব ছিল না। সেটার মধ্যে ছিল শুধু পদার্থের নিউক্লিয়াসগুলি—বাস্তবিক কোন পদার্থ নয়। বৈজ্ঞানিকদের হিসাব অনুসারে সেই নিউক্লিয়াস গ্যাসের গড় ঘনত্ব ছিল প্রায় ১০০০০০০০০০০০০০ গ্র্যাম প্রতি ঘন সেন্টিমিটার অর্থাৎ প্রায় একশত কোটি কুইন্টাল—প্রতি ঘন সেন্টিমিটার। আর সেই গ্যাস-পিণ্ডের আয়তন ছিল প্রায় আটটি সূর্যের আয়তনের সমান; অর্থাৎ ঐ গোলকের ব্যাস ছিল প্রায় ২ কোটি কিলোমিটার।

অবশ্য এই অবস্থা বেশীক্ষণ স্থায়ী হয় নি। কেন না, ঐ গ্যাসের দ্রুত প্রসারণের জন্যে কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই তার ঘনত্ব জলের সমান হয়ে গিয়েছিল।

প্রায় এই সময়েই ঐ বিরাট গ্যাসের গোলকটি কয়েকটি ভাগে ভেঙ্গে যায়। ঐ ভাগগুলিই পরে ভিন্ন ভিন্ন নক্ষত্রমণ্ডলীর সৃষ্টি করেছে। সেই সময়ে ঐ গ্যাসীয় মেঘ যে গতিতে পরস্পরের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছিল, আজও প্রায় সেই গতিতেই তারা মহাশূন্যের অজ্ঞাত পথে ছুটে চলেছে।

মহাজাগতিক বিবর্তনের এই কাহিনী জানবার পর স্বভাবতঃই আমাদের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে যে, নক্ষত্রমণ্ডলীগুলির এই যে দৌড়, তা কি কখনও থামবে? কিংবা নক্ষত্রগুলি সেই ৩০০ কোটি বছর আগে যেমন এক জায়গায় মিলিত হয়েছিল, সেভাবে মিলিত হবার জন্যে আবার কি ফিরে আসবে আর আমাদের ছায়াপথ, সূর্য, পৃথিবী ও মানব জাতি সকলকে আবার কি সেই রকম নিউক্লিয়ার ঘনত্বের চাপে একটা বিরাট মহাজাগতিক গ্যাস-পিণ্ডে রূপান্তরিত করবে?

যতদূর জানা গেছে, তাতে এই বিষয় আমরা নিশ্চিন্ত থাকতে পারি। বৈজ্ঞানিকদের মতে, নক্ষত্রমণ্ডলী শুধু ক্রমাগত দূরে বহু দূরে চলে যাবে, তাদের কখনও আর ফিরে আসবার কোন সম্ভাবনা নেই। কেন না, তাদের গতিবেগজনিত যে শক্তি (Kinetic energy), তাদের পারস্পরিক গুরুত্বাকর্ষণ শক্তির (Gravitational potential energy) চেয়ে কয়েক শত গুণ বেশী।

অবশ্য জ্যোতির্বিজ্ঞানের মাপজোক খুব বেশী নির্ভুল হয় না। যেমন ১৭ লক্ষ আলোক-বছর দূরের তারকার দূরত্বে ২-৪ কোটি মাইলের ভুল থাকা খুবই সম্ভব। এই অবস্থায় কিছু কাল পরের গণনা ও গবেষণার দ্বারা যদি প্রমাণিত হয় যে, যাবতীয়

---

* হাবলের মূল গণনা অনুসারে:—যে কোন দুটি Galaxi-র গড় দূরত্ব—১৭ লক্ষ আলোক-বর্ষ, অর্থাৎ $১'৬ \times ১০^{১৯}$ কিলোমিটার। তাদের আপেক্ষিক গতি—৩০০ কি. মি. প্রতি সেকেণ্ডে। সুতরাং এই দূরত্ব যেতে সময় লেগেছে

$\frac{১'৬ \times ১০^{১৯}}{৩০০}$ সেকেণ্ড

$= ৫ \times ১০^{১৬}$ সেকেণ্ড

= ১৮০ কোটি বছর

আধুনিক গণনা অনুযায়ী সময় অনেক বেশী।

মহাজাগতিক পদার্থ আবার এক স্থানে মিলিত হবে এবং সমস্ত সৃষ্টি এক প্রচণ্ড চাপে ও তাপে ধ্বংস হয়ে যাবে—তবুও আমাদের চিন্তিত হবার কোন কারণ নেই। কেন না, সেদিন আসতে অন্ততঃ দু'শ কোটি বছর লাগবেই; অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ডের আজকের রূপ তৈরি হতে যত সময় লেগেছে, ধ্বংসের দিন আসতেও অন্ততঃ তত সময় লাগবেই।

সোনা

শ্রীমণীন্দ্রনাথ দাস

সোনা সূর্যের মত উজ্জল ও পীতাভ এবং সাধারণ অবস্থায় অমলিন ধাতু। সম্ভবতঃ আদিম মানব ধাতুর মধ্যে সর্বপ্রথম সোনার অস্তিত্ব আবিষ্কার করে। বোধ হয় নদীর বালিতে হলুদ রঙের উজ্জ্বল স্বর্ণকণিকার প্রতি প্রথম তাহাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছিল। আট হাজার বৎসর আগেকার নবোপলীয় যুগের পাথরের অস্ত্রশস্ত্রের সঙ্গে কিছু কিছু সোনার জিনিষও আবিষ্কৃত হইয়াছে। আয়ার্ল্যাণ্ডে প্রাগৈতিহাসিক যুগের যে সকল প্রত্নদ্রব্যাদি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার মধ্যে প্রচুর পরিমাণে সোনার জিনিষও আছে। মিশরে চকমকি পাথরের তৈয়ারী যে ছোরা পাওয়া গিয়াছে, তাহার হাতল সোনা দিয়া মোড়া। খৃষ্টের জন্মের ১৩৫০ বৎসর পূর্বেকার মিশরের রাজা তুতানখামেনের যে শবাধার পাওয়া যায়, তাহা সুবর্ণ নির্মিত। প্রাচীন মিশরে প্রায় চার হাজার বৎসর আগে যে ভাবে সোনা ধোয়া, গলানো ও ওজন করা হইত, তাহার সুন্দর উৎকীর্ণ চিত্র এখনও দেখা যায়। ক্রীট দ্বীপ হইতে একটি সোনার পেয়ালা পাওয়া গিয়াছে, যাহা প্রায় সাড়ে তিন হাজার বৎসরের পুরাতন। প্রাচীন সুমেরীয় জাতির শিল্পকলার নিদর্শনস্বরূপ পাঁচ হাজার বৎসর পূর্বেকার একটি সোনার তৈয়ারী গরুর শিং ও একটি স্বর্ণমণ্ডিত শিরস্ত্রাণ পাওয়া গিয়াছে। গ্রীস দেশে লিডিয়ার রাজা ক্রিসাসের (খৃঃ পূঃ ৫৬০—৫৪৬) একটি স্বর্ণমুদ্রা ও মাইসিনি হইতে একটি সোনার মুখোস সংগ্রহ করা হইয়াছে। সোভিয়েট রাশিয়ার অন্তর্গত ইউক্রেনের এক জায়গা খনন করিয়া আড়াই হাজার বৎসর আগেকার একটি সুদৃশ্য সোনার চিরুণী বাহির করা হইয়াছে।

ভারতবর্ষে মহেঞ্জোদাড়ো ও হারাপ্পা হইতে পাঁচ হাজার বৎসর পূর্বেকার সোনার পুঁতির মালা আবিষ্কার করা হইয়াছে। ঋগ্বেদে স্বর্ণনির্মিত অলঙ্কারের মধ্যে হার, কঙ্কন, কুণ্ডল ও মলের উল্লেখ পাওয়া যায়। চম্পারন জেলায় লৌরিয়া নন্দনগড় হইতে একটি সমাধি স্থান খনন করিয়া বৈদিক কালের এক ইঞ্চি লম্বা একটি স্বর্ণপত্র উদ্ধার করা হইয়াছে। ইহার গায়ে একটি উপবিষ্ট নারীমূর্তি খোদিত আছে। মেগাস্থিনিসের ভারত বিবরণ হইতে জানা যায় যে, রাজা চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য (খৃঃ পূঃ ৩২৩—২৯৯) যাতায়াতের জন্য সুবর্ণনির্মিত পাল্কী ব্যবহার করিতেন। সেই সময়কার সাধারণ বিপণীতেও স্বর্ণপাত্র বিক্রয় করা হইত। মৌর্য যুগের একাধিক স্বর্ণমুদ্রা পাটনা মিউজিয়ামে সংরক্ষিত হইয়াছে। আফগানিস্থানের বিমারণ হইতে একটি তিন ইঞ্চি উচ্চ স্বর্ণাধার আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহা খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর বলিয়া অনুমিত হয়। ইহার গায়ে বুদ্ধদেব ও তাঁহার শিষ্যবর্গের মূর্তি উৎকীর্ণ আছে। তক্ষশীলায়

খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর লাল পাথর বসানো একটি সোনার হার পাওয়া গিয়াছে।

সিরিয়া দেশে প্রাপ্ত একটি স্বর্ণকলস খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীর বলিয়া বিশেষজ্ঞেরা অনুমান করেন। সাইপ্রাস দ্বীপে যে স্বর্ণদণ্ড পাওয়া গিয়াছে, তাহা খৃষ্টপূর্ব দ্বাদশ শতাব্দীতে নির্মিত। চীনদেশ হইতে আড়াই হাজার বৎসর আগেকার চৌ রাজবংশের আমলের একটি চার ইঞ্চি লম্বা সুবর্ণনির্মিত ছোরার হাতল সংগৃহীত হইয়াছে। মেক্সিকো হইতে প্রাচীন বসন্ত দেবতার একটি স্বর্ণ মূর্তি সংগ্রহ করা হইয়াছে। পেরু দেশ হইতে স্প্যানিয়ার্ডগণ সুবর্ণনির্মিত বহু অলঙ্কার, আধার, মুকুট ও সূর্য মূর্তি বলপূর্বক সংগ্রহ করিয়া স্বদেশে প্রেরণ করে। ১৪৯২ খৃষ্টাব্দে কলম্বাসের আমেরিকা আবিষ্কারের সময় হইতে ১৬০০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত দক্ষিণ আমেরিকা হইতে এই ভাবে ৮০০০০০০ আউন্স সোনা ইউরোপে রপ্তানী হয়। সোনার লোভে কত যে অভিযান, যুদ্ধ-বিগ্রহ এবং অপরাধ অনুষ্ঠিত হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই।

অমৃতসরে শিখদের স্বর্ণমন্দির অনেকেই দেখিয়াছেন। পাঞ্জাব কেশরী মহারাজ রণজিৎ সিং যে পালঙ্কে শয়ন করিতেন, তাহা নিরেট সোনায় তৈয়ারী হইয়াছিল। সুপ্রসিদ্ধ জ্যোতির্বিজ্ঞানী টাইকো ব্রাহী (১৫৪৬-১৬০১) এক দ্বন্দ্ব যুদ্ধে আহত হইবার পর নিজের নাক সোনা দিয়া বাঁধাইয়া লইয়াছিলেন। রোমান ক্যাথলিকদের সর্বাধিনায়ক ইটালীর পোপ ঈষ্টারের পূর্বে কখনও কখনও কোন বিশিষ্ট ব্যক্তি, সম্প্রদায় বা চার্চকে একটি সুন্দর সোনার গোলাপ ফুল উপহার দিয়া আশীর্বাদ করিয়া থাকেন।

সোনাই সমস্ত ধাতুর মধ্যে শ্রেষ্ঠ। সেই জন্য বাইবেলে প্রথমেই সোনার উল্লেখ আছে। অথর্ববেদে একটি শ্লোকে বলা হইয়াছে—সূর্য প্রদত্ত স্বর্ণ উজ্জ্বল বর্ণবিশিষ্ট—যাহারা ইহা ব্যবহার করে, তাহারাও দীর্ঘায়ু হয়। ঋষি বাৎস্যায়ন দেড় হাজার বৎসর পূর্বে তাঁহার লিখিত গ্রন্থে অবশ্য-শিক্ষণীয় চৌষট্টি কলার মধ্যে সুবর্ণরত্ন পরীক্ষার কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। সোনার ল্যাটিন নাম 'অরাম', মানে উজ্জ্বল ঊষা। সংস্কৃত সাহিত্যেও সোনার অনেকগুলি নাম আছে, যথা—কণক, কাঞ্চন, চামীকর, জাম্বুনদ, তপনীয়, রুক্ম, শাতকুম্ভ, সুবর্ণ, স্বর্ণ, হিরণ্য, হেম ইত্যাদি।

খৃষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে সিসিলির সুপ্রসিদ্ধ গ্রীক গণিতজ্ঞ ও বৈজ্ঞানিক আর্কিমিডিস সর্বপ্রথম সোনার আপেক্ষিক গুরুত্ব নির্ধারণ করেন। তৎকালীন সোনার তৈয়ারী একটি রাজমুকুটে কতটা খাদ আছে, তাহা তিনি জলের সাহায্যে কিভাবে নির্ণয় করিয়াছিলেন, সে কথা অনেকেই জানেন। খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে প্লিনি তাঁহার গ্রন্থে পারদের সহায়তায় খনিজ পদার্থ হইতে স্বর্ণ নিষ্কাশনের পদ্ধতির কথা বিস্তারিতভাবে বিবৃত করিয়াছেন। ইহা ছাড়া তিনি নায়ারদের দেশ মালাবারে যে বহু স্বর্ণখনি অবস্থিত, তাহারও উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। প্রাচীন গ্রীক ও রোমান লেখকদের মধ্যে হেরোডোটাস (খৃঃ পূঃ ৪৮৪—৪২৪), প্লিনি ও ষ্ট্রাবো (খৃষ্টীয় ১ম শতাব্দী) একটি বহু প্রচলিত ভারতীয় কাহিনীর বিবরণ দিয়া গিয়াছেন। সে যুগে কোন কোন পর্বতের সানুদেশে পিপীলিকারা পর্বত খুঁড়িয়া যে মৃত্তিকা উত্তোলন করিত, তাহার সহিত অনেক সময় স্বর্ণকণিকাও উঠিয়া আসিত। প্রাচীন যুগে কাশ্মীরের এক জাতি যে রাজস্ব হিসাবে স্বর্ণচূর্ণ প্রদান করিত, তাহারও প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে।

সমস্ত পৃথিবীতে গড়ে শতকরা প্রায় '০০০০০০৫ ভাগ সোনার অস্তিত্ব রহিয়াছে। প্রতি টন সমুদ্র-জলে প্রায় '০৫ মিলিগ্র্যাম পরিমিত সোনা থাকে। সপ্ত সমুদ্রের জলে প্রায় ২১০ লক্ষ টন সোনা মজুদ আছে বলিয়া অনুমিত

হয়। প্রাণী ও উদ্ভিদের ভস্মেও অতি সামান্য পরিমাণ সোনা বর্তমান। কোন কোন কয়লার ছাইয়ে প্রতি টনে এক গ্র্যাম পরিমাণ সোনা থাকে। যে সকল নদীতে স্বাভাবিকভাবে ক্লোরিন বিদ্যমান, সে সকল নদীর জলে সহজেই কিয়ৎ পরিমাণ সোনা গলিয়া গিয়া মিশিয়া থাকে এবং এই স্বর্ণমিশ্রিত জল গাছপালা শিকড়ের সাহায্যে শোষণ করিয়া লয়। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় দেখা গিয়াছে—ভুট্টার দানায় এইভাবে সামান্য পরিমাণ সোনা সঞ্চিত হইয়া থাকে। পৃথিবীর উপরিভাগে সাধারণ মাটি-পাথরেও প্রতি টনে '০০৫ গ্র্যাম মাত্রায় সোনা আছে। সাধারণতঃ সোনা স্ফটিক প্রস্তরের সঙ্গে গ্রথিত বা মিশ্রিত অবস্থায় থাকে। স্বর্ণযুক্ত স্ফটিকের রং হল্‌দে কিম্বা নীলাভ ধূসর হইয়া থাকে। এই রকম স্বর্ণযুক্ত স্ফটিক প্রস্তর যখন প্রাকৃতিক কারণে চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া জলস্রোতের সঙ্গে নদীপথে নিম্নভূমিতে ছড়াইয়া পড়ে, তখন নদীর তীরবর্তী বালি ও পলি হইতে কিয়ৎ পরিমাণ সোনা পাওয়া যায়। সচরাচর খনি হইতে যে সকল সোনা উত্তোলিত হয়, তাহার সহিত প্রায়ই স্বর্ণমাক্ষিক (Iron pyrites), গন্ধকঘটিত সীসা ও তামা থাকে। গোল্ড টেলুরাইড নামক খনিজে শতকরা প্রায় ৪৩ ভাগ সোনা থাকে। খনিজ সোনার সঙ্গে সাধারণতঃ শতকরা প্রায় ১৬ ভাগ রৌপ্য থাকে। রূপার পরিমাণ সমান সমান হইলে রং সাদা হয়, তখন ইহাকে ইলেকট্রাম বলা হয়। অষ্ট্রেলিয়ায় বিসমাথ মিশ্রিত একরকম কৃষ্ণবর্ণের সোনা পাওয়া যায়। সূক্ষ্ম স্বর্ণকণা এক মিলিমিটারের সহস্রাংশ পর্যন্ত ছোট হইতে পারে, আবার অন্য দিকে ক্যালিফোর্নিয়াতে এক ইঞ্চি পরিমিত সোনার কৃষ্ট্যালও পাওয়া গিয়াছে। অষ্ট্রেলিয়ায় ১৮৫৮ সালে ১৮৪ পাউণ্ড ওজনের এক বিরাট স্বর্ণখণ্ড পাওয়া গিয়াছিল এবং ১৮৬৯ সালে সেই দেশ হইতে ১৯০ পাউণ্ড ওজনের আর একটি সোনার চাঁইও সংগৃহীত হইয়াছিল। কালগুর্লির স্পঞ্জ সোনা ৯৯'৯% বিশুদ্ধ। পূর্বকালে মেষচর্ম কিম্বা কম্বলের মধ্যে স্বর্ণকণা মিশ্রিত বালুকা জলে ধুইয়া লোকে স্বর্ণ নিষ্কাশন করিত। এই প্রক্রিয়ার ফলে ভেড়ার লোমের ভিতর স্বর্ণরেণু আটকাইয়া যাইত। কাঠের গামলার মধ্যে সোনা মিশ্রিত নদীর বালি জলে অনেকক্ষণ ধরিয়া বার বার ধৌত করিলে ভারী স্বর্ণকণা পাত্রের নীচে জমা হইয়া পড়ে এবং হাল্‌কা বালি জলস্রোতের সঙ্গে বাহির হইয়া যায়। আজকাল খাঁজকাটা সুদীর্ঘ নালীর মধ্যে স্বর্ণকণাযুক্ত বালি রাখিয়া তাহার উপর প্রবল জলধারা প্রয়োগ করা হয়। সোনার কণিকাগুলি অপেক্ষাকৃত গুরুভার হইবার ফলে তলায় গিয়া জমা হয় এবং লঘু বালুকা ও প্রস্তরকণা ধুইয়া জলপ্রবাহের সহিত বাহিরে চলিয়া আসে। পারা এবং পটাসিয়াম সায়ানাইডের জলে সোনা দ্রবণীয়। এই কারণে খনিজ পদার্থ হইতে স্বর্ণ নিষ্কাশন করিবার জন্য এই পদার্থ দুইটির সাহায্য লওয়া হইয়া থাকে। প্রথমে স্বর্ণযুক্ত স্ফটিক প্রস্তর চূর্ণ করিয়া পারদের প্রলেপ দেওয়া বড় বড় তামার চাদরের উপর দিয়া জলের সাহায্যে স্রোতের মত প্রবাহিত করান হয়। এই প্রক্রিয়ার ফলে স্বর্ণকণিকা পারদের সঙ্গে যুক্ত হইয়া যায়। সেই সমস্ত পারদ চাঁচিয়া লইয়া পাতন যন্ত্রে উত্তপ্ত করা হয়। উত্তাপ প্রয়োগের ফলে পারদ বাষ্পাকারে বাহির হইয়া গিয়া অন্য পাত্রে জমা হয় এবং পাতন যন্ত্রে শুধু সোনা পড়িয়া থাকে অথবা স্বর্ণযুক্ত খনিজ প্রস্তর চূর্ণ করিয়া শতকরা এক ভাগ পটাসিয়াম সায়ানাইডের জলে নিমজ্জিত করা হয়। ইহার ফলে সোনা রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় দ্রবীভূত হইয়া যায়। পরে এই জলে দস্তাচূর্ণ নিক্ষেপ করিলে সোনা পৃথক হইয়া আসে। অতঃপর এই সোনা বৈদ্যুতিক পদ্ধতির সাহায্যে আরও বিশুদ্ধ করা হয়।

সোনার পারমাণবিক ওজন ১৯৭.২ এবং ইহার আপেক্ষিক গুরুত্ব ১৯.৩২। ১০৬৩° সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় সোনা গলিয়া যায়। তরল সোনার রং ঈষৎ সবুজ। ২৬০০° সেন্টিগ্রেড তাপ-মাত্রায় সোনা ধীরে ধীরে ফুটিতে আরম্ভ করে ও বেগুনী বর্ণের বাষ্পে পরিণত হয়। সমস্ত স্বর্ণ-সংশোধনাগার ও সোনার কারখানার চিম্‌নি ঝাড়িয়া মধ্যে মধ্যে বেশ কিছু পরিমাণ সোনা উদ্ধার করা হইয়া থাকে। সোনার গড় আপেক্ষিক তাপ .০৩১২, প্রতি এক ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড তাপ প্রয়োগের ফলে সোনা .০০০০১৪ ভাগ রেখাকারে প্রসারিত হয়। খাঁটি সোনার কাঠিন্য ২.৫ হইতে ৩ অবধি হইয়া থাকে। সেই জন্য ইহার উপর নখের আঁচড় কাটা অসম্ভব নয়। সোনার বিদ্যুৎ-পরিবহন ক্ষমতা .৭০০ সি-জি-এস মাত্রা। এই পরিমাপে রূপা ও তামার বিদ্যুৎ-পরিবহন ক্ষমতা যথাক্রমে .৯৭৪ ও .৯১৮। সোনা বিলক্ষণ ঘাতসহ, মাত্র এক গ্রেণ সোনা পিটাইয়া ছয় বর্গফুট বিস্তৃত সোনার পাত্‌ করা সম্ভব। দুইটি কোমল বৃষচর্মের মাঝখানে সামান্য সোনা রাখিয়া উত্তমরূপে পিটাইতে থাকিলে এক ইঞ্চির প্রায় তিন লক্ষ ভাগের এক ভাগ পাত্‌লা পাত্‌ প্রস্তুত করা যায়। এক আউন্স ওজনের সোনা হইতে প্রায় পঞ্চাশ মাইল লম্বা তারা টানা সম্ভব। খুব পাত্‌লা সোনার পাতের মধ্য দিয়া সবুজ ও বেগুনী আলো অনায়াসে যাতায়াত করিতে পারে।

সোনার রাসায়নিক গুণাবলী আলোচনা করিলে দেখা যায়, বাতাসের অক্সিজেন কোন অবস্থাতেই সোনার উপর ক্রিয়াশীল হয় না। এক ভাগ নাইট্রিক অ্যাসিড ও তিন ভাগ হাইড্রো-ক্লোরিক অ্যাসিডে সোনা সহজেই দ্রবীভূত হইয়া যায়। কাজেই এই অ্যাসিড মিশ্রণকে অ্যাকোয়া রিজিয়া বলা হইয়া থাকে। ইহা ছাড়া ক্লোরিন, ব্রোমিন ও আয়োডিন মিশ্রিত জলে সোনা দ্রবীভূত হয়। ফুটন্ত ফেরিক ক্লোরাইড সলিউশন ও উত্তপ্ত সেলেনিক অ্যাসিড সোনাকে ক্ষয় করিয়া থাকে। ম্যাঙ্গানিজ ডাইঅক্সাইড ও পটাসিয়াম পার্ম্যাঙ্গানেট প্রভৃতি অক্সিজেনবহুল রাসায়নিক পদার্থসমূহ সোনাকে আক্রমণ করিতে পারে। পারদ ও পটাসিয়াম সায়ানাইড দ্রবে সোনা যে গলিয়া যায়, তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। শতকরা .০১ ভাগ গোল্ড ক্লোরাইড দ্রবণে যদি কয়েক ফোঁটা তার্পিন কিম্বা ফর্মালডিহাইড অথবা ফস্‌ফরাস যোগ করা যায়, তাহা হইলে এই দ্রবণ চুনীর মত রক্তবর্ণ ধারণ করে এবং উহার মধ্যে সূক্ষ্ম স্বর্ণকণা ইতস্ততঃ ভাসিয়া বেড়ায়। ১৮৫৭ সালে ফ্যারাডে ব্যাপারটি লক্ষ্য করেন এবং তখন হইতে ইহাকে ফ্যারাডের সোনা বলা হইয়া থাকে। দুই রকম টিন ক্লোরাইড সলিউশনের সঙ্গে যদি যৎসামান্য গোল্ড ক্লোরাইড মিশ্রিত করা হয়, তবে রাসায়নিক প্রতিক্রিয়ার ফলে এই দ্রবণ রক্তাভ বেগুনী বর্ণ ধারণ করে আর জলযুক্ত টিন অক্সাইডের কণা পৃথক হইয়া গিয়া সূক্ষ্ম স্বর্ণাণু বহন করিয়া বেড়ায়। এই সুন্দর রাসায়নিক পদার্থকে ক্যাসিয়াসের বেগুনী রং বলা হয়, কারণ ১৬৮৫ সালে বৈজ্ঞানিক ক্যাসিয়াস ইহার প্রস্তুত প্রণালী প্রথম প্রকাশ করেন। যদি কোন স্বর্ণ-দ্রবণ বা গোল্ড অক্সাইডের উপর তীব্র অ্যামোনিয়া প্রয়োগ করা হয়, তাহা হইলে রাসায়নিক প্রতি-ক্রিয়ার ফলে এক প্রকার হরিৎ বর্ণের বিস্ফোরক পদার্থ উৎপন্ন হইয়া থাকে। ইহাকেই ফুল্মিনেটিং গোল্ড বলা হয়। শুষ্ক হইলে এই পদার্থ সামান্য ঘর্ষণ, উত্তাপ বা আঘাত প্রয়োগেই প্রচণ্ড বেগে বিস্ফোরিত হয়।

স্বর্ণঘটিত অন্যান্য রাসায়নিক পদার্থের মধ্যে গোল্ড ক্লোরাইড, ব্রোমাইড, আয়োডাইড, অক্সাইড, হাইড্রক্সাইড, সালফাইড, সালফেট ও অ্যাসিডোনাইট্রেট উল্লেখযোগ্য।

সোনার বিশেষত্ব নির্দেশক গুণাবলীর মধ্যে

ইহার ঘাতসহনশীলতা ও আপেক্ষিক গুরুত্ব বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রতি বর্গ ইঞ্চি সোনা প্রায় ৭ টন ওজনের টান সহ্য করিতে পারে। ইহা ছাড়া সোনা তীব্র অ্যাসিড প্রয়োগেও অমলিন ও উজ্জ্বল থাকে, কিন্তু পিতল বা স্বর্ণসদৃশ যে কোন মিশ্রধাতু তীক্ষ্ণ অম্লের সংস্পর্শে আসিলেই সঙ্গে সঙ্গে বিবর্ণ হইয়া গলিয়া যায়। আধুনিক রাসায়নিক ক্রিয়া-পদ্ধতি এতই সূক্ষ্ম যে, কোন পদার্থের ভিতর একশত কোটির মধ্যে এক ভাগ মাত্র সোনা থাকিলেও তাহা নির্ভুলভাবে নির্ণয় করা যায়। উত্তপ্ত ও প্রদীপ্ত স্বর্ণের বর্ণালী বিশ্লেষণ করিলে নির্দিষ্ট স্থানে বিশেষত্বব্যঞ্জক রেখার অস্তিত্ব পাওয়া যায়; যেমন—কমলা ও লাল রঙে ৬২৭৮ ও ৫৯৫৭ সংখ্যায়, হলুদে রঙে ৫৮৩৭ ও ৫৬২৬ সংখ্যায়, সবুজ রঙে ৫০৬৫ সংখ্যায়, নীল রঙে ৪৭৯২ ও ৪৪৩৭ সংখ্যায়, বেগুনী রঙে ৪০৬৫ ও ৩৮৯৮ সংখ্যায়। সূর্যের বর্ণালী বিশ্লেষণ করিয়া উহার মধ্যে সোনার অস্তিত্বের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে।

নিখাদ সোনাকে ২৪ ক্যারেট খাঁটি বলিয়া অভিহিত করা হয়, উহার সহিত তামা বা অন্যান্য ধাতু মিশ্রিত করিলে অলঙ্কারাদি গড়িবার উপযোগী কাঠিন্য প্রাপ্ত হয়। এখানে স্বর্ণযুক্ত মিশ্রধাতুর (Alloy) একটি তালিকা দেওয়া হইল।

সোনা		তামার পরিমাণ	আপেক্ষিক গুরুত্ব
২৪	ক্যারেট খাঁটি	০	১৯.৩
২২	„ গিনি	২	১৭.৭
১৮	„	৬	১৫.৪
১৪	„	১০	১৩.৯
৯	„	১৫	১১.৪

সোনার সঙ্গে কখনও কখনও অন্য ধাতু যোগ করিয়া বিভিন্ন বর্ণের উজ্জ্বল মিশ্রধাতু প্রস্তুত করা হয়, যেমন—

বর্ণ	সোনার ভাগ	অন্য ধাতুর অংশ
সবুজ	৩	১ রৌপ্য
লাল	১	১ তামা
নীল	৩	১ ইস্পাত
সাদা	১	১ রৌপ্য

পারদের মধ্যে অন্য ধাতুর দ্রবণকে অ্যামাল-গাম বলা হয়। পূর্বকালে সোনার জল করিতে হইলে প্রথমে দুই ভাগ সোনার সঙ্গে এক ভাগ পারদ মিশাইয়া তামা, রূপা, ব্রোঞ্জ বা পিতলের উপর প্রলেপ দেওয়ার পর ঐ বস্তুকে আগুনের উপর উত্তমরূপে উত্তপ্ত করা হইত। ইহার ফলে পারদ আস্তে আস্তে বাষ্পাকারে উবিয়া যাইত আর বস্তুটির উপর সোনার একটা পাত্‌লা স্তর পড়িত। আজকাল বিদ্যুতের সাহায্যে সোনার প্রলেপ দেওয়া হয়। ১৮০৩ সালে ভল্টার শিষ্য ব্রাগনাটেলি এই প্রক্রিয়া আবিষ্কার করিয়াছিলেন এবং ডি লা রাইভ সর্বপ্রথম ইহার ব্যবহারিক প্রয়োগ করেন। প্রথমে একটি পাত্রে একশত ভাগ জলে এক ভাগ পটাসিয়াম সায়ানাইড ও এক ভাগ গোল্ড সায়ানাইড মিশাইয়া এক প্রকার রাসায়-নিক দ্রবণ প্রস্তুত করিয়া লওয়া হয়। তাহার পর সেই জলের মধ্যে বিদ্যুতাধার হইতে বিদ্যুৎবাহী পজিটিভ তারের প্রান্ত বা অ্যানোডের সহিত একটি সোনার পাত সংলগ্ন করিয়া তাহার প্রায় অর্ধেকের বেশী অংশ ডুবাইয়া রাখিতে হয়। আর নেগেটিভ বা ক্যাথোড প্রান্তে তামা বা রূপার পাত্রাদি সংযুক্ত করিয়া ঐ দ্রবণে ডুবাইয়া কিছুক্ষণ ধরিয়া বিদ্যুৎ সঞ্চালিত করিলেই ঈপ্সিত তাম্র বা রৌপ্য পাত্রের উপর সোনার একটা পাত্‌লা আস্তরণ পড়িয়া যায়।

অলঙ্কার, ঘড়ি ও মুদ্রা প্রস্তুতের কাজে প্রধানতঃ

সোনা ব্যবহৃত হয়। ইহা ছাড়া সোনার বাট তৈয়ার করিয়া ব্যাঙ্কে মজুত রাখা হইয়া থাকে। দাঁত বাঁধাইতে ও ফাউন্টেন পেনের নিব তৈয়ার করিতেও সোনার প্রয়োজন হয়। ফটোগ্রাফি, রেডিও এবং ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং-এ সোনার আবশ্যকতা আছে। ১৯৩০ সালে ডাক্তার ফরেষ্টিয়ার সন্ধিবাতের চিকিৎসায় স্বর্ণঘটিত ঔষধ অরোথায়োম্যালেটের ব্যবহার প্রচলন করেন। তদবধি এই ঔষধটি ঐ রোগে সাফল্যের সহিত ব্যবহৃত হইতেছে। আয়ুর্বেদের মতে, স্বর্ণ শীতল, বলকারক, রসায়ন, চক্ষুষ্যতা, কান্তি ও স্মৃতিপ্রদ, বয়ঃস্থাপক, আয়ু ও মেধা বর্ধক, শোষ, ক্ষয়, উন্মাদ, ত্রিদোষ জ্বরনাশক।

বিশেষজ্ঞদের অভিমত এই যে, সভ্যতার আদিকাল হইতে আধুনিক সময় পর্যন্ত দশ হাজার বৎসরের মধ্যে মানুষ ভূগর্ভ হইতে প্রায় ৫০,০০০ টন স্বর্ণ উদ্ধার করিয়াছে। ১৯৫৪ সালে পৃথিবীর সমস্ত দেশের সম্মিলিত স্বর্ণ উৎপাদনের পরিমাণ প্রায় ৩৫১০০০০০ আউন্স হইয়াছিল। এই পরিমাণ স্বর্ণ ১৩ ঘন ফুট স্থান পরিপূর্ণ করিতে সক্ষম। দক্ষিণ আফ্রিকার ট্র্যান্সভালের অন্তর্গত জোহান্সবার্গের নিকট র‍্যাণ্ড স্বর্ণখনি ১৮৮৭ সালে আবিষ্কৃত হয়। বর্তমান কালে এই স্থান হইতে পৃথিবীর প্রায় এক তৃতীয়াংশ স্বর্ণ সংগৃহীত হইয়া থাকে। এখানকার প্রতি টন স্বর্ণখনিজে আধ আউন্স আন্দাজ সোনা থাকে। অষ্টাদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে ব্রেজিলের সোনার খনির সন্ধান পাওয়া যায়। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে রাশিয়া, ক্যালিফোর্নিয়া ও অষ্ট্রেলিয়ার ভিক্টোরিয়া স্বর্ণখনি আবিষ্কৃত হয় এবং ইহার পঞ্চাশ বৎসর পরেই আলাস্কার স্বর্ণখনি লোকের দৃষ্টিগোচর হয়। মিশরের নীল নদ ও লোহিত সাগরের মধ্যবর্তী অঞ্চলের স্বর্ণখনি এবং এশিয়া-মাইনরের স্বর্ণখনি বহু প্রাচীন কালেই মানুষের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছিল। ইউরোপে ট্রানসিলভানিয়া, চেকোস্লোভেকিয়া ও বলকান রাষ্ট্রে স্বর্ণের অস্তিত্ব আছে। ইহা ছাড়া ইউরাল ও আল্পস্ পার্বত্য অঞ্চলে স্থানে স্থানে স্বর্ণের সন্ধান পাওয়া যায়।

১৯৩১ হইতে ১৯৩৯ সাল পর্যন্ত এই তিন বৎসর গড়ে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ হইতে কি পরিমাণ স্বর্ণ উৎপন্ন হইয়া ছিল, তাহার একটি তালিকা নিম্নে দেওয়া হইল।

দেশ	স্বর্ণোৎপাদনের পরিমাণ
সোভিয়েট রাশিয়া	৫৩ লক্ষ আউন্স
ক্যানাডা	৪৬ ,, ,,
আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র	৪৩ ,, ,,
মেক্সিকো	৮ ,, ,,
কলাম্বিয়া	৫ ,, ,,
ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ	৯ ,, ,,
কোরিয়া	৮ ,, ,,
জাপান	৭ ,, ,,
দক্ষিণ আফ্রিকা	১২২ ,, ,,
দক্ষিণ রোডেসিয়া	৮ ,, ,,
গোল্ড কোষ্ট	৭ ,, ,,
কঙ্গো	৫ ,, ,,
অষ্ট্রেলিয়া	১৫ ,, ,,
ভারতবর্ষ	৩·৪ ,, ,,

এই সময়ের মধ্যে সমস্ত পৃথিবীতে মোট স্বর্ণ উৎপাদনের পরিমাণ ৩৭৭ লক্ষ আউন্স।

১৯৫৩-৫৪ সালে সারা পৃথিবীতে স্বর্ণ উৎপাদনের হার এইরূপ ছিল—

দক্ষিণ আফ্রিকা	৫২%
ক্যানাডা	১৭%
আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র	৭%
অষ্ট্রেলিয়া	৪%
ঘানা	৩%
দক্ষিণ রোডেসিয়া	২%

ফিলিপাইন	২%
মেক্সিকো	২%
কলাম্বিয়া	২%
অন্যান্য	৯%
	১০০%

১৯২৯ সালে সমস্ত পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ হইতে প্রায় ৪৩০০০০০০ আউন্স স্বর্ণ উৎপাদিত হইয়াছিল।

দেশ	উৎপাদনের হার
দক্ষিণ আফ্রিকা	৫০%
সোভিয়েট রাশিয়া	২৫%
ক্যানাডা	১০%
আমেরিকার যুক্তরাজ্য	৪%
অষ্ট্রেলিয়া	২·৫%
ঘানা	২·৫%
অন্যান্য	৬%
	১০০%

যদি কোন দেশে সব সময় সেখানকার প্রচলিত মুদ্রার অনুপাতে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ স্বর্ণ সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়, তাহা হইলে ইহাকে স্বর্ণমান বলা হয়; অর্থাৎ এক্ষেত্রে যে কোন সময় নির্দিষ্ট মাত্রার সোনার পরিবর্তে নির্দিষ্ট সংখ্যক ব্যাঙ্ক নোট বিনিময় করা সম্ভব। আন্তর্জাতিক অর্থের মানদণ্ড হিসাবে সোনার চাহিদা চিরকাল থাকিয়া যাইবে বলিয়া মনে হয়। বর্তমান কালে প্রায় অর্ধেক সোনা আমেরিকার যুক্তরাজ্যের জাতীয় ভাণ্ডারে সঞ্চিত আছে। এখনও আন্তর্দেশীয় ঋণ পরিশোধ সোনার সাহায্যেই করা হইয়া থাকে।

ভারতে কোলার স্বর্ণখনি মহীশূর রাজ্যের পূর্বপ্রান্তে অবস্থিত। এই স্থান মাদ্রাজ হইতে ১২৫ মাইল পশ্চিমে ও সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ২৮০০ ফুট উচ্চে অবস্থিত। ১৮০২ সালে ওয়ারেন সর্বপ্রথম এই দেশের স্বর্ণ সংগ্রহ-পদ্ধতির প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এখানকার খনিজ পদার্থে স্বর্ণকণার পরিমাণ এত কম যে, খালি চোখে মোটেই দেখা যায় না। প্রতি টন স্বর্ণখনিজে প্রায় ১৬০ গ্রেণ পরিমাণ সোনা থাকে। ১৯৫৩ সালে উরগাঁও কোলার খনির গভীরতা এক স্থানে ৯৮৭৬ ফুট পর্যন্ত হইয়াছিল। সেই সময় ইহা পৃথিবীর মধ্যে নিম্নতম খনি ছিল। এখানকার স্বর্ণোৎপাদন সর্বাপেক্ষা বেশী হইয়াছিল ১৯০৫ সালে। এই বৎসর এখান হইতে ৬১৬,৭৫৮ আউন্স স্বর্ণ উত্তোলন করা হয়। ১৯৬৩ সালে কোলার খনি হইতে ৪:০৫ কিলোগ্র্যাম সোনা সংগ্রহ করা হয়। ইহা ছাড়া হায়দরাবাদ প্রদেশে হুট্টি অঞ্চলে, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর ধারওয়ার জেলায় এবং ছোটনাগপুরে লওয়া নামক স্থান হইতে কিছু কিছু সোনা আহরণ করা হয়। ডাঃ ম্যাক্লারেন বিশেষরূপে অনুসন্ধান করিয়া ১৯০৩ সালে এই অভিমত প্রকাশ করিয়া যান যে, ভারতের বিভিন্ন নদীর পলিমাটি ও বালিতে সচরাচর যে পরিমাণ সোনা থাকে, সেই রকম পৃথিবীর খুব কম দেশেই দেখা যায়। ছোটনাগপুরে সুবর্ণরেখা ও অন্যান্য অনেক নদীর বালিতেই গড়ে প্রতি ঘনগজে এক হইতে দুই গ্রেণ হিসাবে সোনা আছে। এতদ্ব্যতীত হিমালয় প্রদেশের সিমলা. গাড়োয়াল, কাঙড়া ও কুমায়ুন অঞ্চলের অনেক নদনদী এবং আসামে ব্রহ্মপুত্রের শাখা নদীর পলিমাটিতে সোনার রেণু আছে। এই সকল জায়গার শ্রমিক ও কৃষিজীবী অধিবাসীরা অতিরিক্ত আয়ের জন্য শীতকালে নদীর তীরবর্তী পলিমাটি ধুইয়া প্রতি বৎসর এখনও সামান্য পরিমাণ সোনা সংগ্রহ করিয়া থাকে। দাক্ষিণাত্য ও উড়িষ্যার একাধিক নদীর বালিতে এই রকম স্বর্ণকণার অস্তিত্ব আছে। গাড়োয়ালের সোনা নদী ও খারসোয়ানের সোনা নদী এবং উড়িষ্যার ব্রাহ্মণী নদী এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। শোন নদীর প্রাচীন নাম হিরণ্যবাহ। খুব সম্ভব সে

যুগে ইহার বালুকা হইতে স্বর্ণ আহরণ করা হইত।

মধ্য যুগে অ্যালকেমিষ্টরা নিম্নশ্রেণীর ধাতু হইতে স্বর্ণ প্রস্তুতকরণের উপায় আবিষ্কার ও পরশ পাথরের অনুসন্ধানে অনেক পরিশ্রম, সময় ও অর্থব্যয় করিয়াছিল। তাহারা লৌহ-গন্ধক-ঘটিত খনিজ স্বর্ণমাক্ষিক ও সীসা একত্র করিয়া অস্থিভস্মের আধারে উত্তপ্ত করিত এবং উহার উপর দিয়া প্রবল বেগে বায়ুপ্রবাহ প্রয়োগ করিত। ইহার ফলে কিছুক্ষণ পরে ঐ লৌহ ও সীসা প্রচণ্ড অক্সিজেন প্রবাহে একযোগে বিদূরিত হইত আর পাত্রের তলায় শুধু ছোট্ট একটি সোনার দানা পড়িয়া থাকিতে দেখা যাইত। বলা বাহুল্য, স্বর্ণমাক্ষিকে সাধারণতঃ স্বাভাবিকভাবেই যৎ-সামান্য সোনা বিদ্যমান থাকে। অ্যালকেমিষ্টরা আর একটি উপায়ে সোনা তৈয়ার করিয়া দেখাইত। একটি ফাঁপা লোহার নলে পূর্ব হইতে গোপনে স্বর্ণচূর্ণ ভর্তি করিয়া রাখিত এবং তাহার মুখ মোম দিয়া বন্ধ করিয়া কোন উত্তপ্ত পাত্রের ভিতর তরল দ্রব্য-সামগ্রীর মধ্যে নাড়াচাড়া করিত। অল্পক্ষণ পরেই নলের মোম গলিয়া যাইত আর সকলের অজ্ঞাতসারে সুবর্ণকণা পাত্রের অভ্যন্তরে স্থান লাভ করিত। তাহাদের অন্য আর একটি কৌশল ছিল এই যে, প্রথমে অর্ধেক লৌহ ও অর্ধেক স্বর্ণ দিয়া প্রস্তুত একটি পেরেক লইয়া তাহাতে উত্তমরূপে কালো বার্ণিশ প্রলেপ লাগানো হইত। তাহার পর এই পেরেক লইয়া কোন পাত্রের ভিতর তরল বস্তুর মধ্যে নিমজ্জিত করিয়া নাড়া হইত। তাহার ফলে বার্ণিশ ধুইয়া গিয়া পূর্বের ব্যবস্থামত পেরেকের অর্ধেকটা সকলের কাছে যেন সোনায় পরিণত হইয়াছে, এরূপ মনে হইত। কখনও কখনও অর্ধেক সোনা ও অর্ধেক রূপা দিয়া তৈয়ারী সাদা রঙের মিশ্রধাতুর একটি মুদ্রা লইয়া সকলের সামনে নাইট্রিক অ্যাসিডের মধ্যে ডুবান হইত এবং কিছুক্ষণের মধ্যে রূপা গলিয়া গিয়া সর্বসমক্ষে মুদ্রার আধখানা যেন সোনায় পরিণত হইয়াছে, এই রকম মনে হইত।

প্রাচীন ও মধ্যযুগের অ্যালকেমিষ্টরা কৃত্রিম উপায়ে স্বর্ণ প্রস্তুতে বিফল হইলেও আধুনিক কালে পদার্থবিদেরা এই কার্যে সফলতা অর্জন করিয়াছেন। ১৯৪১ সালে আমেরিকার হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশিষ্ট পদার্থতত্ত্ববিদ্ কেনেথ বেনব্রিজ ৮০টি প্রোটন সমন্বিত পারদের পরমাণুর উপর নিউট্রনের সাহায্যে প্রচণ্ড সংঘাত হানিয়া উহাকে ৭৯টি প্রোটনযুক্ত স্বর্ণ-পরমাণুতে রূপান্তরিত করিতে সমর্থ হন।

তবে এই পরমাণু-সংঘর্ষের প্রক্রিয়া অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য ব্যাপার। কাজেই আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় প্রচুর পরিমাণ স্বর্ণ উৎপাদন সুদূরপরাহত বলিয়াই মনে হয়।

টাইটেনিয়াম

মোহাঃ আবু বাক্‌কার

আমরা জানি—কোন একটি ধাতু যেমন উত্তাপে কম-বেশী বর্ধিত হয়, অপর দিকে তেমনি আবার শৈত্যে কম-বেশী সঙ্কুচিত হয়; অর্থাৎ উত্তাপে বৃদ্ধি এবং শৈত্যে সঙ্কোচন, যে কোন ধাতুর স্বাভাবিক ধর্ম। কিন্তু এস্থলে আলোচ্য ধাতু টাইটেনিয়ামের ক্ষেত্রে ধাতুর এই স্বাভাবিক ধর্মের ব্যতিক্রম দেখা যায়। টাইটেনিয়াম ধাতু উত্তাপে বর্ধিত না হয়ে কেঁপে ওঠে এবং সঙ্কুচিত হয়। অপর দিকে এই ধাতুটিকে বাঁকালে কিংবা বাঁকিয়ে ছেড়ে দিলে কিছুক্ষণের মধ্যে এটি সোজা হয়ে যায়। টাইটেনিয়াম ধাতুর এই সব ধর্ম, বিশেষ করে শেষোক্ত ধর্মটি আমাদের কাছে যেন ম্যাজিক বলে মনে হয়। সে জন্যে টাইটেনিয়াম ধাতুকে ম্যাজিক ধাতু বললে হয়তো অত্যুক্তি হবে না।

সাধারণভাবে টাইটেনিয়াম দিয়ে কোন জিনিষ নিখুঁতভাবে তৈরি করা যায় না; কারণ যখন এই ধাতুকে উত্তপ্ত করে গলানো হয়, তখন ধাতুটি বাতাস শুষে নেয়। এই শোষিত বাতাসই টাইটেনিয়ামকে ভঙ্গুর করে তোলে এবং এজন্যেই টাইটেনিয়াম দিয়ে জিনিষগুলি নির্মিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই কিংবা কিছু সময় পরে গুঁড়া হয়ে যায়।

খোলা বাতাসে এই ধাতুকে জোড়া দেওয়া অসম্ভব। কেন না, জোড়া দেবার সময় ধাতুটি ব্লটিং কাগজের কালি শোষণের মত বাতাস শুষে নেয়। এর ফলে এই ধাতু দিয়ে তৈরি জিনিষগুলি এত ভঙ্গুর হয়ে থাকে যে, জিনিষগুলিকে ভাঙবার জন্যে কেবলমাত্র একটা আঙ্গুলের টোকা দেওয়াই যথেষ্ট।

টাইটেনিয়াম ধাতুর এই অসুবিধা থাকা সত্ত্বেও এই ধাতুর যথেষ্ট গুরুত্ব আছে। সুপারসোনিক এয়ার ক্র্যাফট (Supersonic aircraft) পরিকল্পনাকারীদের কাছে এর গুরুত্ব সোনার মতই। টাইটেনিয়াম ধাতু অ্যালুমিনিয়াম ধাতু অপেক্ষা কিছুটা ভারী হলেও এটি ইস্পাতের মতই শক্ত।

কেবলমাত্র কাঠিন্য এবং হাল্কা হবার জন্যেই নয়, এর ৭০০° ফারেনহাইট পর্যন্ত তাপ সহনশীলতা এবং এই উষ্ণতায় ক্ষয়নিরোধক ধর্ম থাকবার জন্যে এই ধাতুটিকে অন্য যে কোন ধাতুর সঙ্গে মিশ্রিত করে বিভিন্ন প্রকার সঙ্কর ধাতুতে পরিণত করা যায়। এই কারণেই টাইটেনিয়াম ধাতু ব্যবহারের দিকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

সাধারণতঃ বিরল ধাতুগুলিই বেশী পরিমাণ তাপ সহ্য করতে পারে। এই দিক থেকে টাইটেনিয়াম যদিও বিরল ধাতুগুলির অন্তর্গত, তথাপি এই ধাতু প্রায় সর্বত্রই পাওয়া যায়। পৃথিবীপৃষ্ঠ যে সব ধাতু দিয়ে গঠিত, সেই সব ধাতুগুলির মধ্যে এটি চতুর্থ এবং সাধারণ ধাতুগুলির মধ্যে এর স্থান নবম।

টাইটেনিয়াম ধাতুর সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য আকরিক হচ্ছে রুটাইল (Rutile) এবং ইলমেনাইট (Ilmenite)। ফাউণ্ড্রিতে ব্যবহৃত এই আকরিকগুলি দেখতে কালো কালো বালুকার মত। আমাদের দেশে, আমেরিকায় এবং ব্রেজিলে ইলমেনাইট প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়।

পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, আধ ইঞ্চি পুরু

টাইটেনিয়ামের পাত্ দিয়ে তৈরি যে কোন প্রতিরোধক, আধ ইঞ্চি পুরু ইস্পাত দিয়ে তৈরি প্রতিরোধক অপেক্ষা অনেক বেশী দুর্ভেদ্য।

যদিও টাইটেনিয়াম আকরিক যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়, তথাপি আকরিক থেকে এই ধাতুটি সহজে নিষ্কাশিত হয় না। কেন না, গলিত অবস্থায় টাইটেমিয়াম রাসায়নিকভাবে এত সক্রিয় থাকে যে, পারিপার্শ্বিক যে কোন পদার্থের সঙ্গে সেটা মিশে যায়। এমন কি, যে চুল্লীতে একে নিষ্কাশন করা হয়, সেই চুল্লীর ধাতু অর্থাৎ যে সব ধাতু দিয়ে সেই চুল্লীটি নির্মিত, সেগুলিও গলিত টাইটেনিয়ামে দ্রবীভূত হয়। তবে এই ধাতুকে তামার কাঁপা দেয়ালবিশিষ্ট চুল্লীতে গলিয়ে নিষ্কাশন করা হয়। এই সব তাম্র-চুল্লীর বাইরের চারদিকে ঠাণ্ডা জল পরিচালনা করে চুল্লীগুলিকে যতদূর সম্ভব ঠাণ্ডা রাখা হয়। বাইরে থেকে জল পরিচালনা করে চুল্লীগুলিকে ঠাণ্ডা রাখবার ফলে চুল্লীর অভ্যন্তরে গলিত টাইটেনিয়ামেরই একটা শক্ত আবরণ পড়ে। এই আবরণই চুল্লীগুলিকে ক্ষয়-ক্ষতি থেকে রক্ষা করে। চুল্লীর মধ্যে টাইটেনিয়ামকে বৈদ্যুতিক উপায়ে গলিয়ে নিষ্কাশন করা হয়।

টাইটেনিয়ামের সঙ্গে অন্যান্য ধাতু, যেমন—ভ্যানাডিয়াম, মলিবডিনাম প্রভৃতি মিশ্রিত হয়ে কার্যোপযোগী শক্ত সঙ্কর ধাতু তৈরি করে। কিন্তু যেহেতু টাইটেনিয়াম ধাতু বাতাস থেকে অক্সিজেন কিংবা নাইট্রোজেন শোষণ করে, যার ফলে তৈরি জিনিষসমূহ ভেঙ্গে যায়, সেহেতু সঙ্কর ধাতু প্রস্তুতের কাজ বায়ুশূন্য চুল্লীতে করা হয়।

টাইটেনিয়াম ধাতুকে হয় আর্গন গ্যাসপূর্ণ প্লাষ্টিক আধারে কিংবা অতিরিক্ত সচ্ছিদ্র নল-যুক্ত ওয়েল্‌ডিং টর্চের সাহায্যে জোড়া লাগানো হয়। টর্চের আলোক শিখাকে বাতাসের সান্নিধ্য থেকে পৃথক রাখবার জন্যে অতিরিক্ত সচ্ছিদ্র নলের সাহায্যে টর্চের আলোক শিখার চতুর্দিকে আর্গন গ্যাস পরিচালনা করা হয়। এর ফলে জোড়া লাগাবার কাজ নির্বিঘ্নে করা যায়।

বর্তমানে টাইটেনিয়াম নিয়ে যথেষ্ট গবেষণা করা হচ্ছে। আজকের শিল্পে এটা দেখা গেছে যে, টাইটেনিয়াম ধাতুর ব্যবহার নির্মাণ-ব্যয় কমাতে পারে। যে সব ক্ষেত্রে তৈরি জিনিষ-গুলিকে ক্ষয়-প্রতিরোধক, শক্ত এবং হাল্কা করবার প্রয়োজন হয়, সে সব ক্ষেত্রে টাইটেনিয়াম ব্যবহার করা যেতে পারে।

আজকের মহাকাশ-অভিযানের যুগে টাইটেনি-য়ামের মত ধাতুর প্রয়োজনীয়তা অনেক বেড়ে গেছে। রকেট ইত্যাদি প্রস্তুতিতে টাইটেনিয়ামের যথেষ্ট গুরুত্ব আছে। বর্তমানের রকেট ও কৃত্রিম উপগ্রহগুলিকে যতদূর সম্ভব হাল্কা, শক্ত, ক্ষয়-প্রতিরোধক ও তাপ-রোধক করবার দিকে দৃষ্টি দেবার প্রয়োজন হওয়ায় টাইটেনিয়াম নিয়ে অনেক গবেষণা করা হচ্ছে। আমরা ভবিষ্যতে মহাকাশ অভিযানের যুগে এই ধাতু সম্বন্ধে অনেক কিছু জানতে পারবো।

বিজ্ঞান-সংবাদ

বাতাসের নাইট্রোজেনের সাহায্যে কৃষি-সার উৎপাদনের আয়োজন

নাইট্রোজেন কৃষিসারের অন্যতম প্রধান উপাদান। বাতাসে যে অফুরন্ত নাইট্রোজেন রয়েছে, তাকে কাজে লাগাবার একটি উপায় সম্প্রতি জনৈক তরুণ রসায়ন-বিজ্ঞানী কর্তৃক উদ্ভাবিত হয়েছে। আমেরিকার ন্যাশন্যাল ফাউণ্ডেশনের বৃত্তির সাহায্যে নর্থ ক্যারোলিনা বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়নশাস্ত্রের অধ্যাপক ডাঃ জেম্‌স্ পি. কোলম্যান নতুন অজৈব যৌগিক পদার্থসমূহ নিয়ে গবেষণা করছিলেন। এই গবেষণা চালাতে গিয়েই আবহমণ্ডল থেকে নাইট্রোজেন সংগ্রহের অভিনব পদ্ধতিটি আবিষ্কৃত হয়েছে। ফাউণ্ডেশন এই প্রসঙ্গে বলেছেন যে, স্বল্পোন্নত রাষ্ট্রসমূহের পক্ষে এই আবিষ্ক্রিয়া খুবই তাৎপর্যপূর্ণ।

মিঃ কোলম্যান দেখেছেন, দুটি যৌগিক পদার্থের সাহায্যে বাতাসের এই নাইট্রোজেন সংগ্রহ করা যেতে পারে। বাতাসের শতকরা ৭৫ ভাগই নাইট্রোজেন এবং রাসায়নিক দিক থেকে এই মৌলিক পদার্থটি নিষ্ক্রিয় অবস্থায় রয়েছে বলে মানুষ এটিকে বাতাস থেকে সংগ্রহ করে এযাবৎ কাজে লাগাতে পারে নি। নিষ্ক্রিয় অর্থে অন্য পদার্থের সঙ্গে এটি সহজে যুক্ত হয় না, অর্থাৎ যৌগিক পদার্থ গড়ে তোলে না।

তবে অতিরিক্ত চাপ ও অতি উচ্চ তাপের সাহায্যে নাইট্রোজেনকে অন্য পদার্থের সঙ্গে যুক্ত করে যৌগিক পদার্থ গড়ে তোলা যায়; কিন্তু তা খুবই ব্যয়সাপেক্ষ। এপর্যন্ত এই ব্যয় বাহুল্যের জন্যেই বাতাসের নাইট্রোজেনকে কাজে লাগিয়ে নাইট্রোজেনযুক্ত কৃষিসার তৈরি সম্ভব হয় নি।

ফাউণ্ডেশন এই প্রসঙ্গে বলেছেন যে, ডাঃ কোলম্যান প্রত্যক্ষভাবে বাতাস থেকে নাইট্রোজেন সংগ্রহ করেন নি। একটি জটিল রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় তিনি ইরিডিয়াম ও রেডিয়ামের সাহায্যে বাতাসের নাইট্রোজেন সংগ্রহের ব্যবস্থা করেছেন। এই নাইট্রোজেনকে কাজে লাগাবার ব্যাপারে এই আবিষ্ক্রিয়া একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ।

ডাঃ কোলম্যান এই প্রসঙ্গে বলেছেন যে, বাতাসের নাইট্রোজেন শুষে নিতে পারে, এরকম যৌগিক পদার্থের সন্ধানই হচ্ছে এই গবেষণার উল্লেখযোগ্য বিষয়। এই পদার্থটি অনুঘটকের কাজ করবে। যৌগিক পদার্থটি বাতাসের নাইট্রোজেন আত্মসাৎ করবার পর ঐ নাইট্রোজেন যাতে বাতাসের হাইড্রোজেনের সঙ্গে যুক্ত হতে পারে তার ব্যবস্থা করা হয়। তারই ফলে পাওয়া যায় অ্যামোনিয়া। কৃষিসার উৎপাদনে অ্যামোনিয়া প্রচুর পরিমাণে ব্যবহার করা হয়। অ্যামোনিয়ার উৎপাদনও খুবই ব্যয়সাপেক্ষ ব্যাপার। কারখানায় অ্যামোনিয়া উৎপাদনের জন্যে ৯০০ ডিগ্রী ফারেনহাইট তাপ এবং প্রতিবর্গ ইঞ্চিতে ৬০০০ পাউণ্ড চাপের প্রয়োজন হয়।

বাতাস থেকে নাইট্রোজেন সংগ্রহ করে অ্যামোনিয়া উৎপাদন করবার যে পদ্ধতি উদ্ভাবিত হয়েছে, তাতে সমগ্র বিশ্বই কৃষি উৎপাদনের ব্যাপারে বিশেষ উপকৃত হবে।

ফাউণ্ডেশন এই প্রসঙ্গে আরও বলেছেন যে, দু-জন বিদেশী গবেষকও বাতাসের নাইট্রোজেন শুষে নেবার মত যৌগিক পদার্থ উদ্ভাবন করেছেন বলে গত বছর জানিয়েছিলেন।

মোটর টায়ারের অবস্থা নিরূপণের অভিনব পদ্ধতি

মোটর গাড়ী বা এরোপ্লেনের চাকা অনেক সময় রাস্তাঘাটে চলবার কালে হঠাৎ ফেটে গিয়ে বিপদ ঘটিয়ে থাকে। চাকাটির অবস্থা কেমন, তা ফাটবার উপযোগী হয়ে আছে কি না, তা আগে থেকেই জানবার একটি বৈজ্ঞানিক উপায় উদ্ভাবিত হয়েছে।

মোটর গাড়ীর টায়ারের সঙ্গে একটি ছোট্ট রেডিও ট্র্যান্সমিটার বা বেতার বার্তা প্রেরণযন্ত্র জুড়ে দেওয়া হয়। গাড়ীর গতি যখনই কমে বা বাড়ে, তখনই চাকার মধ্যে বায়ুর চাপ ও তাপমাত্রার তারতম্য ঘটে। চলন্ত গাড়ীর চাকার বায়ুর চাপ ও তাপমাত্রার যথাযথ খবর এই বেতার যন্ত্রটি সরবরাহ করে থাকে।

এই ব্যবস্থা উদ্ভাবিত হবার পূর্বে গাড়ীর চলা বন্ধ হয়ে যাবার পর ইঞ্জিনিয়ারগণ প্রেসার গজ ও থার্মোইলেকট্রিক কাপল নামক যন্ত্রের সাহায্যে চাকার অবস্থা নিরূপণ করতেন। চলবার কালে চাকার অবস্থা জানতে না পারলে চাকার প্রকৃত অবস্থার সন্ধান পাওয়া সম্ভব হয় না। কোন টায়ারের পরমায়ুর পরিমাপ করতে হলে ইঞ্জিনিয়া-দের টায়ারের ভিতরের বায়ুর চাপ এবং টায়ারের তাপমাত্রার পরিমাণ জানা একান্ত আবশ্যক। আমেরিকার ওহিয়োর আকরনস্থিত বৃহত্তম রবার কারখানা গুড ইয়ার অ্যাণ্ড রাবার কোম্পানী কর্তৃক এই নতুন ব্যবস্থা উদ্ভাবিত হয়েছে—তাঁরাই এই ক্ষুদ্র বেতার যন্ত্রটি নির্মাণ করেছেন। মহাকাশযাত্রীদের শরীরের অবস্থার খবরাখবর এই বেতার ব্যবস্থার মাধ্যমেই পৃথিবীতে প্রেরিত হয়ে থাকে।

এই পদ্ধতিতে মহাকাশচারীদের কব্জিতে ও বুকে ক্ষুদ্র যন্ত্রটি বেঁধে দেওয়া হয়। মহাকাশ-চারীর রক্তের চাপ, হৃৎপিণ্ডের কম্পনের মাত্রা, শ্বাস-প্রশ্বাসের গতি ও দেহের তাপমাত্রার খবর এই যন্ত্র সরবরাহ করে। স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থায় ঐ সকল সংবাদ আবার ইলেকট্রনিক সঙ্কেতে রূপান্তরিত হয় এবং বেতারযোগে পৃথিবীতে প্রেরিত হয়ে থাকে।

মোটর গাড়ীর চাকার মধ্যে যে বেতার যন্ত্রটি জুড়ে দেওয়া হয়, তাও ঠিক এইভাবেই কাজ করে। মোটর গাড়ীর টায়ারের ভাল্‌বের কাছে একটি ছোট্ট ইলেকট্রনিক প্রেসার গজ অথবা ট্রান্সডিউসার লাগিয়ে দেওয়া হয়। এই যন্ত্রটি বায়ুর চাপ সম্পর্কে সকল খবর বেতার যন্ত্রে সরবরাহ করে, আর ঐ বেতার যন্ত্রে তাপমাত্রা সরবরাহ করে চারটি থার্মিস্টার। প্রত্যেকটি দেখতে একটি ছোট্ট পিনের মাথার মত। তবে তাপ ও চাপমাত্রার খবরসমূহ ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে সাঙ্কেতিক চিহ্নে রূপান্তরিত হয়। বেতারবার্তা প্রেরক যন্ত্রটি কর্তৃক প্রেরিত সকল খবর এতদসংক্রান্ত গবেষণাগারের বার্তাগ্রাহক যন্ত্রে গৃহীত হয় এবং বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থা অনুসারে এই সব সংবাদ গ্রাফের আকারে কাগজে লিপিবদ্ধ হয়ে থাকে। তা থেকেই ইঞ্জিনিয়ারেরা টায়ারের অবস্থা নিরূপণ এবং নতুন ধরণের টায়ারের গুণাগুণ পরীক্ষা করতে পারেন।
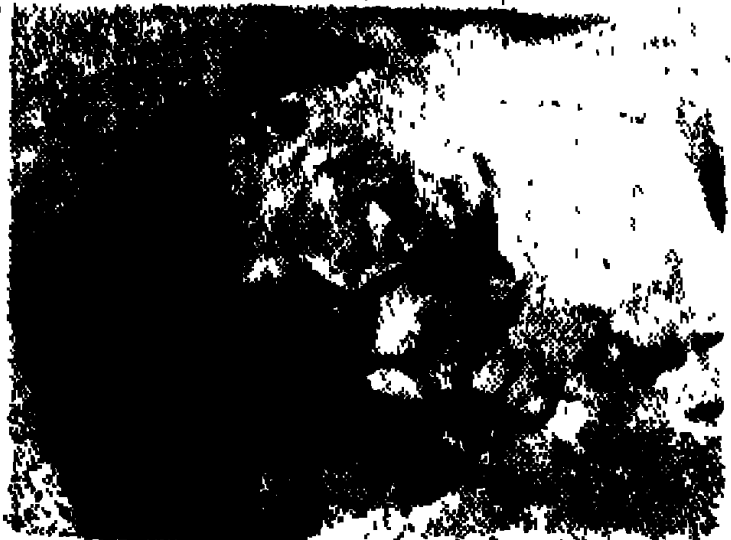
কিশোর বিজ্ঞানীর দপ্তর

জেনে রাখ

আকস্মিক আবিষ্কার

প্রয়োজনের খাতিরে মানুষ চিন্তা করে, গবেষণা করে অনেক কিছুই আবিষ্কার করেছে—কিন্তু কোন চিন্তা বা গবেষণা ব্যতিরেকেই আকস্মিকভাবে এমন বহু জিনিষ আবিষ্কৃত হয়েছে, যাদের কাহিনী খুবই কৌতূহলোদ্দীপক।

তোমরা অনেকে হয়তো জান—স্যাকারিন নামে সাদা একটা দানাদার জিনিষ চিনির চেয়ে প্রায় পাঁচ-শ' পঞ্চাশ গুণ বেশী মিষ্টি। এক গ্লাস জলে সামান্য একটু স্যাকারিন ফেলে দিলেই জলটা মিষ্টি হয়ে যায়; কিন্তু পরিমাণে একটু বেশী হলেই জলটা তেতো লাগে। গুড়, চিনি প্রভৃতির পরিবর্তে স্যাকারিন ব্যবহার করা হয় বটে, কিন্তু এর কোন খাদ্য বা পুষ্টিগুণ নেই। যাহোক, এই স্যাকারিন জিনিষটা আবিষ্কৃত হয়েছিল আকস্মিকভাবে। আবিষ্কারের পূর্বে কেউ ধারণাও করে নি যে, চিনির চেয়ে এরূপ অসম্ভব রকমের মিষ্টি কোন পদার্থ থাকতে পারে।

ফালবার্গ নামে এক তরুণ রসায়ন-বিজ্ঞানী জন হপ্‌কিন্স বিশ্ববিদ্যালয়ে আলকাত্‌রা থেকে পাওয়া টলুইন নিয়ে একটা পরীক্ষা করছিলেন, কিন্তু বার বার চেষ্টা সত্ত্বেও সাফল্য লাভ হচ্ছিল না। বিফলতার কারণ বুঝতে না পেরে ক্লান্তভাবে একদিন তিনি ঘরে ফিরে এসে গৃহকর্ত্রীকে কিছু খাবার দিতে বললেন। খাবার খেয়ে তক্ষুনি আবার লেবরেটরীতে যেতে হবে। খাবার আনা হলে তিনি সেই খালি হাতেই খাওয়া

সুরু করলেন। কিন্তু এ কি ব্যাপার। চা, রুটি যা মুখে দেন—প্রত্যেকটাই অসম্ভব রকম মিষ্টি। মিষ্টি তিনি মোটেই পছন্দ করতেন না—তাতে আবার এত বেশী মিষ্টি! গৃহকর্ত্রীকে রাগতস্বরে ভর্ৎসনা করতে লাগলেন। কিন্তু গৃহকর্ত্রী দৃঢ়তার সঙ্গে জানালেন যে, তিনি তাতে মোটেই মিষ্টি দেন নি।

তবে কি তাঁর নিজের হাতেই কোন মিষ্টি জিনিষ লেগে রয়েছে?—এই ভেবে তিনি হাতের আঙ্গুল মুখে দিয়ে দেখলেন—সত্যই তো আঙ্গুল অসম্ভব মিষ্টি লাগছে! তৎক্ষণাৎ ছুটে গেলেন লেবরেটরীতে। পরীক্ষা সংশ্লিষ্ট যে সব রাসায়নিক পদার্থ টেবিলের উপর ছিল, সেগুলিকে একে একে পরীক্ষা করে একটির মধ্যে মিষ্টি স্বাদ পাওয়া গেল। এর ফলেই আবিষ্কৃত হলো স্যাকারিন।

আর একটা আকস্মিক আবিষ্কারের কথা বলছি। আজকাল সেলুলয়েড বা ব্যাকেলাইটের জিনিষের মত অথচ সেগুলির চেয়ে দীর্ঘস্থায়ী ও উজ্জ্বল নানা রঙের চায়ের পেয়ালা, গেলাস, বাটি, ফাউন্টেন পেন, ছাতার বাঁট, চিরুণী ও নানা রকম বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতির যথেষ্ট প্রচলন হয়েছে। এগুলি কি থেকে তৈরি হয়—জান? এগুলি তৈরি হয় দুধ থেকে। দুধ থেকে কেজিন বা ছানা তৈরি করে সেই ছানা দিয়েই রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় এই জিনিষগুলি প্রস্তুত করা হয়। কিন্তু দুধের ছানা থেকে যে এরূপ জিনিষ তৈরি হতে পারে, তা কেমন করে আবিষ্কৃত হলো—জান? এটাও একটা আকস্মিক আবিষ্কার।

একজন রসায়ন-বিজ্ঞানী তাঁর গবেষণাগারে কাজ করছিলেন। টেবিলের উপর একটা পাত্রের মধ্যে বেশ খানিকটা চিজ (পণির) রাখা ছিল। পণির অর্থাৎ চিজ যে ছানা ছাড়া আর কিছু নয়, তা বোধ হয় তোমরা সবাই জান। হঠাৎ টেবিলের উপর একটা বিড়াল এসে পড়লো। বিজ্ঞানীও সঙ্গে সঙ্গে তাড়া করলেন বিড়ালটাকে। তাড়া খেয়ে বিড়ালটা লাফিয়ে পালিয়ে যাবার সময় একটা বোতল উল্টে গিয়ে ভেঙে পড়লো ঐ চিজের পাত্রটার উপর। তখন কিছু বোঝা যায় নি। বোঝা গেল অনেকক্ষণ পরে, যখন দেখা গেল—পাত্রটার মধ্যে চিজের পরিবর্তে রয়েছে হাতীর দাঁতের মত শক্ত একটা সাদা জিনিষ।

কি হলো? দেখা গেল, ওই উল্টে-পড়া বোতলটার মধ্যে ছিল—ফর্ম্যালডিহাইড। ফর্ম্যালডিহাইড পাত্রের পণির অর্থাৎ কেজিনের সঙ্গে মিশে তাকে সাদা শক্ত জিনিষে পরিবর্তিত করেছে। এথেকেই গড়ে উঠেছে এই নতুন শিল্প।

বাংলার প্রাচীন ও বৃহত্তম বিশ্ববিদ্যালয়

পশ্চিম বাংলায় এখন সর্বসমেত সাতটি বিশ্ববিদ্যালয় আছে। সেগুলি হচ্ছে—কলকাতা, যাদবপুর, বিশ্বভারতী, উত্তর বঙ্গ, বর্ধমান, কল্যাণী ও রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়। এই বিশ্ববিদ্যালয়গুলির মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীন ও বৃহত্তম হচ্ছে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। তাছাড়া কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ভারতের এক বিরাট ঐতিহ্যসম্পন্ন বিশ্ববিদ্যালয়। ভারতের বহু খ্যাতনামা মনীষী, হয় এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, গবেষক—নয়তো অধ্যাপক ছিলেন। কাজেই বাংলার একটি সর্বাঙ্গীন পরিচয় পেতে হলে—কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কথাও জানা দরকার।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রথম প্রস্তাব ওঠে ১৮৪৪ কি ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে। কিন্তু তখন সে প্রস্তাব ইংরেজ সরকার অনুমোদন করেন নি। কিন্তু পরবর্তী দশ বছরের মধ্যেই ইংরেজদের মত বদ্‌লে যায়। ইংরেজ কর্তৃপক্ষ ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দের ১৯শে জুলাই শিক্ষা সম্বন্ধে এক শতটি অনুচ্ছেদ সমন্বিত এক বিধান-পত্র এদেশে পাঠান। তাতেই কলকাতায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সারবত্তা স্বীকৃত হয়।

বিলাতী কর্তৃপক্ষের নির্দেশে প্রস্তাবিত নতুন বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মাবলী রচনার জন্যে ভারত সরকার একটি কমিটি গঠন করেন। সেই কমিটিতে ছিলেন প্রসন্নকুমার ঠাকুর, রামগোপাল ঘোষ, পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও আরও কয়েকজন জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তি। কমিটি ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে তাঁদের কাজ শেষ করে রিপোর্ট পেশ করেন।

তারপর ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের ২৪শে জানুয়ারী কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আইন বিধিবদ্ধ হয় এবং সঙ্গে সঙ্গেই নতুন বিশ্ববিদ্যালয়টি জন্মলাভ করে। এই নতুন বিশ্ববিদ্যালয় লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের ধাঁচে গঠিত হয় এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালক সভা সেনেট নামে অভিহিত হয়। বড়লাট লর্ড ক্যানিং হন প্রথম চ্যান্সেলার, আর সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সার জেমস্ উইলিয়াম কলভিল হন প্রথম ভাইস চ্যান্সেলার। প্রথম পরিচালক সভা বা সেনেটে চ্যান্সেলার ও ভাইস চ্যান্সেলার সমেত মোট একচল্লিশ জন সদস্য ছিলেন। অতঃপর বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যনির্বাহক সভা বা সিণ্ডিকেট গঠিত হয় এবং সিণ্ডিকেটের প্রথম অধিবেশন বসে ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের ৩০শে জানুয়ারী। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম প্রবেশিকা পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল মাত্র ২৪৪ জন। আর সে সময় প্রবেশিকা পরীক্ষার ফি ছিল মাত্র পাঁচ টাকা। প্রথম বছর বাংলা ও সংস্কৃত পরীক্ষক ছিলেন পাদ্রী কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। তখন পরীক্ষকেরাই প্রশ্নপত্র তৈরি করতেন। প্রথম প্রবেশিকা পরীক্ষায় ইংরেজী বাদে গ্রীক, ল্যাটিন, আরবী, ফারসী, হিব্রু, সংস্কৃত, বাংলা, হিন্দী ও উর্দুর যে কোন একটি এবং ইতিহাস, ভূগোল, অঙ্ক ও বিজ্ঞান—এই

কয়টি বিষয়ে পরীক্ষা গৃহীত হয়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম রেজিষ্ট্রার নিযুক্ত হন অধ্যাপক উইলিয়াম গ্র্যানেল।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে প্রথম এল. এম. এস. পরীক্ষা গ্রহণ করা হয় ১৮৫৭ সালের ২রা মার্চ তারিখে। তখন এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সীমা ছিল সুদূর বিস্তৃত—পশ্চিমে লাহোর থেকে পূর্বে রেঙ্গুন পর্যন্ত; অর্থাৎ গোটা উত্তর ভারত ও ব্রহ্মদেশ এর আওতার মধ্যে ছিল। একালে এতটা বিরাট এলাকা নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় গঠনের কথা আমরা কল্পনাও করতে পারি না।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গঠনের পর ষোল বছর ধরে এর কাজকর্ম ভাড়াটে বাড়ীতেই চলেছিল। তারপর ভারত সরকারের সাহায্যে ১৮৭৩ সালে সেনেট ভবন নির্মিত হয়। নির্মাণের জন্যে খরচ পড়ে ৪'৩৫ লক্ষ টাকা। সিনেট হল নির্মিত হলে বিশ্ববিদ্যালয়ের যাবতীয় কাজ এখানেই হতে থাকে। দীর্ঘকাল ধরে এই সিনেট হলই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মকেন্দ্র ছিল।

এরপর ক্রমাগত বিশ্ববিদ্যালয় ভবন সম্প্রসারিত হতে থাকে। একে একে গড়ে ওঠে দ্বারভাঙ্গা লাইব্রেরী ভবন, আশুতোষ ভবন, হার্ডিঞ্জ হোষ্টেল ও বিজ্ঞান কলেজ ভবন। দ্বারভাঙ্গার মহারাজার আড়াই লক্ষ টাকা দানে গড়ে ওঠে দ্বারভাঙ্গা ভবন। সার তারকনাথ পালিত বিজ্ঞান কলেজ ভবন নির্মাণের জন্যে যে জমি ও অর্থ দান করেন, তার মোট মূল্য পনেরো লক্ষ টাকা। রাসবিহারী ঘোষ মোট ২১'৪৩ লক্ষ টাকা দান করেন—কারিগরী শিক্ষার সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে। বোম্বাই নিবাসী প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে এককালীন দুই লক্ষ টাকা দান করেন। সেই টাকার সুদ থেকে প্রতি বছর উৎকৃষ্ট গবেষণা-প্রবন্ধের জন্যে প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি দেওয়া হয়। এই বৃত্তি প্রথম লাভ করেন আশুতোষ মুখোপাধ্যায়—১৮৬৮ সালে। দানবীর প্রসন্নকুমার ঠাকুরের দানের আয় থেকে সৃষ্টি করা হয় 'ঠাকুর আইন অধ্যাপক' পদ। এই পদ প্রথম লাভ করেন হার্বার্ট কাওয়েল—১৮৭০ সালে। এছাড়া আরও অনেক দাতার দানে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সমৃদ্ধ হয়েছে।

প্রতিষ্ঠার পর থেকে বেশ কিছুকাল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় একটি পরীক্ষা-নিয়ামক কেন্দ্র রূপেই পরিচিত ছিল। বিভিন্ন স্কুল ও কলেজের মাধ্যমে এই বিশ্ববিদ্যালয় দেশের সর্বত্র শিক্ষা ও সংস্কৃতির বীজ ছড়াচ্ছিল। কিন্তু পরে এটি উচ্চতম শিক্ষা ও গবেষণা-কেন্দ্রে পরিণত হয়। ১৮৭৫ সালে একটি আইন বলে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় 'অনারেরী ডক্টর অফ ল' ডিগ্রী দানের অধিকার অর্জন করেন। ঐ বছরের সমাবর্তন উৎসবে প্রথম এই ডিগ্রী দেওয়া হয় রাজা সপ্তম এডোয়ার্ডকে। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ভারতীয় উপাচার্য ছিলেন ডক্টর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি উপাচার্য ছিলেন ১৮৯০ সালে।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বর্তমানে উচ্চশিক্ষার জন্যে অনেকগুলি বিভাগ বা ফ্যাকালটি আছে। এই সব বিভাগের মধ্যে আছে কৃষি, কলা, বাণিজ্য, শিক্ষা, ইঞ্জিনীয়ারিং, ললিত কলা, সঙ্গীত, আইন, চিকিৎসা-বিজ্ঞান, বিজ্ঞান ও পশু চিকিৎসা বিভাগ। প্রতিটি বিভাগ বা ফ্যাকালটির সভাপতিকে বলা হয় ডীন। ভারতবাসীদের মধ্যে কলা বিভাগের সর্বপ্রথম ডীন হন পাদ্রী কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। আইন শাস্ত্রে ডীন হন বিচারপতি রমেশচন্দ্র মিত্র, চিকিৎসা-বিজ্ঞানে ডাক্তার সূর্যকুমার সর্বাধিকারী ও ইঞ্জিনীয়ারিং বিভাগে—সার রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। আর বিজ্ঞান বিভাগের প্রথম বাঙ্গালী ডীন হন—আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়। ১৯১৭ সাল থেকে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে ফরাসী, জার্মান, ইটালিয়ান, পর্তুগীজ, চীনা এবং তিব্বতীয় ভাষা শিক্ষার ক্লাস সুরু হয়। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় পাশ করে প্রথম মহিলা ডাক্তার হন কাদম্বিনী বসু।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনশাস্ত্র বিভাগ স্থাপিত হয় ১৯১২ সালে। ১৯২১ থেকে ১৯৪১ সাল পর্যন্ত এই বিভাগের অধ্যাপকের পদ অলঙ্কৃত করেছিলেন প্রখ্যাত দার্শনিক ও ভারতের বর্তমান রাষ্ট্রপতি ডক্টর সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন। নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত বিজ্ঞানী চন্দ্রশেখর বেঙ্কট রামন ১৯১৭ সালে এই বিশ্ববিদ্যালয়েই পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হন। এখানেই গবেষণা চালিয়ে তিনি আলো বিকিরণ তত্ত্ব 'রামন এফেক্ট' আবিষ্কার করেন এবং এই আবিষ্কারের জন্যেই ১৯৩০ সালে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ মিউজিয়ামটি শিল্পকলার একটি উল্লেখযোগ্য সংগ্রহাগার। কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারটিও বিশাল। প্রায় তিন লক্ষ গ্রন্থ আছে এই গ্রন্থাগারে। ১৯০৯ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসটি স্থাপিত হয়। শত শত গবেষণা-পুস্তিকা মুদ্রিত হয়েছে এই প্রেসেই। এই প্রেস থেকেই শতাধিক বছরের পুরাতন ক্যালকাটা রিভিউ পত্রিকা ছাপা হচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের বহু অমূল্য গ্রন্থরাজিও এই প্রেস থেকে প্রকাশিত হচ্ছে।

বাংলা, তথা ভারতের শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবদান অপরিসীম।

অমরনাথ রায়

কীট-পতঙ্গের কারিগরী দক্ষতা

কীট-পতঙ্গ অতি সাধারণ স্তরের জীব—একথা আমরা প্রায় সবাই ভেবে থাকি। এদের সামাজিক জীবন, আকৃতি-প্রকৃতি প্রভৃতি সম্বন্ধে আমাদের কৌতূহলও সাধারণতঃ কম। কিন্তু সব রকম কীট-পতঙ্গ সম্বন্ধে একথা সত্য নয়। কোন কোন কীট-পতঙ্গের জীবনে বৈচিত্র্যপূর্ণ এমন কিছু দেখা যায় না, যা সহজেই আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে। আবার এমন অনেক কীট-পতঙ্গ দেখা যায়—যাদের বিচিত্র চাল-চলন, বাসস্থান, আকৃতি-প্রকৃতি আমাদের কৌতূহল সৃষ্টি করে। তোমাদের পরিচিত কয়েকটি কীট-পতঙ্গের চাল-চলন একটু চেষ্টা করলেই নিজের চোখে দেখতে পাবে। এখন কয়েকটি কীট-পতঙ্গের বিচিত্র কারিগরী দক্ষতার কথা বলছি। প্রধানতঃ বাসা নির্মাণেই এদের বিচিত্র কারিগরী দক্ষতা লক্ষ্য করা যায়।

ঝুঁড়ি-পোকা বা কাঁটা-পোকা তোমরা অনেকেই দেখে থাকবে! এদের বাসা যদি দেখ, তবে অবাক না হয়ে পারবে না। কাঁটার মত আকৃতিবিশিষ্ট বাসা তৈরি করে এরা গাছের গায়ে লেগে থাকে। কাঁটাগুলির অগ্রভাগ সরু এবং গোড়ার দিক ক্রমশঃ মোটা হয়ে গেছে। রং সামান্য লালচে। কাঁটাগুলি মাঝে মাঝে না নড়লে বোঝবার উপায়ই নেই যে, সেগুলি প্রকৃতই গাছের কাঁটা নয়—এক রকম পোকার বাসা। কাঁটার মত বাসাটা অত্যন্ত হাল্কা এবং ফাঁপা এবং ভিতরেই বাসস্থানের অধিকারী বাস করে। এই সব পোকার মুখের অংশটা গাঢ় বাদামী রঙের এবং শরীরের বাদবাকী অংশের রং হাল্কা বাদামী।

এই সব পোকা তাদের মুখ দিয়ে খুব সরু সূতা বুনে কাঁটার মত আকৃতিবিশিষ্ট বাসা তৈরি করে। তারা অপূর্ব কৌশলে গাছের ছাল থেকে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম লাল্‌চে রঙের টুক্‌রা সংগ্রহ করে বাসার কাঠামোর সর্বত্র বসিয়ে দেয়। তখন আর আসল বা নকলের তফাৎ বুঝা যায় না সহজে—মনে হয় গাছের কাঁটা। কাঁটা-পোকা বা ঝুঁড়ি-পোকারা খুব সাবধানী। তারা বাসা সমেত খাদ্যের সন্ধানে ইতস্ততঃ চলাফেরা করে। তোমরা প্রশ্ন করতে পার, বাসা সমেত পোকাটা চলাফেরা করে কেমন করে? ওদের মুখের সামনের দিকে দুটি ধারালো দাঁত সাঁড়াশির মত বাঁকানো। এই বাঁকানো দাঁত দিয়ে গাছের ছালের এক স্থান কামড়ে ধরে আরেক স্থানে যায়। এরা গাছের ছালের সূক্ষ্ম অংশ ভক্ষণ করে। এক জায়গার খাবার ফুরিয়ে গেলেই আর এক জায়গায় খাদ্যের সন্ধানে যায়। খাবার সময় বাসাটাকে চটচটে সূতার মত পদার্থের সাহায্যে গাছের গায়ে কিছুক্ষণের জন্যে আটকে রাখে। যে গাছে

এরা বাস করে তার সঙ্গে এদের যেন বন্ধুত্ব আছে বলা চলে। কারণটা কি জান? কাঁটা-পোকা যেমন গাছের ছাল কুরে কুরে খায়—তেমনি অসংখ্য লালচে কাঁটা প্রতিদানে গাছের ক্ষতিকারক শত্রুর প্রতিরোধে সাহায্য করে, অর্থাৎ এদের গাছের গায়ে দেখবার পর শত্রুর আর এগুতে সাহস হয় না। খেতে খেতে পূর্ণবয়স্ক হবার পর এরা বাসার মধ্যে পুত্তলীতে রূপান্তরিত হয় এবং বাসাটা তখন এক জায়গায় শক্তভাবে আটকানো থাকে। নিশ্চল অবস্থায় কিছুকাল অতিবাহিত করবার পর পূর্ণবয়স্ক পতঙ্গে পরিণত হয়ে গুটি কেটে বেরিয়ে আসে। যাযাবর মানুষ যেমন ঘরবাড়ী সঙ্গে নিয়েই ঘুরে বেড়ায়, এরাও তেমনি বাড়ীঘর সঙ্গে নিয়ে চলে। নানা জাতের কাঁটা-পোকা বা ঝুঁড়ি-পোকা আমাদের দেশে দেখা যায়। বাচ্চা অবস্থায় এরা যে রকম কারিগরী দক্ষতার পরিচয় দেয়, পরিণত বয়সে সেরূপ দক্ষতা দেখা যায় না।

লতা-গুল্ম বা ঘাস-পাতার মধ্যে এক ইঞ্চির মত লম্বা এক জাতীয় ঝুঁড়ি-পোকা দেখা যায়। এরা তাদের বাসার উপরে দুর্বাঘাসের টুক্‌রা স্তরে স্তরে সাজিয়ে রাখে। মনে হয় বাসার উপর যেন নক্সা এঁকেছে। বাসাটাকে নিয়েই এরা হাঁটা-চলা করে। সুতার মত সরু লম্বাটে ধরণের এই ঝুঁড়ি-পোকা এভাবে শত্রুর চোখে ধুলা দেয়। সুপারী গাছের কাণ্ডে শ্যাওলার সাহায্যে অদ্ভুত বাসা তৈরি করে ঝুঁড়ি-পোকা শত্রুকে প্রতারিত করে। শ্যাওলার টুক্‌রাগুলি জমাট বেঁধে গেছে বলে মনে হয়। কিন্তু শ্যাওলার টুক্‌রাগুলি ইতস্ততঃ নড়াচড়া করায় বোঝা যায় ঐগুলি কোন পোকার বাসা।

জলে বিচরণকারী কয়েক জাতের ঝুঁড়ি-পোকা জলজ লতাপাতার সাহায্যে বাসা প্রস্তুত করে। এই সব ঝুঁড়ি-পোকার আকৃতি অনেকটা শেঁায়াপোকার মত। এরা দাঁতের সাহায্যে অর্ধচন্দ্রের আকারে পাতা কেটে নিয়ে—তা জলে ভাসিয়ে আর একটা পাতার উপর নিয়ে আসে এবং আঠালো পদার্থের সাহায্যে পাতা দুটা জুড়ে দিয়ে নীচের পাতাটিকে ঐ মাপে কেটে ফেলে। পোকাটা পাতার ভাঁজের মাঝখানে থাকে এবং পাতাটা ভেলার মত ভাসতে থাকে। দরকার হলে এরা পাতার ফাঁক দিয়ে গড়িয়ে সাঁতার কেটে ভেসে বেড়ায় এবং বাসাটাকেও সঙ্গে নিয়ে চলে। কিছু দিন বাদে বাসার মধ্যে পুত্তলীর রূপ ধারণ করে যথাসময়ে গুটি কেটে পূর্ণবয়স্ক পতঙ্গরূপে বেরিয়ে আসে।

নিম্নস্তরের প্রাণীদের মধ্যে মাকড়সার জাল বোনা উল্লেখযোগ্য। সব জাতের মাকড়সার জালই যে দেখতে সুন্দর হয় তা নয়। কিন্তু কয়েক জাতের মাকড়সা অতি সুন্দরভাবে ধৈর্য সহকারে জাল বুনে থাকে এবং এই জাল বোনায় যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় দেয়। কোন কোন মাকড়সা ইতস্ততঃ সুতা বিছিয়ে মাঝখানে গর্তের মত ফাঁদ পেতে রাখে।

বোলতা, মৌমাছির চাক তৈরির ব্যাপার তোমরা অনেকেই দেখে থাকবে। ভ্রমরের বাসা তৈরিও কৌশলও কম বিচিত্র নয়। বাসা তৈরির আগে এরা এমন পুরনো কাঠের খণ্ড নির্বাচন করে, যা ফাঁপা অথবা যাতে লম্বা গর্ত আছে। তারপর বাসা প্রস্তুতের মাল-মসলা সংগ্রহ করে আনে। সাধারণতঃ এরা গোলাপ বা ঐ জাতীয় কোন গাছের সবুজ পাতা ডিম্বাকৃতির মত করে কেটে নিয়ে আসে। তারপর পাতাগুলিকে চুরুটের মত জড়িয়ে বাসা বানায়। পাতার ভাঁজের মধ্যস্থলে ডিম পাড়ে এবং বাচ্চাদের খাদ্যের ব্যবস্থাও করে রাখে। প্রতিটি গর্তের মধ্যে এরকম ৮।১০টা জড়ানো পাতার গুটি রেখে দেয় এবং প্রতিটি গুটির মধ্যেই একটা করে ডিম থাকে।

আমাদের দেশে বনে-জঙ্গলে থুথুপোকা নামে পরিচিত অতি ক্ষুদ্র এক জাতীয় পতঙ্গ দেখা যায়। এদের বাচ্চাগুলি নিজেদের দেহ থেকে ফেনার মত থুথু বের করে তার ভিতরে লুকিয়ে থাকে। ফেনার মত থুথুই এদের বাসা। গুবরেপোকা জাতীয় এক প্রকার পতঙ্গের বাচ্চাগুলি অপূর্ব কৌশলে বাসা তৈরি করে তার মধ্যে নিশ্চিন্তে বাস করে। এরা ৫।৬ ইঞ্চি পাতাকে মুখ দিয়ে মুড়ে সুতার দ্বারা জুড়ে দেয়। দেখলে টুনটুনি পাখীর বাসার কথা মনে পড়ে। ক্যাডিস ফ্লাই নামে আমাদের দেশে কয়েক জাতের পতঙ্গ দেখা যায়। এরা আকারে খুব ছোট এবং ছোট নলের মত বাসা তৈরি করে। কারো কারো বাসা আবার দেখায় ক্ষুদ্রাকৃতির শামুকের মত কুণ্ডলী পাকানো।

এক জাতীয় ক্ষুদ্রাকার মথের বাচ্চা শত্রুর আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার জন্যে বিচিত্র কৌশল অবলম্বন করে। গোলাপ, করমচা প্রভৃতি গাছের ডালপালা বা পাতার নানা স্থানে কালো রঙের এক একটি বিচিত্র পদার্থ ঝুলে থাকতে দেখা যায়। বাড়ীঘরের দেয়ালে, আনাচে-কানাচে যেমন ঝুল থাকে, ঠিক সে রকম দেখতে। লম্বা গোলাকার এই অদ্ভুত পদার্থের চারদিকে এক ইঞ্চি বা দেড় ইঞ্চি লম্বা কতকগুলি শুক্‌নো কাঠি আঠা দিয়ে আটকানো থাকে। কাঠিগুলি জোরে টেনে তুলে নিলে খুব নরম একটি নলের মত পদার্থ বেরিয়ে পড়ে। নলটা ছিঁড়লে একটা ছোট মথের বাচ্চা দেখা যায়। এরা গাছের ছাল বা পাতা উদরসাৎ করে বেঁচে থাকে। এরা দেহের আবরণের উপর ছোট ছোট ডালের টুক্‌রা দাঁত দিয়ে কেটে এনে চার দিকে বসিয়ে দেয়। বাসার পথটা থাকে উপরের দিকে। এই অবস্থায় এরা দাঁত দিয়ে ডালপালা কামড়ে ঝুলন্ত অবস্থায় একস্থান থেকে অন্যস্থানে যায়। অবসর সময়ে এদের মুখের কাছে যে আল্‌গা সুতা সঞ্চিত থাকে, তার সাহায্যে বোঁটার মত করে শক্তভাবে বাসা ঝুলিয়ে রাখে। ঝুলন্ত বাসার মধ্যেই বাচ্চাটা পুত্তলীর আকার ধারণ করে এবং পরে পরিণত মথে রূপান্তরিত হয়ে গুটি কেটে বেরিয়ে আসে।

আমাদের বাড়ীঘরের দেয়ালে, বেড়ার গায়ে চিঁড়ে-পোকা নামে এক প্রকার পোকা দেখা যায়। এদের বাসা চিঁড়ের মত চ্যাপ্টা। এরা থেমে থেমে চলে।

বাসায় ছুটা পথ আছে দু-দিকে। এক দিকের পথ চলবার সময় বাধা পেলে অপর দিকের পথটাকে তৎক্ষণাৎ কাজে লাগায়। একদিকের মুখ বন্ধ করে দিলে অন্য দিকের পথ দিয়ে মুখ বের করে কাজ করতে থাকে। নলখাগড়া বা বাঁশের বেড়ার গায়ে ছোলা-পোকা নামে এক প্রকার পোকা দেখা যায়। এদের বাসার আকৃতি ছোলার মত দেখতে। ছোলার মত একটা সরু থলের মধ্যে এরা বাস করে। বেড়ার গায়ের অতি ক্ষুদ্র শ্যাওলা জাতীয় পদার্থ এরা উদরসাৎ করে বেঁচে থাকে।

কোন কোন পতঙ্গ পালকের টুক্‌রা, ছোট আঁশ, ডিমের খোলা সংগ্রহ করে সেগুলিকে এলোমেলোভাবে আট্‌কে দিয়ে বাসা বানায়। ময়লার মত সেই বাসাটাকে সঙ্গে নিয়ে খাদ্যের সন্ধানে এদিক-সেদিক ঘুরে বেড়ায়।

শ্রীঅরবিন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রশ্ন ও উত্তর

প্রঃ ১। (ক) মেঘগর্জন, বিদ্যুৎ ও বজ্রপাত কেন হয়?
(খ) বজ্র-বিদ্যুতের উপকারিতা কি?

সেবাপ্রিয় দাস
ও
নীহারেন্দু দাস

প্রঃ ২। (ক) রেডার কি? (খ) কবে এবং কে আবিষ্কার করেন?
(গ) কিসে এর ব্যবহার হয়?

সৌমেন্দ্রনাথ সরকার
ও
সত্যশঙ্কর সুর

উঃ ১। (ক) মেঘগর্জন, বিদ্যুৎ ও বজ্রপাত—এই সবগুলিরই কারণ হচ্ছে মেঘের মধ্যে বিদ্যুৎ-শক্তির সঞ্চয়। মেঘ কি ভাবে তড়িতাবিষ্ট হয়, এসম্বন্ধে অবশ্য একাধিক মতবাদ প্রচলিত আছে। প্রকৃত কারণ এখনও অজানা। অনেকেই লক্ষ্য করে থাকবেন, বজ্র বিদ্যুৎসহ ঝড়বৃষ্টি হবার আগে একটা প্রচণ্ড গুমোট গরম অনুভব করা যায়। ফলে নীচের বাতাস উপরের দিকে উঠতে থাকে। মেঘের জলকণাগুলি নীচে নেমে আসবার সময় এই ঊর্ধ্বগামী বায়ুর সঙ্গে ঘর্ষণে ভেঙ্গে গিয়ে ছোট ছোট অংশে বিভক্ত হয়ে

যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে তড়িতাবিষ্ট হয়ে পড়ে। ছোট কণাগুলি নামতে নামতে ক্রমশঃ আরও ছোট হতে থাকে, ফলে তড়িতের পরিমাণও বাড়তে থাকে। এক সময়ে অতি ক্ষুদ্র এই সব জলকণা ঊর্ধ্বগামী বায়ুপ্রবাহের সঙ্গে আবার উপরে উঠে যায়। মেঘের বিদ্যুৎ-শক্তি আহরণের ব্যাপারে সিম্পসন প্রবর্তিত এই মতবাদটিকে মোটামুটি মেনে নেওয়া হয়েছে।

এভাবে পাশাপাশি বা উপরে-নীচে দু-খণ্ড মেঘ বিপরীত-ধর্মীরূপে তড়িতাবিষ্ট হতে পারে—অর্থাৎ একটি পজিটিভ ও অপরটি নেগেটিভ হবে। ফলে একটি আরেকটিকে আকর্ষণ করবে। পজিটিভ থেকে বিদ্যুৎ যখন নেগেটিভের দিকে চলতে থাকে, তখন পথের বায়ুকণা অত্যধিক উত্তপ্ত হয়ে আলোকিত হয়ে ওঠে। আমরা বলি বিদ্যুৎ চমকালো। আবার একখণ্ড মেঘই অনেক সময় অত্যধিক বিদ্যুৎ-ভাবাপন্ন হয়ে যায়। তার কাছে হয়তো বিপরীত বিদ্যুৎ-ধর্মী অন্য কোন মেঘ নাও থাকতে পারে। এরকম অবস্থায় বিদ্যুৎ-শক্তিসম্পন্ন মেঘটি ভূপৃষ্ঠের উপর তার নিকটতম বস্তুকে বিপরীত-ধর্মী বিদ্যুতের দ্বারা আবিষ্ট করে; অর্থাৎ ভূপৃষ্ঠে যে বস্তুটি খুব উঁচু, যেমন—সুউচ্চ বাড়ী বা মন্দির ইত্যাদির চূড়া, তাল, নারকেল প্রভৃতি বৃক্ষ—সে বিপরীত-ধর্মী বিদ্যুৎ-ভাবাপন্ন হয়ে যায়। আকাশের বিদ্যুৎ তখন ভূপৃষ্ঠে নেমে আসে সারা পথকে আলোকিত করে। আমরা বলি বাজ পড়লো।

বিদ্যুৎই চমকাক বা বাজই পড়ুক—পথের বায়ু অত্যধিক উত্তপ্ত হয়ে ভয়ঙ্করভাবে হঠাৎ প্রসারিত হবার চেষ্টা করে। ফলে প্রচণ্ড শব্দ শোনা যায়। অনেক সময় এক মেঘ থেকে অন্য মেঘে প্রতিধ্বনিত হতে হতে এই শব্দ এসে আমাদের কানে পৌঁছায় গুরু গুরু ধ্বনিরূপে।

১। (খ) প্রত্যক্ষভাবে না হলেও পরোক্ষভাবে বজ্র-বিদ্যুৎ মানুষের উপকারে আসে। মানুষের জীবনধারণের ক্ষেত্রে বৃক্ষের অবদান অনস্বীকার্য। অনেকেরই জানা আছে যে, গাছের একটি প্রধান খাদ্য হচ্ছে নাইট্রেট এবং তার কিছুটা অংশ সে গ্রহণ করে বায়ুমণ্ডলের নাইট্রোজেন থেকে। বায়ুমণ্ডলের এই নাইট্রোজেনকে নাইট্রেটে পরিবর্তিত করতে সাহায্য করে আকাশের বিদ্যুৎ। প্রতিবার বিদ্যুৎ চমকালেই বায়ুমণ্ডলের নাইট্রোজেন ও অক্সিজেন যুক্ত হয়ে নাইট্রিক অক্সাইড গঠিত হয়। নাইট্রিক অক্সাইড বৃষ্টির জলের মাধ্যমে নাইট্রিক ও নাইট্রাস অ্যাসিডরূপে মাটিতে নেমে আসে। এরা মাটির নানা প্রকার রাসায়নিক দ্রব্যের সঙ্গে মিশে যথাক্রমে নাইট্রেট ও নাইট্রাইট প্রস্তুত করে। নাইট্রাইট আবার এক জাতীয় ব্যাক্টিরিয়ার সাহায্যে নাইট্রেটে রূপান্তরিত হয়ে যায়। এই নাইট্রেটই গাছ গ্রহণ করে। হিসাব করে দেখা গেছে—গড়ে প্রতি ২৪ ঘণ্টায় ২৫০,০০০ টন নাইট্রিক অ্যাসিড এই প্রক্রিয়ায় তৈরি হয়ে থাকে।

উঃ ২। (ক) রেডার কথাটি আসলে কয়েকটি ইংরেজী শব্দের আদ্যাক্ষর নিয়ে গঠিত। মূল কথাটি হলো—Radio Detection and Ranging অর্থাৎ বেতারের সাহায্যে কোন বস্তুর অস্তিত্ব ও অবস্থান নির্ণয়।

বেতার যন্ত্রের সাহায্যে শক্তিশালী বেতার-তরঙ্গ সন্ধানী আলো বা সার্চলাইটের মত ঝলকে ঝলকে আকাশে প্রেরণ করা হয়। সার্চলাইটের আলো যেমন কোন কিছুতে প্রতিহত হয়ে ফিরে আসে এবং অপেক্ষমান দর্শকের চোখে পড়ে, রেডার থেকে প্রেরিত বেতার-তরঙ্গও তেমনি কোন বাধার সম্মুখীন হলে প্রতিফলিত হয়ে ফিরে আসে ও যন্ত্রের মধ্যে ধরা পড়ে। এরূপ তরঙ্গ প্রেরণ এবং গ্রহণই রেডারের কাজ। এথেকেই অতি অল্প সময়ের মধ্যে প্রতিফলক বস্তুর (যেমন—বিমান, জাহাজ ইত্যাদি) দূরত্ব, গতিবেগ, কোন দিকে যাচ্ছে—ইত্যাদি সব কিছু নির্ণয় করা যায়।

২। (খ) রেডার আবিষ্কারের জন্যে কোন বিশেষ লোকের নাম বা কোন বিশেষ সময়ের কথা বলা যায় না। রেডার দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অবদান—বহুসংখ্যক বিজ্ঞানীর দীর্ঘদিন ধরে অক্লান্ত পরিশ্রমের ফল। প্রধানতঃ বৃটিশ বিজ্ঞানীরাই এই ব্যাপারে অগ্রণী ছিলেন।

২। (গ) সামরিক প্রয়োজনের তাগিদেই রেডার যন্ত্রের উদ্ভব ও উন্নতি। রেডার আবিষ্কারের ফলে অতর্কিত আক্রমণের সম্ভাবনা একেবারে দূর হয়েছে। শত্রুপক্ষের বিমান একটিই থাকুক বা এক ঝাঁকই থাকুক—অনেক দূর থেকেই তাকে রেডারের কাছে ধরা দিতেই হবে এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রস্তুত হবে গোলন্দাজ বাহিনী। ইলেকট্রনিক্স যন্ত্রের উন্নতি হবার সঙ্গে সঙ্গে আজকাল বিমানধ্বংসী কামানগুলি স্বয়ংক্রিয়ভাবে রেডারের সঙ্গে একযোগে কাজ করে। লক্ষ্যভেদ একেবারে নির্ভুল, এর জন্যে আলাদা কোন কামান-চালকের প্রয়োজন হয় না। আজকাল বিমানগুলিতেও রেডার বসানো হয়েছে। শত্রুপক্ষের বিমান ধরা পড়ে মিত্রপক্ষের বিমানবাহিত রেডারে। সুরু হয় গোলাগুলি বর্ষণ। এছাড়া টহলদার বিমানগুলি সহজেই শত্রুপক্ষের জাহাজ, ডুবোজাহাজ প্রভৃতি ধ্বংস করতে পারে। বোমা ফেলবার সুবিধার জন্যে রেডারের এত উন্নতি হয়েছে যে, নির্দিষ্ট শহর মেঘাচ্ছন্ন বা কুয়াশাচ্ছন্ন যাই হোক না কেন, কোথায় কারখানা, সেতু বা বড় রাস্তা ইত্যাদি আছে, মানচিত্রের মতই বোমারু বিমানের রেডারে তা ধরা পড়ে। জলযুদ্ধেও রেডার সমপরিমাণ কার্যকরী। জাহাজ দৃষ্টিগোচর হবার আগেই রেডারের সাহায্যে তাকে ধ্বংস করা যায়।

শান্তিকামী মানুষ শীঘ্রই দেখলো, যুদ্ধের প্রয়োজন ছাড়া মানুষের কল্যাণকর কাজেও রেডারকে ব্যবহার করা যেতে পারে। অসামরিক বিমান অবতরণের জন্যে

রেডার আজ অপরিহার্য। মেঘাচ্ছন্ন বা কুয়াশাচ্ছন্ন বিমান-বন্দরের কাছে এসে চালক নিজের অবস্থান ঠিক করতে পারে না। নীচে থেকে রেডারের সাহায্যে সেটা জেনে নিয়ে তাকে বেতারের মাধ্যমে জানানো হয়। তখন চালক বিমানটিকে নিরাপদে নামিয়ে নিয়ে আসে। আজকাল চালকের সাহায্য ছাড়া সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয়ভাবে রেডারের সাহায্যে বিমান নামিয়ে আনা সম্ভব। জলপথেও রেডার নাবিকদের প্রধান সহায়। জলকণাবাহী মেঘ থেকে বেতার-তরঙ্গ প্রতিফলিত হয় বলে আবহাওয়া পর্যবেক্ষণের কাজেও রেডার অপরিহার্য। এছাড়া মহাকাশযান, উল্কা, উপগ্রহ প্রভৃতি সম্বন্ধে গবেষণার কাজেও রেডার ব্যবহার করা হচ্ছে।

দীপক বসু

শোক-সংবাদ

অধ্যাপক সুশীলকুমার আচার্য

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজের প্রাক্তন অধ্যাপক সুশীলকুমার আচার্য গত ২৮শে ডিসেম্বর শেষ রাত্রিতে তাঁহার শ্যামবাজারস্থিত বাসভবনে পরলোক গমন করিয়াছেন।

অধ্যাপক সুশীলকুমার আচার্য

অধ্যাপক আচার্য ২৪ পরগণা জেলার বসির-হাট মহকুমার রুদ্রপুর গ্রামে ১২৯৪ বঙ্গাব্দের ৭ই ভাদ্র (ইং ২৩শে আগষ্ট, ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দ) জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম বনমালি আচার্য এবং মাতার নাম ভবতারিণী দেবী। তিনি পিতা-মাতার জ্যেষ্ঠ সন্তান। ইঁহাদের কৌলিক পদবী ছিল মুখোপাধ্যায়।

অধ্যাপক আচার্যের শৈশবের শিক্ষার সূত্রপাত হয় রুদ্রপুরের চিন্তামণি গুরুমহাশয়ের পাঠশালায়। পাঠশালার শিক্ষা শেষ করিয়া তিনি কলিকাতার সেন্ট্রাল কলেজিয়েট স্কুল হইতে এনট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। সেন্ট্রাল কলেজিয়েট স্কুলের শ্রদ্ধেয় অধ্যক্ষ দার্শনিক ক্ষুদিরাম বসুর সান্নিধ্য অধ্যাপক আচার্যের জীবনে গভীর প্রভাব বিস্তার করে। অধ্যাপক আচার্যের চরিত্র, চাল-চলনে সরলতা এবং কর্মজীবনে সঠিক পথ নির্বাচন, দৃঢ়তা প্রভৃতি গুণাবলী অধ্যক্ষ ক্ষুদিরাম বসুর আদর্শের প্রভাবে গড়িয়া ওঠে।

১৯০৮ সালে জেনারেল অ্যাসেমব্লি ইনষ্টিটিউশন হইতে প্রথম বিভাগে এফ. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং পদার্থ ও রসায়নবিদ্যায় ডাফ-বৃত্তি ও সারদাপ্রসাদ পুরস্কার লাভ করেন।

১৯১০ সালে স্কটিশচার্চ কলেজ হইতে তিনি ডিষ্টিংশনসহ বি. এস-সি. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। স্কটিশচার্চ কলেজে তিনি খ্যাতনামা অধ্যাপকদের (জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ, গৌরীশঙ্কর দে, বরুণকুমার দত্ত, মন্মথনাথ বসু) সংস্পর্শে আসেন। তাঁহাদের প্রভাবও অধ্যাপক আচার্যের শিক্ষার প্রতি অনুরাগ বৃদ্ধির একটি কারণ।

১৯১২ সালে প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে প্রথম শ্রেণীতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়া এম. এস-সি. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং রৌপ্য পদক লাভ করেন।

প্রেসিডেন্সী কলেজে তিনি আচার্য জগদীশ চন্দ্র, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র, ডক্টর দেবেন্দ্রনাথ মল্লিক, ডক্টর সি. ডব্লিউ. পীক, ই. পি. হ্যারিসন, এইচ. আর. জেম্‌স্ প্রমুখ মনীষীদের সংস্পর্শে আসেন এবং শিক্ষাজগতে জীবন অতিবাহিত করিবার জন্ম অনুপ্রাণিত হন। তিনি ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট পদের জন্ম নির্বাচিত হইয়াছিলেন, কিন্তু সেই পদ প্রত্যাখান করেন। ১৯১২ সালের জুলাই মাসে তিনি পদার্থবিদ্যায় পালিত রিসার্চ স্কলার হিসাবে নিযুক্ত হন এবং ১৯১৪ সাল পর্যন্ত আচার্য জগদীশচন্দ্রের অধীনে অনারেরী রিসার্চ অ্যাসিষ্ট্যান্ট হিসাবে কাজ করেন।

১৯১২ সালের নভেম্বর হইতে ১৯১৪ সালের এপ্রিল পর্যন্ত প্রেসিডেন্সি কলেজে তিনি পদার্থ-বিদ্যায় লেক্‌চারার-ডেমনষ্ট্রেটর হিসাবে কাজ করিয়াছিলেন। ১৯১৪ সাল হইতে ১৯১৬ সালের প্রথম ভাগ পর্যন্ত তিনি কলিকাতার সিটি কলেজের লেক্‌চারার ছিলেন।

১৯১৬ সালে প্রথম কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় বিজ্ঞানে পোষ্ট-গ্রাজুয়েট ক্লাস চালু করেন।

১৯১৬ সালে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজে পদার্থবিদ্যার লেক্‌চারার নিযুক্ত হন। ইহা ছাড়াও অধ্যাপক আচার্য ১৯১৬-১৯৫০ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্যাবুলেটর, প্রশ্নকর্তা ও পরীক্ষক ছিলেন। পদার্থবিদ্যার লেক্‌চারার থাকিবার সময় ১৯৩০-৩১ সাল পর্যন্ত তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পোষ্ট-গ্রাজুয়েট বিভাগের অস্থায়ী সেক্রেটারী ছিলেন।

১৯৪৩-৪৯ সাল পর্যন্ত তিনি কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ডেপুটেড স্পেশাল অফিসার ছিলেন। এই সময়ে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, পোষ্ট-গ্রাজুয়েট বিভাগ প্রভৃতির আর্থিক বিষয়সমূহ তদারক করিতেন। স্পেশাল অফিসার থাকিবার সময় তিনি ১৯৪৯-৫০ সাল পর্যন্ত পোষ্ট-গ্রাজুয়েট আর্টস্ অ্যাণ্ড বিজ্ঞান বিভাগের সেক্রেটারীর দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। ১৯৫০ সালে অধ্যাপক আচার্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে অবসর গ্রহণ করেন।

অধ্যাপক আচার্য ১৯০৯ সালে 'শ্রমজীবী শিক্ষা পরিষদ' স্থাপন করেন। তিনি রামমোহন লাইব্রেরী, ইণ্ডিয়ান ফিজিক্যাল সোসাইটি, সায়েন্স নিউজ অ্যাসোসিয়েসন, অল বেঙ্গল কলেজ অ্যাণ্ড ইউনিভারসিটি সমূহের টিচার্স অ্যাসোসিয়ে-সন, বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের আজীবন সদস্য ছিলেন। কিছুকাল তিনি বিজ্ঞান পরিষদের কর্মসচিব ও কোষাধ্যক্ষও ছিলেন। তিনি পার্ক ইনষ্টিটিউশনের সভাপতি ছিলেন। ১৯১৬-১৯২০ সাল পর্যন্ত তিনি কলিকাতা কর্পোরেশনের প্রাইমারী এডুকেশন কমিটির সদস্য ছিলেন। এতদ্ব্যতীত তিনি ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন অব দি সায়েন্স, অল ইণ্ডিয়া এডুকেশন্যাল সোসাইটি, সুনীতি শিক্ষালয় এইচ. ই. স্কুল (ফর গার্লস্), কেশব অ্যাকাডেমি, সেন্ট্রাল কলেজ অ্যাণ্ড কলেজিয়েট স্কুল, আরিয়ান ইনষ্টিটিউশন প্রভৃতি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সহিত যুক্ত ছিলেন।

বিবিধ

রুশভাষায় আচার্য জগদীশচন্দ্রের রচনাবলী

বিশ্বখ্যাত বিজ্ঞানী আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর বৈজ্ঞানিক রচনাবলী দুটি খণ্ডে রুশ ভাষায় অনূদিত হয়ে সম্প্রতি সোভিয়েট রাশিয়ায় প্রকাশিত হয়েছে। কলকাতায় আগত সোভিয়েট উদ্ভিদ-বিজ্ঞানী অধ্যাপক এ. এম. সিন্যুখিন গত ৩০শে নভেম্বর বসু বিজ্ঞান মন্দিরের ৪১তম প্রতিষ্ঠা দিবসে বিজ্ঞান মন্দিরের অধিকর্তা ডাঃ দেবেন্দ্রমোহন বসুর হস্তে এই গ্রন্থ দুটি আনুষ্ঠানিক-ভাবে অর্পণ করেন।

ইউ. এস. এস. আর. বিজ্ঞান অ্যাকাডেমির পক্ষ থেকে মস্কোর লুমুম্বা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদবিদ্যার অধ্যাপক এ. এম. সিন্যুখিন রুশ ভাষায় লিখিত আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর পুস্তকাবলী বসু বিজ্ঞান মন্দিরের ডিরেক্টর ডাঃ ডি. এম. বসুকে উপহার দিচ্ছেন।

সোভিয়েট বিজ্ঞান অ্যাকাডেমি বর্তমানে যে 'চিরায়ত বিশ্ববিজ্ঞান' গ্রন্থমালা প্রকাশ করছেন, আচার্য জগদীশচন্দ্রের রচনাবলী সেই গ্রন্থমালার অন্তর্ভুক্ত। এই গ্রন্থমালায় অন্যান্য বিশ্ববিজ্ঞানীদের মধ্যে রয়েছেন নিউটন, ফ্যারাডে, আইনষ্টাইন প্রমুখ জগৎবরেণ্য বিজ্ঞানীগণ। আচার্য জগদীশচন্দ্রের গ্রন্থাবলী বিশিষ্ট সোভিয়েট বিজ্ঞানীদের দ্বারা অনূদিত হয়েছে। এই অনুবাদকমণ্ডলীর মধ্যে অধ্যাপক সিন্যুখিনও রয়েছেন।

ডাঃ বসুর হস্তে আচার্য জগদীশচন্দ্রের গ্রন্থাবলী অর্পণকালে অধ্যাপক সিন্যুখিন বলেন, 'বিখ্যাত ভারতীয় বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্রের বিজ্ঞান-জগতে অবদানের বিষয়ে সোভিয়েট বিজ্ঞানীরা অত্যন্ত

সজাগ। বিজ্ঞান-জগতে এক নতুন দিকের দ্বার খুলে দিয়ে গেছেন আচার্য জগদীশচন্দ্র। তাঁর আবিষ্কৃত পথে আজ বহু সোভিয়েট বিজ্ঞানী গবেষণার কাজ করে চলেছেন। অ্যাকাডেমিসিয়ান তিমিরিয়াজেফ, হোলোদনি, ভেদেনস্কি, তোপচিয়েফ, পোপোফ, লেবেদেফ ও হেক্কেল প্রমুখ খ্যাতনামা সোভিয়েট বিজ্ঞানীদের লিখিত জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার সম্পর্কে এপর্যন্ত ৩০টি নিবন্ধ পুস্তক সোভিয়েট ইউনিয়নে প্রকাশিত হয়েছে। 'চিরায়ত বিশ্ববিজ্ঞান' গ্রন্থমালায় এশিয়া। আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকার দেশগুলি থেকে একমাত্র আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর রচনাবলীই যে প্রকাশ করা হয়েছে, তা এই অসাধারণ ভারতীয় বৈজ্ঞানিকের প্রতিভার প্রতিই সোভিয়েটের মহান শ্রদ্ধার্ঘ্য।'

রুশ ভাষায় জগদীশচন্দ্রের রচনাবলী কৃতজ্ঞচিত্তে গ্রহণ করে' বসু বিজ্ঞান মন্দিরের অধিকর্তা ডাঃ বসু বলেন—'এই গ্রন্থাবলী প্রকাশের দ্বারা বিজ্ঞানের প্রগতির পথে ভারত ও সোভিয়েট সহযোগিতা আরও বর্ধিত হবে বলে আমরা মনে করি। আমি আশা করি, জগদীশচন্দ্রের উদ্ভিদ-বিজ্ঞানের গবেষণাধারার আর একটি পীঠস্থান হয়ে উঠবে মস্কো এবং সোভিয়েট বিজ্ঞানীরা এই গবেষণার কাজকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাবেন।'

এই অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় বিজ্ঞান ও শ্রমশিল্প সংস্থার অধিকর্তা ডাঃ আত্মারাম ২৮তম আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু স্মারক-বক্তৃতা প্রদান করেন। বহু বিশিষ্ট বিজ্ঞানী, বিজ্ঞান-অধ্যাপক ও বিজ্ঞানানুরাগী উপস্থিত ছিলেন।

পারমাণবিক বিষঘ্ন বটিকা

তাইপে থেকে রয়টার কর্তৃক প্রচারিত এক সংবাদে প্রকাশ—নেপোলিয়নের চুল নিয়ে অভ্রান্ত যে গবেষণা চলছে, তারই সহায়তায় কুওমিন্টাং চীনের একজন বিজ্ঞানী পারমাণবিক বিকিরণের মুখে আত্মরক্ষার উপযোগী একটি ঔষধ উৎপাদনের সুলভ পদ্ধতি আবিষ্কার করেছেন।

ঔষধটির নাম সিসটিন। মানুষের চুল থেকে এক পাউণ্ড এই ঔষধ বের করে আনতে খরচ পড়ে মাত্র আড়াই ডলার।

আবিষ্কারক কুওমিন্টাং চীনের রসায়নবিদ্যা অ্যাকাডেমির ডিরেক্টর ডাঃ ওয়েই বলেন, দু-এক গ্র্যাম সিসটিন খেয়ে ফেললে আধঘণ্টা পর্যন্ত পারমাণবিক বিকিরণ কোন ক্ষতিই করতে পারবে না।

পারমাণবিক বোমার আক্রমণকালে আশ্রয়-স্থলের দিকে ছুটে যাবার আগে সিসটিন সেবন বিধেয়।

মানুষের চুলে আর্সেনিকের পরিমাণ দেখে তার জ্ঞানেরও পরিমাপ করা সম্ভব বলে যে বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব রয়েছে, তাথেকেই আমি মানুষের চুল নিয়ে গবেষণা সুরু করি।

বাস্তবিক, নেপোলিয়নের চুলে মাত্রাধিক আর্সেনিক ছিল বলে হালে প্রমাণিত হয়েছে। জ্ঞানী-গুণীদের চুলে যে আর্সেনিক একটু বেশী থাকে, সেটা আজ প্রমাণিত সত্য।

চুল নিয়ে গবেষণা করতে গিয়ে সিসটিনের সন্ধান পেলাম, যা পেটে থাকলে অন্ততঃ আধঘণ্টা পারমাণবিক বিকিরণ-বিষ দেহে ঢুকতে পারবে না। সিসটিন খাদ্য হিসাবেও বলকারী হবে।

ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের ৫৪তম অধিবেশন

৩রা জানুয়ারী হায়দ্রাবাদে বিজ্ঞান কংগ্রেসের ৫৪তম অধিবেশনের উদ্বোধন হয়েছে। উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী। এই অধিবেশনে মূল সভাপতির আসন গ্রহণ করেন অধ্যাপক টি. আর. শেষাদ্রি।

এই সংখ্যার লেখকগণের নাম ও ঠিকানা

১। বিষ্ণুপদ মুখোপাধ্যায়
চিত্তরঞ্জন ন্যাশনাল ক্যান্সার রিসার্চ সেন্টার
৩৭, এস. পি. মুখার্জী রোড,
কলিকাতা

২। শ্রীমৃত্যুঞ্জয়প্রসাদ গুহ
৭৭/১, ইন্দ্রবিশ্বাস রোড,
কলিকাতা-৩৭

৩। দেবব্রত চট্টোপাধ্যায়
গণিত বিভাগ,
লাহিড়ী কলেজ,
চিরিমিড়ি,
মধ্যপ্রদেশ

৪। মণীন্দ্রনাথ দাস
"সাধনালয়"
পুরুলিয়া রোড,
রাঁচী

৫। মোহাঃ আবু বাক্কার
পোঃ ও গ্রাম—কলিঠা
ভায়া—নলহাটি
জেলা—বীরভূম

৬। শ্রীঅমরনাথ রায়
NB/T-99
Unit—A
New Traffic Settlement
P. O. Kharagpur
Midnapur

৭। শ্রীঅরবিন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়
৫ ও ৭, নেতাজী সুভাষ রোড,
কলিকাতা-১

৮। দীপক বসু
ইনষ্টিটিউট অব রেডিও ফিজিক্স অ্যাণ্ড
ইলেকট্রনিক্স, বিজ্ঞান কলেজ,
কলিকাতা-৯

সম্পাদক—শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস কর্তৃক ২৯৪।২।১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড হইতে প্রকাশিত এবং গুপ্তপ্রেস
৩৭।৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা হইতে প্রকাশক কর্তৃক মুদ্রিত

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

বিংশতি বর্ষ | ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৭ | দ্বিতীয় সংখ্যা

ফুয়েল সেল বা জ্বালানী-কোষ

শ্রীবীরেন্দ্রকুমার চক্রবর্তী

ফুয়েল সেল জিনিষটা কি?

ফুয়েল সেল বা জ্বালানী কোষ হলো বিদ্যুৎ উৎপাদনের এক প্রকার নতুন উদ্ভাবিত কৌশল। বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্যে সাধারণতঃ দুটি কৌশল ব্যবহার করা হয়; যথা—(১) ফুয়েল বা জ্বালানী পদার্থ (অর্থাৎ কয়লা, পেট্রোল, গ্যাস ইত্যাদি) পুড়িয়ে তার তাপের শক্তিতে ডায়নামো বা জেনারেটর চালিয়ে। (২) ইলেকট্রিক সেল বা তড়িৎ-কোষের সাহায্যে (যেমন টর্চ লাইটের ড্রাই সেল, ষ্টোরেজ সেল প্রভৃতি) রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটিয়ে। এই দুটি পদ্ধতির সমন্বয়ে তৈরি হয়েছে আধুনিক ফুয়েল সেল। এর ফলে শক্তির অপচয় ও বিদ্যুৎ উৎপাদনের ব্যয় উভয়ই হ্রাস পাবে। ব্যাপারটা বোঝবার জন্যে আমরা ধাপে ধাপে আলোচনা করবো। প্রথম দেখা যাক, ফুয়েল বা জ্বালানী পুড়িয়ে কিভাবে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়।

জ্বালানী পুড়িয়ে বিদ্যুৎ

কোন জ্বালানী, যেমন—কয়লা পুড়িয়ে যে তাপ পাওয়া যায়, তার সাহায্যে প্রথমে বাষ্প উৎপন্ন করা হয়। এই বাষ্পের সাহায্যে বাষ্পচক্র ঘোরানো হয়। ঘূর্ণায়মান বাষ্পচক্রে জেনারেটর যুক্ত করে বিদ্যুৎ উৎপন্ন করা হয়।

জ্বালানী যখন পোড়ে, তখন তাও একটি রাসায়নিক বিক্রিয়া। কয়লা যখন পোড়ে তখন কয়লার কার্বনের সঙ্গে বাতাসের অক্সিজেন যুক্ত হয়—রাসায়নিকের ভাষায় তাকে কার্বনের জারণ (Oxidation) বলা যায়। এই বিক্রিয়ার ফলে

কার্বন-ডাইঅক্সাইড গ্যাস উৎপন্ন হয় এবং সেই সঙ্গে প্রচুর রাসায়নিক শক্তি ছাড়া পায়। এই শক্তিই তাপের আকারে আত্মপ্রকাশ করে।

জ্বালানীর মধ্যেকার রাসায়নিক শক্তি প্রথমে তাপের আকারে প্রকাশ পায়, তারপর সেই তাপকে বাষ্পের চাপ-শক্তিতে পরিণত করা হয়। এরপর বাষ্পের চাপে যখন বাষ্পচক্র ঘোরে, তখন উৎপন্ন হয় যান্ত্রিক শক্তি এবং বাষ্পচক্রের সঙ্গে সংযুক্ত জেনারেটর ঘুরে ঐ যান্ত্রিক শক্তি বিদ্যুৎ-শক্তিতে পরিণত হয়। ব্যাপারটা সংক্ষেপে এইভাবে দেখানো যেতে পারে—
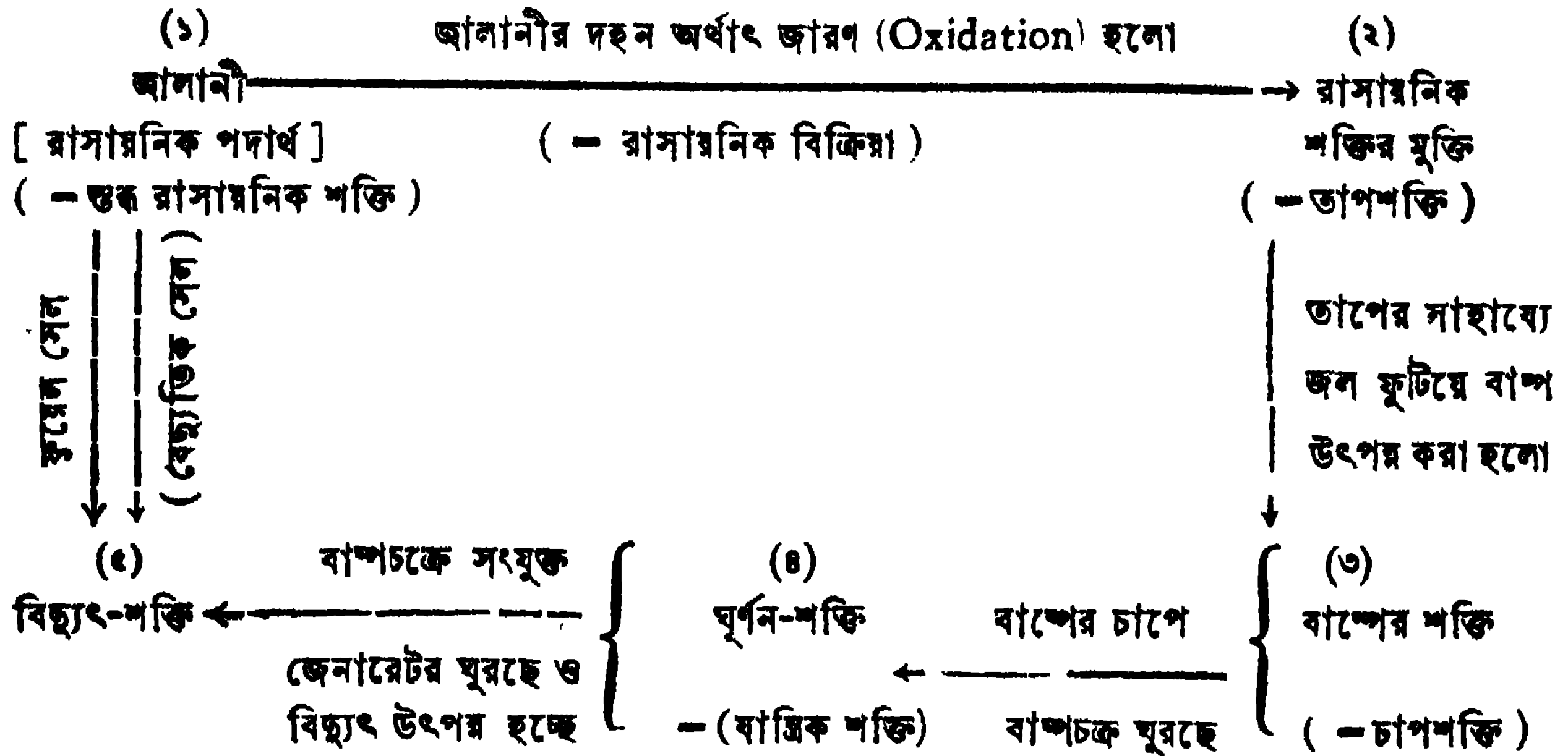
এই পদ্ধতিতে পাঁচটি পর্যায় আছে এবং তার পঞ্চম পর্যায়ে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হচ্ছে। মধ্যের তিনটি পর্যায়ে (অর্থাৎ ২য়, ৩য় ও ৪র্থ পর্যায়ে) শক্তির অপচয় হয়। ২য় পর্যায়ে যে তাপ উৎপন্ন হয়, তার একটা বড় অংশ নানাভাবে নষ্ট হয়ে যায়; ৩য় পর্যায়ে উৎপন্ন বাষ্পের সবটুকু শক্তিকে বাষ্পচক্র ঘোরাবার কাজে ব্যবহার করা যায় না; চতুর্থ পর্যায়ে জেনারেটরের ভিতরকার নানারকম বাধা-বিঘ্নের ফলে বাষ্পচক্রের সবটুকু যান্ত্রিক শক্তি বিদ্যুৎ-শক্তিতে পরিণত হয় না। দেখা গেছে, এভাবে শক্তির অপচয় হবার ফলে শেষ পর্যন্ত জ্বালানীর মধ্যেকার মোট রাসায়নিক শক্তির তিন ভাগের দুভাগ বা তারও বেশী নষ্ট হয়ে যায়, মাত্র ⅓ ভাগ বা তারও কম অংশ বিদ্যুৎ-শক্তি হিসাবে পাওয়া যায়। বড় বড় তাপ-বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রে শতকরা ৩৫ ভাগ পর্যন্ত তাপ-শক্তিকে বিদ্যুৎ হিসাবে পাওয়া সম্ভব।

স্বভাবতঃই প্রশ্ন ওঠে—যদি মাঝের তিনটি পর্যায় বাদ দিয়ে কোন কৌশলে জ্বালানী থেকে সরাসরি বিদ্যুৎ উৎপন্ন করা যেত, তাহলে শক্তির এত অপচয় হতো না। জ্বালানী-কোষে ঠিক তাই করা হয়। ফলে জ্বালানীর মধ্যেকার মোট রাসায়নিক শক্তির শতকরা ৭০ ভাগ বা আরো বেশী বিদ্যুতে পরিণত হয়। কিন্তু কিভাবে তা সম্ভব হয়? সেটা বুঝতে হলে তড়িৎ-কোষে কিভাবে কাজ হয়, তা আগে জানা দরকার। কেন না, তড়িৎ-কোষের মধ্যেও রাসায়নিক শক্তিকে সরাসরি বিদ্যুতে পরিণত করা হয়। উদাহরণ-স্বরূপ একটা সাধারণ প্রাথমিক তড়িৎ-কোষের কার্যপদ্ধতি সংক্ষেপে আলোচনা করা যাক।

তড়িৎ-কোষে বিদ্যুৎ উৎপাদন

একটি সাধারণ প্রাথমিক তড়িৎ-কোষ এভাবে তৈরি হয়:—একটি কাচের পাত্রে কিছুটা লঘু

সালফিউরিক অ্যাসিড রেখে তামা এবং দস্তার দুটি পাত বা দণ্ড ঐ অ্যাসিডের মধ্যে পরস্পর থেকে কিছু দূরে আংশিকভাবে ডুবিয়ে রাখা হয়। এবার পাত দুটির শীর্ষদেশ দুটি তামার তার দিয়ে যোগ করে দিলে ঐ তারের মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হতে থাকে (১নং চিত্র দ্রষ্টব্য)।

কিন্তু কেন এই বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয়? এর কারণ তামা এবং দস্তার দণ্ড দুটি যখন অ্যাসিডে ডুবানো হয়, তখন উভয় দণ্ডের সঙ্গেই অ্যাসিডের এই উভয় দণ্ডের শীর্ষদেশ দুটি যোগ করে দিলে ঐ তারের মধ্য দিয়ে দস্তার দণ্ড থেকে তামার দণ্ডে ইলেকট্রনগুলি ছুটে চলতে থাকে। তারের মধ্য দিয়ে এই ইলেকট্রনের প্রবাহই বিদ্যুৎ-প্রবাহ। যতক্ষণ দণ্ড দুটির সঙ্গে অ্যাসিডের রাসায়নিক বিক্রিয়া চলতে থাকে, ততক্ষণ বিদ্যুৎ-প্রবাহও চলতে থাকে।

দেখা গেল, প্রাথমিক তড়িৎ-কোষে রাসায়নিক বিক্রিয়া থেকে সরাসরি বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়,
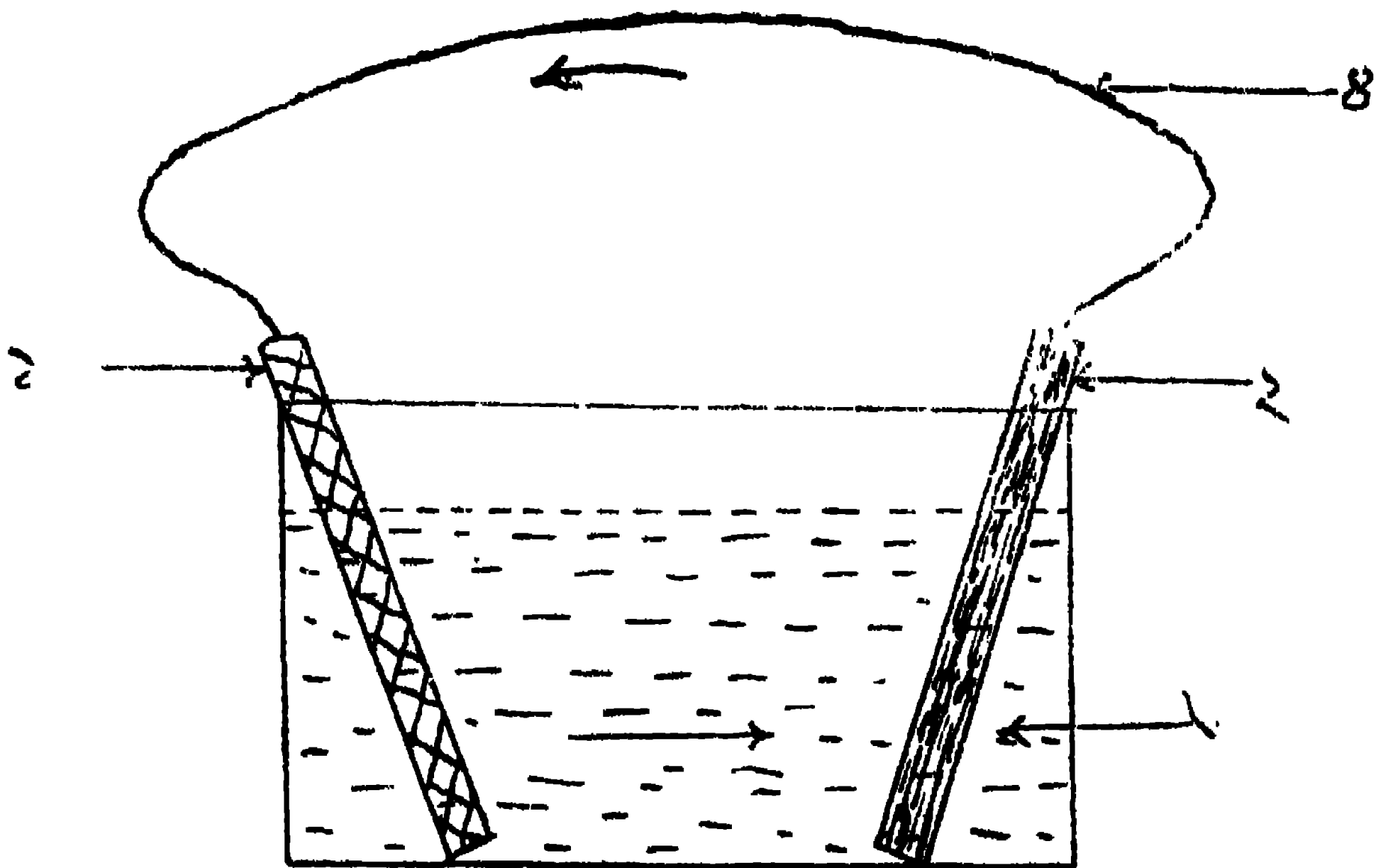
১নং চিত্র—প্রাথমিক তড়িৎ-কোষ
১—তামার দণ্ড, ২—দস্তার দণ্ড, ৩—লঘু সালফিউরিক অ্যাসিড,
৪—বিদ্যুৎবাহী তামার তার।

পৃথক রকমের রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটে। ফলে অ্যাসিড থেকে বহুসংখ্যক ইলেকট্রন এসে দস্তার দণ্ডটির উপর ছাড়া পায় অর্থাৎ দস্তার দণ্ডটির উপর ইলেকট্রনের পরিমাণ ও চাপ স্বাভাবিক অপেক্ষা বেশী হয়। তেমনি ওদিকে তামার দণ্ড থেকে বহু ইলেকট্রনকে অ্যাসিড নিয়ে নেয়, অর্থাৎ তামার দণ্ডে ইলেক্ট্রনের উপস্থিতির পরিমাণ ও চাপ স্বাভাবিক অপেক্ষা কম হয়। এই অবস্থায় দস্তার দণ্ড ইলেকট্রন দিতে চায়, আর তামার দণ্ড ইলেকট্রন পেতে চায়। কাজেই একটি তার দিয়ে মাঝখানে তাপশক্তি বা যান্ত্রিক শক্তির মধ্য দিয়ে যেতে হয় না। কাজেই এই তড়িৎ-কোষে শক্তির অপচয় খুবই কম হয়। টর্চ লাইটে ব্যবহৃত ড্রাই সেল একশ্রেণীর প্রাথমিক তড়িৎ-কোষ।

এবার স্টোরেজ সেল বা তড়িৎ-সঞ্চায়ক কোষের কথা ধরা যাক। মোটর গাড়ীতে ব্যবহৃত এই স্টোরেজ সেলের অন্য নাম লেড-অ্যাসিড সেল; কারণ এর মধ্যে লঘু সালফিউরিক অ্যাসিডে লেড বা সীসার একটি পাত ডুবানো থাকে, অন্য পাতটি হয় সীসার পাতের

উপর সীসার পার-অক্সাইডের আস্তরণ মাখিয়ে। সহজে ধারণা দেবার জন্যে এভাবে বলা হলো; সঞ্চয়ক কোষের আসল গঠন আরো জটিল। এই অবস্থায় পাত দুটির শীর্ষদেশ একটি তামার তার দিয়ে যোগ করে দিলে তার মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হতে থাকে। এই বিদ্যুৎকে তারের মাধ্যমে ইচ্ছামত কাজে লাগানো যায়। কোষ থেকে এই ভাবে বিদ্যুৎ নিতে থাকলে রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলে অ্যাসিডে ডুবানো দুটি পাতই ক্রমে লেড-সালফেট ($PbSO_4$) হয়ে যায়। একে বলে কোষের মোক্ষণ বা ডিস্‌চার্জ হওয়া। মোক্ষণ হবার পর বাইরে থেকে উল্টো মুখে কোষের মধ্যে বিদ্যুৎ-প্রবাহ পাঠালে তড়িৎ-দণ্ড দুটির সঙ্গে অ্যাসিডের উল্টো রকম রাসায়নিক বিক্রিয়া হয় এবং এভাবে বিদ্যুৎ-শক্তি রাসায়নিক শক্তিরূপে কোষে সঞ্চিত হয়। এই হলো কোষকে চার্জ করা। এইভাবে একই কোষকে অনেক দিন পর্যন্ত বার বার চার্জ করে বৈদ্যুতিক শক্তির উৎস হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে।

এখানেও দেখা যাচ্ছে সঞ্চয়ক কোষে রাসায়নিক শক্তিরূপে যে বিদ্যুৎ সঞ্চিত রাখা হয়, তাকে সরাসরিই আবার বিদ্যুৎরূপে ফেরৎ পাওয়া যায়, মাঝখানে তাপ বা অন্য কোন শক্তির মধ্য দিয়ে তাকে আত্মপ্রকাশ করতে হয় না। কাজেই এক্ষেত্রে শক্তির অপচয় খুবই কম হয়। হিসাব করে দেখা গেছে, একটি লেড-অ্যাসিড সঞ্চয়ক ব্যাটারীকে (একাধিক কোষকে পরপর সাজিয়ে বৈদ্যুতিক সংযোগে যুক্ত করলে তাদের একত্রে বলে ব্যাটারী) চার্জ করবার সময় যতটা বিদ্যুৎ-শক্তি বাইরে থেকে ব্যাটারীর মধ্যে পাঠানো হয়, তার শতকরা প্রায় ৭৫ ভাগ আবার বিদ্যুৎ হিসাবে ব্যাটারীর কাছ থেকে ফেরৎ পাওয়া যায়। তাহলে বলা যায় – লেড-অ্যাসিড ব্যাটারীর কার্য-ক্ষমতা ৭৫%। একে বলে ব্যাটারীর শক্তি বিষয়ক কর্মক্ষমতা। ব্যাটারীর অন্য রকম দক্ষতার হিসাবও আছে।

ফুয়েল সেল অর্থাৎ জ্বালানী-কোষের সুবিধা কি?

তড়িৎ-কোষে রাসায়নিক শক্তিকে সরাসরি বিদ্যুৎ-শক্তিতে পরিণত করা হয় বলে তাতে শক্তির অপচয় কম। ফুয়েল সেলেও তাই করা হয়। তাহলে ফুয়েল সেলের সুবিধা কি? সুবিধা হলো —সাধারণ তড়িৎ-কোষে, যেখানে তামা, দস্তা, সীসা প্রভৃতি ধাতু ব্যবহার করা হয় এবং রাসায়নিক বিক্রিয়ায় এই ধাতুগুলি ক্ষয়িত হয়ে তবেই বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়—সেখানে জ্বালানী-কোষে সস্তা জ্বালানী পদার্থ, যেমন—হাইড্রোজেন গ্যাস, কার্বন মনোক্সাইড, হাইড্রোকার্বন গ্যাস (এখন আবার নানারকম কঠিন জ্বালানী ব্যবহারের চেষ্টাও হচ্ছে) প্রভৃতি ব্যবহার করা যেতে পারে। অবশ্য জ্বালানী-কোষেও ধাতব তড়িৎ-দণ্ড—সাধারণতঃ নিকেলের দণ্ড ব্যবহার করা হয়, কিন্তু সেগুলির কোন ক্ষয় হয় না। এর ফলে বিদ্যুৎ উৎপাদনের ব্যয় হ্রাস পায়। চলিত পদ্ধতি অনুযায়ী এই সব সস্তা জ্বালানী পুড়িয়ে তার তাপের শক্তিতে জেনারেটর ঘুরিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে গেলে শক্তির প্রভূত অপচয়ের ফলে বিদ্যুৎ উৎপাদনে ব্যয় বেশী পড়ে। আবার তড়িৎ-কোষে যেখানে শক্তির অপচয় কম, সেখানেও দামী ধাতু খরচের ফলে বিদ্যুৎ উৎপাদনের ব্যয় বেশী পড়ে। কাজেই সস্তা জ্বালানী ব্যবহার করে তড়িৎ-কোষের প্রক্রিয়ায় তা থেকে সরাসরি বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে পারলে দুদিক থেকেই সুবিধা হয় এবং বিদ্যুৎ উৎপাদনের ব্যয় অনেক পরিমাণে হ্রাস পায়।

তাছাড়াও জ্বালানী-কোষের আরো কতকগুলি সুবিধা আছে। তড়িৎ-কোষে শরীরের পক্ষে ক্ষতিকর নানারকম রাসায়নিক গ্যাস বা অ্যাসিড-

বাষ্প নির্গত হয়ে বায়ুকে দূষিত করে, জ্বালানী-কোষে তা হয় না। অন্তদিকে টার্বাইন বা ইঞ্জিনের সাহায্যে জেনারেটর ঘুরিয়ে যখন বিদ্যুৎ উৎপন্ন করা হয়, তখন ঐ সব ঘূর্ণায়মান যন্ত্র থেকে জোরালো শব্দ উত্থিত হয়ে গোলমালের সৃষ্টি করে, জ্বালানী-কোষে সে রকম কোন শব্দ থাকে না। তাছাড়া জ্বালানী-কোষের আরেকটা বড় সুবিধা হলো এই যে, এর জ্বালানী শেষ হওয়া মাত্র নতুন জ্বালানী সংযোগ করলেই তাথেকে বিদ্যুৎ পাওয়া যায়। সঞ্চয়ক কোষকে চার্জ করবার জন্যে যেমন সময় লাগে এবং বাইরে থেকে বিদ্যুৎকে কোষের মধ্যে ঢোকাতে হয়, জ্বালানী-কোষে তেমন কিছুর দরকার নেই, অথচ তা সঞ্চয়ক ব্যাটারীর মতই বহু সময় যাবৎ বিদ্যুৎ সরবরাহ করতে পারে। কাজেই অদূর ভবিষ্যতে মোটর গাড়ী প্রভৃতিতে সঞ্চয়ক ব্যাটারীর স্থানে জ্বালানী-কোষের ব্যবহার খুবই সম্ভব। জ্বালানী-কোষ কালক্রমে খুবই হাল্কা এবং ছোট হয়ে যাবে, তখন যে কোন কাজে যত্রতত্র তাকে বহন করে নিয়ে যাওয়া যাবে। জ্বালানী-কোষের একটা বড় ব্যবহার হবে বিদ্যুৎ-শক্তির দ্বারা চালিত নানারকম যানবাহন চালাবার জন্যে। বৃটেন এবং ফ্রান্স এই কাজে খানিকটা অগ্রসর হয়েছে, আমেরিকা জ্বালানী-কোষকে মহাকাশযানে ব্যবহারের চেষ্টায় নিযুক্ত, সুইডেন ডুবোজাহাজ চালাবার শক্তির উৎস হিসাবে জ্বালানী-কোষকে ব্যবহার করতে সচেষ্ট। পৃথিবীর অন্যান্য শিল্প-প্রধান দেশ জ্বালানী-কোষকে আরো উন্নত ও কার্যকরী করে গড়ে তোলবার কাজে নিজেদের নিয়োজিত করেছে।

জ্বালানী-কোষের উদ্ভাবক কে ?

১৮০১ সালে বৃটিশ বৈজ্ঞানিক সার হামফ্রে ডেভি একটা কার্বন-কোষ (Carbon cell) তৈরি করেছিলেন। সেটা সাধারণ গৃহতাপে বিদ্যুৎ উৎপন্ন করতো। কেউ কেউ এটিকেই জ্বালানী-কোষের প্রাথমিক পর্ব বলে মনে করেন। কিন্তু বৃটিশ আইনজীবি ও বৈজ্ঞানিক সার উইলিয়াম গ্রোভ-কেই জ্বালানী-কোষের জনক হিসাবে গণ্য করা হয়। ১৮৩৯ সালে তিনি একটি গ্যাস-সেল তৈরি করেছিলেন, যাতে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের মিলনের ফলে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়েছিল। একটি পাত্রে রাখা লঘু সালফিউরিক অ্যাসিডের মধ্যে প্ল্যাটিনামের দুটি পাতকে পরস্পর থেকে কিছু দূরে আংশিকভাবে ডুবিয়ে রেখে তাদের শীর্ষদেশ দুটিকে একটি তামার তার দিয়ে যুক্ত করে ঐ পাত দুটির একটির সংস্পর্শে গ্যাসীয় হাইড্রোজেন এবং অপরের সংস্পর্শে গ্যাসীয় অক্সিজেন রেখে তিনি দেখলেন যে, ঐ সংযোগ-তারের মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হচ্ছে। কারণ উক্ত সংযোগ-তারের মাঝখানে একটা গ্যালভানোমিটার যন্ত্র যুক্ত করে দেখা গেল যে, তার কাঁটা একই দিকে ঘুরে যাচ্ছে (২নং চিত্র দ্রষ্টব্য)।

গ্রোভের এই গবেষণা আর বেশী দূর অগ্রসর হয় নি। তারপর বহু বছর পরে নানা দেশের বৈজ্ঞানিকদের দৃষ্টি আবার এদিকে পড়তে আরম্ভ করে। গ্রোভের ঠিক একশত বছর পরে, সম্ভবতঃ ১৯৩৮ সাল নাগাদ বৃটিশ বৈজ্ঞানিক এফ. টি. বেকন জ্বালানী-কোষকে বাস্তব রূপ দেবার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। ১৯৪৭-৪৮ সাল থেকে তাঁর নেতৃত্বে কেম্ব্রিজের একদল বৈজ্ঞানিক এবিষয়ে গভীর মনঃসংযোগ করেন। প্রায় বারো বছরের অক্লান্ত চেষ্টায় এঁদের গবেষণা সাফল্য লাভ করে এবং ১৯৫৯ সালে তাঁরা সর্বপ্রথম জনসমক্ষে তাঁদের তৈরি একটি জ্বালানী-কোষের (আসলে সেটি ছিল একটি জ্বালানী-কোষ ব্যাটারী) কার্যক্ষমতা পরীক্ষা করে দেখান। এই কোষটির শক্তি উৎপাদনের ক্ষমতা ছিল পাঁচ কিলোওয়াট এবং এতে ২৪ ভোল্টের বিদ্যুৎ-চাপ উৎপন্ন হয়েছিল। বেকন দেখালেন যে, এই কোষ থেকে শক্তি নিয়ে মালপত্র ওঠানো-নামানোর জন্যে ব্যবহৃত একরকম ট্রাক

(Fork Lift Truck) চালানো যায়। এই কোষে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন গ্যাসকে ধীরে ধীরে মিলিয়ে জল তৈরি হতো এবং তারই ফলে উৎপন্ন হতো বিদ্যুৎ।

বৃটেন ছাড়া অন্যান্য দেশেও জ্বালানী-কোষের উপর অনেক কাজ হয়েছে। আমেরিকায় জেনারেল ইলেক্‌ট্রিক কোম্পানী, ন্যাশন্যাল কার্বন কোম্পানী প্রভৃতি এবিষয়ে কাজ সুরু করেন। অন্যান্য দেশের প্রাথমিক গবেষকদের নাম দাভ্‌তিয়ান (রাশিয়া), ইউস্তি (জার্মেনী), মার্কো (অষ্ট্রিয়া) প্রভৃতি। ফ্রান্সের মারকুসি-তে অবস্থিত জেনারেল ইলেক্‌ট্রিক কোম্পানিও অনেক দিন পূর্বেই এবিষয়ে কাজ সুরু করেন।

জ্বালানী-কোষ কিভাবে কাজ করে?

আসল জ্বালানী-কোষগুলির গঠন ও তাদের মধ্যেকার ক্রিয়া-ব্যবস্থা কিছু জটিল। এখানে ব্যাপারটা সহজে বোঝাবার জন্যে বেকনের তৈরী কোষের মূল ক্রিয়াকৌশল আমরা যথাসম্ভব সহজভাবে বলবার চেষ্টা করবো।

একটি পাত্রে শতকরা ৩৭ ভাগ পটাসিয়াম হাইড্রক্সাইডের জলীয় দ্রবণ নেওয়া হলো এবং তার মধ্যে সচ্ছিদ্র নিকেলের (Porous nickel) তৈরি দুটি পাতকে পরস্পর থেকে কিছুটা দূরে আংশিকভাবে ডুবিয়ে রাখা হলো ও তাদের শীর্ষদেশ দুটি একটি তামার তার দিয়ে যুক্ত করে দেওয়া হলো। এবার একটি দণ্ড বরাবর হাইড্রোজেন গ্যাস এবং অন্য দণ্ড বরাবর অক্সিজেন গ্যাস এমন সুকৌশলে ও ধীরগতিতে অবিরাম পাঠানো হতে থাকলো যে, গ্যাস দুটি নিজ নিজ পাতে প্রথমে পৃষ্ঠশোষিত হয় (Adsorption)। পাত দুটির শীর্ষদেশ তারের দ্বারা যুক্ত থাকলে একদিকে ঐ শোষিত গ্যাস দুটি পাত থেকে আয়নিত অবস্থায় দ্রবণে প্রবেশ করতে থাকবে, আর অন্য দিকে ঠিক তখনই ঐ সংযোগকারী
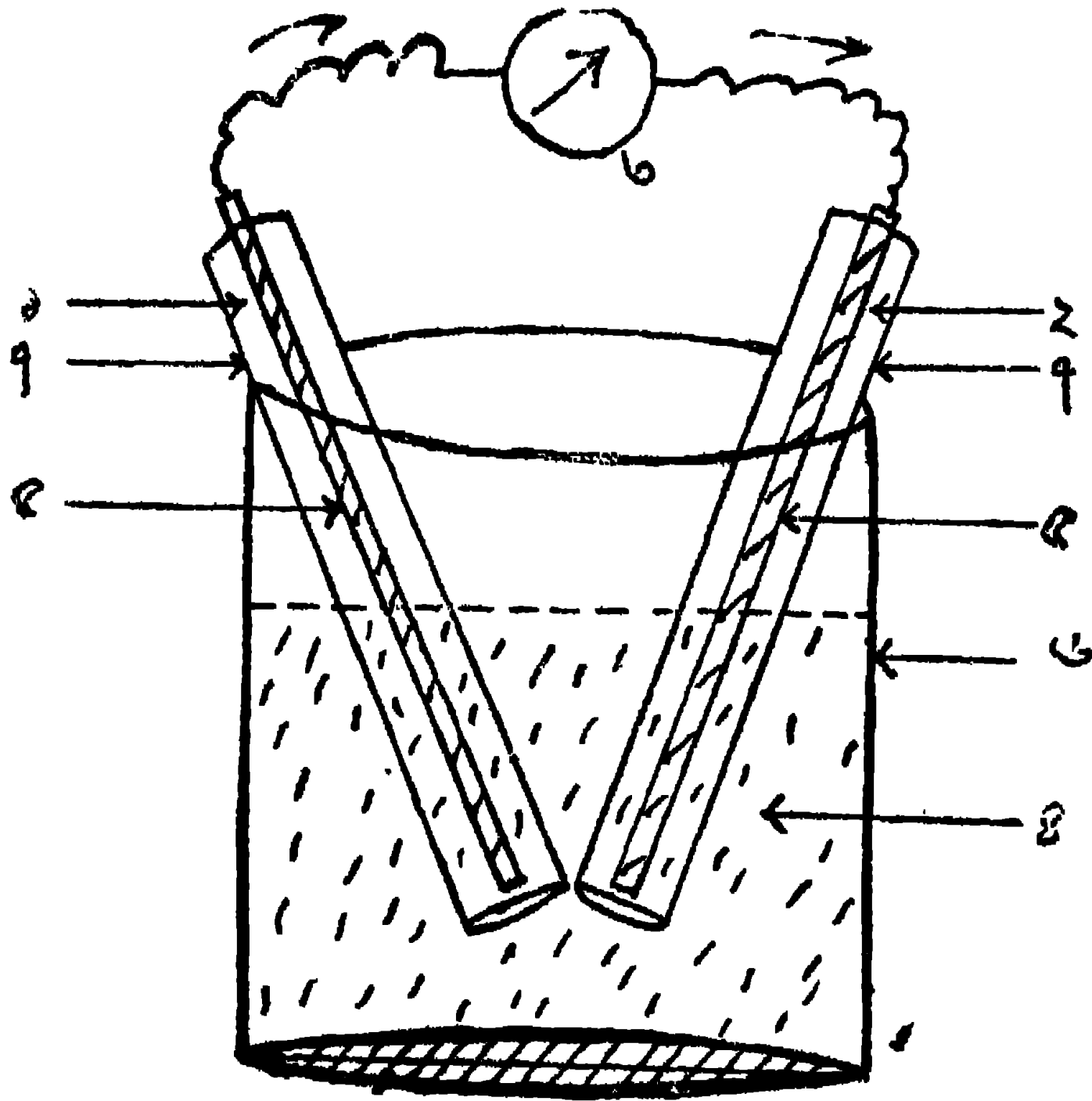
২নং চিত্র। গ্রোভের গ্যাস-সেল।
১—অক্সিজেন গ্যাস, ২—হাইড্রোজেন গ্যাস, ৩—গ্যালভানোমিটার, ৪—লঘু সালফিউরিক অ্যাসিড, ৫—প্ল্যাটিনাম পাত, ৬—কাচপাত্র, ৭—কাচ-নল।

তারের পথে হাইড্রোজেনবাহী দণ্ড থেকে ইলেকট্রনগুলি অক্সিজেনবাহী দণ্ডের দিকে যেতে থাকবে। এই প্রক্রিয়া ক্রমাগত চলতে থাকবার অর্থ—ঐ সংযোগ তারের মধ্যে বিদ্যুৎ-প্রবাহ উৎপন্ন হওয়া। এদিকে দ্রবণে হাইড্রোজেন আয়ন (H^+) ও অক্সিজেন আয়ন (O^{-2}) প্রবেশের অর্থ সেখানে জল উৎপন্ন হওয়া। এই জলকে প্রয়োজনমত দ্রবণ থেকে বিশেষ কৌশলে আলাদা করে নেওয়া যায়। এখানে আরেকটা কোষ তৈরি হয়েছে। এমন কি, আজকাল কয়লাকেও (তাকে গ্যাসে পরিণত করে নিয়ে) জ্বালানী-কোষের জ্বালানীরূপে ব্যবহার করে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা সম্ভব হয়েছে।

জ্বালানী-কোষের প্রকারভেদ

কোষে কি জ্বালানী ব্যবহার করা হয়েছে, তার উপর নির্ভর করে জ্বালানী-কোষের শ্রেণী-বিভাগ করা যায়। কিন্তু সাধারণতঃ এগুলির
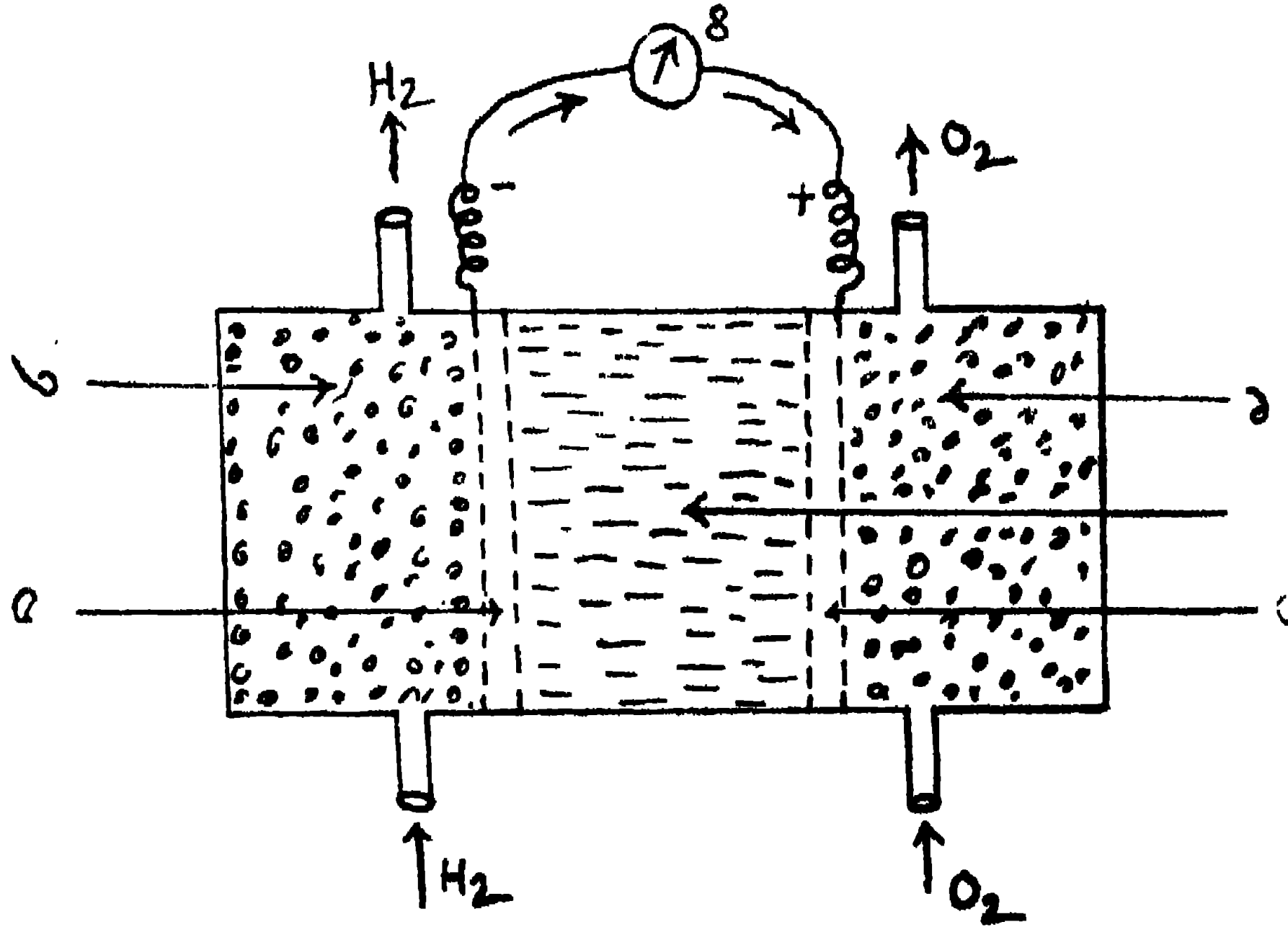
৩নং চিত্র। দাভ্‌তিয়ানের জ্বালানী-কোষ।
১—নিকেলের দ্বারা অনুবিদ্ধ ও সক্রিয়কৃত অঙ্গার তড়িৎ-দ্বার, ২—পটাসিয়াম হাইড্রক্সাইডের দ্রবণ, ৩—রৌপ্যের দ্বারা অনুবিদ্ধ ও সক্রিয়কৃত অঙ্গার তড়িৎ-দ্বার, ৪—গ্যালভানোমিটার, ৫—মোম মাখানো পর্দা, এর মধ্য দিয়ে জল যেতে পারে না, কিন্তু আয়নগুলি যেতে পারে।

কথা উল্লেখযোগ্য যে, জ্বালানী-কোষে যে নিকেল দণ্ডগুলি ব্যবহার করা হয়, সেগুলির কোন ক্ষয় হয় না, কারণ সেগুলির সঙ্গে দ্রবণের বা গ্যাসের কোন রাসায়নিক বিক্রিয়া হয় না।

বেকনের তৈরি এই কোষে হাইড্রোজেন গ্যাসই জ্বালানী। কিন্তু হাইড্রোজেনের দাম নেহাৎ কম নয়। কাজেই কার্বন-মনোক্সাইড বা হাইড্রোকার্বন গ্যাস ব্যবহার করে এখন জ্বালানী-শ্রেণীবিভাগ হয় কোষ কি অবস্থায় কাজ করছে অর্থাৎ তার তাপ কত এবং তাতে ব্যবহৃত গ্যাসের চাপই বা কি, তার উপর নির্ভর করে। এই হিসাবে তিন শ্রেণীর জ্বালানী-কোষ দেখা যায়:

(১) নিম্নতাপ ও নিম্নচাপ কোষ, (২) মধ্যম-তাপ ও উচ্চচাপ কোষ, (৩) উচ্চতাপ কোষ। এগুলি সম্পর্কে দু-চারকথা বলা যেতে পারে:

(১) নিম্নতাপ ও নিম্নচাপ কোষ:

রাশিয়ার দাভ্তিয়ান এবং আমেরিকার ইউনিয়ন কার্বাইড কোম্পানী এই শ্রেণীর কোষ প্রথম তৈরি করেন। উভয় ক্ষেত্রেই হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন গ্যাস ব্যবহৃত হয়। উভয়ে যথাক্রমে সাধারণ গৃহতাপে ও ২৫° সে. থেকে ৭০° সে. পর্যন্ত তাপ ব্যাপ্তির মধ্যে কাজ করে। পটাসিয়াম হাইড্রক্সাইডের জলীয় দ্রবণ এই শ্রেণীর কোষে তড়িৎ-বিশ্লেষক (Electrolyte) রূপে ব্যবহৃত হয়। দাভ্তিয়ানের তৈরি কোষের (৩নং চিত্র দ্রষ্টব্য) তড়িৎ-দ্বার (Electrode) মোম মাখানো পর্দা থাকে যার মধ্যে জল যেতে পারে না, কিন্তু আয়নগুলি যেতে পারে।

(২) মধ্যম তাপ ও উচ্চ চাপের কোষ :

এই বিষয়ে শ্রেষ্ঠ উদাহরণ বেকনের কোষ। এর ক্রিয়াকালীন তাপ ২০০° সে. এবং চাপ বর্গইঞ্চি প্রতি ৩০০ থেকে ৪০০ পাউণ্ড। তড়িৎ-বিশ্লেষক পটাসিয়াম হাইড্রোক্সাইডের জলীয় দ্রবণ (৩৭%)। এর তড়িৎ-দ্বার দুটি কণিকাভূত নিকেল থেকে পিণ্ডবন্ধন প্রক্রিয়ায় (Sintering) তৈরি ১/১৬ ইঞ্চি পুরু সছিদ্র ফলক, যার এক পিঠের (যে পিঠের
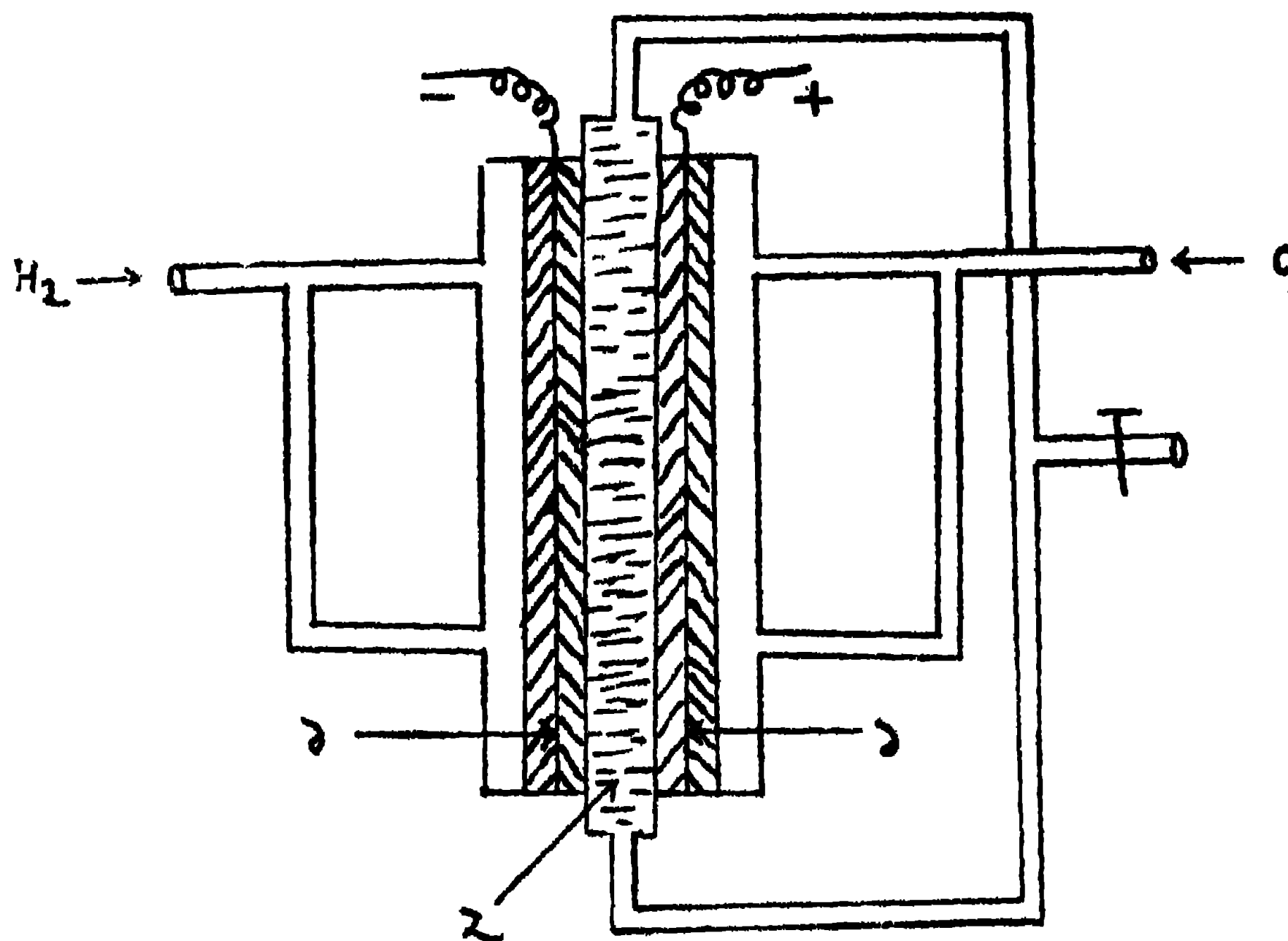
৪নং চিত্র। বেকনের জ্বালানী-কোষ।

১—রন্ধ্রময় নিকেল তড়িৎ-দ্বার। ২—পটাসিয়াম হাইড্রক্সাইডের দ্রবণ।

সংস্পর্শে গ্যাস থাকে) রন্ধ্রগুলির মাপ ৩০ মাইক্রন (এক মাইক্রন হলো এক মিলিমিটারের হাজার ভাগের একভাগ, 10^{-3} মি. মি.), আর অন্য পিঠের (যার সংস্পর্শে তড়িৎ-বিশ্লেষক থাকে) রন্ধ্রগুলির মাপ ১৬ মাইক্রন। এরকম দুটি তড়িৎ-দ্বারের ফলক পাশাপাশি রেখে তাদের মধ্যবর্তী স্থান জুড়ে (অর্থাৎ ফলক দুটির সংস্পর্শে) রাখা হয় তরল তড়িৎ-বিশ্লেষক। আর তাদের বাইরের দিকের দুটি পিঠ বরাবর (অর্থাৎ তাদের সংস্পর্শে) দুটি যথাক্রমে বিজারিত রৌপ্য ও বিজারিত নিকেল কণিকাসমূহের দ্বারা অনুবিদ্ধ (Impregnated) এবং সক্রিয়কৃত অঙ্গার (Activated carbon) থেকে তৈরি দুটি সছিদ্র প্রশস্ত ফলক, যাদের মধ্য দিয়ে যথাক্রমে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন গ্যাসকে সহজেই প্রবাহিত করানো যায় এবং যাদের মধ্যবর্তী স্থান তড়িৎ-বিশ্লেষক দ্রবণের দ্বারা পূর্ণ থাকে। উভয় পার্শ্বে, দ্রবণ ও তড়িৎ-দ্বারের মধ্যবর্তী স্থানে একটি

দুটি গ্যাস প্রবাহিত করানো হয় (৪নং চিত্র দ্রষ্টব্য)।

(৩) উচ্চ তাপের কোষ

আজকাল এই শ্রেণীর নানারকম কোষ তৈরি হচ্ছে। এর একটি পুরনো উদাহরণ হলো চেম্বারের কোষ। এর ক্রিয়াকালীন তাপ ৫৫০°-৭০০° সে.। যে সব জ্বালানী নিম্ন বা মধ্যম তাপে যথেষ্ট সক্রিয় নয়, যেমন—কার্বন মনোক্সাইড, হাইড্রোকার্বন প্রভৃতি, তাদের এই উচ্চ তাপের কোষে ব্যবহার করা যায়। এই কোষের তড়িৎ-বিশ্লেষক সোডিয়াম ও লিথিয়াম কার্বনেটের ইউটেক্টিক মিশ্রণ—গলিত অবস্থায় এবং তড়িৎ-দ্বার হলো রৌপ্যের দ্বারা অনুবিদ্ধ জিঙ্ক-অক্সাইডের দুটি ছিদ্রময় ফলক। এই দুটি তড়িৎ-দ্বারের মধ্যবর্তী স্থানে (এবং উভয়ের সংস্পর্শে) পিণ্ডবদ্ধ ম্যাগ্‌নেশিয়া থেকে তৈরি অপর একটি রন্ধ্রময় (রন্ধ্রের মাপ ২৫ মাইক্রন) ফলক থাকে, যার রন্ধ্রগুলির মধ্যে উক্ত তড়িৎ-বিশ্লেষকটি গলিত অবস্থায় অবস্থান করে (৫নং চিত্র দ্রষ্টব্য)।

৫নং চিত্র। চেম্বারের জ্বালানী-কোষ।
১—রৌপ্যের দ্বারা অনুসিক্ত রন্ধ্রময় জিঙ্ক-অক্সাইড তড়িৎ-দ্বার, ২—তড়িৎ-বিশ্লেষক ধারক রন্ধ্রময় ম্যাগ্‌নেশিয়া ঝিল্লী, ৩—হাওয়া (অক্সিজেন), ৪—জ্বালানী গ্যাস।

জ্বালানী-কোষ সম্বন্ধে নানা খবর

১৯৬৩ সালে জেনারেল ইলেকট্রিক কোম্পানী এক উচ্চ তাপের (২০০০° ফা.) জ্বালানী-কোষ উদ্ভাবন করেন, যাতে জ্বালানী হিসাবে প্রাকৃতিক গ্যাস (Natural gas) ব্যবহার করা হয়। এরকম প্রতিটি কোষে বিদ্যুৎ-চাপ উৎপন্ন হয় ০·৭ ভোল্ট এবং উৎপন্ন বিদ্যুৎ-প্রবাহের ঘনত্ব (Current density) হয় বর্গফুট প্রতি ১৫০ অ্যাম্পিয়ার।

নিউইয়র্কের জেনারেল ইলেকট্রিক রিসার্চ লেবরেটরী ১৯৬৩ সালে একটা মধ্যম তাপের (২৫০°-৪০০° ফা.) জ্বালানী-কোষ উদ্ভাবন করেন, যাতে জ্বালানী হিসাবে প্রোপেন গ্যাস বা প্রাকৃতিক গ্যাস ব্যবহার করা হয়। এই কোষে বর্গফুট প্রতি ২৫ অ্যাম্পিয়ারের প্রবাহ-ঘনত্ব পাওয়া গেছে।

১৯৬৪ সালে শেল রিসার্চ লিমিটেডের 'থ্রনটন গবেষণা কেন্দ্র' একটি নিম্নচাপের (৭০° সে.) জ্বালানী-কোষ তৈরি করেন, যাতে জ্বালানী হিসেবে

মিথেনল ব্যবহার করা হয়। এই কোষে প্রায় ৫ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়।

১৯৬৫ সালে আমেরিকার ওয়েষ্টিং হাউস রিসার্চ লেবরেটরী ৪০০টি জ্বালানী-কোষ নিয়ে গঠিত একটি উচ্চ তাপের (১৮০০° ফা.) ব্যাটারী তৈরি করেন, যা থেকে ১০০ ওয়াট বিদ্যুৎ পাওয়া যায়। এই ব্যাটারীর সব চেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হলো, এতে জ্বালানী হিসেবে ব্যবহার করা হয় কয়লা। উত্তপ্ত কয়লার উপর বাষ্প পাঠিয়ে হাইড্রোজেন ও কার্বন মনোক্সাইড গ্যাসের যে মিশ্রণ পাওয়া যায়, তাই আসলে এই কোষের জ্বালানী। এই পদ্ধতিতে ভবিষ্যতে কয়লা থেকে সরাসরি বিপুল পরিমাণ বিদ্যুৎ উৎপন্ন হবার সম্ভাবনা আছে।

১৯৬৫ সালের ২১শে অগাষ্ট আমেরিকা কর্তৃক উৎক্ষিপ্ত জেমিনি-৫ নামক মহাকাশযানে (এতে দু-জন মহাকাশচারী কুপার ও কনরাড ছিলেন) দুটি হাইড্রোজেন-অক্সিজেন জ্বালানী-কোষের ব্যাটারী ব্যবহার করা হয়। এই ব্যাটারী থেকে উৎপন্ন বিদ্যুতের দ্বারা মহাকাশযানের ভিতরের নানারকম যন্ত্রপাতি চালু রাখা হয়েছিল। এই দুটির একত্রে ওজন ছিল মাত্র ১৩৪ পাউণ্ড এবং এগুলি থেকে উৎপন্ন হতো ২ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ। সাধারণ স্টোরেজ ব্যাটারী থেকে এই পরিমাণ বিদ্যুৎ আট দিন ধরে পেতে হলে (মহাকাশযানটি প্রায় আট দিন আকাশে ছিল) যতগুলি ব্যাটারী লাগতো, তাদের মোট ওজন দাঁড়াতো প্রায় এক-টন। ব্যবহৃত জ্বালানী-কোষের ব্যাটারী দুটির প্রতিটির আয়তন ছিল এক ফুট ব্যাস ও দু ফুট উঁচু একটা ছোট ড্রামের মত। এগুলি থেকে প্রতিদিন ২ গ্যালনেরও বেশী বিশুদ্ধ জল উৎপন্ন হতো। দু-জন মহাকাশচারীর আট দিনের প্রয়োজনীয় সবটুকু পানীয় জল এই ব্যাটারী দুটি থেকেই নেওয়া হয়েছিল।

অদূর ভবিষ্যতে (১৯৭০ সালের আগেই) তিন জন মহাকাশচারীসমেত চাঁদে অভিযান চালাবার জন্যে আমেরিকা যে অ্যাপোলো নামক মহাকাশযান তৈরি করছে, তাতে বিদ্যুতের উৎস এবং মহাকাশচারীদের ১৪ দিনের মত প্রয়োজনীয় সমস্ত পানীয় জল সরবরাহের জন্যে জ্বালানী-কোষের ব্যাটারী ব্যবহার করা হবে। ইষ্ট হার্ডফোর্ডে অবস্থিত প্র্যাট অ্যাণ্ড হুইট্নি এয়ার-ক্র্যাফট নামক প্রতিষ্ঠানের উপর এই ব্যাটারী তৈরির ভার পড়েছে। তাঁরা ইতিমধ্যেই যে ব্যাটারী তৈরি করেছেন, তাতে ২২ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপন্ন হচ্ছে এবং ৪০০ ঘণ্টায় তা থেকে ৭৭ গ্যালন জল পাওয়া গেছে। নাসা (NASA National Aeronautics and Space Administration) উক্ত প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে এই ব্যাটারীগুলি গ্রহণ করেছেন।

সম্প্রতি এই প্রতিষ্ঠান (প্র্যাট এণ্ড হুইট্নি এয়ার ক্র্যাফট) এমন একটি জ্বালানী-কোষ তৈরি করেছেন, যাতে হাইড্রোজেনের বদলে প্রাকৃতিক গ্যাস (Natural gas) এবং অক্সিজেনের বদলে হাওয়া ব্যবহার করা যায়। এতে ৩২ ভোল্ট বিদ্যুৎ-চাপে ৫০০ ওয়াট বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়। এই কোষের আর একটা বৈশিষ্ট্য হলো এই যে, এতে প্রাকৃতিক গ্যাসের পরিবর্তে পেট্রোল, কেরোসিন প্রভৃতি নানা রকম তরল হাইড্রোকার্বন জ্বালানী ব্যবহার করা যায়।

নাসা-র সঙ্গে অপর এক কনট্রাক্ট অনুযায়ী আমেরিকার এলিস-চামার্‌স্ নামক প্রতিষ্ঠান ১৯৬৫ সালে একটি জ্বালানী-কোষের ব্যাটারী তৈরি করেন, যেটা একটি মহাকাশযানে ৬০ দিন ধরে ২ কিলোওয়াট পরিমাণ বিদ্যুৎ (চাপ ২৮ ভোল্ট) দিতে পারবে। এতে প্রতিদিন ২½ থেকে ৩ গ্যালন পরিমাণ জল উৎপন্ন হয়। এই কোষের সব চেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য এই যে, এটা মহাকাশের অত্যন্ত নিম্নতাপে (-৬০° সে.) সহজভাবেই কাজ করে।

ফ্রান্সে জ্বালানী-কোষ সম্পর্কে গবেষণা

সাম্প্রতিক এক খবরে প্রকাশ, ফ্রান্সের মারকুসিতে অবস্থিত জেনারেল ইলেকট্রিক কোম্পানীর গবেষণা কেন্দ্রের বৈজ্ঞানিকগণ জ্বালানী-কোষ সম্পর্কে বেশ কিছু কাজ করেছেন। তাঁরা তড়িৎ-দ্বার হিসেবে নিকেল-রৌপ্যের সচ্ছিদ্র পাত ব্যবহার করে খুব সুফল পেয়েছেন। এগুলি বহুদিন ধরে খুব দক্ষতার সঙ্গে কাজ দেয় এবং সহজে এদের উপর কোন বিবক্রিয়া হয় না। এদের তৈরি ১০ ভোল্টের একটি জ্বালানী-কোষ তিন বছর ধরে ক্রমাগত কাজ করবার পর এখনও একই রকম দক্ষতার সঙ্গে কাজ করে চলেছে। মাঝে মাঝে এটাকে সট-সার্কিট করা বা এর গ্যাস সরবরাহ হেরফের করা প্রভৃতি নানাভাবে একে ব্যতিব্যস্ত করা সত্ত্বেও এর দক্ষতা একটুও কমে নি।

কোষের মধ্যে অতি সহজেই হাইড্রোজেন গ্যাস যাতে সরবরাহ করা যায়, সে জন্যে তাঁরা ক্যালসিয়াম হাইড্রাইড নামক রাসায়নিকটি ব্যবহার করছেন। ক্যালসিয়াম হাইড্রাইডে জলসংযোগ করলেই তাথেকে হাইড্রোজেন গ্যাস উৎপন্ন হয়। কাজেই কোষের দ্রবণের মধ্যে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন সংযোগে যে জল উৎপন্ন হয়, দ্রবণ থেকে তাকে বিশেষ কৌশলে আলাদা করে নিয়ে সেই জলকেই আবার ক্যালসিয়াম হাইড্রাইডের উপর প্রয়োগ করা হয়। এই প্রক্রিয়া চক্রবৎ চলে।

মারকুসি গবেষণা কেন্দ্রের বৈজ্ঞানিকগণ এখন অনেকগুলি করে ছোট আকারের জ্বালানী-কোষকে অল্প পরিসরের মধ্যে বিশেষ কৌশলে সাজিয়ে এবং তাদের বৈদ্যুতিক সংযোগে যুক্ত করে তাথেকে বিভিন্ন চাপ ও বিভিন্ন শক্তির বিদ্যুৎ আহরণের চেষ্টায় নিয়োজিত আছেন। এভাবে ১১টি ক্ষুদ্রকার কোষকে পরস্পরের বৈদ্যুতিক সমান্তরালে সংযুক্ত করে তাথেকে ৪০ অ্যাম্পিয়ার প্রবাহ শক্তির এবং ০·৭৫ ভোল্ট চাপের বিদ্যুৎ উৎপন্ন করা সম্ভব হয়েছে। তাঁরা ১১টি করে কোষকে এভাবে একত্রিত করে একটি করে মডিউল (Module) তৈরি করেছেন। এরকম গোটাকতক মডিউলকে পাশাপাশি সাজিয়ে যুক্ত করলে তাথেকে যুগপৎ উচ্চ শক্তির ও উচ্চ চাপের বিদ্যুৎ পাওয়া যায়। এই ব্যাটারী থেকে অতি সহজেই প্রয়োজনমত নানা চাপের ও নানা শক্তির বিদ্যুৎ আহরণ করা যেতে পারে। ১৯৬৫ সালে এঁদের উদ্ভাবিত ২৪ ভোল্ট চাপের এবং ১ কিলোওয়াট পর্যন্ত শক্তি উৎপাদনক্ষম একটি জ্বালানী-কোষ প্যারিসের 'পালেস অব ডিস্কভারী'তে রক্ষিত আছে। এই কোষটির বাইরের চেহারা নিতান্তই একটা ছোটখাটো রেফ্রিজারেটরের মত।

জৈব জ্বালানী-কোষ

নর্দমার ময়লা ও গোবর থেকে বিদ্যুৎ: অতি আধুনিক কালে জৈব রাসায়নিক জ্বালানী-কোষের (Biochemical fuel cell) বা সংক্ষেপে জৈবকোষের (Biocell) উদ্ভব হয়েছে। নর্দমার ময়লা, পচনশীল গোবর প্রভৃতি এক্ষেত্রে জ্বালানী। এরকম কোষে কোন বিশিষ্ট শ্রেণীর ব্যাক্টিরিয়া বা এনজাইমের প্রভাবে হাওয়ার অক্সিজেনের সঙ্গে জ্বালানীর সংঘটিত রাসায়নিক বিক্রিয়া (Bacterial air oxidatian) থেকে উৎপন্ন শক্তি বিদ্যুতে পরিণত হয়। একদিকে যেমন বিদ্যুৎ পাওয়া যায়, অন্যদিকে তেমনি ময়লাগুলিও পরিষ্কৃত হয়ে যায়। মহানগরীর নর্দমার ময়লাকে এভাবে পরিষ্কৃত ও প্রচুর পরিমাণ বিদ্যুতের উৎসে পরিণত করা যেতে পারে; আর পাড়াগাঁয়ে গোবর থেকে অতি সহজেই এবং বিনা খরচায় বিদ্যুৎ উৎপাদন করে রেডিও চালানো বা অন্যান্য ছোটখাটো কাজ করা যেতে পারে।

নারকেলের জল থেকে বিদ্যুৎ: ক্যালিফোর্নিয়ার এক বৃহৎ আমেরিকান প্রতিষ্ঠান সম্প্রতি এক নতুন রকমের জৈব জ্বালানী-কোষ উদ্ভাবনে

সক্ষম হয়েছেন। এই কোষের জ্বালানী হলো অতি সাধারণ নারকেলের জল। নারকেলের জল মিষ্টি, কাজেই তার মধ্যে কোন কোন শর্করা দ্রবীভূত অবস্থায় থাকে। বাতাসের অক্সিজেনের সাহায্যে এই শর্করা দ্রবণকে জারিত করলে তাথেকে ফর্মিক অ্যাসিড উৎপন্ন হয় ও রাসায়নিক শক্তি ছাড়া পায়। এরোমোনাস ফরমিকান (Aeromonas formican) নামক বাতাসে ভেসে-বেড়ানো এক রকম জীবাণুর প্রভাবে এই বিক্রিয়া সহজেই ঘটে। বিশেষভাবে তৈরি একটি প্লাগকে এরকম বিক্রিয়াশীল নারকেল জলে ডুবিয়ে দিয়ে ঐ ছাড়া-পাওয়া রাসায়নিক শক্তিকে বিদ্যুৎরূপে আহরণ করা যায়। প্রতি পাউণ্ড নারকেলের জল থেকে এভাবে যে বিদ্যুৎ পাওয়া যায়, তা দিয়ে একটা ট্রানজিষ্টর রেডিওকে পঞ্চাশ ঘণ্টা ধরে চালু রাখা যায় কিম্বা একটা বৈদ্যুতিক বাতিকে ঘণ্টাখানেক জ্বালিয়ে রাখা চলে। হাল্‌কা ও অতি সহজলভ্য এই ধরণের বিদ্যুৎ-উৎস যে কোন পাড়াগাঁয়ের অধিবাসীদের অথবা জংলা এলাকায় অবস্থানকারী জওয়ানদের খুবই প্রয়োজনে লাগবে।

বৈজ্ঞানিকেরা এখন আখের রস, ফলের রস, রাঙা আলু—এমন কি, ঘাস বা গাছের পাতার রস থেকে বিদ্যুৎ আহরণের কৌশল উদ্ভাবনের চেষ্টায় নিযুক্ত আছেন।

বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষেত্রে জ্বালানী-কোষ যে এক যুগান্তকারী আবিষ্কার, তাতে কোন সন্দেহ নেই। অদূর ভবিষ্যতে আমরা হয়তো দেখবো, বহু যানবাহন পেট্রোল বা ডিজেলের পরিবর্তে জ্বালানী-কোষের বিদ্যুৎ-শক্তিতে চলছে। ট্রেন এবং জাহাজ চালাতেও কালক্রমে কোষের ব্যবহার হতে পারে। ভবিষ্যতে জ্বালানী-কোষের মাধ্যমে অতি অল্প খরচে যেখানে-সেখানে—এমন কি, যে কোন রকম গ্রাম্য এলাকাতেও বিদ্যুতের আশীর্বাদ পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হবে।

রাবার-রসায়ন

শ্রীস্বপনকুমার চট্টোপাধ্যায়

রাবার হইতেছে একরকম গাছের রস বা আঠা। এই গাছের নাম হিভিয়া ব্রাসিলিয়েনসিস (Hevea Brasiliensis)। মালয়, ব্রেজিল, মেক্সিকো, বেলজিয়ান কঙ্গো, থাইল্যাণ্ড, বার্মা, বোর্ণিও, সিংহল ও দক্ষিণ ভারতে রাবারের চাষ হয়। রাবার গাছের বয়স ছয় বৎসর পূর্ণ হইলেই ইহা হইতে রস সংগ্রহ করা হইতে থাকে এবং প্রায় ৪০ বৎসর বয়স পর্যন্ত ইহার উৎপাদন ক্ষমতা বজায় থাকে। রাবার গাছ হইতে রস সংগ্রহের পদ্ধতি অনেকটা খেজুর গাছের রস সংগ্রহের মত। সাধারণতঃ একদিন অন্তর একদিন এই রস সংগ্রহ করা হয় এবং দৈনিক একটি গাছ হইতে প্রায় ১ আউন্স পরিমাণ রস পাওয়া যায়। এই রস দেখিতে কতকটা দুধের মত এবং ইহাতে রাবারের কণাগুলি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত অবস্থায় ভাসিয়া বেড়ায়। রাবার গাছের রসকে ইংরেজীতে ল্যাটেক্স বলে। রাসায়নিক বিশ্লেষণে ইহাতে নিম্নোক্ত উপাদানগুলি পাওয়া যায়—

রাবার হাইড্রোকার্বন	=৩৫—৩৮%
জল	=৬০%
প্রোটিন	=১.৫—২%
অ্যাসিটোনে দ্রবণীয় পদার্থ	=১.৫%
অজৈব লবণ	=০.৫%

রাবার কণাগুলির ব্যাস মোটামুটি এক সেন্টিমিটারের দশহাজার ভাগের একভাগ এবং ওজন ৫×১০^{-১৪} গ্র্যাম।

রাবার ল্যাটেক্সে অ্যাসিটিক অ্যাসিড বা ফরমিক অ্যাসিড দিলে রাবারের কণাগুলি অধঃক্ষিপ্ত হয়। এই অধঃক্ষেপকে অতঃপর রোলারে চাপ দিয়া উহার জলীয় অংশ দূর করা হয়। পরে এই রাবারের পাত্‌গুলিকে বাতাসে শুকাইয়া লইলেই ক্রেপ রাবার পাওয়া যায়। ইহাতে ৯০ শতাংশেরও বেশী রাবার হাইড্রোকার্বন থাকে। তবে বাজারে যে রাবার বিক্রয় হয়, তাহার অধিকাংশই ধূম্রপক্ক (Smoked) রাবার। ইহা প্রস্তুত করিতে হইলে রাবারের পাত্‌গুলিকে কাঁচা কাঠের ধোঁয়াতে প্রায় এক সপ্তাহ রাখিয়া দিতে হয়। ধোঁয়াতে রাবারের রং বাদামী হয়ে যায় এবং রাবারকে ছত্রাকের (Mold) হাত হইতে রক্ষা করে।

প্রাকৃতিক রাবারের কতকগুলি অসুবিধা আছে। প্রথমতঃ ইহা খনিজ তৈল ও অজৈব অ্যাসিডে সহজেই দ্রবীভূত হয়। এতদ্ব্যতীত ইহা অক্সিজেন, ওজোন ও সূর্যালোকের দ্বারাও সহজেই আক্রান্ত হয়। ফলে উহার স্থিতিস্থাপকতা নষ্ট হয় এবং অব্যবহার্য হইয়া পড়ে। এই কারণে রাবারকে শতকরা ৫-৮ ভাগ গন্ধকের সহিত মিশাইয়া ১৪০° ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় ৪-৫ ঘণ্টা উত্তপ্ত করা হয়। এই প্রক্রিয়াকে বলা হয় ভাল্‌ক্যানাইজেশন। ইহা কতকটা আকস্মিকভাবে আবিষ্কার করেন রাবার-রসায়নের জনক চার্লস্‌ গুড্‌ইয়ার ১৮৩৯ সালে। ইহার ফলে রাবারের ধর্মের নিম্নলিখিত পরিবর্তনগুলি ঘটিয়া থাকে—

	ধর্ম	কাঁচা (Raw) রাবার	গন্ধকযুক্ত (Vulcanized) রাবার
(১)	স্থিতিস্থাপকতা (পাউণ্ড প্রতি বর্গইঞ্চিতে)	৩০০	৩০০০
(২)	সর্বোচ্চ প্রসারণ-ক্ষমতা	১২ গুণ	৮ গুণ
(৩)	জলশোষণ-ক্ষমতা	বেশী	কম
(৪)	বেঞ্জিনে দ্রবণীয়তা	দ্রবণীয়	কিঞ্চিৎ দ্রবণীয়
(৫)	আঠালোভাব (Tackiness)	খুব বেশী	একেবারেই নাই
(৬)	ব্যবহারোপযোগী তাপমাত্রার সীমা	১০-৬০°C	-৪০ হইতে ১০০°C

গুড্‌ইয়ার আবিষ্কৃত উপরিউক্ত পদ্ধতিটি প্রায় ১৮৩৯ হইতে ১৯৩৫ সাল পর্যন্ত প্রায় ১০০ বৎসর চালু ছিল। এই পদ্ধতির দোষ হইল—ইহাতে সময় বেশী লাগে এবং তাপমাত্রাও অধিক। তাহা ছাড়া গন্ধকের পরিমাণ বেশী হইলে রাবারের বর্ণ ধূসর হয় এবং উহার শক্তি, স্থায়িত্ব প্রভৃতি সব কিছুই কমিয়া যায়। এই কারণে আজকাল Vulcanize করিবার পূর্বে রাবারের সহিত আরও কতকগুলি রাসায়নিক দ্রব্য মিশ্রিত করা হয়; যেমন—মার্‌ক্যাপটো-বেনজো-থায়াজোল (MBT), ডাইফিনাইল গুয়ানিডিন (DPG), টেট্রামিথাইল-থাওইউরান-ডাইসালফাইড প্রভৃতি। ইহাদের বলা হয় Accelerator। ইহার ফলে অপেক্ষাকৃত কম সময়ে, কম তাপমাত্রায় ও কম গন্ধক মিশাইয়া উত্তম গুণসম্পন্ন রাবার প্রস্তুত হয়। তাহা ছাড়া জিঙ্ক অক্সাইড

(Activator) মিশাইলে রাবারের স্থিতিস্থাপকতা বৃদ্ধি পায়।

রাবার যাহাতে নরম ও প্লাষ্টিক হয় এবং অন্যান্য উপাদানের সহিত সহজে মিশিতে পারে, সেই জন্য উহাকে রোলারে পেষণ করা হয়—ইহাকে বলা হয় Mastication বা Milling। পেষণের পূর্বে অবশ্য ১-২% আলকাত্‌রা, রোজিন বা মোম মিশাইয়া লইলে কাজটি অনেক কম সময়ে ও কম শক্তিব্যয়ে সম্পন্ন হইতে পারে এবং রাবারের আণবিক ওজন প্রয়োজনের অতিরিক্ত কমিতে পারে না। এই পদার্থগুলিকে বলা হয় Plasticizer।

রাবারের সহিত কার্বন-ব্ল্যাকের গুঁড়া মিশাইলে উহার ছেদন (Tear), ঘর্ষণ (Abrasion) ও টানসহন শক্তি (Tensile strength) বৃদ্ধি পায়। মোটর গাড়ীর চাকায় এই কার্বন-ব্ল্যাকের ব্যবহার খুব বেশী। একটি অ্যামব্যাসেডর গাড়ীর মোট ওজন প্রায় ৩০০০ পাউণ্ড—ইহার মধ্যে কার্বন-ব্ল্যাক ২০০ পাউণ্ড। অবশ্য কার্বন-ব্ল্যাকের পরিমাণ খুব বেশী হইলে রাবারের গুণ হ্রাস পায় এবং ঘর্ষণজাত তাপ উৎপত্তির ফলে টায়ার দ্রুত নষ্ট হইয়া যায়। রাবারের সহিত শতকরা ১ ভাগ পরিমাণ ফিনাইল-বিটা-ন্যাপথাইল-অ্যামিন নামক পদার্থটি মিশাইলে উহা বেশী দিন স্থায়ী হয়। রাবারের রঙীন জিনিষ প্রস্তুত করিতে হইলে উহার সহিত লৌহ, ক্যাডমিয়াম টাইটেনিয়াম প্রভৃতি ধাতুর অক্সাইড মিশাইতে হয়।

প্রাকৃতিক রাবারের একটি প্রধান দোষ হইল এই যে, উহা খনিজ তৈলের দ্বারা সহজেই আক্রান্ত হয়। এই দিক দিয়া কৃত্রিম রাবার সুবিধাজনক। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় যখন প্রাকৃতিক রাবারের রপ্তানী বাধাপ্রাপ্ত হয়, সেই সময় আমেরিকা ও অন্যান্য দেশে কৃত্রিম রাবার শিল্পের দ্রুত প্রসারলাভ ঘটে। বর্তমানে পৃথিবীতে প্রাকৃতিক রাবার উৎপন্ন হয় বৎসরে ২০ লক্ষ টন এবং কৃত্রিম রাবার উৎপাদনের হারও বৎসরে ২০ লক্ষ টন। ভারতবর্ষের উত্তর প্রদেশের অন্তর্গত বেরিলিতে কৃত্রিম রাবারের একটি কারখানা সম্প্রতি স্থাপিত হইয়াছে—ইহার উৎপাদনের হার বৎসরে ৩৩০০০ টন।

কৃত্রিম রাবারের মধ্যে সর্বপ্রধান হইল এস-বি-আর (SBR) বা বুনা-এস (Buna-S)। তিন ভাগ বিউটাডাইন ও একভাগ ষ্টাইরিনের বিক্রিয়ায় এই রাবার প্রস্তুত হয়।

$$CH_2=CH-CH=CH_2 + CH_2=\underset{\substack{|\\ C_6H_5}}{CH}$$

(বিউটাডাইন) ↓ (ষ্টাইরিন)

$$\left[-(CH_2-CH=CH-CH_2)_x-(CH_2-\underset{\substack{|\\ C_6H_5}}{CH})_y-\right]_n$$
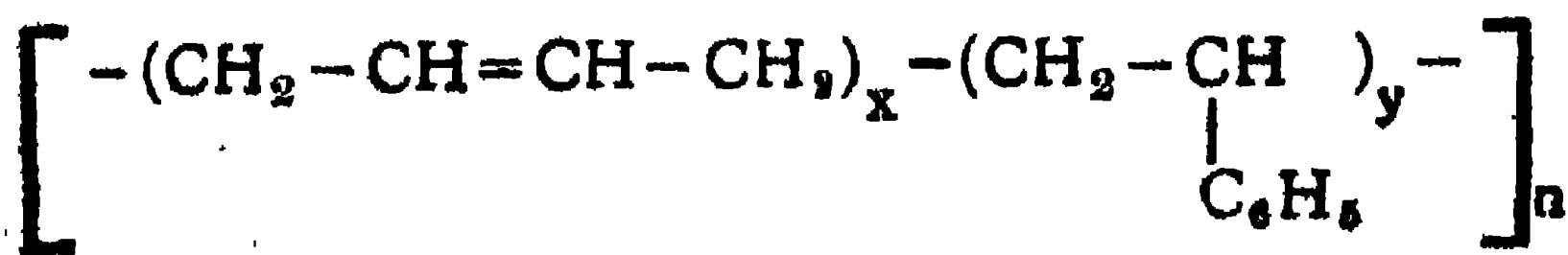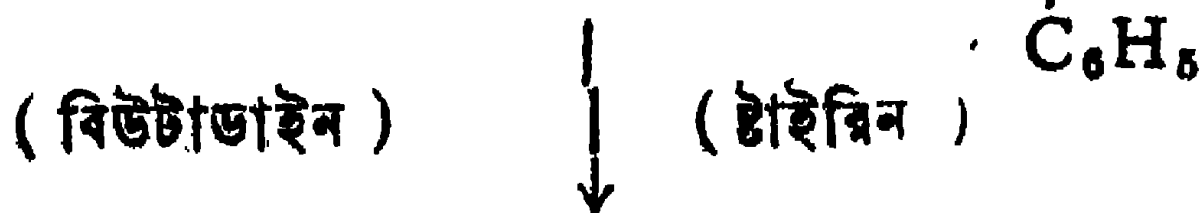
(এস-বি-আর)

পেট্রোলিয়াম খনি হইতে পাওয়া যায় মিথেন গ্যাস; ইহাকে অ্যাসিটিলিন গ্যাসে রূপান্তরিত করা যায় তাপের প্রভাবে। অতঃপর ঐ অ্যাসিটিলিন হইতে বিউটাডাইন প্রস্তুত করা হয় নিম্নোক্তরূপে—

$$HC \equiv CH + 2\,HCHO \xrightarrow[\text{৫ atm.}]{\text{১০০°C}} \underset{OH}{CH_2} - C \equiv C - \underset{OH}{CH_2}$$

(অ্যাসিটিলিন) (ফরম্যালডিহাইড) (বিউটাইন-ডাই-অল)

$$\downarrow H_2/Ni \quad \text{১০০°C ; ৩০০ atm.}$$

$$\underset{OH}{CH_2} - CH_2 - CH_2 - \underset{OH}{CH_2}$$

(১ : ৪-বিউটেন-ডাই-অল)

$$\leftarrow$$

$$\begin{array}{cc} CH_2 - & CH_2 \\ | & | \\ CH_2 & CH_2 \\ \multicolumn{2}{c}{\llcorner O \lrcorner} \end{array}$$

(টেট্রাহাইড্রোফুরান)

$$\downarrow \text{২১০°C} \mid H_3PO_4$$

$$CH_2 = CH - CH = CH_2$$
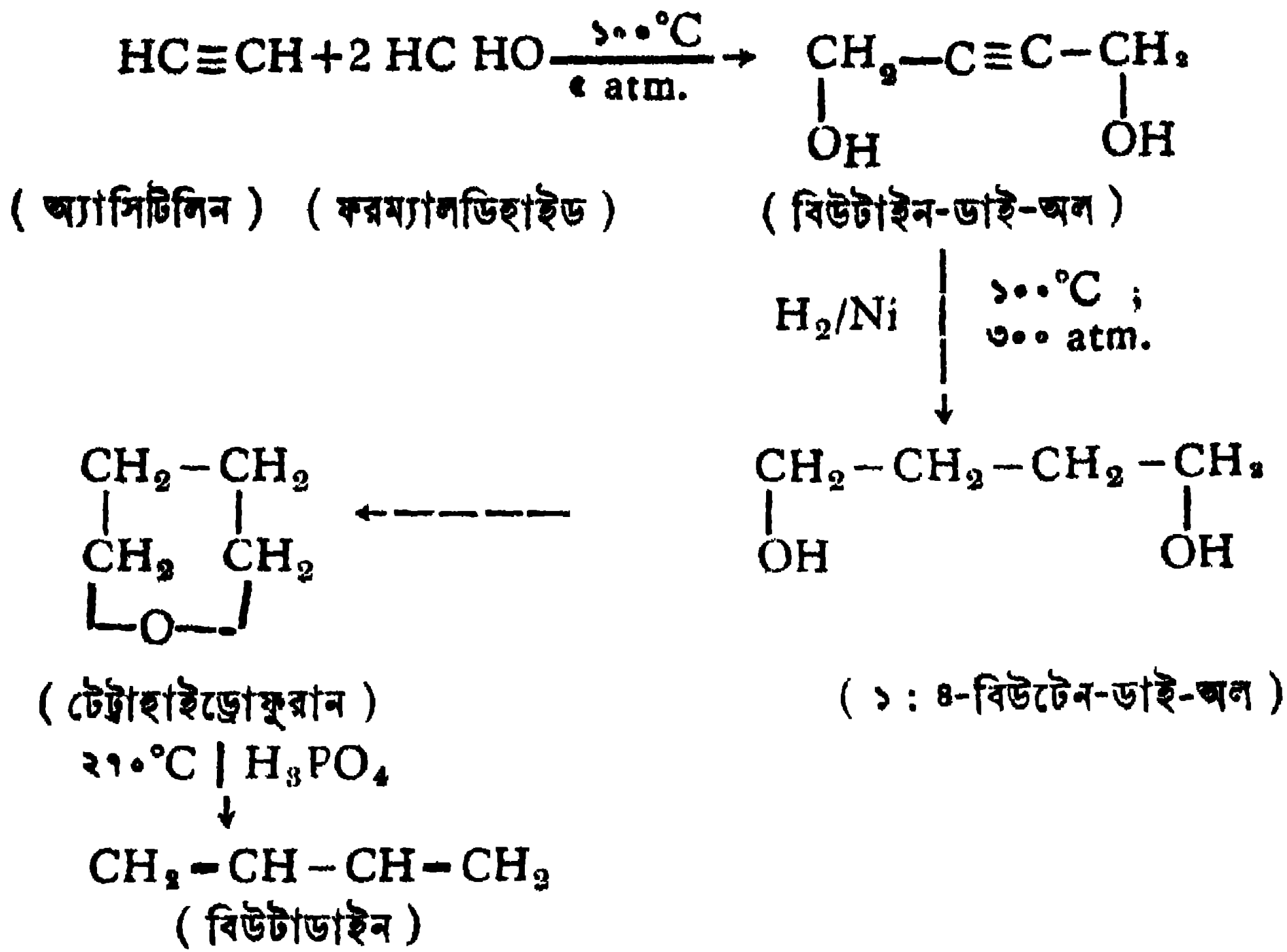
(বিউটাডাইন)

ইহা ছাড়া ইথাইল অ্যালকোহল হইতেও বিউটাডাইন প্রস্তুত করা চলে।

ষ্টাইরিন প্রস্তুত করিতে হইলে প্রথমে ইথিলিন ও বেঞ্জিনের বিক্রিয়ায় ইথাইল-বেঞ্জিন প্রস্তুত করা হয় এবং পরে ঐ শেষোক্ত পদার্থটি হইতে হাইড্রোজেন দূর করা হয়—

$$C_6H_6 + C_2H_4 \xrightarrow[\text{৯৫°C}]{AlCl_3} C_6H_5 - CH_2 - CH_3$$

(বেঞ্জিন) (ইথিলিন)

$$\downarrow (-H_2) \quad SiO_2/Ta_2O_5 \quad \text{৬০০-৭০০°C}$$

$$C_6H_5 - CH = CH_2$$
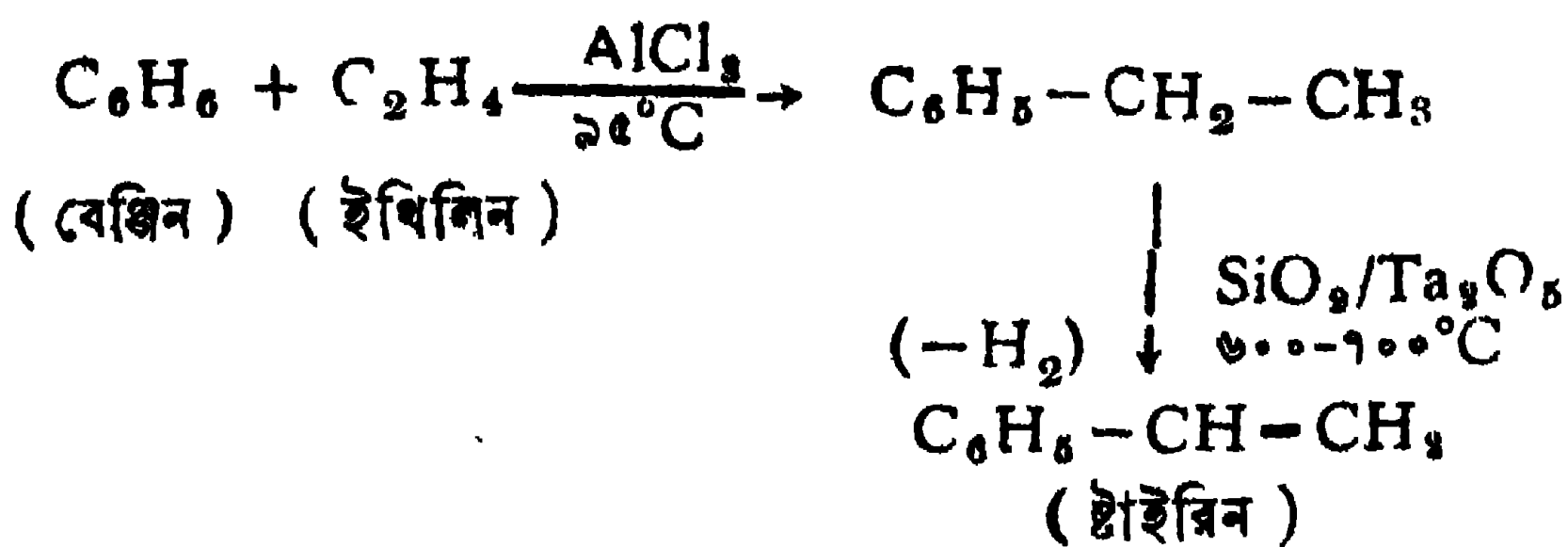
(ষ্টাইরিন)

অতঃপর ষ্টাইরিন ও বিউটাডাইন হইতে পূর্বোক্ত উপায়ে এস-বি-আর রাবার প্রস্তুত করা হয়। রাবারের জিনিষ তৈয়ারি করিতে এখন অনেক ক্ষেত্রেই প্রাকৃতিক রাবারের পরিবর্তে এস-বি-আর ব্যবহার করা হইতেছে। কিন্তু সর্বক্ষেত্রে তাহা সম্ভব হয় না। কৃত্রিম রাবারের আঠালোভাব (Tackiness) কম বলিয়া টায়ার-শিল্পে অন্ততঃ শতকরা ২৫ ভাগ প্রাকৃতিক রাবার অপরিহার্য।

এস-বি-আর ছাড়া অন্যান্য কৃত্রিম রাবার-গুলিকে একটি বিশেষ শ্রেণীভুক্ত করা হয়। এই শ্রেণীতে পড়ে বুনা-এন, নিয়োপ্রিন, বিউটাইল রাবার ও থাওকল। ইহারা সকলেই খনিজ তৈলের সংস্পর্শ সহ্য করিতে পারে।

বুনা-এন বা পারবিউনান রাবারের প্রস্তুত-পদ্ধতি অনেকটা এস-বি-আর রাবারের অনুরূপ। তবে এক্ষেত্রে ষ্টাইরিনের পরিবর্তে ব্যবহার করা হয় অ্যাক্রাইলো-নাইট্রাইল। এই শেষোক্ত পদার্থটি পাওয়া যায় ইথিলিন অক্সাইড ও হাইড্রো-সায়ানিক অ্যাসিডের সংমিশ্রণে।

নিয়োপ্রিন রাবার প্রস্তুত করা হয় অ্যাসিটিলিন গ্যাস ও হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড হইতে—অনুঘটক হিসাবে ব্যবহার করা হয় কিউপ্রাস ক্লোরাইড ও অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইডের দ্রবণ;

$$2\,HC\equiv CH \xrightarrow[৩০^{\circ}C]{CuCl/NH_4Cl} CH_2=CH-C\equiv CH$$

(মনোভিনাইল অ্যাসিটিলিন)

$$\downarrow HCl\ (\text{ঘন})$$

$$\left(-CH_2-CH=\underset{\underset{Cl}{|}}{C}-CH_2-\right)_n \xleftarrow[\text{পলিমেরিজেশন}]{\text{ইমালসন}} CH_2=CH-\underset{\underset{Cl}{|}}{C}=CH_2$$
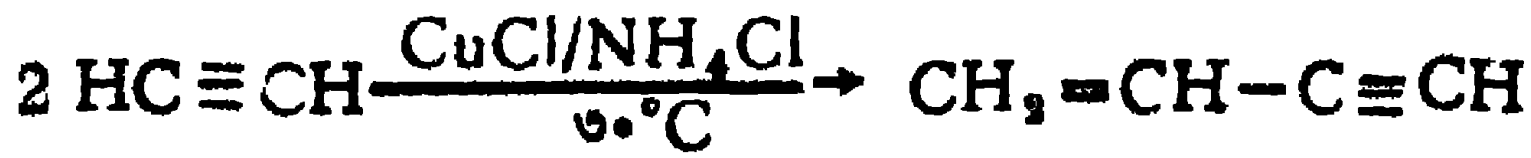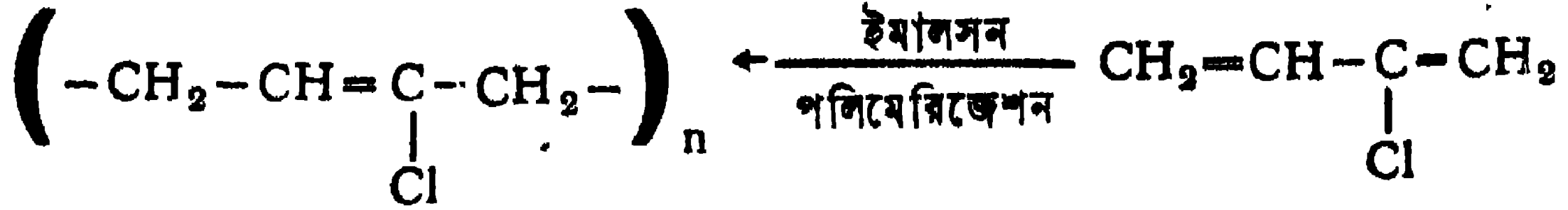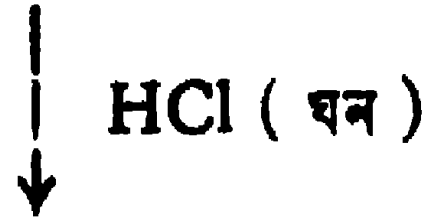
(নিয়োপ্রিন) (ক্লোরোপ্রিন)

বিউটাইল রাবার একটি কো-পলিমার। ইহার উপাদান হইল শতকরা ৯৮ ভাগ আইসো-বিউটিলিন এবং ২ ভাগ আইসোপ্রিন অথবা বিউটাডাইন :

$$CH_2=\underset{\underset{CH_3}{|}}{\overset{\overset{CH_3}{|}}{C}} \quad + \quad CH_2=\overset{\overset{CH_3}{|}}{C}-CH=CH_2$$

$$\downarrow$$

$$\left[\left(CH_3-\underset{\underset{CH_3}{|}}{\overset{\overset{CH_3}{|}}{C}}-\right)_x \left(-CH_2-\overset{\overset{CH_3}{|}}{C}=CH-CH_2-\right)_y\right]_n$$
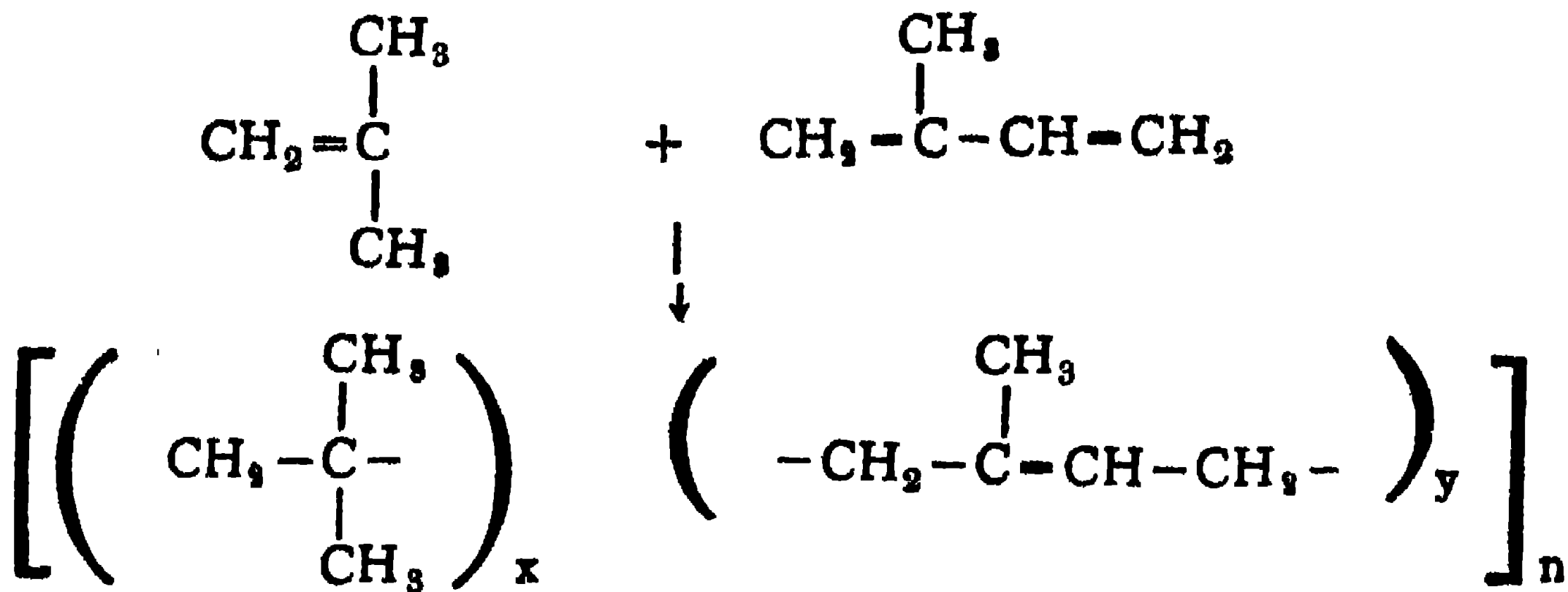
থায়োকল রাবার আবিষ্কার করেন বিজ্ঞানী প্যাট্রিক ১৯২০ সালে। গ্রীক ভাষায় গন্ধককে বলে 'থায়োন' এবং ইহা হইতেই থায়োকল শব্দের উৎপত্তি ; কারণ থায়োকল রাবারে গন্ধক বর্তমান। ইথিলিন ডাইক্লোরাইড এবং সোডিয়াম টেট্রা-সালফাইডের বিক্রিয়ায় থায়োকল-এ (Thiokol-A) রাবার প্রস্তুত হয় :

$$\underset{\underset{Cl}{|}}{CH_2}-\underset{\underset{Cl}{|}}{CH_2} + Na-\underset{\underset{S}{\|}}{S}-\underset{\underset{S}{\|}}{S}-Na \dashrightarrow \left(-CH_2-CH_2-\underset{\underset{S}{\|}}{S}-\underset{\underset{S}{\|}}{S}-\right)_n$$
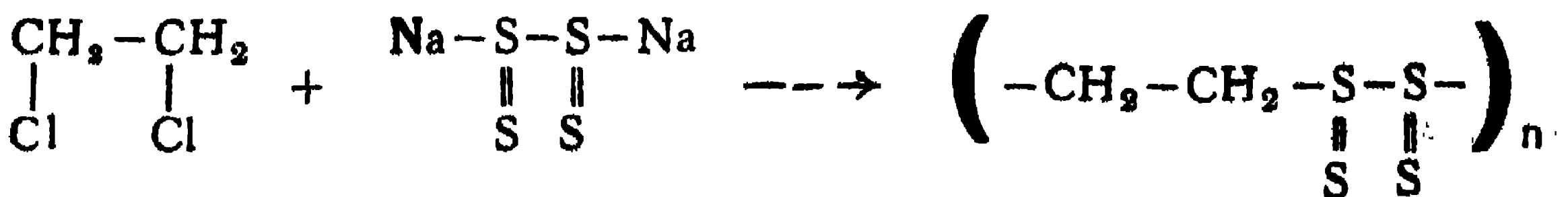
বুনা-এন ; নিয়োপ্রিন প্রভৃতি উপরিউক্ত সব কয়টি রাবারই খনিজ তৈল ও দ্রাবকের সংস্পর্শ সহ্য করিতে পারে—তবে ইহাদের মধ্যে থায়োকলেরই সহনক্ষমতা সর্বাধিক। কিন্তু ইহাতে গন্ধক থাকিবার দরুণ ইহা চর্মরোগ উৎপন্ন করিতে পারে।

বিভিন্ন কৃত্রিম রাবারের যে প্রস্তুত-পদ্ধতি সম্বন্ধে উপরে আলোচনা করা হইয়াছে, তাহা হইতে সহজেই বুঝা যায় যে, কৃত্রিম রাবার শিল্পের জন্ত প্রয়োজন পেট্রোলিয়াম-শোধনাগারের উপজাত দ্রব্যগুলি। যদিও পেট্রোলিয়াম-সম্পদে আমাদের দেশ এখনও অতীব দরিদ্র, তথাপি আসাম, বিশাখাপত্তনম ও বোম্বাইতে যে কয়টি শোধনাগার আছে, তাহাদের উপজাত দ্রব্যের দ্বারা ভারতে কৃত্রিম রাবারের উৎপাদন আরও বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।

মানব-বৈশিষ্ট্যের বংশধারা

অরুণকুমার রায়চৌধুরী

সন্তান-সন্ততির মধ্যে একই অস্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য প্রতি পর্যায়ে দেখা গেলে সেই বৈশিষ্ট্যকে সাধারণতঃ বংশগত বলে গ্রহণ করা হয়। বৈশিষ্ট্যের প্রকাশ কখনও স্ত্রীলোকের মধ্যে বেশী এবং পুরুষের মধ্যে কম, আবার কখনও স্ত্রীলোক অপেক্ষা পুরুষের মধ্যে বেশী দেখা যায়। কোন ক্ষেত্রে বৈশিষ্ট্য এক এক পর্যায় অন্তর পরিস্ফুট হয়, আবার কোন ক্ষেত্রে সুস্থ পরিবারের সন্তান-সন্ততির মধ্যে ধূমকেতুর মত হঠাৎ আবির্ভূত হয়। আপাত-দৃষ্টিতে বংশগত বৈশিষ্ট্যের আবির্ভাবকে "এলো-মেলো বলে মনে হলেও বংশলতিকার (Pedigree chart) সাহায্যে বৈশিষ্ট্যের পর্যায়ক্রমিক ধারা পর্যবেক্ষণ করলে, অনেক ক্ষেত্রে শ্রেণীগত বৈশিষ্ট্যের সাধারণ উত্তরাধিকার সূত্র আবিষ্কার করা যায়। বংশলতিকার সাহায্যে মানব-বৈশিষ্ট্যের উত্তরাধি-কারসূত্র আবিষ্কার করবার পূর্বে বংশানুক্রম প্রক্রিয়ার মূলসূত্র সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যেতে পারে।

আমরা জানি যে, পুরুষের একটি শুক্রাণু (Sperm) ও স্ত্রীলোকের একটি ডিম্বাণুর (Ovum) সংমিশ্রণে যে এক কোষবিশিষ্ট জাইগোট (Zygote) উৎপন্ন হয়, তা ক্রমাগত বিভাজনের ফলে অসংখ্য কোষের সৃষ্টি হয় এবং তাদের সমষ্টি নিয়ে গড়ে ওঠে একটি পূর্ণাঙ্গ মানুষ। মানুষের প্রতিটি দেহকোষের কেন্দ্রে থাকে একটি নিউক্লিয়াস এবং প্রতিটি নিউক্লিয়াসের মধ্যে থাকে সুতার মত দেখতে কয়েকটি জৈব পদার্থ—তাদের বলা হয় ক্রোমোসোম (Chromosome)। বিভিন্ন প্রজাতিতে (Species) ক্রোমোসোমের সংখ্যা সুনির্দিষ্ট। মানুষের দেহকোষে ২৩ জোড়া ক্রোমোসোম থাকে; প্রতি জোড়া ক্রোমোসোমের একটি মাতার এবং অপরটি পিতার নিকট থেকে আসে। ২৩ জোড়া ক্রোমোসোমের মধ্যে যে একজোড়া ক্রোমোসোম মানুষের লিঙ্গকে নির্ধারণ করে—তাদিগকে যৌন ক্রোমোসোম (Sex Chromosome) আর বাকী ২২ জোড়াকে অ-যৌন ক্রোমোসোম বা অটো-সোম (Autosome) বলে। যৌন ক্রোমোসোম দুটিকে X ও Y দ্বারা চিহ্নিত করা হয়। আকৃতি ও আয়তনে X ও Y ক্রোমোসোম দুটির মধ্যে অমিল দেখা যায়। স্ত্রীলোকের দেহকোষে দুটি X ক্রোমোসোম এবং পুরুষের দেহকোষে একটি X ও একটি Y ক্রোমোসোম থাকে। প্রতি স্ত্রীলোক পিতা ও মাতা উভয়ের নিকট থেকে একটি করে X ক্রোমোসোম লাভ করে, কিন্তু প্রতি পুরুষ মাতার নিকট থেকে X এবং পিতার নিকট থেকে Y ক্রোমোসোম পেয়ে থাকে।

ক্রোমোসোমের মাধ্যমে পিতামাতার বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য সন্তান-সন্ততির মধ্যে সঞ্চারিত হয়। প্রকৃতপক্ষে মানুষের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যকে নিয়ন্ত্রণ করে বিভিন্ন জিন (Gene)। ডি-এন-এ (DNA) নামক এক প্রকার জৈব রাসায়নিক পদার্থের দ্বারা জিন গঠিত। ক্রোমোসোম বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের জিন বহন করে থাকে। কোন বিশেষ জিন নির্দিষ্ট ক্রোমোসোমের নির্দিষ্ট কক্ষে (Locus) অবস্থান করে। যে জিন যৌন ক্রোমোসোমে অবস্থিত, তাকে লিঙ্গ অনুগামী জিন (Sex linked gene) এবং যে জিন অ-যৌন ক্রোমোসোমে অবস্থিত, তাকে অ-লিঙ্গ অনুগামী জিন (Autosomal gene) বলে। জিন যে বৈশিষ্ট্যকে নিয়ন্ত্রণ করে

তা সব সময় সন্তান-সন্ততির মধ্যে প্রকাশিত হতে দেখা যায় না। দুটি বিপরীত বৈশিষ্ট্যের সংমিশ্রণে যে বৈশিষ্ট্য সন্তান-সন্ততির বহিঃপ্রকৃতিতে (Phenotypically) প্রকাশ পায়, সেই বৈশিষ্ট্যকে প্রকট বৈশিষ্ট্য (Dominant character) এবং যে বৈশিষ্ট্য অপ্রকাশিত থাকে, তাকে প্রচ্ছন্ন বৈশিষ্ট্য (Recessive character) বলে। প্রকট বৈশিষ্ট্যকে প্রকট জিন (Dominant gene) এবং প্রচ্ছন্ন বৈশিষ্ট্যকে প্রচ্ছন্ন জিন (Recessive gene) নিয়ন্ত্রণ করে। সাধারণতঃ সন্তান যদি পিতামাতা উভয়ের নিকট থেকে প্রকট জিন অথবা প্রচ্ছন্ন জিন পায়, তাহলে তার মধ্যে প্রকট অথবা প্রচ্ছন্ন জিনের বৈশিষ্ট্য পরিস্ফুট হয়। কিন্তু সন্তান যদি পিতামাতার যে কোন একজন থেকে প্রকট জিন এবং অপর জন থেকে প্রচ্ছন্ন জিন লাভ করে, তাহলে তার মধ্যে প্রকট জিনের বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায় এবং প্রচ্ছন্ন জিনের বৈশিষ্ট্য অপ্রকাশিত থাকে। যদি পিতামাতার একজনের চোখের মণির রং কালো, অপর জনের কটা হয় এবং তাদের সব সন্ততির যদি কালো চোখ দেখা যায়, কটা রঙের লক্ষণ প্রকাশ না পায়, তাহলে কালো চোখ প্রকট এবং কটা চোখ প্রচ্ছন্ন জিনের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়ে থাকে। মানুষের বেশীরভাগ বংশগত রোগ প্রচ্ছন্ন জিনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। বাহ্যতঃ নীরোগ অবস্থায় যে ব্যক্তি বংশগত রোগের প্রচ্ছন্ন জিন বহন করে, তাকে 'বাহক' (Carrier) বলে গণ্য করা হয়।

বংশলতিকায় বৈশিষ্ট্যের ধারা অনুসরণ করে জিনের প্রকৃতি ও তার যৌন অথবা অযৌন ক্রোমোসোমের অবস্থান সম্পর্কে পরিচয় পাওয়া যায়। মানব-বৈশিষ্ট্যের বংশলতিকা প্রস্তুত করতে হলে কতকগুলি প্রতীক চিহ্নের আশ্রয় গ্রহণ করা হয়। পুরুষকে চতুষ্ক এবং স্ত্রীলোককে বৃত্তের দ্বারা চিহ্নিত করাই সাধারণ রীতি। স্বামী-স্ত্রীকে একটি সরল রেখার দ্বারা সংযুক্ত করা হয় এবং তাদের ঠিক নীচে আর একটি সমান্তরাল রেখায় পুত্রকন্যাদের জন্ম অনুযায়ী বাম দিক থেকে সারিবদ্ধভাবে সাজিয়ে একটি লম্ব রেখার সাহায্যে দুই পর্যায়কে (Generation) সংযোগ করা হয়। বংশলতিকায় স্বাভাবিক (সুস্থ), অস্বাভাবিক (রোগগ্রস্ত) ও 'বাহক' পুরুষ ও স্ত্রীলোককে নিম্নে বর্ণিত প্রতীকের দ্বারা বোঝানো হয়ে থাকে (১নং চিত্র)।

□ স্বাভাবিক পুরুষ ■ অস্বাভাবিক পুরুষ ⊡ বাহক পুরুষ

○ ,, স্ত্রীলোক ● ,, স্ত্রীলোক ⊙ ,, স্ত্রীলোক

১নং চিত্র।

মানুষের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের ধারা সব ক্ষেত্রে অনুধাবন করা কঠিন। যে সব বৈশিষ্ট্য মাত্র একটি জিনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এবং পরিবেশের উপরে নির্ভরশীল নয়, তাদের বংশধারা বর্তমান প্রবন্ধে উল্লেখ করা হয়েছে।

(১) অ-লিঙ্গ অনুগামী প্রকট বৈশিষ্ট্যের ধারা

পিতা অথবা মাতার কোন রোগ বা বৈশিষ্ট্য যদি অর্ধেক পুত্রসন্তান ও অর্ধেক কন্যা-সন্তানের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করে, তাহলে সেই রোগ বা বৈশিষ্ট্য অ-লিঙ্গ অনুগামী প্রকট জিনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। এরূপ পরিবারের রোগগ্রস্ত সন্তানের পিতা অথবা মাতাকে রোগগ্রস্ত অবস্থায় দেখা যায় এবং

বংশলতিকায় রোগের ধারা অনুসরণ করে উপর পর্যায়ের দিকে অগ্রসর হলে রোগ কোন্ পর্যায়ের কোন্ ব্যক্তি থেকে উৎপত্তি হয়েছে, তার সন্ধান পাওয়া যায়। হাত-পায়ের আঙুল-

২নং চিত্র।

গুলি ছোট হওয়ার বৈশিষ্ট্যকে Brachydactylism বলে এবং এটা অ-লিঙ্গ অনুগামী প্রকট জিনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। উপরে এই বৈশিষ্ট্যের বংশধারা দেখানো হয়েছে (২নং চিত্র)।

ব্যাধি বা বৈশিষ্ট্য অ-লিঙ্গ অনুগামী প্রচ্ছন্ন জিনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। কোন সন্তান যদি পিতা ও মাতা উভয়ের নিকট থেকে একই বৈশিষ্ট্যের প্রচ্ছন্ন জিন লাভ করে, তাহলে তার মধ্যে ঐ জিনের অভিব্যক্তি (Manifestation) লক্ষ্য করা যায়। স্বামী-স্ত্রী উভয়ই আত্মীয়তাসূত্রে আবদ্ধ থাকলে, তাদের সন্তান-সন্ততির মধ্যে প্রচ্ছন্ন জিনের বৈশিষ্ট্য প্রকাশ হওয়ার সম্ভাবনা বেশী থাকে।
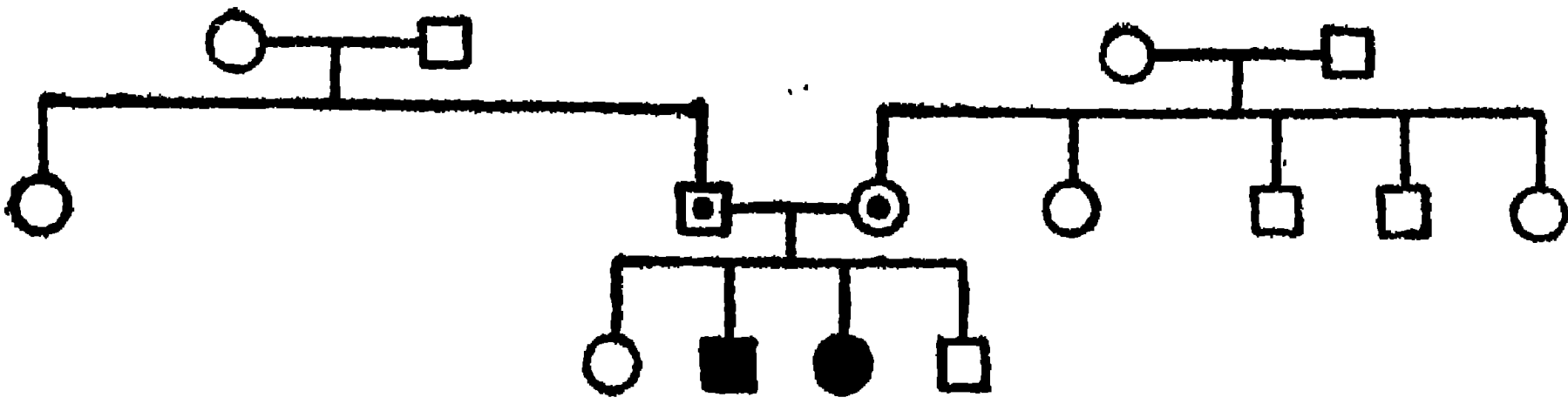
৩নং চিত্র।

(২) অ-লিঙ্গ অনুগামী প্রচ্ছন্ন বৈশিষ্ট্যের ধারা

সন্তানের কোন অস্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য যদি তার পিতা, মাতা ও নিকট পূর্বপুরুষের মধ্যে লক্ষ্য করা না যায়, তাহলে সেই বৈশিষ্ট্যকে সহজে বংশগত বলে গ্রহণ করা যায় না। অ্যালবিনিজিম্, বিপাক বিশৃঙ্খলাজনিত বংশগত ব্যাধি (যেমন ফেনিলকেটোনুরিয়া, গ্যালাক্‌টোসেমিয়া প্রভৃতি) সুস্থ পরিবারের পুত্রকন্যাদের মধ্যে হঠাৎ আবির্ভূত হয়ে থাকে। এই সব প্রচ্ছন্ন জিনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত বৈশিষ্ট্য কিভাবে পুত্র-কন্যার মধ্যে পরিস্ফুট হয়ে থাকে, তা একটি বংশলতিকার মাধ্যমে দেখানো হয়েছে (৩নং চিত্র)।

(৩) লিঙ্গ অনুগামী প্রকট বৈশিষ্ট্যের ধারা

প্রতি পর্যায়ে কোন রোগ বা বৈশিষ্ট্যের প্রাদুর্ভাব পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকের মধ্যে যদি বেশী দেখা যায়, তখন সেই রোগ বা বৈশিষ্ট্য X ক্রোমোসোমে অবস্থিত প্রকট জিনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। পূর্বে বলা হয়েছে যে,

প্রতি স্ত্রীলোক পিতা ও মাতা উভয়ের নিকট থেকে একটি করে X ক্রোমোসোম এবং প্রতি পুরুষ শুধু মাতার নিকট থেকে একটি X ক্রোমোসোম পায়—এই কারণে X ক্রোমোসোম সংশ্লিষ্ট প্রকট জিনের বৈশিষ্ট্য পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকের মধ্যে প্রকাশ হওয়ার সম্ভাবনা বেশী। অনেক সময় লিঙ্গ ও অ-লিঙ্গ অনুগামী প্রকট জিনের বংশগতির পার্থক্য বোঝা দুষ্কর হয়ে পড়ে।

৪নং চিত্র।

(৪) লিঙ্গ অনুগামী প্রচ্ছন্ন বৈশিষ্ট্যের ধারা

হিমোফিলিয়া, বর্ণান্ধতা প্রভৃতি বংশগত রোগ স্ত্রীলোক অপেক্ষা পুরুষের মধ্যে বেশী প্রকাশ পায়। রোগের বংশগতি অনুধাবন করলে দেখা যায় যে, এক এক পর্যায় অন্তর এর আবির্ভাব ঘটে এবং রোগগ্রস্ত পুরুষ কন্যার মাধ্যমে তার রোগ দৌহিত্রকে প্রদান করে, কিন্তু তার নিজের পুত্র ও পৌত্রদের মধ্যে রোগের লক্ষণ কখনও প্রকাশ পায় না। এই শ্রেণীর বংশগত রোগ X ক্রোমোসোমে অবস্থিত প্রচ্ছন্ন জিনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। স্ত্রীলোকেরা রোগের 'বাহক' হয়ে থাকে। তাদের অর্ধেক পুত্র সন্তানদের মধ্যে রোগের লক্ষণ দেখা যায় এবং অর্ধেক কন্যা-সন্তান রোগের 'বাহক' হয়ে জন্মগ্রহণ করে। 'বাহক' স্ত্রীলোকের সঙ্গে রোগগ্রস্ত পুরুষের
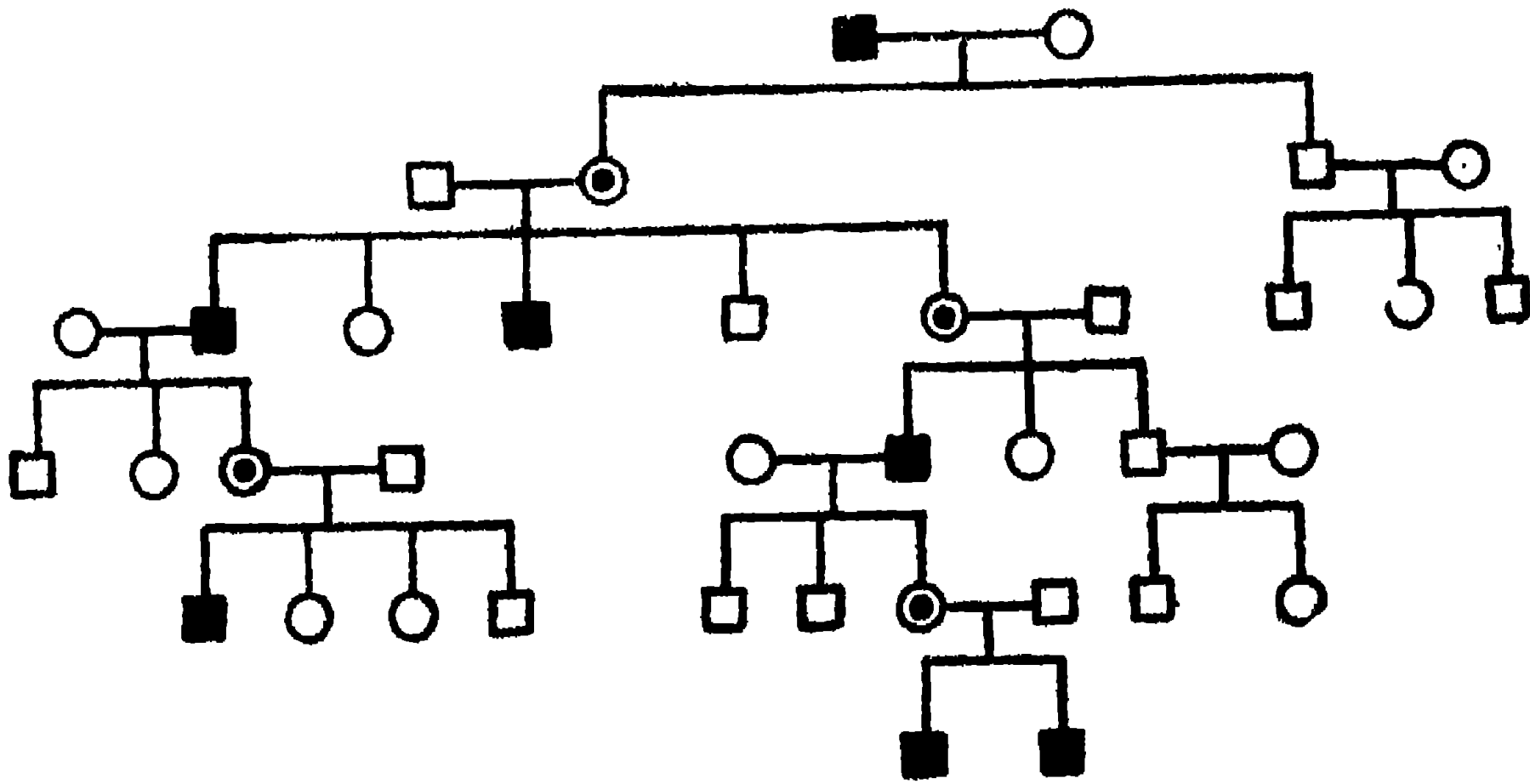
৫নং চিত্র।

প্রথম ক্ষেত্রে পিতার বৈশিষ্ট্য শুধুমাত্র কন্যা-সন্তানের মধ্যেই আবির্ভূত হয়, কিন্তু দ্বিতীয় ক্ষেত্রে পুত্র-কন্যা নির্বিশেষে অর্ধেক সন্তান-সন্ততির মধ্যে বৈশিষ্ট্য প্রকাশিত হয়। নষ্ট এনামেলের ফলে দাঁত যে গাঢ় হলুদবর্ণ ধারণ করে, তা লিঙ্গ অনুগামী প্রকট জিনের উপর নির্ভরশীল। এই বৈশিষ্ট্যের ধারা উপরের বংশলতিকায় দেখানো হয়েছে (৪নং চিত্র)।

বিবাহে অর্ধেক পুত্র সন্তান ও অর্ধেক কন্যা-সন্তানের মধ্যে রোগের লক্ষণ প্রকটিত হয়। একটি বংশলতিকার সাহায্যে লিঙ্গ অনুগামী প্রচ্ছন্ন জিনের ধারা বোঝানো হয়েছে (৫নং চিত্র)।

প্রপৌত্রের মধ্যে প্রকাশ পায়, কিন্তু কোন কন্যাসন্তানের মধ্যে প্রকাশ পায় না। এই বৈশিষ্ট্য Y ক্রোমোসোমে অবস্থিত জিনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে, কারণ Y ক্রোমোসোম সর্বদা পিতা থেকে পুত্র, পুত্র থেকে
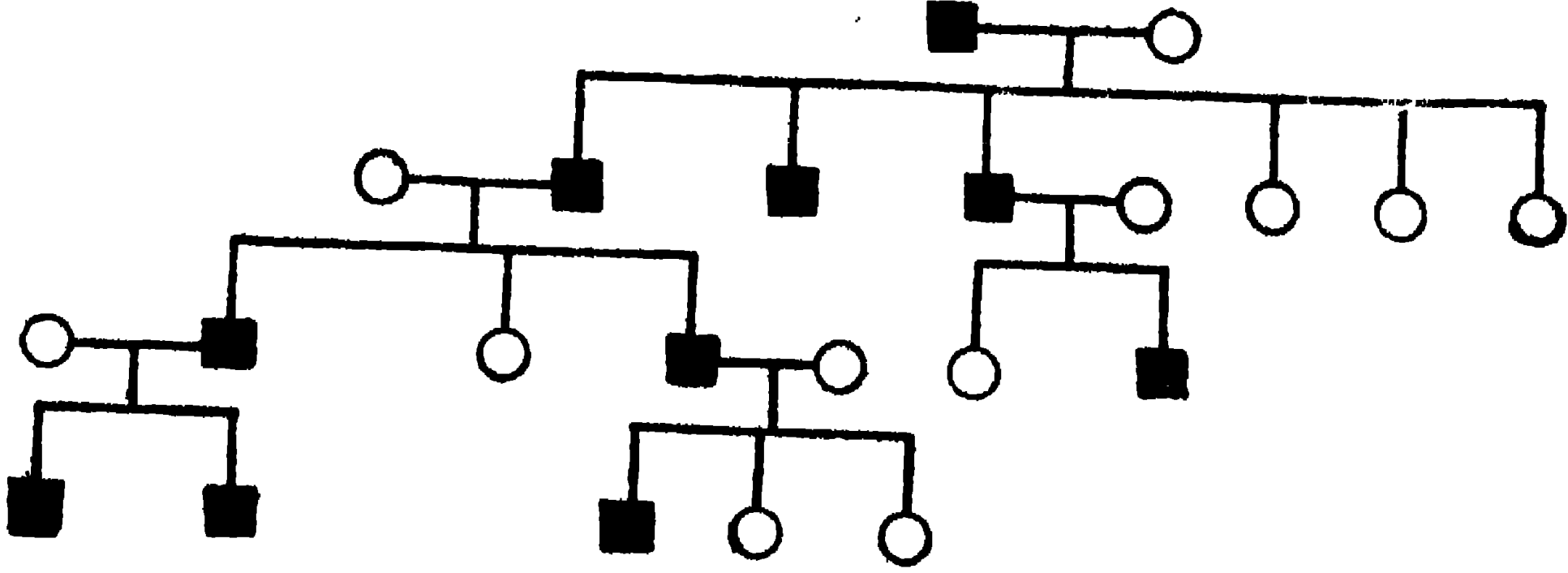
৬নং চিত্র।

(৫) Y-ক্রোমোসোম সংশ্লিষ্ট বৈশিষ্ট্যের ধারা

অনেক বয়স্ক পুরুষের কানে যে চুল দেখা যায়, তা বংশ পরম্পরায় পিতা, পুত্র, পৌত্র, পৌত্র, পৌত্র থেকে প্রপৌত্রের মধ্যে সঞ্চারিত হয়। উপরের বংশলতিকায় Y ক্রোমো-সোমে অবস্থিত জিনের ধারা দেখানো হয়েছে (৬নং চিত্র)।

সমপরিবাহী পদার্থ

বিশ্বরঞ্জন নাগ

রেডিও ও টেলিভিশনের সঙ্গে আর একটি কথা আজকাল বিশেষভাবে শোনা যায়। কথাটি হলো ট্র্যানজিস্টর (Transistor)। এক বিশেষ ধরণের ছোট আকারের রেডিও, যা ব্যাটারী দিয়ে চলে এবং অতি সহজে যত্র-তত্র নিয়ে যাওয়া যায়, সেই রেডিওর নাম হলো ট্র্যানজিস্টর রেডিও। নামটি এসেছে এই রেডিওতে ট্র্যানজিস্টর ব্যবহার হয় বলে। প্রায় বিশ বছর আগে ট্র্যানজিস্টর আবিষ্কৃত হয়। আবিষ্কার করেন আমেরিকার বেল লেবরেটরীতে নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত খ্যাত-নামা তিন জন বিজ্ঞানী—শক্‌লে (Shockley), বার্ডিন (Bardeen) ও ব্রাটেন (Brattain)। ভাল্‌ব দিয়ে যে সব কাজ করা যায়, সেই সব কাজ ট্র্যানজিস্টর দিয়েও করা যায়, উপরন্তু ট্র্যানজিস্টর আকারে অনেক ছোট এবং এতে বৈদ্যুতিক শক্তির অপচয়ও হয় কম। তাই ট্র্যানজিস্টর আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গেই বিশেষভাবে সমাদৃত হয় এবং রেডিওর মাধ্যমে জনসাধারণেরও বিশেষ পরিচয় হয়। বিজ্ঞানের দিক থেকে বলা যেতে

পারে, ট্র্যানজিস্টর ইলেকট্রনিক্সে (Electronics) এক নতুন যুগের সূচনা করে।

ট্র্যানজিস্টর তৈরি হয় এক বিশেষ ধরণের বিদ্যুৎ-পরিবাহী পদার্থের দ্বারা, যার ইংরেজী নাম হলো সেমিকণ্ডাক্টর (Semiconductor), বাংলায় বলা যেতে পারে সমপরিবাহী। বিজ্ঞানের প্রথম যুগে মানুষ যখন তড়িতের সঙ্গে পরিচিত হয় তখনই লক্ষ্য করে যে, বিভিন্ন পদার্থে তড়িতের চলাচলে বিভিন্নতা আছে। এক ধরণের পদার্থে তড়িৎ সঞ্চার করলে তড়িৎ সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। আর এক ধরণের পদার্থে কিন্তু সীমিত জায়গাতেই জমা থাকে। তামা, রূপা, লোহা এবং অন্যান্য ধাতু প্রথম ধরণের পদার্থ। এদের নাম দেওয়া হয় পরিবাহী (Conductor)। গন্ধক, কাচ, গালা ইত্যাদি দ্বিতীয় ধরণের পদার্থ। এদের নাম দেওয়া হয় অপরিবাহী (Insulator)। কালক্রমে বিভিন্ন পদার্থ নিয়ে বিশদভাবে পরীক্ষার ফলে দেখা যায়—এই দুই শ্রেণীর মধ্যে আবার আর এক শ্রেণীর পদার্থ আছে, যারা সীমিত জায়গায় তড়িৎকে ধরেও রাখতে পারে না, আবার তড়িৎ অল্প সময়ের মধ্যে এদের সর্বত্র ছড়িয়েও পড়তে পারে না। এই ধরণের পদার্থের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য জার্মেনিয়াম (Germanium), সিলিকন (Silicon) ও গ্যালিনা, কপার অক্সাইড, ক্যাডমিয়াম সালফাইড জাতীয় বিভিন্ন যৌগিক পদার্থ। এদের নাম দেওয়া হয় সমপরিবাহী।

তড়িৎ-বিদ্যার চর্চার সঙ্গে সঙ্গে পরিবাহী ও অপরিবাহী পদার্থের গূঢ় তত্ত্ব বিজ্ঞানীদের আয়ত্তে আসে। জানা যায় যে, পরিবাহী ও অপরিবাহী পদার্থের তড়িৎ-গুণের বিভিন্নতা আসে এদের পারমাণবিক গঠনের বিভিন্নতা থেকে। পরিবাহী পদার্থের পরমাণুগুলির ইলেকট্রনের একটি অংশ মুক্ত অবস্থায় থাকে এবং এরাই তড়িৎকে এক অংশ থেকে অন্য অংশে বয়ে নিয়ে যায়। কিন্তু অপরিবাহী পদার্থের পরমাণুর ইলেকট্রনগুলি কঠিন বন্ধনে বাঁধা থাকে বলে তড়িৎকে ছড়িয়ে দেবার কোন বাহক পাওয়া যায় না। সমপরিবাহী পদার্থের গুণাগুণ কিন্তু বিজ্ঞানীদের কাছে বিশেষ দুর্বোধ্য ছিল। অতি বিশুদ্ধ সমপরিবাহী পদার্থ তৈরি করবার কায়দা যতদিন না আয়ত্ত হয়েছিল, ততদিন এদের গুণাগুণ জানাও সম্ভব ছিল না। বিভিন্ন বিজ্ঞানীর পরীক্ষার ফলাফলে মিলের চেয়ে অমিলই বেশী দেখা যেত। উপরন্তু তত্ত্বের দিক থেকেও পরীক্ষার ফল বোঝা যাচ্ছিল না। তাই পদার্থবিদেরা একে পদার্থবিদ্যার একটি 'নোংরা অংশ' ধরে নিয়ে এদের পরিহার করে চলতেই অভ্যস্ত হয়ে পড়েন।

সমপরিবাহী পদার্থকে বোঝা সম্ভব না হলেও কোন কোন ক্ষেত্রে এদের ব্যবহার চালু ছিল। পরিবর্তী প্রবাহকে (A. C.) সমপ্রবাহে (D. C.) পরিবর্তিত করবার জন্যে এদের ব্যবহার করা হতো। তামার একটি পাতের একটা দিককে অক্সিজেনের আবহাওয়ায় গরম করে নিলে দেখা যেত, তড়িৎ-প্রবাহ তামা থেকে কপার অক্সাইডে যেতে পারে, কিন্তু উল্টো দিকে যেতে পারে না। আবার গ্যালিনার একটি খণ্ড নিয়ে তার উপরে কোন ধাতুর তার চেপে লাগিয়ে নিলেও দেখা যায়, তড়িৎ-প্রবাহ ধাতুটি থেকে গ্যালিনায় যেতে পারে, কিন্তু উল্টো দিকে যেতে পারে না। তাই বহুকাল থেকেই পরিবর্তী প্রবাহকে সমপ্রবাহে পরিবর্তিত করবার জন্যে এবং বেতার-তরঙ্গ থেকে শব্দজ্ঞাপক তরঙ্গ উৎপন্ন করবার কাজে কপার অক্সাইড ও গ্যালিনার বহুল প্রচলন ছিল। ভাল্ব আবিষ্কারের পরে এই ব্যবহার কিছুটা কমে যায়, কেন না, ভাল্বের দ্বারা একাজ আরও সুষ্ঠুভাবে করা যেত। কিন্তু রেডার জাতীয় যন্ত্রে, যেখানে স্বল্প দৈর্ঘ্যের বেতার-তরঙ্গ (Microwave) ব্যবহৃত হয়, সে সব ক্ষেত্রে এই ধরণের ক্রিষ্ট্যালের ব্যবহার থেকে যায়। স্বল্প দৈর্ঘ্যের বেতার-তরঙ্গের যন্ত্রে

ভাল্‌ব ঠিক কাজ করতো না বলেই কৃষ্ট্যালের ব্যবহার চালু ছিল। গত মহাযুদ্ধের সময় রেডারে এই কৃষ্ট্যালের বহুল প্রচলনের ফলে বিজ্ঞানীদের সমপরিবাহী পদার্থ সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসা অনেক বেড়ে যায়। বহু বিজ্ঞানী এদের নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা আরম্ভ করেন। তাঁদের চেষ্টায় সমপরিবাহী পদার্থকে বিশুদ্ধিকরণের বিদ্যা আয়ত্তে আসে। তত্ত্ববিদেরাও সমপরিবাহী পদার্থের পরমাণুর আভ্যন্তরীণ অবস্থা সম্পর্কে অনেক বেশী অবহিত হয়ে ওঠেন।

বহুজনের অধ্যবসায়ে পদার্থবিদ্যার 'নোংরা অংশটি' পরিষ্কৃত হয় এবং ছাইয়ের গাদা থেকে আবিষ্কৃত হয় একটি নতুন মাণিক। পরিবাহী ও অপরিবাহী পদার্থ থেকে অনেক বেশী উপযোগী গুণ নিয়ে দেখা দেয় সমপরিবাহী পদার্থ। পরিবাহী এবং অপরিবাহী পদার্থের ব্যবহারের ক্ষেত্র সীমাবদ্ধ—কেন না, এদের তড়িৎ-গুণ সহজে পাল্টানো যায় না। সহজে যদি তড়িৎ-প্রবাহকে এক স্থান থেকে অন্যস্থানে নিয়ে যেতে হয়, তাহলে ব্যবহার করা হয় পরিবাহী পদার্থ—যেমন, বাড়ীর ইলেকট্রিক লাইনে। প্রয়োজন অনুসারে এবং অর্থনৈতিক অবস্থা বুঝে রূপা, তামা বা অ্যালুমিনিয়াম ব্যবহৃত হয়। আবার তড়িৎ থেকে আত্মরক্ষা করতে হলে বা দুটি লাইনকে আলাদা রাখতে হলে ব্যবহৃত হয় অপরিবাহী পদার্থ। যেমন, বাড়ীর সুইচে ব্যাকেলাইট, লাইনের আবরণে রবার, দূর পাল্লার উচ্চ বিভবের বৈদ্যুতিক লাইনে চীনামাটি। এমনিভাবে তড়িৎ-চুম্বক তৈরি করবার কাজে ব্যবহার করা হয় লোহা, তাপ উৎপন্ন করবার জন্যে নিকেল ও ক্রোমিয়ামের গলিত মিশ্রণ, আলোর জন্যে টাংষ্টেন। এই সব পদার্থের তড়িৎ-গুণ প্রায় অপরিবর্তনীয়, পারিপার্শ্বিকের উপরে খুব অল্প পরিমাণেই নির্ভরশীল। পরিবাহী ও অপরিবাহী পদার্থের তড়িৎ-গুণ অপরিবর্তনীয় হওয়ার প্রধান কারণ হলো এই যে, এদের মধ্যে মুক্ত ইলেকট্রনের সংখ্যার সহজে কোন পরিবর্তন করা যায় না। অপরিবাহী পদার্থের ইলেকট্রনের বন্ধন মুক্ত করা সহজ নয়। আবার পরিবাহী পদার্থে মুক্ত হওয়ার মত সব ইলেকট্রনই মুক্ত থাকে বলে তাদের সংখ্যাও বাড়ানো বা কমানো যায় না। শুধু মাত্র তাপমাত্রার পার্থক্য ঘটিয়েই পরিবাহী ও অপরিবাহী পদার্থের তড়িৎ-গুণের সামান্য পরিবর্তন করা যায়। যদি নিয়ন্ত্রণ-যোগ্য কোন বৈদ্যুতিক যন্ত্র তৈরি করতে হয়, তাহলে এমন কোন পদার্থ দরকার, যার মুক্ত ইলেকট্রনের সংখ্যার সহজে পরিবর্তন করা যায়। পরিবাহী পদার্থের ইলেকট্রনগুলি বাইরে নিয়ে আসা যায় তাপ দিয়ে বা আলো ফেলে। ভাল্‌বে এমনি তাপের দ্বারা পরিবাহী পদার্থ থেকে বাইরে আনা মুক্ত ইলেকট্রনরই ব্যবহার হয়। ভাল্‌বের বায়ুশূন্য অংশে এই মুক্ত ইলেকট্রনগুলি নিয়ন্ত্রণ করেই তড়িৎ-প্রবাহ নিয়ন্ত্রিত করা হয় এবং ফলে বৈদ্যুতিক নিয়ন্ত্রণাধীনে বিভিন্ন যন্ত্রপাতি ভাল্‌বের দ্বারা চালানো সম্ভব হয়।

সমপরিবাহী পদার্থের তড়িৎ-গুণ খুব সহজেই পরিবর্তিত করা যায়। এদের পরমাণুর যে ইলেকট্রনগুলি মুক্ত হতে পারে, তার কিছু অংশ সাধারণতঃ মুক্ত থাকে এবং কিছু অংশ পরমাণুর সঙ্গেই বাঁধা থাকে। কতগুলি ইলেকট্রন বাঁধা থাকবে এবং কতগুলি মুক্ত থাকবে, তাও সহজেই নিয়ন্ত্রণ করা যায় তাপমাত্রার পার্থক্য ঘটিয়ে বা চৌম্বক ক্ষেত্রে রেখে দিয়ে বা অন্য পদার্থ মিশিয়ে। ধরা যাক জার্মেনিয়ামের গুণাগুণ। জার্মেনিয়াম ধাতু হলেও এর তড়িৎ-প্রকৃতি সমপরিবাহী। অতি বিশুদ্ধ জার্মেনিয়ামের এক ঘন সেন্টিমিটার একটি টুক্‌রার অবরোধ (Resistance) ২৫° সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় ৪৭ ওম্; অর্থাৎ এমন একটি টুক্‌রায় ৪৭ ভোল্ট তড়িৎ-বিভব প্রয়োগ করলে ১ অ্যাম্পিয়ার তড়িৎ-প্রবাহ চলে। কিন্তু

তাপমাত্রা যদি ১০° সেন্টিগ্রেড বাড়ানো হয়, তাহলে ঐ টুক্‌রাটির অবরোধ কমে গিয়ে হয়ে যায় ৪৪ ওম্। আবার যদি ১০ কিলোগাউস চৌম্বক ক্ষেত্রে টুক্‌রাটি রেখে দেওয়া হয়, তাহলে অবরোধ বেড়ে গিয়ে হয়ে যায় ৫৫ ওম্। অন্য পদার্থ মিশিয়ে দিলেও টুক্‌রাটির অবরোধ অনেক কমে যায়। দেখা যায় অন্য পদার্থ মিশিয়ে বিশুদ্ধ জার্মেনিয়ামকে নিয়ন্ত্রিতভাবে অবিশুদ্ধ করে দুই ধরণের জার্মেনিয়াম পাওয়া যায়। এক হলো বিশুদ্ধ জার্মেনিয়ামের চেয়ে বেশী সংখ্যক ইলেকট্রনযুক্ত ঋণাত্মক (n-type) জার্মেনিয়াম। দ্বিতীয় হলো বিশুদ্ধ জার্মেনিয়ামের চেয়ে কম সংখ্যক ইলেকট্রনযুক্ত ধনাত্মক (p-type) জার্মেনিয়াম। প্রথম ধরণের জার্মেনিয়াম তৈরি হয় অ্যান্টিমনি বা আর্সেনিক মিশিয়ে এবং দ্বিতীয় ধরণের জার্মেনিয়াম তৈরি হয় গ্যালিয়াম বা ইণ্ডিয়াম মিশিয়ে। এই দুই ধরণের জার্মেনিয়ামেরই প্রতি ঘন সেন্টিমিটারের অবরোধ বিশুদ্ধ জার্মেনিয়ামের চেয়ে অনেক কম হতে পারে। উপরন্তু এই দুই ধরণের জার্মেনিয়াম পরস্পরের সঙ্গে যুক্তাবস্থায় রাখা হলে বিদ্যুৎ-বিভবের সাহায্যে ইলেকট্রনগুলিকে এক অংশ থেকে অন্য অংশে নিয়ে যাওয়া যায়। ফলে ভাল্‌বে যেমন নিয়ন্ত্রণযোগ্য মুক্ত ইলেকট্রন পাওয়া যায়, জার্মেনিয়ামেও তেমনি ইলেকট্রন পাওয়া যেতে পারে।

বেল লেবরেটরীর বিজ্ঞানীরাই সর্বপ্রথম বিশেষভাবে বিশুদ্ধ ও নিয়ন্ত্রিত অবিশুদ্ধ জার্মেনিয়াম নিয়ে পরীক্ষা করে এদের নিয়ন্ত্রণযোগ্য ইলেকট্রনের বিভিন্ন গুণাগুণ আবিষ্কার করেন। সমসাময়িক অন্যান্য বিজ্ঞানীরাও এর তত্ত্বের জট ছাড়িয়ে অন্তর্নিহিত ঘটনাগুলি বিজ্ঞানীদের আয়ত্তে আনেন। এর ফলেই আবিষ্কৃত হয় ভাল্‌বের ন্যায় বিদ্যুৎ-প্রবাহকে নিয়ন্ত্রণ করবার একটি নতুন যান্ত্রিক কৌশল—ট্র্যানজিস্টর। ইণ্ডিয়াম মেশানো একটি জার্মেনিয়াম-খণ্ডের দুই প্রান্তকে আর্সেনিকের বাষ্পে কিছুক্ষণ রেখে দিয়ে ঐ দুই প্রান্তে ও মাঝখানে তিনটি তার জুড়ে দিলেই ট্র্যানজিস্টর তৈরি হয়ে যায়। দুই প্রান্তে আর্সেনিক থাকায় প্রান্ত দুটি হয় ঋণাত্মক গোত্রের এবং মাঝখানের অংশে ইণ্ডিয়াম থাকায় এটি হয় ধনাত্মক গোত্রের। ফলে এক প্রান্ত ও মাঝখানের তড়িৎ-বিভবের পরিবর্তন ঘটিয়ে অপর প্রান্তের তড়িৎ-প্রবাহ পরিবর্তিত করা যায় এবং বিশেষ ব্যবস্থার দ্বারা অপর প্রান্তে প্রথম প্রান্তের চেয়ে জোরালো তড়িৎ-বিভব পাওয়া যেতে পারে। এভাবে ট্র্যানজিস্টরের দ্বারা তড়িৎ-বিভবের জোর কমানো বা বাড়ানো যেতে পারে। কাজেই ভাল্‌বের ন্যায় দূরাগত বেতার-তরঙ্গের জোর ট্র্যানজিস্টরের দ্বারা বাড়ানো যায়। ফলে রেডিওতে এই ট্র্যানজিস্টরের ব্যবহার দেখা দেয়। শব্দ সৃষ্টিকারী বিদ্যুৎ-তরঙ্গের জোর বাড়ানোর জন্যে অ্যামপ্লিফায়ারে বা মাইকের আনুষঙ্গিক সরঞ্জামেও এর ব্যবহার চালু হয়। ট্র্যানজিস্টরের সঙ্গে সঙ্গে সমপরিবাহী পদার্থের ডায়োড, প্রচলিত ভাষায় ক্রিষ্ট্যালেরও প্রভূত উন্নতি হওয়ায় বেতার-তরঙ্গ থেকে শব্দ সৃষ্টিকারী তড়িৎ-প্রবাহ আহরণ করবার কাজেও সমপরিবাহী পদার্থ বিশেষভাবে উপযোগী হয়ে ওঠে।

উল্লিখিত ক্ষেত্রগুলি ছাড়াও আজকাল সমপরিবাহী পদার্থের আরও অনেক ধরণের উপযোগিতা জানা গেছে। এর মধ্যে বিশেষ কয়েকটি উপযোগিতার কথা অবশ্যই উল্লেখ করা প্রয়োজন। আগেই বলা হয়েছে যে, সমপরিবাহী পদার্থের অবরোধ তাপমাত্রা ও চৌম্বক ক্ষেত্রের উপর বিশেষভাবে নির্ভরশীল। আলো বা বিকিরিত তাপ সমপরিবাহী পদার্থের উপর পড়লে এর অবরোধ ক্ষমতা অনেকটা বদ্‌লে যায়। দ্বিতীয়তঃ কোন সমপরিবাহী পদার্থের একটি খণ্ডের দুই প্রান্তকে ঋণাত্মক ও ধনাত্মক করে নিলে যে ডায়োড পাওয়া যায়, তার উপর আলো ফেললে বা দুই

প্রান্তের তাপমাত্রার পার্থক্য ঘটালে দুই প্রান্তে তড়িৎ-বিভবের সৃষ্টি হয়। তৃতীয়তঃ সমপরিবাহী পদার্থে বা এই পদার্থ দিয়ে তৈরি ডায়োডে বিদ্যুৎ-প্রবাহ চালালে এথেকে আলো ও অন্যান্য তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের বেতার-তরঙ্গ বিকিরিত হয়। সমপরিবাহী পদার্থের এই সব গুণাগুণ সহজ ও সাধারণ পরীক্ষায়ই ধরা পড়ে, কিন্তু এর ব্যাখ্যা পদার্থ-বিদ্যার তাত্ত্বিক জটিলতার মধ্যে পড়ে এবং সাধারণের পক্ষে তা বিশেষ দুর্বোধ্যও বটে। তত্ত্ব না বুঝলেও কিন্তু গুণগুলি যে বিভিন্ন ধরণের কাজের উপযোগী হবে, তা সহজেই বোঝা যায়।

তাপমাত্রার উপর সমপরিবাহী পদার্থের অবরোধ-ক্ষমতা বিশেষভাবে নির্ভর করে বলে তাপমাত্রা পরিমাপের জন্যে এর ব্যবহার হতে পারে। আবার যে সব যন্ত্রে তাপমাত্রা নির্দিষ্ট রাখতে হয়, সে সব যন্ত্রেও সমপরিবাহী পদার্থের থার্মোমিটার বহুল ব্যবহৃত হয়। এমনিভাবে চৌম্বক ক্ষেত্র পরিমাপের জন্যে বা চৌম্বক ক্ষেত্র ব্যবহার করে বিভিন্ন যন্ত্রের বিদ্যুৎ-প্রবাহকে নিয়ন্ত্রিত করবার জন্যেও এর ব্যবহার হয়। আলো পড়লে সম-পরিবাহী পদার্থের অবরোধ পরিবর্তিত হয় বলে আলো মাপবার জন্যেও এর ব্যবহার হয়, যেমন—ক্যামেরায় আলো নির্দেশক যন্ত্রে। এক্ষেত্রে একটি সমপরিবাহী পদার্থের মধ্য দিয়ে ব্যাটারীর সাহায্যে তড়িৎ-প্রবাহ পাঠানো হয় এবং তড়িৎ-প্রবাহের পরিমাণ একটি মিটারে নির্দেশিত হয়। সমপরিবাহী পদার্থে আলো পড়লে তড়িৎ-প্রবাহ বেড়ে যায় এবং পক্ষান্তরে তড়িৎ-প্রবাহ পরিমাপক মিটার আলোর পরিমাণ নির্দেশ করে অপর পক্ষে আবার আলো ব্যবহার করে সমপরিবাহী পদার্থের সাহায্যে বিভিন্ন নিয়ন্ত্রণ যন্ত্রও তৈরি করা যায়; যেমন, চোর ধরবার অ্যালার্ম। আলোর কাছে রেখে দিলে কোন সমপরিবাহী পদার্থে যে তড়িৎ-প্রবাহ পাওয়া যায়, আলোর সামনে দিয়ে কেউ হেঁটে গেলে সেই তড়িৎ-প্রবাহের পরিবর্তন ঘটবে। সেই পরিবর্তন কাজে লাগিয়ে অ্যালার্ম বাজানো যেতে পারে।

সমপরিবাহী পদার্থের ডায়োডেরও আলো পরিমাপের জন্যে বহুল প্রচলন আছে। আজকাল অধিকাংশ ক্যামেরায় সমপরিবাহী পদার্থের বদলে সাধারণতঃ ডায়োডেরই ব্যবহার হয়; কেন না, এর সঙ্গে ব্যাটারী লাগাতে হয় না। এক্ষেত্রে ডায়োডের উপর আলো পড়লে যে তড়িৎ-বিভবের সৃষ্টি হয়, তার দ্বারাই এর দুই প্রান্তের মধ্যে লাগানো মিটারে তড়িৎ-প্রবাহ চলে। তাই একটি ডায়োড ও মিটার ব্যবহার করেই আলোর পরিমাণ মিটারের নির্দেশ থেকে জানা যেতে পারে। আলোর ন্যায় বিকিরিত তাপও সমপরিবাহী পদার্থের ডায়োড দিয়ে মাপা যেতে পারে। এমনি ডায়োডের আর একটি প্রসারিত ব্যবহারের ক্ষেত্র হলো সূর্যালোক থেকে বিদ্যুৎ-শক্তি উৎপন্ন করবার কাজে। সূর্যালোককে পুরাপুরি কাজে লাগাবার জন্যে ডায়োডটি বিশেষভাবে তৈরি করা হয়, যেন সূর্যরশ্মির সব অংশ শুষে নিতে পারে। এই বিশেষ কাজের ডায়োডের নাম দেওয়া হয়েছে সৌর-কোষ (Solar battery)। সূর্যালোকে রেখে দিলে সাধারণ ব্যাটারীর মতই এই সৌর-কোষের দুই প্রান্তে তড়িৎ-বিভবের সৃষ্টি হয় এবং একে ব্যাটারীর বিকল্পরূপে ব্যবহার করা যায়। মহাকাশযানের বৈদ্যুতিক শক্তির উৎসের অধিকাংশই এই সৌর-কোষ। ডানার উপরে বা যানের গায়ে কাচ লাগানো যে অংশ দেখা যায়, সেই অংশ সৌর-কোষের দ্বারাই পূর্ণ থাকে এবং এরাই সূর্যালোক থেকে তড়িৎ-শক্তি উৎপন্ন করে বিভিন্ন বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি চালু রাখে।

সমপরিবাহী পদার্থে বিদ্যুৎ-প্রবাহ পাঠালে এর দুই প্রান্তের তাপমাত্রার বিশেষ পার্থক্য হয় বলে তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করবার জন্যে বা

কোন জায়গাকে ঠাণ্ডা করবার জন্তে, যেমন—রেফ্রিজারেটারে এর ব্যবহার দেখা যায়, কতকগুলি সমপরিবাহী পদার্থের খণ্ডকে জুড়ে নিয়ে এক প্রান্ত রেফ্রিজারেটারের মধ্যে রেখে বিদ্যুৎ-প্রবাহ চালালেই অভ্যন্তরের প্রান্ত ঠাণ্ডা হয়ে যায় এবং রেফ্রিজারেটারের তাপমাত্রা কমিয়ে দেয়।

সমপরিবাহী পদার্থের তৃতীয় ধরণের গুণকে কাজে লাগানো সাম্প্রতিক কালেই আরম্ভ হয়েছে। দুটি ধাতুর চাদরের মধ্যে কিছুটা সমপরিবাহী পদার্থ রেখে দিয়ে চাদর দুটিতে তড়িৎ-বিভব যোগ করলেই পদার্থটি থেকে আলো নির্গত হয়। এই আলো ঘরের মধ্যে অভিনবভাবে কাজে লাগানো যেতে পারে। ঘরের পর্দায় বা দেয়ালে সমপরিবাহী পদার্থ পেন্টের মত লাগিয়ে নিয়ে তড়িৎ-বিভবের সাহায্যে সমগ্র পর্দা বা দেয়াল থেকে স্নিগ্ধ আলো পাওয়া যেতে পারে। বিদ্যুতের খরচা এই ধরণের আলোতে অনেক কম এবং সব জায়গা সমভাবে আলোকিত করাও সম্ভব। বিজ্ঞাপনে বা সঙ্কেতের কাজেও এই ধরণের আলোর উপযোগিতা সহজেই উপলব্ধি করা যায়। কার্যকরী সমপরিবাহী পদার্থের আলো উদ্ভাবনের কাজ খুব দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে এবং অতি অল্পকালের মধ্যেই সাধারণের ব্যবহারের জন্তে আলো পাওয়া যাবে বলে আশা করা যায়।

ট্রানজিস্টর আবিষ্কারের পর থেকেই দুর্বল তড়িৎ-প্রবাহ ব্যবহারকারী রেডিওর সমগোত্রীয় যন্ত্রে ভাল্‌বের বিকল্পরূপে সমপরিবাহী পদার্থের ব্যবহার আরম্ভ হয়। অ্যাম্‌প্লিফায়ার, কম্পিউটার, কৃত্রিম হৃদ্‌যন্ত্র, শ্রবণ যন্ত্র প্রভৃতি অসংখ্য রকমের ছোট বৈদ্যুতিক যন্ত্রে ট্রানজিস্টর পুরাপুরি ভাল্‌বের জায়গা দখল করে। কিন্তু ট্রানজিস্টরের বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপন্ন করবার ক্ষমতা সীমিত থাকায় বেতারের প্রেরক যন্ত্রে (Transmitter) এর বিশেষ প্রয়োগ হয় নি। কিন্তু ট্রানজিস্টরের ক্ষমতার পরিধি ক্রমান্বয়ে বেড়েই চলেছে এবং ছোট ছোট প্রেরক যন্ত্রে এর ব্যবহার আরম্ভ হচ্ছে। উপরন্তু সমপরিবাহী পদার্থের দ্বারা অতি আধুনিক কালে এক অভিনব ধরণের বেতার-তরঙ্গ উৎপাদক যন্ত্র আবিষ্কৃত হয়েছে। গ্যালিয়াম আর্সেনাইড জাতীয় সমপরিবাহী পদার্থে বিদ্যুৎ-প্রবাহ পাঠালে আপনা থেকেই রেডারের উপযোগী স্বল্প দৈর্ঘ্যের বেতার তরঙ্গ বিকিরিত হয়। মাইক্রোওয়েভের ক্ষেত্রে গ্যালিয়াম আর্সেনাইডের এই গুণ বলতে গেলে যুগান্তর এনেছে। আশা করা যাচ্ছে, এর ব্যবহারে যে সব যন্ত্র মাইক্রোওয়েভে চলে, যেমন—রেডার, মাইক্রোয়েভের টেলিফোন, সে সব যন্ত্রে অনেক সরলতা আসবে।

গ্যালিয়াম আর্সেনাইড জাতীয় সমপরিবাহী পদার্থের ডায়োডেরও একটি অভিনব গুণ আবিষ্কৃত হয়েছে। বিদ্যুৎ-প্রবাহ পাঠালে এই ডায়োড থেকে আলো বা তাপ রশ্মি বিকিরিত হয়, যে আলো বা বিকিরিত তাপ খুব জোরালো, কেন্দ্রীভূত ও বিশুদ্ধ হয়। মহাশূন্তের সঙ্গে খবর আদান-প্রদানের কাজে এই আলো বা তাপ বিশেষ উপযোগী হবে বলে আশা করা যায়।

ট্রানজিস্টর বা ভাল্‌বের দ্বারা বিদ্যুৎ-তরঙ্গকে জোরালো করা যায় বটে, কিন্তু স্বল্প দৈর্ঘ্যের তরঙ্গকে জোরালো করা যায় না। সমপরিবাহী পদার্থের ডায়োডের একটি বিশেষ গুণকে কাজে লাগিয়ে একাজও করা যায়। ফলে মাইক্রোওয়েভের যন্ত্রপাতি অনেক সূক্ষ্ম করা সম্ভব হয়েছে এবং বেতার-জ্যোতির্বিত্তার (Radio-Astronomy) কাজও অনেক উন্নত হয়েছে।

মোট কথা, গত বিশ বছরের গবেষণার ফলে সমপরিবাহী পদার্থ আজ এমন এক রূপ নিয়ে দেখা দিয়েছে যে, আমাদের বিভিন্ন প্রয়োজন মেটাবার জন্তে বিদ্যুৎ-শক্তির ব্যবহার হবে

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সমপরিবাহী পদার্থের মাধ্যমে। আলো, রেডিও, টেলিফোন, টেলিভিশন, বেতার-জ্যোতির্বিদ্যা, রেডার, মহাকাশযানের ব্যাটারী, ক্যামেরার আলোর মিটার, আলোর বিজ্ঞাপন প্রভৃতি সর্বত্রই সমপরিবাহী পদার্থ অচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে দেখা দিয়েছে। সমপরিবাহী পদার্থের কথার শেষ নেই। বিংশ শতাব্দীর এক অভিনব ও বিস্ময়কর আবিষ্কার এই পদার্থ ও এই পদার্থ দিয়ে তৈরি যন্ত্রপাতি। গবেষণা যতই এগিয়ে চলেছে, সমপরিবাহী পদার্থের উপযোগিতা সম্পর্কে মানুষের বিস্ময়ও ততই বেড়ে চলেছে। বিভিন্ন প্রগতিশীল দেশে তাই সমপরিবাহী পদার্থ নিয়ে গবেষণা একটি বিশেষ স্থান অধিকার করেছে। অসংখ্য ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানে এবং সরকারী ও বেসরকারী গবেষণাগারে অসংখ্য বিজ্ঞানী এই গবেষণায় ব্যাপৃত আছেন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, আমাদের দেশে কয়েকটি গবেষণাগারে এই বিষয়ে সামান্য কাজ হলেও সমপরিবাহী পদার্থের উপযোগিতা সম্পর্কে আমরা এখনও অবহিত নই অথবা পদার্থবিদ্যার এক সময়ের এই 'নোংরা অংশ' সম্বন্ধে আমাদের বিরাগ এখনও কাটিয়ে উঠতে পারি নি। অন্যান্য দেশের তুলনায় এই ব্যাপারে আমরা এখনও অনেক পিছিয়ে আছি। এমন কি, সাধারণভাবে ব্যবহৃত জার্মেনিয়াম বা সিলিকন জাতীয় পদার্থ উৎপন্ন করবার কোন প্রতিষ্ঠান বা গবেষণাগার এখনও স্থাপিত হয় নি বা স্থাপনার কোন উদ্যোগও দেখা যাচ্ছে না। নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে—বিজ্ঞানের এই অবদান সত্য মানুষের পক্ষে অপরিহার্য হয়ে দেখা দেবে এবং যদি অল্প সময়ের মধ্যে আমাদের নিস্পৃহ ভাব না কাটানো যায়, তাহলে দেশরক্ষা বা দেশের সর্বাঙ্গীন উন্নতির কাজে অন্যান্য অনেক দেশের তুলনায় আমাদের অনেক পিছিয়ে থাকতে হবে।

সঞ্চয়ন

রক্তশূন্য শিশুর জন্মের প্রতিকার আবিষ্কার

এই বিষয়ে জন নিউওয়েল লিখেছেন—বৃটেনে জাত প্রতি ২০০টি শিশুর মধ্যে একটি রক্তশূন্যতা (Rh-haemolytic) রোগাক্রান্ত হয়ে থাকে। সম্প্রতি লিভারপুলের ডাক্তারদের চেষ্টায় এই রোগ থেকে মুক্তির উপায় পাওয়া গেছে।

মা ও শিশুর দৈহিক উপাদানের সামান্য তারতম্যের জন্যে এই রোগ হয়ে থাকে। এই তারতম্যের ফলে নবজাত শিশুর দেহে রক্তকণিকার একান্ত অভাব ঘটে। এই শিশুদের বলা হয় রিসাস বেবিজ (Rhesus babise)।

গর্ভস্থ শিশুদেহ ও মায়ের দেহের প্রতিক্রিয়ার ফলেই এই রোগ জন্মায়। প্রতি পাঁচ জনের মধ্যে একজনের রক্তকণিকায় Rh নামে এক প্রকার উপাদান থাকে। যদি মাতা ও পিতা উভয়ের রক্তে এই উপাদান থাকে, অর্থাৎ তাঁরা উভয়েই যদি আর-এইচ পজিটিভ (Rh-positive) হয়, তাহলে বিপদের কোন আশঙ্কা থাকে না। আবার উভয়েই যদি আর-এইচ নেগেটিভ (Rh-negative) হয়, অর্থাৎ উভয়েই যদি এই উপাদান-মুক্ত হয়, তাহলেও কোন বিপদ ঘটে না। এমন কি, পিতা যদি আর-এইচ নেগেটিভ হয়, তবে মাতা আর-এইচ পজিটিভ হলেও কোন ক্ষতি হয় না। কিন্তু পিতা যদি আর-এইচ পজিটিভ হয় এবং সন্তান

যদি তার অনুরূপ হয় এবং মাতা যদি আর-এইচ নেগেটিভ হয়, তাহলেই বিপদ ঘটে।

সাধারণভাবে মা ও শিশুর রক্তকণিকা পরস্পর মেশে না, অন্ততঃ প্ল্যাসেণ্টার বাধা অতিক্রম করে তাদের পরিচলন সম্ভব হয় না। কিন্তু গর্ভকালের শেষাশেষি ছাঁকনিতে ত্রুটি দেখা দেয় ও শিশুর দেহ থেকে দু-একটি রক্তকণিকা মায়ের দেহে পরিবাহিত হতে থাকে। এখন এই শিশুর রক্তকণিকা যদি পিতৃসূত্রে প্রাপ্ত আর-এইচ পজিটিভ উপাদানযুক্ত হয় এবং মা যদি হয় আর-এইচ নেগেটিভ, তাহলে মায়ের দেহ তাঁর গর্ভস্থ শিশুকে বিদেশী বস্তু বলে বিবেচনা করে। শিশুর রক্তকণিকার বিরুদ্ধে মায়ের দেহ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলে। মায়ের দেহ অ্যাণ্টিবডি (Antibody) তৈরি করে শিশুর রক্তকণিকাগুলি নষ্ট করে ফেলে। অনেকটা টীকা নেবার পর যে প্রতিরোধ গড়ে ওঠে, এটি তার অনুরূপ।

মায়ের দেহ প্রথম শিশুর রক্তকণিকার বিরুদ্ধে বেশী শক্তিশালী প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারে না, কিন্তু দ্বিতীয় সন্তানকে গোড়া থেকেই বিদেশী বস্তু বলে গণ্য করে এবং তার সমস্ত রক্তকণিকা নষ্ট করে ফেলে। এই শিশুরা একেবারেই রক্তশূন্য হয়।

এই রোগ থেকে মুক্তি পাবার উপায় হলো, মায়ের দেহকে যেন সন্তানের রক্তকণিকার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে না হয়, তার আগেই সে কাজটি যেন অন্যভাবে করে দেওয়া হয়।

ঠিক এই কাজটি করেছেন লিভারপুর হাসপাতালের অধ্যাপক সি. এ. ক্লার্ক ও তাঁর সহকর্মীরা। যে সব মায়ের সন্তান আর-এইচ পজিটিভ, তাদের অ্যাণ্টিবডিযুক্ত ইনজেকশন দেওয়া হচ্ছে। ইনজেনশনের দ্বারা রক্তকণিকাগুলি নষ্ট করে দেবার ফলে পরবর্তী সন্তানের বিরুদ্ধে মায়ের আর নিজস্ব প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হয় না।

এই পদ্ধতি যুক্তভাবে লিভারপুল, শেফিল্ড, লীডস, ব্র্যাডফোর্ড ও যুক্তরাষ্ট্রের বাল্টিমোরে পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে। ৭৮ জন স্ত্রীলোকের উপর পরীক্ষায় এই পদ্ধতির সুফল পাওয়া গেছে। তাদের দেহে সন্তানের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলা বন্ধ করা সম্ভব হয়েছে। মনে হয়, শিশুর রক্তশূন্যতা (Rh-haemolytic) রোগটিকে সম্পূর্ণরূপে দূর করা সম্ভব হবে। এই পদ্ধতির একটি অসুবিধার দিক হলো এই যে, অ্যাণ্টিবডি ইনজেশনের জন্যে প্রচুর গামা গ্লোবিউলিনের (Gamma globulin) প্রয়োজন হয়।

একটি প্রবন্ধে ডাক্তারেরা বলেছেন—পদ্ধতিটিকে অন্য কাজেও লাগানো যাবে। স্পেয়ার পার্ট সার্জারির (Spare part surgery) সময় দেহে যে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়, এই ইনজেকশন দিয়ে তা প্রশমিত করা যাবে।

অগ্নিদগ্ধ হলে দ্রুত প্রাথমিক সাহায্য

লণ্ডনের কুইন মেরি হাসপাতালের ডাঃ জে. কোহেন অগ্নিদগ্ধ ব্যক্তিদের দ্রুত প্রাথমিক সাহায্য দিয়ে তাদের কষ্ট লাঘব করতে ও হাসপাতালে পাঠাবার এক নতুন পদ্ধতি বের করেছেন।

এই পদ্ধতির মূল কথা হলো নতুন ধরণের ড্রেসিং। এর দ্বারা মাথা থেকে পা পর্যন্ত মারাত্মকভাবে অগ্নিদগ্ধ মানুষের জীবনও এক মিনিটের মধ্যে নিরাপদ করা যাবে।

এই ড্রেসিং-এর উপকরণ হলো প্লাষ্টিক উপাদানে

তৈরি পলিউরেথেন ফোম (Polyurethane foam)। বিভিন্ন প্রয়োজন মেটাতে এই ফোম ২ ইঞ্চি পুরু ও বিভিন্ন আকারে তৈরি করা হয়।

অগ্নিদগ্ধ ব্যক্তিকে প্রথমে ফোমের চাদরে শোয়ানো হয়। তারপর সেই চাদর দিয়ে তাকে মুড়ে প্রয়োজনমত কাটাকুটি করে পিন এঁটে দেওয়া হয়।

একজন শিক্ষাবিহীন লোকও একাজ করতে পারে। বিরাট বিস্ফোরণ বা অগ্নিকাণ্ডের ক্ষেত্রে যেখানে এক সঙ্গে বহুলোক অগ্নিদগ্ধ হয়, সেখানে এটা একটা বড় রকমের সাহায্য। সাধারণ ড্রেসিং-এর চেয়ে এই ড্রেসিং-এ রোগীকে অনেক নিরাপদে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া চলে।

সাধারণ ড্রেসিং-এ সময় লাগে বেশী এবং সেটা তাড়াতাড়ি শক্ত হয়ে ওঠে, পোড়া-জায়গার সঙ্গে জুড়ে যায় এবং সংক্রমণেরও ভয় থাকে। তাছাড়া এই ড্রেসিং-এ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া নিরাপদ নয়।

ফোম ড্রেসিং-এর সুবিধা এই যে, হাসপাতালে পৌঁছে কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই রোগীকে বিশেষ কষ্ট না দিয়ে ফোম ড্রেসিং খুলে নেওয়া যায়। এর অর্থ হলো এই যে, রোগীকে অজ্ঞান করবার জন্যে ঔষধ খাওয়াতে হয় না।

নিরক্ষীয় অঞ্চলে বৃটিশ সৈন্যেরা এই ফোম ড্রেসিং নিয়ে একনাগাড়ে ছয় দিন পর্যন্ত কাটিয়েছেন, কিন্তু তবুও তা গায়ে লেগে যায় নি।

হাসপাতালে অগ্নিদগ্ধ রোগীদের এক্সপোজার ট্রিটমেন্টের (Exposure treatment) সময় ফোমের গদিতে শুইয়ে রাখা হয়। পোড়া দেহের রস গড়িয়ে ফোমে পড়ে সঙ্গে সঙ্গে শুকিয়ে যায়।

মৎস্য উৎপাদনের ভবিষ্যৎ

জে. লুকাস এই সম্পর্কে লিখেছেন—মৎস্য প্রথম শ্রেণীর প্রোটিন, অথচ পৃথিবীতে প্রোটিনের নিদারুণ অভাব। এটা বৃটেনের কাছে একটা বিস্ময়ের ব্যাপার—কেন না, এই দেশের ভৌগোলিক অবস্থান মৎস্য-শিকারের ব্যাপারে খুবই অসুবিধাজনক।

নিকট সমুদ্রের মাছ এই দেশের সব সমুদ্র-তীরেই পাওয়া যায়। নর্থ সীর অগভীর জল থেকে আসে মধ্য সমুদ্রের মাছ এবং গভীর সমুদ্রের মাছ আসে আটলান্টিক, গ্রীনল্যাণ্ড, পশ্চিমের গ্র্যাণ্ড ব্যাঙ্কস, আইস ল্যাণ্ডের চতুর্দিক, নরওয়ে, উত্তর ও পূর্বের বার্নেট সী থেকে।

পৃথিবীর শতকরা ৮০ ভাগ লোক প্রোটিন অভাবে রয়েছে; সর্বনিম্ন প্রয়োজন—দিনে মাথাপিছু ৩০ গ্র্যাম—তাও তারা পায় না। বস্তুতঃ শতকরা ১০ ভাগ লোকের ভাগ্যে দিনে ১০ গ্র্যাম মাছও জোটে না। আবার নিরক্ষীয় ও দক্ষিণ গোলার্ধে, যেখানে প্রোটিনের অভাব নিদারুণ, সেখানকার মানুষকে প্রোটিনের জন্যে শুধু মাছের উপরই নির্ভর করতে হয়।

সমুদ্রে যখন সমস্ত পৃথিবীর মানুষকে (জনসংখ্যা বৃদ্ধির কথা ধরলেও) খাওয়াবার মত প্রচুর মাছ রয়েছে, তখন মাছের চাহিদা ও সরবরাহের মধ্যে এই ভারসাম্যহীনতা কেন?

পৃথিবীব্যাপী বিরাট আকারে মৎস্য-শিল্প কি গড়ে উঠতে পারে? যদি পারে, তাহলে কেমন করে? এই সব প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সহজ নয়—ভৌগোলিক অবস্থান, বায়ুপ্রবাহ, সমুদ্রস্রোত,

তাপমাত্রা, সমুদ্রতলের আকার ও প্রকৃতি প্রভৃতি বিষয় প্রশ্নটির সঙ্গে জড়িত। তারপর রয়েছে কারিগরী ও বৈজ্ঞানিক কলাকৌশলের দিক। জাহাজ ও নৌকাগুলিকে এমনভাবে তৈরি করতে হবে, যাতে তাদের মৎস্য-শিকারের যোগ্যতা বাড়ে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর মাছধরা জালের প্রভূত উন্নতি হয়েছে—এখন ফ্লাক্স, সুতা, নাইলন, টেরেলিন ইত্যাদি সবই ব্যবহৃত হচ্ছে।

তারপর রয়েছে অর্থনৈতিক বাধা। জাহাজ ও জ্বালানি কিনতে টাকার দরকার, জাহাজ চালক ও কর্মীদের কৌশল আয়ত্ত করতেও টাকার দরকার। সর্বোপরি ভাল ডক এবং পরিবহন ও সংরক্ষণ ব্যবস্থার জন্যেও প্রচুর অর্থের প্রয়োজন।

মৎস্য-শিল্প সর্বাপেক্ষা প্রাচীন এবং ২০০০ বছরেও এর মৌলিক কলাকৌশল প্রায় একই আছে। পুকুরে মিঠা জলের মাছের চাষ ও সমুদ্রের মাছ নিয়ে কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা ছাড়া মৎস্য-পালনের ক্ষেত্রে বিশেষ কিছু করা হয় নি। এখনো সমুদ্রই মানুষের কাছে মাছের প্রধান উৎস।

নতুন সম্ভাবনা রয়েছে—আধুনিক কারিগরী বিদ্যার সাহায্যে সমুদ্রের অংশবিশেষ বেছে নিয়ে সেখানে মৎস্যের সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটানো বা মৎস্য-শিকারের যোগ্যতা বৃদ্ধির মধ্যে। এই দুদিকেই কিছু অগ্রগতি ঘটেছে।

চারটি মৎস্যবহুল বিরাট ক্ষেত্র আবিষ্কৃত হয়েছে। এই চারটি ক্ষেত্রেই সমুদ্রস্রোতবাহিত হয়ে অনেক নিউট্রিয়েন্ট জমা হয়। সৌভাগ্য-ক্রমে এই চারটি ক্ষেত্রের কাছাকাছি দেশেই খাদ্যাভাব রয়েছে। এই চারটি ক্ষেত্র হলো দক্ষিণ আমেরিকার পশ্চিম উপকূল, আফ্রিকার পশ্চিম ও পূর্ব উপকূল এবং ভারতের মালাবার উপকূল।

এই চারটি অঞ্চলের মধ্যে একমাত্র দক্ষিণ আমেরিকার সমুদ্র অঞ্চলেই ব্যাপকভাবে মৎস্য-শিকার অভিযান চালানো সুরু হয় ১৯৫৮ সালে। এখানে প্রতি বছর প্রায় ৭০ লক্ষ টন মাছ ধরা হয়ে থাকে। অবশ্য তিনটি অঞ্চলে এখনও অভিযান চালানো হয় নি। তবে অনুমান করা যায়, এই অঞ্চলগুলির প্রত্যেকটিতে বছরে ৫০ লক্ষ টন মাছ ধরা পড়বে। বিশেষজ্ঞেরা মনে করেন, পুরনো ও নতুন মৎস্য অঞ্চলগুলি থেকে যদি ব্যাপকভাবে মৎস্য-উৎপাদন সুরু করা যায়, তাহলে আগামী ২০ বছরে পৃথিবীতে মৎস্য-উৎপাদন দ্বিগুণ হবে।

অনেকের মতে, এটা অতি আশাবাদী মনোভাবের পরিচায়ক; কারণ উত্তর আটলান্টিক ও উত্তর প্রশান্ত অঞ্চল থেকে আর মৎস্য-উৎপাদন বৃদ্ধি সম্ভব নয়।

উৎপাদন বৃদ্ধি করতে হলে মৎস্য-শিকার পদ্ধতির যোগ্যতা বাড়ানো দরকার। পাল-তোলা নৌকার যুগ থেকেই ট্রলিং-এর ব্যবস্থা রয়েছে। তবে বর্তমানে তলদেশ থেকে, মধ্য-জলে ও গভীর সমুদ্রে মাছ ধরবার জন্যে বিভিন্ন ধরণের ট্রলার রয়েছে। এদের মধ্যে মধ্য-জলের ট্রলারগুলিই বেশী মনোযোগ আকর্ষণ করে।

ট্রলারগুলিও নতুন নতুন রূপ নিচ্ছে। জাহাজের পাশাপাশি না রেখে এখন তাদের পিছনের দিকে রাখা হয়। এই ধরণের জাহাজের মধ্যে 'ফেয়ারট্রি' একটি অগ্রণী জাহাজ। এই ধরণের আরও আধুনিক জাহাজ হলো 'আর্কটিক ক্রিবুটার'। এই জাহাজ গভীর সমুদ্রে মাছ ধরবার উদ্দেশ্যেই নির্মিত। এগুলি সাধারণতঃ দেশ থেকে ১০০০ মাইল দূরে গিয়ে মৎস্য-শিকার করে থাকে। যান্ত্রিকীকরণ সত্ত্বেও এই কারখানা জাহাজে প্রোসেসিংয়ের জন্যে অনেক নাবিক রাখতে হয়। সেই জন্যে এই জাহাজের সাহায্যে মাছ ধরা ব্যয়সাধ্য ব্যাপার।

স্থলে শ্রমিকদের শ্রমের সময় কমিয়ে দেওয়ায় ও জাহাজী শ্রমিকের জীবনযাত্রা কষ্টসাধ্য হওয়ায় এই সব গভীর সমুদ্রে মাছ-ধরা জাহাজের জন্যে শ্রমিক পাওয়া কঠিন। সে জন্যে আর্কটিক

ফ্রিবুটারে অনেক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

সমুদ্রে মাছের ঝাঁকের সন্ধান করা হয় হাল্‌কা বিমান বা হেলিকপ্টারের সাহায্যে। জাহাজের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে ইলেকট্রনিক ফিস ফাইণ্ডার (Fish finder)। একটি রেডার টাইপ স্ক্রীনে মাছের ঝাঁককে প্রত্যক্ষ করা যায়—এমন কি, বিচ্ছিন্নভাবে একটি বিশেষ মাছকেও দেখা যায়। এর ফলে বিশেষ মাছ ধরবার জন্যে বিশেষ পদ্ধতি অবলম্বন করা সম্ভব হয়।

এটা সত্যি যে, পুরনো মৎস্য-অঞ্চলগুলি অত্যধিক পরিমাণে কর্ষিত, কিন্তু সে এক বিশেষ ধরণের মাছের ক্ষেত্রে, এক বিশেষ গভীরতায়। তাই সেখানে নতুন পদ্ধতি প্রয়োগে পরীক্ষা চালানো হচ্ছে।

বৈদ্যুতিক মাছ ধরা দুভাবে চালানো যেতে পারে। একটি হলো ইলেকট্রোট্যাক্সিস (Electro-taxis)—এতে দুটি ইলেকট্রোডের মধ্যে যখন বৈদ্যুতিক তরঙ্গ চালানো হয়, তখন মাছগুলি অ্যানোডের (Anode) দিকে আকৃষ্ট হয়।

দ্বিতীয়টি হলো ইলেকট্রোনারকোসিস ও ইলেকট্রোকিউশন (Electronarcosis and electrocution)। এতে বৈদ্যুতিক তরঙ্গের দ্বারা মাছগুলির মৃত্যু ঘটানো হয়। এই পদ্ধতি একত্রে প্রয়োগ করা চলে। তবে ব্যবহৃত বিদ্যুৎ-শক্তি ৮০ কিলোওয়াটের হলে বিপদের সম্ভাবনা থাকে।

মৎস্য-শিল্পের অবশ্যই ভবিষ্যৎ আছে। পুরনো অঞ্চলগুলি অধিক ব্যবহৃত হলেও নতুন অঞ্চলগুলিতে অভিযান চালানো হচ্ছে।

একটি সমস্যা কিন্তু এখনও যথেষ্ট মনোযোগ আকর্ষণ করে নি। সেটি হচ্ছে ক্রেতাদের কুসংস্কার। উদাহরণস্বরূপ, উত্তর আটলান্টিকে এমন অনেক মাছ রয়েছে, যা উৎকৃষ্ট শ্রেণীর প্রোটিনে সমৃদ্ধ, কিন্তু কুৎসিত আকারের জন্যে তাদের কোন ক্রেতা নেই এবং তাদের কখনও ধরা হয় না।

আফ্রিকার কয়েকটি হ্রদে রয়েছে বৃহদাকারের হাতীশুঁড়ো মাছ, যা মেয়েদের খেতে দেওয়া হয় না। সংস্কার এই যে, ঐ মাছ খেলে মেয়েরা বন্ধ্যা হয়ে যায়। এর সমর্থনে অবশ্য কোন প্রমাণ নেই। মৎস্য-শিল্পের উন্নতির জন্যে এই কুসংস্কার দূর করতে হবে—সাধারণকে শিক্ষিত করে তুলতে হবে।

ব্যাণ্ডেল তাপ-বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র

কলিকাতার ৪০ মাইল উত্তর-পশ্চিমে ব্যাণ্ডেল সহর থেকে ৭ মাইল দূরে হুগলী নদীর বাঁকে ব্যাণ্ডেল তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি স্থাপিত হয়েছে। ত্রিবেণী রেল ষ্টেশনটি এর খুবই কাছে। চারটি ইউনিটের ২০০ ফুট উঁচু চারটি চিম্‌নি, চারটি বয়লার এবং কর্মচারীদের অসংখ্য বাসভবন সহ কারখানাটি যে ৪০০ একর পরিমিত স্থানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, সেখানে একদা ছিল এক বিরাট জলাভূমি, তাতে ধীবরেরা বাস করতো। পশ্চিমবঙ্গের বিদ্যুৎ পর্ষদ বা ষ্টেট ইলেকট্রিসিটি বোর্ডই এর মালিক ও পরিচালক। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা অনুসারে (এপ্রিল, ১৯৬১-মার্চ, ১৯৬৬) পর্ষদ এর রূপায়ণ প্রকল্প মঞ্জুর করে। পশ্চিমবঙ্গে বিদ্যুৎ-শক্তির উন্নয়নকল্পে প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার শেষ বছরে ১৯৫৫ সালের ১লা মে, এই পর্ষদ গঠিত হয়। ১৯৬২ সালের ২০শে এপ্রিল পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র রায়ের উপস্থিতিতে প্রাক্তন মার্কিন রাষ্ট্রদূত জন কেনেথ গ্যালব্রেথ আনুষ্ঠানিকভাবে এর নির্মাণ কার্যের উদ্বোধন করেন

এই তাপ-বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের যে চারটি ইউনিট আছে, তাদের প্রত্যেকটিরই বিদ্যুৎ-শক্তি উৎপাদন ক্ষমতা ৭৫ মেগাওয়াট। তবে পশ্চিমবঙ্গ বিদ্যুৎ পর্ষদের চীফ ইঞ্জিনীয়ারের মতে, প্রতিটি ইউনিটের ৮২.৫ মেগাওয়াট পর্যন্ত বিদ্যুৎ-শক্তি উৎপাদনের ক্ষমতা রয়েছে বলে এই চারটি ইউনিট থেকে মোট ৩৩০ মেগাওয়াট বা ১০০০ কিলো-ওয়াট বিদ্যুৎ-শক্তি পাওয়া যেতে পারে। এর তিনটি ইউনিটই চালু রয়েছে। প্রথমটি চালু হয়েছিল ১৯৬৫ সালের ১৪ই অগাষ্ট। বিদ্যুৎ-শক্তি চালিত রেলগাড়ীতে এই বিভিন্ন শিল্প কর্পোরেশনের এলাকা বহির্ভূত অঞ্চলে এই কেন্দ্র থেকে বিদ্যুৎ-শক্তি সরবরাহ করা হচ্ছে। কলিকাতা এবং বৃহত্তর কলিকাতা অঞ্চলে বিদ্যুৎ-শক্তির চাহিদা পূরণে এই কেন্দ্রটি বিশেষভাবে সাহায্য করছে।

এই কারখানার বিদ্যুৎ-শক্তি উৎপাদনের ইন্ধন হিসাবে অতি নিম্নমানের কয়লা, কয়লার গুঁড়া ব্যবহৃত হয়ে থাকে। দৈনন্দিন কয়লার চাহিদা তিন হাজার টনের মত। এর ফলে উচ্চমানের কয়লা ইস্পাত তৈরি ও উন্নত ধরণের ধাতুবিদ্যা সংক্রান্ত কাজে ব্যবহারের জন্যে বাঁচানো যাচ্ছে। এই কয়লা জ্বালিয়ে তারই তাপে বয়লারে জলকে বাষ্পে পরিণত করে সেই বাষ্পের সাহায্যে টারবাইন চালিয়ে বিদ্যুৎ-শক্তি উৎপাদন করা হচ্ছে।

এজন্যে এখানে চারটি বয়লার আছে। প্রত্যেকটি বয়লার ১৪০ ফুট উঁচু ও ৯০ ফুট ৬ ইঞ্চি চওড়া। এগুলি ঘণ্টায় ৬৫ হাজার পাউণ্ড অতি উত্তপ্ত বাষ্প উৎপাদন করতে পারে। এই বাষ্প ৮৯ হাজার কিলোওয়াটের যে চারটি টার্বোজেনা-রেটর আছে, তাতে সরবরাহ করা হয়। এই বাষ্পীয় শক্তির সাহায্যে ঐ টার্বোজেনারেটরে বিদ্যুৎ-শক্তি উৎপন্ন হয়। পাঁচতলাবিশিষ্ট উৎপাদন কেন্দ্র ভবনের তেতলায় বিদ্যুৎ-শক্তি উৎপাদন যন্ত্রসমূহকে রাখা হয়েছে। এই সকল যন্ত্রের সবচেয়ে ভারী অংশটির ওজন ১২০ টন।

গুঁড়া কয়লায় বয়লারের আগুন জ্বালিয়ে বাতাসের সাহায্যে সেই আগুন বয়লারের ফার্নেসের মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু ঐ কয়লা কাজে লাগাবার আগে আগুনের শিখাকে জিইয়ে রাখবার উদ্দেশ্যে জ্বালানী হিসাবে তেল ব্যবহার করা হয়। ১০ লক্ষ গ্যালন তেল রাখা যায়, এরকম দুটি বিরাট ট্যাঙ্কে এই তেল সঞ্চয় করে রাখা হয়েছে।

সর্বাধুনিক পদ্ধতিতে নির্মিত এই বিরাট উৎপাদন কেন্দ্রটি পুরাপুরি স্বয়ংক্রিয়। এটি চালাবার জন্যে মাত্র ৪০০ লোকের প্রয়োজন হয়ে থাকে। এতে বাষ্পের তাপ রোধ করবার টার্বো-জেনারেটরগুলিকে আবর্তিত করবার পর সেই বাষ্পকে বয়লারের মধ্যে ফেরৎ নিয়ে এসে বারে বারে কাজে লাগাবার ব্যবস্থা আছে। সমগ্র ভারতে এটিই বৃহত্তম তাপ-বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র।

বিদ্যুৎ-শক্তিই যে কোন দেশের উন্নয়ন পরি-কল্পনার বুনিয়াদ—শিল্প ও বৈষয়িক উন্নতির ভিত্তি। এই শক্তির আধিপত্য আজ সর্বত্র পরিব্যাপ্ত—এই যুগ বিদ্যুৎ-শক্তির যুগ। একথা উপলব্ধি করেই ভারতের উন্নয়ন পরিকল্পনা রচয়িতাগণ দেশের তাপ-বিদ্যুৎ ও জল-বিদ্যুৎ উৎপাদনকে অগ্রা-ধিকার দিয়েছেন। এর ফলও হয়েছে খুবই চমকপ্রদ। ১৯৫১ সালে প্রথম পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনার সুরুতে ভারতের বিদ্যুৎ-শক্তি উৎ-পাদনের পরিমাণ ছিল ২৩ লক্ষ কিলোওয়াট। ১৯৬১ সালে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার শেষাশেষি তা ৫৭ লক্ষ কিলোওয়াটে এসে দাঁড়ায়। ১৯৬৬ সালের ৩১শে মার্চ তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার পূর্তির তারিখ। তৃতীয় পরিকল্পনার লক্ষ্য হলো ১২৭ লক্ষ কিলোওয়াট। প্রথম পরিকল্পনার সুরুতে যে পরিমাণ বিদ্যুৎ-শক্তি উৎপন্ন হতো, তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা রূপায়ণের শেষে তার শতকরা ৪৫০ ভাগ বা ১০৪ লক্ষ কিলোওয়াট বৃদ্ধি পাবার কথা। এর মধ্যে ৫৮ লক্ষ

কিলোওয়াট অর্থাৎ ৫৬ শতাংশ বৃদ্ধি পাবে মার্কিন সাহায্যে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভারতের বিদ্যুৎ-শক্তির উৎপাদন বৃদ্ধির জন্যে সাহায্য করেছেন বিদেশী মুদ্রায় মোট ৫১ কোটি ১ লক্ষ ডলার অর্থাৎ ৩৮২ কোটি ৫৮ লক্ষ টাকা। এছাড়া, এখানে টাকায় ঋণ ও খয়রাতি দানের পরিমাণ ৩৩০ কোটি ৪৯ লক্ষ টাকা। এই সাহায্য পাওয়া যাচ্ছে অংশতঃ অথবা সমপ্রভাবে আর্থিক সাহায্যের আকারে অথবা কারিগরী সাহায্যের মাধ্যমে।

আমেরিকার সাকুল্য সাহায্যের পরিমাণ ৭৩০ কোটি ডলার বা ৫৪৬৫ কোটি টাকা। সারা পৃথিবী থেকে ভারত যে সাহায্য পেয়েছে, এই অর্থ তার প্রায় তিন পঞ্চমাংশ। ভারতের রেলপথের আধুনিকীকরণে, বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধিতে, শিক্ষা ব্যবস্থা জোরদার করতে, ম্যালেরিয়া বিনাশে, খাতব সম্পদের উন্নয়নে এবং ভারতের শিল্পোন্নতিতে উৎসাহ যোগাতে এই অর্থ সহায়ক হয়েছে।

ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের ৫৪তম অধিবেশন

মূল সভাপতি ও শাখা সভাপতিদের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

অধ্যাপক টি. আর. শেষাদ্রি

মূল সভাপতি

অধ্যাপক টি. আর. শেষাদ্রি ১৯২২ সালে মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং অধ্যাপক বি. বি. দে-র সহযোগে কুম্যারিন (Coumarin) সম্পর্কে গবেষণা করে মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দুটি গবেষণা পুরস্কার লাভ করেন। ১৯২৭ সালে তিনি যুক্তরাজ্যে গমন করেন এবং ১৯২৯ সালে ম্যাঞ্চেষ্টার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি-এইচ. ডি. ডিগ্রি লাভ করেন এবং সেখানে তিনি নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত অধ্যাপক স্যার রবার্ট রবিনসনের অধীনে "সার্চ ফর অ্যান্টি-ম্যালেরিয়াল্‌স্‌ এবং 'সিন্থেসিস অব অ্যান্থোসায়ানিন্‌স্‌" সম্পর্কে গবেষণা করেন। তিনি তাঁর সঙ্গে লণ্ডনের ইউনিভার্সিটি কলেজে গবেষণা করতে থাকেন এবং পরবর্তী সময়ে অধ্যাপক জি. বার্জারের সঙ্গে এডিনবরার মেডিক্যাল কেমিষ্ট্রি ইনষ্টিটিউট এবং গ্রাজের (অষ্ট্রিয়া) মেডিক্যাল কেমিষ্ট্রি ইনষ্টিউটে অধ্যাপক এফ. প্রেগল্‌-এর সঙ্গে গবেষণা করেন। ভারতে ফিরে আসবার পর তিনি কোয়েম্বাটুরের কৃষি গবেষণা পরিষদে তিন বছর (১৯৩০-৩৩) গবেষণা করেন। পরে তিনি অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগের রীডার এবং প্রধান হিসাবে নিযুক্ত হন এবং ১৯৩৭ সালে অধ্যাপক হিসাবে নিযুক্ত হন। তিনি পাঁচ বছর কেমিক্যাল টেক্‌নোলজী বিভাগের প্রধান হিসাবে নিযুক্ত ছিলেন এবং এই বিভাগ ও ফার্মেসী বিভাগের উন্নয়নের সহায়তা করেন। ১৯৪৯ সালে তিনি দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগের অধ্যাপক এবং প্রধান হিসাবে যোগদান করেন এবং ১৯৬৫ সালের জুলাই মাস পর্যন্ত ঐ পদে অধিষ্ঠিত থাকেন। তারপর তিনি ঐ বিভাগের এমেরিটাস অধ্যাপক নিযুক্ত হন।

তাঁর পরিচালনায় শতাধিক ছাত্র ডক্টরেট ডিগ্রি অর্জন করেন। অধ্যাপক শেষাদ্রি এবং তাঁর সহযোগিগণ সম্মিলিতভাবে ভারত ও বিদেশী পত্রিকায় ১০০-এরও বেশী মৌলিক গবেষণা-প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। তাঁর একটি পুস্তকের নাম "Chemistry of Vitamins and Hormones"। তাঁর গবেষণা প্রধানতঃ জৈবরসায়ন সম্পর্কিত;

যেমন—প্রাকৃতিক পদার্থ থেকে উৎপন্ন যা ওষুধ, রং, কীটঘ্ন এবং অ্যান্টিঅক্সিড্যান্ট হিসাবে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। কাঠ এবং ফল সম্বন্ধেও তিনি গবেষণা করেছেন। বহু সংখ্যক নতুন যৌগের পৃথকীকরণ, উপাদান নির্ধারণ এবং তাদের সংশ্লেষণও সম্ভব হয়েছে। তিনি এদের শারীরতাত্ত্বিক গুণাবলী, জৈবসংশ্লেষণ এবং ব্যবহার সম্পর্কিত গবেষণায়ও বিশেষ উৎসাহী।

অধ্যাপক টি. আর শেষাদ্রি
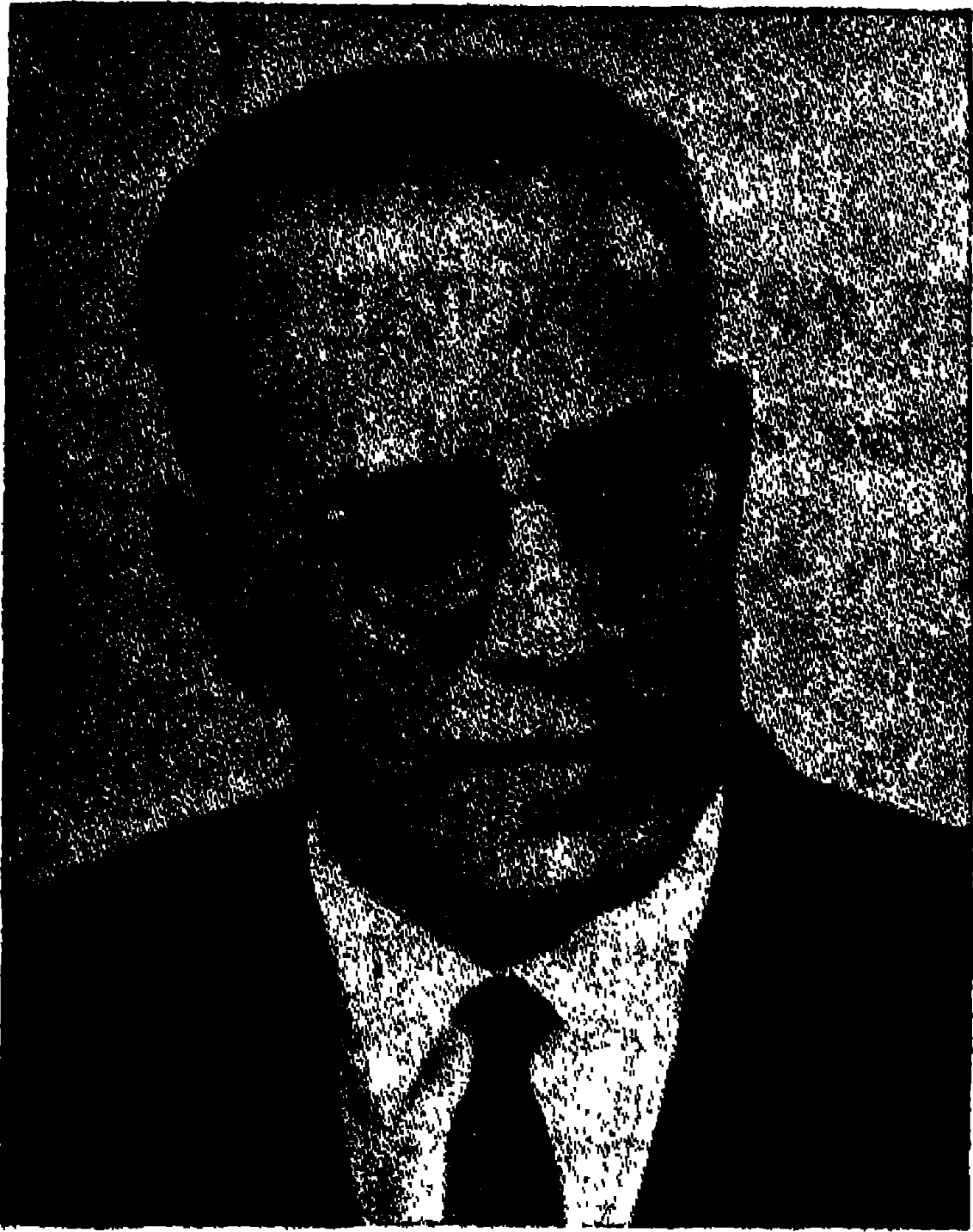
অধ্যাপক শেষাদ্রি লণ্ডনের রয়াল সোসাইটির ফেলো নির্বাচিত হয়েছেন। তিনি German Academie fur Naturforschung, Halle-এর সদস্য, ইণ্ডিয়ান অ্যাকাডেমি অব সায়েন্সেস-এর ফেলো ও কিছুকাল সহঃ সভাপতি, ন্যাশনাল ইনষ্টিটিউট অব সায়েন্সেস-এর ফেলো, সহ-সভাপতি ও এখন সভাপতি। তিনি ইণ্ডিয়ান কেমিক্যাল সোসাইটি এবং ইণ্ডিয়ান ফার্মাসিউটিক্যাল অ্যাসোসিয়েসন এবং কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন। তিনি ইণ্ডিয়ান কেমিক্যাল সোসাইটির আচার্য পি. সি. রায় লেকচারারশিপ, ন্যাশন্যাল ইনষ্টিটিউট অব সায়েন্স অব ইণ্ডিয়ার ভাটনগর পদক পেয়েছিলেন। তিনি অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অনারেরি ডি. এস-সি. ডিগ্রি এবং কেন্দ্রীয় সরকারের পদ্মভূষণ উপাধি লাভ করেন।

অধ্যাপক উদিতনারায়ণ সিং

সভাপতি—গণিত বিভাগ

ডাঃ সিং ১৯২০ সালে জন্মগ্রহণ করেন। মিউনিসিপ্যাল হাই স্কুলের (যা বর্তমানে জে. পি. মেহতা মিউনিসিপ্যাল ইন্টার কলেজ হিসাবে পরিচিত) পড়া শেষ করে বেনারসের কুইন্স কলেজ থেকে ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তিনি এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গণিতে এম. এ. ডিগ্রি লাভ করেন।

অধ্যাপক উদিতনারায়ণ সিং

১৯৪৭ সালে ডাঃ সিং এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে গণিতের লেকচারার নিযুক্ত হন এবং ১৯৪৯ সালে ঐ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি ফিল ডিগ্রি লাভ করেন। পরলোকগত অধ্যাপক বি.এন. প্রসাদের তত্ত্বাবধানে 'থিয়োরী অব ট্রিগোনোমেট্রিক সিরিজ' সম্পর্কিত

গবেষণা ছিল তাঁর ডি. ফিলের কাজ। ১৯৫১ সালে তিনি ফরাসী সরকারের বৃত্তি পেয়ে প্যারিস যান এবং প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতনামা গণিতজ্ঞ অধ্যাপক এস. ম্যাণ্ডেলব্রট-এর (S. Mandelbrojt) সঙ্গে কাজ করেন। ১৯৫৪ সালে প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'Tris honourable'-এর উল্লেখসহ ডি. এস-সি. (ষ্টেট) ডিগ্রি লাভ করেন। Concept of generalized Fourier Transform and its applications—সম্পর্কিত বিষয়ই তাঁর গবেষণার প্রধান ক্ষেত্র। ১৯৫৪ সালে ভারতে ফিরে এসে আলিগড় মুস্লিম বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিত বিভাগে রীডার হিসাবে তিনি নিযুক্ত হন। ১৯৫৮ সালে তিনি বরোদা এম. এস. বিশ্ববিদ্যালয়ে গণিত বিভাগের অধ্যাপক এবং প্রধান হিসাবে যোগদান করেন। ১৯৬৩ সালে ডাঃ সিং ইলিনয়েস (আরবানা) বিশ্ববিদ্যালয়ের ফ্যাকালটিতে ভিজিটিং প্রোফেসর হিসাবে এক বছর কাজ করেন। ইউ. এস. এ. এডুকেশন ফাউণ্ডেশনের আমন্ত্রণে তিনি যুক্তরাষ্ট্র পরিদর্শন করেন।

ডাঃ সিংয়ের অ্যানালিসিসে (আসল এবং জটিল উভয় ক্ষেত্রেই) গুরুত্বপূর্ণ কাজ আছে। বরোদার এম. এ. বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি একটি গণিতের গবেষণা কেন্দ্র গড়ে তুলেছেন।

অধ্যাপক ভি. এস. হুজুরবজার

সভাপতি—পরিসংখ্যান বিভাগ

ডাঃ ভি. এস. হুজুরবজার মহারাষ্ট্রের কোলহাপুর সহরে ১৯১৯ সালের ১৫ই সেপ্টেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। বোম্বাই, বেনারস ও কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর শিক্ষাজীবন কৃতিত্বপূর্ণ ছিল। ১৯৪৯ সালে তিনি কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি-এইচ. ডি. ডিগ্রি লাভ করেন। তিনি সম্ভাবনাবাদ এবং গাণিতিক পরিসংখ্যান সম্পর্কে নতুন গবেষণা ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছেন—এই বিষয় সম্পর্কিত পুস্তকাদিতে তাঁর কাজের উল্লেখ আছে।

কিছুকাল ডাঃ হুজুরবজার গৌহাটি ও লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিত ও পরিসংখ্যান বিভাগের রীডার ছিলেন। ১৯৫৩ সাল থেকে তিনি পুণা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিত ও পরিসংখ্যান বিভাগের অধ্যাপক এবং প্রধান হিসাবে যোগদান করেন। সম্ভাবনাবাদ সম্পর্কিত গবেষণার জন্যে ১৯৬১ সালের জুলাই মাসে তিনি কেম্ব্রিজ

অধ্যাপক ভি. এস. হুজুরবজার

বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অ্যাডামস্ পুরস্কার লাভ করেন। ন্যাচারাল ফিলোজফি, বিশুদ্ধ গণিত, জ্যোতির্বিদ্যা সম্পর্কিত মূল্যবান গবেষণার জন্যে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় এই পুরস্কার দিয়ে থাকে। ডাঃ হুজুরবজারের পূর্বে দু-জন ভারতীয় এই পুরস্কার লাভ করেন। তাঁরা হলেন ডাঃ এইচ. জে. ভাবা এবং ডাঃ এস. চন্দ্রশেখর।

১৯৬২ সালের সেপ্টেম্বর থেকে ১৯৬৩ সালের মে পর্যন্ত তিনি যুক্তরাষ্ট্রের আইওয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের (অ্যামেস) ফুলব্রাইট ভিজিটিং প্রোফেসর ছিলেন। এই সময়ে তাঁর Sufficient statistics-এর ধর্মসমূহ সম্পর্কিত গবেষণা যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশান্যাল সায়েন্স

ফাউণ্ডেশনের স্বীকৃতি লাভ করে এবং তাঁর গবেষণার জন্যে অর্থ মঞ্জুর করা হয়। ডাঃ হুজুরবজার প্রিন্সটন, হার্ভার্ড, মিনেসোটা বিশ্ববিদ্যালয়ে আমন্ত্রিত হয়ে বক্তৃতা করেন এবং ১৯৬৩ সালের অগাষ্ট মাসে ক্যানাডার মন্ট্রিলে অনুষ্ঠিত Discrete Distribution সম্পর্কে ইন্টারন্যাশান্যাল সিম্পোসিয়ামে বক্তৃতা দেন।

ডাঃ হুজুরবজার ভারত সরকার কর্তৃক গঠিত ইণ্ডিয়ান ন্যাশন্যাল কমিটির সদস্য। ডাঃ হুজুরবাজার ন্যাশান্যাল ইনষ্টিটিউট অব সায়েন্সেস অব ইণ্ডিয়া, ইণ্ডিয়ান অ্যাকাডেমি অব সায়েন্সেস, কেম্ব্রিজ ফিলজফিক্যাল সোসাইটি এবং লণ্ডনের রয়াল ষ্ট্যাটিষ্টিক্যাল সোসাইটির ফেলো।

অধ্যাপক এফ. সি. আউলাক

সভাপতি—পদার্থবিদ্যা বিভাগ

ডাঃ ফকিরচাঁদ আউলাক পাঞ্জাবের জলন্ধরে ১৯১২ সালে জন্মগ্রহণ করেন। স্থানীয় এস. ডি. এ. এস. স্কুলে তাঁর শৈশব শিক্ষার সূত্রপাত হয়। ১৯৩২ সালে জলন্ধরের ডি. এ. ভি. কলেজ থেকে গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি লাভ করে তিনি লাহোরে গভর্নমেন্ট কলেজে যোগদান করেন। ১৯৩৪ সালে গণিতে উল্লেখযোগ্য নম্বর পেয়ে এম. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। স্কুল ও কলেজের ছাত্রজীবনে তিনি অনেক পুরস্কার লাভ করেন এবং ১৯২৮ সাল থেকে ১৯৩৪ পর্যন্ত তিনি বৃত্তিও পান। পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৪২ সালে 'ডক্টর অব ফিলজফি' ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯৪৬ সালে "প্রব্লেম্‌স্ ইন ষ্ট্যাটিস্টিক্যাল থার্মোডাইনামিক্স" সম্পর্কে থিসিসের জন্যে তিনি পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টর অব সায়েন্স ডিগ্রি লাভ করেন। তাঁর থিসিসের পরীক্ষকদের মধ্যে ই. এ. মিল্নেও ছিলেন।

১৯৩৬ থেকে ১৯৩৮ সাল পর্যন্ত তিনি পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যা বিভাগের লেকচারার এবং ১৯৩৮ থেকে ১৯৪২ সাল পর্যন্ত লাহোরের দয়াল সিং কলেজের লেকচারার ছিলেন। ১৯৪২ সালে দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যা বিভাগের লেকচারার হিসাবে যোগদান করেন—তদবধি সেখানেই নিযুক্ত আছেন। ১৯৫৫ সালে তিনি পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক নিযুক্ত হন।

অধ্যাপক এফ. সি. আউলাক

১৯৫০-'৫১ সালে তিনি কেম্ব্রিজের ক্যাভেণ্ডিস লেবরেটরিতে ছিলেন। ১৯৫৮ সালে যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা-পদ্ধতি পরিদর্শনের জন্যে যে ভারতীয় প্রতিনিধি দল গিয়েছিলেন, অধ্যাপক আউলাক তার সদস্য ছিলেন। সাংস্কৃতিক বিনিময় কর্মসূচীর পরিকল্পনা অনুযায়ী তিনি ইউ. এস. এস. আর. পরিদর্শনেও আমন্ত্রিত হন।

অধ্যাপক আউলাকের ৭৫টিরও বেশী গবেষণা-পত্র প্রকাশিত হয়েছে। অধ্যাপক আউলাকের গবেষণার প্রধান বিষয়বস্তু হচ্ছে—'Partition theory of numbers and its applications to Statistical mechanics, Astro-physics, Magnetohydrodynamics, Superfluidity and Superconductivity'। তাঁর গবেষণার উল্লেখ অনেক ক্ষেত্রেই করা হয় এবং কোন কোন পাঠ্যপুস্তকে তাঁর গবেষণার ফল সংযোজিত

হয়েছে। তাঁর তত্ত্বাবধানে গবেষণা করে বাইশ জন ছাত্র পি-এইচ. ডি. ডিগ্রী লাভ করেছেন।

অধ্যাপক এস. চৌলার সহযোগিতায় সংখ্যার বিভাজন তত্ত্বের (Partition Theory of numbers) সম্পর্কে গবেষণা সুরু হয়। অধ্যাপক ডি. এস. কোঠারীর সহযোগিতায় তাঁর তত্ত্ব এবং ষ্ট্যাটিস্টিক্যাল মিকানিক্স-এর মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক—ষ্ট্যাটিস্টিক্যাল মিকানিক্স এবং পার্টিশন থিয়োরী অব নাম্বার-এর সমস্তাগুলি বোঝবার পক্ষে যথেষ্ট সহায়ক। The problem of the maximum value of the numbers of partitions of n into k parts সম্বন্ধে তাঁর গবেষণা যথেষ্ট স্বীকৃতি লাভ করেছে এবং এই গবেষণার ফল উচ্চশক্তিতে নিউক্লিয়ন-নিউক্লিয়ন সংঘর্ষজাত বস্তু, যেমন—pion প্রভৃতি উৎপাদনের ব্যাখ্যায় ব্যবহৃত হয়।

গ্রহ এবং শ্বেত বামন তারকার Mass radius relationship ব্যাখ্যা করবার জন্মে অধ্যাপক কোঠারী যে চাপ আয়নন তত্ত্বের অবতারণা করেন তাকে ইলেক্ট্রোষ্ট্যাটিক ফিল্ডের ফলাফল ব্যাখ্যায়ও অন্তর্ভুক্ত করেন অধ্যাপক আউলাক। তিনি Bounded Harmonic Oscillator তত্ত্বের উন্নতি সাধন করেন এবং অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে এটি শ্বেত বামন তারকার অনুশীলনে প্রয়োগ করা হয়। তাঁর আবিষ্কৃত তত্ত্ব পাঠ্যপুস্তকের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। Random fragmentation সম্পর্কে তাঁর গবেষণা সুবিদিত। এক বা দ্বিমাত্রিক বস্তুসমূহের খণ্ডিতকরণ-এর প্রারম্ভিক তত্ত্বসমূহকে তিনি ত্রিমাত্রিক বস্তুর ক্ষেত্রেও প্রসারিত করেন এবং উল্লেখযোগ্য কৃতিত্বের সঙ্গে নক্ষত্রপুঞ্জের ব্যাপক বিস্তৃতির ব্যাখ্যায়ও প্রয়োগ করেন। তাঁর এই গবেষণার ফল আরও অনেক ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়। এসব গবেষণা ছাড়াও তিনি অন্যান্য বিষয়ের গবেষণায় উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব দেখিয়েছেন।

১৯৫৭ সালে তিনি Bunching of photons in a beam সম্পর্কে একটি গবেষণা-পত্র প্রকাশ করেন। তাঁর এই গবেষণালব্ধ তথ্যের যাথার্থ্য হ্যানবারি, ব্রাউন এবং টুইস এবং অন্যান্সের পরীক্ষায় প্রমাণিত হয়েছে। তিনি আরও দেখিয়েছে যে, তীব্র বিকিরণ ক্ষেত্রের উপস্থিতিতে ল্যাম্ব শিফ্টকে (Lamb shift) পরিবর্তিত করা যায়—এই গবেষণালব্ধ ফলের জ্যোতিঃপদার্থবিদ্যা বিষয়ক তাৎপর্য আছে। অতিপরিবাহিতা গুণসম্পন্ন নাক্ষত্রিক পদার্থের সম্ভাবনা সম্পর্কেও অনুসন্ধান করা হয়েছে। তাঁর Stability problems in magnetohydrodynamics সম্পর্কিত গবেষণাও সুবিদিত।

অধ্যাপক আউলাক তাঁর ছাত্রদের গবেষণায় যথেষ্ট উৎসাহ এবং প্রেরণা দেন। ফলে তাঁর একদল উৎসাহী ছাত্র-গবেষকমণ্ডলী তৈরি হয়েছে। ১৯৬০ সালে অধ্যাপক আউলাক ন্যাশন্যাল ইনষ্টিটিউট অব সায়েন্সেস অব ইণ্ডিয়ার ফেলো নির্বাচিত হন। তিনি বর্তমানে এই প্রতিষ্ঠানের সম্পাদক।

অধ্যাপক আর. সি. মেহরোত্রা

সভাপতি—রসায়ন শাখা

অধ্যাপক আর. সি. মেহরোত্রা ১৯২২ সালের ১৬ই ফেব্রুয়ারী কানপুরে জন্মগ্রহণ করেন। গত ২৩ বছর তিনি এলাহাবাদ, লণ্ডন, লক্ষ্ণৌ, গোরক্ষপুর এবং রাজস্থান বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের কেমিষ্ট্রি রিভিউ কমিটির তিনি একজন সক্রিয় সদস্য ছিলেন। অধ্যাপক মেহরোত্রা প্রায় ৩০০ গবেষণা-পত্র প্রকাশ করেছেন। তাঁর ৩৬ জন গবেষক ছাত্রের মধ্যে ২৪ জন পি-এইচ. ডি. ডিগ্রি পেয়েছেন। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা ও পুস্তকে রেফারেন্স হিসাবে তাঁর গবেষণার উল্লেখ করা হয়।

তাঁর গবেষণার ক্ষেত্র ব্যাপক হলেও নিম্নোক্ত চারটি ক্ষেত্রেই তাঁর গবেষণা উল্লেখযোগ্য।

১। Absorption Indicators; ২। Redox Titrations, ৩। Complex Metaphosphates, ৪। Organic Derivatives of Elements।

লুব্রিক্যান্ট সম্বন্ধে জেনাতে অনুষ্ঠিত ষষ্ঠ আন্তর্জাতিক সম্মেলনে ১৯৬৪ সালে অধ্যাপক মেহরোত্রা Heavy Metal Soap সম্বন্ধে অন্যতম প্রধান
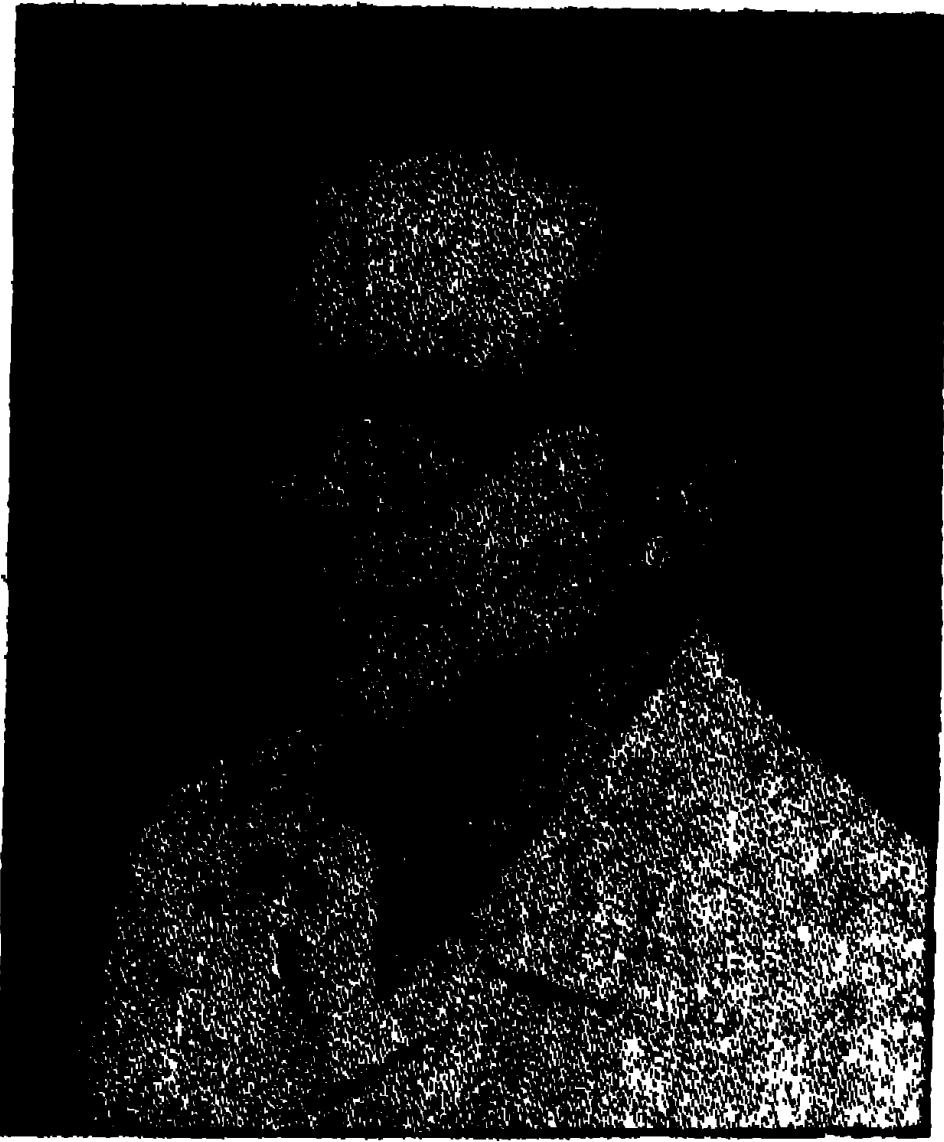
অধ্যাপক আর. সি. মেহরোত্রা

বক্তৃতা প্রদান করেন। ১৯৬৫ সালে প্রাগে অনুষ্ঠিত ইন্টারন্যাশন্যাল অরগ্যানো-সিলিকন কনফারেন্সে তিনি প্রধান বক্তৃতা প্রদান করেন।

অধ্যাপক মেহরোত্রা বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণে বিশেষ উৎসাহী। বিজ্ঞান-এর সম্পাদক (১৯৪৭-'৫০) এবং সি. এস. আই. আর-এর ভারতীয় ভাষাসমূহের ইউনিট-এর চেয়ারম্যান হিসাবে এই ব্যাপারে তাঁর দান অনস্বীকার্য। ইণ্ডিয়ান জার্নাল অব কেমিষ্ট্রি এবং জার্নাল অব দি ইণ্ডিয়ান কেমিক্যাল সোসাইটির সম্পাদকমণ্ডলীর তিনি একজন সদস্য। তিনি বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং সি. এস. আই. আর ও এ. ই. ই-এর বিভিন্ন সংস্থার সদস্য। তিনি বোর্ড অব সায়েন্টিফিক অ্যাণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল রিসার্চ-এরও সদস্য।

অধ্যাপক রামলোচন সিং

সভাপতি—ভূতত্ত্ব ও ভূগোল শাখা

অধ্যাপক সিং উত্তর প্রদেশের জৌনপুর জেলার এক কৃষক পরিবারে ১৯১১ সালের ২০শে মার্চ জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৩৮ সালে তিনি স্কুলের শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং ১৯৪০ সালে বারানসীর উদয় প্রতাপ কলেজ থেকে ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৯৪২ সালে আগ্রার সেণ্ট জন্স কলেজ থেকে গ্রাজুয়েট ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯৪২ সালের আন্দোলনে জড়িত থাকায় এক বছর পরে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পোষ্ট-গ্রাজুয়েট স্কুল অব জিওগ্রাফিতে যোগদান করেন এবং ১৯৪৫ সালে ভূগোলে মাষ্টার্স ডিগ্রি লাভ করেন।

১৯৪৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে অধ্যাপক সিং বারানসীর ইউ. পি. কলেজে ভূগোলের লেক্চারার নিযুক্ত হন এবং পরবর্তী ফেব্রুয়ারী মাসে বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করেন। লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে দু' বছর (১৯৫১-৫৩) তিনি অধ্যাপক ডাডলি ষ্ট্যাম্প-এর সঙ্গে গবেষণা করেন এবং "Banaras and its Umland: A Study in Settlement Geography" সম্পর্কিত গবেষণার জন্যে পি-এইচ. ডি. ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯৫৫ সালে তিনি বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূগোল বিভাগের অধ্যাপক এবং প্রধান হিসাবে নিযুক্ত হন এবং সেই পদে এখনও অধিষ্ঠিত আছেন।

ভূগোলের গবেষণায় অধ্যাপক সিং আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন করেছেন। ১৯৫৬ সালে ব্রেজিলের রিও ডি জেনেরিয়োতে অনুষ্ঠিত ১৮শ আন্তর্জাতিক ভূগোল কংগ্রেসের একটি শাখার

সভাপতিত্ব করেন। তিনি বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ও জাতীয় কংগ্রেস এবং সেমিনারে অংশ গ্রহণ করেছেন। সরকার, পরিকল্পনা কমিশন ও বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক কমিটির তিনি সদস্য। তিনি ন্যাশন্যাল কমিটি ফর জিওগ্রাফির সদস্য এবং ১৯৪৮ সাল থেকে ন্যাশন্যাল জিওগ্রাফিক্যাল সোসাইটির অনারেরি সেক্রেটারী। ভারতবর্ষে তিনি ব্যবস্থাপনার ভূগোল (Geography of settlement) সংক্রান্ত গবেষণার একজন পুরোধা। তিনি বেনারস হিন্দু

অধ্যাপক রামলোচন সিং

বিশ্ববিদ্যালয়ে Settlement Geography সম্পর্কে একটি শাখা স্থাপনে সক্ষম হয়েছেন। নিজে তিনি গবেষণায় পুরাপুরি লিপ্ত থাকা সত্ত্বেও একদল গবেষককে এই বিষয়ে উৎসাহিত করে তুলেছেন এবং দশ বছরেরও কম সময়ের মধ্যে ২৪ জনেরও বেশী গবেষক এই শাখা থেকে তাঁদের পি-এইচ. ডি. থিসিসের জন্যে করণীয় কাজ কৃতিত্বের সঙ্গে সমাপ্ত করেছেন।

বেনারসের পৌর ভূগোল (Urban Geography) সম্পর্কিত তাঁর গবেষণা (১৯৫৫) ভারতবর্ষে পৌর-ভূগোলের গবেষণার ক্ষেত্রে অনেক গবেষককে আকৃষ্ট করেছে। তাঁর রিসার্চ মনোগ্রাম—'Bangalore : An Urban Survey (1964)' প্রকাশিত হয়েছে এবং 'Umland of Varanasi : A Study in Settlement Geography' যন্ত্রস্থ। বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক পত্রিকায় তিনি ২৫টিরও বেশী গবেষণা-পত্র প্রকাশ করেছেন।

অধ্যাপক আর. এন. ট্যাণ্ডন
সভাপতি—উদ্ভিদবিদ্যা শাখা

মৈনপুর জেলার শিকোহাবাদে এক জমিদার পরিবারে ১৯০৩ সালের ২১শে নভেম্বর ডাঃ আর. এন. ট্যাণ্ডন জন্মগ্রহণ করেন। এলাহাবাদে গভর্ণমেন্ট হাই স্কুলে তাঁর স্কুলের শিক্ষালাভ শেষ হবার পর এলাহাবাদের ইউয়িং ক্রিশ্চিয়ান কলেজে ভর্তি হন। প্রথম দিকে তিনি ডাঃ ডব্লিউ. ডাডজনের কাছে উদ্ভিদবিদ্যায় শিক্ষালাভ করেন। ১৯২৫ সালে এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গ্রাজুয়েট ডিগ্রি লাভ করেন। দুই বছর বাদে ঐ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করে মাষ্টার্স ডিগ্রি লাভ করেন। মাষ্টার্স ডিগ্রি লাভের পর তিনি ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করেন এবং উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগের অধ্যাপক এবং প্রধান হিসাবে ১৯৬৫ সালের নভেম্বর মাসে অবসর গ্রহণ করেন। অধ্যাপক জুলিয়ান এইচ. মিটারের অধীনে তিনি মাইকোলজি এবং প্ল্যান্ট প্যাথোলজি সম্পর্কে গবেষণা সুরু করেন। তিনি পরবর্তী কালে ইম্পিরিয়াল কলেজে (লণ্ডন) যান এবং অধ্যাপক ডাব্লিউ. ব্রাউন, এফ-আর-এস-এর অধীনে গবেষণা করেন। তিনি ছত্রাকের পুষ্টি সম্পর্কে অনুশীলন করে বিশেষ জ্ঞান অর্জন করেন। তিনি ভারতবর্ষের অনেক নতুন ছত্রাক সম্পর্কে তথ্য এবং অনেক ছত্রাকও সংগ্রহ করেছেন। দেশীয় এবং বিদেশীয় সুপরিচিত পত্রিকায় তিনি ১২৫টিরও বেশী গবেষণা-

পত্র প্রকাশ করেছেন। তিনি ইণ্ডিয়ান ফাইটোপ্যাথোলজিক্যাল সোসাইটি, ইণ্ডিয়ান অ্যাকাডেমি অব সায়েন্সেস (ব্যাঙ্গালোর), ন্যাশন্যাল ইনষ্টিটিউট অব সায়েন্সেস অব ইণ্ডিয়ার ফেলো। ইণ্ডিয়ান ফাইটোপ্যাথোলজিক্যাল সোসাইটি, ইন্টারন্যাশন্যাল সোসাইটি অব প্ল্যাণ্ট মরফোলজিষ্টস এবং ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অব প্ল্যাণ্ট

অধ্যাপক আর. এন. ট্যাণ্ডন

ফিজিওলজির তিনি প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। তিনি ন্যাশন্যাল ইনষ্টিটিউট অব সায়েন্সেস-এর কাউন্সিলের সদস্য এবং ন্যাশন্যাল অ্যাকাডেমি অব সায়েন্সেস-এর সহ-সভাপতি। ১৯৬৫ সালে ন্যাশন্যাল অ্যাকাডেমি অব সায়েন্সেস (ইণ্ডিয়ার) জীববিজ্ঞান শাখায় তিনি সভাপতিত্ব করেন। ১৯৬৬ সালের জন্যে তিনি ইণ্ডিয়ান ফাইটো-প্যাথোলজিক্যাল সোসাইটির সভাপতি হন। উদ্ভিদবিদ্যা ছাড়াও তিনি সঙ্গীত ও খেলাধুলা প্রভৃতি বিষয়ে বিশেষ উৎসাহী। এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রীড়া সংস্থায় তিনি বিভিন্ন পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন এবং অবসর গ্রহণের সময় উক্ত সংস্থার সভাপতি ছিলেন।

অধ্যাপক শিবতোষ মুখোপাধ্যায়

সভাপতি—প্রাণী ও কীট-পতঙ্গ বিজ্ঞান শাখা

অতি তরুণ বয়সে যাঁরা এযাবৎ বিজ্ঞান কংগ্রেসের শাখা-সভাপতির পদে নির্বাচিত হয়েছেন, তাঁদের মধ্যে ডাঃ মুখোপাধ্যায়ের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ভারত-বর্ষে আধুনিক জীববিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যাঁরা অগ্রগণ্য, ডাঃ মুখোপাধ্যায় তাঁদের অন্যতম। তিনি তাঁর নিজস্ব গবেষণার ক্ষেত্রে (Developmental biology) বিরাট কৃতিত্বের অধিকারী। এছাড়া ভারতবর্ষের জীববিজ্ঞানকে বর্ণনাত্মক থেকে পরীক্ষাত্মক দিকে পরিবর্তনে তিনি এবং তাঁর কয়েকজন সহযোগীই প্রাথমিক উদ্যোক্তা। ডাঃ মুখোপাধ্যায় এবং তাঁর কয়েকজন ছাত্র অ্যামিবা, হাইড্রা, স্পঞ্জ-এর সেল মরফোজেনেসিস বিশ্লেষণের অনেক কার্যকরী এবং নিপুণ কৌশল প্রবর্তন করেছেন। প্রেসিডেন্সি কলেজে তাঁর ছাত্রজীবন বিশেষ কৃতিত্বপূর্ণ। এখন তিনি ঐ কলেজেরই প্রাণিবিদ্যার অধ্যাপক এবং একদল গবেষক ছাত্রকেও পরিচালিত করেন। আন্তর্জাতিক মহলে ডাঃ মুখোপাধ্যায় ধীশক্তিসম্পন্ন, সম্ভাবনাপূর্ণ তরুণ বৈজ্ঞানিকরূপে সুপরিচিত। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি. এস-সি (অনার্স) এবং এম. এস-সি. (প্রাণিবিদ্যায়) পরীক্ষায় তিনি প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করেন। এরপর তিনি যুক্তরাজ্যে গিয়ে অধ্যাপক সি. এইচ. ওয়াডিংটন এফ-আর-এস-এর অধীনে ডক্টরেট ডিগ্রির জন্যে গবেষণা সুরু করেন। প্রায় ২৫ বছর বয়সে তিনি পি-এইচ. ডি. ডিগ্রী লাভ করেন। ইনষ্টিটিউট অব অ্যানিমল জেনেটিক্স, এডিনবরা ত্যাগ করবার পর তিনি ব্রুসেলসের Laboratorie de Morphologie-তে Prof Jean Brachet-এর কাজের সঙ্গী হন। দেশে ফেরবার পরেই তিনি নবনির্মিত চিত্তরঞ্জন ক্যান্সার সেণ্টার-এ টিস্যু কালচার লেবরেটরি গঠনের জন্যে আহূত হন।

পরে ডাঃ মুখোপাধ্যায় প্রেসিডেন্সি কলেজের নবসৃষ্ট প্রাণিবিদ্যা বিভাগের অধ্যাপক এবং প্রধান হিসাবে নিযুক্ত হন। এই সময় তাঁর বয়স ছিল ২৭। শীঘ্রই তিনি কলেজে Developmental biology সম্পর্কিত একটি প্রথম শ্রেণীর গবেষণাগার স্থাপন করেন। সারা ভারতবর্ষ থেকে আগ্রহী ছাত্রেরা এখানে গবেষণার জন্যে আগ্রহান্বিত হন। এখানকার গবেষণার ফল আন্তর্জাতিক নানা পত্রিকায় প্রকাশিত হবার ফলে এই পরীক্ষাগার ভারতবর্ষে Developmental biology সম্পর্কিত

অধ্যাপক শিবতোষ মুখোপাধ্যায়

একটি সর্বপ্রধান গবেষণা কেন্দ্র হিসাবে পরিগণিত হয়। তিনি একটি গবেষকমণ্ডলী গঠন করেছেন। সাম্প্রতিক পাঠ্য পুস্তকে তাঁর মৌলিক গবেষণার কিছু অংশ সন্নিবেশিত হয়েছে। গত কয়েক বছর যাবৎ ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের আলোচনা-চক্রে তিনি উল্লেখযোগ্য অংশ গ্রহণ এবং বহু আলোচনার সূত্রপাত করেছেন। বর্তমানে ডাঃ মুখোপাধ্যায় এবং তাঁর সম্প্রদায় কোষের রূপান্তরণ, অঙ্গপ্রত্যঙ্গের পার্থক্য উৎপাদনের ভিত্তি এবং বহুবিধ কোষের উৎপত্তি সম্পর্কে গবেষণায় ব্যাপৃত আছেন। তিনি C.S.I.R., U.G.C., I.C.M.R ও কেন্দ্রীয় সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে অর্থ সাহায্য পেয়ে থাকেন। তাঁর তত্ত্বাবধানে গবেষণা করে বহু ছাত্র ডক্টরেট ডিগ্রি লাভ করেছেন। Cell differentiation সম্পর্কিত গবেষণার জন্যে ডাঃ মুখোপাধ্যায় ইন্টারন্যাশন্যাল ইনষ্টিটিউট অব এম্ব্রাওলজির সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন। ভারতবর্ষে Experimental embryology সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ গবেষণার জন্যে ১৯৬২ সালে ডাঃ মুখোপাধ্যায় সার ডোরাব টাটা স্বর্ণ পদক পুরস্কার লাভ করেন। এশিয়ায় প্রাণিবিদ্যায় গুরুত্বপূর্ণ গবেষণার জন্যে গত বছর এশিয়াটিক সোসাইটি তাঁকে জয়গোবিন্দ লাহা স্মৃতি স্বর্ণপদক পুরস্কার দানে সম্মানিত করেন। তিনি রকফেলার ইনষ্টিটিউট, নিউইয়র্ক-এর রকফেলার ফেলো, ওয়াশিংটন-এর ন্যাশন্যাল অ্যাকাডেমির ভিজিটিং সায়েন্টিষ্ট ছিলেন। তিনি নিউইয়র্কের Prof. Paul Weiss এবং বার্কলের (ক্যালিফোর্নিয়া) Prof Danial Mazia-এর সঙ্গে সহযোগিতা করেন। তাঁর কোন কোন সহযোগী বিশ্বের কয়েকজন বিশিষ্ট জীববিজ্ঞানীর (Developmental biology সম্পর্কিত গবেষণায় যাঁরা খ্যাতি অর্জন করেছেন) কাজের অংশগ্রহণ করেছেন।

ডাঃ মুখোপাধ্যায় বহু দেশ ভ্রমণ করেছেন। Developmenal biology সম্পর্কিত প্রধান গবেষণা কেন্দ্রের অধিকাংশই তিনি পরিদর্শন করেছেন। তিনি কাউন্সিল অব সায়েন্টিফিক ও ইণ্ডাস্ট্রিয়াল রিসার্চ-এর অনেকগুলি নীতি-প্রস্তুতকারক সংস্থায় কাজ করেছেন এবং এই দেশে জীববিদ্যার প্রসারের জন্যে নতুন প্রেরণা সঞ্চারের কাজে অন্যান্য প্রধান বিজ্ঞানীদের সহযোগিতায় তিনি সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন। তিনি C. S. I. R.-এর বায়োলজিক্যাল রিসার্চ কমিটিতে আছেন। সায়েন্স অ্যাণ্ড কালচার এবং ইণ্ডিয়ান জার্নাল অব এক্সপেরিমেন্টাল বায়োলজির সম্পাদক মণ্ডলীর

তিনি সদস্য। তিনি কলিকাতায় বোস ইনষ্টিটিউটের কাউন্সিলের সদস্য। ডাঃ মুখোপাধ্যায় একজন সুলেখক এবং সুবক্তা। তিনি অনেক জনপ্রিয় বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধের রচয়িতা। বাংলা ভাষায় তিনি ভ্রমণ কাহিনী, বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ এবং অন্যান্য বিষয়ে লিখেছেন। ডাঃ মুখোপাধ্যায় স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের পৌত্র। তাঁর স্ত্রীও একজন জৈব পদার্থবিদ (Biophysicist) এবং স্বামীর সঙ্গে তিনি একই গবেষণাগারে গবেষণা করছেন।

অধ্যাপক এ. কে. মিত্র
সভাপতি—নৃতত্ত্ব ও পুরাতত্ত্ব শাখা

ডাঃ এ. কে. মিত্র ১৯০৩ সালের ৩১শে মার্চ জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৯২০ সালে খিদিরপুর অ্যাকাডেমি থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তিনি গৌড়ীয় সর্ববিদ্যায়তনে (বাংলার জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়) যোগ দেন এবং ১৯২৪ সালে সেখান থেকে স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন। ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব তাঁর বিশেষ বিষয় ছিল। যাদবপুরের জাতীয় শিক্ষা পরিষদের বৃত্তি পেয়ে বিখ্যাত পুরাতত্ত্ববিদ রমাপ্রসাদ চন্দের তত্ত্বাবধানে কলিকাতার ভারতীয় যাদুঘরে গবেষণা সুরু করেন। ডাঃ মিত্র সারনাথে খননকার্যে শিক্ষালাভ করেন এবং ময়ুরভঞ্জ রাজ্যে পুরাতত্ত্ব বিষয়ক গবেষণাকার্যে নিযুক্ত হন। পরবর্তী কালে ময়ুরভঞ্জের রাষ্ট্রীয় যাদুঘরের কিউরেটর হিসাবে খিচিং-এর যাদুঘর বিন্যস্ত করেন। এরপর তাঁর কাজ হয় বহুমুখী। তিনি হরিপুরের খননকার্য পরিচালনা করেন। ডাঃ বি. এস. গুহের তত্ত্বাবধানে ভারতের প্রাণিতাত্ত্বিক সমীক্ষায় Physical Anthropology-তে শিক্ষার্থী হিসাবে ডেপুটেড হন। পরে অস্থি-সংস্থান বিদ্যায় বিশেষ শিক্ষালাভের জন্যে আর. জি. কর মেডিক্যাল কলেজে যোগ দেন। ১৯৩৭ সালে তিনি মিউনিক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টরেট ডিগ্রি-লাভ করেন। তাঁর থিসিসের বিষয়বস্তু ছিল "বাংলার লোকদের জাতিগত উপাদান।"

ভারতে ফিরে এসে ডাঃ মিত্র ভারতীয় প্রাণিতত্ত্ব সমীক্ষায় সহকারী নৃতাত্ত্বিক হিসাবে পুনরায় নিযুক্ত হন। কিছুদিন তিনি সিন্ধু উপত্যকার

অধ্যাপক এ. কে. মিত্র

নরকঙ্কাল সম্বন্ধে কাজ করেন। পরবর্তী কালে তিনি ভারতীয় নৃতাত্ত্বিক সমীক্ষায় নৃতত্ত্ববিদ্ হিসাবে নিযুক্ত হন এবং ১৯৫৯ সালে ডেপুটি ডিরেক্টর হিসাবে কাজ থেকে অবসর গ্রহণ করেন।

এই সময়ের মধ্যে তিনি নালন্দায় বৌদ্ধ সমাধিক্ষেত্রে খনন করেন এবং সমাধির ভঙ্গীতে নবম শতাব্দীর একটি সম্পূর্ণ কঙ্কাল উদ্ধার করেন। সেই বছরেই তিনি দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করেন। তিনি মানব প্রজনন-তত্ত্ব, জাতিসম্পর্কিত ইতিহাস এবং ডারম্যাটো-গ্লিফিক্স (Dermatoglyphics) সম্বন্ধে গবেষণা চালাচ্ছেন। ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ববিদ্যা এবং Physical Anthropology-এর বিভিন্ন শাখা সম্পর্কে তিনি কয়েকটি গবেষণা-পত্র প্রকাশ করেছেন।

অধ্যাপক অমিয় বি. চৌধুরী

সভাপতি—চিকিৎসা ও পশু-চিকিৎসা শাখা

অধ্যাপক চৌধুরী ক্রিমিতত্ত্বের (Helminthology) অধ্যাপক, পরজীবিতত্ত্ব বিভাগের চেয়ারম্যান ও কলিকাতার স্কুল অব ট্রপিক্যাল মেডিসিনের ফিল্ড এপিডেমিওলজি ইউনিটের প্রধান (Chief)। এছাড়াও তিনি কলিকাতার কারমাইকেল হাসপাতালের গ্রীষ্মমণ্ডলীয় রোগের প্রবীণ ভিজিটিং চিকিৎসক।

অধুনা পূর্ব-পাকিস্থানের অন্তর্ভুক্ত চট্টগ্রামে অধ্যাপক চৌধুরী জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ থেকে তাঁর M. B. B. S. ডিগ্রি লাভ করেন। পরবর্তী সময়ে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি. ফিল. ডিগ্রি

অধ্যাপক অমিয় বি. চৌধুরী

লাভ করেন। ১৯৫০ সালের প্রারম্ভে তিনি কলিকাতার স্কুল অব ট্রপিক্যাল মেডিসিন-এ যোগদান করেন। ১৯৫৯ সালে তিনি অধ্যাপক এবং বিভাগীয় প্রধান হিসাবে নিযুক্ত হন।

পরজীবিতত্ত্বের গবেষক হিসাবে তাঁর খ্যাতি সুবিদিত। তাঁর গবেষণার ক্ষেত্র বেড-সাইড ক্লিনিক্যাল রিসার্চ এবং ফিল্ড ষ্টাডিজ থেকে ইলেকট্রন মাইক্রস্কোপের ব্যবহার, রেডিও-আইসোটোপ, ইমিউনো-ফ্লোরেসেন্স এবং ইমিউনো-ডিফিউসন পর্যন্ত বিস্তৃত। তিনি কয়েকটি গবেষণা পরিকল্পনা পরিচালনা করেছেন, তন্মধ্যে কয়েকটি পরিচালিত হয়েছে ইন্টারন্যাশন্যাল সেন্টার ফর মেডিক্যাল রিসার্চ অ্যাণ্ড ট্রেনিং-এর সহযোগিতায়। তাঁর কয়েকটি উল্লেখযোগ্য গবেষণা হচ্ছে—পরজীবি ক্রিমির হিষ্টোকেমিক্যাল বিষয় সম্পর্কিত অনুশীলন, পরজীবীদের বৃদ্ধি এবং বিকাশ সম্পর্কিত ফিজিকো-কেমিক্যাল কারণ, পরজীবি সংক্রমণের গতিশীল সঞ্চরণ, মানুষের রোগের কারণ হিসাবে হোষ্ট-প্যারাসাইট সম্পর্কের বিলোড়ন, পরজীবি সংক্রামিত রোগের ইমিউনোলজি, পরজীবি-নাশক ওষুধের ক্লিনিক্যাল ইভ্যালুয়েশন ইত্যাদি। তিনি দেশ-বিদেশের বিভিন্ন পত্রিকায় প্রায় ২০০ গবেষণা-পত্র প্রকাশ করেছেন। বিদেশ থেকে প্রকাশিত কয়েকটি পুস্তকের তিনি বিভাগীয় লেখক।

১৯৫৭-৫৮ সালে তিনি রকফেলার ফাউণ্ডেশন বৃত্তি লাভ করেন এবং নিউইয়র্কের কর্ণেল বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিক্যাল কলেজে গবেষণা চালান। তিনি ইউ. এস. এ, ইউ. কে, ইউরোপ, ইউ. এস. এস. আর এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় দেশগুলির নানা গবেষণা ও শিক্ষাকেন্দ্র পরিদর্শন করেন। তিনি বিভিন্ন আন্তর্জাতিক অধিবেশন ও সম্মেলনে অংশ গ্রহণ করেছেন। ১৯৫৮ সালে লিসবনে এবং ১৯৬৩ সালে রিও ডি জেনেরিওতে অনুষ্ঠিত ট্রপিক্যাল মেডিসিন ও ম্যালেরিয়া সংক্রান্ত ৬ষ্ঠ ও ৭ম আন্তর্জাতিক কংগ্রেসে তিনি তাঁর গবেষণা-পত্র উত্থাপনের জন্যে আমন্ত্রিত হন। ১৯৫৮ সালে আমেরিকান সোসাইটি ফর ট্রপিক্যাল মেডিসিন অ্যাণ্ড হাইজিন-এর বার্ষিক সম্মেলনে, ১৯৬১ সালে রোমে অনুষ্ঠিত ইন্টারন্যাশান্যাল সোসাইটি অব ট্রপিক্যাল ডারমেটোলজির প্রথম কংগ্রেসে, ১৯৬৪

সালে রোমে অনুষ্ঠিত প্রথম ইণ্টারন্যাশন্যাল কংগ্রেস অব প্যারাসিটোলজি এবং ১৯৬৬ সালে টোকিওতে অনুষ্ঠিত ১১শ প্রশান্ত মহাসাগরীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসে তিনি আমন্ত্রিত হন। ১৯৬১ সালে ইউ. এস. এস. আর-এ অনুষ্ঠিত সঞ্চারযোগ্য রোগ সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক সম্মেলনে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেন। ম্যানিলায় অনুষ্ঠিত (১৯৬৫) Filariasis সম্পর্কিত ডাব্লিউ. এইচ. ও, আন্তঃরাজ্য সেমিনার এবং ব্যাঙ্ককে অনুষ্ঠিত (১৯৬৬) পরজীবি সংক্রামিত রোগ সম্পর্কে দ্বিতীয় সম্মেলনেও তিনি ভারতের প্রতিনিধি ছিলেন। তিনি ভারতের অনেক বৈজ্ঞানিক সমিতি ও কমিটির সদস্য।

অধ্যাপক বি. এন. সাহু

সভাপতি—কৃষি-বিজ্ঞান শাখা

উড়িষ্যা রাজ্যের কটক জেলার কালানটিরা গ্রামে ১৯১০ সালের ১লা অগাষ্ট ডাঃ বিশ্বনাথ সাহু জন্মগ্রহণ করেন। র‍্যাভেনশা কলেজিয়েট স্কুল এবং র‍্যাভেনশা কলেজ থেকে শিক্ষা শেষ করে ১৯৩০ সালে তিনি বিহার ও উড়িষ্যা সরকারের বৃত্তিধারী প্রার্থী হিসাবে নাগপুর কৃষি কলেজে ভর্তি হন। নাগপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি ১৯৩৫ সালে বি. এ. ডিগ্রি লাভ করেন।

১৯৩৫ সালের জুন মাসে বিহার ও উড়িষ্যার কৃষি বিভাগের পাটনা ফার্ম, দক্ষিণ বিহার রেঞ্জে যোগদান করেন। উড়িষ্যা আলাদা প্রদেশ হিসাবে গঠিত হবার পর তিনি ১৯৩৭ সালে কটক ফার্মে বদ্‌লি হন। ১৯৪০ সালে তিনি কটক ফার্মের ম্যানেজার পদে উন্নীত হন এবং ১৯৪৬ সালে তিনি উড়িষ্যা সরকারের ক্রপ ডেভলপমেণ্ট অফিসার হিসাবে নিযুক্ত হন। তিনি ক্যানাডার অণ্টারিও কলেজে প্রেরিত হন এবং ১৯৪৭ সালে টরোণ্টো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিষ্টিংশন-সহ এম. এস-সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং ১৯৪৯ সালে ইউ. এস. এ-র ইষ্ট ল্যানসিং-এর মিচিগান ষ্টেট কলেজ থেকে পি-এইচ. ডি. ডিগ্রি লাভ করেন।

ভারতে প্রত্যাবর্তনের পর তিনি উড়িষ্যার কৃষি প্রসারণ কার্যের ভার প্রাপ্ত হন। ১৯৫২ সালে ভারত সরকার কর্তৃক তিনি যুক্তরাষ্ট্র ও জাপানের কৃষি প্রসারণ কার্য পরিদর্শনে প্রেরিত

অধ্যাপক বি. এন. সাহু

হন। সেখান থেকে প্রত্যাবর্তনের পর তিনি সমষ্টি উন্নয়ন পরিকল্পনার কৃষি উন্নয়ন অফিসার হিসাবে নিযুক্ত হন। ১৯৫৪ সালে তিনি উড়িষ্যা সরকারের অ্যাগ্রোনোমিষ্ট হিসাবে নিযুক্ত হন। তিনি অ্যাগ্রোনোমির গবেষণা শাখা গঠন করেন এবং ১৯৫৯ সাল পর্যন্ত ভুবনেশ্বরস্থিত কৃষি কলেজের অ্যাগ্রোনোমির গবেষণা বিভাগের প্রধান হিসাবে নিযুক্ত ছিলেন। ১৯৬০ সালে উৎকল কৃষি মহাবিদ্যালয়ের অ্যাগ্রোনোমি বিভাগের প্রধান এবং অধ্যাপক হিসাবে পুনরায় যোগ দেন। তখন থেকেই তিনি আণ্ডার-গ্র্যাজুয়েট ও পোষ্ট-গ্র্যাজুয়েট শিক্ষণ-প্রণালী, অ্যাগ্রোনোমির গবেষণা এবং প্রসারণ প্রভৃতি কাজ তত্ত্বাবধান করছেন। ১৯৬০ সালের নভেম্বর থেকে ১৯৬১ সালের ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত তিনি উৎকল মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ছিলেন।

১৯৫০ সালে সিংহলে অনুষ্ঠিত দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ভূমি ব্যবহার সম্পর্কিত সম্মেলনে তিনি ভারতীয় প্রতিনিধি নির্বাচিত হয়েছিলেন। এই সম্মেলনে তিনি তাঁর "Land utilisation in Orissa" নামক পুস্তকটি উপহার দেন। এই পুস্তকেই তিনি প্রথম বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে উড়িষ্যার মাটির শ্রেণী বিভাগ ও কৃষি আবহাওয়া অঞ্চল সম্পর্কে বর্ণনা দেন।

উড়িয়া সাহিত্য এবং প্রাচীন কৃষির উন্নতি বিধানে তাঁর দান যথেষ্ট। উড়িষ্যার মাটির রকম অনুযায়ী বিভিন্ন শস্যের সার সম্পর্কিত তাঁর গবেষণা বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

উড়িষ্যায় বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণের জন্যে স্থাপিত উড়িষ্যা বিজ্ঞান প্রচার সমিতির তিনি একজন সক্রিয় সদস্য। কৃষি বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে তিনি একজন লোকরঞ্জক প্রবন্ধ লেখক। উড়িষ্যা সাহিত্য অ্যাকাডেমি তাঁর "Dhan" নামক পুস্তকটি প্রকাশ করেছে। এই পুস্তকে তিনি উড়িষ্যাকে চাউল উৎপাদনের দ্বিতীয় কেন্দ্র এবং ভারতবর্ষে শবর এবং গডভা—এই দুই জাতের অষ্ট্রো-এশিয়াটিক লোকদের প্রথম ধান চাষকারী বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অব অ্যাগ্রোনোমি, ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অব সয়েল সায়েন্স, ইণ্টারন্যাশন্যাল সোসাইটি অব সয়েল সায়েন্স-এর সদস্য। তিনি উৎকল বিশ্ববিদ্যালয়ের বৈজ্ঞানিক পরিভাষা কমিটির সদস্য। ভারত সরকারের বিজ্ঞান ও কারিগরী শব্দের পরিভাষার ষ্ট্যাণ্ডিং কমিশনেরও তিনি সদস্য। ডাঃ সাহু উৎকল বিশ্ববিদ্যালয়ের ফ্যাকাল্টি অব এগ্রিকালচার-এর ডীন। কলিকাতা, কল্যাণী, ভাগলপুর, রাঁচী, অন্ধ্র, বিক্রম ও গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে তিনি সংশ্লিষ্ট আছেন।

তিনি চাষ, সার, সেচ এবং ধান চাষ ও আগাছা নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে মৌলিক গবেষণা-পত্র প্রকাশ করেছেন। তাঁর মৌলিক গবেষণা-পত্রের সংখ্যা ৩৫-এরও বেশী। ১৯৫১ সালে Vegetable Cultivation, ১৯৫২ সালে 'Fruit Culivation, ১৯৫৪ সালে 'গোমঙ্গল ও গোচিকিৎসা', ১৯৫৫ সালে 'Flower garden', ১৯৫৬ সালে 'Fodder Cultivation এবং ১৯৫৭ সালে 'Our fish wealth' নামক পুস্তক প্রকাশ করেন। এই সব বই উড়িয়া ভাষায় প্রকাশিত। উড়িষ্যার মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে তাঁর কয়েকটি বই পাঠ্য পুস্তক এবং রেফারেন্স বই হিসাবে চালু আছে। উড়িষ্যার বিভিন্ন অঞ্চলে কৃষি বিষয়ক সংজ্ঞা সংগ্রহ করে সেগুলিকে বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাসহ তিনি সংকলিত করেন। কৃষির সঙ্গে সংযুক্ত উড়িষ্যার ধর্মীয় উৎসব সম্পর্কে তিনি 'Krushi Parba Parbani' শীর্ষক একটি পুস্তক রচনা করেছেন। তিনি 'Agriculture in India'-র তিন খণ্ডকে উড়িয়া ভাষায় অনুবাদ করেছেন।

অধ্যাপক সুশীলরঞ্জন মৈত্র

সভাপতি—শারীরবিদ্যা শাখা

অধ্যাপক মৈত্র ১৯০৯ সালে অধুনা পূর্ব পাকিস্থানের অন্তর্ভুক্ত ফরিদপুর জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। চট্টগ্রামেই (পূর্ব পাকিস্থান) প্রধানতঃ তাঁর বিদ্যালয়ের শিক্ষালাভ হয়। কলেজের শিক্ষালাভ হয় কলিকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে। ১৯৩৩ সালে শারীরবিদ্যায় এম. এস-সি. ডিগ্রি লাভ করবার পর তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজের তাৎকালীন শারীরবিদ্যার অধ্যাপক এন. এম. বসুর অধীনে গবেষণা সুরু করেন। সে সময়ে বাংলা দেশে শোথ রোগ মহামারী রূপে দেখা দেয়। সন্দেহ করা হয়েছিল যে, আর্দ্র ও গরম আবহাওয়ায় গুদামে মজুত করা চাল থেকেই এই রোগের সুত্রপাত হয়। অধ্যাপক মৈত্র এই সমস্যা সম্পর্কে গবেষণা সুরু করেন। বর্ধমান জেলার বিভিন্ন রকমের চাল সংগ্রহ করে (বর্ধমান জেলায় তখন শোথ রোগ মহামারী রূপে দেখা দিয়েছিল)—

স্যাংসেঁতে আবহাওয়ার মজুত করে রাখবার ফলে—তার অ্যামিনো-নাইট্রোজেন বৈষম্য বের করবার জন্যে সচেষ্ট হন। অর্থাভাবে তাঁর এই কাজ বেশী দূর অগ্রসর হয় নি। পরলোকগত অধ্যাপক এস. সি. মহালনবীশ ১৯৪০ সালে তাঁকে ডেমনষ্ট্রেটর হিসাবে নির্বাচিত করেন এবং এই সময়েই অধ্যাপক মহলানবীশ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর শারীরবিদ্যা বিভাগ চালু করেন। এই সময়ে অধ্যাপক মৈত্র ফলিত রসায়ন বিভাগের অধ্যাপক বি. এন ঘোষ এবং শারীরতত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক বি. বি

অধ্যাপক সুশীলরঞ্জন মৈত্র

সরকারের সঙ্গে গোখুরা সাপের বিষ এবং তার সক্রিয় উপাদান (উপক্ষার) সম্পর্কে গবেষণা সুরু করেন। তিনি এবং ডাঃ এন. কে. সরকার Cardiotoxin নামক সাপের বিষের একটি সক্রিয় উপাদান আবিষ্কার করেন। এই উপাদানটি হৃদ্‌যন্ত্রকে অচল করে দিতে পারে। এই কাজের জন্যে অধ্যাপক মৈত্র ডি. এস-সি. ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯৫২ সালে তিনি শারীরবিদ্যা বিভাগের লেক্‌চারার নিযুক্ত হন। সমস্ত বছর ধরে তিনি অধ্যাপক বি. বি. সরকার ও অধ্যাপক পি. বি. সেনের সহযোগিতায় শারীরবিদ্যা বিভাগের উন্নতির জন্যে আন্তরিকভাবে কাজ করতে থাকেন। ভারতবর্ষে এই ধরণের প্রতিষ্ঠান কেবল মাত্র এটিই। এখন তিনি মানব শারীরবিদ্যা, বিশেষতঃ শারীরবিদ্যা সম্পর্কিত গবেষণায় আত্মনিয়োগ করেছেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে অধ্যাপক ই. অ্যাসমুসেনের অধীনে কোপেনহাগেনের Gymnastikteoretiske Laboratorium of Instititute of Physiology-তে শিল্প ও শ্রম সম্পর্কিত শারীরবিদ্যায় বিশেষ ট্রেনিং লাভের জন্যে পালিত বৃত্তি (বিদেশ যাত্রার জন্যে) প্রদান করেন। তিনি অধ্যাপক অ্যাসমুসেনের কাছে এক বছর কাজ করেন এবং অল্প দিনের জন্যে জার্মেনীর ডর্টমুণ্ডের ম্যাক্স প্লাঙ্ক ইনষ্টিটিউট ও ষ্টকহোমের জিমন্যাসটিক লেবরেটরীতেও তিনি কাজ করেন। কলিকাতায় ফিরে এসে তিনি শ্রম ও শিল্প সম্পর্কিত শারীরতাত্ত্বিক গবেষণার কাজ সুরু করেন। কার্যের পারম্পর্যের (Graded work) ফলে সৃষ্ট শারীরতাত্ত্বিক ও জৈব রাসায়নিক পরিবর্তন, শৈশব থেকে পরিণত অবস্থায় বালকদের শারীরিক যোগ্যতার উন্নতি, অবসাদ প্রভৃতি বর্তমানে তাঁর গবেষণার বিষয়বস্তু। তিনি এখন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শারীরবিদ্যা বিভাগের অধ্যাপক। ষ্টকহোমের অধ্যাপক এইচ. ক্রিস্টেনসন এবং কোপেনহেগেনের অধ্যাপক ই. অ্যাসমুসেন তাঁর পরীক্ষাগার এবং গবেষণার ধারা দেখে বিশেষ প্রশংসা করেছেন।

বিজ্ঞান শিক্ষায় এবং তাঁর এলাকায় বালকবালিকাদের উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের উন্নতি সাধনে অধ্যাপক মৈত্র বিশেষ আগ্রহী। কলিকাতার সায়েন্স ক্লাবের মাধ্যমে সায়েন্স ক্লাব আন্দোলনে তিনি অগ্রণী। ভারতের শারীরতাত্ত্বিক সমিতির প্রতিষ্ঠা-কাল থেকেই তিনি এই সমিতির নানা পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন;

বর্তমানে তিনিই এর সভাপতি। তিনি বনহুগলীর বিকলাঙ্গ শিশু হাসপাতালের সায়েন্টিফিক বোর্ডের সদস্য। বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের তিনি কোষাধ্যক্ষ। Work Physiology-কে শিক্ষা গবেষণা এবং কৌশল প্রয়োগের দ্বারা সম্ভাব্য সকল রকম ব্যবহারিক ক্ষেত্রেই মানুষের হিতসাধনে তিনি উৎসাহী। Work and Industrial Physiology-তে তাঁর ছাত্রেরাই ভারতবর্ষে একমাত্র শিক্ষিত কর্মী এবং তাঁরা কেন্দ্রীয় সরকারের লেবার ইনষ্টিটিউট এবং মাইনিং রিসার্চ ইনষ্টিটিউট প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত আছেন।

অধ্যাপক এইচ. সি. গাঙ্গুলি

সভাপতি—মনস্তত্ত্ব ও শিক্ষা শাখা

ডাঃ গাঙ্গুলী ১৯২৪ সালের ২৫শে নভেম্বর উত্তর প্রদেশের মিরাটে জন্মগ্রহণ করেন। মীরাট কলেজ, আগ্রা বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর শিক্ষা লাভ হয়। ১৯৪৫ সালে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করে তিনি মাষ্টার্স ডিগ্রি লাভ করেন। শিল্প-মনস্তত্ত্ব সম্পর্কে গবেষণার জন্যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৫১ সালে তাঁকে ডি. ফিল এবং ১৯৫৬ সালে ডি. লিট ডিগ্রী দান করেন।

ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে অল্প দিনের জন্যে তিনি মনস্তাত্ত্বিক পরীক্ষা-কার্যে নিযুক্ত ছিলেন। পরবর্তী কালে তিনি ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল হেলথ রিসার্চ ইউনিট, ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অব মেডিক্যাল রিসার্চ, ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অব টেকনোলজি (খড়্গপুর), ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অব সায়েন্সে (ব্যাঙ্গালোর) মনস্তত্ত্ববিদ হিসাবে কাজ করেন। দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের মনস্তত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক এবং প্রধানরূপে যোগদানের পূর্বে তিনি ভারতীয় বিমান বাহিনীর নিরাপদ বিমান চালনা দপ্তরের ডেপুটি ডিরেক্টর এবং অ্যাভিয়েশন সাইকোলজি এবং হিউম্যান ইঞ্জিনীয়ারিং রিসার্চের প্রিন্সিপাল সায়েন্টিফিক অফিসার হিসাবে দুই বছর নিযুক্ত ছিলেন।

ডাঃ গাঙ্গুলি ৪০টিরও বেশী মৌলিক প্রবন্ধ বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক পত্রিকায় প্রকাশ করেছেন। তাছাড়া তিনি কয়েকটি পুস্তকের রচয়িতা। শিল্প ও বিমান চালনার মনস্তত্ত্বে ডাঃ গাঙ্গুলী উৎসাহী। শিল্পের

অধ্যাপক এইচ. সি. গাঙ্গুলি

ক্ষেত্রে গতিবৃদ্ধি সমস্যা, শিল্পাঞ্চলের জনগণের মানসিক সমস্যা এবং ইকুয়িপমেণ্ট ডিজাইনের ক্ষেত্রে সেন্সরি-মোটর কোঅর্ডিনেশনের সমস্যা সম্পর্কিত গবেষণায় তিনি বিশেষ উৎসাহী।

বর্তমানে তিনি বিশেষভাবে ভারতবর্ষের সমস্যা-সহ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সামাজিক পরিবর্তনের সমস্যা সম্পর্কে গবেষণা করছেন। UNESCO, ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অব মেডিক্যাল রিসার্চ, ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অব কালচারেল রিলেসনস্ প্রভৃতির নানা পরিকল্পনা ডাঃ গাঙ্গুলীর দ্বারা পরিচালিত। অকুপেশন্যাল হেল্থ অ্যাড্ভাইসরি কমিটি অব দি ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অব মেডিক্যাল রিসার্চ, রিসার্চ কাউন্সিল অব দি ইণ্ডিয়ান ইণ্টারন্যাশন্যাল সেণ্টার প্রভৃতির তিনি সদস্য। তিনি বিদেশেও বহুবার গিয়েছেন। তিনি W. H. O. কর্তৃক আহূত

স্বয়ংক্রিয় যান্ত্রিক ব্যবস্থায় মানসিক স্বাস্থ্য সম্পর্কিত সম্মেলনের ন্যায় আরও কয়েকটি আন্তর্জাতিক সম্মেলনে অংশ গ্রহণ করেছেন।

অধ্যাপক দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

সভাপতি—ইঞ্জিনিয়ারিং ও ধাতুবিদ্যা শাখা

১৯২১ সালে অধ্যাপক ব্যানার্জী জন্মগ্রহণ করেন। ভাটপাড়ায় তাঁর স্কুলের শিক্ষা সুরু হয় এবং ১৯৪১ সালে পদার্থবিদ্যায় অনার্স-সহ কলিকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বি. এস-সি. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। পরে তিনি শিবপুর বি. ই. কলেজে ভর্তি হন এবং ১৯৪৪ সালে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করে বি. ই. (মেকানিক্যাল) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে Shibley Scholar হিসাবে শিক্ষানবিশী করবার পর সরকারী বৃত্তিতে তিনি ১৯৪৬ সালে ইউ. কে. যান।

অধ্যাপক দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

স্নাতকোত্তর অনুশীলন এবং গবেষণায় শিক্ষালাভের নিমিত্ত লণ্ডনের ইম্পিরিয়াল কলেজ অব সায়েন্স অ্যাণ্ড টেকনোলজিতে ভর্তি হন। Gas Turbines and Heat Transfer সম্পর্কে তিনি Prof. O. A. Saunders-এর অধীনে কাজ করেন এবং ১৯৪৮ সালে D. I. C. এবং লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. এস-সি. (ইঞ্জিনিয়ারিং) ডিগ্রি লাভ করেন। তিনি স্বল্পকালের জন্যে মেসার্স ডাব্লিউ. এইচ. অ্যালেন অ্যাণ্ড কোং., বেডফোর্ড ও নর্থ বৃটিশ লোকোমোটিভ কোং, গ্লাসগোতে শিল্পসংক্রান্ত শিক্ষা লাভ করেন।

যুক্তরাজ্য থেকে ফিরে এসে ১৯৪৯ সালে তিনি শিবপুর বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে যোগদান করেন ডাঃ এস. আর. সেনগুপ্তের অধীনে গ্যাস টারবাইনের উন্নতি বিষয়ে গবেষণা সুরু করেন। তখন থেকেই তিনি মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে একটি রিসার্চ ইউনিট গঠন করেছেন এবং ১৯৬১ সাল থেকে তিনি এই মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের অধ্যাপক এবং প্রধান হিসাবে কাজ করছেন।

অধ্যাপক ব্যানার্জী U. S. A. I. D কর্মসূচী অনুযায়ী যুক্তরাষ্ট্র পরিদর্শন করেছেন এবং Gas Turbine এবং Propulsion field-এ ইনষ্টিটিউশন এবং গবেষণা কেন্দ্রসমূহে কাজ করেছেন। তিনি Turbo-machinery সম্পর্কে গবেষণায় শিক্ষালাভের জন্যে অধ্যাপক ই. এস. টেলারের অধীনে ম্যাসাচুসেটস্ ইনষ্টিটিউট অব টেকনোলজিতে অনারেরি ভিজিটিং ফেলো হিসাবে ম্যাসাচুসেট্স্ ইনষ্টিটিউট অব টেকনোলজির 'গ্যাস টারবাইন ডিভিসনে'র সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তিনি জাপান, যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, পশ্চিম জার্মেনী, সুইজারল্যাণ্ডে তাঁর গবেষণার বিষয়বস্তু সম্পর্কিত গবেষণা কেন্দ্রগুলি পরিদর্শন করেন।

অধ্যাপক ব্যানার্জী বর্তমানে "Fluid Mechanics of Turbo-machinery" এবং 'দহন' সম্পর্কিত গবেষণায় ব্যাপৃত আছেন। তিনি অনেক মৌলিক নিবন্ধ প্রকাশ করেছেন। ভারতে কারিগরী শিক্ষার উন্নতিতে তিনি যথেষ্ট উৎসাহী এবং এই বিষয়ে তাঁর দানও মূল্যবান। ইনষ্টিটিউশন অব ইঞ্জিনিয়ার্স (ইণ্ডিয়া) এবং ইণ্ডিয়ান সোসাইটি ফর টেকনিক্যাল অ্যাণ্ড অ্যাপ্লায়েড মিকানিক্স-এর সঙ্গে তিনি ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট।

প্রবন্ধের সঙ্গে ব্যবহৃত ছবিগুলির ব্লক "সায়েন্স অ্যাণ্ড কালচার" পত্রিকার সৌজন্যে প্রাপ্ত—স.

বিজ্ঞান-সংবাদ

যে যন্ত্র মানুষকে সচল রাখছে

রোগভোগের ফলে শরীরের অংশবিশেষ বিকল হলে তার স্থান গ্রহণ করবার মত যন্ত্র চিকিৎসা-বিজ্ঞানীরা তৈরি করে চলেছেন।

উদাহরণস্বরূপ, লৌহ ফুস্‌ফুসের সঙ্গে এখন সবাই পরিচিত। এই যন্ত্র পোলিও রোগীদের শ্বাস নিতে ও বেঁচে থাকতে সাহায্য করে।

ডাক্তার ও ইঞ্জিনীয়ারেরা এই সব যন্ত্রপাতিকে নিখুঁত করতে বহু সময় ও শ্রম ব্যয় করেন। তাঁরা জানেন, যে সব লোক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ হারিয়েছেন, তাঁদের কাছে এই কাজের গুরুত্ব কতখানি। এই সব ডাক্তার ও ইঞ্জিনীয়ারদের চেষ্টাতেই মানুষ এখন তৈরি আঙ্গুল, হাত-পা ইত্যাদির সাহায্যে সুন্দরভাবে কাজ-কর্ম করছে।

১০০টিরও বেশী বিভিন্ন দেশে বৃটেন আরোগ্যোত্তর ব্যবহারের জন্যে যন্ত্রপাতি পাঠিয়ে থাকে। একটি যান্ত্রিক কব্জি তৈরি করা সম্ভব হয়েছে, যা ব্যবহারকারীর নির্দেশে চলে। এর জন্যে শক্তি আসে ব্যবহারকারীর পকেটে রাখা ব্যাটারী থেকে।

বিদ্যুৎ-চালিত একটি হাত আর একটি হাতের নির্দেশে কাজ করতে পারে। গুরুতর-ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত অস্থি-র সংযোগস্থলগুলির স্থান গ্রহণকারী যন্ত্রের প্রভূত উন্নতি হয়েছে। ধাতু ও প্লাষ্টিক দিয়ে এগুলি নির্মিত হয়ে থাকে।

হৃৎপিণ্ডের প্রধান ভাল্‌ভের স্থানে প্লাষ্টিক ভাল্‌ভ্ ব্যবহার সম্ভব হয়েছে। এর ফলে বাঁচবার আশা নেই, এমন মানুষও অস্ত্রোপচারের ফলে সুস্থ হয়ে উঠছেন। শল্য-চিকিৎসার ক্ষেত্রে এটি একটি বড় রকমের অগ্রগতি।

হৃৎপিণ্ডের অস্ত্রোপচার এক সময়ে ছিল খুবই বিপজ্জনক ব্যাপার। বৃটেনে হৃৎপিণ্ড-ফুস্‌ফুস যন্ত্র (Heart-lung machine) উদ্ভাবিত হওয়ায় এখন আর একাজ তত কঠিন নয়।

যখন হৃৎপিণ্ডে অস্ত্রোপচারের কাজ চলে, তখন ডাঃ ডেনিস মেলরোজ উদ্ভাবিত এই যন্ত্র হৃৎপিণ্ডের কাজ চালিয়ে যায়। পাম্পের সাহায্যে যন্ত্রটি শুধু রক্ত সঞ্চালনের কাজ নয়, অক্সিজেন গ্রহণ করে রক্ত পরিশোধনের কাজও করে থাকে। এই যন্ত্রে একটি কাচের সিলিণ্ডারের মধ্যে ঘূর্ণায়মান ১৪০টি ষ্টেনলেস ষ্টিলের চাক্তির সাহায্যে রক্ত পরিশোধনের কাজ চলে।

দূরে বসানো অন্য একটি বিদ্যুৎ-চালিত যন্ত্র রোগীর মস্তিষ্ক ও হৃৎপিণ্ডের অবস্থা, রক্তের চাপ, তাপমাত্রা ইত্যাদি শল্য-চিকিৎসককে জানিয়ে দেয়। তার ফলে তিনি নির্বিঘ্নে অস্ত্রোপচারের কাজ চালাতে পারেন।

পঙ্গপালের বিরুদ্ধে বিজ্ঞান

সম্প্রতি লণ্ডনের অ্যাণ্টি-লোকাষ্ট রিসার্চ সেণ্টারের গবেষণায় ভবিষ্যতে পঙ্গপাল দমন করা সম্ভব হবে বলে আশা পাওয়া গেছে। যে সব গাছপালা খেয়ে পঙ্গপাল বেঁচে থাকে, তাদের সম্পর্কে বৈজ্ঞানিকেরা নতুন অনেক কিছু আবিষ্কার করেছেন। এর ফলে পঙ্গপালের জীবনযাত্রা-পদ্ধতিতে বিপর্যয় ঘটিয়ে তাদের প্রজনন রোধ করা সম্ভব হবে বলে আশা করা যায়।

অ্যাণ্টি-লোকাষ্ট রিসার্চ সেণ্টারটি ১৯৪৫ সালে একটি স্বাধীন সংস্থা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমানে এটি একটি গবেষণা ও আন্তর্জাতিক তথ্য-কেন্দ্র হিসাবে পরিচালিত হচ্ছে। এখানে বহু

দেশের পঙ্গপাল দমনকারী-কর্মীদের জন্যে একটি শিক্ষাক্রমও পরিচালিত হয়।

পঙ্গপাল দমনের ক্ষেত্রে এই নতুন আবিষ্কারটি ঘটলো প্রায় তখন, যখন পঙ্গপাল বিনাশের যুদ্ধে মানুষ প্রায় জয়ী হয়ে এসেছে। ১৯৬৬ সালের অগাষ্ট মাস পর্যন্ত কেন্দ্রে কোন পঙ্গপালের উৎপাতের বিবরণ আসে নি। এর কারণ রাসায়নিক দ্রব্যের সাহায্যে এখন পঙ্গপাল বিনাশ করা যায়। মাত্র এক গ্যালন রাসায়নিকের সাহায্যে ৩,০০০,০০০ পঙ্গপাল বিনাশ করা সম্ভব। কিন্তু এরকম কড়া রাসায়নিক ব্যবহারের বিপদ সম্পর্কে বিজ্ঞানীরা সচেতন। তাই তাঁরা পঙ্গপাল দমনের অন্য পন্থা খুঁজছেন।

কিছুকাল পূর্বে বিজ্ঞানীরা লক্ষ্য করেন যে, মির নামক পদার্থের সাহায্যে পঙ্গপালের মধ্যে ঠিক সময়ের পূর্বেই প্রজননক্রিয়া সুরু করিয়ে দেওয়া যায়। আবার তাঁরা এও লক্ষ্য করেন যে, কতকগুলি পদার্থ পঙ্গপালের খাদ্যে না থাকলে তারা আদৌ প্রজননে সক্ষম হয় না। তাছাড়া বিজ্ঞানীরা জানেন, কি কি জিনিষ গাছপালাকে সবুজ রাখে।

এখনও অবশ্য অনেক পথ বাকী। তবু আশা করা যায়, বৈজ্ঞানিকেরা একদিন পঙ্গপাল প্রজননের সময় নির্ধারণ করতে সক্ষম হবেন। রাসায়নিক দ্রব্যাদির সাহায্যে তাঁরা এটা করবেন। বর্তমানে পঙ্গপালের প্রজনন ঘটে যখন গাছপালা সবচেয়ে সবুজ ও সতেজ থাকে। যদি এমন ঘটানো সম্ভব হয় যে, তারা ঠিক সময়ের পূর্বে প্রজনন সুরু করবে, তাহলে সেই সময় তারা প্রয়োজনীয় খাদ্য পাবে না এবং মানুষও তার কৃষির সবচেয়ে পুরনো শত্রুর হাত থেকে বেঁচে যাবে।

বৈদ্যুতিক মোটর গাড়ী

একবার ব্যাটারী চার্জ করিয়ে নিলে এক-টানা ১০০ মাইল চলতে পারে। এমন বিদ্যুৎ-শক্তি চালিত মোটর গাড়ীর উৎপাদন বৃটেনে ১৯৭৮ সালের প্রথমার্ধেই সুরু হবে।

প্রথমতঃ ১২ ভোল্টের ৪টি লেড-অ্যাসিড ব্যাটারী একটি ডি-সি ইলেকট্রিক মোটরকে ৫ অশ্বশক্তি যোগাবে। এই মোটর সমন্বিত গাড়ী ১ জন যাত্রী নিয়ে ৬০ মাইল ও ৪ জন যাত্রী নিয়ে ৪০ মাইল যেতে সক্ষম হবে।

হাল্কা ধরণের সুপার ব্যাটারী ব্যবহার করে এই গতি যাতে ১০০ মাইল করা যায়, সেই বিষয়ে চিন্তা করা হচ্ছে।

আখের ছিবড়া থেকে আসবাব

বৃটেনের একটি ফার্ম আখের ছিবড়া পিষে আসবাব তৈরির উপাদান হিসাবে ব্যবহারযোগ্য করে তুলছেন।

এই ফার্মের নাম বাগাসী প্রোডাক্টস্ কোঃ লিমিটেড (ওয়ার্টফোর্ড, হার্টফোর্ডশায়ার)। উপাদানটির নাম দেওয়া হয়েছে বাগেলি। এটি বোর্ড ও পাউডারের আকারে পাওয়া যায়।

বাগেলিকে মেলামাইন সম্পৃক্ত কাগজের সঙ্গে বিশেষ চাপে সংযুক্ত করলে তা বেলামাইনে পরিণত হয়। বেলামাইনের স্ক্রু-গ্রহণ ক্ষমতা চীপবোর্ডের চেয়ে শতকরা ৫০ ভাগ বেশী। রেডিও ও টেলিভিশন ক্যাবিনেট তৈরিতে এই উপাদানের বহুল ব্যবহার হবে।

কিশোর বিজ্ঞানীর দপ্তর

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

ফেব্রুয়ারী—১৯৬৭

২০শ বর্ষ : ২য় সংখ্যা
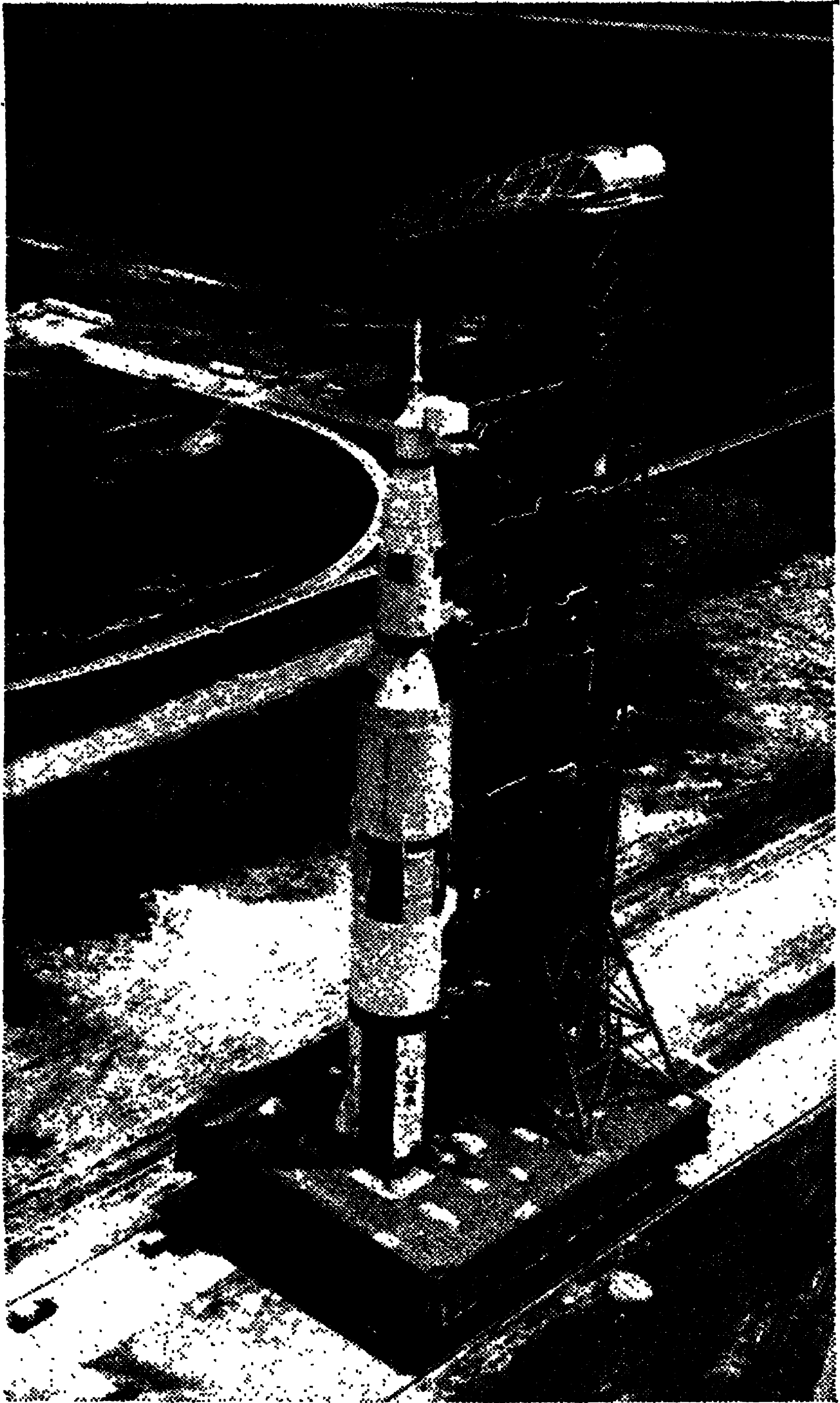
তিনজন আমেরিকান আকাশচারী নিয়ে ভবিষ্যৎ চন্দ্র অভিযানের জন্যে পরিকল্পিত পাঁচটি রকেট সমন্বিত ১১১ মিটার লম্বা স্যাটার্ণ রকেটটিকে ৩,০০০ টনের ক্রলারের সাহায্যে ফ্লোরিডার কেপ কেনেডির উৎক্ষেপণ মঞ্চে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

তড়িৎ-সমাহর্তা বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন

আকাশের বুক চিরে বিজলীর ঝলক—লক লক করে প্রকাশিত হয়ে ক্ষণিকেই আবার আকাশের মধ্যেই কোথায় বিলীন হয়ে যায়—সে দৃশ্য প্রায় সকলেরই সুপরিচিত। কিন্তু কারও কারও মগজে হঠাৎ চিন্তা-ভাবনার বিজলীর ঝিলিকও খেলে যায়। তেমনি ঘটেছিল একবার, আজ থেকে প্রায় সার্দ্ধ দুই শতাব্দী পূর্বে একজন আমেরিকাবাসীর ক্ষেত্রে। তাঁর ইচ্ছা হলো, আকাশের বুক থেকে বিজলী নামিয়ে আনবেন পৃথিবীর বুকে এবং সঙ্গে সঙ্গে একখানা ঘুড়ি উড়িয়ে সেখান থেকে বিজলী আটক করে সত্য সত্যই একদিন পৃথিবীর বুকে নিয়ে এলেন। এই আমেরিকানের নাম হলো বেঞ্জামিন ফ্র্যাঙ্কলিন। গল্পের মত শোনালেও তিনি তাঁর এই অভিজ্ঞতার বিবরণ তদানীন্তন কালের প্রচলিত সায়েন্টিফিক জার্নালে ছাপিয়ে দিলেন। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বিজ্ঞানীরা তাঁর সেই পরীক্ষাটি পুনরায় করে দেখলেন—তাঁর বিজলী আটক করে আনবার কথা রহস্য কাহিনীর মত শোনালেও সত্য সত্যই ঘটে থাকে।

"ডেবী, আমার ভারী ইচ্ছা করে দয়ালু প্রভু যদি এখন যতক্ষণ স্থায়ী তার দ্বিগুণ স্থায়ী করে দিনগুলিকে রচনা করবার কথাটা উপযুক্ত বিবেচনা করে দেখতেন!" বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন তাঁর পত্নীকে একবার এইরূপ উক্তি করে বলেন, "তাহলে আমি কিছু একটা করবার কৃতিত্ব অর্জন করতে পারতাম বোধ হয়!" বস্তুতঃ বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন কি কিছু সম্পাদন করতে পেরেছিলেন জীবনে? জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক বিভিন্ন ক্ষেত্রে, যেমন—বিজ্ঞান, উদ্ভাবন, শিক্ষা, সাহিত্য, প্রকাশন, সমাজসেবা এবং আন্তর্জাতিক কূটনীতিতে বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন বিশিষ্ট অবদান রেখে গেছেন। যদি দিনের ব্যাপকতা দুই কি তিন হতো, তবে তিনি যে আরও কত কি সাধন করতেন, তা ভেবে উঠা কঠিন।

শিক্ষা ও জীবিকা অর্জন

ম্যাসাচুসেট্‌স্ কলোনীর বোষ্টন নগরে ১৭০৬ খৃষ্টাব্দের ১৭ই জানুয়ারী বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন আজ থেকে প্রায় দুই শত ষাট বছর পূর্বে জন্মগ্রহণ করেন। পরিবারে তাঁরা ছোট-বড় ভাই-বোন মিলে সতেরো জন। তিনি তাঁদের মধ্যে পঞ্চদশ স্থানীয়। তাঁর বাবা তখনকার দিনের গুরুত্বপূর্ণ শিল্প মোমবাতি তৈরির কাজে লিপ্ত; কিন্তু তাঁর যা আয়, তাতে সংসার চালানো দুঃসাধ্য। বেন নিজে নিজেই পড়তে শিখেন। আট বছর বয়সে তাকে স্কুলে পাঠানো হয়। এখনকার মত তখন বিনাবেতনে স্কুলে পড়াশুনার ব্যবস্থা ছিল না। তাঁর বাবার পক্ষে তাঁর শিক্ষার খরচ চালানো সম্ভব

হলো না। কাজে কাজেই অনিচ্ছা সত্বেও বেনকে স্কুল থেকে ছাড়িয়ে এনে তাঁর মোমবাতি তৈরির দোকানে কাজে লাগিয়ে দিলেন। কিন্তু বেন ছিল বরাবরই অস্থির প্রকৃতির—কাজের জন্যে সর্বদা চঞ্চল। বোষ্টন নগরের পোতাশ্রয়ের দিকে চোখ মেলে চেয়ে থাকতেন আর প্রায়ই বলতেন, তিনি একদিন সমুদ্র পাড়ি দিবেন। বাড়ী ছেড়ে যাতে না পালিয়ে যায়, সে জন্যে পিতা শঙ্কিত হয়ে বেনকে বুঝিয়ে-সুজিয়ে মুদ্রাকর হবার জন্যে রাজী করালেন। বড় ভাই জেম্‌স্‌ 'দি নিউ ইংল্যাণ্ড ক্যুরাণ্ট' নামে একখানি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করতেন। বারো বছরের বেন তখন কিছু সময়ের জন্যে একটু সুখী হয়েছিল ছাপার কাজকর্মে। তিনি হরফ গুছিয়ে বসিয়ে দিতে ও ছাপাকল চালাতে শিখে নিলেন।

লেখাপড়ার আগ্রহ তাঁর এতই প্রবল ছিল যে, তিনি সামনে হাতের কাছাকাছি যে বই পেতেন সবই পড়তেন। এমন হয়েছে যে, খাবার পয়সা জমিয়ে বই কিনেও পড়েছেন প্রায়ই। সাধারণের চেয়ে স্বতন্ত্র এই ছেলেটি নিজে নিজেই পাটীগণিত, অ্যালজেব্রা, নৌচলাচল-বিদ্যা, ব্যাকরণ এবং যুক্তিবিদ্যা পড়ে পড়ে শিখে ফেললেন। লেখাতেও তিনি রীতিমত পটুতা অর্জন করলেন। তাঁর লেখার প্রকাশভঙ্গী এত সুন্দর ছিল যে, মৃত্যুর পর যখন তাঁর আত্মজীবনী প্রকাশিত হলো, তখন আমেরিকার সাহিত্য-জগতে তা উচ্চ-পর্যায়ের সাহিত্যরূপে বিবেচিত হয়েছিল।

বড় ভাই জেম্‌স্‌ কর্তৃক প্রকাশিত 'নিউ ইংল্যাণ্ড ক্যুরাণ্ট' পত্রিকায় রচনা প্রকাশের জন্যে বেন কৃতসংকল্প হন। কিন্তু তাঁর ছোট ভাইয়ের এই ইচ্ছায় নিষ্ঠা আছে বলে বড় ভাই মনে করতেন না। শ্রীমতী সাইলেন্স ডগ্‌উড্‌—এই ছদ্মনামে বেন ঐ পত্রিকায় রচনা পাঠাতে লাগলেন। লেখকের পরিচয় যখন জেম্‌স্‌ আবিষ্কার করলেন, তখন তাঁর মেজাজ খুব উত্তপ্ত হয়ে উঠলো এবং তিনি বেনের জীবন অতিষ্ঠ করে তোললেন। বেন সিদ্ধান্ত করলেন, তিনি নিজেই নিজের জীবনের পথ খুঁজে বের করবেন। আঠারো বছর বয়সে বেন তখন ফিলাডেলফিয়ার পথে পা বাড়ালেন।

ফিলাডেলফিয়াতে মুদ্রাকর হিসাবে তাঁর দক্ষতার কথা দ্রুত প্রচারিত হয়ে পড়লো এবং সকলেই তাঁর কাজের সুযোগ নিতে সচেষ্ট হয়ে উঠলো। তিনি কিন্তু নিজেই নিজের ছাপাখানা খোলবার বাসনা প্রকাশ করলেন। সেই সময়ে আমেরিকার কোন কলোনীতেই ছাপাখানার যন্ত্রপাতি তৈরি হতো না—সে সব ইংল্যাণ্ড থেকে আমদানী করতে হতো। পেনসিলভ্যানিয়া রাজ্যের গভর্নর স্যার উইলিয়াম কিথের প্রদত্ত আর্থিক সাহায্যের প্রতিশ্রুতির উপর ভরসা করে তিনি ইংল্যাণ্ডে যাত্রা করলেন ছাপাখার সরঞ্জামাদি সংগ্রহ করবার জন্যে।

যে কোন কারণেই হোক, প্রতিশ্রুত আর্থিক সাহায্য আর এসে পৌঁছালো না।

কিন্তু বেনের দৃঢ়সংকল্প তাঁর পথ খুঁজে নিল আপন বুদ্ধিবলে। তিনি দেড় বছর ধরে ইংল্যাণ্ডে থেকে কাজ করলেন আর টাকা জমিয়ে নিলেন ছাপাখানা গড়ে তোলবার জন্যে। ইতিমধ্যে দেশে তাঁর কোন খবর না পেয়ে প্রণয়িনী ডিবোরা রিড অপর একজনের পাণিগ্রহণ করেন। অবশ্য কয়েক বছর পরে যখন সেই স্বামী তাঁকে পরিত্যাগ করে কোথায় চলে গেলেন, তখন বেঞ্জামিন ও ডিবোরা রিড পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হলেন। তাঁদের তিনটি সন্তান জন্মগ্রহণ করে।

ফিলাডেলফিয়াতে প্রত্যাবর্তনের পর তিনি "ফিলাডেলফিয়া গেজেট" নামে একখানি পত্রিকা প্রকাশ আরম্ভ করেন। তাছাড়া, "পুওর রিচার্ডস্ অ্যাল্ম্যানাক" নামে একখানি বার্ষিকীও প্রকাশ করতে থাকেন। "পুওর রিচার্ডস্ অ্যালম্যানাক" আমাদের প্রচলিত পঞ্জিকা শ্রেণীর মত একখানি পত্রিকা। সূর্যোদয়, চন্দ্রের কলার হ্রাস-বৃদ্ধি, সুদূর মেয়াদী আবহাওয়ার পূর্বাভাস, চার্চে ধর্মচর্চার ব্যাপারে কোন কোন শুভ ও পবিত্র বিষয়ের খবর এই পত্রিকাতে পাওয়া যেত। তাছাড়া সততা, পরিশ্রম, মিতব্যয়িতা, দেশপ্রেম প্রভৃতি বিষয়ের উপর অনেক সারগর্ভ ছোট ছোট বচন এই পত্রিকাতে ছাপিয়ে দেওয়া হতো। সেই সব বচনের অনেকগুলিই আজকের দিনেও প্রচলিত আছে।

জনসেবা ও লোকহিতকর কার্যাবলী

বিয়াল্লিশ বছর হবার মধ্যেই তিনি প্রচুর অর্থ উপার্জন করেন। জনসেবা, লোকহিতকর ও বৈজ্ঞানিক কাজকর্মে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে নিয়োজিত রাখবার জন্যে এবার তিনি কারবার থেকে অবসর নিলেন। ছাপাখানার কাজ-কারবারে লিপ্ত থাকবার সময় থেকেই তিনি এই সব কাজকর্ম সুরু করে দিয়েছিলেন।

তখন তাঁর বয়স একুশ বছর। ফিলাডেলফিয়া সহরের অল্প বয়সী কারবারী ও মিস্ত্রীদের নিয়ে তিনি একটি আলোচনা-চক্র গড়ে তোলেন। সেই চক্র কালক্রমে ফিলাডেলফিয়ার গণ্ডী ছাড়িয়ে বিস্তৃত হয়ে পড়ে এবং আমেরিকান ফিলজফিক্যাল সোসাইটির রূপ পরিগ্রহ করে। 'কমিটিস্ অব সিক্রেট করেস্পণ্ডেন্স' (গোপন চিঠি চলাচলের সমিতিসমূহ) নামে সংস্থা তারা গড়ে তুলেছিল। সেই সংস্থাকে ভিত্তি করেই চাঞ্চল্যকর 'ডিক্লারেশন অব ইণ্ডিপেণ্ডেন্স' (স্বাধীনতা-ঘোষণা) এবং আমেরিকান রিভোলিউশন (আমেরিকার বিপ্লব) সংঘটিত হয়েছিল।

আমেরিকার কলোনীসমূহের পোষ্টমাষ্টার জেনারেল পদে বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিনকে ১৭৫৩ খৃষ্টাব্দে নিযুক্ত করা হয়। তিনি তাঁর স্বাভাবিক শক্তি-সামর্থ্য এই কাজে প্রয়োগ করেন। কলোনীসমূহের মধ্যে ডাক চলাচল ব্যবস্থার প্রভূত উন্নতি সাধন করেন এবং ডাক চলাচলের ব্যবসায়টিকে লাভজনক করে তোলেন। ১৮৪৭ খৃষ্টা...

যুক্তরাষ্ট্রে প্রথম ডাক-টিকিট ছাপা হয়। প্রথম প্রকাশিত টিকিটে বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিনের ছবি ছাপিয়ে আমেরিকার ডাক চলাচল-ব্যবস্থায় তাঁর অবদানের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা হয়।

বেঞ্জামিন সবে তখন পঁচিশ বছর বয়সে পৌঁচেছেন। তাঁর ছোটবেলার কথা মনে পড়লো। কতদিন না খেয়ে পয়সা বাঁচিয়ে বই কিনে পড়েছেন—এই কথা স্মরণ করে আমেরিকায় সর্বপ্রথম চলমান লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা করেন। ফিলাডেলফিয়া শহরে অগ্নিনির্বাপনের জন্যে তিনি একটি বিভাগ গড়ে তুলেছিলেন। অগ্নিদগ্ধ বেচারাদের দুঃখ-ক্লেশ লাঘবের উদ্দেশ্যে প্রথম আমেরিকান ফায়ার ইনসিওরেন্স কোম্পানীর গোড়া পত্তনের জন্যে তিনি সাহায্য করেন। অ্যাকাডেমি অব পেনসিলভেনিয়া প্রতিষ্ঠার জন্যেও তিনি সহায়তা করেন। কালক্রমে সেটিই পেনসিলভেনিয়া ইউনিভার্সিটিতে পরিণত হয়। কলোনীসমূহের মধ্যে ফিলাডেলফিয়া শহর যে খ্যাতি অর্জন করেছিল, তার অনেকখানিই এই মহান পুরুষের প্রভাব-প্রতিপত্তির জন্যে ঘটেছিল। বিজ্ঞান-জগতেও তিনি ছিলেন বিশেষ কৃতিত্বের অধিকারী।

বৈজ্ঞানিক তৎপরতা

আকাশ থেকে তড়িৎ নামিয়ে আনবার কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। ফ্রাঙ্কলিন স্থির তড়িৎ সম্পর্কে যে তত্ত্ব খাড়া করেন, সেটি মূলতঃ খুবই সরল এবং আজ পর্যন্ত তা আমাদের মধ্যে প্রচলিত রয়ে গেছে। তাঁর কথা হলো—যাবতীয় বস্তুই 'সাধারণ জড় পদার্থ' (Common matter) এবং তড়িৎ-ধর্ম সমন্বিত জড়-পদার্থ (Electrical matter) বা তড়িৎ-ধর্ম সমন্বিত তরল পদার্থের (Electric fluid) সমবায়ে গঠিত। স্বাভাবিক অবস্থায় সকল বস্তুর মধ্যেই নির্দিষ্ট পরিমাণ তড়িৎ-ধর্ম সমন্বিত তরল পদার্থ বর্তমান থাকে। যদি তাথেকে কিছু পরিমাণ হারিয়ে যায় বা আরও কিছু পরিমাণ অন্য স্থান থেকে এসে যুক্ত হয়, তবেই বস্তুটি তড়িদাহিত (Charged) হয়ে পড়ে। যদি তড়িৎ-ধর্ম সমন্বিত তরল পদার্থ সংযুক্ত হয়, তবে বস্তুটি ইতিবাচক অর্থাৎ পজিটিভ তড়িদাহিত এবং যদি তড়িৎ-ধর্ম সমন্বিত তরল পদার্থ হারিয়ে ফেলে, তবে সেটি নেতিবাচক অর্থাৎ নেগেটিভ তড়িদাহিত হয়ে থাকে।

আজকের বিজ্ঞানের ভাষাতে আমরা কি বলে থাকি? প্রত্যেক বস্তুর পরমাণুতে প্রোটন ও ইলেকট্রন বর্তমান। সমান সংখ্যক প্রোটন ও ইলেকট্রন বিরাজ করবার ফলে পরস্পরের প্রভাব কাটাকুটি হয়ে যায় অর্থাৎ পরমাণু নিস্তড়িৎ অবস্থায় থাকে। একটি প্রোটন পজিটিভ তড়িতের একটি একক এবং একটি ইলেকট্রন একটি নেগেটিভ তড়িতের একটি এককের মান প্রকাশ করে থাকে। সুতরাং পজিটিভ তড়িদাহিত হওয়াতে ইলেকট্রনের সংখ্যা অপেক্ষা প্রোটনের সংখ্যাধিক্য, যা ইলেকট্রন কমে গেলেই

ঘটে। পক্ষান্তরে, নেগেটিভ তড়িদাহিত হলে প্রোটনের সংখ্যা অপেক্ষা ইলেকট্রনের আধিক্য ঘটে, যা ইলেকট্রনের সংখ্যা বেড়ে গেলেই হতে পারে। সুতরাং উভয় ক্ষেত্রেই তত্ত্বের মূলে হ্রাস-বৃদ্ধির যে ধারণা বর্তমান, সেটি ঠিকই প্রচলিত আছে আজও।

তাঁর তত্ত্বের স্বপক্ষে ফ্রাঙ্কলিন কতকগুলি পরীক্ষা করে দেখান। একখণ্ড কাচের টুক্‌রা রেশমের কাপড় দিয়ে ঘষলে কাচের মধ্যে পজিটিভ ও রেশমের মধ্যে নেগেটিভ তড়িতাধান হাজির হয়। তখন অনেক বিজ্ঞানীই ভাবতেন যে, ঘর্ষণের ফলেই তড়িৎ সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু ফ্রাঙ্কলিন যুক্তিপূর্ণভাবে তাঁদের বোঝাতে চেষ্টা করেন, তড়িৎ সৃষ্টি করা হয় নি, বরং তড়িৎ ধর্ম সমন্বিত তরল পদার্থ রেশম থেকে কাচের মধ্যে পরিচালিত করা হয়েছে ঘর্ষণের ফলে।

তড়িৎ-তরল পদার্থ সংক্রান্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষা প্রদর্শনের ব্যাপারটিকে ফ্রাঙ্কলিন বেশ নাটকীয় করে তোলেন। মেঝের উপর তড়িৎ-অপরিবাহী কাচ রেখে তার উপর ছখানি টুলে ছজন লোককে বসালেন। তাদের একজনকে পজিটিভ তড়িদাহিত করলেন, অর্থাৎ তার মধ্যে তড়িৎ-ধর্ম সমন্বিত তরল পদার্থের আধিক্য ঘটলো। অপর জনকে নেগেটিভ তড়িদাহিত করলেন, অর্থাৎ তার মধ্যে ঘটলো তড়িৎ-ধর্ম সমন্বিত তরল পদার্থের ঘাট্‌তি বা কমতি। যখন লোক ছজন পরস্পরকে স্পর্শ করলো তখন তাদের তড়িতাধান লোপ পেল এবং তারা উভয়েই আঘাত (Shock) পেল। একজনের অধিক তরল অপর জনের ঘাট্‌তি পূরণ করে দিল। কোনরূপ তড়িদাহিত করা হয় নি, এমন কোন লোক পজিটিভ তড়িদাহিত লোকটিকে স্পর্শ করলে বা নেগেটিভ তড়িদাহিত লোকটিকে স্পর্শ করলে উভয় ক্ষেত্রেই সে আঘাত পাবে। যে নেগেটিভ তড়িদাহিত, তার চেয়ে এই লোকটির আধান বেশী এবং যে পজিটিভ তড়িদাহিত তার চেয়ে আধান কম বলে।

তড়িৎ সম্পর্কে অনুশীলন-কার্য পরিচালনা করতে গিয়ে ফ্রাঙ্কলিন তড়িদাকর্ষী দণ্ডের (Lightning rod) উদ্ভাবন করেন। তিনি লক্ষ্য করেন যে, কোন তড়িদাহিত বস্তুর নিকট তীক্ষ্ণাগ্র কোন কিছু রাখলেই সেটি আহিত বস্তুর তড়িৎ আকর্ষণ করে টেনে নেয়। তিনি জানতেন, মেঘমাত্রেই তড়িদাহিত। তিনি তাই প্রস্তাব করলেন, কোন বাড়ীর শীর্ষদেশে তীক্ষ্ণাগ্র লোহার একটি দণ্ড বসানো হোক এবং সেটির সঙ্গে যুক্ত করে একটি তার টেনে এনে মাটিতে পুঁতে রাখা হোক। এই ব্যবস্থার ফলে আকর্ষণের দরুণ দণ্ডটির মধ্য দিয়ে মেঘের তড়িৎ ধীরে ধীরে নেমে আসবে এবং মেঘ নিস্তড়িৎ হয়ে পড়বে—তাহলে সজোরে ও সনিনাদে বজ্রপাত হবে না। নানাবিধ পরীক্ষা করে ফ্রাঙ্কলিন অনুমান করেন যে, মেঘ কখনও পজিটিভ বা কখনও নেগেটিভ তড়িদাহিত হয়ে থাকে। সুতরাং যতবার আকাশ থেকে মাটির দিকে তড়িৎ-মোক্ষণ (Discharge) হয়, ঠিক ততবারই মাটির দিক থেকে আকাশের দিকেও তড়িৎ-মোক্ষণ হয়ে থাকে।

আধুনিক কালে বজ্রপাত সম্পর্কে গবেষণালব্ধ তথ্যাবলীর সঙ্গে তাঁর অনুমানের বেশ মিল রয়েছে।

তড়িতাধান সংগ্রহের আধার হিসাবে 'লিডেন জার' সার্বজনীন স্বীকৃতি লাভ করে। ফ্রাঙ্কলিন সেই লিডেন জার নিয়েও অনুশীলন করেন। এই জার বাইরে দিকে ধাতুর পাতে মোড়া এবং ভিতরে জল ভর্তি একটি সাধারণ কাচের জারবিশেষ। তখন ধারণা ছিল, জলের ভিতরেই তড়িতাধান সংগৃহীত থাকে। কিন্তু এই বিষয়ে তাঁর তৎপরতার ফলাফল প্রকাশিত করে ফ্রাঙ্কলিন তদানীন্তন বিজ্ঞান-জগৎকে চমৎকৃত করেন। তড়িদাহিত লিডেন জারের ভিতর থেকে জল ফেলে দিলেন, আবার নতুন জল দিয়ে ভর্তি করলেন। কিন্তু লিডেন জারটি তখনও তড়িদাহিতই রয়ে গেল। তিনি এভাবে প্রমাণ করলেন যে, তড়িতাধান জলের ভিতর থাকে না, থাকে কাচের ভিতর। এই সব পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলে তিনি 'প্যারাল্যাল প্লেট ক্যাপাসিটর' উদ্ভাবন করেন। এটি আধুনিক যুগে টেলিভিশন ও রেডিও যন্ত্রে প্রয়োগ করা হয়।

ফ্রাঙ্কলিনের কীর্তিগাথা

তাঁর পাণ্ডিত্যপূর্ণ 'এক্সপেরিমেণ্টস্ অ্যাণ্ড অবজারভেশনস্ অন ইলেকট্রিসিটি মেড্ অ্যাট ফিলাডেলফিয়া ইন অ্যামেরিকা' গ্রন্থে তড়িৎ সম্পর্কে যে সকল নীতি ফ্রাঙ্কলিন আবিষ্কার ও রচনা করেন, সেগুলি লিপিবদ্ধ আছে। সারা পৃথিবী জুড়ে এই বৃহৎ গ্রন্থখানি প্রকাশিত হয় এবং জার্মান, ফরাসী ও ইতালীয় ভাষায় অনূদিত হয়। পৃথিবীর অগ্রণী বিজ্ঞানীরা এই গ্রন্থখানিকে স্যার আইজাক নিউটনের 'প্রিন্সিপিয়ার' সঙ্গে তুলনা করে থাকেন। কোন একখানি পত্রিকার মন্তব্য—'ডাঃ ফ্রাঙ্কলিনের পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণাবলী নিয়ে তড়িতের এই 'প্রিন্সিপিয়া' রচিত ও তার উপর ভিত্তি করে যে তন্ত্র রচিত, তা যেমন সরল, তেমনই গভীর।' বিজ্ঞান-জগতের যত সম্মান সম্ভব ছিল, সবই ফ্রাঙ্কলিনের উপর বর্ষিত হয়েছিল। তিনি রয়াল সোসাইটির সদস্য এবং প্যারীর রয়াল অ্যাকাডেমী সায়েন্সের সদস্য নির্বাচিত হন। তড়িতের 'এক তরল পদার্থ' (One fluid) সংক্রান্ত তত্ত্বটিই তাঁর বিশিষ্ট অবদান। আজকাল সকলেই আমরা বলে থাকি, তড়িতের স্রোত মানেই ইলেকট্রনের প্রবাহ—এখনও সেই একটি 'তরল প্রবাহেরই' (Fluid) তত্ত্ব মাত্র।

বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে গবেষণা ও প্রকাশনের কার্যে নিরত থাকলেও জনসাধারণের সঙ্গে জড়িত কাজকর্মের জন্যেও ফ্রাঙ্কলিন সময় বের করতে পারতেন। আমেরিকান বিপ্লব তখন চলছে। কন্টিনেণ্টাল কংগ্রেস টমাস জেফারসন, জন এডামস্ এবং বেঞ্জামিন

ফ্রাঙ্কলিনকে দিয়ে গঠিত একটি কমিটি 'ডিক্লারেশন অব ইণ্ডিপেণ্ডেন্স' নামক দলিলের খসড়া রচনা করেছিল।

আমেরিকার সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক ইতিহাসে ফ্রাঙ্কলিনকে একজন দৈত্যের মত বলবান বীরপুরুষ বলে স্বীকার করা হয়। তড়িৎ সম্পর্কিত তত্ত্বের বিকাশ সাধন করাতে বিজ্ঞান-জগতেও তিনি একজন অগ্রদূতের আসন অলঙ্কৃত করে আছেন।

শ্রীমাধবেন্দ্রনাথ পাল

হবি বা সখের কাজ

বৃত্তিমূলক ও নিয়মিত কাজকর্মের ফাঁকে ফাঁকে অথবা অবসর সময়ে লোকে যে সব নির্দোষ, হাল্কা অথচ আনন্দদায়ক টুকটাক সখের কাজ করে, তাকে ইংরেজিতে বলা হয় 'হবি'।

হবি নানা রকমের হতে পারে, যেমন—গান-বাজনা, ছবি আঁকা, ফটোগ্রাফী, কাঠের কাজ, চামড়ার কাজ, খেলনা তৈরি, বাগান করা ইত্যাদি। একেবারে সাধারণ হবি হলো ডাকটিকেট সংগ্রহ করা। কেউ যদি এসব কাজ ব্যবসা বা আসল বৃত্তি হিসাবে করে, তবে সেটা কিন্তু ঠিক হবির পর্যায়ে পড়ে না। হবি বা সখের কাজ হলো তাই, যা আসল কাজের ফাঁকে অবসর সময়ে খেয়ালখুশিমাফিক করা হয়।

হবি কখনো শিক্ষামূলক, কখনো বা নেহাৎ সখের কাজ। আবার এক এক লোকের এক এক হবি। তোমাদের অনেকেরই হয়তো একটা না একটা হবি আছে। কেউ হয়তো ডাকটিকেট বা অটোগ্রাফ সংগ্রহ করে বেড়াচ্ছ, কেউ বা খেলোয়াড় কিংবা সিনেমা আর্টিষ্টদের ছবি সংগ্রহ করছো। ডাকটিকেটের সংগ্রহ থেকে দেশ-বিদেশের ইতিহাস ও ভূগোল সম্পর্কে জ্ঞান জন্মে। তাছাড়া পুরনো দুর্লভ ডাকটিকেটের চাহিদাও আছে বাজারে—খুব চড়া দরে বেচা-কেনা হয়ে থাকে।

হবি বা সখের কাজে কোন জোর জবরদস্তি নেই। নেহাৎই সখের ব্যাপার ওটা। যার যেমন পছন্দ, যার যেটা ভাল লাগে তাই করা যেতে পারে। আর এই হবি একান্তই অবসর সময়ের কাজ—মনের খোরাক। অবশ্য দেখতে হবে, হবি বা সখের কাজের ফলে আসল কাজের যেন ব্যাঘাত না হয়।

প্রত্যেকেরই একটা কোন হবি থাকা বাঞ্ছনীয়। এতে অবসর সময়টা উপভোগ করা যায়, মনে স্ফূর্তি ও আনন্দ পাওয়া যায়। দৈনন্দিন কাজকর্মে ক্লান্তি বোধ করলে শরীর ও মনের অবসাদ দূর করবে ঐ হবি। রেহাই মিলবে একঘেয়েমি থেকে।

অবশ্য বুড়ো বয়সে ডাকটিকেট কুড়নো কিংবা অন্য কোন ছেলেমানুষি কাজ করা সাজে না। কিন্তু বাগান করা, গান-বাজনা করা, বঁড়শি দিয়ে মাছ ধরা—ইত্যাদির মত হবি তাদের থাকতে পারে।

বিজ্ঞানী আইনষ্টাইন কেবল বিজ্ঞানের চর্চাই করতেন না, অবসর সময়ে বেহালাও বাজাতেন। ওটা ছিল তাঁর হবি। আমাদের দেশের সত্যেন বসুও অবসর পেলেই সেতার বাজিয়ে থাকেন।

ইউরোপে খুবই হবির রেওয়াজ আছে। ইংরেজদের সম্বন্ধে কথা আছে, ওরা 'হবি-হর্স' অর্থাৎ হবির ঘোড়া চড়ে বেড়ায়। বাস্তবিক ওরা হবির কদর বোঝে এবং প্রত্যেকেরই একটা না একটা হবি আছে। এদিকে তেমন ঝোঁক নেই আমাদের দেশের লোকের। যদি মনে করা হয় হবি সময়ের অপব্যবহার ছাড়া কিছু নয়, তবে সেটা ভুল। এতে সাধারণতঃ খরচ নেই বরং লাভ আছে—চাহিদা মেটানো যায়। তাছাড়া মনের আনন্দ তো আছেই। শিক্ষার দিকটাও নিশ্চয় অবহেলা করবার নয়। বাড়্তি গুণ কি ফেলবার জিনিস? আমার এক আত্মীয় ছিলেন ডাক্তার। সারাক্ষণ ব্যস্ত থাকতেন রোগীর চিকিৎসার ব্যাপারে। কিন্তু দেখা যেত—একটু ফুরসুৎ পেলেই তিনি ছুতোরের মত কাঠের কাজ করছেন, তৈরি করছেন টুল, টেবিল, চেয়ার, আলমারী প্রভৃতি। বহুকাল ধরে এই ধরণের কাজ করেছিলেন তিনি। বলতেন, ডাক্তারী করছি প্রয়োজনের তাগিদে, আর এই কাঠের কাজ করছি সখে। অপর এক ভদ্রমহিলাকে জানি, তিনি ঘর সংসারের রান্নাবাড়া, ঝাড়পোঁছ ইত্যাদি যাবতীয় গৃহিণীপণার কাজ করে দিন-রাতে যখনই এতটুকু ফুরসুৎ পান, সেলাইয়ের কাজ নিয়ে বসেন—চিত্র-বিচিত্র কাঁথা সেলাই করেন। এটা ওঁর সখের কাজ এবং এতে ওঁর অপার আনন্দ।

দেখা যাচ্ছে, সখের কাজ বা হবির দৌলতে একটা কিছু প্রয়োজনীয় জিনিষ গড়ে তোলা শক্ত নয়।

হবির প্রয়োজনীয়তা এবং মূল্য জানতেন রবীন্দ্রনাথ। অনেক কাল আগেই তাই তিনি এর ব্যবস্থা করে গেছেন শান্তিনিকেতনে—চামড়ার কাজ, নাচ-গান, ছবি আঁকা, তাঁতের কাজ ইত্যাদি শিক্ষার ব্যবস্থা। যারা শুধু পুঁথিগত বিদ্যাই শিখলো, কিন্তু শিখলো না হাতের কোন কাজ, তারা তো নির্গুণ মানুষ। এদের লক্ষ্য করেই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'বোকা হাতের মানুষ'।

ইদানীং আমাদের দেশের গভর্ণমেণ্ট হবির কার্যকারিতা বুঝতে পেরেছেন এবং এই বিষয়ে দৃষ্টি দিয়েছেন। কলেজে কলেজে, আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয়ে একটা করে 'হবি হাউস' প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে। হবির দিকে ছাত্রছাত্রীদের মন আকৃষ্ট করাই এর উদ্দেশ্য। এতে লেখাপড়া শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে অপর একটা বিদ্যা আয়ত্ত করাও সম্ভব হবে।

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ দত্ত

প্রশ্ন ও উত্তর

প্রঃ ১। (ক) রকেটের জ্বালানী কাকে বলে ?

(খ) ইথার তরঙ্গ কি ?

(গ) বিভিন্ন গ্রহের ভর কি ভাবে মাপা হয় ?

মদনমোহন মুখোপাধ্যায়

উঃ ১। (ক) রকেটের জ্বালানী বুঝতে হলে আগে জানতে হবে, রকেটের ক্রিয়া-পদ্ধতি অর্থাৎ কি ভাবে বা কি কারণে রকেট ঊর্ধ্বে উঠে যায়। কালীপুজার সময় ব্যবহৃত হাউই বাজীর সঙ্গে আমরা পরিচিত। যে কারণে দেওয়ালীর দিনে হাউই শোঁ করে উপরে উঠে যায়, সেই কারণেই রকেটও পায় তার ঊর্ধ্বগতি। হাউই-এর বারুদে আগুন লাগলে ভিতরে প্রচুর পরিমাণে গ্যাস উৎপন্ন হয়। এই গ্যাস একটি ছিদ্র দিয়ে প্রচণ্ড বেগে নীচের দিকে বেরিয়ে আসতে থাকে। নিউটন বলে গেছেন—প্রত্যেক ক্রিয়ারই প্রতিক্রিয়া আছে। সেই প্রতিক্রিয়ার জোরেই হাউই ঊর্ধ্বাকাশে উঠে যায়। রকেটের ব্যাপারও এমনি, তবে সে ক্ষেত্রে বিশেষ ধরণের 'বারুদ' ব্যবহার করা হয়। তাকেই বলে জ্বালানী। এই জ্বালানী হচ্ছে রকেটের প্রাণস্বরূপ।

প্রথম দিকে কঠিন জ্বালানী রকেটে ব্যবহৃত হতো। কিন্তু দেখা গেল, তাকে ইচ্ছামত ঠিকভাবে পোড়ানো বেশ অসুবিধাজনক। তখন রুশ বিজ্ঞানী ৎসিওলভস্কি ও আমেরিকান বিজ্ঞানী গডার্ড তরল জ্বালানী ব্যবহারের প্রস্তাব করেন। ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে ১৬ই মার্চ গডার্ড সর্বপ্রথম তরল জ্বালানী সমন্বিত আধুনিক ধরণের রকেট উৎক্ষেপণে সক্ষম হন। এই পরীক্ষায় গডার্ড পেট্রল ব্যবহার করেছিলেন। তারপর থেকে গবেষণার ফলে আরও নানা জাতীয় তরল পদার্থ জ্বালানী হিসাবে ব্যবহার করা হচ্ছে ; যেমন—নাইট্রিক অ্যাসিড, হাইড্রাজিন, অ্যালকোহল, গ্যাসোলিন ইত্যাদি।

এখন সমস্যা হলো—যে কোন প্রকার জ্বালানীরই জ্বলবার সময়ে অক্সিজেন দরকার। সাধারণ কঠিন জ্বালানী এবং কোন কোন তরল জ্বালানীর ভিতরেই অক্সিজেন থাকে। তাদের জ্বলতে কোন অসুবিধা হয় না। কিন্তু অধিকাংশ তরল জ্বালানীরই জ্বলবার সময়ে আলাদা অক্সিজেন দরকার হয়। এই অক্সিজেন তরল অক্সিজেনরূপে সরবরাহ করা হয়। কাজেই তরল জ্বালানী-চালিত রকেটের মধ্যে দুটি তরল পদার্থ থাকে—একটি প্রকৃত জ্বালানী ও অপরটি তরল অক্সিজেন। আজকাল সমস্ত রকেটেই তরল

জ্বালানীর দ্বারা চালিত হয়। ভবিষ্যতে আরও এক প্রকার জ্বালানী ব্যবহার করা হবে—তা হলো পারমাণবিক শক্তি সমন্বিত জ্বালানী। এই জ্বালানীর শক্তি হবে প্রচণ্ড। আন্তগ্রর্হ পরিভ্রমণে পারমাণবিক জ্বালানী খুব সাহায্য করবে বলে মনে হয়।

১। (খ) আমাদের দৈনন্দিন জীবনে অনেক রকমের তরঙ্গের সঙ্গে আমরা পরিচিত। যেমন—জলের মধ্যে একটা ঢিল ছুঁড়ে দিলে ঢিলটাকে কেন্দ্র করে অসংখ্য তরঙ্গের সৃষ্টি হয়; 'ধানের ক্ষেতে ক্ষ্যাপা হাওয়া'—সেও তরঙ্গের সৃষ্টি করে। এছাড়া কোন রকম শব্দ করলেই বাতাসে শব্দ-তরঙ্গের সৃষ্টি হয়। এই সব ক্ষেত্রেই তরঙ্গ এক জায়গা থেকে অপর জায়গায় প্রবাহিত হয় কোন মাধ্যমের উপর ভর করে; যেমন—প্রথম ক্ষেত্রে এই মাধ্যম হলো জল, দ্বিতীয় ক্ষেত্রে ধানের ক্ষেতে, তৃতীয় ক্ষেত্রে বাতাস। আমরা জানি—যেখানে বাতাস নেই, সেখানে শব্দ শোনা যায় না।

বিজ্ঞানীরা যখন সিদ্ধান্ত করলেন যে, আলোক এক জায়গা থেকে অপর জায়গায় প্রবাহিত হয় তরঙ্গের আকারে, তখন তাঁদের মনে প্রশ্ন দেখা দিল—এই তরঙ্গ কিসের উপর ভর করে চলে? কারণ বায়ুহীন মহাশূন্যের মধ্য দিয়েও আলোক প্রবাহিত হয়ে থাকে। আলোক-তরঙ্গের বিচরণ ক্ষেত্রে মাধ্যমের অভাব স্বভাবতঃই বিজ্ঞানীদের খুব ভাবিয়ে তুললো। এই সমস্যার সমাধানের জন্যে বিখ্যাত ফরাসী বিজ্ঞানী ফ্রেনেল সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ড জুড়ে এক মাধ্যমের কল্পনা করলেন এবং নাম দিলেন ইথার। ফ্রেনেলের মতে এই ইথার সকল স্থানে বিদ্যমান এবং আলোক ইথারের মধ্য দিয়ে তরঙ্গের আকারে প্রবাহিত হয়। ইথার-তরঙ্গ বলতে আমরা এই বুঝি। যাই হোক, এখানে উল্লেখযোগ্য যে, ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে মার্কিনী বিজ্ঞানীদ্বয় মাইকেলসন ও মর্লের পরীক্ষা থেকে নিশ্চিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে যে, ইথারের কোন অস্তিত্ব নেই। আইনষ্টাইন তাঁর আপেক্ষিকতা মতবাদেও ইথারকে বাদ দিয়েছেন।

১। (গ) গ্রহগুলির ভর মাপবার সহজতম উপায় হলো তাদের একটি উপগ্রহের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করা। ধরা যাক, গ্রহটি ও তার উপগ্রহের ভর যথাক্রমে M ও m এবং উপগ্রহটি v গতিবেগে গ্রহের চারদিকে আবর্তন করছে। গ্রহ ও উপগ্রহের মধ্যে দূরত্ব যদি R হয়, তবে আমরা জানি এদের

$$\text{পারস্পরিক আকর্ষণ শক্তি} = G\frac{mM}{R^2}$$

এখানে G একটি ধ্রুবক, যার মান আমাদের জানা আছে। উপবৃত্তাকার পথে আবর্তনের সময়ে সৃষ্ট

$$\text{কেন্দ্রাতিগ শক্তি} = \frac{mv^2}{R}$$

আমাদের এও জানা আছে—এই দুই শক্তি পরস্পর সমান অর্থাৎ

$$G\frac{mM}{R^2} = \frac{mv^2}{R}$$

এথেকে সহজেই দেখানো যায়

$$M = \frac{v^2R}{G}$$

v এবং R জানা থাকলে এই সূত্র থেকে সহজেই গ্রহের ভর M নির্ধারণ করা যায়।

দীপক বসু

বিবিধ

৩ জন মহাকাশচারী ভস্মীভূত

২৮শে জানুয়ারী, কেপ কেনেডি থেকে রয়টার, এ. পি. ও এফ. পি. প্রেরিত সংবাদে প্রকাশ—উৎক্ষেপণ মঞ্চের উপর অতিকায় স্যাটার্ণ রকেট (২১৮ ফুট উঁচু) খাড়া দাঁড়িয়ে রয়েছে। মাথার উপর মহাকাশযান অ্যাপোলো। অ্যাপোলোর একটি বদ্ধ কুঠুরিতে মহাকাশচারী ভার্জিল গ্রিসম, এডওয়ার্ড হোয়াইট ও রোজার শেফি। হঠাৎ রকেটে আগুন ধরে গেল। দেখা গেল, একটি একটি অগ্নিস্তম্ভ আকাশের দিকে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। এমনই আগুনের প্রভা ও তেজ ছিল যে, কেউ সামনে গিয়ে ওদের উদ্ধারের চেষ্টা করতে পারে নি। তিন জন মহাকাশচারী ভস্মীভূত হয়ে গেলেন।

নদীর জলের নিয়মিত রাসায়নিক বিশ্লেষণ

নয়া দিল্লী থেকে ইউ. এন. আই. কর্তৃক প্রচারিত এক খবরে প্রকাশ—সেচ ও বিদ্যুৎ মন্ত্রালয় ভারতের প্রধান প্রধান নদীগুলির কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ স্থানে নদীর জলের নিয়মিত রাসায়নিক বিশ্লেষণ চালাবার সিদ্ধান্ত করেছেন।

কয়েকটি গবেষণা-কেন্দ্র বিশেষ ভাবে সেচ ও অন্যান্য উদ্দেশ্যে নদীর জলের রাসায়নিক অনুসন্ধান চালাচ্ছেন। উত্তর ভারতের নদীগুলির মধ্যে গঙ্গা, গণ্ডক, কোশী ও ব্রহ্মপুত্রে এবং মধ্য ভারতের চম্বল, নর্মদা, তাপ্তী ও যমুনা নদীতে এই রকম অনুসন্ধান চলছে।

সংগৃহীত তথ্যগুলি থেকে মোটামুটি জানা গেছে, উত্তর ভারতের নদীগুলিতে সারা বছর লবণাক্ততা কম, মাসিক ও বার্ষিক তারতম্যও কম এবং জল বেশীর ভাগ ক্ষারযুক্ত (ক্যালসিয়াম ও বাইকারবনেটের ভাগ বেশী)। মধ্য ভারতের নদীগুলিতে লবণাক্ততা শুধু বর্ষাকালেই কম।

কাঁচি-কাটা জল

পাসাডেনা (ক্যালিফোর্নিয়া) থেকে রয়টার কর্তৃক প্রচারিত এক খবরে প্রকাশ—এখানকার কোন বৈজ্ঞানিক এক নতুন ধরণের জল আবিষ্কার করেছেন। এই জল এক পাত্র থেকে অন্য পাত্রে ঢালতে হলে একবার একটু কাৎ করে দিলেই হলো—জল আপনা থেকেই গড়াতে থাকবে। পাত্রটিকে আর কাৎ করে ধরে রাখতে হবে না।

জল গড়ানো বন্ধ করতে হলে দরকার হবে কাঁচির। কাঁচি দিয়ে ফিতে কাটবার মত কেটে দিলে জল গড়ানো বন্ধ হবে।

এই জলের আবিষ্কারক হচ্ছেন ক্যালিফোর্নিয়া টেক্‌নোলজিক্যাল প্রতিষ্ঠানের স্নাতকোত্তর শ্রেণীর ছাত্র ডেভিড জেম্‌স্ (বয়স ২১)। পলিমার আর জলের দ্রবণ নিয়ে পরীক্ষা করতে গিয়ে তিনি ওই কাঁচি-কাটা জল আবিষ্কার করেছেন।

উপগ্রহ মারফৎ সংযোগ রক্ষা

নয়া দিল্লী থেকে পি. টি. আই. কর্তৃক প্রচারিত এক খবরে প্রকাশ—কেন্দ্রীয় সংযোগ-রক্ষা দপ্তরের সচিব শ্রী এল. সি. জেন এক বেতার ভাষণে বলেছেন, ১৯৬৮ সালের মধ্যে ভারত কৃত্রিম উপগ্রহ মারফৎ সংযোগ রক্ষায় নবযুগে প্রবেশ লাভ করবে।

শ্রী জৈন বলেছেন, ভারতের গ্রাউণ্ড ষ্টেশনটি ভারতীয় বৈদেশিক সংযোগ রক্ষা বিভাগ কর্তৃক পুনার ৬০ মাইল উত্তরে আরভিতে স্থাপিত হচ্ছে। ১৯৬৮ সালের মধ্যেই এই কাজ শেষ হবে। এই সময়ের মধ্যেই ভারত মহাসাগরের উপরে কৃত্রিম উপগ্রহের রীলে ষ্টেশনটিও স্থাপিত হবে।

এই সংযোগরক্ষা ব্যবস্থায় টেলিফোন, টেলিগ্রাফ, বেতার এবং টেলিভিশনের ক্ষেত্রে যথেষ্ট সুবিধা হবে।

একটি আবিষ্কার

বোম্বাই থেকে ইউ. এন. আই. কর্তৃক প্রচারিত সংবাদে জানা যায়—সূর্যদেহ থেকে যে নিউট্রন কণিকা বিচ্ছুরিত হয়ে থাকে, পৃথিবীতে সর্বপ্রথম তার সুনির্দিষ্ট প্রমাণ পেয়েছেন টাটা মৌলিক গবেষণা কেন্দ্রের মহাজাগতিক কণিকা-গবেষণা শাখা। এজন্যে তাঁরা একটি নতুন যন্ত্রও উদ্ভাবন করেছেন। সেই যন্ত্রের সহায়তায় ১৯৬৬ সালের ৫ই এপ্রিল তারিখে এই শক্তিশালী মহাজাগতিক কণিকা ধরা পড়েছে।

সে দিন সূর্যদেহের আধখানা জুড়ে তখন বিস্ফোরণ চলছিল। একটি বেলুনে ইলেকট্রনিক ডিটেক্টর রেখে সেটিকে পাঠিয়ে দেওয়া হলো মহাকাশে। ডিটেক্টর ঠিকই ধরে ফেললো, সূর্যদেহে বিস্ফোরণের কালে সেখানে যে মহাপ্রলয় ঘটছে, তারই সুযোগে গুচ্ছ গুচ্ছ নিউট্রন কণিকা মহাকাশে ছড়িয়ে পড়ছে।

গবেষণা সংস্থার একজন মুখপাত্র সম্প্রতি বলেন, নিউট্রন খুঁজে পেয়ে আমরা শুধু সূর্যকেই ভাল করে চিনলাম না, মহাকাশ-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও নতুন সম্পদ সংগৃহীত হলো।

মহাকাশে নিউট্রনের সন্ধান লাভের জন্যে আর একবারও ভারতীয় বিজ্ঞানীরা চেষ্টা করেছিলেন—১৯৬২ সালে। সেবার বেলুনে করে ফটোগ্রাফির প্লেট পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু কোন কাজেই আসে নি। তারপর চার বছর ধরে চেষ্টা চললো নতুন একটি যন্ত্র উদ্ভাবনের। অবশেষে গত এপ্রিল মাসে নতুন যন্ত্রটিকে বেলুনে করে পাঠিয়ে দেওয়া হলো।

বিজ্ঞপ্তি

১৯৫৬ সালের সংবাদপত্র রেজিষ্ট্রেশন (কেন্দ্রীয়) রুলের ৮নং ফরম অনুযায়ী বিবৃতি :—

১। যে স্থান হইতে প্রকাশিত হয় তাহার ঠিকানা—বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ, ২৯৪/২।১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা-৯

২। প্রকাশনের কাল—মাসিক

৩। মুদ্রাকরের নাম, জাতি ও ঠিকানা—শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস, ভারতীয়, ২৯৪/২।১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা-৯

৪। প্রকাশকের নাম, জাতি ও ঠিকানা—শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস, ভারতীয়, ২৯৪/২।১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা-৯

৫। সম্পাদকের নাম, জাতি ও ঠিকানা—শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য, ভারতীয়, ২৯৪/২।১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা-৯

৬। স্বত্বাধিকারীর নাম ও ঠিকানা—বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ, (বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান বিষয়ক সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান), ২৯৪।২।১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড কলিকাতা-৯

আমি, শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস, ঘোষণা করিতেছি যে, উপরিউক্ত বিবরণসমূহ আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে সত্য।

স্বাক্ষর—শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস

প্রকাশক—'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' মাসিক পত্রিকা

তারিখ—৭-২-৬৭

এই সংখ্যার লেখকগণের নাম ও ঠিকানা

১। বীরেন্দ্রকুমার চক্রবর্তী
বিড়লা ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল অ্যাণ্ড
টেকনোলজিক্যাল মিউজিয়াম
১৯।এ, গুরুসদয় রোড,
কলিকাতা-১৯

২। স্বপনকুমার চট্টোপাধ্যায়
৫২/৮, ব্যানার্জী পাড়া রোড,
কলিকাতা-৪১

৩। অরুণকুমার রায়চৌধুরী
বসু বিজ্ঞান মন্দির
৯৩।১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড,
কলিকাতা-৯

৪। বিশ্বরঞ্জন নাগ
ইনষ্টিটিউট অব রেডিও ফিজিক্স
অ্যাণ্ড ইলেকট্রনিক্স
বিজ্ঞান কলেজ
৯২, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড,
কলিকাতা-৯

৫। শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ দত্ত
৬।২, বিজয়গড়,
কলিকাতা-৩২

৬। শ্রীমাধবেন্দ্রনাথ পাল
M. I. G. Housing Estate
Flat-7
37, Belgachia Road
Calcutta-37

৭। দীপক বসু
ইনষ্টিটিউট অব রেডিও ফিজিক্স অ্যাণ্ড
ইলেকট্রনিক্স, বিজ্ঞান কলেজ,
কলিকাতা-৯

সম্পাদক—শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য
শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস কর্তৃক ২৯৪।২।১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড হইতে প্রকাশিত এবং গুপ্তপ্রেস
৩৭।৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা হইতে প্রকাশক কর্তৃক মুদ্রিত

আচার্য স্মবোধচন্দ্র মহলানবিশ

জন্ম—৪ঠা মার্চ, ১৮৬৭; মৃত্যু—৩১শে জুলাই, ১৯৫৩।

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

বিংশতি বর্ষ | মার্চ, ১৯৬৭ | তৃতীয় সংখ্যা

আচার্য সুবোধচন্দ্র মহলানবিশ

রুদ্রেন্দ্রকুমার পাল

শতাধিক বছর আগে প্রাতঃস্মরণীয় আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় এক শুভক্ষণে সুদূর প্রতীচ্য থেকে আহরণ করে এনেছিলেন যে জ্ঞানের উজ্জ্বল শিখা, তাথেকে স্ফুলিঙ্গগুলি কালক্রমে এবং বংশ-পরম্পরায় প্রথমে একে একে এবং পরে বহু হয়ে প্রোজ্জ্বল দীপশিখার আকারে আত্মপ্রকাশ করে আজ শুধু বাংলা দেশেই নয়, সমগ্র ভারতের বুকে এক অভূতপূর্ব দীপান্বিতায় পর্যবসিত হয়েছে। আচার্যদেবের শিষ্য, প্রশিষ্য ও আরো অধস্তন শিষ্যেরা আজ পৃথিবীর সর্বত্র শ্রেষ্ঠ রাসায়নিকরূপে সম্মানিত। ঠিক একই ভাবে আমরা আর একজন মহাপুরুষ আচার্যের নাম করতে পারি, তিনি হচ্ছেন বাংলা দেশ, তথা সমগ্র ভারতবর্ষের শারীরবিদ্যার জনক, অধ্যাপক সুবোধচন্দ্র মহলানবিশ মহাশয়। আকারে, বেশভূষায় ও জীবনধারায় দু'জনের মধ্যে ছিল আকাশ-পাতাল পার্থক্য, কিন্তু সৃজনী প্রতিভায়, শিক্ষার ক্ষেত্রে নিষ্ঠা এবং হৃদয়বত্তায় দু'জনে ছিলেন একই পথের পথিক। যে সকল তরুণ শিক্ষার্থী একবার তাঁদের সংস্পর্শে এসেছে, তারা তৎক্ষণাৎ মন্ত্রমুগ্ধের মত আকৃষ্ট হয়েছে, লোহা যেমন আকৃষ্ট হয় চুম্বকের দ্বারা তেমনি, আর তারাও তাঁদের পদপ্রান্তে বসে শুধু বিদ্যার্জনই করে নি, অভিসিঞ্চিতও হয়েছে চিরজীবনের মত তাঁদের অন্তরের পূত স্নেহধারায়। আচার্য সুবোধচন্দ্র মহলানবিশের স্নেহধন্য আমি তাঁর জীবন-কথা লিখতে বসি নি, আমার স্মৃতির মণিকোঠায় আচার্যদেব সম্বন্ধে যে কয়েকটি

বিশিষ্ট ঘটনা স্বর্ণাক্ষরে উজ্জ্বল হয়ে ফুটে আছে, আজ সে সম্বন্ধেই দু'চারটি কথা বলবো।

আচার্যদেবের সঙ্গে আমার প্রথম ও দ্বিতীয় দুটি সাক্ষাৎ পরীক্ষক ও পরীক্ষার্থী হিসেবে, প্রথম এম. বি বি. এস. ও বি. এস্-সি. পরীক্ষার ক্ষেত্রে। দীর্ঘ দেহ, পরিপাটি বেশভূষা, গম্ভীর পদক্ষেপ, মার্জিত অথচ মোলায়েম কথাবার্তা, ইংরেজ-সুলভ ইংরেজী উচ্চারণ, সব কিছুই মনে রেখাপাত করেছিল এক অনন্যসুলভ ব্যক্তিত্বের নিদর্শনরূপে। মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র হয়েও বি. এস্-সি ও এম. এস-সি পড়বার সুপ্ত বাসনা ছিল মনে। স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের কৃপায় নন্‌কলেজিয়েট ছাত্র হিসেবে বি. এস্-সি. পাশ করা সম্ভব হয়েছিল, তদানীন্তন অধ্যক্ষ লেঃ কর্ণেল বার্ণাডোর আপত্তি সত্ত্বেও। দুর্ভাগ্যক্রমে "বাংলার বাঘ" এবং বার্ণাডো প্রমুখ ইংরেজ অধ্যাপকদের ভীতিস্থল স্যর আশুতোষ ইতিমধ্যে মহাপ্রয়াণ করেছেন। তাই প্রেসিডেন্সী কলেজে শারীরবিদ্যায় এম. এস্-সি. পড়বার আবেদন-পত্র সুপারিশের জন্যে অধ্যক্ষ সাহেবের নিকট নিয়ে গেলে তিনি তা প্রত্যাখ্যান করলেন। অগত্যা অধ্যক্ষের সুপারিশহীন আবেদন-পত্রই দাখিল করতে হলো। যথাসময়ে জানতে পারলাম যে, যথাযথ প্রণালীতে না হবার দরুণ আমার আবেদন-পত্র গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হয় নি, অর্থাৎ এম. এস্-সি. ক্লাসে আমাকে ভর্তি হবার অনুমতি দেওয়া হয় নি। এক দারুণ হতাশা নিয়ে একদিন সকাল-বেলায় আচার্যদেবের সমাজপাড়ার বাড়িতে গিয়ে দর্শনপ্রার্থী হলাম। কিছুক্ষণ পরেই তিনি আমাকে দোতলার সুসজ্জিত ড্রয়িং রুমে ডেকে পাঠালেন এবং বিশুদ্ধ ইংরেজীতে সুস্নিগ্ধ স্বরে বসতে বলে আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, তিনি আমার জন্যে কি করতে পারেন।

কম্পিত বুকে, শুষ্ক গলায়' ইংরেজীতে কথা বলবার প্রয়াসে হোচট খেতে খেতে বললাম—"একটি সত্য কথা বলবার জন্যে কি আমাকে শাস্তি পেতে হবে স্যর?"

তিনি একটু বিস্মিতভাবে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন—"কি রকম?" "আমি নন্‌কলেজিয়েট ছাত্র হিসেবে পরীক্ষা দিয়ে ভাল-ভাবে সম্মানের সঙ্গে বি. এস্-সি. পাশ করেছি। যদি সে হিসেবেই ভর্তি হবার জন্যে দরখাস্ত দিতাম, আর আমি যে মেডিক্যাল কলেজে পড়ি তা যদি ইচ্ছাক্রমে গোপন রাখতাম, তাহলে তো আমার আবেদন গ্রাহ্য হতো! তাথেকেই প্রমাণিত হচ্ছে যে, সত্য গোপন না করবার জন্যেই আমাকে শাস্তি পেতে হলো। আমি আপনার কাছে সুবিচারের জন্যে এসেছি।"

তিনি এক মুহূর্ত চিন্তা করে বললেন—"তাই তো, সে কথাটা তো মনে আসে নি, আমরা গতানুগতিকভাবেই তোমার আবেদন অগ্রাহ্য করেছিলাম, তারই মধ্যে যে আর একটা বিশেষ দিক থাকতে পারে, তা তখন ভেবে দেখি নি। সত্যি কথা বলবার জন্যে শাস্তি পাওয়া কখনই উচিত নয়। দেখি আমি কি করতে পারি।"

ধন্যবাদ জানিয়ে আমি বাড়ি চলে এলাম, আর সে মুহূর্তে তাঁর প্রশান্ত মুখের দিকে তাকিয়ে মনে হলো, আমার প্রতি সুবিচারের আবেদন বোধ হয় নিষ্ফল হবে না। হলোও তাই। তিন দিন পরে আমি চিঠি পেলাম নির্দিষ্ট সংখ্যক সীটেরও অতিরিক্ত আর একটি সীটে আমার ভর্তি হবার আবেদন মঞ্জুর হয়েছে। এতদিন দূরে ছিলাম, মনে হলো এবার যেন একটি বিরাট মহীরুহের শীতল ছায়ায় এসে আশ্রয় লাভ করলাম। ষষ্ঠ বার্ষিক শ্রেণীতে পড়বার সময়েই তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজের শারীরবিদ্যার অধ্যাপকের পদ থেকে অবসর গ্রহণ করেন। বিদায়-সম্বর্ধনা সভায় ভাষণ

দিতে গিয়ে তাঁর চোখ অশ্রুসজল ও কণ্ঠ এত ভারাক্রান্ত হয়ে উঠেছিল যে, বার বার তাঁর মুখে চির সাবলীল কথাগুলিও যেন অস্ফুট শোনাচ্ছিল। আর অশ্রুসজল নেত্রে আমাদেরও মনে হচ্ছিল যেন আমাদের স্নেহময় পিতৃতুল্য আচার্যদেব চিরতরে আমাদের কাছে বিদায় নিচ্ছেন।

কয়েক মাস পরে মাত্র কয়েক দিনের ব্যবধানে একই সঙ্গে এম. বি, বি. এস ও এম. এস-সি. পরীক্ষায় পাশ করে শেষ পরীক্ষার ফল বের হবার আগেই সুদূর মধ্যভারতের ইন্দোর মেডিক্যাল স্কুলে শিক্ষকের কাজ নিয়ে চলে যেতে হলো। মনে অফুরন্ত আকাশচুম্বী উচ্চাশা, কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় সাধ যত ছিল, সাধ্য ছিল সে তুলনায় নগণ্য। তাই উচ্চশিক্ষার জন্যে বিলেতে যাবার আশার মরীচিকায় ইন্দোর থেকে কলকাতা ছুটাছুটি আরম্ভ করলাম, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের "ঘোষ ট্র্যাভেলিং ফেলোশিপ" বৃত্তি লাভের আশায়। ঐ উদ্দেশ্যে আচার্যদেবের সঙ্গে দেখা করলে তিনি পরামর্শ দিলেন, ঐ কমিটির সদস্যদের সকলের সঙ্গে দেখা করতে। মে মাসের কাঠফাটা রোদ মাথায় করে আরম্ভ হলো আমার সদস্যদের দোরে দোরে ধর্ণা দেওয়া। সকলেই আশা দিলেন, কিন্তু যথাসময়ে দেখা গেল যে, তা নিতান্ত মৌখিক ভদ্রতা ছাড়া আর কিছুই নয়। মীটিং-এর দিন সন্ধ্যায় আচার্যদেবের সঙ্গে দেখা করে জানতে পারলাম, ঘোষ অধ্যাপকেরা সকলে একযোগে আমার বিরুদ্ধে গেছেন; আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রও হঠাৎ খুলনায় চলে যেতে বাধ্য হয়ে মীটিং-এ আসতে পারেন নি, ফলে আমি ভোট পেয়েছি মোটে তিনটি—আচার্যদেবের, অধ্যক্ষ হেরম্ব মৈত্র মহাশয়ের এবং তদানীন্তন শিক্ষাবিভাগের অধিকর্তা ষ্টেপলটনের। আচার্যদেব আরও বললেন—"জীবনে কখনও ষ্টেপলটন ও আমার মতৈক্য হয় নি, কিন্তু বিস্ময়ের সঙ্গে দেখলাম, তোমার বিষয়ে আমরা অভিন্ন মত। অধ্যক্ষ মৈত্রও তোমার খুবই প্রশংসা করেছেন। কিন্তু ষ্টেপলটন ভোটের ফল দেখে বিরক্ত হয়ে তৎক্ষণাৎ সভাস্থল ত্যাগ করতে করতে বলে গেলেন যে, তাঁর হাতে যদি কোন ষ্টেট স্কলারশিপ থাকে তাহলে তোমাকে দিয়ে বিলেত যাওয়ার সাহায্য করবেন। তোমার হয়ে এতখানি ওকালতি তিনি করে গেছেন, সুতরাং কালই তুমি তাঁর কাছে গিয়ে তাঁকে ধন্যবাদ দিয়ে এস, হয়তো তোমার জন্যে তিনি কিছু করতে পারবেন। আর আমার কথা ঘুণাক্ষরেও তাঁকে বলো না, তাতে খারাপ হতে পারে।"

পরদিনই রাইটার্স বিল্ডিং-এ ষ্টেপলটন সাহেবের সঙ্গে আচার্যদেবের পরামর্শমত দেখা করতে গেলে তিনি আমার সঙ্গে অতি সদয় ব্যবহার করে সান্ত্বনার সুরে বললেন—"মাই বয়, হতাশ হয়ো না। আমি আজই খোঁজ করেছিলাম ষ্টেট স্কলারশিপ খালি আছে কিনা, কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় বিজ্ঞানের ফেলোশিপ আগামী বছরে খালি হবে, সে পর্যন্ত তুমি অপেক্ষা কর, আমি যদি সে পর্যন্ত এই পদে থাকি, তবে নিশ্চয়ই তোমাকে সাহায্য করবো।"

কৃতজ্ঞচিত্তে শিক্ষা-বিভাগের অধিকর্তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে বিফল মনোরথ হয়ে ইন্দোরে ফিরে এলেও আমার মনে এক গভীর সন্তোষ বিরাজ করছিল এই জেনে যে, আমার পূজনীয় আচার্যদেব ছাড়াও আরো দুজন মনীষীর প্রশংসা ও স্নেহলাভে আমি ধন্য হয়েছি।

ইংরেজীতে একটি প্রবাদ বাক্য আছে, 'বার বার বিফলতা সাফল্যের স্তম্ভ।' রবার্ট ব্রুসের দৃষ্টান্ত দিয়ে এসম্বন্ধে পরীক্ষার খাতায় প্রবন্ধ লিখেছি, কিন্তু ঐরূপ অঘটন অর্থাৎ ঐ প্রবাদ বাক্যের সত্যতা যে আমার জীবনেও ঘটতে পারে, তা আগে কোন দিন স্বপ্নেও ভাবি নি। ফেলোশিপ লাভে দু'-দু'বারের চেষ্টায় বিফল হয়ে যখন আমি হতাশচিত্তে আশার মরীচিকার পশ্চাতে আর ছুটবো না বলে প্রতিজ্ঞা

করলাম, তখনই সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে মাতৃতুল্যা অনাত্মীয়া একজন মহিলা আপনি এগিয়ে এলেন বিনা সর্তে আমার বিদেশে গিয়ে শিক্ষার জন্যে সাহায্যার্থে। যথাসময়ে সুখবরটি জানালাম আচার্যদেবকে। তিনিও আনন্দ প্রকাশ করে আশীর্বাদ করলেন। চেষ্টা চলতে লাগলো আমার দিক থেকে বিলাত যাত্রার।

কথায় বলে সৎকার্যের পথে অশেষ বাধা। পদে পদে নানা বাধার সম্মুখীন হতে হলো। পশ্চিম বঙ্গ থেকে পাশপোর্ট পাওয়া গেল না, বাড়ি থেকে বাবার অনুমতি পাওয়া গেল একান্ত দুঃসাধ্য সর্তাধীনে। এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিখ্যাত অধ্যাপক স্যর এডোয়ার্ড শার্পিশেফারকে চিঠি লিখেছিলাম, তাঁর তত্ত্বাবধানে গবেষণার অনুমতির জন্যে। তিনি লিখলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণাগারে মেরামতের কাজ চলেছে, সুতরাং সে সময় স্থানাভাব। তার উপর ভাইদের পড়াশুনার ব্যয় সংকুলানের ভাবনাও কম নয়। কিন্তু ভগবান যখন সদয় হন, তখন দুর্লঙ্ঘ্য বাধার প্রাচীরও ভেঙে খান খান হয়ে যায়, আর হলোও তাই। মধ্যভারতের হর্তাকর্তা স্যর রেজিনাল্ড গ্ল্যান্সীর দয়ায় মধ্যভারত থেকে পাশপোর্ট পাওয়া গেল। বাবার উপর'ওলা হাইকোর্টের বিচারে অর্থাৎ ঠাকুর্দার নিকট থেকে বিনাসর্তে পাড়ি দেবার অনুমতি পাওয়া গেল। ভাইদের দু'জনই পরীক্ষায় খুব ভাল ফল করে একাধিক স্কলারশিপ পেয়ে গেল। সুতরাং শেষ মুহূর্তে এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ে সীট না পাওয়া সত্ত্বেও জাহাজের প্যাসেজ বুক করে ফেললাম এই ভেবে যে, যখন এত বাধাই দূর হয়ে গেল, তখন ওটাও দূর হবেই হবে।

কলম্বো থেকে বিদেশ যাত্রার আগে একবার বাড়িতে যাবার পথে কলকাতায় এলাম এবং আচার্যদেবের সঙ্গে দেখা করে তাঁর সাহায্য-প্রার্থী হলাম। তিনি তৎক্ষণাৎ সানন্দচিত্তে অধ্যাপক শার্পিশেফারের নিকট ব্যক্তিগত চিঠি দিলেন এই বলে যে, শেফার তাঁর বহু দিনের পুরনো বন্ধু; যখন তিনি কার্ডিফে অধ্যাপক ছিলেন তখন শেফার এক্সটারন্যাল পরীক্ষকরূপে নাকি লণ্ডন থেকে আসতেন। সুতরাং তাঁর কথায় এবং হাতে ঐ চিঠিখানি পেয়ে আমি মেঘাচ্ছন্ন অন্ধকার আকাশে যেন বিদ্যুচ্ছটা দেখতে পেলাম। বিদায় মুহূর্তে প্রণাম করে হাত বাড়িয়ে পদধূলি মাথায় নিলাম, আর তিনিও হাত বাড়িয়ে একেবারে বুকের মধ্যে আমাকে টেনে নিয়ে মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করলেন। গুরু-শিষ্যের প্রথম নিবিড় আলিঙ্গন গঙ্গা-যমুনার মিলনে প্রয়াগ তীর্থে পরিণত হলো।

১৯২৯ সালের ২৬শে সেপ্টেম্বর লণ্ডনে পৌঁছে সেই রাত্রিতেই রওনা হয়ে আমার গন্তব্যস্থল এডিনবরায় পরদিন সকাল বেলায় পৌঁছাই। প্রাতরাশ শেষ করেই ছুটে যাই অধ্যাপক শার্পিশেফারের সঙ্গে দেখা করতে ইউনিভার্সিটিতে। বহু দর্শন-প্রত্যাশী অপেক্ষা করছিলেন তাঁর সঙ্গে দেখা করবার জন্যে, তবু অবাক হয়ে গেলাম, যখন অধ্যাপক মহলানবিশের পত্রখানা পাওয়া মাত্র আমাকে তিনি ডেকে পাঠালেন সকলের আগে। আমাকে বসতে বলে প্রথমেই আচার্যদেব সম্বন্ধে তাঁর কুশল বার্তা ও অন্যান্য অনেক কিছু জানতে চাইলেন। তারপর বললেন—"আমার মনে আছে, তোমাকে এখন আসতে বারণ করেছিলাম, কারণ বাড়ি মেরামতের জন্যে লেবরেটরিতে স্থানাভাব; তবু যখন এসে পড়েছ, আর আমার খুবই প্রিয় বন্ধু মহলানবিশ তোমার সম্বন্ধে যে ভাবে লিখেছেন, তাতে তোমাকে প্রত্যাখ্যান করা অন্যায় হবে; আর বিশেষতঃ তুমি যখন এত আগ্রহশীল যে, একুশ দিন জাহাজে থেকে লণ্ডনে পৌঁছে এক দিনের জন্যেও লণ্ডনে বিশ্রাম না করেই কার্যস্থলে ছুটে এসেছ।" অধ্যাপক শার্পিশেফারকে ধন্যবাদ ও

কৃতজ্ঞতা জানালাম এবং মনে মনে বহুদূরে অবস্থিত আচার্যদেবকে প্রণাম জানালাম, কারণ শুধু তাঁরই সুপারিশের জোরে আমি স্থান পেলাম বিশ্ববিখ্যাত শারীরতত্ত্ববিদ সার্পিশেফারের গবেষণাগারে ছাত্র হিসেবে।

বছর তিন গড়িয়ে গেল—পাটনা মেডিক্যাল কলেজের অধ্যাপকরূপে ১৯৩২ সালে প্রথম কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষক হিসেবে এলাম আচার্যদেবের সহযোগী হয়ে। তখন তিনি কারমাইক্যাল মেডিক্যাল কলেজের অধ্যাপক। এক বছর আগে বিলেত থেকে ফিরে এসে তাঁকে প্রণাম করে আশীর্বাদ পেয়েছিলাম. আবার পেলাম সহ-পরীক্ষক হিসাবে। গুরু-শিষ্যের এভাবে বছরে দুই বা ততোধিকবার দেখা ও সহযোগিতা হতে লাগলো বহু বছর ধরে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শারীরবিদ্যার পরীক্ষার ক্ষেত্রে।

১৯৩৩ সালে আবার তাঁর আশীর্বাদ পেলাম আমার বিবাহ-বাসরে। তিনি সেখানে আমার শ্বশুর বাড়িরও নিমন্ত্রিত অতিথি ছিলেন। সেখানেই আমাকে আশীর্বাদ করে বললেন—"তোমার ভাইও তোমাদের পক্ষ থেকে নিমন্ত্রণ পত্র দিয়ে এসেছে আমাকে। কিন্তু আমি আশা করেছিলাম যে, তুমি নিজেই এসে ঐ সুখবরটি আমাদের দেবে।" স্নেহময় পিতৃতুল্য অধ্যাপকের অভিমান হবে, তাতে আর আশ্চর্য কি? ত্রুটির জন্যে মার্জনা ভিক্ষা করলাম।

বিয়ের কয়েক দিন পরে যখন দ্বিরাগমনে পাটনা থেকে কলকাতায় এলাম, তখন তিনি নিমন্ত্রণ করে তাঁর নিউ পার্ক স্ট্রীটের বাড়িতে নিয়ে গিয়ে আমাকে ও আমার পত্নীকে দুটি সোনার হাফ গিনি দিয়ে আশীর্বাদ করলেন। শ্রদ্ধেয়া আচার্যপত্নী মণিকাদেবী আমার পত্নীকে বুকে জড়িয়ে ধরে বললেন—একদিকে তুমি ছিলে আমার ভাইঝি, অন্যদিকে আমার বৌমা হলে।

১৯৩৫ সালে যখন মরণাপন্ন অসুখে পড়ে কলকাতায় তালতলার বাড়িতে ছিলাম শয্যাশায়ী, তখন কতদিন আচার্যদেব কলেজ থেকে ফেরবার পথে দেখে গেছেন আমাকে এবং অচিরে যাতে ভাল হয়ে উঠি, তার জন্যে আশীর্বাদ করে গেছেন। তারপর ডাক্তারদের পরামর্শক্রমে কলকাতা ছেড়ে কেবল স্বাস্থ্যলাভের জন্যে যেতে হলো কাজ নিয়ে সুদূর কুন্নুরে এবং সেখান থেকে নয়া দিল্লীতে। ১৯৩৯ সালে যখন আবার পৃথিবী-ব্যাপী দ্বিতীয় মহাসমর আরম্ভ হলো, তখন কাজ ছেড়ে আবার কলকাতায় ফিরে এলাম এবং স্থায়ীভাবে বালিগঞ্জ প্লেসের নিজ আবাস-ভবনে বাস করতে আরম্ভ করলাম। সেখান থেকে আচার্যদেবের বাসভবন খুবই কাছে। সুতরাং এতদিনে দূরত্বের ব্যবধান কেটে গিয়ে এল নিকটতর মেলামেশার সুযোগ। যখনই সুযোগ পেতাম আচার্যদেব ও পিসীমার কাছে ছুটে যেতাম, আর তাঁরাও পুত্রকন্যাধিক স্নেহে আমাদের কাছে টেনে নিতেন। কোন কারণে কয়েক দিন তাঁদের কাছে না গেলে, হয় টেলিফোন করতেন 'কেমন আছ?' আর নয়তো এক বাক্স ভীম নাগের সন্দেশ পাঠিয়ে দিতেন—যার নিগূঢ় মানে, তোমাদের দেখতে বড় ইচ্ছে, তাড়াতাড়ি এসো। লজ্জিত হয়ে তৎক্ষণাৎ ছুটে যেতাম তাঁদের কাছে, অনাবিল স্নেহধারায় অভিসিঞ্চিত হতে। আচার্যদেব প্রায়ই বলতেন, 'বৌমা বহুদিন তোমার গান শুনি নি।' প্রতিমাকে তখনই গিয়ে অর্গ্যানের কাছে বসে অন্ততঃ গোটা পাঁচ-ছয় গান গাইতে হতো। একদিন বললেন—"তোমাদের কোন ছবি আমাদের কাছে নেই, একখানা দিয়ে যেও, যাতে সর্বদা তোমাদের সান্নিধ্য অনুভব করতে পারি।" ফটোখানা পেয়ে ৪।১১।৪৪ তারিখে পিসীমা লিখলেন,

90 Park Street.
(Circus P. O)
Calcutta, 4.11.44

পরম স্নেহের প্রতিমা,

তোমাদের ছবিখানি পেয়ে কত সুখী হয়েছি বলতে পারি না। এতদিন লিখতে পারি নাই বলিয়া অত্যন্ত লজ্জিত আছি। আশা করি ক্ষমা করিবে। আমার ইচ্ছা ছিল নিজে গিয়ে তোমাদের আশীর্বাদ করে আসব, কিন্তু তাহার সুবিধা করতে পারছি না। তাই আরও লিখতে দেরী হইল। তোমাদের ছবিখানি আমাদের ঘরে সাজানো আছে, সকলের দেখে খুব ভাল লাগছে। মনে মনে তোমাদের অনেক আশীর্বাদ করছি।

আশা করি দুজনে বেশ ভাল আছ।

আমাদের উভয়ের স্নেহাশীর্বাদ দুজনে গ্রহণ করিও।

শুভাকাঙ্খিণী
পিসিমা

ইতিমধ্যে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে শারীর-বিদ্যার জন্যে স্নাতকোত্তর বিভাগ খোলা হয়েছিল এবং আচার্যদেবকে কারমাইক্যাল মেডিক্যাল কলেজে অধ্যাপক থাকা সত্ত্বেও বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক পদে নিয়োগ করা হয়েছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয়, শারীরিক অক্ষমতাহেতু তিনি বেশী দিন ঐ কর্মভার বহন করতে পারেন নি এবং ১৯৪২ সালে অবসর গ্রহণ করেন। আমি তখন ঐ বিভাগে পার্ট-টাইম শিক্ষক। সেই বিদায়-সম্বর্ধনা সভায় সভাপতিত্ব করেন ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয়। বিদায় সম্ভাষণের উত্তরে সে দিন পূজনীয় আচার্যদেব অতি প্রাঞ্জল বাংলা ভাষায় যে বক্তৃতা করেন, তাতে অনেকেই বিস্মিত হয়েছিলেন। তিনি সর্বদাই এত সুন্দর ইংরেজী বলতেন এবং সকলের সঙ্গে সর্বদা ইংরেজীতে কথাবার্তা বলতেন (অবশ্য ঘরোয়াভাবে আমরা কয়েক জন তার ব্যতিক্রম) যে, অনেকের মনে ধারণা ছিল যে, তিনি বাংলা ভাষায় লিখতে বা বক্তৃতা করতে পারেন না। কিন্তু সেদিন তিনি প্রমাণ করলেন যে, তিনি সব্যসাচী। ডক্টর শ্যামা-প্রসাদ তাঁর সভাপতির ভাষণে অনুরোধ জানালেন যে, অবসর গ্রহণের পর আচার্যদেব যেন বাংলা ভাষায় শারীরবিদ্যা সম্বন্ধে একখানি প্রামাণ্য পাঠ্যপুস্তক লিখে দেন; কারণ সুদীর্ঘ পঞ্চাশ বছরের শিক্ষকতায় অভিজ্ঞ যে শিক্ষক এমন সুন্দরভাবে বাংলা বক্তৃতা করতে পারেন, কেবল তিনিই এরূপ দুরূহ কাজ করতে পারেন, এই তাঁর বিশ্বাস।

আচার্যদেবের নিকট থেকে একটু দূরে আমি দাঁড়িয়েছিলাম, তিনি হাতছানি দিয়ে ডেকে এনে আমাকে ডক্টর শ্যামাপ্রসাদের কাছে উপস্থিত করে বললেন—"অনুরোধটি নিশ্চয়ই রক্ষিত হবে, কিন্তু তার ভার আমি দিলাম আমার এই উপযুক্ত শিষ্যের উপর।"

শ্যামাপ্রসাদ বললেন—"আপনি কি পারবেন এ ভার নিতে।"

আমি উত্তর করলাম—"আচার্যদেবের আশীর্বাদে এবং আপনার শুভেচ্ছায় আমি নিশ্চয়ই পারবো।"

গুরুর কথার মর্যাদা রাখতে আমি এক বছর অক্লান্ত পরিশ্রম করে বাংলা ভাষায় "শারীরবিদ্যা" পুস্তিকাখানি রচনা করে ডক্টর শ্যামাপ্রসাদের হাতে দিই এবং তা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ১৯৫০ সালে প্রকাশিত হয়। ফলে পেলাম আচার্যদেবের আশীর্বাদ, ডক্টর শ্যামাপ্রসাদের অকুণ্ঠ প্রশংসা এবং সম্পূর্ণ অযাচিতভাবে দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৫১ সালের নরসিংদাস বাংলা পুরস্কার। আচার্যদেব আবার আশীর্বাদ করলেন।

১৯৪৩ সালে গুরুদেব কারমাইক্যাল মেডিক্যাল কলেজ থেকেও অবসর গ্রহণ করলেন। তখন জোর লড়াই চলছে, কৃতবিদ্য শিক্ষকেরা অনেকেই যুদ্ধে অংশ গ্রহণে চলে গেছেন দূর দূরান্তরে। যে কোন একজনের পক্ষে আচার্যদেবের

পরিত্যক্ত আসনের মর্যাদা রক্ষা করা সম্ভবপর নয় বলে যুগ্মভাবে যে দু'জনের উপর তার দেওয়া হলো, তাঁদের দু'জনের মধ্যে চললো রেষারেষি এবং ঝগড়াঝাঁটি। অত্যন্ত বিব্রতভাবে ঐ কলেজের কর্তৃপক্ষ শরণাপন্ন হলেন আচার্যদেবের উপযুক্ত পরামর্শের জন্যে। আচার্যদেব বললেন—"এই অবস্থায় বিভাগটি চালাবার সম্পূর্ণ যোগ্যতা আছে আমার জানা একটি লোকের—(এই বলে আমার নাম উল্লেখ করলেন), তাকেই আপনারা সাদরে ডেকে আনুন।" আমি তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর বিভাগে শিক্ষক, সুতরাং কারমাইক্যাল মেডিক্যাল কলেজের সাদর আহ্বান পেয়ে বিব্রতবোধ করে আচার্যদেবের কাছে ছুটে গেলাম। তিনিও বললেন যে, তাঁরও ইচ্ছা আমি তাঁরই মত একই সঙ্গে দুটি পদই গ্রহণ করি। তাঁরই আদেশ শিরোধার্য করে কারমাইক্যাল মেডিক্যাল কলেজের গভর্নিং বডির প্রেসিডেন্ট ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় এবং ইউনিভার্সিটির স্নাতকোত্তর বিজ্ঞান বিভাগের প্রেসিডেন্ট ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের সম্মিলিত ইচ্ছায় আমাকে একই সঙ্গে ঐ দুটি পদের গুরু দায়িত্বভার কাঁধে নিতে হলো। আচার্যদেবের শুধু অনাবিল স্নেহ নয়, এমনি বিশ্বাস ও আস্থা ছিল তাঁর প্রিয় ছাত্রের উপর।

একাধারে নানা গুণ সত্ত্বেও আচার্যদেবের নার্ভগুলির উপর সংবেদনশীল প্রভাবের এত আধিক্য ছিল যে, কোন বিষয়ে পান থেকে চুন খসলে তিনি উত্তেজিত হয়ে পড়তেন। গৃহে প্রতিটি আসবাবপত্র, বই, কাগজপত্র, কাপড়-চোপড় থাকবে অতি পরিপাটিভাবে শৃঙ্খলার সঙ্গে বিন্যস্ত। কোন কারণে তার এতটুকু ব্যতিক্রম ঘটলেও তিনি তা বরদাস্ত করতে পারতেন না। ফলে তাঁকে বিনিদ্র রজনী যাপন করতে হতো। তাঁর মুখে বহুবার শুনেছি যে, শয্যায় শয়ন করলেও তাঁর মনে অনবরত যে সকল চিন্তার অন্তঃপ্রবাহ চলতে থাকতো, তার ফলে নাকি তিনি দীর্ঘ পঞ্চাশ বছর সুনিদ্রা কাকে বলে জানতেন না। পারিপার্শ্বিক প্রতিকূল অবস্থায়ও তিনি একই ভাবে চিন্তিত ও ব্যাকুল হয়ে পড়তেন। সে কারণে ১৯৪২ সালে যখন কলকাতায় দু-দুবার জাপানী বোমা পড়লো, তখন তিনি কলকাতা ছেড়ে সপরিবারে কয়েক মাস বাস করতে গিয়েছিলেন গিরিডিতে তাঁর নিজের বাড়িতে। সে সময়ে প্রায়শঃ তিনি আমার কাছে প্রাঞ্জল বাংলাভাষায় চিঠি লিখে তাঁর তৎকালীন মনোভাব প্রকাশ করতেন। তারপর আবার ১৯৪৬ সালে যখন কলকাতায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার তাণ্ডব চলছে, অদূরে মুসলমানের পাড়া, আর বাড়ির গায়ে আছে মুসলমান গুণ্ডাদের লীলানিকেতন একটি মসজেদ, তাই তখন তিনি তাঁর প্রাসাদোপম বাড়িটি ছেড়ে অন্য কোন হিন্দুপ্রধান পাড়ায় গিয়ে থাকতে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। পিসীমা তাঁর বড় বৌমার সঙ্গে আমাদের বাড়িতে এসে আমাদের কাছে কোন বাড়ি পেলে তাতে এসে থাকবার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। তাঁদের সঙ্গে নিয়ে বহু স্থানে খোঁজ করেছি, কিন্তু ভাল বাড়ির সন্ধান করে উঠতে পারি নি। সুতরাং তাঁরা বাধ্য হয়ে নিজেদের প্রাসাদোপম বাড়িটিকে একজন মুসলমানের কাছে ভাড়া দিয়ে আবার সমাজপাড়ায় তাঁদের পুরনো সংকীর্ণ বাড়ীতে সাময়িকভাবে উঠে গেলেন। যাঁরা কাছে ছিলেন, তাঁরা আবার কতকটা দূরে চলে গেলেন! এসব অস্বস্তিকর টানাপোড়েনের মধ্য দিয়ে একটা সঙ্কটময় কাল শেষ হয়ে এল স্বাধীনতা। কিন্তু দারুণ দুর্বিপাকময় ঝড়ের পর তরুশাখায় বসা কাকের যে অবস্থা হয়, আচার্য-দেব ও পিসীমারও তখন সেই অবস্থা। তাঁরা নিজের বাড়িতে ফিরে এলেও স্বাভাবিক অবস্থা বা মনের ভাব বা শরীরের স্বাস্থ্য ফিরে পেলেন না। দীর্ঘ পঁয়তাল্লিশ বছরের সুখে-দুঃখে জীবনসঙ্গিনী, মূর্তিমতী নিঃস্বার্থ ত্যাগ মণিকাদেবী ১৯৪৭ সালের ৯ই নভেম্বর শোকসন্তপ্ত বৃদ্ধ স্বামী ও তিনটি পুত্রকে

রেখে মহাপ্রয়াণ করলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে আমি তখন সস্ত্রীক ইউরোপে, সুতরাং শেষ মুহূর্তে পিসীমার সঙ্গে দেখা হলো না—সে দুঃখ জন্মের মত থেকে গেল।

১০ই ডিসেম্বর ফিরে এসেই আমরা দেখা করতে গেলাম শোকসন্তপ্ত আচার্যদেবের সঙ্গে। কি দেখলাম, আচার্যদেবের ভাষায়ই বলছি, দেখলাম—"অনতিদূরে বাতাহত একটা প্রকাণ্ডকায় মহুয়া গাছের দুর্দশা···একেবারে শুকনো একটা প্রচণ্ড বাতাসের অত্যাচারে সে বিপন্ন হয়ে সমস্ত ডালপালা আছড়ে প্রতিবাদ করছে। আর তার লক্ষ লক্ষ পুরনো জীর্ণ ও শুষ্ক পাতা চারদিকে বিক্ষিপ্ত হচ্ছে। কয়েক দিনের মধ্যেই এই বিপুল গাছটা পর্ণশূন্য হয়েছে।"

মনের তো এই অবস্থা, শরীরেরও তথৈবচ। তবু শিষ্যের প্রতি বাৎসল্যের কিছুমাত্র হ্রাস নেই। ফেরবার সময় বিলেত থেকে নতুন একখানি "Standard" গাড়ি কিনে সঙ্গে এনেছি জেনে কত খুসী ও কত আশীর্বাদ! বিদায় নিয়ে নীচে এসে যখন গাড়িতে উঠতে যাচ্ছি, উপরে তাকিয়ে দেখি—তিনি অসুস্থ দেহকে লাইব্রেরীতে টেনে এনে জানালায় দাঁড়িয়ে প্রীতিপূর্ণ নেত্রে আমাদের নতুন গাড়িতে প্রবেশ দেখছেন আর শুনতে পেলাম বলছেন—"একদিন তোমাদের নতুন গাড়িতে করে বেড়িয়ে আসবো।" প্রতিটি কথায় যেন স্বর্গীয় স্নেহ ও বাৎসল্য উছলে উঠছে!

তারপরেও তিনি প্রায় ছয় বছর বেঁচেছিলেন, কিন্তু বোধ হয় ঠিক তা বলা চলে না, যেন এক রকম জীবন্মৃত অবস্থাই। শক্তিমানের শক্তি হারিয়ে গেলে যে বিপর্যস্ত অবস্থা—সে অবস্থায়ই তিনি বেঁচেছিলেন। আমরা কাছে গেলে আনন্দ প্রকাশ করতেন, আর বলতেন—"আমি যখন এ জগতে থাকবো না, তখন তোমাদের মধ্যেই বেঁচে থাকবো।" "কলেজের আমার প্রিয় লেবরেটরীর খবর কি? ছোট হলেও ওটা আমাদের বড় প্রিয়। তোমরা সবাই যেন মনে রেখো 'বাসা ছোট হলেও আশা ছোট নহে।' সকলে মিলে এই ডিপার্টমেন্টকে জাঁকিয়ে তোলো, এই আমার প্রাণের আকাঙ্ক্ষা।"

অন্য সময়ে বলতেন—"বিশ্বব্যাপী এই ঘোর দুর্দিনের অবসানে আমাদের দেশের—তথা জগতের নবজীবন লাভ হবে এটা ধ্রুব সত্য। তোমরা তার জন্যে প্রস্তুত হও। আমরা যারা ওপারের জন্যে পা বাড়িয়ে আছি, এই আশা নিয়ে তোমাদের আশীর্বাদ করে চলে যাই।"

১৯৫৩ সালের ৩১শে জুলাই ছিয়াশি বছর বয়সে স্বধর্মনিষ্ঠ স্নেহপ্রবণ আচার্যদেব মরজগৎ ত্যাগ করে প্রায় ছয় বছর পরে অমৃতলোকে তাঁর জীবনসঙ্গিনীর সঙ্গে মিলিত হলেন।

৪ঠা মার্চ (১৯৬৭) তাঁর জন্মশতবার্ষিকীর শুভদিন। অপরিসীম স্নেহধন্য শিষ্য আজ সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞচিত্তে এই মহাপুরুষের পুণ্যস্মৃতি চারণা করে নিজেকে ধন্য মনে করছে আর অমর্ত্যলোক বাসী তাঁকে প্রণাম জানাচ্ছে,

"অজ্ঞান তিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরুবে নমঃ।"

পরিশিষ্ট

আচার্যদেবের কয়েকখানি পত্র

(১)

90, Park Street,
(Circus P. O)
Calcutta
The 2nd April, 19.0

My dear Pal,

Your registered lerter containing questions for the 1st M. B. Exam. reached this morning (Tuesday). The meeting of the Board was held yesterday—and owing to this unfortunate

delay in receiving the question they could not be placed before the meeting.

I am very sorry it has happened like this. The Controller's office might have telegraphed and given you more time.

The dates of the Orals and practicals are not yet fixed. They will probably commence on the 26th April, 1940. I shall ask the Controller to inform you as soon as possible.

Where is বধূমাতা now? I do hope you are both keeping well. Is your wife likely to be in Calcutta about the time of the examination? In that case my wife and self shall be very glad to see you both.

Kindest wishes to you both.

Yours Very Sincerely,
Sd/. S. C. Mahalanobis.

(২)

Prof. S. C. MAHALANOBIS

BARGANDA
GIRIDIH

পরম কল্যাণীয়েষু, 20. 12. 1942

স্নেহের রুদ্রেন্দ্র, দু'মাস হয়ে গেল এখানে এসেছি। ঘটনাচক্রে আমরা ১১ই অক্টোবর — সেই দুরন্ত সাইক্লোনের রাতে কলিকাতা ছেড়েছিলাম। লীলাময় বিধাতার আশ্চর্য্য বিধানে আমরা রক্ষা পেয়েছি। এখন এখানে স্বপনের মত মনে হয়।

তোমরা সকলে কেমন আছ? এখানে আসিয়া তোমাকে চিঠি লিখিতে পারি নাই — কিন্তু তোমাদের খবর পাইতে খুব ইচ্ছা হয়। কল্যাণীয়া মা প্রতিমা কেমন আছেন? কলিকাতা ছাড়িবার পূর্ব্বে তোমরা একদিন আমাদের বাড়ী আসিয়া বড় আনন্দ দিয়াছিলে। আমরা প্রায়ই সে কথা বলিয়া থাকি। প্রতিমা মার সুমধুর গান ভুলিবার নহে। আবার কবে — বা কোন দিন — তাহা শুনিবার সুযোগ ঘটিবে কি না জানি না।

কলেজের — আমার প্রিয় ল্যাবরেটরীর খবর কি? ছোট হলেও উহা আমাদের বড় প্রিয়। তোমরা সবাই যেন মনে রেখো "বাসা ছোট হলেও, আশা ছোট নহে"। সকলে মিলে এই ডিপার্টমেন্টকে জাগিয়ে তোলো, এই আমার প্রাণের আকাঙ্ক্ষা।

আলো — আরো আলো — সত্যের ও জ্ঞানের — তোমাদের সাধনায় স্বদেশে ও দেশান্তরে পৌঁছুক। অনেক স্নেহাশীর্ব্বাদ লও।

কল্যাণকামী — শ্রীসুবোধচন্দ্র মহলানবিশ।

(৩)

Prof. S. C. Mahalanobis

Barganda
Giridih
20.12.1942

পরম কল্যাণবরেষু,

স্নেহের রুদ্রেন্দ্র, ছ'মাস হয়ে গেল এখানে এসেছি। ঘটনাচক্রে আমরা ১৬ই অক্টোবর—সেই দুরন্ত সাইক্লোনের রাতে কলিকাতা ছেড়েছিলাম। লীলাময় বিধাতার আশ্চর্য বিধানে আমরা রক্ষা পেয়েছি। এখন ভাবলে স্বপনের মত মনে হয়।

তোমরা সকলে কেমন আছ ? এখানে আসিয়া তোমাকে চিঠি লিখিতে পারি নাই—কিন্তু তোমাদের খবর পাইতে খুব ইচ্ছা হয়। কল্যাণীয়া মা প্রতিমা কেমন আছেন ? কলিকাতা ছাড়িবার পূর্বে তোমরা একদিন আমাদের বাড়ী আসিয়া বড় আনন্দ দিয়াছিলে। আমরা প্রায়ই সে কথা বলিয়া থাকি। প্রতিমা মার সুমধুর গান ভুলিবার নহে। আবার কবে—বা কোনদিন—তাহা শুনিবার সুযোগ ঘটিবে কিনা জানি না।

কলেজের আমার প্রিয় ল্যাবরেটরীর খবর কি ? ছোট হলেও ওটা আমার বড় প্রিয়। তোমরা সবাই যেন মনে রেখো—"বাসা ছোট হলেও আশা ছোট নহে"। সকলে মিলে এই ডিপার্টমেন্টকে জাঁকিয়ে তোলো—এই আমার প্রাণের আকাঙ্ক্ষা।

আলো—আরো আলো - সত্যের ও জ্ঞানের—তোমাদের সাধনায় স্বদেশে ও দেশান্তরে পৌঁছাক।

অনেক আশীর্বাদ লও।

(স্বাঃ) কল্যাণকামী
শ্রীসুবোধচন্দ্র মহলানবিশ

(৪)

Barganda,
Giridih
১লা বৈশাখ, ১৩৫০

পরম কল্যাণবরেষু,

স্নেহের রুদ্রেন্দ্র, নববর্ষে কল্যাণীয়া প্রতিমা মাকে ও তোমাকে আমাদের উভয়ের অনেক শুভকামনা ও স্নেহাশীর্বাদ জানাইতেছি। বিদ্বেষ-বিষজর্জরিত পুরনো বৎসরের বুকের উপর কত তাণ্ডব লীলা ঘটিয়াছে—তা ভাবিলে হৃদয় শিহরিয়া উঠে। সম্মুখে কি আছে জানি না। এস সকলে মিলিয়া ভগবানের চরণে মাথা রাখিয়া প্রার্থনা করি, এই প্রলয় পয়োধির মহামন্থনের অবসানে শান্তির অমৃত উঠুক।

আশা করি তোমরা দুজনে ভাল আছ। তোমার শ্বশুর মহাশয় কোথায় ও কেমন আছেন ? তাঁহাকে আমাদের নববর্ষের অভিবাদন জানাইও।

এখানে গরম ক্রমশঃ বাড়িয়া চলিয়াছে—আশঙ্কা হয় টিঁকতে পারিব কিনা। খাদ্য-সামগ্রীর অভাব ও নানা কষ্টে আর প্রবাসে ভাল লাগিতেছে না। এসকল কথা লিখিতে লজ্জা হয়—জগতের দুঃখরাশির কথা ভাবিয়া।

কদিন ধরে দুরন্ত ঝড় বইছে। আমার ঘরের অনতিদূরে বাতাহত একটি প্রকাণ্ডকায় মহুয়া গাছের দুর্দশা বসে বসে দেখছি। একেবারে শুকনো একটা প্রচণ্ড বাতাসের অত্যাচারে সে বিপন্ন হয়ে সমস্ত ডালপালা আছড়াইয়া প্রতিবাদ করছে। আর তার লক্ষ লক্ষ পুরনো জীর্ণ ও শুষ্ক পাতা চারিদিকে বিক্ষিপ্ত হচ্ছে। কয়েক দিনের মধ্যেই এই বিপুল গাছটা পর্ণশূন্য হয়েছে। প্রকৃতির এ নিষ্ঠুর খেলা যে 'সংস্কারের প্রথা' তা তোমরা বিজ্ঞানবিদেরা বলে থাক। সত্যই দেখছি সঙ্গে সঙ্গে রাশি রাশি নব কিশলয় গজাতে আরম্ভ হয়েছে—যা অচিরে নিবিড় হরিৎপত্রে এই বিরাট

মহীরুহের গৌরব ও গাম্ভীর্য পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিবে। এই ব্যাপারটা দেখে মনে হয়—লাঞ্ছিত জগতের বর্তমান পরিস্থিতির সঙ্গে ইহার সাদৃশ্য আছে।

বিশ্বব্যাপী এ ঘোর দুর্দিনের অবসানে—আমাদের দেশের—তথা জগতের নব জীবন লাভ হবে, ইহা ধ্রুব সত্য। তোমরা তার জন্য প্রস্তুত হও। আমরা যারা ওপারের জন্য পা বাড়িয়ে আছি, এই আশা নিয়ে তোমাদের আশীর্বাদ করে চলে যাই।

সকলে অনেক স্নেহাশীর্বাদ লও।

একান্ত কল্যাণকামী

(স্বাঃ) শ্রীসুবোধচন্দ্র মহলানবিশ

(৫)

Prof. S. C. Mahalanobis

90 Park Street,
Calcutta
10. 6. 1943

পরম কল্যাণবরেষু,

স্নেহের রুদ্রেন্দ্র, তোমাকে দেখিবার জন্য উৎসুক আছি। একবার আসিলে সুখী হইব। উপস্থিত সকল ব্যাপারের বিষয় আমি সাক্ষাৎভাবে অবগত আছি। কল্যাণ হউক।

পরশু (শনিবার) সকাল ১০ হইতে ১১টার মধ্যে আসিতে পারিলে ভাল হয়।

প্রতিমা মা কেমন আছেন ? দুজনে স্নেহাশীর্বাদ লও।

কল্যাণকামী

(স্বাঃ) শ্রীসুবোধচন্দ্র মহলানবিশ

(৬)

90 Park Street
(Circus P. O.)
Calcutta—17
15. 6. 49

মা প্রতিমা,

তোমাদের জন্য যৎসামান্য মিষ্টি পাঠাইলাম, খাইলে সুখী হব। স্নেহাশীর্বাদ লও।

একান্ত কল্যাণকামী

পিসেমশাই

(৭)

90 Park Street
(Circus P. O)
Calcutta—17
27. 11. 49

পরম কল্যাণীয়াসু,

মা প্রতিমা, ৬ই ডিসেম্বরের কথা ভুলিও না। আমার আঁধার সংসারে এখন ঐ একটি দিন কেবল আনন্দের দিন আছে। আগামী ৬ই ডিসেম্বর মঙ্গলবারে বিকাল ৫॥০টার সময়—তোমার পিসীমার 'জন্ম ও বিবাহের' সাম্বৎসরিক উপলক্ষ্যে আমাদের গৃহে প্রীতিসম্মিলন হইবে। গত বৎসরে তুমি ও কল্যাণীয় রুদ্রেন্দ্র এখানে আসিয়াছিলে—ও তুমি কত তোমার সুমধুর সঙ্গীতে আনন্দ পরিবেশন করিয়াছিলে। আশা করি এবারেও সে তৃপ্তি হতে বঞ্চিত হব না।

উভয়ে অনেক আশীর্বাদ লও।

একান্ত কল্যাণকামী

পিসেমশাই

(৮)

90 Park Street
(Circus P. O)
Calcutta—17
10. 3. 1950

মা লক্ষ্মী,

অনেকদিন তোমাদের খবর পাই নাই। তোমরা কেমন আছ জানিবার জন্য উদ্বিগ্ন হয়ে আছি।

২৯শে জানুয়ারী তোমরা কমল কুটিরে আসতে পেরেছিলে দেখে বড় ভাল লাগলো। ডাক্তার সাহেব ভাল ত ?

আমি নিজে টেলিফোন করতে পারি নে। এক লাইন লিখে তোমরা সকলে কেমন আছ জানালে সুখী হব। আমার শরীর নিতান্ত অপটু। ওপারের যাত্রী হয়ে দ্রুতগতিতে চলেছি।

সকলে স্নেহাশীর্বাদ লও।

একান্ত কল্যাণকামী

পিসেমশাই

অধ্যাপক সুবোধচন্দ্র মহলানবিশ মহাশয়ের জীবন-স্মৃতি

শ্রীসুজিত মহলানবিশ

১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে, ৪ঠা মার্চ (ফাল্গুন, ১২৭৩ সালে) মহলানবিশ পিতৃদেব কলিকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। আমাদের পিতামহ গুরুচরণ মহলানবিশ মহাশয়ের পৈত্রিক বাসভূমি ছিল ঢাকার অন্তর্গত বিক্রমপুর জেলার পঞ্চসার গ্রামে। পিতামহ পরবর্তী কালে কলিকাতায় আসিয়া বসবাস করেন এবং তাৎকালিক ব্রাহ্ম আন্দোলনের বিশিষ্ট নেতা বলিয়া পরিগণিত হন।

পিতৃদেবের শৈশব ব্রাহ্মসমাজের নির্মল পরিবেষ্টনে অতিবাহিত হইয়াছিল। তিনি ছয় বৎসর বয়সে কলিকাতা বয়েজ স্কুলে (Calcutta Boys' School) ভর্তি হন। কলিকাতা বয়েজ স্কুল পরে এলবার্ট স্কুল নামে পরিচিত হয়। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের কনিষ্ঠ ভ্রাতা কৃষ্ণবিহারী সেন এই বিদ্যালয়ের রেক্টর (Rector) ছিলেন। তিনি পিতৃদেবকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। এই বিদ্যালয়ে পিতৃদেবের অনেকগুলি বন্ধু লাভ হইয়াছিল, তন্মধ্যে ছিলেন স্বর্গীয় প্রমথলাল সেন, বিনয়েন্দ্রনাথ সেন, নরেন্দ্রনাথ ও ভুপেন্দ্রনাথ মজুমদার। মাঘোৎসবের সময়ে এই স্থানে তাঁহারা সকলে মিলিত হইয়া উৎসব করিতেন এবং প্রতি শুক্রবারে সৎ আলোচনা ইত্যাদি হইত। এই বিদ্যালয়ে পিতৃদেব চার বৎসর কাল অধ্যয়ন করেন।

ইহার পর পিতৃদেব সিটি স্কুলে (City School) ভর্তি হন। সিটি স্কুলে অধ্যয়ন করিবার সময় হইতেই পিতৃদেব কমল কুটিরে (ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের গৃহ) এবং নববিধান সমাজে যাতায়াত করিতেন। সিটি স্কুলে স্বর্গীয় উমেশচন্দ্র দত্ত ও স্বর্গীয় হেরম্বচন্দ্র মৈত্র মহাশয় শিক্ষকতা করিতেন। পিতৃদেব হেরম্বচন্দ্র মৈত্র মহাশয়ের অতি প্রিয় ছাত্র ছিলেন। পিতৃদেব সিটি স্কুলের একজন কৃতী ছাত্র ছিলেন এবং বরাবর পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন।

সিটি স্কুল হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া পিতৃদেব জেনারেল এসেম্ব্লিতে (General Assembly) ভর্তি হন। পিতৃদেব দ্বাদশ বৎসর বয়স হইতেই বক্তৃতা করিতে পারিতেন। জেনারেল এসেম্ব্লিতে অধ্যয়নের সময়ে তিনি ইংরেজি ভাষায় কয়েকটি বক্তৃতা দেন। তাহা শুনিয়া সকলে অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছিলেন। বিজ্ঞানের অধ্যাপক হ্যামিলটন সাহেব (Mr. Hamilton) পিতৃদেবকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন এবং এই স্নেহের বন্ধন কোন দিন ছিন্ন হয় নাই। পিতৃদেব নিজবুদ্ধির দ্বারা নিজহস্তে নানাপ্রকার বৈজ্ঞানিক যন্ত্র প্রস্তুত করিয়াছিলেন, যাহা দেখিয়া সকলে অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছেন। পিতৃদেব সুলেখক বলিয়াও পরিচিত হন। "নব্য ভারত", "ব্যবসায়ী" ইত্যাদি কাগজে তিনি নিয়মিত প্রবন্ধ লিখিতেন।

জেনারেল এসেম্ব্লি হইতে পিতৃদেব মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হন। মেডিক্যাল কলেজে কিছুকাল অধ্যয়ন করিয়া তিনি ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে বিলাত গমন করেন এবং এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ে (Edinburgh University) তিনি চিকিৎসা শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করেন। কয়েক বৎসর চিকিৎসা শাস্ত্র অধ্যয়ন করিবার পর তিনি শারীরবিজ্ঞান (Physiology) অধ্যয়ন করেন। এডিনবরা গবেষণাগারে (Research Labaratory, Royal College of Physicians) তিনি দুই

বৎসর গবেষণা করেন। পিতৃদেব সুদীর্ঘ সাত বৎসর কাল এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করেন এবং পরে তিনি রয়েল সোসাইটির ফেলো হন (Fellow of the Royal Society, Edinburgh)।

এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ের আনন্দপূর্ণ দিনগুলির কথা পিতৃদেব কখনও বিস্মৃত হন নাই। তাঁহার লিখিত এক প্রবন্ধ (Reminiscences of Edinburgh University) কার্ডিফ বিশ্ববিদ্যালয়ের সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল, পরে এই প্রবন্ধটি কলিকাতায় "নিউ ইণ্ডিয়া" নামক সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হয়। এডিনবরাতে অধ্যয়ন কালে যে সকল বিজ্ঞানবিদ্ মনীষিগণের সঙ্গলাভ করিবার সৌভাগ্য হইয়াছিল, পিতৃদেব এই প্রবন্ধে বিশেষভাবে তাহার উল্লেখ করিয়াছেন। এই প্রবন্ধের কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

"The foremost figure that stands in my memory, is that of the 'grand old man of Scotland'. No one, who had not seen this evergreen professor, would be able to form an adequate idea of the grand personality of the late Professor Blackie—apart from his profound Scholarship. Scotch to the core—you see the Highlander walking gleefully along the street with his tartan plaid round his shoulders and his silvery curls streaming behind the ears, down to his neck, now stopping to speak a kindly word to a little street arab, again pacing along, muttering Greek Verses to himself! Who said Blackie was ever old? Something must have been wrong with the man who was not fired with the enthusiasm for manly sports which Blackie used to infuse into the hearts of his students. Was there another Professor who loved his students more and was loved more by his students than Blackie?'

* * *

"Just the other day, my Alma Mater mourned the loss of one of the most brilliant teachers of Medical Science in the death of my esteemed teacher—the late Prof. Rutherford. It would be wellnigh impossible for an outsider to understand Rutherford *rightly*. But we, who had the privilege of being his students, knew him well and we dearly loved 'Bilirubin', as we liked to call him. His very idiosyncracies and his mannerisms were dear to us. For Rutherford without his peculiarities would not be Rutherford. But his heart and energies were undividedly devoted to the welfare of the students. I could talk to you a whole night about his funny little ways".

* * * *

"The Edinburgh University with its venerable buildings, its time-honoured traditions, its charming associations, its youthful friendships has left a never-to-be obliterated impression on my heart. The moulding of character by the personal influence of great teachers, the kindling of intellectual fire and awakening of noble aspirations

in young minds by the electric touch of giant intellects, are indeed the highest mission of all great educational institutions".

এডিনবরায় অধ্যয়নের সময় কয়েকটি স্কচ্ পরিবারের সহিত পিতৃদেবের বিশেষভাবে ঘনিষ্ঠতা হয় এবং এই বন্ধুত্ব চিরস্থায়ী হইয়াছিল। এডিনবরাতে পাঠ্যাবস্থায় এক সময়ে পিতৃদেবের অর্থাভাবে বিশেষ কষ্ট হইয়াছিল। পিতামহের নিকট হইতে সামান্য সাহায্য পাইতেন; সুতরাং তাঁহাকে অন্য উপায়ে আয় করিতে হইত। তিনি একদিকে নিজে অধ্যয়ন করিতেন এবং অন্য সময়ে ছাত্র পড়াইয়া ও ছবি তুলিয়া (Photography) অর্থোপার্জন করিতেন। এইরূপ অর্থাভাব ও নানা বিঘ্নের মধ্যেও পিতৃদেব অধ্যয়ন সমাপ্ত করিয়া বিশেষ কৃতিত্বের সহিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

এই সময়ে কার্ডিফ বিশ্ববিদ্যালয়ে (University College, Cardiff) একটি শারীরবিজ্ঞানের অধ্যাপকের পদ খালি হওয়াতে পিতৃদেব সেই পদে নিযুক্ত হন। ইহার পূর্বে এই পদে কোন ভারতীয় অধ্যাপক নিযুক্ত হন নাই। পিতৃদেব কার্ডিফ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষকের পদেও নিযুক্ত হন। কার্ডিফ বিশ্ববিদ্যালয়ে পিতৃদেব তিন বৎসর কাল শিক্ষকতা করিবার পর স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। তিনি কার্ডিফ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বিদায় লইবার সময় ছাত্রগণ তাঁহাকে একটি বিদায় সম্ভাষণ দিয়াছিল। ছাত্রগণ তাঁহাকে যে কিরূপ ভালবাসিত ও শ্রদ্ধা করিত তাহার নিদর্শনস্বরূপ সেই বিদায় সম্ভাষণ-পত্র (Address) হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করা হইল।

"May we be permitted to take this opportunity of conveying to you by means of this brief address, an expression of our good feeling towards you as a Physiologist, as a teacher and as a man.

In such a short space, it would be difficult to epitomize the many excellent traits in your character which have made you loved and respected by us as a body of students.

During your stay in Cardiff, you have won your way to our hearts not only by your marked ability as a teacher of Physiology, but also by the kindly consideration which you have shown to us as students of medicine.

In addition to this, you have ever kept before us a high ideal of the noble profession which we are about to enter.

* * *

In conclusion, permit us to express our hope that by your wider sympathies, by your deep understanding of human nature, and by your keen sense of the nobler duties of man, you will endear yourself to your fellow countrymen as you have endeared yourself to a body of British medical students, who welcomed you as an alien, who loved you as a man and who will ever think of you as deserving of the grand old name of gentleman."

পিতৃদেব ১৯০১ খৃষ্টাব্দে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিয়া কলিকাতায় প্রেসিডেন্সী কলেজে একটি পদের জন্য চেষ্টা করেন। তৎকালীন বাংলার লাট স্যর জন উডবার্ণের (Sir John Woodburn) সহিত তিনি সাক্ষাৎ করেন। লাট তখন দার্জিলিং-এ অধিবাস করিতেছিলেন। লাট সাহেবের

ইহার প্রেসিডেন্সী কলেজে পিতৃদেবের জন্য একটি নূতন শারীরবিজ্ঞান বিভাগ স্থাপন করা হইল। লাট সাহেব পিতৃদেবকে বলিয়াছিলেন—"তোমাকে সামান্য বেতনে প্রবেশ করিতে হইল তার জন্য আমি দুঃখিত, তবে আশা করি পরে তোমাকে ভাল চাকুরী দিতে পারিব।"

এই সময়ে পিতৃদেব কয়েক দিন দার্জিলিং-এ অবস্থান করেন। দার্জিলিং-এ অবস্থান কালে তাঁহার সহিত করুণাচন্দ্র সেনের (ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র) পুনরায় বিশেষভাবে পরিচয় হয়। ইহার পূর্বে করুণাচন্দ্রের সহিত পিতৃদেবের একবার পরিচয় হইয়াছিল। ইহার কিছুদিন পরেই করুণাচন্দ্রের ভগিনী ও ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের চতুর্থ কন্যা মণিকা দেবীর সহিত পিতৃদেবের বিবাহের প্রস্তাব হয়। সেই সময়ে মণিকা দেবীর জ্যেষ্ঠা ভগিনী কুচবিহারের মহারাণী সুনীতি দেবী বিলাতে ছিলেন বলিয়া বিবাহ স্থগিত রাখা হয়।

১৯০২ খৃষ্টাব্দে পিতৃদেব পুনরায় দার্জিলিং গমন করেন। লাট সাহেব স্যর জন উডবার্ণ বিবাহের কথা শুনিয়া মণিকা দেবীকে বলেন—"আপনি একজন খ্যাতনামা ব্যক্তিকে বিবাহ করিতেছেন" (You are going to marry a distinguished person)। এই বৎসরে ডিসেম্বর মাসে পিতৃদেবের বিবাহ হয়। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের স্বর্গারোহণের ৩০ বৎসর পরে তাঁহার গৃহ কমল কুটীরে বহু সমারোহে এই বিবাহ সম্পন্ন হয়। বিবাহের পর ২৫ বৎসর কাল পিতৃদেব পিতামহের গৃহে (২১০ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট) বাস করেন এবং ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে তাঁহার নবনির্মিত গৃহে (৯০ পার্ক ষ্ট্রীট) গমন করেন। তদবধি তিনি সেই স্থানেই বাস করিতেন।

প্রেসিডেন্সী কলেজে অধ্যাপকের কাজে নিযুক্ত থাকাকালীন বহু ইংরেজ অধ্যাপকের সহিত পিতৃদেবের বিশেষ বন্ধুত্ব হয়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন প্রিন্সিপ্যাল হর্নেল (Principal Hornell), অধ্যাপক কানিংহাম (Professor Cunningham), অধ্যাপক হ্যারিসন (Professor Harrison), অধ্যাপক পীক্ (Professor C. W. Peake) এবং অধ্যাপক ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ (Professor W. C. Wordsworth)। অধ্যাপক কানিংহাম পিতৃদেবকে আজীবন স্নেহ করিয়াছেন। বিলাতে তাঁহারই পিতার গৃহে পিতৃদেব সপরিবারে কিছুকাল বাস করিয়াছিলেন। প্রেসিডেন্সী কলেজের পরিবর্তন বা উন্নতি-সাধনে এই অধ্যাপকগণ সর্বদা পিতৃদেবের পরামর্শ লইতেন। প্রেসিডেন্সী কলেজের বেকার লেবরেটরী (Baker Laboratory) প্রতিষ্ঠার সময়ে অধ্যাপক পীক, অধ্যাপক ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ এবং পিতৃদেব এই তিনজন মিলিত হইয়া উহার নক্সা করেন। প্রথমে উদ্ভিদ বিজ্ঞানের (Botany) ও শারীরবিজ্ঞানের (Physiology) বিভাগ দুইটি এক স্থানে ছিল। তখন হইতেই পিতৃদেবের বিশেষ আকাঙ্খা ছিল যে, শারীরবিজ্ঞানের জন্য একটি স্বতন্ত্র বিভাগ প্রতিষ্ঠা করেন এবং ইহার জন্য তিনি আপ্রাণ চেষ্টা ও শ্রমসাধন করেন। ভারতবর্ষে তখন কোন কলেজে (মেডিক্যাল কলেজ ব্যতীত) শারীরবিজ্ঞান সম্বন্ধে শিক্ষাদান করিবার ব্যবস্থা ছিল না। পিতৃদেবই সর্বপ্রথম প্রেসিডেন্সী কলেজে স্বতন্ত্র শারীরবিজ্ঞান বিভাগ প্রতিষ্ঠা করেন। পিতৃদেব প্রেসিডেন্সী কলেজে অধ্যাপনা করিবার সময়ে লাট-সাহেব, বহু বিজ্ঞানবিদ্ মনীষিগণ ও অন্যান্য গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ এই শারীরবিজ্ঞান বিভাগ পরিদর্শন করিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছেন। পিতৃদেব ২৭ বৎসর কাল প্রেসিডেন্সী কলেজে অধ্যাপনার কাজে নিযুক্ত ছিলেন।

১৯০৯ খৃষ্টাব্দে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে ডারউইন শতবার্ষিকী উৎসবে (Darwin Centenery Celebrations) যোগদান করিবার আমন্ত্রণ পাইয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি-

স্বরূপ পিতৃদেব সপরিবারে পুনরায় বিলাত গমন করেন। ঐ সময়ে তিনি ইংল্যাণ্ড, স্কটল্যাণ্ড ও আয়ারল্যাণ্ডের নানাস্থানে পরিভ্রমণ করেন এবং সকল শ্রেণীর লোকের নিকট বিশেষ করিয়া সেখানকার বিশিষ্ট অধ্যাপকমণ্ডলীর নিকট সমাদৃত হন। রাজ-দরবারে উপস্থিত হইবার জন্য পিতৃদেব ও মাতৃদেবী উভয়েই নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন।

প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে অবসর গ্রহণ করিবার পর পিতৃদেব ১৫ বৎসর কাল কারমাইকেল কলেজে (অধুনা আর. জি. কর মেডিক্যাল কলেজ) শারীরবিজ্ঞান বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ছিলেন। পিতৃদেব কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত বহু বৎসর কাল ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তিনি ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো নির্বাচিত হন এবং ১৯১৬ হইতে ১৯৪২ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের শারীরবিজ্ঞানের স্নাতকোত্তর বিভাগের অধ্যক্ষ এবং বোর্ড অব হায়ার স্টাডিজ ইন ফিজিওলজির (Board of Higher Studies in Physiology) সভাপতি ছিলেন। তিনি ১৯০৭ হইতে ১৯২৮ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের সিণ্ডিকেটের সদস্য ছিলেন। ইহা ব্যতীত তিনি ফিজিওলজিক্যাল সোসাইটি অব ইণ্ডিয়ার প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ছিলেন এবং ১৯৩৭ হইতে ১৯৪০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত বোটানিক্যাল সোসাইটি অব বেঙ্গলেরও সভাপতি ছিলেন। ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় ভারতীয় বিজ্ঞান পরিষদের (Indian Science Congress) শারীরতত্ত্ব বিভাগে তিনি সভাপতিত্ব করেন।

অতি অল্প বয়স হইতেই পিতৃদেব বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় বক্তৃতা করিবার এক অনন্যসাধারণ ক্ষমতা অর্জন করিয়াছিলেন। তিনি অতি সরল ভাষায় বিজ্ঞানের গূঢ় তত্ত্ব বুঝাইতে পারিতেন এবং লোকমুখে শুনিয়াছি যে, তাঁহার সকল বক্তৃতাই অত্যন্ত উপভোগ্য হইত। তাঁহার মিউজিক অব দি হার্ট (Music of the Heart) শীর্ষক বক্তৃতা যাঁহারা শুনিয়াছেন, তাঁহারা বলিয়াছেন যে, এমন প্রাঞ্জল ভাষায় বিজ্ঞানের বিষয়ে এরূপ বক্তৃতা আর কখনও শুনেন নাই। এই বক্তৃতাটি প্রবন্ধাকারে নিউ ইণ্ডিয়া নামক সাময়িক পত্রে ১৯০১ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। উহার কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

"If you apply ear to the front of a person's chest, rather to the left of the middle line you will distinctly hear what I have called the 'Music of the Heart'. As the living pump works steadily, with each stroke you are told—

'No rest that throbbing slave may ask

For ever quivering over his task.'

It is the audible sign of the life of the heart, yea, it is the music of the very citadel of life.

* * * And all this work is done merrily—singing *lubb dup—lubb dup* all the while.

Blessed is the mortal whose heart continues to beat within the chest tuned to the proper music while he works through his alloted span of life for God, Humanity and the Fatherland."

বাংলার বহু খ্যাতনামা মনীষিগণ, যথা—স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, স্যর জগদীশচন্দ্র বসু, স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ও স্যর প্রফুল্লচন্দ্র রায় পিতৃদেবকে বিশেষ স্নেহ করিতেন। পিতৃদেব অল্প বয়সে ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউটের

যুগ্ম সম্পাদক ছিলেন। অপর যুগ্ম সম্পাদক ছিলেন অধ্যাপক বিনয়েন্দ্রনাথ সেন। ঐ সময়ে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র তাঁহাদের খুব উৎসাহ দিতেন এবং আচার্য জগদীশচন্দ্র প্রায়ই সেখানে বক্তৃতা দিতেন।

স্ত্রীশিক্ষা এবং সমাজ-সেবায় পিতৃদেব বহু বৎসর আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। তিনি বেথুন কলেজ, ভিক্টোরিয়া ইনষ্টিটিউসন ও ব্রাহ্ম বালিকা বিদ্যালয়ের পরিচালন সমিতির সদস্য ছিলেন। বিলাত হইতে প্রত্যাবর্তনের পর তিনি ভিক্টোরিয়া ইনষ্টিটিউসনে নিয়মিত বক্তৃতা দিতেন। তিনি প্রায়ই লরেটো কনভেন্ট স্কুল (Loreto Convent School) পরিদর্শন করিতে যাইতেন এবং সেখানকার পরীক্ষক ছিলেন।

কলিকাতায় বারানসী ঘোষ ষ্ট্রীটে তিনি মহিলাদিগের জন্য একটি হোষ্টেল প্রতিষ্ঠা করেন এবং নিজহস্তে সেই গৃহ সুসজ্জিত করেন। বহু খ্যাতনামা লোক ও বিদুষী মহিলাগণ এই প্রতিষ্ঠানে আসিয়া ইহা পরিদর্শন করিয়াছেন ও বক্তৃতা দিয়াছেন। মহারাণী সুনীতি দেবী, ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী, মিস্ ব্রক, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি অনেকেই এখানে আসিয়াছেন।

পিতৃদেব কয়েক বৎসর আগে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভাপতি নির্বাচিত হন। তিনি একদিন বলিয়াছিলেন—"কয়েক বৎসর আগে একদিন চিঠি পেলাম—আমাকে ব্রাহ্মসমাজের সভাপতি করা হয়েছে। আশ্চর্য হলাম। মণিকা দেবী ভরসা দিয়ে বললেন—এ বিধাতার ইচ্ছা—তুমি দ্বিধা কোর না। সে দিন থেকে নববিধান ও সাধারণের মধ্যে মিলনক্ষেত্র প্রস্তুতের ব্রত নিলাম।"

ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে সাম্প্রদায়িক বিভেদ দূরীকরণে যাঁহারা যত্নবান হয়েছেন, পিতৃদেব ছিলেন তাঁহাদের অগ্রণী। তিনি যখন সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভাপতি ছিলেন, মাঘোৎসবের সময়ে একবার মহিলা উৎসবের দিন উপাসনা করিবার জন্য মহিলাগণ মণিকা দেবীর ভগিনী ময়ূরভঞ্জের মহারাণী সুচারু দেবীকে মনোনীত করেন। ইহাতে সাধারণ সমাজের প্রায় ৩০।৪০ জন সভ্য আপত্তি জানাইয়া সভাপতিকে চিঠি লেখেন, কিন্তু পিতৃদেবের ব্যক্তিত্ব ও উদার মনোভাবের দ্বারা এই সমস্যার সমাধান সম্ভব হইয়াছিল। সুচারু দেবী উপাসনা করেন এবং সেই হৃদয়গ্রাহী উপাসনা শুনিয়া সকলে বিশেষ আনন্দ লাভ করেন। এইভাবে দুই সমাজের মধ্যে মিলনের সেতু রচিত হয়।

পিতৃদেব বালক, বালিকা এবং শিশুদিগেরও বন্ধু ছিলেন। মাঘোৎসবের সময়ে বালক-বালিকা সম্মিলনের দিন তিনি বহুবার তাহাদের গল্প বলিয়াছেন। বালক-বালিকাগণ তাঁহার অমৃতময় বাণী শুনিয়া পরম আনন্দলাভ করিয়াছে।

১৯৪২ সালে, সুদীর্ঘ কর্মক্লান্ত জীবনের অবসর গ্রহণক্ষণে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শারীরবিজ্ঞানের অধ্যাপকগণ (যাঁহারা সকলেই পিতৃদেবের অনুরক্ত প্রাক্তন ছাত্র ছিলেন) তাঁহাকে একটি বিদায়-সম্ভাষণ দেন।

বিদায়-সম্ভাষণ পত্রে তাঁহারা যাহা লিখিয়াছিলেন, সেই কথাতেই আজ পিতৃদেবের আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করি—

"হে জ্ঞানি,

প্রতীচ্যের জ্ঞানালোক আহরণ করে যশের গৌরব-মুকুট শিরে যাঁরা ভারত-জননীর মুখোজ্জ্বল করেছিলেন, তাঁদের তুমি একজন।

হে গুণি,

যাঁরা প্রাচ্য ও প্রতীচ্যে ভাল যাহা কিছু সুদীর্ঘকাল কর্মবহুল জীবনের মধ্যে অবিমিশ্রভাবে ফুটিয়ে তুলেছিলেন, তুমি তাঁদের অন্যতম।

হে আচার্য,

বিজ্ঞানের প্রদীপ যাঁরা বাংলার তথা ভারতের ঘরে ঘরে একনিষ্ঠ ও নিঃস্বার্থভাবে

বিতরণ করেছেন, তুমি তাঁদের অগ্রগণ্য।

হে আদর্শ পুরুষ,

শত শত ঘাত-প্রতিঘাতেও যাঁরা কখনও জীবনের মহান আদর্শ হতে লক্ষ্যভ্রষ্ট হন নাই, তুমি তাঁদের শ্রেষ্ঠ

আজ সার্থক সুদীর্ঘ কর্মক্লান্ত জীবনের অবসর গ্রহণের ক্ষণে তোমার পুত্রতুল্য ছাত্রদের সশ্রদ্ধ প্রণিপাত গ্রহণ কর। বিধাতার আশীর্বাদে তোমার জীবন শতায়ু হউক এবং তোমার অবসর-ক্ষণ স্নিগ্ধ ও শান্তিময় হউক।”

পিতৃদেব অমরলোকে গমন করিয়াছেন। তাঁহাকে আজ শ্রদ্ধায় স্মরণ করি। তিনি কর্মবহুল জীবনের যে মহান আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন, আমরা যেন তাহা স্মরণ করি এবং জীবনে প্রতি-পালন করিতে পারি, ইহাই বিশ্বপিতার চরণে বিনীত প্রার্থনা।

ব্রহ্মাণ্ড

শ্রীজিতেন্দ্রকুমার গুহ

ব্রহ্মাণ্ডের প্রসারণ

অ্যাণ্ড্রোমিডা বা উত্তর ভাদ্রপদ নক্ষত্রপুঞ্জে একটি নীহারিকা দেখা যায়। খালি চোখে দৃষ্ট অপর অনেক নীহারিকার মত এটিকেও ছায়াপথ দ্বীপ-জগতের অন্তর্গত একটি গ্যাসীয় মেঘলোক মনে করা হতো। বর্তমান শতাব্দীর ২য় দশকে এক-শ' ইঞ্চি দূরবীনে এর প্রকৃত পরিচয় ধরা পড়েছে। ছায়াপথ দ্বীপ-জগতের সীমানা পেরিয়ে এই নীহারিকাটি অসংখ্য নক্ষত্র সমাকীর্ণ অপর এক দ্বীপ-জগৎ। অ্যাণ্ড্রোমিডা নক্ষত্রপুঞ্জ ভেদ করে বহু দূরে এর অবস্থান। দূরত্বের দরুণই একে ঐ নক্ষত্রপুঞ্জে অবস্থিত এক মেঘলোকের ন্যায় দেখায়। আমেরিকার মাউন্ট উইলসন মানমন্দিরের প্রখ্যাত জ্যোতির্বিজ্ঞানী নীহারিকা-বিশেষজ্ঞ ডক্টর ই. পি হাবল শুধু অ্যাণ্ড্রোমিডা নীহারিকাই নয়, মহাশূন্যে ১০০ ইঞ্চি দূরবীনের সাহায্যে ও পরে ২০০ ইঞ্চি দূরবীনের সাহায্যে কোটি কোটি নক্ষত্র-লোকের সন্ধান পেয়েছেন—যেগুলির প্রত্যেকেই আমাদের ছায়াপথ বিশ্বের মত এক একটি স্বয়ং-সম্পূর্ণ দ্বীপ-জগৎ বা বিশ্ব অর্থাৎ গ্যালাক্সী (Island Universe or Galaxy)।

ব্রহ্মাণ্ড বলতে বোঝায় অসংখ্য গ্যালাক্সী সমন্বিত আমাদের দৃশ্য ও অদৃশ্য সমস্ত ব্যাপ্তিকে; অর্থাৎ এমন কিছু নেই, যা ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্ভুক্ত নয়। ডক্টর হাবলের গবেষণার ফলে ব্রহ্মাণ্ডের যে রূপ আবিষ্কৃত হয়েছে, তা সংক্ষেপে এই ভাবে বলা যায়—বহু কোটি দ্বীপ-জগৎ ব্রহ্মাণ্ডময় ইতস্ততঃ ছড়িয়ে আছে। তাদের পরস্পরের মধ্যে দূরত্ব বেড়ে চলেছে এবং সে কারণে ব্রহ্মাণ্ড প্রসারিত হয়ে যাচ্ছে।

কাগজের কতকগুলি ছোট ছোট চাকতি কেটে রবারের বেলুনের গায়ে এঁটে দিয়ে যদি বেলুনটাকে ফোলানো যায়, তাহলে দেখা যাবে চাকতিগুলি পরস্পরের কাছ থেকে সরে যাচ্ছে। বেলুনটাকে যত ফোলানো যাবে, চাকতিগুলি ক্রমান্বয়ে তত পরস্পরের দূরবর্তী হবে। কোনও একটা চাকতির উপর যদি একটা মাছি বসে থাকে তবে সে দেখবে—চারদিকের আর সব চাকতি তার কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে

এবং যে চাকৃতি যত দূরে, তার গতিবেগ তত বেশী।

প্রতিটি কাগজের চাকৃতির উপর যদি কয়েকটা করে কালির বিন্দু দেওয়া থাকে, তাহলে বেলুন ফোলালে কালির বিন্দুগুলির কোনও নড়চড় হয় না—শুধু এক চাকৃতির বিন্দুসমষ্টি অন্য চাকৃতির বিন্দু-সমষ্টি থেকে দূরে সরে যায়। ব্রহ্মাণ্ডের অবস্থাও অনুরূপ। প্রতিটি কালির বিন্দু যেন এক একটি দ্বীপ-জগৎ বা গ্যালাক্সী। কতকগুলি করে দ্বীপ-জগৎ কালির বিন্দুর মত সমষ্টিবদ্ধ হয়ে আছে। তাদের আমরা দ্বীপপুঞ্জ (Cluster of Galaxies) বলবো; অর্থাৎ প্রতিটি চাকৃতি এক একটি দ্বীপপুঞ্জ।

ব্রহ্মাণ্ড এক বিরাট বুদ্বুদের মত প্রসারিত হয়ে যাচ্ছে। তার ফলে দ্বীপপুঞ্জগুলি কাগজের চাকৃতির মত একে অন্যের কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। কিন্তু যে কোন দ্বীপপুঞ্জের অধিবাসী আমরা হই না কেন—আমাদের কাছে প্রতীয়মান হবে যে, আমরাই যেন কেন্দ্রে আছি, অন্যগুলি আমাদের কাছ থেকে দূরে পালাচ্ছে এবং যে দ্বীপপুঞ্জ যত দূরে তার গতিবেগ তত দ্রুত। কিন্তু কাগজের চাকৃতি যেমন আয়তনে বাড়ে নি, দ্বীপপুঞ্জগুলিও তেমনি আয়তনে বাড়ছে না, শুধু তাদের মধ্যেকার পারস্পরিক দূরত্ব বাড়ছে—তাদের অন্তর্বর্তী স্থানের ব্যবধান বাড়ছে।

বলে রাখা ভাল, উপরের উপমাটায় ত্রুটি রয়ে গেছে। বেলুনের গায়ে চাকৃতি বসানো হয়েছে, বেলুনের মধ্যে আছে হাওয়া। এই হাওয়ার ভিতরে ফাঁকা জায়গায় সর্বত্র ঐ রকম চাকৃতি আছে, কল্পনা করতে হবে। সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডেই ঐরূপ পুঞ্জ পুঞ্জ দ্বীপ-জগৎ যত্রতত্র ছড়িয়ে আছে—কোন সমতলে বা গোলকের পৃষ্ঠে তাদের অবস্থান নয়।

দ্বীপপুঞ্জগুলির আয়তন বাড়ছে না, কিন্তু পুঞ্জের অন্তর্ভুক্ত দ্বীপ-জগৎগুলিও স্থাণু হয়ে বসে নেই। তারা প্রত্যেকেই আপন আপন মেরু অবলম্বনে আবর্তন করছে, নিজেদের মধ্যে কেউ কারও কাছে আসছে, কেউ বা দূরে সরে যাচ্ছে—সৌরজগতের সীমানার মধ্যে থেকেই গ্রহ-উপ-গ্রহগুলি যেমন স্থান পরিবর্তন করে।

ছায়াপথ দ্বীপ-জগতের দুটি উপজগৎ আছে, তারাও দুটি ক্ষুদ্রতর নক্ষত্রলোক বা গ্যালাক্সী বিশেষ। এদের নাম মেগালানীর মেঘমালা (Magallanic clouds)। এরা পরস্পরকে প্রদক্ষিণ করতে করতে ছায়াপথ বিশ্বকে প্রদক্ষিণ করে। পূর্বেই বলা হয়েছে, অ্যাণ্ড্রোমিডা নক্ষত্র-মণ্ডলে দৃষ্ট বিখ্যাত নীহারিকাটি প্রকৃতপক্ষে একটি দ্বীপ-জগৎ—ছায়াপথ দ্বীপ-জগৎ থেকে চৌদ্দ লক্ষ আলোক-বর্ষ দূরে অবস্থিত। জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা এর নাম দিয়েছেন এম-৩১ (M 31)। অ্যাণ্ড্রোমিডা দ্বীপ-জগতেরও দুটি উপজগৎ আছে, যারা গ্যালাক্সী হলেও আয়তনে ক্ষুদ্রতর এবং অ্যাণ্ড্রো-মিডার চারদিকে প্রদক্ষিণ করে। এই ক্ষুদ্র গ্যালাক্সী দুটির পরিচিতি এম-৩২ (M 32) এবং এন. জি. সি-২০৫ (N. G. C 205)। দুটি উপজগৎ সমেত ছায়াপথ গ্যালাক্সী, দুটি উপজগৎ সমেত অ্যাণ্ড্রোমিডা গ্যালাক্সী এবং আরও ১৭টি—মোট ১৯টি দ্বীপ-জগৎ নিয়ে আমাদের এই স্থানীয় দ্বীপপুঞ্জটি গঠিত। এদের প্রত্যেকেরই অক্ষ অবলম্বনে আবর্তন আছে, অন্যান্য গতি আছে, কিন্তু মহাকর্ষের টানে এক পরিবারভুক্ত—কেউই অন্যদের প্রভাব মুক্ত হয়ে দূরে সরে যেতে পারে না—যেমন পারে না গ্রহ-উপগ্রহগুলি সৌর-জগৎ ছেড়ে পালাতে।

ব্রহ্মাণ্ডের অপরাপর গ্যালাক্সীগুলিও ঐরূপ কতকগুলি করে এক গোষ্ঠীভুক্ত হয়ে এক একটি পুঞ্জ রচনা করে রয়েছে। তবে পুঞ্জের দ্বীপ-জগৎ-গুলি চাকৃতির কালির বিন্দুর মত এক সমতলে অবস্থিত নয় এবং তারা বেলুনের মত কোন গোলকের পৃষ্ঠদেশ অধিকার করে নেই, মহাশূন্যে তারা সর্বত্র ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত।

এই সকল দ্বীপপুঞ্জের বিস্তার বাড়ছে না, কিন্তু পুঞ্জগুলি প্রত্যেকে প্রত্যেকের কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। এই ভাবে গ্যালাক্সীগুলির পারস্পরিক দূরত্ব বৃদ্ধির গতিবেগকে তাদের অপসরণ বেগ (Recession velocity) বলা হয়। ডপ্‌লার তত্ত্ব অনুযায়ী বর্ণালীতে লালের অপসরণ থেকে নির্ধারণ করা যায়, গ্যালাক্সীর গতি কোন্‌ দিকে অর্থাৎ এগিয়ে আসছে, না পিছিয়ে যাচ্ছে এবং এই গতিবেগের পরিমাণ কত। এই পদ্ধতিতেই দেখা গেছে, দুই গ্যালাক্সীর ব্যবধান যদি ১০ কোটি হবে। বর্ণালীতে লালের অপসরণ হিসেব করে উল্লিখিত তথ্যের উদ্ভব। এজন্যে তথ্যটিকে হাবলের লাল-অপসরণ সূত্র বলা হয়। হাবলের সূত্রে ব্রহ্মাণ্ডের কোনও কিনারা অর্থাৎ প্রান্তীয় সীমা কল্পিত হয় নি, কাজেই কোনও গ্যালাক্সীরই কোন অবস্থান-বৈশিষ্ট্য নেই এবং প্রতিটি গ্যালাক্সীর আবাসিকই নিজেদের অবস্থানকে ব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্র মনে করতে পারে।

ধরা যাক ক খ গ ঘ সারবন্দী ৪টি গ্যালাক্সী আছে। পর পর তাদের একে অন্যের মধ্যে দূরত্ব
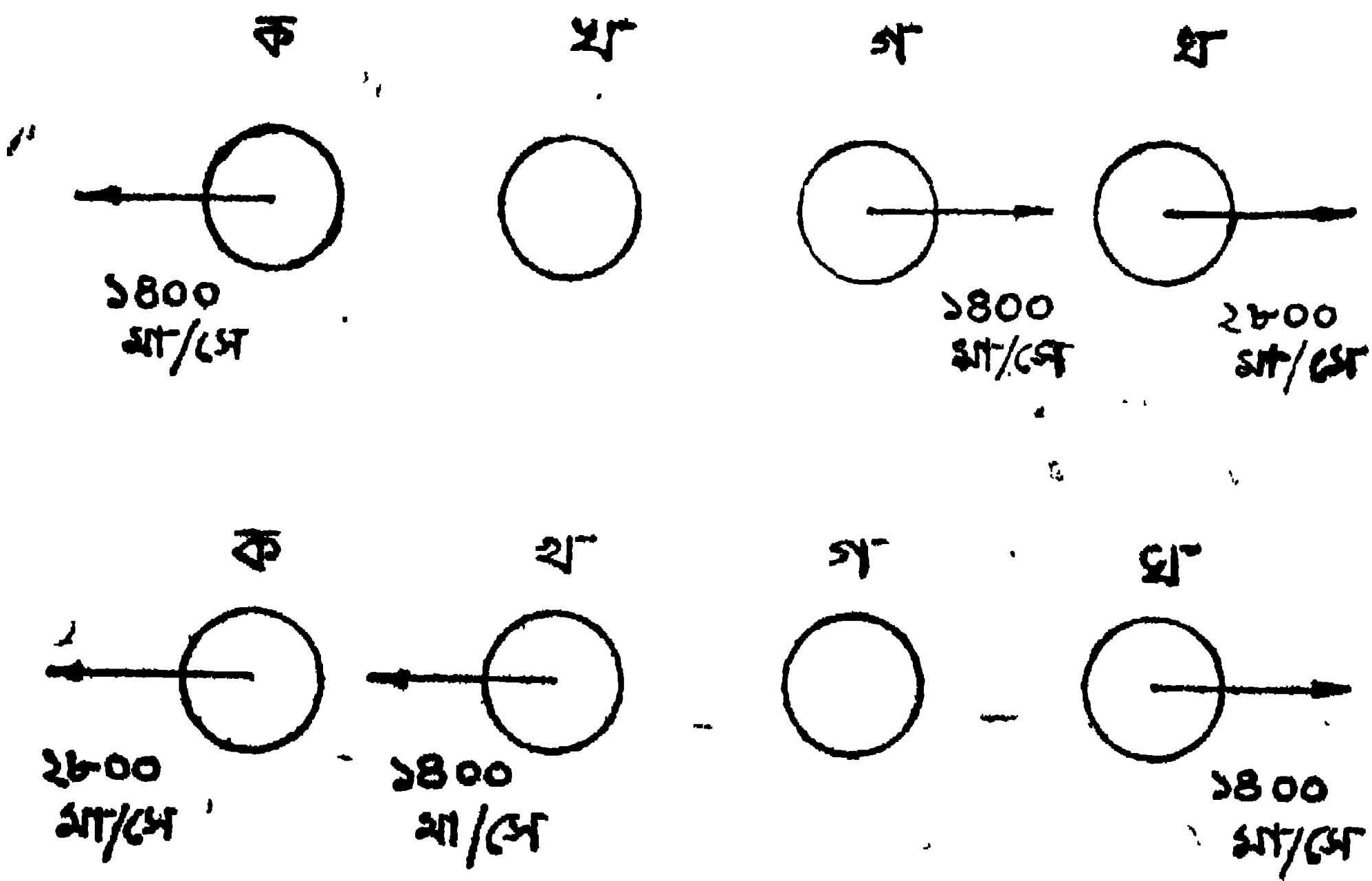
১নং চিত্র
দ্বীপ-জগতের অপসরণ বেগ।

আলোক-বর্ষ হয়, তবে একটি অপরটি থেকে প্রতি সেকেণ্ডে ১৪০০ মাইল দূরে সরে যাচ্ছে।

১৯২৯ সালে দুই জ্যোতির্বিদ হাবল এবং হুমাসন একটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ আবিষ্কার করেন। তাঁরা দেখলেন, যে কোন গ্যালাক্সী থেকেই অপর গ্যালাক্সীগুলির দূরত্ব এবং তাদের অপসরণ বেগ সমানুপাতিক; অর্থাৎ আমাদের কাছ থেকে প্রথম গ্যালাক্সীর দূরত্ব যত, দ্বিতীয় গ্যালাক্সীর দূরত্ব যদি তার দ্বিগুণ হয়, তবে এই দ্বিতীয় গ্যালাক্সীর অপসরণ বেগও দ্বিগুণ ১০ কোটি আলোক-বর্ষ (১নং চিত্র)। আমরা যদি খ গ্যালাক্সীতে থাকি, তবে আমরা দেখবো, প্রতি সেকেণ্ডে ক ১৪০০ মাইল বাঁ-দিকে সরে যাচ্ছে, গ প্রতি সেকেণ্ডে ১৪০০ মাইল ডানদিকে যাচ্ছে এবং ঘ প্রতি সেকেণ্ডে ২৮০০ মাইল ডানদিকে যাচ্ছে। আমরা যদি গ গ্যালাক্সীতে থাকি, তবে আমরা দেখবো খ প্রতি সেকেণ্ডে ১৪০০ মাইল বাঁ-দিকে সরে যাচ্ছে, ক প্রতি সেকেণ্ডে ২৮০০ মাইল বাঁ-দিকে সরে যাচ্ছে এবং ঘ প্রতি সেকেণ্ডে ১৪০০ মাইল ডানদিকে যাচ্ছে। আমাদের কাছ থেকে প্রতি

সেকেণ্ডে ১৪০০ মাইল বেগে ১০ কোটি আলোক-বর্ষ পথ যেতে প্রথম গ্যালাক্সীর লেগেছে ১৩০০ কোটি বছর। প্রতি সেকেণ্ডে ২৮০০ মাইল বেগে আমাদের কাছ থেকে ঐ দূরত্বে যেতে দ্বিতীয় গ্যালাক্সীরও লেগেছে ১৩০০ কোটি বছর। সুতরাং গ্যালাক্সীগুলির গতিবেগ যদি ঠিক ঐ প্রকারই বরাবর থাকে, তাহলে ১৩০০ কোটি বছর পূর্বে তারা সব একত্র সংঘবদ্ধ হয়েছিল এবং তার পর বিভিন্ন বেগে চলতে আরম্ভ করে তাদের অন্তর্বর্তী দূরত্ব ক্রমাগত বেড়ে চলেছে।

দূরস্থিত গ্যালাক্সীগুলির অপসরণ বেগ ক্রমান্বয়ে বেশী। এযাবৎ দূরবীনের দৃষ্টিসীমার মধ্যে যেগুলি অবস্থিত, তাদের গতিবেগ হিসেব করে সর্বোচ্চ অপসরণ বেগ পাওয়া গেছে, আলোর গতির ৪০ শতাংশ অর্থাৎ সেই দূরস্থিত গ্যালাক্সীটি প্রতি সেকেণ্ডে ৭০ হাজার মাইলেরও বেশী সরে যাচ্ছে। সুতরাং দূরবীনের দৃষ্টি বহির্ভূত এমন গ্যালাক্সী থাকা সম্ভব, যার অপসরণ বেগ আলোর গতির সমান হবে অর্থাৎ প্রতি সেকেণ্ডে ১৮৬০০০ মাইল হবে। হাবলের সূত্রে জানা যায়, আমাদের কাছ থেকে বা পৃথিবী থেকে ১৩০০ কোটি আলোক-বর্ষ দূরে যে গ্যালাক্সী অবস্থিত, তার অপসরণ বেগ আলোর গতির সমান। আইনস্টাইনের তত্ত্ব অনুযায়ী কোন কিছুরই গতিবেগ আলোর গতির চেয়ে বেশী হতে পারে না। এই সিদ্ধান্ত অনুসারে ১৩০০ কোটি আলোক-বর্ষ অপেক্ষা দূরস্থিত গ্যালাক্সীর অপসরণ বেগ যদি আলোর গতির সমানও হয়, তথাপি তার আলোকরশ্মি কোন দিনই পৃথিবীর নাগাল পাবে না। সুতরাং পৃথিবীর দৃষ্টিসীমা ঐ ১৩০০ কোটি আলোক-বর্ষ দূর পর্যন্ত। বর্তমানে দৃষ্টি-সহায়ক যন্ত্রপাতির দ্বারা পৃথিবী থেকে ন্যূনাধিক ২০০ কোটি আলোক-বর্ষ দূর পর্যন্ত দেখা যায়। ভবিষ্যৎ উন্নতিতে ঐ সকল যন্ত্রপাতি যত শক্তিশালীই হোক, ১৩০০ কোটি আলোক-বর্ষ অপেক্ষা দূরস্থিত সমস্ত কিছুই তার অদৃশ্য থেকে যাবে। অর্থাৎ পৃথিবীকে কেন্দ্র করে তার চতুর্দিকে দৃষ্টিসীমা ১৩০০ কোটি আলোক-বর্ষ দূর পর্যন্ত বিস্তৃত, তার বেশী হতে পারে না। অথবা বলা যায়, পৃথিবী থেকে দৃশ্যমান ব্রহ্মাণ্ডের ব্যাসার্ধ ১৩০০ কোটি আলোক-বর্ষের দূরত্বের সমান।

যে জ্যোতিষ্কের আলো আমরা ১০০ কোটি আলোক-বর্ষ দূর থেকে পাচ্ছি, সে আলোকরশ্মি বস্তুতঃ ১০০ কোটি বছর পূর্বে আমাদের দিকে রওনা হয়েছিল—এতদিনে আমরা তার পৌঁছ-খবর পেলাম। এই সময়ের মধ্যে যদি সেই জ্যোতিষ্ক লয়ও পেয়ে থাকে, তাহলে তার প্রলয় কাল পর্যন্ত দিনের পর দিন যত রশ্মি বিকিরণ করেছে, আমরা দিনের পর দিন তা পেতেই থাকবো। তারপর যে দিন তার রশ্মি প্রেরণ বন্ধ হয়ে যাবে তার ১০০ কোটি বছর পরে আমরা জানতে পারবো জ্যোতিষ্কটির মৃত্যু ঘটেছে। এই মুহূর্তে যদি আমরা পঞ্চাশ হাজার আলোক-বর্ষ দূরস্থিত কোনও জ্যোতিষ্কে উপস্থিত থাকতাম এবং আমাদের দৃষ্টিশক্তির যদি তেমন ক্ষমতা থাকতো, তাহলে স্বচক্ষেই আমরা দেখতে পেতাম পৃথিবীতে বনমানুষ থেকে মানুষের ক্রমবিকাশের ধারা।

ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি

ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধে বিভিন্ন মতবাদের মধ্যে দুইটি সমধিক প্রচলিত। একটির নাম প্রচণ্ড বিস্ফোরণ (Big Bang) মতবাদ, অন্যটির নাম সদা-সমাবস্থা (Steady state) মতবাদ। প্রচণ্ড বিস্ফোরণ মতবাদে কোনও এক অতীতে ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির সূচনা হয়েছিল এবং তারপর থেকে তার ক্রমবিবর্তন চলছে। সদা-সমাবস্থা মতবাদে আভ্যন্তরীণ নানা পরিবর্তন সত্ত্বেও ব্রহ্মাণ্ডের সার্বিক অবস্থা চিরকাল একই রূপ থেকে যাচ্ছে। উভয় মতের সমর্থক বিজ্ঞানীরা আপন আপন

মতবাদের স্বপক্ষে প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যার অবতারণা করেছেন।

১৯২০ সালে বেলজিয়ামের বিজ্ঞানী জি. ই. লেমেটারের কল্পিত সৃষ্টিরহস্য এই যে, এক আদিম কণিকা (Primeval atom) থেকে ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি হয়েছে। জর্জ গ্যামো প্রমুখ কিছু সংখ্যক বিজ্ঞানী এই মতেরই অনুবর্তন করে প্রচণ্ড বিস্ফোরণ (Big Bang) মতবাদের প্রবর্তন করেন।

ব্রহ্মাণ্ডের বর্তমান নৈসর্গিক রীতিনীতির পরিবর্তন না ঘটে থাকলে সুদূর অতীতে এমন একদিন ছিল, যখন গ্যালাক্সী ও গ্যালাক্সীপুঞ্জ সকলে প্রায় গায়ে গায়ে লেগে ছিল। তারও পূর্বে তাদের আর কোন পৃথক সত্তা ছিল না, তারা সব একত্র সন্নিবিষ্ট ছিল। ব্রহ্মাণ্ডের প্রসারণ হচ্ছে বলেই অতীতে তার সঙ্কুচিত অবস্থা স্বতঃসিদ্ধ। কিন্তু কেমন সেই সঙ্কোচন? গ্যামো প্রমুখ বিজ্ঞানীরা বলেন, সঠিক কোনও ইতিবৃত্ত দেওয়া সম্ভব নয়, কিন্তু অনুমান করতে দ্বিধা নেই যে, সেই জমাট পিণ্ডের ঘনত্ব ছিল মানুষের কল্পনার অতীত, সঙ্কোচন হেতু তার তাপমাত্রাও দাঁড়িয়েছিল অকল্পনীয়—ভয়াবহ। জমাট পিণ্ডটির সম্ভাব্য ঘনত্ব ছিল জলের তুলনায় এক শত কোটি গুণ বেশী, অর্থাৎ এক ঘনসেন্টিমিটারের ওজন হবে দশ কোটি টন। কালির পরিবর্তে ঝরণা কলমে ঐ বস্তু ভরে নিলে কলমটির ওজন দাঁড়াবে কম করেও কুড়ি কোটি টন। বর্তমানের দুই শত ইঞ্চির দূরবীনের দৃষ্টির অন্তর্গত ব্রহ্মাণ্ডের নক্ষত্রাদি যাবতীয় বস্তুকে ঐ ঘনত্বে নিয়ে এলে যে স্থান অধিকার করবে, তার আয়তন ত্রিশটি সূর্যকে একত্রে জড়ো করে রাখলে যে আয়তন হবে তার সমান। এই ঘনত্বে ও তাপে কোন পদার্থেরই স্বাতন্ত্র্য থাকতে পারে না, তারা ভেঙে চূর্ণ-বিচূর্ণ হবে। যে কোন পদার্থ ভাঙলেই তার শেষ বিভাগ দাঁড়ায় প্রোটন, ইলেকট্রন ও নিউট্রনে। বিভক্ত এই জমাট মিশ্রণকে ঐ বিজ্ঞানীরা নাম দিয়েছেন ইলেম (Ylem)। ইলেমই ব্রহ্মাণ্ডের আদি পিণ্ড।

ঘনত্বেরও একটা সীমা আছে। আদি পিণ্ড সেই সীমায় পৌঁছালেই প্রতিক্রিয়ার ফলে হলো এক প্রচণ্ড বিস্ফোরণ এবং সঙ্গে সঙ্গে সুতীব্র বেগে সুরু হলো প্রসারণ। প্রসারণের ফলে ইলেমের তাপ দ্রুত কমতে আরম্ভ করলো এবং ইলেকট্রন, প্রোটন ও নিউট্রনের অর্থাৎ মৌলিক শক্তিকণাগুলির পক্ষে সম্ভব হলো বিবিধ সংগঠনে একে অন্যের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে পরমাণুর সৃষ্টি করা। বিস্ফোরণ থেকে আরম্ভ করে পরমাণুর সৃষ্টি পর্যন্ত হয়তো মাত্র ঘণ্টাখানেক সময় অতিক্রান্ত হয়েছিল। পরমাণুর দ্বারা গঠিত গ্যাস ক্রমশঃ ছড়িয়ে পড়তে লাগলো, ফলে তার ঘনত্ব কমতে আরম্ভ করলো, পূর্বতন শত কোটি ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রাও ক্রমে কমে এল। প্রথম তিন কোটি বছর এই ভাবেই চললো। গ্যাস বিরল থেকে বিরলতর হয়ে চতুর্দিকে প্রসারিত হচ্ছিল এবং সেই সঙ্গে তাপমাত্রাও ধীরে ধীরে শূন্য ডিগ্রীর দিকে নেমে আসছিল।

এই সময়ে ব্রহ্মাণ্ড রইলো ঘন অন্ধকারে নিমগ্ন। তারপর বিরল গ্যাসের সমষ্টিবদ্ধ হয়ে দ্বীপ-জগৎ ও নক্ষত্রাদি সৃষ্টির পালা। কিন্তু ব্রহ্মাণ্ডের প্রসারণ কোন সময়েই থেমে থাকে নি। বিস্ফোরণের পর গ্যাসীয় মেঘের বস্তুকণাসমূহ যেমন যেমন গতিবেগ পেয়েছিল, সেই গতিবেগ নিয়ে কিংবা মহাকর্ষের শক্তিতে সৃষ্ট পরিবর্তিত গতিবেগ নিয়ে আজও তারা বহির্মুখে ছুটে চলেছে এবং চলবার পথেই তাদের সংহতি থেকে ক্রমাগত সৃষ্ট হয়ে চলেছে দ্বীপ-জগৎ ও নক্ষত্রাদি জ্যোতিষ্ক।

মহাগুরু, মহাতপ্ত ও মহোজ্জ্বল একটি আদি পিণ্ড ও তার বিস্ফোরণের সমর্থনে জর্জ গ্যামো, উইৎসেকার প্রমুখ প্রখ্যাত বিজ্ঞানীরা নানা বৈজ্ঞানিক তথ্য ও যুক্তি দেখিয়েছেন। আদি পিণ্ড

বা ইলেমের বিস্ফোরণ হেতু ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির সূত্রপাত হয়েছে—এই প্রকার অনুমান-নির্ভর বলে এই মতবাদকে Big Bang বা Big Squeeze বলা হয়। কিন্তু স্বভাবতঃই মনে প্রশ্ন জাগে, ইলেমের আগে কি ছিল? প্রশ্নটাকে ঘুরিয়ে জর্জ গ্যামো সরস করে লিখেছেন—সেন্ট অগষ্টাইনের মনেও প্রশ্ন জেগেছিল—ভগবান তো স্বর্গ সৃষ্টি করলেন, পৃথিবী সৃষ্টি করলেন, কিন্তু তার আগে তিনি কি করছিলেন?

ঐ বিস্ফোরণের পর ক্রম-নিম্নগ চাপ ও তাপ মাত্রায় অতি অল্প সময়ের মধ্যে যে অবস্থায় যেমন সম্ভব হয়েছে, তেমনই বিভিন্ন সংশ্লেষণে যুক্ত হয়ে ইলেমের শক্তিকণাসমূহ সর্ববিধ মৌলিক পদার্থের পরমাণু সৃষ্টি করলো। ইউরেনিয়াম, থোরিয়াম প্রভৃতি তেজস্ক্রিয় ভারী মৌলিক পদার্থের উদ্ভব হতে অপরিসীম চাপ ও তাপের দরকার। অতএব সর্বপ্রথম ঐ সকল ভারী মৌলিক পদার্থ উৎপন্ন হলো। তারপর অতি দ্রুত পর্যায়ে অন্য সব অপেক্ষাকৃত হাল্কা মৌলিক পদার্থের সৃষ্টি হয়েছে। প্রচণ্ড বিস্ফোরণ মতবাদে এই ভাবেই সুদূরের কোন এক অতীতে ব্রহ্মাণ্ডের সূচনা হয়েছিল।

ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি সম্পর্কে অপর অনুমানটি সদা-সমাবস্থা (Steady State) মতবাদ নামে আখ্যাত। বিশিষ্ট জ্যোতির্বিজ্ঞানী ফ্রেড হয়েল, টি. গোল্ড ও এইচ. বণ্ডি এই মতবাদের স্রষ্টা। কোন আদি পিণ্ডের বিস্ফোরণের ফলে ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির সূত্রপাত—একথা এই বিজ্ঞানীরা স্বীকার করেন না। এঁরা বলেন, প্রসারণ সত্ত্বেও সার্বিক বিন্যাসে ব্রহ্মাণ্ড চিরকাল সমাবস্থায় আছে।

ব্রহ্মাণ্ডের প্রসারণ হেতু দ্বীপ-জগৎসমূহের অন্তর্বর্তী দূরত্ব বাড়ছে। এখন থেকে কয়েক লক্ষ বছর পরে আমরা যদি আবার পৃথিবীতে এসে একই শক্তিশালী দূরবীনের সাহায্যে ফটোগ্রাফ নিই, তাহলে সেই আলোকচিত্রে এখনকার অপেক্ষা অনেক কম দ্বীপ-জগতের ছবি ধরা পড়বার কথা। এমনটি যদি সত্য হয়, তবে বুঝতে হবে যে, কতকগুলি গ্যালাক্সী ইতিমধ্যে দূরে সরে গেছে, তাদের স্থান আর পূর্ণ হয় নি। সমাবস্থা-বাদী বিজ্ঞানীরা বলেন যে, নতুন দ্বীপ-জগতের সৃষ্টি অবিরাম চলছে এবং অধুনা বা সুদূর ভবিষ্যতে যে কোন সময়েই সেই শক্তিশালী দূরবীনের গৃহীত আলোকচিত্রে প্রায় সমসংখ্যক দ্বীপ-জগতের ছবিই ধরা পড়বে।

তাহলে মানতে হয় যে, গ্যালাক্সীগুলি দূরে সরে গেলে ব্রহ্মাণ্ডের সাম্য রক্ষিত হয় সমহারে নতুন গ্যালাক্সীর সৃষ্টির দ্বারা। এই মতবাদই সদা-সমাবস্থা। প্রক্রিয়াটিকে ভাষান্তরে অবিরাম সৃষ্টি (Continuous Creation) মতবাদও বলা হয়।

এই মতের প্রধান প্রবক্তা বৃটিশ বিজ্ঞানী ফ্রেড হয়েল। তিনি বলেন, সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডে পদার্থের গড় ঘনত্ব চিরকাল একই রয়ে যাচ্ছে। এই গড় ঘনত্ব অতীতে যা ছিল, বর্তমানে তাই আছে, ভবিষ্যতেও তাই থাকবে। প্রসারণ হেতু ব্রহ্মাণ্ডের ব্যাপ্তি বাড়লে ঘনত্ব যতটা কমে, পরিপূরক নতুন পদার্থের সৃষ্টির দ্বারা ঘনত্ব আবার সেই পূর্বেকার অবস্থায় ফিরে আসে। এইভাবে ব্রহ্মাণ্ডের গড় ঘনত্ব আবহমানকাল একই থেকে যাচ্ছে। সৃষ্ট নতুন পদার্থ থেকেই উৎপন্ন হয় নতুন গ্যালাক্সী ও তার মধ্যে নতুন নক্ষত্র। এই মতবাদে ব্রহ্মাণ্ডের আরম্ভ নেই, শেষও নেই—ব্রহ্মাণ্ড অনাদি অনন্ত।

কিন্তু প্রশ্ন ওঠে, এই পরিপূরক নতুন পদার্থ আসে কোথা থেকে? এর উত্তর নিশ্চয়ই শূন্য থেকে। কিছু নেই থেকে কিছুর জন্ম। এর সমাধান করতে গিয়ে ঐ বিজ্ঞানীরা যে অনুমান

আশ্রয় নিয়েছেন, তার ভিত্তিও কল্পনাশ্রয়ী। এখানেই এই মতবাদের একটি প্রধান দুর্বলতা।

এদিকে বেতার-জ্যোতিষের আবিষ্ক্রিয়া জ্যোতির্বিজ্ঞানকে সমৃদ্ধ করে চলেছে। ১৯৬৩-৬৫ সালের মধ্যে কতকগুলি আশ্চর্য বেতার-উৎসের সন্ধান পাওয়া গেল। আলোকচিত্রে দেখা যায়, এরা আয়তনে এক একটা সাধারণ নক্ষত্রের সমতুল্য অথচ একটা সম্পূর্ণ গ্যালাক্সী থেকে যে পরিমাণ বেতার-রশ্মি বিকিরিত হয়, এদের প্রত্যেকের বেতার-শক্তি অন্ততঃ ততটাই বিরাট। এদের নাম দেওয়া হয়েছে কোয়াসার। Quasi Stellar Radio Sources শব্দগুলিকে সংক্ষেপ করে Quaser শব্দটির উৎপত্তি।

এলেন স্যাণ্ডেজ, মার্টিন স্মিথ প্রমুখ বিজ্ঞানী-দের গবেষণায় জানা গেছে, কোয়াসারের অপরিসীম ঔজ্জ্বল্যের সঙ্গে অন্য কোনও জ্যোতিষ্কের তুলনাই চলে না। এদের কোন কোনটার একক দেহে প্রায় একশত গ্যালাক্সীর দীপ্তি বর্তমান। এদের বিকিরণে অতিবেগুনী রশ্মির প্রাচুর্য, আর সেই সঙ্গে আছে অতি শক্তিশালী বেতার-তরঙ্গ। এদের বর্ণালীর সঙ্গে অপর কোন জাত নক্ষত্র, নোভা, অতিনোভা, নীহারিকা অথবা দ্বীপ-জগতের বর্ণালীর মিল নেই। এত উজ্জ্বল বলেই এরা আমাদের নিকটবর্তী কোন নক্ষত্র বলে ভ্রম হয়। প্রকৃতপক্ষে আমাদের বৃহত্তম দূরবীনের স্বাভাবিক দৃষ্টিসীমা পেরিয়ে আরও বহুদূরে এদের অবস্থান।

কোয়াসারের দেহ থেকে বিকিরিত তেজের প্রকৃতি, তার দূরত্ব, তার শক্তিমত্তা প্রভৃতি পর্যালোচনা করে ফ্রেড হয়েল দেখলেন, এই অত্যাশ্চর্য জ্যোতিষ্কের সঙ্গে সমাবস্থা মতবাদের সামঞ্জস্য ঘটানো যায় না। তাই ১৯৬৫ সালের অক্টোবর মাসে ফ্রেড হয়েল ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিরহস্য সম্বন্ধে তাঁর স্বরচিত ও কুড়ি বছর যাবৎ সুপ্রথিত সদা-সমাবস্থা মতবাদ প্রত্যাহার করেছেন।

ব্রহ্মাণ্ডের স্বরূপ

ব্রহ্মাণ্ড সসীম কি অসীম—এই ভাবনা সর্বদেশের সর্বকালের চিন্তানায়কদের, কিন্তু আজও এর কোন প্রশ্নাতীত মীমাংসা হয় নি। মহাকর্ষ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে মহামতি আইনষ্টাইন অনুমান করেছিলেন 'দেশের বক্রতা' (Curvature of Space)। এই তথ্যকে ভিত্তি করেই অনেক মনীষী বলেছেন—"ব্রহ্মাণ্ড পরিমিত অথচ সীমাহীন" (Finite but Unbounded)। 'দেশের বক্রতা' বলতে কি বোঝায় তার কোন সুস্পষ্ট ধারণা কারও আছে কি না, সে বিষয়ে বিশিষ্ট বিজ্ঞানীরাও সন্দেহ প্রকাশ করেন। আবার 'পরিমিত অথচ অসীম' এই পরস্পর বিরোধী ভাবাপন্ন শব্দদ্বয়ের দ্বারা ব্রহ্মাণ্ডের স্বরূপ মানসচক্ষে আনা দুরূহ। এক্ষেত্রে ভূগোলকের একটা অনুরূপ দৃষ্টান্ত ঐ ব্রহ্মাণ্ডের ধারণা আনতে সহায়ক হতে পারে; যেমন—পৃথিবীর বঙ্কিম উপরিভাগের আয়তন পরিমিত কিন্তু সীমাহীন। ভূপৃষ্ঠের আয়তনের বিস্তৃতি পরিমাপ করা যায়, কিন্তু তার উপর যতই ঘোরা যাক, তার সীমানা পাওয়া যাবে না। ভূপৃষ্ঠের আয়তনের কোন কেন্দ্রবিন্দু নেই, কোন প্রান্তও নেই। গোলকের পৃষ্ঠে যে কোন স্থানে দাঁড়িয়েই চতুর্দিকে একই দৃশ্যাবলী দেখা যাবে, পৃষ্ঠের যে কোন বিন্দুকেই কেন্দ্র ভাবা যেতে পারে। কিন্তু সম্পূর্ণ ভূগোলকের একটি কেন্দ্র আছে, অতএব সীমিত একটি ব্যাসার্ধও আছে। ব্রহ্মাণ্ডেরও সেইরূপ কোথাও না কোথাও কোন একটি কেন্দ্র আছে, অতএব ব্যাসার্ধও আছে, কিন্তু তার ব্যাসার্ধের মাপ পরিবর্তনশীল—কারণ ব্রহ্মাণ্ড প্রসারিত হচ্ছে।

আইনষ্টাইনের আপেক্ষিকতাতত্ত্ব পর্যালোচনা করে বিজ্ঞানীরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, ঐ তত্ত্ব অনুসারে ব্রহ্মাণ্ডের তিন প্রকার পরিণতি সম্ভব।

১। ব্রহ্মাণ্ড ক্রমশঃ সঙ্কুচিত হয়ে যাবে, অথবা

২। ব্রহ্মাণ্ড অনন্তকাল ধরে ক্রমাগত সম্প্রসারিত হয়ে যাবে, অথবা

৩। সীমিত সময়ের মধ্যে ব্রহ্মাণ্ড পর্যায়ক্রমে একবার প্রসারিত ও একবার সঙ্কুচিত হতে থাকবে।

প্রথম সম্ভাবনাটির কোনও প্রশ্ন ওঠে না, কারণ ব্রহ্মাণ্ডের প্রসারণ প্রমাণিত হয়ে গেছে। অনেক বিশিষ্ট বিজ্ঞানী দ্বিতীয় পরিণামে বিশ্বাসী, আবার অনেক প্রখ্যাত বিজ্ঞানী তৃতীয় পরিণামে বিশ্বাস করেন।

সঞ্চয়ন

প্রোটিনসমৃদ্ধ ডালের উন্নতিসাধন

ডাল আমাদের অন্যতম প্রধান খাদ্য। একথা আজ ব্যাপকভাবে স্বীকৃত হয়েছে যে, মানুষ বেশী পরিমাণে ডাল খেতে অভ্যস্ত হলে বিশ্বের খাদ্যসমস্যার অনেকখানি সুরাহা হবে। দুঃখের বিষয় ভারতে ও অন্য বহু উন্নতিশীল দেশে ডাল সকল সময় সহজপ্রাপ্য নয়। আবার অনেক জায়গাতেই এত দুর্মূল্য যে, তা সাধারণ মানুষের ক্রয়-ক্ষমতার বাইরে। বর্তমানে পশ্চিম বাংলায়ও আমরা এই অবস্থায় এসে পৌঁচেছি। খাদ্যবস্তুতে প্রোটিনের অভাব যখন এত প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছে, তখন ডালের উৎপাদন বৃদ্ধির দিকে মনোযোগ দেবার সময় এসেছে।

এই বিষয়ে নয়া দিল্লীতে কৃষি-বিজ্ঞানীরা এক নীরব সাধনা করে চলেছেন। এঁদের গবেষণার উদ্দেশ্য ডালের উৎপাদন বাড়ানো ও দর কমানো। এই প্রচেষ্টায় ভারতীয় ও মার্কিন কৃষি-বিজ্ঞানীরা একযোগে সহায়তা করছেন।

ডালের এই উন্নয়ন পরিকল্পনায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা ও মার্কিন কৃষি দপ্তর উভয়েই সাহায্য করছে। পরিকল্পনাটির নাম দেওয়া হয়েছে—আঞ্চলিক ডাল উন্নয়ন প্রকল্প। পরিকল্পনাটি বহুজাতিক এবং এর পরীক্ষামূলক কাজ দক্ষিণ এশিয়া থেকে সারা মধ্যপ্রাচ্য হয়ে আফ্রিকা পর্যন্ত বিস্তৃত হবে। ভারত, ইরান, আফগানিস্তান, মিশর ও তুরস্ক এতে অংশ গ্রহণ করেছে। ভারত ও ইরানেই অধিকাংশ গবেষণার কাজ চলবে।

বর্তমানে বিশ্বের দুই-তৃতীয়াংশ মানুষ যে খাদ্যবস্তুর উপর নির্ভর করে, তার গড়পড়তা পুষ্টিমূল্য পর্যাপ্ত নয়। জাপান ও ইজরায়েল ব্যতীত সমগ্র এশিয়া, দক্ষিণাঞ্চল ব্যতীত সমগ্র আফ্রিকা, দক্ষিণ আমেরিকার উত্তর ভাগ এবং প্রায় সমগ্র সেণ্ট্রাল আমেরিকায় এই অবস্থা চলছে। এই পুষ্টির ঘাটতির পরিমাণ পর্যাপ্ত পুষ্টিমূল্যযুক্ত খাদ্যাঞ্চলের চেয়ে দৈনিক ৯০০ ক্যালরী কম।

খাদ্যে প্রোটিনের পরিমাণকেই পুষ্টিমূল্যের মাপকাঠি ধরা হয়। জান্তব প্রোটিনই শ্রেষ্ঠ প্রোটিন বলে গণ্য হলেও কোন কোন উদ্ভিজ্জ প্রোটিনও কম উপকারী নয়। এই রকম প্রোটিন হলো ডালের প্রোটিন।

চাল, গম, সরগুম—এমন কি, ভুট্টার চেয়েও বেশী প্রোটিন আছে ডালে, সাধারণ খাদ্যশস্যের চেয়ে শতকরা ১০ ভাগ বেশী।

বিভিন্ন জাতীয় ডালের উন্নতিসাধন, শস্যের

ব্যাধি নিয়ন্ত্রণ, মড়ক নিবারণ এবং চাষের উন্নতি নিয়ে ইতিমধ্যেই গবেষণা করা হচ্ছে।

পাঁচজন মার্কিন বিজ্ঞানী বর্তমানে এই পরিকল্পনায় ভারতে কাজ করছেন। এঁরা হলেন প্রজননবিদ্যাবিদ এবং উদ্ভিদ-প্রজননবিদ্যা-বিশারদ ডাঃ রিচার্ড মাৎসুরা, উদ্ভিদের রোগ বিশেষজ্ঞ ফ্লয়েড উইলিয়াম্‌স্‌, কৃষিবিদ ও অণুজীব-বিজ্ঞানী রবার্ট ডেভিস, কীটতত্ত্ববিদ কেনেথ গিবসন এবং পরিচালনার ব্যাপারে ওয়াল্টার ল্যানসিং।

মার্কিন বিজ্ঞানীদের সঙ্গে সহযোগিতা করবার জন্যে কয়েকজন ভারতীয় বিশেষজ্ঞ শীঘ্রই নিযুক্ত হবেন। নয়া দিল্লীর ভারতীয় কৃষি-গবেষণা মন্দির, মাদ্রাজ রাজ্যের কোয়েম্বাটুর কৃষি কলেজ এবং সকল রাজ্য সরকার ও অধিকাংশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এই প্রকল্পে সাহায্য করছেন।

এই পরিকল্পনার জন্যে বহু প্রকার ছোলা সংগ্রহ করা হয়েছে পরীক্ষার জন্যে। পৃথিবীর বিভিন্ন স্থান থেকে অড়হড় সংগ্রহ করা হচ্ছে।

১৯৬৫ সালের ডিসেম্বর মাস থেকে বিশেষজ্ঞেরা এখানে এই প্রকল্পে কাজ শুরু করেছেন।

ডালের মধ্যে নানাজাতীয় অ্যামিনো-অ্যাসিড পর্যাপ্ত পরিমাণে রয়েছে। খাদ্যে এই অ্যামিনো-অ্যাসিডের মান বৃদ্ধি করতে পারলেই এর প্রোটিনের ভাগ উন্নত হয়। প্রকল্পে এই চেষ্টা করা হচ্ছে।

চিকিৎসা-বিজ্ঞানে গবেষণাকারীদের সহায়তায় ডাল উৎপাদন পরিকল্পনায় অ্যামিনো-অ্যাসিড সংক্রান্ত তথ্য কাজে লাগানো হবে। এই ব্যাপারে রকফেলার ফাউণ্ডেশনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতায় কাজ করা হবে।

১৯৬৬ সালে ভেষজ-বিজ্ঞানের নোবেল পুরস্কার

ক্যান্সার রোগের গবেষণায় উল্লেখযোগ্য অবদানের জন্যে ১৯৬৬ সালে ভেষজ-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে নোবেল পুরস্কারটি দু-জন মার্কিন বিজ্ঞানীকে দেওয়া হয়েছে। এঁদের একজন হলেন নিউ-ইয়র্কের রকফেলার বিশ্ববিদ্যালয়ের প্যাথোলজিষ্ট ডাঃ ফ্র্যান্সিস পি. রাউস এবং শিকাগো বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ৬৫ বছর বয়স্ক একজন শল্যচিকিৎসক অধ্যাপক ডাঃ চার্লস বি. হাগিন্স। এই মারাত্মক রোগ নিরাময়ের ক্ষেত্রে এরকম কাজ এর আগে হয় নি।

ডাঃ হাগিন্সকে যে এই পুরস্কার দেওয়া হয়েছে, তার একটা বিশেষ তাৎপর্য আছে। শল্যচিকিৎসক হিসাবে যাঁরা এই পুরস্কারটি পেয়েছেন, তাঁদের মধ্যে তিনি দ্বিতীয় ব্যক্তি। এর আগে প্রথম যে সার্জেন বা শল্যচিকিৎসককে এই পুরস্কার দিয়ে সম্মানিত করা হয়েছিল, তাঁর নাম এমিল ডিয়োডোর কোচার। সুইজারল্যাণ্ডের এই প্রখ্যাত চিকিৎসক এই পুরস্কারটি পেয়েছিলেন ১৯০১ সালে। যে কাজের জন্যে ডাঃ হাগিন্সকে এই পুরস্কার দেওয়া হয়েছে, তা ২৫ বছরেরও বেশী হলো তিনি সমাপ্ত করেছেন।

ডাঃ রাউসকে যে কাজের জন্যে পুরস্কৃত করা হয়েছে, সে কাজটি তিনি সমাধা করছিলেন ৫৫ বছর আগে। পুরস্কার দানের ব্যাপারে এটা খুবই অস্বাভাবিক ব্যাপার। সুদীর্ঘকাল পরে তিনি যে তাঁর কাজের জন্যে স্বীকৃতি পেয়েছেন, তার কারণ হলো পঞ্চাশ বছর আগে তিনি যখন তাঁর গবেষণা সমাপ্ত করেছিলেন, তখন তাঁর সহযোগী বিজ্ঞানীদের কাছে এর গুরুত্ব এবং তাৎপর্য ধরা পড়ে নি। যদিও নোবেল কমিটি তাঁর গবেষণা সম্পর্কে বলেছেন, এর গুরুত্ব প্রতি বছরই বেড়ে গিয়েছে।

১৯১১ সালে ডাঃ রাউস যখন ৩২ বছর বয়সের যুবক, তখন তিনি বলেছিলেন যে, সুস্থ মুরগীর দেহে রোগগ্রস্ত মুরগীর দেহের অংশ-বিশেষের রস ইঞ্জেকসন করে ক্যান্সার ঘটিয়েছেন। তিনি কিন্তু ঐ রোগগ্রস্ত অংশের সূক্ষ্ম পরিস্রুত চূর্ণ নিয়ে রস তৈরি করে ইঞ্জেকসন দিয়েছিলেন। এই রোগের নাম সারকোমা, অর্থাৎ এক জাতীয় ক্যান্সার। তাঁর কথা তখন অনেকেই হেসে উড়িয়ে দিয়েছিলেন। কেউ কেউ এমন মন্তব্যও করেছিলেন যে, ডাঃ রাউস ভুলে ক্যান্সার রোগগ্রস্ত পুরা কোষ সুস্থ মুরগীর দেহে ইঞ্জেকসন করে বসে আছেন। কাজেই ঐ মুরগীর দেহে যে রোগ দেখা গেছে, সেটা ক্যান্সার নয়।

ঐ সময়ে ক্যান্সার রোগদুষ্ট কোন কোষ বা সেল কোন প্রাণীর দেহ থেকে অন্য প্রাণীর দেহে জুড়ে দেওয়া বা সংযোজন করা প্রায় অসম্ভবই ছিল। এই কাজের পথে ছিল বহু অন্তরায় এবং সেই প্রচেষ্টা তখন খুব কমই সফল হতো। কিন্তু ডাঃ রাউস প্রমাণ করেছিলেন যে, কোষের মধ্যে এমন কিছু আছে, যা এক দেহ থেকে অন্য দেহে রোগ-বীজাণু বহন করে নিয়ে যেতে পারে—এ হলো ভাইরাস।

কিন্তু ১৯৩০ সাল থেকে যে দশক সুরু হয়, সেই দশকের আগে অন্য কোন বিজ্ঞানীর গবেষণার দ্বারা ডাঃ রাউসের সিদ্ধান্ত সমর্থিত হয় নি বা তাঁরই সিদ্ধান্ত ভিত্তি করে আর কোন গবেষক গবেষণাও চালান নি। কিন্তু এই যুগে রাউসের গবেষণার ফলাফলকে ভিত্তি করেই ভাইরাস-বাহিত ক্যান্সার রোগ সম্পর্কে গবেষণা চালানো হচ্ছে এবং নতুন নতুন উদ্ভাবনও চলছে।

ক্যান্সার রোগের গবেষণার ক্ষেত্রে শল্য-চিকিৎসক হাগিন্স ১৯৪১ সালে বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। ঐ বছরে অণ্ডকোষ অপসারণ কালে এই রোগ নিরাময়ের কারণ সম্পর্কে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তাঁর চোখে পড়ে প্রোষ্টেট গ্ল্যাণ্ড বা মূত্রগ্রন্থিতে ক্যান্সার রোগের জন্যেই অণ্ডকোষ অপসারণের প্রয়োজন হয়েছিল। প্রোষ্টেট গ্ল্যাণ্ডে ক্যান্সার মধ্যবয়সীদের পক্ষে খুবই মারাত্মক হয়ে থাকে। রোগদুষ্ট অণ্ডকোষ অপসারণের ফলে রোগ নিরাময় ঘটে। ডাঃ হাগিন্স তখন প্রমাণ করেন যে, অণ্ডকোষের মধ্যে যে হর্মোন তৈরি হয়, তাও অণ্ডকোষ অপসারণের সঙ্গে সঙ্গে অপসারিত হওয়ায় রোগীর দেহে যে রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটে, তারই ফলে এই নিরাময় ঘটে। দেহাভ্যন্তরে বিভিন্ন অন্তঃস্রাবী গ্রন্থি বা এণ্ডোক্রাইন গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত জৈব রসকে বলে হর্মোন। তাঁর মতে, শল্যচিকিৎসার ফলে এই নিরাময় ঘটে নি।

এর ফলে হর্মোন ক্যান্সার গবেষণার ক্ষেত্রে একটি নতুন দ্বার উদ্‌ঘাটিত হয়। শল্যচিকিৎসা ছাড়াই পুরুষদের এই রোগে মেয়েদের হর্মোন খাইয়ে এই চিকিৎসার ব্যবস্থা হয়। এর ফলে ক্যান্সার চিকিৎসার একটি নতুন পন্থা উদ্ভাবিত হয়। মেয়েদের স্তনের ক্যান্সারের চিকিৎসাও অনুরূপ ভাবে পুরুষদের দেহ থেকে সংগৃহীত হর্মোনের সাহায্যে করা হয়। এই চিকিৎসা পদ্ধতিতে বেশ সুফলও পাওয়া যায়।

যে সকল হর্মোন প্রয়োগে পুরুষদের মেয়েলিভাব এবং মেয়েদের পুরুষালি ভাব বৃদ্ধির সাহায্য করে না, সে রকম হর্মোনও পরবর্তী কালে ডাঃ হাগিন্স কর্তৃক উদ্ভাবিত হয়েছে।

এই মারাত্মক রোগ নিরাময়ের ক্ষেত্রে বিশেষ উল্লেখযোগ্য অবদানের জন্যেই ডাঃ হাগিন্স ও ডাঃ রাউসকে নোবেল পুরস্কার দিয়ে সম্মানিত করা হয়েছে। ১৯০১ সাল থেকে আজ পর্যন্ত বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মোট ৩৫০ জনেরও বেশী বিজ্ঞানী, সাহিত্যিক ও শান্তিকামীকে ৩০০টি নোবেল পুরস্কার দিয়ে সম্মানিত করা হয়েছে।

ডাঃ রাউস ও ডাঃ হাগিন্স আরও

কয়েকটি ক্ষেত্রেও বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছেন। ডাঃ রাউস রক্ত সংরক্ষণের যে উপায়টি উদ্ভাবন করেছেন, তা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বিশ্বের ব্লাড ব্যাঙ্কসমূহে এই ব্যবস্থা খুবই কাজে লাগছে। এই দু-জন বিশিষ্ট বিজ্ঞানী আমেরিকা ও অন্যান্য দেশ থেকেও বহু পুরস্কার পেয়েছেন। এই দু-জনের কারোরই কর্ম থেকে অবসর গ্রহণের কোন অভিলাষ নেই।

ডাঃ রাউস ক্যান্সার ভাইরাসের গবেষণা নিয়ে এখন আর বেশী মাথা না ঘামালেও তিনি জার্ণাল অব এক্সপেরিমেন্টাল মেডিসিন নামে সাময়িক পত্রের সম্পাদন করবার জন্যে এবং যে সকল গবেষক যকৃৎ ও পিত্তকোষ নিয়ে গবেষণা করছেন, তাঁদের নির্দেশ দানের জন্যে নিয়মিত-ভাবেই রকফেলার বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণাগারে এসে থাকেন। প্রায় অর্ধ শতাব্দী পূর্বে এই পত্রিকা-খানিতেই তাঁর ক্যান্সার ভাইরাস সম্পর্কে গবেষণার বিবরণী প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল।

ডাঃ হাগিন্স সপ্তাহের সাত দিনই কাজ করে থাকেন এবং তিনি তাঁর শিকাগোর গবেষণাগারে যে সকল পদার্থ অন্ত কোষে প্রবিষ্ট হয়ে ক্যান্সার রোগের সঞ্চার করতে পারে, এরকম কয়েকটি পদার্থ নিয়ে গবেষণা করছেন। এছাড়া ক্যান্সার রোগ প্রতিরোধ করতে পারে, এরকম আরও কয়েকটি পদার্থ নিয়েও তাঁর গবেষণা চলছে। ডাঃ হাগিন্সের সহকর্মীদের অভিমত—এক্ষেত্রে ডাঃ হাগিন্সের গবেষণার ফলাফল এখনও পুরাপুরি প্রকাশিত হয় নি।

তেজস্ক্রিয়ার সাহায্যে খাদ্যবস্তু সংরক্ষণ

আমেরিকায় বর্তমানে দুটি বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়েই রেডিয়েশন বা তেজস্ক্রিয়া সম্পর্কে গবেষণা চালানো হচ্ছে। প্রথমতঃ হিমায়ন ব্যবস্থা বা রেফ্রিজারেশান ছাড়াই মাংস প্রভৃতি খাদ্যকে বীজাণুমুক্ত করে দীর্ঘকাল অবিকৃত অবস্থায় রাখবার কোন পন্থা উদ্ভাবন করা যায় কিনা, সে বিষয়ে পরীক্ষা করে দেখা। দ্বিতীয়তঃ হিমায়ন ব্যবস্থায়ও যে সকল পাকা ফল ইত্যাদি সুদীর্ঘকাল রাখা যায় না সেই পচনশীল পদার্থ-সমূহকে তেজস্ক্রিয়ার সাহায্যে ও হিমায়ন ব্যবস্থায় আরও বেশী সময় অটুট রাখা যায় কিনা, সে সম্পর্কেও পরীক্ষা করে দেখা।

খাদ্য নষ্ট ও বিকৃত হওয়ার পিছনে বহু কারণই আছে। ভৌতিক, রাসায়নিক ও এনজাইমগত পরিবর্তনের ফলে খাদ্যবস্তুর বিকৃতি ঘটে এবং নষ্ট হয়ে যায়। পোকামাকড় এবং যে সকল ক্ষুদ্র কীট অণুবীক্ষণে মাত্র দেখা যায়, সে সকলও রয়েছে খাদ্যবস্তু নষ্ট হবার পিছনে।

এই ক্ষুদ্র কীটসমূহ প্রায়ই পচনশীল বস্তু-সমূহের পচে যাবার প্রধান কারণ হয়ে থাকে। এসব শত্রুর কবল থেকে কেবল মাত্র হিমায়ন ব্যবস্থার মাধ্যমে খাদ্যবস্তু সংরক্ষণ সম্ভব হয় না, তবে এই ব্যাপারে সহায়ক হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে তেজস্ক্রিয়ার সাহায্যেই পচন নিবারণ এবং আরও বেশী সময় এই সকল খাদ্যবস্তু সংরক্ষণ সম্ভব হতে পারে।

পোকামাকড়ও পৃথিবীর বহু দেশেই শস্যের, বিশেষ করে গম, ময়দা প্রভৃতির প্রভূত ক্ষতি করে থাকে। বর্তমানে তেজস্ক্রিয়ার সাহায্যে এই সমস্যা সমাধানের এবং পোকামাকড় নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা হয়েছে। তেজস্ক্রিয়ায় পোকামাকড় মরে যায় অথবা বন্ধ্যা হয়ে যায় বলে এদের আর বংশবৃদ্ধি হয় না।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বেশীর ভাগ উদ্যোগই এক্ষেত্রে ফিন ও শেল প্রভৃতি যে সকল মাছ সমুদ্র থেকে সংগৃহীত হয়, তাদের সংরক্ষণে ব্যয়িত

হয়ে থাকে। এসব মাছ হিমঘরে টাট্‌কা অবস্থায় মাত্র কয়েক দিন রাখা যায়। কিন্তু শত শত টন সামুদ্রিক মাছ তেজস্ক্রিয়ার দ্বারা শোধন করে কেবলমাত্র কয়েক দিন নয়, কয়েক সপ্তাহ পর্যন্ত যে হিমঘরে অবিকৃত অবস্থায় রাখা যায়, তা এসকল মাছ বিভিন্ন স্থানে চালান দেবার সময় প্রমাণিত হয়েছে।

এই প্রক্রিয়া পেঁপে, কলা, টমেটো প্রভৃতি নির্দিষ্ট কয়েক প্রকার ফল ও সব্জীর উপর প্রয়োগ করেও বিশেষ ফল পাওয়া গেছে। কলা খুব তাড়াতাড়ি পেকে যায় এবং যথাসময়ে বিক্রয় করতে না পারলে নষ্টও হয়ে থাকে। এই প্রক্রিয়ায় অর্থাৎ তেজস্ক্রিয়ার সাহায্যে এসব ফল শীঘ্র যাতে না পাকে অর্থাৎ ফলের এই অবস্থা যাতে নিয়ন্ত্রণ করা যায়, তারই জন্যে নানা পরীক্ষা চালানো হচ্ছে।

হাওয়াই বিশ্ববিদ্যালয়ে তেজস্ক্রিয়ার সাহায্যে ফল সংরক্ষণের গবেষণা হচ্ছে। ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকেরা দেখেছেন, পাকা পেঁপেকে গরম জল ও তেজস্ক্রিয়ার সাহায্যে সম্পূর্ণ পাকা অবস্থায় তিন-চার দিন অবিকৃত অবস্থায় রাখা যায়। বিজ্ঞানীরা সপ্তাহখানেক রাখবার জন্যে চেষ্টা করছেন। এই গবেষণা সফল হলে পেঁপে নানাদেশে বিমানে না পাঠিয়ে জাহাজে করেই পাঠানো যাবে এবং তাতে পরিবহন খরচও অনেক কমে যাবে।

ক্যালিফোর্ণিয়া বিশ্ববিদ্যালয়েও এই বিষয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে। ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীরা টমেটো নিয়ে গবেষণা করেছেন। তাঁরা প্রমাণ করেছেন যে, একেবারে পাকা টমেটো আট থেকে পনেরো দিন পর্যন্ত অবিকৃত অবস্থায় রাখা যেতে পারে। ফলে এই সকল ফল বাজারে বিক্রয়ের সুযোগ অনেকখানি বেড়ে যায়। পচে-গলে নষ্ট হয়ে যাবার সম্ভাবনাও অনেকখানি হ্রাস পায়। এজন্যে এদের বিমানে চালান না দিয়ে জাহাজযোগে চালান দেবার সুযোগ অনেক বৃদ্ধি পাবে। এতে পরিবহনের খরচও অনেক কম লাগবে।

তেজস্ক্রিয়ার সাহায্যে খাদ্যবস্তুর অপচয় নিবারণ বহু দেশের খাদ্যের ঘাট্‌তি পূরণে সহায়ক হতে পারে। নানা প্রকার রাসায়নিক পদার্থের ধোঁয়া ও অন্যান্য দ্রব্যের সাহায্যে ও খাদ্যবস্তু সংরক্ষণ করা হয়।

ব্যবসা-বাণিজ্যিক ভিত্তিতে ব্যাপক ক্ষেত্রে এই প্রক্রিয়ায় খাদ্যবস্তু সংরক্ষণের ব্যবস্থা হলে সমগ্র বিশ্বেরই কল্যাণ সাধিত হবে, পচনশীল খাদ্য-দ্রব্যেরও আন্তর্জাতিক ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্র সম্প্রসারিত হবে।

গণিতশাস্ত্রের একটি ধ্রুবক π

অমিতোষ ভট্টাচার্য

গণিতশাস্ত্রকে বলা হয় বিজ্ঞানের রাণী। বিজ্ঞান-জগতে গণিতশাস্ত্রকে যদি রাণীর সম্মান দেওয়া হয়ে থাকে, তা কিন্তু আদৌ বাড়াবাড়ি বলে মনে করবার কোন কারণ নেই। এই শাস্ত্রের ব্যাপ্তি, গভীরতা আর প্রকাশক্ষমতার আভিজাত্য সম্পর্কে কারো মনে কোন প্রশ্ন নেই। বিজ্ঞানের সর্বশাখার নানা দুরূহ তত্ত্বকে সহজ করে নানা-ধরণের গাণিতিক শৃঙ্খলে বেঁধে রাখবার ক্ষমতা অঙ্কশাস্ত্রের যেমনটি আছে, অন্য কোন শাস্ত্রের তা নেই। নানারকমের জটিল সমীকরণ, সিদ্ধান্ত, অনুমান, ধ্রুবক ইত্যাদি বিভিন্ন চরিত্র নিয়ে বিজ্ঞান-জগতের এই রাণীর রাজত্ব আর বিজ্ঞানের নানা শাখায় নিজেদের নিত্যনতুন ভাবে প্রকাশ করে নানা সমস্যার সমাধান করাই এই সব চরিত্র-গুলির বৈশিষ্ট্য। এই বৃহৎ রাজ্যের একটি চরিত্র বেশ মজার এবং গাণিতিকেরা এই চরিত্রটির আভিজাত্য নিয়ে অনেক বিশ্লেষণ ও গবেষণা

১নং চিত্র

করেছেন। এর নাম পাই এবং গণিতশাস্ত্রে π—এই গ্রীক অক্ষরটি দিয়ে প্রকাশ করা হয়। π-এর মান সব সময়, সব অবস্থায় স্থির থাকে বলে একে অঙ্কশাস্ত্রে বলা হয় ধ্রুবক বা Constant। অবশ্য অঙ্কশাস্ত্রে π ছাড়া আরও অসংখ্য ধ্রুবক আছে। কিন্তু বর্তমান প্রবন্ধে আমরা শুধু π নিয়েই আলোচনা করবো।

বৃত্তের পরিধি আর ব্যাসের অনুপাতকে বলা হয় π এবং এর মান $\frac{২২}{৭}$ বা ৩·১৪৩৬-এর কাছাকাছি। এটা গেল π-এর মোটামুটি একটা সংজ্ঞা এবং আমরা সবাই এই পর্যন্ত জেনেই খুশী। কিন্তু π-এর পেছনে একটা গৌরবময় ইতিহাস রয়েছে। স্মরণাতীত কাল থেকে গণিতে π-এর ব্যবহার চলে আসছে। অঙ্কশাস্ত্রবিদ হিসাবে ইউক্লিডের পর আর্কিমিডিসের (খৃঃ পূঃ ২৮৭—২১২) মত প্রতিভা খুব বেশী দেখা যায় নি। পদার্থের আপেক্ষিক গুরুত্ব নির্ণয়ের সূত্র

আবিষ্কার করা ছাড়াও জ্যামিতির নানা শাখায় তাঁর অবদান অনেক। বৃত্তের ক্ষেত্রফল (πr^2), গোলকের সমতলের ক্ষেত্রফল ($4\pi r^2$), ঘনফল ($\frac{4}{3}\pi r^3$), ইত্যাদি নির্ণয়ের জন্যে আমরা যে সব সূত্র ব্যবহার করে থাকি, সে সবও আর্কিমিডিসের দৌলতে। আর্কিমিডিস এক নতুন পদ্ধতিতে π-এর মান বের করলেন। r-ব্যাসার্ধের কোন বৃত্তকে পরিবেষ্টিত করে সবচেয়ে ছোট যে বর্গক্ষেত্রটি আঁকা যায়, তা হলো ABCD (চিত্র-১) এবং এর ক্ষেত্রফল হলো $4r^2$। আবার এই বৃত্তটির ভিতরে সবচেয়ে বড় PQRS বর্গক্ষেত্রটিই আঁকা যায় এবং তার ক্ষেত্রফল হবে $2r^2$, কাজেই আর্কিমিডিস সিদ্ধান্ত করলেন, বৃত্তের ক্ষেত্রফল বর্তমান ক্ষেত্রে $4r^2$-এর কম আর $2r^2$-এর বেশী হবে। সুতরাং এইভাবে দুটি বর্গক্ষেত্র না এঁকে যদি বাহুর সংখ্যা বাড়িয়ে সুষম ষড়ভুজ করা যায়, তাহলে বাইরের আর ভিতরের ষড়ভুজ দুটির ক্ষেত্রফল দাঁড়াবে যথাক্রমে $3.464r^2$ এবং $2.598r^2$। আবার সুষম অষ্টভুজ হলে হবে $3.314\ r^2$ ও $2.828\ r^2$। অর্থাৎ এইভাবে যদি বৃত্তের ভিতরে আর বাইরে বাহুর সংখ্যা অনির্দিষ্টভাবে বাড়িয়ে যাওয়া যায়, তাহলে বহিঃক্ষেত্র আর অন্তঃক্ষেত্র দুটি বৃত্তটিকে ঘন করে বেষ্টন করে ফেলবে। যেহেতু বৃত্তের ক্ষেত্রফল হলো πr^2, কাজেই এই প্রক্রিয়ায় π-এর মান নির্ণয় করা সম্ভবপর হবে। এই চিন্তাধারা অনুসরণ করে আর্কিমিডিস ৯৬টি বাহুবিশিষ্ট দুটি সুষম বহুভুজ এঁকে আর সমস্যাটিকে সরল করবার জন্যে কিছু অনুমানের সাহায্য নিয়ে দেখালেন, π-এর মান $3\frac{10}{71}$ (বা 3.1408) এবং $3\frac{1}{7}$ (বা 3.1429)—এই ভগ্নাংশ দুটির মধ্যে থাকবে। বর্তমানে চার দশমিক স্থান পর্যন্ত π-এর আসন্ন মান হলো 3.1416। কাজেই আর্কিমিডিসের চিন্তাধারার শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না। তাছাড়া আর্কিমিডিসের সমকালীন গণিতশাস্ত্রে এই ধরণের কোন পদ্ধতিতে π-এর মান নির্ধারণের চেষ্টা এক কথায় যুগান্তকারী বলা যায়। কারণ, সে সময় ক্যালকুলাস স্বপ্নেরও অগোচর ছিল, বীজগণিতের শৈশব অবস্থাও পার হয় নি।

১৫০ খৃষ্টাব্দে টলেমি π-এর মান 3.1416 ব্যবহার করে তাঁর গাণিতিক হিসেবপত্র করেছিলেন· যদিও ঠিক সেই যুগের চৈনিক অঙ্কশাস্ত্রবিদেরা π সম্পর্কে একটা ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হয়ে প্রচার করেছিলেন যে, π হলো ১০-এর বর্গমূল, অর্থাৎ 3.16221। ষোড়শ শতাব্দীর মাঝামাঝি একটা আশ্চর্যজনক ভগ্নাংশ আবিষ্কৃত হলো। $\frac{355}{113}$—এই ভগ্নাংশটির আবিষ্কার যে ভাবেই হোক না কেন, ভগ্নাংশটি π-এর মস্তবড় প্রতিদ্বন্দ্বী হবার গৌরব লাভ করলো। কারণ সাত দশমিক স্থান পর্যন্ত $\frac{355}{113}$-এর মান হলো $3.1415929\cdots$ এবং সাত দশমিক স্থান পর্যন্ত π-এর মান হলো $3.1415926\cdots$। অর্থাৎ ছয় দশমিক স্থান পর্যন্ত π এবং $\frac{355}{113}$-এর মধ্যে কোন পার্থক্য ছিল না। যাঁরা π-কে $\frac{355}{113}$-এর সমান বলবার স্বপক্ষে যুক্তিতর্ক উপস্থিত করেছিলেন, তাঁরা ছয় দশমিক স্থান পর্যন্ত নির্ভুল ছিলেন, কিন্তু তা π-এর আসল মানের সমান কিছুতেই হলো না। আসলে π এমন একটি ধ্রুবক, যার সঠিক মান নির্ণয় আজও সম্ভব হয় নি। যদিও সাধারণভাবে অঙ্ক কষবার জন্যে $\pi = 3.142$ নিয়ে আমরা হিসেব করে থাকি, কিন্তু এতে সন্তুষ্ট না হয়ে Van Cenlen নামক একজন জার্মান গাণিতিক দশমিক স্থানের পর কুড়ি অঙ্ক পর্যন্ত π-এর মান বের করে পেলেন $3.14159265358979323846\cdots$ এবং সেই সময়েই মানুষের আগ্রহ এমন এক স্তরে পৌঁচেছিল, যার ফলে দশমিকের পর ৭০০ অঙ্ক পর্যন্ত π-এর মান নির্ণয় শেষ হয়েছিল। আধুনিক যুগে কম্পিউটার দিয়ে প্রায় ২০০০ অঙ্ক পর্যন্ত হিসেব করবার পরেও π-এর কোন সম্পূর্ণ মান তো দূরের

কথা—এমন কি, কোন রকম পৌনঃপুনিক দশমিকও পাওয়া যায় নি।

আগেই উল্লেখ করেছি যে, π হলো বৃত্তের সঙ্গে জড়িত একটা ধ্রুবক সুতরাং জ্যামিতির সাহায্য নিলে আমরা আরও অনেক মজার মজার তথ্য জানতে পারবো। চিত্র—২(ক)-এ একটা অর্ধ-বৃত্তের মধ্যে তিনটি সমবাহু ত্রিভুজ আঁকা হয়েছে। অর্ধবৃত্তটির তিনটি জ্যা বৃত্তটির ব্যাসার্ধের সমান এবং ত্রিভুজগুলি সমান বাহুবিশিষ্ট বলে প্রত্যেকটি কোণের মাপ হবে ৬০°। এখন যদি জ্যা তিনটিকে উপরের দিকে ঠেলে অর্ধবৃত্তাকার চাপের সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়া হয়, তাহলে অবস্থাটি ২য় চিত্রের খ-এর মত দাঁড়াবে। জ্যা তিনটিকে বেঁকিয়ে বৃত্তচাপের সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়া হয়েছে বলে এরা AB চাপটিকে (২-ক চিত্র দ্রষ্টব্য) সম্পূর্ণভাবে বেষ্টন করতে পারবে না এবং ছোট্ট একটা চাপ AC বাইরে পড়ে থাকবে (২-খ চিত্র দ্রষ্টব্য)। যদি ব্যাসার্ধ r-এর মান ১ ধরে নেওয়া হয়, তাহলে মাপলে দেখা যাবে, চাপ AC=০·১৪১৫৯। অর্থাৎ,

চাপ BAC=৩·১৪১৫৯

$=\pi$ ... ... (১)

কিন্তু BAC চাপ COB সরলরেখার (বর্তমান ক্ষেত্রে বৃত্তের ব্যাস) উপর ১৮০° কোণ তৈরি করেছে। সুতরাং সমীকরণ (১) থেকে

$\pi = ১৮০°$ ... ... (২)

অতএব দেখা যাচ্ছে, যে কোন কোণকে আমরা π-এর আকারে লিখতে পারি। যেমন— ৯০° $\frac{\pi}{২}$ ১২০° ২π ইত্যাদি। সাধারণতঃ উচ্চতর গণিতে কোণকে এভাবেই প্রকাশ করা হয়ে থাকে।

(ক)

(খ)

২নং চিত্র

দ্বিতীয় চিত্রটির (খ) অংশ পরীক্ষা করলে দেখা যাবে BOD কোণের মান এখন আর ৬০° নেই, বরং ৬০°-এর চেয়ে ২°৪২′১৬″ কম। অর্থাৎ ∠BOD=৫৭°১৭′৪৪″ এবং কোন কোণের মান এই ৫৭°১৭′৪৪″-এর সমান হলে তাকে বলা হয় ১ রেডিয়ান (Radian)। কাজেই ব্যাসার্ধের সমান বৃত্তচাপ কেন্দ্রে যে কোণ উৎপন্ন করে, তাকে বলে রেডিয়ান এবং ১ রেডিয়ান= ৫৭°১৭′৪৪″। এই হিসেব থেকে খুব সহজেই দেখানো যেতে পারে যে,

১° = ০·০১৭৪৫ রেডিয়ান ... (৩)

$১' = \frac{১°}{৬০} = ০·০০০২৯$ (৪)

$১'' = \frac{১'}{৬০} = ০·০০০০০৫$ (৫)

রেডিয়ানের সংজ্ঞা থেকে আমরা আরও একটা সহজ সিদ্ধান্তে আসতে পারি, তা হলো—

বৃত্তের চাপ = বৃত্তের ব্যাসার্ধ × কেন্দ্রস্থ কোণ (রেডিয়ান) ... ... (৬)

উদাহরণ হিসেবে ধরে নিই, একটি বৃত্তের ব্যাসার্ধ ১০০ ফুট এবং চাপ XY কেন্দ্রে

যে কোণ তৈরি করেছে, তার পরিমাণ হলো ৩০° ১৫′ ২০″ (চিত্র—৩)।

এখন সমীকরণ (৩), (৪) এবং (৫) থেকে আমরা এই কোণটিকে রেডিয়ানে প্রকাশ করতে পারি, অর্থাৎ

১ নৌ-মাইল হলো ৬৯.৪১ ÷ ৬০ বা ১.১৫৭ মাইল ; অর্থাৎ ১ নৌ-মাইল আমাদের সাধারণ মাইলের ০.১৫৭ মাইল বা ২৭৬ গজ বেশী। নৌ-মাইলকে বলা হয় নট (Knot)। যখন বলা হয় একটি জাহাজের গতি ২৫ নট, তখন বুঝতে হবে
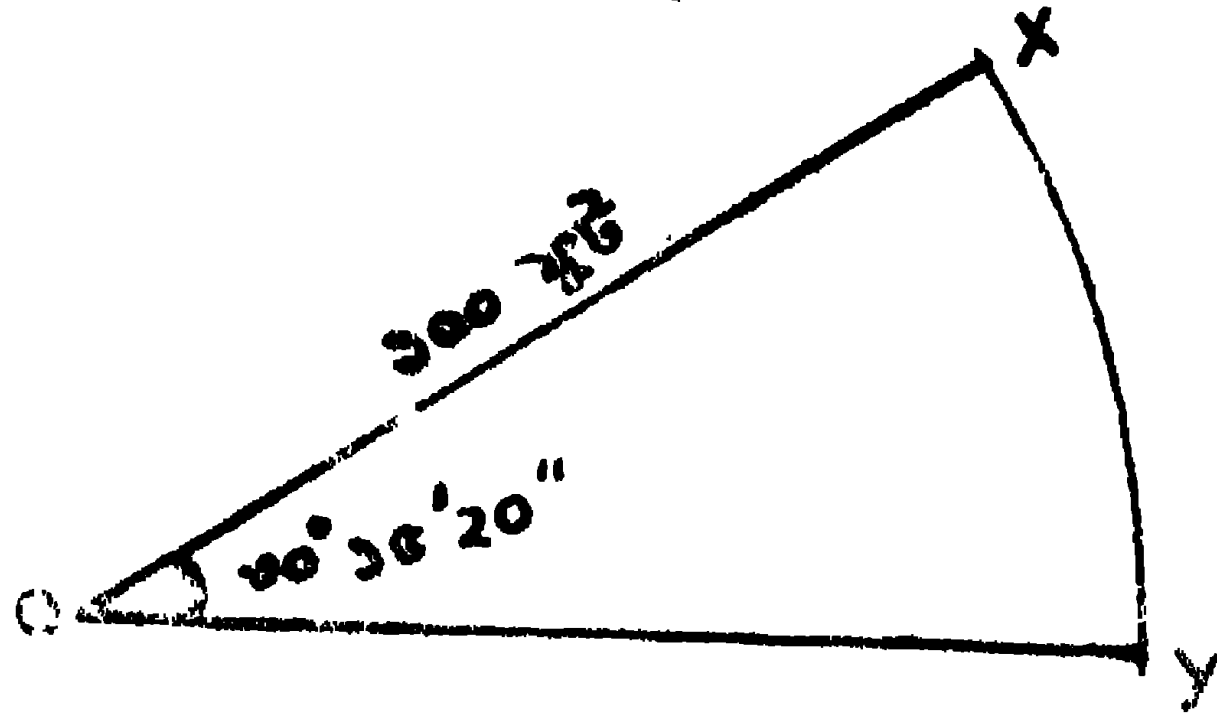
৩নং চিত্র

৩০° = ৩০ × ০.০১৭৪৫ = ০.৫২৩৫ রেডিয়ান
১৫′ = ১৫ × ০.০০০২৯ = ০.০০৪৩৫ ,,
২০″ = ২০ × ০.০০০০০৫ = ০.০০১০০ ,,

অথবা, ৩০° ১৫′ ২০″ = ০.৫২৮৮৫ রেডিয়ান। তাহলে সমীকরণ (৬) থেকে XY চাপের দৈর্ঘ্য হবে ০.৫২৮৮৫ × ১০০ বা প্রায় ৫২ ফুট সাড়ে ১০ ইঞ্চি। এই সহজ উদাহরণটি থেকে পরিষ্কার বুঝতে পারা গেল যে, কোন বৃত্তাকার ক্ষেত্রের চাপ কেন্দ্রস্থ কোণ আর ব্যাসার্ধের মধ্যে যে কোন দুটির মান জানা থাকলে তৃতীয়টি নির্ণয় করা অত্যন্ত সহজ।

আমরা জানি, পৃথিবীর ব্যাসার্ধ ৩৯৬৩ মাইল ; সুতরাং ১° অক্ষাংশ ভূপৃষ্ঠের উপর যে চাপ তৈরি করবে তা হবে ০.০১৭৪৫৩৩ × ৩৯৬৩ বা ৬৯.৪১ মাইল। সাধারণতঃ আমরা ১৭৬০ গজে ১ মাইল মেপে থাকি, কিন্তু সমুদ্রে এই মাইলের হিসাবটি আলাদা। সামুদ্রিক মাইল বা নৌ-মাইল (Nautical mile) বলতে আসলে সমুদ্রের উপরিভাগে ১′ অক্ষরৈখিক চাপ বোঝায়। সুতরাং

জাহাজটি প্রতি ঘণ্টায় পৃথিবীর পৃষ্ঠে ৩০ মিনিটের একটি অক্ষরৈখিক চাপ তৈরি করছে।

উপরে যে দুটি উদাহরণ দিলাম, প্রয়োগ-ক্ষেত্র ভিন্ন ভিন্ন হলেও আসলে এরা বৃত্তীয় গতি সংক্রান্ত সমস্যা এবং এই ধরণের সমস্যায় π-এর ব্যবহার এক কথায় অপরিহার্য। অথচ গণিতশাস্ত্রের এই বিশেষ অংশেই π-এর প্রয়োগ সীমাবদ্ধ নেই, এর ব্যবহার-ক্ষেত্র আরও ব্যাপক এবং বিশাল। শুধু আর একটি প্রয়োগ-ক্ষেত্রে π-এর গুরুত্ব বিশ্লেষণ করে π সম্পর্কে আলোচনা শেষ করবো।

আমরা জানি যে, কোন খেলা সুরু হবার আগে পয়সা টস্ করা হয়ে থাকে। এক দলের অধিনায়ক টস্ করেন এবং অন্য অধিনায়ক ডাকেন। এটা নিতান্ত সাধারণ ঘটনা। পয়সা টস্ করলে লেজ উঠবে, কি মাথা উঠবে—সেটা স্রেফ সম্ভাবনার ব্যাপার এবং যিনি ডাকেন, তিনিও হয়তো মনে যা আসে তাই বলেন। এই ক্ষেত্রে দুই দলেরই টসে জেতবার সম্ভাবনা

(Probability) হলো পঞ্চাশ-পঞ্চাশ। এটা গেল বিজ্ঞানে সম্ভাবনা বা Probability বলতে আমরা যা বুঝি, তার নিতান্ত সহজ একটি উদাহরণ। এই জাতীয় নানা ধরণের সমস্যা বিজ্ঞানের নানা শাখায় (বিশেষ করে পদার্থবিদ্যায়, পরিসংখ্যানে, আধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থায়) ছড়িয়ে আছে এবং দেখা গেছে, এসব ব্যাপারেও গণিত-রাজ্যের এই অধিবাসীটির গুরুত্ব কম তো নয়ই, বরং স্বমহিমায় বিরাজমান। এই ব্যাপারটা একটা বিষয়ে বিশেষ খেয়াল রাখতে হবে, তা হলো সমান্তরাল সরলরেখাগুলি সমান সমান দূরত্বে থাকবে আর এই দূরত্ব সব সময় কাঠিটির দৈর্ঘ্যের দ্বিগুণ হওয়া চাই (চিত্র-৪)

এবার কাঠিটাকে এই কাগজটির উপর খুশীমত এলোপাতাড়ি পয়সা টস্ করবার মত ফেলতে হবে। মোট টসের কতবার কাঠিটা সমান্তরাল সরলরেখাগুলির যে কোন একটিকে স্পর্শ বা ছেদ করে, তার একটা হিসেব রাখতে হবে।
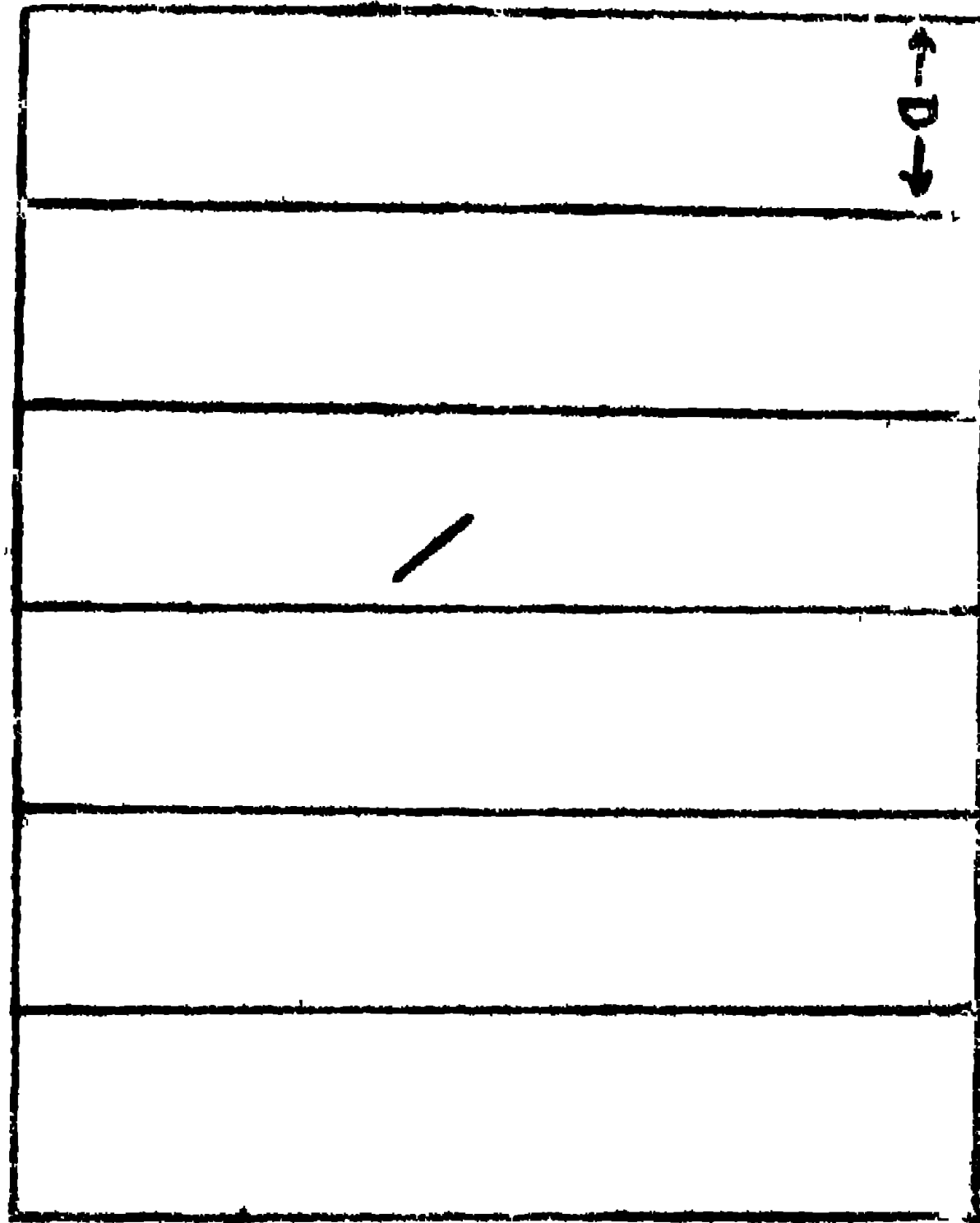
৪নং চিত্র
কাঠির দৈর্ঘ্য যদি ১" হয়, তাহলে D হবে ২"।

নানাভাবে নানাজনে পরীক্ষা করে প্রমাণ করেছেন। কিশোর পাঠকেরা একটু ধৈর্য ধরে নীচের পরীক্ষাটি করলে সত্যিই খুব আনন্দ পাবে। পরীক্ষাটি করতে হলে চাই একটা বড় কার্ডবোর্ড বা সাদা কাগজ। সাদা কাগজটির উপর কতকগুলি সমান্তরাল সরলরেখা আঁকতে হবে। আর চাই একটা কাঠি। যে কোন ধরণের সোজা কাঠিতেই চলবে। যেমন পেরেক, দেশলাইয়ের কাঠি, আলপিন ইত্যাদি। শুধু যদি মোট x-সংখ্যক বার টস্ করা হয়ে থাকে আর তার মধ্যে মোট y-সংখ্যক বার কাঠিটা রেখাগুলির যে কোন একটিকে স্পর্শ করে থাকে, তাহলে দেখা যাবে, $\frac{x}{y}$-এর মান π-এর মানের প্রায় সমান হবে। মাত্র কয়েকবার টস্ করে এই ফলটি পাওয়া যাবে না এবং টস্ করাটা বিশুদ্ধভাবেই এলোপাতাড়ি হওয়া চাই। যত বেশী বার টস্ করা যাবে, ততই $\frac{x}{y}$-এর আগ-

ফলটি π-এর কাছাকাছি হবে। Count Buffon অষ্টাদশ শতাব্দীতে সর্বপ্রথম এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন এবং তাঁর নাম অনুসারে একে Count Buffon's Theorem বলা হয়ে থাকে। ১৯০১ সালে ইতালীয় বিজ্ঞানী Lazzerini এই সিদ্ধান্তটির সত্যতা প্রমাণের জন্যে ধৈর্যের এক চরম পরীক্ষা দিলেন। তিনি একটা কাঠিকে ৩৪০০ বার টস্ করে দেখলেন, ১০৮২ বার সেটা কোন না কোন রেখাকে স্পর্শ (বা ছেদ) করেছে। তাহলে ৩৪০০ + ১০৮২ হলো প্রায়, ৩.১৪২৩৩... অর্থাৎ π-এর তথাকথিত আসল মান থেকে মাত্র ০.০০০৭৪ বেশী, যা সাধারণ হিসেবের দিক থেকে একেবারেই নগণ্য। এই পরীক্ষাটি ধৈর্যের উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করলেও এর অন্য একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক আছে। π-এর মান পরীক্ষামূলকভাবে নির্ণয় করবার রাস্তা হিসেবেও দৃষ্টান্তটি উল্লেখযোগ্য।

নিতে হবে। অঙ্কশাস্ত্রের জটিলতার মধ্যে না গিয়ে আমরা মোটামুটি সোজাভাবে সমস্যাটার একটা ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করবো। ৫নং চিত্রে আমরা তিনটি বিভিন্ন টসে কাঠিটার তিনটি ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার কথা কল্পনা করেছি। দেখা যাচ্ছে কোন সমান্তরাল সরলরেখাকে স্পর্শ করবে কি করবে না, তা দুটি অবস্থার উপর নির্ভর করছে। প্রথমতঃ কাঠিটির কেন্দ্র O থেকে নিকটবর্তী সরলরেখার দূরত্ব কতখানি এবং দ্বিতীয়তঃ কাঠিটা সমান্তরাল সরলরেখার সঙ্গে কতটা কোণ উৎপন্ন করেছে। ধরে নিই, P Q কাঠিটার দৈর্ঘ্য l এবং A B ও C D সমান্তরাল সরলরেখা দুটির দূরত্ব a $l<a$)। চিত্র ৫ (ক) থেকে দেখা যাচ্ছে, যদি কাঠিটার কেন্দ্র O, A B অথবা C D সরলরেখার কাছে থাকে এবং সরলরেখার সঙ্গে উৎপন্ন কোণ যদি বড় হয়, তাহলে কাঠিটা সরলরেখাকে স্পর্শ করবে। কিন্তু
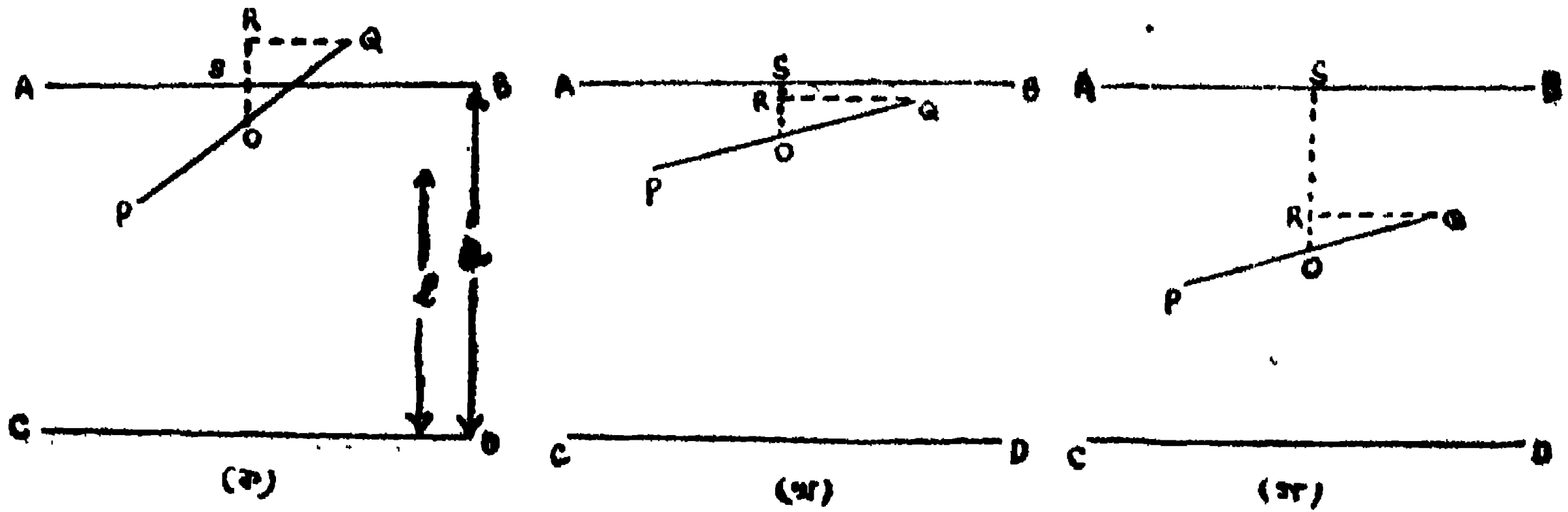
৫নং চিত্র

এভাবে কতকগুলি সমদূরবর্তী সমান্তরাল সরলরেখা আঁকা কাগজের উপর একটা নির্দিষ্ট মাপের কাঠি এলোপাতাড়ি ফেললে কাঠিটা কোন রেখাকে কাটবে কিনা এবং কাটলে তার সম্ভাবনা কতটা, এটা নিতান্ত 'চান্সের' ব্যাপার। এর মধ্যে π-এর আগমন কি করে হলো, তা বুঝতে গেলে আমাদের উচ্চতর গণিতের সাহায্য

যদি কোণ ছোট হয় (চিত্র-৫ খ) বা কাঠির কেন্দ্র সরলরেখা থেকে দূরে থাকে (চিত্র-৫ গ), তাহলে স্পর্শ করবে না। ক, খ আর গ চিত্রকে ভাল করে বিশ্লেষণ করলে দেখতে পাব, কাঠিটা সরলরেখাকে স্পর্শ করবে যদি কাঠিটার শীর্ষবিন্দু Q থেকে কাঠির কেন্দ্র O-এর উপরে অভিক্ষেপ (Projection) O R কাঠির কেন্দ্র থেকে

সরলরেখার দূরত্ব O S-এর চেয়ে বড় হয়। X-অক্ষে কাঠির সঙ্গে সরলরেখার উৎপন্ন কোণ আর Y-অক্ষে নির্দিষ্ট অভিক্ষেপের দৈর্ঘ্য আঁকলে আমরা ৬নং চিত্রটি পাব।

কারণ, কোণের মান 0° হলে PQ AB সরলরেখার উপর শুয়ে থাকবে এবং সেই

৬নং চিত্র

অবস্থায় অভিক্ষেপ $OR = \frac{1}{2} l \text{ Sin } 0° = O$ হবে। যখন কোণের মান $\frac{\pi}{২}$ (=৯০°) হবে, তখন অভিক্ষেপ $OR = \frac{l}{২}$ (কারণ, $\text{Sin}\frac{\pi}{২} = ১$), অর্থাৎ অভিক্ষেপের দৈর্ঘ্য কাঠিটার দৈর্ঘ্যের অর্ধেকের সমান হবে এবং এটিই হলো অভিক্ষেপের সবচেয়ে দীর্ঘতম দৈর্ঘ্য। আবার Q-এর মান ৯০°-র চেয়ে যত বাড়তে থাকবে, OR ততই কমবে এবং কমতে কমতে কোণটি যখন π-এর সমান (১৮০°) হবে, তখন OR-এর মান আবার শূন্য হবে।

সুতরাং উপরের ব্যাখ্যা থেকে বুঝতে পারা গেল, যে সমস্ত টসের বেলায় কাঠিটা কাগজের উপর এমনভাবে পড়বে, যাতে $OS < OR$ হবে, তখনই কাঠিটা সরলরেখাকে স্পর্শ করবে; অর্থাৎ চিত্র-৬-এ ORM রেখার দ্বারা বেষ্টিত X চিহ্নিত ক্ষেত্রের মধ্যে প্রত্যেকটি বিন্দুই কাঠির দ্বারা সরলরেখাকে স্পর্শ বোঝায় এবং এই ক্ষেত্রের বাইরের বিন্দুগুলি স্পর্শ করে না বোঝায়।

তাহলে যত অধিক সংখ্যক বার কাঠিটাকে টস্ করা হবে, ততই X চিহ্নিত ক্ষেত্রের অভ্যন্তরস্থ বিন্দুগুলিকে পাওয়ার সম্ভাবনা বেশী হবে। নিঃসন্দেহে এই ক্ষেত্রটির মধ্যে লক্ষ লক্ষ বিন্দুর অবস্থান সম্ভব; সুতরাং π-এর মান এই প্রক্রিয়ায় পেতে হলে বেশ কিছু সংখ্যক বার টস্ করতেই হবে। কাজেই ৩৪০০ বার টস্ করে ইতালীয় বিজ্ঞানী Lazzerini নিশ্চয়ই পাগলামির পরিচয় দেন নি—যদিও অনেক সময় এভাবে কাঠি টস্ করা নিতান্ত পাগলামির পর্যায়ে পড়ে।

অঙ্ক কষে দেখানো যায় যে, কাঠিটির দ্বারা সমান্তরাল সরলরেখাকে স্পর্শ (বা ছেদ) করবার সম্ভাবনা (Probability) হলো ক্ষেত্র ORM÷ক্ষেত্র OGKM এবং বর্তমান ক্ষেত্রে তার মান হবে $\frac{২l}{\pi a}$। আমরা সমস্যাটি সুরু করেছিলাম এই বলে যে, কাঠির দৈর্ঘ্যের চেয়ে সমান্তরাল সরলরেখার পারস্পরিক দূরত্ব দ্বিগুণ হবে, অর্থাৎ $a = ২l$. তাহলে $\frac{২l}{\pi a}$ হবে $\frac{1}{\pi}$। এই ব্যাখ্যা থেকে আর বুঝে নিতে অসুবিধা হয় না যে, মোট টস্ আসলে ক্ষেত্র OGKM এবং মোট স্পর্শ হলো ক্ষেত্র ORM। সুতরাং একটিকে আর একটি দিয়ে ভাগ দিলে π-এর মান পাওয়া যাবে।

মানবদেহে ধাতুর প্রভাব

শ্রীনিত্যগোপাল পোদ্দার

খাদ্য, পানীয় ও বায়ু আমাদের দৈনন্দিন জীবনে অবশ্য প্রয়োজনীয়। এদের মাধ্যমেই প্রবেশ করছে আমাদের দেহে অসংখ্য ধাতু। স্বাস্থ্যরক্ষার জন্যে এদের কতকগুলির দান যেমন উল্লেখযোগ্য, নানারূপ রোগের উৎস হিসাবেও কতকগুলি অনস্বীকার্য। সুদীর্ঘ দশ বছরব্যাপী গবেষণা করে আমেরিকার ডার্টমাউথ মেডিক্যাল কলেজের ডক্টর স্রুডার দেখেছেন—কতকগুলি ধাতু খুব অল্প পরিমাণে হলেও শরীরের পক্ষে ভিটামিন বা খাদ্যপ্রাণের চেয়ে অধিক প্রয়োজনীয়। মানবদেহ অধিক পরিমাণে খাদ্যপ্রাণ তৈরি করতে পারে, কিন্তু ধাতু তৈরি করতে পারে না। মাইক্রোকেমিক্যাল অ্যানালিটিক্যাল বিজ্ঞানে প্রভূত উন্নতি সাধনের ফলেই অধুনা অ্যাটমিক অ্যাবজর্প্‌শন স্পেক্ট্রোফটোমিটার দিয়ে জীব-দেহের অভ্যন্তরের অতি অল্প পরিমাণ ধাতুরও পরিমাপ করা সম্ভব হয়েছে।

সাধারণতঃ একজন সুস্থ ও সবল লোকের (৭০ কিলোগ্রাম) দেহের জন্যে ১০৫০ গ্রাম ক্যালসিয়াম, ২৪৫ গ্রাম পটাসিয়াম, ১০৫ গ্রাম সোডিয়াম, ৩৫ গ্রাম ম্যাগ্‌নেসিয়াম, ৮·২৫ গ্রাম লোহা, ১৫০ মিলিগ্রাম তামা, ২০ মিলিগ্রাম ম্যাঙ্গানিজ, ১৫ মিলিগ্রাম মলিবডিনাম, ৩ মিলিগ্রাম কোবাল্ট ও ১·৫ মিলিগ্রাম ক্রোমিয়াম প্রয়োজন।

মাটিতে কতকগুলি মৌলিক পদার্থ পরিমাণে খুব অল্প বা অধিক রয়েছে বলেই পৃথিবীতে 'অভিশপ্ত উপত্যকা' ও 'বিষময় সমভূমির' সৃষ্টি হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের পশ্চিমাংশে কতকগুলি স্থানে মাটিতে অতিরিক্ত পরিমাণে সেলিনিয়াম থাকায় গবাদিপশুর ক্ষুর পচে যায়। পূর্বে অষ্ট্রেলিয়ার কোন কোন অঞ্চলে মেষগুলি পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হয়ে মারা যেত। খৈলে (Salt licks) অল্প পরিমাণ কোবাল্ট মিশিয়ে দিলে এই রোগ প্রতিরোধ করা যেতে পারে। প্রতি এক শত মেষের এক বছরের জন্যে এক আউন্স কোবাল্টই যথেষ্ট।

মানবদেহেও অনুরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। লোহা রক্তকণিকার অন্যতম সংগঠক। এটি মানবদেহে অক্সিজেন সঞ্চালনে সহায়তা করে। তাই অতি সামান্য পরিমাণেও এর অভাব হলে শ্বাস-প্রশ্বাসের ব্যাঘাত ঘটে। অল্প পরিমাণে লোহা দেহের পক্ষে অবশ্য প্রয়োজনীয়। কিন্তু পরিমাণ অতিক্রান্ত হলে এটি অনিষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। অ্যানিমিয়ার (Anemia) দরুণ যুক্তরাষ্ট্রে জননীরা চিনির সংমিশ্রণে ফেরাস সালফেট বটিকা সেবন করে থাকেন। তাঁদের শিশুরা অনেক সময় এই বটিকা গ্রহণে মারা যায়। বৃটেনে বিষক্রিয়ায় আক্রান্ত শিশুদের শতকরা দশজনেরই উৎস ফেরাস সালফেট। দক্ষিণ আফ্রিকায় বান্টু উপজাতীয় লোকেরা লোহার পাত্রে মদ তৈরি করে পান করে। সাধারণতঃ একজন স্বাস্থ্যবান লোকের রক্তে ৪০ গ্রাম লোহা থাকে। কিন্তু এই মদের সঙ্গে ৫০ থেকে ১০০ মিলিগ্রাম লোহা দৈনিক তাদের পাকস্থলীতে প্রবেশ করে; ফলে তারা লিভার সিরোসিস রোগে (Liver Cirrhosis) আক্রান্ত হয়।

রক্তের অন্যতম সংগঠক তামা। ১৫০ মিলিগ্রাম তামা আমাদের স্বাস্থ্যরক্ষার্থে

প্রয়োজন। পরিমাণ অতিক্রান্ত হলে এই ধাতু বিষ হিসাবে কাজ করে। তামার বিষাক্ততায় 'উইলসন্‌স্ রোগ' (Wilson's disease) হয়। সাধারণতঃ যকৃৎ ও মস্তিষ্কে অতিরিক্ত পরিমাণে তামা সঞ্চিত হয়। এর ফলেই মস্তিষ্কে 'ট্রেমার' (Tremor) হয় এবং যকৃতের অনিষ্ট সাধন করে। শিশুরা এই সব রোগে আক্রান্ত হয়ে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই মারা যায়।

শবদেহের অংশ পরীক্ষা করলে ক্যাডমিয়ামের সন্ধান মেলে। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এর পরিমাণ বাড়তে থাকে। সাধারণতঃ ক্যাডমিয়ামের উৎস হচ্ছে ফস্‌ফেট সার, সেল মাছ এবং পাইপের সাহায্যে সরবরাহ করা পানীয় জল। মানবদেহে এই ধাতুর প্রভাব সম্পর্কে ডক্টর স্রুডার ও তাঁর সহকর্মীদের গবেষণামূলক তথ্য বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। তাঁরা দুই দল ইঁদুরের প্রথম দলকে এমন খাদ্য দিলেন, যার ভিতর ক্যাডমিয়াম নেই এবং দ্বিতীয় দলকে এমন খাদ্য দিলেন, যার ভিতর পাশ্চাত্যের মানবদেহের ক্যাডমিয়ামের সমপরিমাণ ক্যাডমিয়াম বিদ্যমান। পর্যবেক্ষণ করে দেখা গেল, দ্বিতীয় দলের শতকরা নব্বইটি ইঁদুর উচ্চ রক্তচাপে আক্রান্ত হয়েছে আর তাদের আয়ুষ্কালও উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে। কিন্তু প্রথম দলের শতকরা নব্বইটি ইঁদুরের কোন পরিবর্তন ঘটে নি। মানবদেহের উপর গবেষণা করেও অনুরূপ প্রতিক্রিয়ার সন্ধান মিলেছে। আফ্রিকার উচ্চভূমির অধিবাসীদের মূত্রাশয়ে ক্যাডমিয়ামের পরিমাণ আমেরিকা ও জাপানের অধিবাসীদের তুলনায় যথাক্রমে $\frac{1}{8}$ ও $\frac{1}{8}$ অংশ। ফলে আফ্রিকার ঐ অধিবাসীদের মধ্যে 'আর্টারি হার্ডেনিং' (Artery hardening) এবং 'হার্ট রেকেজ' (Heart wreckage) নেই বললেই চলে।

ক্যাডমিয়াম কি আর্টারি হার্ডেনিং এবং হার্ট রেকেজের মূল কারণ? এই প্রশ্নের উত্তর ব্যাপক গবেষণার অপেক্ষা রাখে। এই সব রোগের মূল কারণ প্রমাণিত হলে ক্যাডমিয়ামের আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়া মোটেই অসম্ভব বলে বিবেচিত হবে না। রোগীকে ক্যাডমিয়ামের সঙ্গে যৌগিক পদার্থ গঠনে সক্ষম একটি সহগ (Ligand) সেবন করালে রোগ নিরাময় হবে।

শবাংশ পরীক্ষা করে দেখা গেছে, বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জীবকোষে ক্রোমিয়ামের পরিমাণ হ্রাস পেতে থাকে। নবজাতকের দেহে এই ধাতুর পরিমাণ প্রাপ্তবয়স্কের তিন গুণ। ইঁদুরের উপর গবেষণা করে দেখা গেছে, ক্রোমিয়াম-বিহীন আহার দেওয়ায় শতকরা আশীটি ইঁদুর বহুমূত্ররোগে আক্রান্ত হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রে মানবদেহের জীবকোষে ক্রোমিয়ামের পরিমাণ থাইল্যাণ্ডের লোকের জীবকোষের চেয়ে অনেক কম। ফলে যুক্তরাষ্ট্রে বহুমূত্র রোগে মৃত্যুর সংখ্যা থাইল্যাণ্ডের প্রায় দশ গুণ। অনুসন্ধান করে দেখা গেছে, প্রয়োজনের অতিরিক্ত ইনসুলিন থাকা সত্ত্বেও অনেকে বহুমূত্র রোগে আক্রান্ত হন। এর কারণ হিসাবে বলা যেতে পারে—

১। ক্রোমিয়াম ইনসুলিনকে কার্বোহাইড্রেট বা শর্করাজাতীয় খাদ্যের সঙ্গে রাসায়নিক ক্রিয়ায় সহায়তা করে। অথবা—

২। ক্রোমিয়াম কতকগুলি এনজাইমের সঙ্গে শর্করাজাতীয় খাদ্যের রাসায়নিক ক্রিয়ায় উদ্দীপক (Promoter) হিসাবে কাজ করে এবং এর (ক্রোমিয়ামের) পরিমাণ হ্রাস পেলে এনজাইমগুলি নিস্তেজ হয়ে পড়ে।

শিল্পের ক্ষেত্রে প্রভূত উন্নতি সাধিত হবার ফলে যথেষ্ট পরিমাণে সীসা চারদিক থেকে মানবদেহে প্রবেশ করছে। রং, সলডার ও পেট্রোলের ধোঁয়ায় প্রচুর পরিমাণে সীসা থাকে। শিল্পাঞ্চলের গাছপালায় এই ধাতু যথেষ্ট পরিমাণে সঞ্চিত হয়। অনেকের মতে, আমরা ক্রমাগত

এর কবলে পতিত হচ্ছি [অবশ্য বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (W. H. O) মতে, গত বিশ বছরে মানুষের পরিবেশে সীসার পরিমাণ উল্লেখযোগ্য-ভাবে বৃদ্ধি পায় নি]। বস্তি অঞ্চলেই 'সীসার বিষক্রিয়া' (Lead poisoning) সবচেয়ে বেশী হয়ে থাকে। পুরনো ও ক্ষয়িষ্ণু গৃহের রঙই এর ইন্ধন যোগায়। সাধারণতঃ শিশুরাই এই রোগের কবলে পড়ে।

উত্তর জাপানের কতকগুলি স্থানে মৃদুজল পান করে সন্ন্যাস রোগে (Appoplexy) বহু লোক মারা যায়। খরজলে দ্রবীভূত ক্যালসিয়াম এবং ম্যাগ্‌নেসিয়াম যৌগ (যেমন বাইকার্বোনেট বা ক্লোরাইড বা সালফেট) পাইপের সংগঠক ধাতুগুলির সঙ্গে বিবিধ যৌগ গঠন করে। পরে অন্যান্য রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় পাইপের ভিতর একটি স্থায়ী স্তরের সৃষ্টি হয়। সে স্তর ভেদ করে জলে মিশ্রিত কার্বন ডাইঅক্সাইডের অ্যাসিড প্রক্রিয়া সম্ভব নয়। কিন্তু মৃদুজল সরবরাহ করা হলে এরূপ কোন স্তরের সৃষ্টি হয় না। জলে মিশ্রিত কার্বন ডাইঅক্সাইড অ্যাসিড প্রক্রিয়ায় পাইপের ক্ষয় সাধন করে। ফলে মৃদুজল তামা, দস্তা, ক্যাডমিয়াম, সীসা প্রভৃতি ধাতু বহন করে নেয়। এসব ধাতু মিশ্রিত জলপানে 'আর্টারি হার্ডেনিং' রোগেরও উদ্ভব হয়।

ধাতুর মধ্যে তেজস্ক্রিয় ধাতুর বিষক্রিয়াই সবচেয়ে বেশী। প্লুটোনিয়াম, ষ্ট্রনসিয়াম-৯০, সিজিয়াম-১৩৭ প্রভৃতি পদার্থের তেজস্ক্রিয় প্রক্রিয়ায় কতকগুলি বিপজ্জনক পদার্থের সৃষ্টি করে। মানবদেহের তন্তুগুলি রেডিও আইসোটোপের দ্বারা আক্রান্ত হলে নিষ্কৃতি পাওয়া একরূপ অসম্ভব। কতকগুলি রেডিও আইসোটোপ, বিশেষ করে ষ্ট্রনসিয়াম-৯০ থেকে বোন ক্যান্সার হয়ে থাকে।

মানবদেহে ধাতুর অনিষ্টসাধনের প্রমাণ পেয়ে বিজ্ঞানীরা নিরাশ হয়ে বসে নেই। গবেষণা চলেছে এবং চলবে। উদ্দেশ্য—রোগীকে নিরাময় করতে হবে, ধাতুর আক্রমণ থেকে রক্ষা পেতে হবে। চিকিৎসা-জগতে প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়েছে—নতুন নতুন ওষুধ আবিষ্কৃত হয়েছে। সবগুলি ওষুধের বিশেষ পরিচয় হলো তারা যৌগিক সহগ (Chelating agent)। অবশ্য সহগ প্রয়োগে প্রয়োজন অনুসারে নিম্নলিখিত এক বা একাধিক উদ্দেশ্য সিদ্ধ হওয়া চাই—

১। সহগ এরূপ যৌগিক পদার্থ গঠন করবে, যা মলমূত্ররূপে শরীর থেকে বিদূরিত হতে পারে।

২। সহগ ধাতুকে এমন তন্তুতে বহন করে নিয়ে যেতে সাহায্য করবে, যেখানে তার অভাব রয়েছে।

৩। সহগ, যে ধাতু রোগ-জীবাণুকে পোষণ করে' যৌগিক পদার্থ গঠন করে, তার কর্মক্ষমতা লোপ করে দেবে।

পূর্বে লিভার সিরোসিস রোগে আক্রান্ত রোগীর রক্তপাত করিয়ে অতিরিক্ত লোহা নিঃসারণ করা হতো। রক্তপাতের ফলে নতুন রক্তকণিকার উৎপত্তি হয়। সেই রক্তকণিকা বিভিন্ন তন্তুতে লোহা টেনে নেয়। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এরূপ রক্তপাত বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়াতো। লোহার সঙ্গে যৌগিক সংযোজন ঘটিয়ে এই রোগের চিকিৎসা করা যেতে পারে। বর্তমানে যৌগিক সংযোজক ডিস-ফেরিঅক্সামিন বি (Des-Ferrioxamine B) প্রয়োগে এর চিকিৎসা করা হয়ে থাকে।

তামার বিষক্রিয়ায় মস্তিষ্কে ট্রেমার রোগ হয় এবং যকৃতের ক্ষয় সাধন করে। তামার সঙ্গে যৌগিক পদার্থ গঠন করতে পারে এরূপ একটি সহগ পেনিসিলামাইন (Penicillamine) সেবনে এসব রোগ থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়।

কতকগুলি সংক্রামক ব্যাধি, রিউমেটিওড

আর্থিরিটিস (Rheumatiod arthiritis) এবং ক্যান্সারে রক্তে তামার পরিমাণ ছুই বা ততোধিক গুণ বৃদ্ধি পায়। রক্তের মধ্যে জীবকোষে প্রয়োজনীয় তামার পরিমাণ হ্রাস পায়। তামার সঙ্গে যৌগিক পদার্থ গঠনের সহগ অ্যাসপিরিন (Aspirin) রক্ত থেকে তামা সংগ্রহ করে জীবকোষে ফিরিয়ে দেয়। অ্যাসপিরিনের পরিবর্তে কোন তাম্র-যৌগ প্রয়োগে ঐ একই উদ্দেশ্য সাধিত হতে পারে। রুগ্ন ইঁদুরের অন্তঃশিরায় তাম্রযৌগ ইন্‌জেকশন করে দেখা গেছে, জ্বর সেরে যায়। কপার সেলিসাইলেট (Copper salicylate) ইন্‌জেকশনে বিশেষ ফল পাওয়া যায়।

সীসার বিষক্রিয়া চিকিৎসার গোড়া পত্তন হয় ১৯৫১ সালে ওয়াশিংটন শিশু হাসপাতালে। বিষাক্ততায় ফলে একটি তিন বছরের শিশুর মস্তিষ্ক ক্ষতিগ্রস্ত (Brain damage) হয়। শিশুটিকে ক্যালসিয়াম ই ডি. টি. এ যৌগ (Calcium salt of E D T A) ওষুধ হিসাবে প্রয়োগ করায় তিন দিনের মধ্যে সে আরোগ্য লাভ করে।

কোন তেজস্ক্রিয় মৌলিক পদার্থের দ্বারা পাকস্থলী আক্রান্ত হলে আশু চিকিৎসা হিসাবে রোগীকে ঐ মৌলিক পদার্থের সঙ্গে অদ্রাব্য যৌগিক পদার্থ গঠন করতে পারে, এমন সহগ খাওয়াতে হবে। অদ্রাব্য যৌগিক পদার্থ মলরূপে শরীর থেকে নির্গত হয়। এইভাবে সিজিয়াম-১৩৭ ও ষ্ট্রনসিয়াম-৯০-এর কবল থেকে যথাক্রমে প্রুসিয়ান ব্লু ও সোডিয়াম এলজিনেটের (Sodium alginate) দ্বারা রক্ষা পাওয়া যেতে পারে। অধুনা BAETA (Bis anhydro ethanolamine tetra acetic acid) নামে একটি সহগ আবিষ্কৃত হয়েছে। এই সহগ দিয়ে অতিরিক্ত পরিমাণে রেডিও ষ্ট্রনসিয়াম নিঃসারণ করা যেতে পারে। অবশ্য রেডিও ষ্ট্রনসিয়াম দেহাভ্যন্তরে প্রবেশ করবার অল্প সময়ের মধ্যেই এর প্রয়োগ হওয়া চাই। পর্যবেক্ষণ করে দেখা গেছে, DTPA-কে (Diethylene triamine penta acetic acid) প্রধানতঃ প্লুটোনিয়াম নিঃসারণের জন্যে ব্যবহার করা হলেও সেটা কোন টিউমারের প্রতিষেধক হিসাবেও কাজ করে।

যান্ত্রিক যুগের আবর্তে মানুষের পরিবেশের যথেষ্ট পরিবর্তন হয়েছে। একদিকে যেমন মানবজীবন সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যময় হয়েছে—জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে, তেমনি আবার জরা, ব্যাধি, দুঃখ দুর্দশাও বেড়ে গেছে বহু গুণে। ক্যালিফোর্নিয়া ইনষ্টিটিউট অফ টেক্‌নোলজির অধ্যাপক ডক্টর পেটারসনের মতে, অদূর ভবিষ্যতে ধাতুর বিষক্রিয়া পারমাণবিক অস্ত্র এবং খাদ্য-সমস্যাকেও হার মানাবে। মানবদেহে খাদ্যপ্রাণ বা ভিটামিনের অভাব আজ এক বিরাট সমস্যা আর সে সমস্যা সমাধানের উপায়—খাদ্যপ্রাণ বটিকা। তেমনি আগামী দিনে দীর্ঘ-জীবন লাভের প্রধান অন্তরায় হবে মানবদেহে ধাতুর বৈরীসুলভ ক্রিয়া, যার প্রতিষেধক হবে যৌগিক সংযোজক (Chelating agent)।

বিজ্ঞান-সংবাদ

মহাজাগতিক রশ্মির সাহায্যে পিরামিড সন্ধান

পুরাতাত্ত্বিকেরা মনে করেন, মিশরের ফ্যারাওদের প্রকৃত সমাধি-প্রকোষ্ঠগুলি পিরামিডের অভ্যন্তরে লোকচক্ষুর আড়ালে থেকে গেছে সাড়ে চার হাজার বছর ধরে। উন্নত ধরণের বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে এই অনাবিষ্কৃত সমাধির সন্ধান করা যেতে পারে বলে মার্কিন বিজ্ঞানীরা মনে করেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সম্মিলিত আরব প্রজাতন্ত্র এক আন্তর্জাতিক বিজ্ঞানীদল নিয়ে একযোগে এই সন্ধানের কাজ করবেন। গিজেতে অবস্থিত সেফরেনের সুবিশাল দ্বিতীয় পিরামিডের অভ্যন্তরে অনাবিষ্কৃত সমাধি-কক্ষ আছে কিনা, পরীক্ষা করে দেখবার জন্যে তাঁরা এক্স-রে পদ্ধতির অনুরূপ একটি প্রক্রিয়া প্রয়োগ করবেন। এই কাজে এক্স-রে প্রক্রিয়া ঠিক উপযোগী নয়। তাই বিজ্ঞানীরা মহাজাগতিক রশ্মিকণা বা পারমাণবিক কণা পিরামিডের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দেবেন। অপর দিকে থাকবে মহাজাগতিক রশ্মিকণা-নির্ধারক যন্ত্র। এই রশ্মিকণা পাথরের মত কঠিন বস্তু ভেদ করে গেলে তার তীব্রতা অনেক কমে যায়; কারণ কঠিন পাথর তার অনেকখানি শোষণ করে নেয়। কিন্তু এই পাথরের অভ্যন্তরে কোন ফাঁকা জায়গা থাকলে রশ্মিকণা তার মধ্য দিয়ে অতিক্রম করলে তার তীব্রতা অনেক বেড়ে যায়। সুতরাং পিরামিডের মধ্যে কোন গোপন কক্ষ থাকলে কিছুটা অংশ ফাঁকা থাকবে। রশ্মি এই স্থান অতিক্রম করে পিরামিডের অপর দিকে রক্ষিত নির্ধারক যন্ত্রে পৌঁছুলে তার তীব্রতা ধরা পড়বে। কাজেই বিজ্ঞানীরা তখন পিরামিডের অভ্যন্তরে গোপন প্রকোষ্ঠের অস্তিত্ব সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হবেন। অতঃপর পিরামিডের গাত্র ভেদ করে ঐ স্থান বরাবর সুড়ঙ্গ খনন করা হবে। এই কাজের জন্যে যে বিশেষ ধরণের যন্ত্রের প্রয়োজন হবে, বর্তমানে তা নির্মিত হচ্ছে ক্যালিফোর্ণিয়ার বার্কলেতে অবস্থিত লরেন্স রেডিয়েশন লেবরেটরীতে। এখানে মার্কিন ও আরব বিজ্ঞানীরা প্রথমে নকল পিরামিড তৈরি করে ঐ যন্ত্র পরীক্ষা করে দেখবেন। তারপর তাঁরা যন্ত্রটিকে নিয়ে যাবেন মিশরের গিজে শহরে। কয়েক মাস ধরে যন্ত্রটি অবিরাম কাজ করবে। আরব বিজ্ঞানীরা যন্ত্রটির রক্ষণাবেক্ষণের ভার নেবেন এবং প্রতিদিন এর চৌম্বক ফিতাগুলি পরিবর্তিত করে দেবেন। কম্পিউটারের সাহায্যে প্রাপ্ত তথ্যের বিশ্লেষণ করা হবে কায়রোয়। এই বিজ্ঞানী দলের নেতৃত্ব করবেন ক্যালিফোর্ণিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক পদার্থবিদ ডাঃ লুইস আলভারেজ এবং কায়রোর আইন শ্যাম্‌স্‌ বিশ্ববিদ্যালয়ের পারমাণবিক পদার্থবিদ্‌ ডাঃ এফ. এল. বেদেউই।

ভাবীকালের মোটর গাড়ী

বৃটিশ বিজ্ঞানীরা এমন তিনটি আবিষ্কার করেছেন, যার ফলে ভাবীকালের মোটর গাড়ীর রূপই বদ্‌লে যাবে। এই তিনটি আবিষ্কার হলো—অতি ক্ষুদ্র ব্যাটারী-চালিত রেডার সেট, ইলেকট্রোষ্ট্যাটিক ক্লাচ (Electrostatic clutch) ও ট্র্যানজিস্টরাইজড ইগ্‌নিশন সিষ্টেম (Transistorised ignition system)।

একটি সাম্প্রতিক বিজ্ঞান-প্রদর্শনীতে ডাঃ সিরিল হিলশম (রেডার রিসার্চ এষ্টাব্লিশমেন্ট মেলভার্ন, বৃটেন) এক অতি ক্ষুদ্রাকৃতির রেডার সেটের ব্যবহার দেখিয়েছেন। তিনি একটি বৈদ্যুতিক ট্রেনে এই রেডার সেট যোগ করে

দেখিয়েছেন, তার সাহায্যে ট্রেনটির গতি, লক্ষ্য ইত্যাদি নিয়ন্ত্রিত করা যায়। এথেকে বোঝা যায় যে, ভবিষ্যতে এই ক্ষুদ্রাকৃতির রেডার সেট ট্রেন বা মোটর গাড়ীর সঙ্গে যুক্ত করলে সামনের বাধাবিঘ্ন বা কোন বিপদের সম্ভাবনা ঘটলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে গাড়ী নিয়ন্ত্রিত হবে। এপর্যন্ত ক্ষুদ্রাকৃতির রেডার সেট আবিষ্কৃত না হওয়ায় এই জিনিষটা শুধু কল্পনাতেই ছিল। এর আর একটা শুভ ফল হবে এই যে, কুয়াশা ও খারাপ আবহাওয়ায় ট্রেন দুর্ঘটনা অনেক কমে যাবে।

মোটর গাড়ীর ক্লাচে দুটি ডিস্ক এমনভাবে সংযুক্ত করা থাকে, যাতে সে দুটি একই দিকে ঘুরতে পারে। জি. ই. সি-র বিজ্ঞানী ও ইঞ্জিনীয়ারেরা—এই কাজ চালাতে পারে, এমন ইলেকট্রোষ্টাটিক ক্লাচ (Electrostatic clutch) উদ্ভাবন করেছেন। তাঁরা একটি তড়িৎ-অপরিবাহী উপাদানে তৈরি বড় ডিস্কের সামনে রিং-এর আকারে ছয়টি ছোট ছোট সেলুলোজ কার্বন ডিস্ক রেখে একই ফল পেয়েছেন। এই রকম একটি ক্লাচ গবেষণাগারে ১৮ মাস ধরে কাজ করছে, কিন্তু যন্ত্রটির কোনরূপ ক্ষতি হয় নি।

এই ক্লাচ অবশ্য এখনও প্রাথমিক পর্যায়ে আছে। এই ক্লাচের একটি সুবিধা এই যে, ম্যাগ্‌নেটিক ক্লাচের চেয়ে এতে ক্লাচ-অন-টাইম (ক্লাচ ব্যবহার করা থেকে ক্লাচ কাজ করবার সময়) কম লাগে।

ইগ্‌নিশন সিষ্টেম উদ্ভাবন করেছে অ্যালডারম্যাষ্টনের অ্যাটমিক ওয়েপন্‌স্ রিসার্চ এষ্টাব্লিশমেণ্ট। অনেক দিন ধরেই এই সিষ্টেম নিয়ে কাজ হচ্ছিল। এই উদ্ভাবনের ফলে কন্ট্যাক্ট ব্রেকারস্-এর (Contact breakers) ক্ষয় ও অন্যান্য ঝঞ্চাট থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যাবে। উচ্চ বিদ্যুৎ-শক্তি উৎপাদনের জন্যে বর্তমানে যে সুদীর্ঘ তার লাগে, তারও প্রয়োজন হবে না তাছাড়া জলীয় বাষ্পজনিত ক্ষতির সম্ভাবনাও থাকবে না।

ফিজিক্স প্রদর্শনীতে বৃটিশ বিজ্ঞানীরা দেখিয়েছেন, উপরিউক্ত তিনটি আবিষ্কারের ফলে ভাবীকালের মোটর হবে আরও নিরাপদ, নির্ভর-যোগ্য ও সস্তা।

উর্ধ্বে প্রেরিত দূরবীক্ষণের সাহায্যে নক্ষত্রের সন্ধান

এই প্রথম পৃথিবীর আবহমণ্ডলের উপরে গিয়ে দূরবীক্ষণের সাহায্যে নতুন তিনটি তারকার সন্ধান করা হয়েছে। গত ১৫ই জুলাই নিউ মেক্সিকোর হোয়াইট স্যাণ্ডস্-এর ক্ষেপণাস্ত্র কেন্দ্র থেকে এরোবি রকেটের সাহায্যে ৩৩০ পাউণ্ড ওজনের যন্ত্রপাতি পৃথিবী থেকে ৯০ মাইল উর্ধ্বে প্রেরিত হয়। পৃথিবীর আবহমণ্ডলের উপরে থেকে ঐ যন্ত্রের সাহায্যে অতিবেগুনী আলোতে তিনটি নক্ষত্রের সন্ধান করা হয়। এদের একটি হলো ভেগা। এটি পৃথিবী থেকে ২৫ আলোক-বর্ষ দূরে অবস্থিত। এক আলোক-বর্ষ দূরত্ব বললে এক বছরে আলোকরশ্মি যতটা দূরত্ব অতিক্রম করতে পারে, তাই বোঝায়। আলোর গতি প্রতি সেকেণ্ডে প্রায় ১৮৬৩২৬ মাইল। দ্বিতীয় নক্ষত্রের নাম ল্যামডা স্করপিয়া; এর দূরত্ব ২১৫ আলোক-বর্ষ। তৃতীয়টি হলো জেটা অফিউকাস; এর দূরত্ব পাঁচ শতেরও বেশী আলোক-বর্ষ। আবহমণ্ডলের জন্যে ভূপৃষ্ঠ থেকে এই সকল নক্ষত্র দৃষ্টিগোচর হয় না।

এই পরিকল্পনার নামকরণ করা হয়েছে 'স্ট্র্যাপ'। উৎক্ষেপণ কেন্দ্র থেকে ৫৫ মাইল দূরে একটি স্থানে যন্ত্রপাতিসমূহ উদ্ধার করা হয়েছে এবং রকেটের সাহায্যে এগুলি পুনরায় উর্ধ্বাকাশে প্রেরণ করা হবে বলে জাতীয় বিমান বিজ্ঞান ও মহাকাশ সংস্থার বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন। বিশিষ্ট বিজ্ঞানী থিয়োডোর পি. ষ্টেচার বলেছেন

যে, এই পরিকল্পনা রূপায়ণের ফলে যে সকল তথ্য সংগৃহীত হয়েছে, তা বিশ্লেষণ করতে বেশ কয়েক মাস লাগবে।

ফলমূল প্রভৃতি খাদ্যবস্তু সংরক্ষণের অভিনব ব্যবস্থা

আমেরিকায় ফলমূল প্রভৃতি খাদ্যবস্তু সংরক্ষণের একটি অভিনব পদ্ধতি সম্প্রতি উদ্ভাবিত হয়েছে। এই পদ্ধতিতে ফলমূল বহুদিন টাট্‌কা রাখা যায় এবং বহু দূরে পাঠালেও পচে নষ্ট হবার কোন আশঙ্কা থাকে না। অক্সিজেনের অবস্থিতির জন্তেই যে ফলমূল পেকে পচে যায় ও শাকসব্জী নষ্ট হয়, তা অনেকেই জানেন। এই পদ্ধতিতে খাদ্য-সংরক্ষণাগারে যে পরিমাণ অক্সিজেন থাকে, তার শতকরা ১ ভাগ মাত্র রেখে সকলই একটি যন্ত্রের সাহায্যে বের করে আনা হয় এবং অবস্থা অনুযায়ী সেখানে নাইট্রোজেন ভর্তি করা হয়। ঐ পদ্ধতিতে নাইট্রোজেনের পরিমাণ কমানো বা বাড়ানোর ব্যবস্থা আছে। এর ফলে ঐ সংরক্ষণাগারে রক্ষিত খাদ্য ও ফল-মূলের পচন সাময়িকভাবে নিবারিত হয়।

এই সকল সাজসরঞ্জাম একটি ট্রাকের মধ্যেও বসানো যেতে পারে। কেবল ফলমূল, শাকসব্জীই নয়, মাছ-মাংস ও ফুল নিয়েও পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে এবং উল্লেখযোগ্য ফল পাওয়া গেছে। নাইট্রোজেনের মধ্যে রাখবার জন্তে ঐ সকল খাদ্য কয়েক সপ্তাহ পর্যন্ত অবিকৃত থাকে।

তবে মার্কিন কৃষি দপ্তর সংরক্ষণের এই নতুন পদ্ধতি সম্পর্কে বলেছেন, এই পদ্ধতির আরও উৎকর্ষ বিধান প্রয়োজন। এই পদ্ধতির উদ্ভাবক এই প্রসঙ্গে বলেছেন যে, টমেটো, ফুটি, খরমুজ ও তরমুজ প্রভৃতি ফল সংরক্ষণের জন্তে পাকবার আগেই তোলা হয়। এখন ঐ সকল ফল একেবারে পাকবার পরেই বাগান থেকে তুলে এনে এই পদ্ধতিতে সংরক্ষণাগারে রাখা যেতে পারে। এই পদ্ধতিতে অকালেও অল্পমূল্যে নানারকমের ফল পাওয়া যেতে পারে এবং দূরদেশেও পাঠানো যেতে পারে। পচে নষ্ট খুবই কম হবে বলে এই সকল ফলমূল সস্তায় পাওয়া যাবে।

আমেরিকার বেষ্ট ফার্টিলাইজার নামে একটি প্রতিষ্ঠানের ইঞ্জিনিয়ার ডেভিড ডিক্সন কর্তৃক এই যন্ত্রটি উদ্ভাবিত হয়েছে। ঐ প্রতিষ্ঠানটি অক্সি-ডেন্টাল পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশনেরই একটি শাখা। বেষ্ট ফার্টিলাইজারই খাদ্য সংরক্ষণের এই যন্ত্রটি তৈরি করেছে। যুক্তরাষ্ট্রে আরও দুটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান—ইউনিয়ন কারবাইড কর্পোরেশন ও রেডিও অব আমেরিকা খাদ্য সংরক্ষণের সাজসরঞ্জাম তৈরি করে থাকে।

শিল্পে কৃত্রিম তন্তুর ব্যবহার

ফ্যাশনের জন্তেই কৃত্রিম তন্তুর চল, এই কথাই অধিকাংশ লোক জানে; যেমন—নাইলনের মোজা, রেওন ও টেরিলিনের জামা-কাপড় প্রভৃতি। কিন্তু নাইলন, টেরিলিন যে ফ্যাক্টরির কনভেয়র বেল্টকে অতিরিক্ত শক্তি জোগায় এবং ফায়ার ব্রিগেডের আগুন-নেবানো পাইপকে জোরদার করে, তা কয়জন জানে?

বৃটেনে প্রস্তুত রেওনের অনেকটাই যায় মোটর গাড়ীর টায়ারের অন্তর্বাস তৈরি করতে। কোর্টওল্ড লিমিটেড কর্তৃক উদ্ভাবিত বিশেষ রেওন দ্রুতগতিতে চলমান টায়ারের সমস্ত ধকল সহ্য করতে পারে।

বর্তমানে দ্রুত চলমান গাড়ীর টায়ারে ও বিমানের চাকায় নাইলন ব্যবহৃত হচ্ছে। বিমান সব দিক দিয়ে যত হাল্‌কা হয়, ততই ভাল। সেদিক দিয়ে বিমানের চাকার পক্ষে নাইলন খুবই ভাল। নাইলন খুব শক্ত, উচ্চ গতিসম্পন্ন বিমান অবতরণের চাপ সহ্য করতে সক্ষম।

নাইলন সহজে পচে না। বন্ধুর পথে চলবার সময় ভারী গাড়ীগুলির টায়ারের উপরিভাগ কেটে-ছিঁড়ে যায়, কিন্তু তাতেও ভিতরের কোন ক্ষতি করতে পারে না। মানুষের তৈরি তন্তু শক্ত, হাল্কা ও সহজে পচনশীল নয়। তাই তা দিয়ে নাবিক ও মৎস্য-শিকারীদের চমৎকার দড়ি, সুতা ইত্যাদি তৈরি হয়ে থাকে।

ভিতরের সুতাগুলির পরস্পর ঘর্ষণে সাধারণতঃ দড়ি সহজে ছিঁড়ে যায়। বৃটেনে উদ্ভাবিত বিশেষ নাইলন ব্যবহারে এই ক্ষয় রোধ করা সম্ভব হয়েছে।

মানুষের তৈরি তন্তু দিয়ে এখন লরী বা রেল ওয়াগনে ব্যবহৃত ত্রিপল তৈরি হচ্ছে। এই তন্তুর সঙ্গে রবার ও প্লাষ্টিক মিশিয়ে তরল পদার্থ বহনক্ষম ব্যাগ তৈরি করা যেতে পারে। এতে সুবিধা হবে এই যে, খালি অবস্থায় ব্যাগটিকে ভাঁজ করে রাখা যাবে।

জল তোলবার অভিনব পাম্প

আমেরিকার ব্যুরো অব মাইন্‌স্‌, কয়লার গুঁড়ার সাহায্যে উৎপন্ন বিদ্যুৎ-শক্তিতে চালিত এক প্রকার অভিনব পাম্প আবিষ্কার করেছেন। মোটর গাড়ীতে গ্যাসোলিনের সাহায্যে যেমন বিদ্যুৎ-শক্তি উৎপন্ন হয়, তেমনি ঐ পাম্প চালাবার জন্যে কয়লার গুঁড়া থেকে বিদ্যুৎ-শক্তি উৎপাদন করা হয়ে থাকে। নীচে থেকে উপরে জল তোলবার অথবা নলের মধ্য দিয়ে জল প্রবাহিত করবার জন্যে এই পাম্প ব্যবহৃত হয়। ব্যুরোর গবেষণাগারসমূহে কয়লা এবং কয়লার উপজাত বস্তুসমূহের নতুন নতুন ব্যবহার সম্পর্কে সর্বদাই পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালানো হয়।

ব্যুরো অব মাইন্‌সের ডিরেক্টর ওয়াল্টার আর. হিবার্ট এই প্রসঙ্গে বলেছেন—সম্পূর্ণ ত্রুটিশূন্য হলে এটিকে সেচকার্যে লাগানো যাবে এবং খরচও খুব কম পড়বে। খনিগর্ভে যারা কাজ করে, তারা কয়লার গুঁড়াতে বিস্ফোরণের বিষয়টি ভাল করেই জানে। এই বিষয়টি বহুকাল ধরে পর্যবেক্ষণ করে অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের ফলেই এই পাম্প উদ্ভাবন সম্ভব হয়েছে।

আইসোটোপের সাহায্যে ক্যান্সার রোগ নির্ণয়

স্যানফ্রান্সিসকোর ডাঃ কেনেথ জি. স্কট এবং জে. এম. ভোগেল টোকিওতে অনুষ্ঠিত ইন্টারন্যাশন্যাল ক্যান্সার কংগ্রেসের অধিবেশনে ক্যান্সার রোগের প্রাথমিক পর্যায়ে রুবিডিয়াম আইসোটোপের কার্যকারিতার কথা ঘোষণা করেছেন। তাঁরা যে পর্যায়ে পাকস্থলী ও ফুস্‌ফুসের ক্যান্সার এই আইসোটোপের সাহায্যে ধরতে পেরেছেন, ঐ পর্যায়ে মামুলী এক্স-রে অথবা প্রচলিত অন্যান্য পদ্ধতিতে তা ধরা পড়ে না। এই রোগ নির্ণয়ের এই পদ্ধতিটি সহজ এবং এতে খরচও খুব কম পড়ে।

ডাঃ স্কট ও ডাঃ ভোগেল পরীক্ষা করে দেখেছেন, কোন সুস্থ ব্যক্তির রক্ত-কোষের রুবিডিয়াম আইসোটোপ আত্মসাৎ করতে যে সময় লাগে, কোন ক্যান্সার রোগাক্রান্ত ব্যক্তির রক্ত-কোষ তার ২০ গুণ কম সময়ে তা আত্মসাৎ করে থাকে। গামা-রে স্পেক্‌ট্রোমিটারের সাহায্যে তাঁরা এই পরীক্ষা চালিয়েছিলেন। বর্তমানে যক্ষ্মারোগ সম্পর্কে যেমন স্বাস্থ্য পরীক্ষার ব্যবস্থা রয়েছে, তেমনি ক্যান্সার রোগ সম্পর্কেও ভবিষ্যতে রুবিডিয়াম আইসোটোপের সাহায্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষার ব্যবস্থা হতে পারে।

পরমাণু-কেন্দ্রীনের নিউট্রনের হ্রাস-বৃদ্ধির ফলেই আইসোটোপের সৃষ্টি হয় এবং আইসোটোপের পারমাণবিক ওজন ব্যতীত আর সব রকম রাসায়নিক ধর্ম সর্বাংশে মৌলিক পদার্থের মতই থাকে।

বিমানযাত্রায় লেসারের ব্যবহার

তীব্র লেসার রশ্মির সাহায্যে সুকঠিন হীরার মধ্যেও ছিদ্র করা যায় এবং চোখের অস্ত্রোপচারে বিচ্ছিন্ন রেটিনারও পুনঃসংযোগ সাধিত হয়ে থাকে।

সম্প্রতি মার্কিন বিমান বাহিনীর ওহিয়োর রাইট প্যাটার্সন ঘাঁটির বিজ্ঞানীদের গবেষণার ফলে লেসারকে বিমানযাত্রায়ও ব্যবহার করা হচ্ছে। কোন্ পথে গেলে ঝড়ঝাপ্টা, অন্য কোন বিমানের সঙ্গে এবং ভূতলে অন্য কোন কিছুর সঙ্গে সংঘর্ষ হবে না, লেসার ব্যবস্থা বিমান চালককে তার নির্দেশ দিয়ে থাকে। আকারে এটি একটি ছোট দেশলাইয়ের মত।

দাবানলের বিরুদ্ধে লড়াই

পৃথিবীর বহু স্থানে দাবানল এক গুরুতর বিপদস্বরূপ। বৃটেনে দাবানলের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে আঠালো জল (Steaky water) নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে।

সমুদ্রের আগাছা থেকে পাওয়া সোডিয়াম অ্যালজিনেটের সঙ্গে জল মিশিয়ে এই তরল পদার্থটি ছড়িয়ে দিলে গাছ ও পাতায় লেগে থাকবে, গড়িয়ে পড়বে না।

লণ্ডনের কাছে বোরহাম উড-এর গবেষণা-কেন্দ্রে অরণ্য পরিবেশ সৃষ্টি করে আগুন জ্বালিয়ে পরীক্ষা চালানো হচ্ছে। এলাকার সীমান্তবর্তী গাছগুলিকে আঠালো জলের রিবন দিয়ে বেঁধে আগুন যদি আর বিস্তৃত হতে দেওয়া না হয়, তাহলে অগ্নিনির্বাপক দলের কাজের অনেক সুবিধা হবে।

অনধিকার প্রবেশ রোধ করবার জন্যে বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম

কারখানা বা অনুরূপ প্রতিষ্ঠানে প্রবেশ রোধ ও প্রস্থান নিয়ন্ত্রণ করতে বৃটেনে একটি নতুন ধরণের পদ্ধতি উদ্ভাবিত হয়েছে। এই পদ্ধতিতে পকেট-মাপের প্লাষ্টিকের কার্ডে সাদা চোখে দৃষ্টিগ্রাহ্য নয়, এমন সাঙ্কেতিক ভাষায় লেখা থাকে। এই কার্ডগুলি চাবির কাজ করে।

এই কার্ডগুলি দরজা, গেট বা টার্নষ্টাইলে লক-ইউনিটগুলিকে বৈদ্যুতিক শক্তিতে পরিচালিত করে। এই পদ্ধতিতে এই ভাবে কার্ড-চাবি আছে, এমন বাঞ্ছিত ব্যক্তিরা প্রবেশাধিকার পান ও অনধিকার প্রবেশকারীরা প্রবেশে বাধা পান।

লক-ইউনিটগুলি প্রবেশ পথের মুখে দেয়ালে, চৌকাঠে অথবা ব্র্যাকেটে লাগানো থাকে। ২$\frac{১}{৪}$×৬ ইঞ্চি আয়তনের কার্ডে লেখা অদৃশ্য সঙ্কেত পাঠ করে লক-ইউনিটগুলি তা কণ্ট্রোলে ক্যাবিনেটকে জানিয়ে দেয়। কণ্ট্রোল ক্যাবিনেট তা বিচার করে গ্রহণযোগ্য বলে মনে হলে প্রবেশ পথ উন্মুক্ত করে দেয়।

যদি কোন নকল কার্ড ধরা পড়ে, তাহলে প্রবেশ পথ উন্মুক্ত হয় না এবং নিরাপত্তা বিভাগের কর্মীরা বিপদজ্ঞাপক সঙ্কেত পান।

অন্য পদ্ধতিগুলির সঙ্গে একযোগে কাজ করলে ‘চেকমেট’ নামের এই পদ্ধতিতে শিল্পক্ষেত্রে অনেক গণ্ডগোলের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে।

পদার্থ-বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার

১৯৬৬ সালের জন্মে পদার্থ-বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে খ্যাতনামা ফরাসী পদার্থ-বিজ্ঞানী অধ্যাপক আলফ্রেড কাস্ত্‌লারকে (Alfred Kastler)। পদার্থ-বিজ্ঞানে যে অবদানের জন্মে সুইডিশ অ্যাকাডেমি তাঁকে এই সম্মানে ভূষিত করেছেন, সেটি 'অপ্‌টিক্যাল পাম্পিং মেথড' (Optical Pumping Method) নামে সুপরিচিত। পরমাণুসমূহের মধ্যে হার্ৎজীয় অনুরণন (Hertzian resonance) পর্যবেক্ষণের জন্মে আলোক-শক্তির প্রয়োগ সংক্রান্ত এই পদ্ধতিটি অতীব জটিল এবং সাধারণ পাঠকের কাছে এই বিষয়টির ধারণা বোধগম্য করে তোলা খুবই কঠিন। এখানে এই পদ্ধতির মূল কথা সাধারণভাবে আলোচনা করা হবে।

অধ্যাপক কাস্ত্‌লার কর্তৃক উদ্ভাবিত এই পদ্ধতি অণু-পরমাণুর আভ্যন্তরীণ গঠন সূক্ষ্মভাবে জানবার পক্ষে বিশেষভাবে সহায়তা করে। কাস্ত্‌লারের এই কাজের সূত্রপাত হয় তাঁর সহকর্মী ডাঃ জাঁ ব্রসেলের গবেষণায়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গবেষণাকালে ডাঃ ব্রসেল সর্বপ্রথম লক্ষ্য করেন, আলোক-শক্তি প্রয়োগ করে উত্তেজিত পরমাণুর চৌম্বক অনুরণন পর্যবেক্ষণ করা যায়। অধ্যাপক কাস্ত্‌লার পদার্থের মৌলিক অবস্থার ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি সম্প্রসারিত করেন। ১৯৫০ সালে 'জুর্নাল দ্য ফিজিক' পত্রিকায় 'অপ্‌টিক্যাল পাম্পিং প্রোসেস' (Optical Pumping Process) শিরোনামায় তিনি একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। এই প্রবন্ধে তিনি বলেন, তীব্র আলোকে পরমাণুসমূহকে রেখে যদি যথাযথভাবে সমবর্তিত (polarised) করা হয়, তাহলে পরমাণুসমষ্টির বিন্যাসে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটে।

আমরা জানি, কোন অবস্থায় পরমাণুসমষ্টি কিভাবে বিন্যস্ত হবে, সেটা নির্ভর করে পরমাণুর স্তর ও তার দেশ-ধর্মের (Spatial properties) উপর। এই ব্যাপারে পরমাণুর চৌম্বক ভ্রামক (Magnetic moment) এবং তাদের গতীয় ভ্রামকেরও (Kinetic moment) প্রভাব আছে।

আমরা জানি, পরমাণুর নিউক্লিয়াসের চার ধারে ইলেকট্রনগুলি বিভিন্ন শক্তি-স্তর অনুযায়ী বিভিন্ন দূরত্বে অবস্থান করে। ইলেকট্রনগুলি যখন শক্তি লাভ করে বা হারিয়ে এক শক্তি-স্তর থেকে অন্য স্তরে লাফিয়ে চলে যায়, তখন আলোক শোষিত বা নির্গত হয়। আবার ইলেকট্রনের স্পিন (Spin) অনুযায়ী শক্তি-স্তরগুলি 'সূক্ষ্ম স্তরে' বিভক্ত। এছাড়া বাইরের চৌম্বক ক্ষেত্রের প্রভাবে পরমাণুর চৌম্বক অক্ষ বিভিন্ন ভাবে বিন্যস্ত হলে বিভিন্ন 'জীম্যান-স্তরের (Zeeman level) সৃষ্টি হয়। এরপর আবার পরমাণুর চৌম্বক ভ্রামক ও তার নিউক্লিয়সি ভ্রামকের পারস্পর্য অনুযায়ী 'অতি সূক্ষ্ম স্তর' (Hyperfine structure) সৃষ্টি হয়। এই অতি সূক্ষ্ম স্তরগুলি পরস্পরের খুব কাছাকাছি থাকে। কিন্তু স্বাভাবিক অবস্থায় এই স্তরগুলি একটা নির্দিষ্ট ব্যবধানে থাকে, পক্ষান্তরে জীম্যান ব্যবধান রচিত হয় পরমাণুর উপর আরোপিত চৌম্বক ক্ষেত্রের মান অনুযায়ী। অপ্‌টিক্যাল পাম্পিং পদ্ধতির সাহায্যে বিভিন্ন স্তরে পরমাণুর সংখ্যার পরিবর্তন ঘটানো যেতে পারে, অর্থাৎ কোন এক শক্তিস্তর থেকে উচ্চ বা নিম্নমানের স্তরে পরমাণুগুলিকে আনা যেতে পারে। যেমন ধরা যাক, কোন এক স্তরে শতকরা ৫০ ভাগ পরমাণু আছে এবং অপর একটি স্তরে আছে বাকী ৫০ ভাগ (সাধারণতঃ যা হয়ে থাকে)। এখন অপ্‌টিক্যাল পাম্পিং

পদ্ধতির সাহায্যে পরমাণুর সংখ্যার পরিবর্তন ঘটিয়ে একটি স্তরে শতকরা ২০ ভাগ পরমাণু ও অপর স্তরে শতকরা ৮০ ভাগ পরমাণুর বিন্যাস করা যেতে পারে। আরও সরল ভাষায় বলতে গেলে, কোন এক স্তরে পরমাণুর সংখ্যা বাড়ানো ও অপর স্তরে কমানো যেতে পারে, অথবা উল্টোভাবে এক স্তরে পরমাণুর সংখ্যা কমানো ও অপর স্তরে বাড়ানো যেতে পারে। কারণ বৃত্তাকারে সমবর্তিত আলোকের (Circularly polarised light) একমুখীকরণের (Orientation) পরিবর্তন ঘটলে পাম্পিং পদ্ধতিও বিপরীত দিকে সঞ্চালিত হয়।

এখন পরমাণুর সমাবেশে (যেমন কোন গ্যাসের পরমাণুর ক্ষেত্রে) জীম্যান স্তর অনুযায়ী দেশে (Space) পরমাণুর চৌম্বক অক্ষ পরিবর্তিত হয়। তখন পরমাণুগুলি সমবর্তিত হবার ফলে গ্যাসটি চৌম্বক ধর্ম প্রাপ্ত হয়। সোডিয়াম, পটাশিয়াম, রুবিডিয়াম ও সিজিয়াম প্রভৃতি ক্ষারীয় পদার্থের পরমাণুর ক্ষেত্রে এটি লক্ষ্য করা গেছে। অধ্যাপক কাস্ত্লার ও তাঁর সহযোগীরা দেখিয়েছেন যে, অপ্টিক্যাল পাম্পিং পদ্ধতির সাহায্যে পরমাণুর নিউক্লিয়াসেরও একমুখীকরণের পরিবর্তন ঘটানো যায়। পারদ ও ক্যাডমিয়াম পরমাণুর নিউক্লিয়াসের উপর পরীক্ষা চালিয়ে তাঁরা এটি লক্ষ্য করেন।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে উপলব্ধি করা যায় যে, এই অপটিক্যাল পাম্পিং পদ্ধতি প্রধানতঃ নিউক্লীয় পদার্থ-বিজ্ঞানীদের কাছেই বিশেষ আগ্রহের বিষয়। কারণ এই পদ্ধতির সাহায্যে হিলিয়াম-৩ পরমাণুর নিউক্লিয়াসের অক্ষের একমুখীকরণের পরিবর্তন ঘটানো গেছে। এভাবে পরিবর্তিত হিলিয়াম গ্যাস নিউক্লীয় পদার্থ-বিজ্ঞান সংক্রান্ত পরীক্ষায় সমবর্তিত লক্ষ্যবস্তু হিসাবে ব্যবহৃত হতে পারে। এখানে একটা প্রশ্ন উঠতে পারে—গ্যাসীয় অবস্থায় পরমাণু বা নিউক্লিয়াস যখন পরিবর্তিত হয়, তখন যদি গ্যাস থেকে আলোক সরিয়ে নেওয়া হয়, তাহলে কি হবে? দেখা গেছে, এক্ষেত্রে অক্ষগুলি ক্রমশঃ তাদের স্বাভাবিক পর্যায়ে ফিরে আসে। স্বাভাবিক পর্যায়ে ফিরে আসবার এই প্রক্রিয়াকে বলা হয় 'রিল্যাকসেশন' (Relaxation)। কিভাবে এই প্রক্রিয়া সম্পাদিত হয়, তার ব্যাখ্যা বিজ্ঞানীরা দিয়েছেন। তাঁরা বলেন, পরমাণুগুলি আধারের (কাচ বা স্ফটিক-নির্মিত) গায়ে আঘাত করে। এক সময় ভাবা হতো, পরমাণুগুলি আধারের গায়ে ধাক্কা খেয়ে আবার ফিরে আসে। কিন্তু এখন জানা গেছে, অনেক ক্ষেত্রেই তা হয় না। এখন ভাবা হয়, অত্যল্প সময়ের জন্যে পরমাণুগুলি আধারের গায়ে লেগে থাকে। আধারের সঙ্গে পরমাণুর এই ধাক্কার গোড়ায় ঘটে অবশোষণ (Adsorption) এবং তারপর হয় বাষ্পীভবন (Evaporation)। এক সেকেণ্ডের ১০ লক্ষ ভাগের একভাগ সময়ে এটা ঘটে যায়। কিন্তু নিউক্লীয় পদার্থ-বিজ্ঞানের বিচারে এই অত্যল্প সময়ও হচ্ছে 'অতি দীর্ঘ' সময়। এই সময়ের আবার তারতম্য ঘটে আধারগাত্রের তাপমাত্রা ও প্রকৃতি অনুযায়ী। যখন কোন আধারগাত্রে কোন কিছু প্রলেপ মাখানো হয়, তখন পরমাণুর লেগে থাকবার সময় পরিবর্তিত হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, যদি আধারগাত্রে

প্যারাফিন বা সিলিকনের একটা প্রলেপ দেওয়া হয়, তাহলে সংশ্লিষ্ট সময় কমে যাবে এবং রিল্যাকসেশনের সময় হবে দীর্ঘতর। এই ধরণের ঘটনা পদার্থ ও রসায়ন বিজ্ঞানীদের কাছে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

কিন্তু সাধারণ লোকের কাছে এই বিষয়টির গুরুত্ব ব্যাখ্যা করা কঠিন। তবে এই জটিল বিষয়টি ইতিমধ্যেই নানা উল্লেখযোগ্য কাজে লাগানো হয়েছে। এই পদ্ধতির উপর ভিত্তি করে ফ্রান্সে অপ্‌টিক্যাল পাম্পিং ম্যাগ্‌নোমিটার (Optical pumping magnometer) নির্মিত হয়েছে। এই যন্ত্রটি ওজনে যেমন হাল্কা, তেমনি সহজে বহনও করা যায়। বিমান থেকে ফ্রান্সের চৌম্বক মানচিত্র প্রস্তুতের কাজে ভূ-পদার্থবিজ্ঞানীরা এই যন্ত্র ব্যবহার করেছেন। এই যন্ত্রের সাহায্যে এমন কয়েক রকম আকরিকের স্তর সনাক্ত করা গেছে, ভূগর্ভে যাদের অস্তিত্ব চৌম্বক ক্ষেত্রে বলরেখার পরিবর্তনের দ্বারা ধরা যায়। এক নতুন ধরণের পারমাণবিক ঘড়িও এই পদ্ধতিতে নির্মিত হয়েছে, যার সময়ের নির্ভুলতা অতুলনীয়। তবে কাস্ত্‌লার পদ্ধতির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও উল্লেখযোগ্য প্রয়োগ হচ্ছে লেসার ও মেসারের ক্ষেত্রে।

অধ্যাপক কাস্ত্‌লার এককভাবে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন। কিন্তু তাঁকে পুরস্কার দেবার সময় সুইডিশ অ্যাকাডেমি ডাঃ জঁা ব্রসেলের কথা বিবেচনা না করায় অধ্যাপক কাস্ত্‌লার দুঃখিত হয়েছেন। তিনি বলেছেন, তাঁদের দুজনকে যৌথভাবে নোবেল পুরস্কার দেওয়া উচিত ছিল। এই মন্তব্য থেকে তাঁর বিজ্ঞানী-সুলভ উদার হৃদয়ের পরিচয় পাওয়া যায়।

অধ্যাপক কাস্ত্‌লার ১৯০২ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বর্তমানে "একোল নর্মেল সুপিরিওর' প্রতিষ্ঠানের পদার্থ-বিজ্ঞান গবেষণাগারের বর্ণালী-বীক্ষণ বিভাগের প্রধান। ১৯৬৪ সালে তিনি ফ্রান্সের বিজ্ঞান অ্যাকাডেমির সদস্য নির্বাচিত হন এবং তার পূর্বে অ্যাকাডেমির গ্র্যাণ্ড প্রিক্স লাভ করেন। প্যারীর পৌর কর্তৃপক্ষও তাঁকে গ্র্যাণ্ড প্রিক্স দিয়েছেন। আমেরিকার অপ্‌টিক্যাল সোসাইটি তাঁকে মীজ্‌ পদক এবং ফ্রান্সের জাতীয় বৈজ্ঞানিক গবেষণা কেন্দ্র তাঁকে স্বর্ণপদক প্রদান করেছেন। লোভেন, পিসা এবং অক্স-ফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে সম্মানসূচক ডক্টরেট ডিগ্রীতে ভূষিত করেছেন। বিদেশের একাধিক বিজ্ঞান অ্যাকাডেমি ও সোসাইটির সদস্যপদে তিনি নির্বাচিত হয়েছেন।

কিশোর বিজ্ঞানীর দপ্তর

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

মার্চ—১৯৬৭

২০শ বর্ষ : ৩য় সংখ্যা

নিজ গবেষণাগারে অধ্যাপক আলফ্রেড কাস্তলার।
ইনি ১৯৬৬ সালে পদার্থ-বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার লাভ করেছেন

পেনিসিলিন আবিষ্কারের ইতিহাস

১৮৮১ সালের যে সময়ের কথা বলছি, তখন আধুনিক চিকিৎসা-বিজ্ঞান জন্ম নিচ্ছে; কিন্তু পরিপূর্ণ আকার তখনও লাভ করে নি। ফরাসী বিজ্ঞানী লুই পাস্তুর গবাদি পশুর উপর পরীক্ষা চালিয়ে টীকা দেবার উপকারিতা প্রমাণিত করেছেন। কিন্তু তখনও পর্যন্ত তা সম্পূর্ণ স্বীকৃতি লাভ করে নি। পাস্তুরের ছাত্র মেচ্‌নিকফ রক্তের ভিতর শ্বেতকণিকা (Phagocytes) আবিষ্কার করেন, যাদের কাজ হলো দেহের অভ্যন্তরে দূষিত জীবাণুগুলিকে আক্রমণ করে ধ্বংস করা। কিন্তু একটা প্রশ্ন সর্বদাই থেকে গেল যে, এই শ্বেতকণিকাগুলির জীবাণুধ্বংসী ক্ষমতা থাকলেও দেহকে বাইরের আক্রমণ থেকে রক্ষা করবার ক্ষমতা তাদের খুবই কম। শ্বেতকণিকাগুলি নির্দিষ্ট পরিমাণে রক্তের সঙ্গে মিশে আছে এবং তাদের ক্ষমতাও নির্দিষ্ট। তাই যখন দেহে এই কণিকাগুলির অভাব পড়ে অথবা অসংখ্য পরিমাণ জীবাণু যখন দেহকে বাইরে থেকে আক্রমণ করে, তখন এরা তাদের প্রতিরোধ করতে পারে না। অনেক দিন পর্যন্ত এই সমস্যার কোন সমাধান হয় নি। পর পর দুটি ভয়াবহ বিশ্বযুদ্ধে হাজার হাজার আহত সৈনিক ও নাগরিক বাইরের দূষিত জীবাণুর আক্রমণ থেকে নিস্তার পায় নি—কেন না, ক্ষতস্থানে পচন নিবারণের জন্যে কোন প্রতিরোধক ওষুধ তখনও আবিষ্কৃত হয় নি। পেনিসিলিন আবিষ্কার করে এই কাজ সমাধা করলেন সার্ আলেক-জাণ্ডার ফ্লেমিং। পেনিসিলিনের প্রধান কাজ হলো রক্তের ভিতর শ্বেতকণিকাগুলিকে যথেষ্ট প্রতিরোধক শক্তি যোগান দেওয়া, যাতে এরা সহজেই বাইরের আক্রমণ প্রতিরোধ করতে পারে এবং দেহ সহজে বহিঃশত্রুর দ্বারা আক্রান্ত হতে পারে না বা ক্ষতস্থানে পচন ধরে না। তাছাড়া রক্তের শ্বেতকণিকাগুলিতে এমন এক স্থিতিশক্তি প্রদান করে, যাতে ভবিষ্যতের যে কোন রকম আক্রমণ সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত থাকা যায়।

পেনিসিলিন আবিষ্কার এ-যুগের সবচেয়ে বিস্ময়কর অবদান। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সঙ্কটময় মুহূর্তে দিনের পর দিন অক্লান্ত পরিশ্রম করে সার্ আলেকজাণ্ডার ফ্লেমিং কিভাবে মানুষকে দূষিত জীবাণুর আক্রমণের হাত থেকে বাঁচাবার এক অদ্ভুত প্রতিরোধক শক্তি আবিষ্কার করেন, তা ভাবলে সত্যই আশ্চর্য হতে হয়। ইতিহাসের বিচিত্র গতিপথে মানুষের চিন্তাধারা কি রকম বিভিন্ন খাতে প্রবাহিত হয়, তা এই সব অনুধাবন না করলে বোঝা যায় না।

সার্ আলেকজাণ্ডার ফ্লেমিং ১৮৮১ সালে আয়ারশায়ারের ডারভেলে জন্মগ্রহণ করেন। ছোটবেলায় তিনি চার মাইল দূরে গ্রামের এক স্কুলে পড়তেন। বাল্যকাল

থেকেই অসাধারণ অধ্যবসায় এবং ধৈর্য তাঁকে পরবর্তী কালে মহিমামণ্ডিত করেছিল। স্কুলের পাঠ শেষ করে তিনি চৌদ্দ বছর বয়সে লণ্ডন যাত্রা করেন। তারপর তিনি এক জাহাজী কোম্পানীর অফিসে কেরাণীর কাজ আরম্ভ করেন। এই সময়েই তিনি কার্যোপলক্ষে সেণ্ট মেরী মেডিক্যাল কলেজের সঙ্গে যুক্ত হন এবং চিকিৎসা-বিজ্ঞান অধ্যয়ন করেন। তিনি টাইফয়েডের প্রতিরোধক টীকার আবিষ্কর্তা ডাঃ রাইটের কাছে প্রথম কাজে নিযুক্ত হন এবং আট বছর তাঁর গবেষণাগারে জীবাণু-বিজ্ঞান সম্বন্ধে গবেষণা করেন। এই সময় তিনি প্রচণ্ড পরিশ্রম করতেন। ঘণ্টার পর ঘণ্টা অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে রক্তের জীবাণু পরীক্ষা করতেন। তাঁর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল এমন এক রাসায়নিক পদার্থ বের করা, যার কাজ হবে রক্তের Phagocyte-গুলিকে সতেজ করা।

এরপর ফ্লেমিং এক সৈনিক হাসপাতালে যোগ দেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ তখন সবে সুরু হয়েছে। যুদ্ধে আহত সৈনিকদের এখানে চিকিৎসার জন্যে পাঠানো হতো, কিন্তু তাদের বেশীর ভাগকেই বাঁচানো সম্ভব হতো না—কেন না, বাইরের ধুলাবালির সংস্পর্শে ক্ষতস্থান বিষাক্ত হয়ে উঠতো। এভাবে প্রায় সাত লক্ষ লোককে জীবনদান করতে হয়েছে। চিকিৎসা-বিজ্ঞান তখন অত্যন্ত অনুন্নত ছিল এবং এর কোন প্রতিকার করা তখনও সম্ভব হয় নি। ফ্লেমিং এবং ডাঃ রাইট দুজনেই কার্বলিক অ্যাসিড জাতীয় রাসায়নিক প্রতিরোধক ব্যবহারের পক্ষপাতী ছিলেন না। তাঁদের ধারণা ছিল, এই রকমের ওষুধ বেশীর ভাগ সময়েই জীবাণুকে বাড়তে সহায়তা করে। তাঁরা চিন্তা করতে লাগলেন—এমন কোন জিনিষের দরকার, যাতে Phagocyte-গুলি বাড়তে পারে ও প্রচুর জীবনীশক্তি পায় এবং যার সাহায্যে বাইরের জীবাণুর ধ্বংস সম্ভব হতে পারে।

এরপর ফ্লেমিং আবার সেণ্ট মেরীতে ফিরে গেলেন এবং সেখানে আবিষ্কার করলেন যে, জীবদেহের পেশীর মধ্যে এমন একটি পদার্থ আছে, যেটা বাইরের জীবাণুগুলিকে সহজেই দ্রবীভূত করতে পারে। তিনি এর নাম দিলেন লাইসোজাইম (Lysozyme) এবং দেখালেন যে, দেহের অভ্যন্তরে এটি বিভিন্ন মাত্রায় বিদ্যমান। তিনি প্রাকৃতিক প্রতিরোধক শক্তির উপর বিশ্বাসী ছিলেন এবং প্রচার করলেন যে, এই লাইসোজাইমগুলিও এক রকমের প্রাকৃতিক প্রতিরোধক, যেগুলি রক্তের Phagocyte-গুলির কোন রকম ক্ষতি না করে বাইরের জীবাণু ধ্বংস করতে পারে। যদিও লাইসোজাইম পরবর্তী কালে বিশেষ কাজে আসে নি, তবুও ঐ সময়ে এই আবিষ্কার তাঁকে একজন প্রখ্যাত চিকিৎসা-বিজ্ঞানী হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছিল।

এরপর ১৯২৮ সালে তিনি লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের জীবাণু-বিজ্ঞানের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। এখানে তিনি পরীক্ষা করবার জন্তে কতকগুলি কাচের প্লেটে ছত্রাক-জাতীয় ষ্ট্যাফাইলোকক্কাস তৈরি করেন এবং অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে দেখবার সময়

লক্ষ্য করেন—যে সব প্লেট ইতিমধ্যেই বাতাসের সংস্পর্শে এসে গেছে, তার একটি মধ্যে এক রকমের ছত্রাক জন্মেছে—যা থেকে নিঃসৃত পদার্থ সহজেই জীবাণু ধ্বংস করতে পারে। ফ্লেমিং এর নাম দিলেন পেনিসিলিন। এরপর তিনি ঐ জীবাণুরোধক পদার্থ আলাদা করেন এবং প্রমাণ করেন যে, লাইসোজাইমের মতই এটি একটি রোগ-প্রতিরোধক প্রাকৃতিক বস্তু এবং এর ক্ষমতা অনেক গুণ বেশী। কিন্তু তখন পেনিসিলিন ব্যবহারের সবচেয়ে অসুবিধা দাঁড়ালো এই যে, এটি অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী এবং রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় এর শোধন দরকার।

দুর্ভাগ্যবশতঃ ফ্লেমিং রসায়নবিদ্যায় অনভিজ্ঞ ছিলেন, তাই তাঁর পক্ষে এই বিষয়ে আর অগ্রসর হবার অসুবিধা ছিল। তিনি তাঁর এই গবেষণার সমস্ত ফলাফল একটি ডাক্তারী পত্রিকায় প্রকাশ করেন এবং কিভাবে এর উন্নতিসাধন করা যায়, তারও এক মোটামুটি খসড়া দিলেন। ইতিমধ্যে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক লর্ড ফ্লোরি এবং ই. চেন প্রমুখ বিজ্ঞানীরা এই রকমই একটি প্রাকৃতিক প্রতিরোধকের সন্ধান করছিলেন। তাঁরা ফ্লেমিংয়ের পেনিসিলিন আবিষ্কারের কাহিনী পড়ে ফ্লেমিংয়ের নির্দেশিত পদ্ধতিতে পেনিসিলিন তৈরি করতেন এবং ফ্লোরি সেটা বিভিন্ন প্রাণীদেহের উপর প্রয়োগ করে পরীক্ষা চালাতেন। কিন্তু পেনিসিলিন অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী বলে এই রকম পরীক্ষা চালানো অসুবিধাজনক এবং সর্বোপরি একে ঘনীভূত করা আর এক দুরূহ কাজ ছিল। উচ্চতাপে এর ঘনীভবন সম্ভব নয়, তাই নিম্নতাপে একে কঠিন পদার্থে পরিণত করে আলাদা করা হতো। এভাবে তাঁরা কাদার মত ঈষৎ বাদামী রঙের গুঁড়া পেনিসিলিন পেলেন এবং একে ৫০ লক্ষ গুণ তরল করে ইঁদুরের উপর পরীক্ষা চালালেন। প্রথম প্রথম তাঁরা মনে করতেন যে, এই বাদামী রঙের গুঁড়ার মত পদার্থটাই বিশুদ্ধ পেনিসিলিন, কিন্তু পরে যখন আরও শোধন করা হলো, তখন এক প্রকার সাদা গুঁড়া পাওয়া গেল। প্রকৃতপক্ষে পূর্বের পেনিসিলিনের মধ্যে খুব বেশী পরিমাণ অবিশুদ্ধ পদার্থ ছিল।

১৯৪০ সালের ২৬শে মে, শনিবার ৮টি ইঁদুরের উপর প্রথম পরীক্ষা চালান ডাঃ হিট্‌লী ও ডাঃ ফ্লোরি। এদের প্রত্যেকের দেহে প্রথমে ইন্‌জেকসন দিয়ে বিষাক্ত রোগ বীজাণু প্রবেশ করিয়ে দেওয়া হয়। তারপর রোগাক্রান্ত ইঁদুরগুলির মধ্যে চারটিকে পুরামাত্রায় পেনিসিলিন দেওয়া হয়। দুটিকে কিছু সময় অন্তর অন্তর ইন্‌জেকসন করা হতে থাকে আর শেষ দুটিকে রোগাক্রান্ত অবস্থাতেই বিনা চিকিৎসায় রাখা হয়। পরদিন সকালে দেখা গেল যে, যে দুটিকে ইন্‌জেকশন দেওয়া হয় নি, সে দুটি মারা গেছে আর অপর ছয়টির মধ্যে যেগুলিকে পুরামাত্রায় পেনিসিলিন দেওয়া হয়েছিল, তারা বেশ সচেতন ও সজীব রয়েছে। বাকী দুটি জীবিত আছে, কিন্তু সম্পূর্ণ রোগমুক্ত নয়।

তাঁদের এই পরীক্ষা 'The Lancet' পত্রিকায় প্রকাশিত হলো। ফ্লেমিং

পেনিসিলিনের আশ্চর্যজনক সাফল্যে আনন্দে আত্মহারা হয়ে ছুটে এলেন অক্সফোর্ডের গবেষণাগারে। এবারে মানুষের উপর পরীক্ষার পালা। কিন্তু তখন তাঁদের হাতে খুব কম পরিমাণই পেনিসিলিন অবশিষ্ট ছিল। ডাঃ ফ্লোরি অক্সফোর্ডের ৪৩ বছর বয়স্ক এক পুলিশের দেহে প্রথম পরীক্ষা চালান। গোলাপ তুলতে গিয়ে লোকটির মুখের কাছে একটু কেটে যায়। সেটাই বিষাক্ত হয়ে সারাদেহে ছড়িয়ে পড়ে। সব রকম সম্ভবপর উপায়ই অবলম্বন করা হলো, কিন্তু রোগের কিছুমাত্র উপশম হলো না। রোগীর চোখ-মুখে তখন মৃত্যুর ছাপ সুস্পষ্ট। এই অবস্থায় ডাঃ ফ্লোরি তাকে ২০০ মিলিগ্র্যাম পেনিসিলিন ইন্‌জেকসন দিলেন। এরপর প্রতি তিন ঘণ্টা অন্তর ১০০ মিলিগ্র্যাম করে পেনিসিলিন দেওয়া হতে লাগলো। এক দিনের মধ্যেই রোগীর উন্নতির লক্ষণ দেখা গেল। ক্ষতস্থান ক্রমশঃ শুকাতে আরম্ভ করলো এবং চোখে পুঁজ জমা বন্ধ হলো। পাঁচ দিনের ভিতর রোগী বিছানায় বসে খাবার খেতে পারতো। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ ইতিমধ্যেই সমস্ত পেনিসিলিন নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল; তাই রোগীকে আর বাঁচানো সম্ভব হলো না। ডাঃ ফ্লোরি এতে অত্যন্ত বিচলিত হলেন এবং স্থির করলেন, পরবর্তী পরীক্ষা কোন শিশুর উপরে চালানো হবে, যাতে কম পরিমাণ পেনিসিলিন লাগে।

এরপর একটি চার বছর বয়সের ছেলের উপর পরীক্ষা চালানো হলো। রক্তে বিষাক্ত জীবাণু সংক্রামিত হওয়ায় এর বাঁচবার আশা ছিল না। ডাঃ ফ্লোরি একে পেনিসিলিন ইন্‌জেকসন দিলেন। এই সময়ে অবশ্য যথেষ্ট ওষুধ হাতে ছিল। কয়েক দিনের মধ্যেই রোগী ক্রমশঃ সুস্থ হতে থাকে—বসতে, দাঁড়াতে—এমন কি খেলা পর্যন্ত করতে পারতো। হঠাৎ পাঁচ দিনের দিন মাথার একটি দুর্বল রক্তবাহী নালী ফেটে গিয়ে তার মৃত্যু হয়। পর পর পেনিসিলিনের নানারকম উন্নতিসাধন করা হয় এবং প্রচুর পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে প্রায় সব ক্ষেত্রেই এর কার্যকারিতা প্রমাণিত হয়।

পেনিসিলিন চিকিৎসা-জগতের এক অমূল্য সম্পদ। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে বহু আহত সৈনিক এবং নাগরিক এর দ্বারা উপকৃত হয়েছে। এই কৃতিত্বের জন্যে সার আলেকজাণ্ডার ফ্লেমিংকে ১৯৪৪ সালে নাইট এবং ১৯৪৫ সালে চিকিৎসা-বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার দিয়ে সম্মানিত করা হয়। কিন্তু এই পৃথিবীব্যাপী বিরাট খ্যাতি এবং অকুণ্ঠ স্বীকৃতি ডাঃ ফ্লেমিংকে কোন দিন কর্তব্য পথ থেকে বিচ্যুত করতে পারে নি। তিনি নিরহঙ্কারী অমায়িক পুরুষ ছিলেন এবং প্রাকৃতিক শক্তির উপর তাঁর অগাধ বিশ্বাস ছিল। নোবেল পুরস্কার বিতরণী সভায় তাই তিনি বলেছিলেন—"I did not do anything. Nature makes penicillin; I just found it".

শ্রীরঘুনাথ দাস

স্টেথোস্কোপ

উনবিংশ শতকের গোড়ার দিকে (১৮১৬) এক শীতের সকালের কথা। প্যারিসের নেকার হাসপাতালে প্রাতঃকালীন পরিদর্শন শেষ করে তরুণ ফরাসী চিকিৎসক একটু বেড়াবার জন্যে বাগানের দিকে এগুলেন। হঠাৎ তাঁর নজরে পড়লো ক্রীড়ারত ছুটি শিশুর দল। একদল একটি ঢেঁকির একপ্রান্তে হাতুড়ী দিয়ে আওয়াজ করছিল আর অন্য দলটি অপর প্রান্তে কান পেতে তা শুনছিল। চিকিৎসক কয়েক মিনিট ধরে তাদের লক্ষ্য করলেন। তাঁর অনুসন্ধিৎসু মন এক বৈজ্ঞানিক তথ্যের সন্ধান পেল। তক্ষুনি তিনি ফিরে এলেন হাসপাতালে। নিজের পড়বার টেবিলে বসে বড় একটি কাগজ গোল করে পাকিয়ে এক মুখ কানে ধরে অপর মুখ টেবিলের উপর রাখলেন। তারপর পেন্সিল দিয়ে টেবিলে আওয়াজ করতে লাগলেন। পেন্সিলের আওয়াজ তাঁর কানে বেশ জোরে বাজতে লাগলো। এথেকে তিনি হৃৎস্পন্দন শোনবার যন্ত্র আবিষ্কারের সন্ধান পেলেন। এই তরুণ ফরাসী চিকিৎসকের নাম রেনি থিয়োফাইল লায়েনেক। এই সময়ে নেকার হাসপাতালের কোন এক ওয়ার্ডে এক স্থূলাঙ্গী রোগিণী বুকের ব্যাধিতে ভুগছিলেন। সরাসরি বুকের আওয়াজ শুনতে ভারি অসুবিধা হচ্ছিল। লায়েনেক তাঁর কাগজ পাকানো টিউবটি রোগিণীর বুকের উপর ধরলেন। তিনি তখন হৃৎস্পন্দন ও ফুস্‌ফুসের শব্দ শুনতে পেলেন। সরাসরি কান পেতে শোনবার চেয়ে কাগজের টিউবের ভিতর দিয়ে ঐ শব্দ আরও সুস্পষ্ট শোনা গেল। এভাবে বুকের অসুখের চিকিৎসার জন্যে লায়েনেক এক নতুন যন্ত্র আবিষ্কার করেন।

১৭৮১ সালে ফ্রান্সের কুইম্পার অঞ্চলে তাঁর জন্ম। বাবা থিয়োফাইল মেরী লায়েনেক ছিলেন একজন আইনবিদ্ ও কবি। লায়েনেকের যখন মাত্র ছয় বছর বয়স তখন তাঁর মা মারা যান। আট বছর বয়সে তিনি শিক্ষার জন্যে কাকা ডাক্তার গুইলামের কাছে যান। ১৪ বছর বয়সে তিনি কাকার কাছে চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়ন সুরু করেন। গৃহযুদ্ধ বেধে যাওয়ায় তাঁর অধ্যয়ন ব্যাহত হয়। ১৭৯৯ ও ১৮০০ সালে তিনি যুদ্ধের জন্যে চিকিৎসক হিসেবে কাজ করেন। ১৮০১ সালে তিনি প্যারিসে প্রত্যাবর্তন করে এক দাতব্য প্রতিষ্ঠানে করভিসাটের ছাত্র হিসাবে তাঁর নাম তালিকাভুক্ত করেন। ১৮০৪ সালে তিনি চিকিৎসক উপাধি লাভ করেন। উপাধি লাভের পর তিনি তাঁর গবেষণার কাজ আরম্ভ করেন। প্যারিসে তখন ডাঃ বেইলীর সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব হয়। এই দুই তরুণ তখন ডেপুট্রেনের সহযোগী হয়ে বেশ কিছুদিন প্যাথোলজিক্যাল অ্যানাটমির উপর কাজ করেন। যক্ষ্মা সংক্রান্ত কিছু

গবেষণাও তিনি করেছিলেন। লায়েনেক বিচক্ষণ প্যাথোলজিষ্ট, সুশিক্ষক ও দক্ষ চিকিৎসক ছিলেন। ১৮১৪ সালে তিনি নেকার হাসপাতালের চিকিৎসক নিযুক্ত হন। ১৮১৬ সালে নেকার হাসপাতালে তিনি ষ্টেথোস্কোপ আবিষ্কারের গোড়াপত্তন করেন। প্রথম প্রথম তিনি কাগজ গোল করে পাকিয়ে বুকের আওয়াজ শুনতেন। এতে অসুবিধা হওয়ায় তিনি আবলুস কাঠ দিয়ে টিউবের মত করে কাজ চালাতেন। এক ফুট লম্বা ও সওয়া এক ইঞ্চি ব্যাসযুক্ত ছিল এই যন্ত্রটি। আবার কিছুদিন পরে এর নতুন সংস্করণ হলো। এটিকে দুটি অংশে ভাগ করে আট্‌কানো হলো একসঙ্গে, তখন যন্ত্রটিকে সর্বদা বহন করা তাঁর পক্ষে সহজ হয়ে উঠলো। ক্রমশঃ তিনি উপলব্ধি করলেন—এই ফাঁকা রডগুলি দিয়ে যদিও হৃৎস্পন্দন খুব স্পষ্ট শোনা যচ্ছে, তবুও এই রড্‌ দিয়ে ফুস্‌ফুসের আওয়াজ পৃথক করা তাঁর পক্ষে কষ্টকর। এই জন্যে তিনি দুটি কাঠের ফাঁকা রডের মাঝে একটি মধ্যবর্তী নল তৈরি করেন। এর সাহায্যে তিনি বিভিন্ন ধরণের ফুস্‌ফুসের রোগে বিভিন্ন প্রকার শব্দ শুনতে সক্ষম হলেন। মুগ্ধ হয়ে তিনি শুনতে লাগলেন চিকিৎসার ইতিহাসের অলিখিত কথা —বুকের ঘর্ঘর, ঘর্ষণ আর মর্মর ধ্বনি। নতুন যন্ত্রটির নামকরণ করলেন স্টেথোস্কোপ, যে নামটি দুটি গ্রীক কথার সমষ্টি—বক্ষ ও পর্যবেক্ষণ করা।

১৮১৯ সালে লায়েনেকের শ্রেষ্ঠ কাজ "Traite de l' auscultation Médiate" পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। লায়েনেকের এই বইটি নানা তত্ত্ব ও তথ্যের খনি। এই বইটি হৃৎপিণ্ড ও ফুস্‌ফুসের ক্লিনিক্যাল আসপেক্ট বা নিদান তত্ত্ব ও তাদের সূক্ষ্ম প্যাথোলজিক্যাল অ্যানাটমির বর্ণনায় পূর্ণ। তাঁর বইটি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে সারা বিশ্বে বিশেষ আলোড়ন সৃষ্টি হয় এবং তা যুগান্তকারী বলে সম্মানিত হয়। সারা বিশ্বের চিকিৎসা কেন্দ্রে তাঁর হৃৎস্পন্দন শোনবার যন্ত্র ও পদ্ধতির ব্যবহার সুরু হয়।

অক্লান্ত গবেষণার অপরিসীম পরিশ্রমে লায়েনেক ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। তাঁর ফুস্‌ফুসে টিউবারকিউলোসিসের লক্ষণ প্রকাশ পায়। তখন তিনি স্বদেশ বৃটানীতে বিশ্রাম নিতে ফিরে যান। তাঁর ভগ্নস্বাস্থ্যের ক্রমশঃ উন্নতি হতে থাকে। অবশেষে বছর দুয়েক পরে তিনি আবার প্যারিসে ফিরে এলেন। এখানে এসে তিনি রাজ্ঞীর অনুগ্রহ লাভ করেন ও তাঁর সহায়তায় ফ্রান্স মহাবিদ্যালয়ে মেডিক্যাল ক্লিনিকের অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হন। এর পরের চার বছর তিনি নিয়োগ করেন তাঁর এই গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশের উদ্দেশ্যে। বইয়ের নাম সামান্য পরিবর্তিত হয়ে "Traite de l' auscultation Médiate et des maladies des poumons et du poumons et du cœur."—এই নামে প্রকাশিত হলো ১৮২৬ সালে। লায়েনেক তাঁর বইয়ের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করবার সময় প্রায়ই নানারকম শারীরিক কষ্টে ভুগছিলেন। তাই স্মৃতি কথায় লিখেছিলেন "এই বই শেষ করবার সময়কার শেষ বছরটিতে আমি বুঝতে

পেরেছিলাম, অত্যধিক পরিশ্রমে আমার জীবনকে বিপদসঙ্কুল করে তুলেছি, কিন্তু এই বইটি আমার স্বপ্ন-সাধনা, আমি প্রকাশ করতে চলেছি। আমি আশা করি, তার মূল্য একটি মানুষের জীবনের চেয়ে অনেক বেশী। এর ফলে আমার কর্তব্য শেষ হবে, জীবনে আমার যাই ঘটুক না কেন।" বইটি প্রকাশিত হবার পর তিনি বৃটানীতে তাঁর নিজের বাড়ীতে প্রত্যাবর্তন করেন এবং সেখানেই তিনি ১৮২৬ সালে ১৩ই অগাষ্ট শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

লায়েনেকের আরব্ধ অসমাপ্ত কাজ তাঁর পরবর্তী চিকিৎসকগণ সমাপ্ত করেন। লায়েনেকের পর এই ষ্টেথোস্কোপের অনেক পরিবর্তন ও উন্নতি সাধিত হয়েছে। পূর্বসূরীর প্রবর্তিত ধারা অনুসরণ করে পায়োরী যন্ত্রটিকে ঈষৎ পরিবর্তিত করেন। পায়োরীর পর ষ্টেথোস্কোপের আরও রূপান্তর ঘটে। আধুনিক ষ্টেথোস্কোপে একটি বিস্তৃত বক্ষখণ্ড এবং দুটি নমনীয় বক্র নল লাগানো থাকে। এই নলের প্রান্ত দুটি কানে বেশ ভালভাবে আটকে থাকে। এই রূপান্তরিত প্রান্ত দুটি আইভরি বা শক্ত রবারের তৈরি। সাধারণ স্টেথোস্কোপ ছাড়া অন্য ধরণের ষ্টেথোস্কোপেও উদ্ভাবিত হয়েছে; যেমন—কোনেণ্ডোস্কোপ। এটিতে বক্ষ-খণ্ডের জায়গায় একটি ছোট ড্রাম লাগানো থাকে। এরপর বৈদ্যুতিক স্টেথোস্কোপ উদ্ভাবিত হয়েছে। এই যন্ত্রে আছে মাইক্রোফোন, টেলিফোন ও বৈদ্যুতিক ভাল্‌ব্‌। এর সাহায্যে হৃৎকম্পন, হৃৎস্পন্দন প্রভৃতি ইচ্ছামত গভীরতা বা তীব্রতায় রোগীর কাছাকাছি না থেকেই শোনা যায়। রোগাক্রান্ত ফুস্‌ফুসের নানা অবস্থা ধরা পড়ে এই ষ্টেথোস্কোপের সাহায্যে এবং এটি হৃৎপিণ্ডের ক্ষেত্রেও সমানভাবে প্রযোজ্য। অনেক রোগই এতে অবিশ্বাস্য রকম নির্ভুলভাবে নির্ণীত হয়। রক্তের চাপ নির্ণয়ে ষ্টেথোস্কোপের সাহায্য অনস্বীকার্য। ফুস্‌ফুস, হৃৎপিণ্ড, প্লুরা, উদর ও দেহের অন্যান্য যন্ত্রের অবস্থা ও সন্তান-সম্ভবা মেয়েদের জঠরে শিশুর অবস্থান উপলব্ধির জন্যে ষ্টেথোস্কোপের সাহায্য নেওয়া হয়। তাই ষ্টেথোস্কোপ আজ চিকিৎসকের অপরিহার্য অঙ্গ। ইলেকট্রনিক রেখচিত্র হয়তো নিদানিক হৃদ-পরীক্ষার সূক্ষ্মতা খানিকটা বাড়িয়ে তুলতে পারে, কিন্তু হৃৎপিণ্ডের অবস্থা পর্যবেক্ষণে সবচেয়ে সুন্দর, সুবেদী ও সূক্ষ্ম যন্ত্র হচ্ছে মানুষের কানে লাগানো লায়েনেকের প্রথম আবিষ্কার—ষ্টেথোস্কোপ।

শ্রীসতী চক্রবর্তী

নাইলনের কথা

মেয়েদের শাড়ী ও নানা রকম পোষাক-পরিচ্ছদ প্রস্তুতির উপকরণ হিসাবে নাইলনের নাম আজ সর্বত্র পরিচিত। কিন্তু ইঞ্জিনীয়ারিং শিল্পে নাইলনের ব্যবহারের কথা অনেকেরই হয়তো জানা নেই। নাইলনের সাহায্যে বেল্ট, দড়ি, টায়ার প্যারাসুটের কাপড় প্রভৃতি অনেক প্রয়োজনীয় জিনিষ তৈরি হয়ে থাকে। মাত্র ত্রিশ বছর আগেও নাইলনের নাম কারও জানা ছিল না। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কিছু আগে আমেরিকার E. I. du Pont de Nemours & Co একটা নতুন ধরণের পলিমার (Polymer) সংশ্লেষণের চেষ্টা করছিলেন। ১৯৩৮ সালে এই du Pont কোম্পানীর গবেষণা বিভাগ থেকে ঘোষণা করা হয় যে, তাঁরা একটা নতুন পলিমার সংশ্লেষণ করতে সক্ষম হয়েছেন। এই নতুন পলিমারটির সংসক্তি (Tenacity) ও ঘর্ষণজনিত প্রতিরোধের ক্ষমতা সাধারণ রেশম, তুলা ও রেয়নের চেয়ে অনেক বেশী। এই পলিমারটির নাম দেওয়া হলো নাইলন।

নাইলন আবিষ্কারের পর তুলা বা রেশমের জিনিষে এর ব্যবহারের উপায় উদ্ভাবনের জন্যে বৈজ্ঞানিকেরা চিন্তা করতে লাগলেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় নাইলন শিল্পের চরম উন্নতি হলো যুদ্ধ সংক্রান্ত প্যারাসুট, দড়ি প্রভৃতি নির্মাণে। কিন্তু যুদ্ধ শেষ হবার পর প্রচুর নাইলন উদ্বৃত্ত রয়ে গেল, কাজেই এই উদ্বৃত্ত নাইলনের সাহায্যে নানা রকম পোষাক-পরিচ্ছদ তৈরির চেষ্টা চলতে লাগলো। পরবর্তী কালে এই নাইলন মোল্ডিং পাউডার (Moulding Powder) হিসাবে ব্যবহৃত হতে থাকে।

নাইলন জিনিষটি কি এবং কোথা থেকে এর উৎপত্তি হয়? অনেকেই মনে করেন—নাইলন বলতে একটি জিনিষকেই বোঝায়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বিভিন্নপ্রকার যৌগিক পদার্থ থেকে উৎপন্ন নাইলনকে ভিন্ন ভিন্ন নাম দেওয়া হয়েছে। এগুলি সবই নাইলন শ্রেণীভুক্ত বটে, কিন্তু প্রত্যেকেরই ধর্ম পৃথক। যেমন—Hexamethylene diamine ও Adipic acid থেকে প্রস্তুত পলিমারের নাম Nylon 6-6; আবার Nylon-6 অথবা Parlon, Nylon 6-10, বা 6 Parlon প্রভৃতি। একপ্রকার নাইলনের কেবলমাত্র আণবিক ওজন বাড়িয়ে-কমিয়ে তার ধর্ম, যেমন—সান্দ্রতা, ঔজ্জ্বল্য ও বর্ণ প্রভৃতির পরিবর্তন করা যায়।

বর্তমানে ক্রমবর্ধমান নাইলনের চাহিদা রসায়নশিল্পে এক বিরাট বিপ্লব এনেছে। আমেরিকা, বৃটেন ও জাপান আজ নাইলন উৎপাদনে এগিয়ে গেছে। আমাদের ভারতেও একটি নাইলন উৎপাদন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার চেষ্টা চলছে। কারণ আমাদের জামা-কাপড় তৈরি করতে এবং কুটির শিল্পে মোল্ডিং পাউডারের জন্যে ব্যবহৃত নাইলন বাইরে থেকে আমদানী করতে হয়। নাইলনের ব্যবহার বহুমুখী, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এর উৎপাদনের এক বিরাট অংশ প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম সুতার সঙ্গে মিশ্রণের জন্যে ব্যবহৃত হয়।

এবার এই প্রয়োজনীয় বস্তুটি প্রস্তুতের কথা আলোচনা করবো। মাত্র দুটি যৌগিক পদার্থের মিশ্রণকে উত্তপ্ত করেই নাইলন পাওয়া যায়। এদের মধ্যে একটি হলো Diamine—Hexamethylene dianamine এবং অপরটি হলো Diabasic acid, যেমন—Adipic acid। এই দুটি যৌগিক পদার্থের বিক্রিয়ার সময় যে জল উৎপন্ন হয়, তাকে বিক্রিয়ার কালেই সরিয়ে দেওয়া হয়।

প্রথমে Hexamethylene diaminine ও Adipic acid-কে জলে মিশ্রিত করা হয়। পরে এই দ্রবণটি কার্বনের গুড়ার সাহায্যে বর্ণহীন করা হয় এবং পরে এই দ্রবণটিকে কার্বনের গুঁড়ার সাহায্যে বর্ণহীন করা হয় এবং সামান্য পরিমাণ অ্যাসেটিক অ্যাসিড মিশ্রিত করা হয়। তারপর এই লবণটিকে অটোক্লেভে রেখে 'পলিমেরাইজ' করা হয়। যখন দ্রবণটি অটোক্লেভে একটা বিশেষ ঘনত্বে এসে পৌঁছায়, কেবল তখনই লবণটি পলিমেরাইজ্‌ড্‌ হয়। এই প্রক্রিয়ায় যে নাইলন উৎপন্ন হয়, তা খুবই চক্‌চকে এবং সেই জন্যে এর দ্বারা পোষাক তৈরি সম্ভব নয়। এই চক্‌চকে ভাবকে কমাবার জন্যে বিক্রিয়ার সময় Titanium dioxide নামক একটি যৌগিক পদার্থ মেশানো হয়। এই পদ্ধতিতে তৈরি নাইলনকে বলা হয় Matt Nylon।

নাইলনের আণবিক ওজন ১২,০০০ থেকে ২০,০০০—যদি এর আণবিক ওজন ১২,০০০-এর কম হয়, তাহলে এর দ্বারা তৈরি সুতা খস্‌খসে হয় এবং টান সহ্য করতে পারে না। আবার যদি আণবিক ওজন ২০,০০০-এর বেশী হয়, তাহলে এই পলিমারকে গলানো কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে। সুতরাং উৎকৃষ্ট নাইলনের জন্যে একটা নির্দিষ্ট আণবিক ওজনেই পলিমেরিজেসন বন্ধ করতে হবে। নাইলন শিল্পে এই বিরাট দায়িত্বপূর্ণ কাজটি একাই নিয়েছে অ্যাসেটিক অ্যাসিড। এই অ্যাসিড মিশ্রণের ফলে বিশেষ বিশেষ আণবিক ওজনের নাইলন তৈরি করা সম্ভব হয়েছে।

Nylon 6-6 তরল অম্ল বা ক্ষারের দ্বারা আক্রান্ত হয় না। বস্ত্রশিল্পে নাইলনের প্রসারের কারণ হিসাবে এই দুটি বিষয় উল্লেখ করা যেতে পারে। কিন্তু নাইলনের একটি বিরাট ত্রুটি এই যে, এটি দাহ্য পদার্থ। সুতরাং নাইলনের পোষাক পরিহিত ব্যক্তির পক্ষে আগুনের কাছে যাওয়া নিষিদ্ধ।

বর্তমান জগতে নাইলনের বহুমুখী ব্যবহার এবং প্রয়োজনীয়তার জন্যে আজও নতুন ধরণের নাইলন প্রস্তুতের উদ্দেশ্যে গবেষণা চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

শ্যামল সেন

সহজে ইংরেজী তারিখের বার নির্ণয়

তোমরা হয়তো অনেকে শকুন্তলা দেবীর কথা শুনেছ। তিনি মাঝে কলকাতায় এসে সাউথ ইণ্ডিয়া ক্লাবের এক অনুষ্ঠানে বড় বড় যোগ, গুণ, Square root, Cube root, Fifth root, Airthmetical progression, Geometrical progression, Factorial প্রভৃতি অঙ্কের সমাধান নিমেষের মধ্যে করে দর্শকদের অকুণ্ঠ প্রশংসা অর্জন করেছিলেন। সেই অনুষ্ঠানের সভাপতি ইণ্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউটের রিসার্চ ট্রেনিং সেকসনের ডিরেক্টর Dr. C. R. Rao শকুন্তলা দেবীকে ২৪টি সংখ্যার একটি অঙ্কের Cube root বের করতে দিয়েছিলেন। তিনি প্রায় সঙ্গে সঙ্গে তার উত্তর বলে দিয়েছিলেন। দর্শকদের মধ্যে একজন তাঁকে $১+২+৩+\cdots+১০^{১২}$ অঙ্কের যোগফল জিজ্ঞাসা করে সঠিক জবাব পেয়েছিলেন। এক ভদ্রমহিলা প্রশ্ন করেছিলেন যে, যদি তিনি ১লা জানুয়ারীতে এক পয়সা, ২রা জানুয়ারীতে দুই পয়সা, ৩রা জানুয়ারীতে চার পয়সা, ৪ঠা জানুয়ারীতে আট পয়সা হিসাবে জমাতে আরম্ভ করেন, তাহলে জানুয়ারী মাসের শেষে তাঁর কত জমবে? শকুন্তলা দেবীর উত্তর দিতে বিন্দুমাত্র কষ্ট হয় নি। কিন্তু উত্তরটি ভদ্রমহিলার জানা ছিল না বলে অসুবিধা হয়েছিল। তবে Dr. Rao বই ঘেঁটে মিলিয়ে দেখলেন যে, উত্তরটি নির্ভুল। সবচেয়ে মজার খেলা তিনি দেখিয়েছিলেন, যখন দর্শকেরা তাঁদের জন্ম বা বিবাহের বছর, মাস ও তারিখ বলে বারের নাম জানতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তিনি মুহূর্তের মধ্যে ঐ বারের নাম বলে সকলকে চমক লাগিয়ে দিয়েছিলেন। তাঁর শেষ খেলাটাও কম চমকপ্রদ নয়। তিনি দর্শকদের মধ্যে সবচেয়ে লম্বা ব্যক্তিকে বেছে নিলেন এবং তার হাতে ১৯৬৭ সালের একটা ক্যালেণ্ডার দিয়ে দর্শকদের যে কোন একটা 'বার' বলতে বললেন একজন বললেন—বৃহস্পতিবার। সঙ্গে সঙ্গে তিনি জানুয়ারী, ফেব্রুয়ারী, মার্চ প্রভৃতি মাসের বৃহস্পতিবার কি কি তারিখ পড়েছে, তা আগাগোড়া গড়গড় করে বলে গেলেন। আবার তিনি উল্টোভাবে ডিসেম্বর থেকে জানুয়ারী মাসের যে কোন বারের তারিখগুলিও নির্ভুলভাবে তাড়াতাড়ি বলে গেলেন। দর্শকদের মধ্যে একজন তাঁকে ঠকাবার জন্যে জানুয়ারী মাসের বুধবার ও ফেব্রুয়ারী মাসের শুক্রবার, আবার মার্চ মাসের বুধবার ও এপ্রিল মাসের শুক্রবার—এইভাবে প্রতি মাসের তারিখগুলি বলতে বলেছিলেন। কিন্তু তাঁকে ঠকানো গেল না, তিনি সকলের করতালির মধ্যে তারিখগুলি সঠিক বলতে পেরেছিলেন।

শকুন্তলা দেবীর ক্যালেণ্ডারের খেলাগুলি খুব কঠিন বলে মনে হলো না। যদি ঘরে বসে কিছুদিন চর্চা কর, তাহলে তোমরাও ক্যালেণ্ডারের খেলাগুলি

দেখিয়ে বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজনকে অবাক করে দিতে পার। প্রথমে তোমাদের চলিত ১৯৬৭ সালের যে কোন তারিখের বার সহজে নির্ণয় করবার পদ্ধতিটা বলছি।

ইংরেজী ক্যালেণ্ডারে জানুয়ারী মাসের যে তারিখ যে বারে দেখা যায়, সেই তারিখ ফেব্রুয়ারী, মার্চ ও নভেম্বর মাসে ৩ দিন, এপ্রিল ও জুলাই মাসে ৬ দিন, মে মাসে ১ দিন, অগাষ্ট মাসে ২ দিন, সেপ্টেম্বর ও ডিসেম্বর মাসে ৫ দিন বাদে যে বার হয়, সেই বারে পড়ে। কিন্তু জানুয়ারী ও অক্টোবর মাসের তারিখগুলি একই বারে পড়ে—কোন পরিবর্তন হয় না। জানুয়ারী মাসের ৯ তারিখ সোমবার পড়লে, ফেব্রুয়ারী ও মার্চ মাসে ৯ তারিখ বৃহস্পতিবার, এপ্রিল মাসে রবিবার, মে মাসে মঙ্গলবার, জুন মাসে শুক্রবার, জুলাই মাসে রবিবার, অগাষ্ট মাসে বুধবার, সেপ্টেম্বর মাসে শনিবার, অক্টোবর মাসে সোমবার, নভেম্বর মাসে বৃহস্পতিবার ও ডিসেম্বর মাসে শনিবার পড়বে। তোমরা একটা তালিকা প্রস্তুত করে রাখতে পার। যেমন জানুয়ারী –0, ফেব্রুয়ারী—৩, মার্চ—৩, এপ্রিল—৬, মে—১, জুন—৪, জুলাই—৬, অগাষ্ট—২, সেপ্টেম্বর—৫, অক্টোবর—0, নভেম্বর—৩, ডিসেম্বর—৫।

এই তালিকাটি যে যত ভালভাবে মনে রাখতে পারবে, সে তত চট্‌পট্ ইংরেজী তারিখের বার নির্ণয় করতে পারবে। তার আগে আর একটা কথা বলা দরকার। ১৯৬৭ সালের ১লা জানুয়ারী—রবিবার। সুতরাং রবিবারকে ১, সোমবারকে ২, মঙ্গলবারকে ৩, বুধবারকে ৪, বৃহস্পতিবারকে ৫, শুক্রবারকে ৬ ও শনিবারকে 0 ধরতে হবে।

এখন যদি তোমাকে বলা হয়—২৬শে মার্চ কি বার? সঙ্গে সঙ্গে তুমি মনে মনে ২৬ তারিখের সঙ্গে মার্চের ৩ (উপরের তালিকা থেকে) যোগ করে যোগফলকে ৭ দিয়ে ভাগ করে যা ভাগশেষ থাকবে—সেই ভাগশেষ তোমাকে 'বার' বলে দেবে। এক্ষেত্রে ভাগশেষ মাত্র ১। সুতরাং তোমার উত্তর হবে রবিবার। আবার যদি তোমাকে প্রশ্ন করা হয়—১৫ই অগাষ্ট কি বার? তুমি মনে মনে ১৫ তারিখের সঙ্গে অগাষ্টের ২ যোগ করে যোগফলকে ৭ দিয়ে ভাগ করে ৩ অবশিষ্ট পাবে। সঙ্গে সঙ্গে তোমার উত্তর মঙ্গলবার বলতে বিশেষ দেরী হবে না।

যদি চলিত বছর লীপ-ইয়ার (Leap year) হয়, তাহলে ২৯শে ফেব্রুয়ারীর পরের তারিখের সঙ্গে ১ যোগ করে নিতে হবে এবং চলিত বছরের ১লা জানুয়ারী যে বার পড়বে, সেই বারকে সব সময় ১ ধরে নিয়ে নতুন করে বারের সংখ্যাগুলি পাল্‌টে নিতে হবে।

এবার তোমাদের ১৯০০ সাল থেকে ১৯৯৯ সালের যে কোন তারিখের বার নির্ণয় করবার কৌশলটা বলবো।

১৯০০ সালের ১লা জানুয়ারী সোমবার ছিল। সুতরাং এক্ষেত্রে সোমবারকে ১,

মঙ্গলবারকে ২, বুধবারকে ৩, বৃহস্পতিবারকে ৪, শুক্রবারকে ৫, শনিবারকে ৬ ও রবিবারকে 0 ধরতে হবে। মাসের ক্ষেত্রে উপরের তালিকায় যে সংখ্যাগুলি ধরা হয়েছে, তার কিছুই নড়চড় হবে না। ১৯০০-এর পরে বছরের সংখ্যা এবং সেই কয় বছরের মধ্যে কটা লীপ-ইয়ার পার হয়ে গেছে, সে সম্বন্ধে খেয়াল রাখতে হবে।

এখন যদি তোমাকে বলা হয়—১৯১০ সালের ১৩ই জুলাই কি বার ছিল? এখানে তুমি প্রথমে ১০ (১৯০০-এর পরে দশ বছর), পরে ২ (দশ বছরে ২টা লীপ-ইয়ার), তারপরে ১৩ (জুলাই মাসের তারিখ) এবং সর্বশেষে উপরের তালিকা থেকে জুলাই-এর ৬ যোগ করে যে ৩১ যোগফল হবে, তাকে ৭ দিয়ে ভাগ করলে ৪ অবশিষ্ট থাকবে। সুতরাং ঐ তারিখ বৃহস্পতিবার বলতে তোমার একটুকুও অসুবিধা হবে না। আবার যদি তোমাকে বলা হয়—১৯৪৭ সালের ১৫ই অগাস্ট কি বার ছিল? এখানে তুমি মনে মনে (৪৭+১১+১৫+২)÷৭ এই অঙ্কটা কষে ভাগশেষ বের করে ফেললেই উত্তর পেয়ে যাবে। এক্ষেত্রে ভাগশেষ ৫ ; সুতরাং উত্তরটি শুক্রবার ছাড়া আর কিছু নয়।

এবার সপ্তাহের কোন 'বার' বললে—সেই বারে জানুয়ারী থেকে ডিসেম্বর মাসের তারিখগুলি কি করে বলতে পারা যায়—তার পদ্ধতিটা বলছি।

এখন যদি তোমাকে বলা হয়—১৯৬৭ সালের জানুয়ারী থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত বৃহস্পতিবারের তারিখগুলি কি কি? তুমি যদি প্রতি মাসের প্রথম বৃহস্পতিবারের তারিখগুলি জেনে নিতে পার, তাহলে সাত পর পর যোগ করলে বাকী সপ্তাহের তারিখগুলি বলতে কোন অসুবিধা হবে না। তুমি আগে থেকেই জান যে, জানুয়ারী মাসের প্রথম সপ্তাহের বৃহস্পতিবার—৫ তারিখ। এখন জানুয়ারী মাসের ৫ তারিখ থেকে ফেব্রুয়ারী, মার্চ, এপ্রিল প্রভৃতি 'মাসের সংখ্যা' (যা উপরের তালিকায় দেওয়া হয়েছে) বাদ দিলে ফেব্রুয়ারী, মার্চ, এপ্রিল প্রভৃতি মাসের প্রথম বৃহস্পতিবারের তারিখ বের করা যায়। যদি কোন 'মাসের সংখ্যা' জানুয়ারী মাসের প্রথম সপ্তাহের তারিখ থেকে বড় বা সমান হয়, তাহলে জানুয়ারী মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহের তারিখ থেকে বাদ দিয়ে সেই মাসের প্রথম সপ্তাহের নির্দিষ্ট বারের তারিখ নির্ণয় করতে হয়। এক্ষেত্রে ১৯৬৭ সালের প্রতি মাসের বৃহস্পতিবারের তারিখগুলি কি কি হবে, তা নীচে দেওয়া হলো।

জানুয়ারী—৫ (=৫—০), ১২, ১৯, ২৬। ফেব্রুয়ারী—২ (=৫—৩), ৯, ১৬, ২৩।
মার্চ—২ (=৫—৩), ৯, ১৬, ২৩, ৩০। এপ্রিল—৬ (=১২—৬), ১৩, ২০, ২৭।
মে—৪ (=৫—১), ১১, ১৮, ২৫। জুন—১ (=৫—৪), ৮, ১৫, ২২, ২৯।
জুলাই—৬ (=১২—৬), ১৩, ২০, ২৭। অগাষ্ট—৩ (=৫—২), ১০, ১৭, ২৪, ৩১।
সেপ্টেম্বর—৭ (=১২—৫), ১৪, ২১ ২৮। অক্টোবর—৫ (=৫—০), ১২, ১৯, ২৬।
নভেম্বর—২ (=৫—৩), ৯, ১৬, ২৩, ৩০। ডিসেম্বর—৭ (=১২—৫), ১৪, ২১, ২৮।

অরুণকুমার রায়চৌধুরী

প্রশ্ন ও উত্তর

প্রঃ ১। টেলিভিশনে কি ভাবে ফটোর আবির্ভাব হয়?

সত্যশঙ্কর সুর

প্রঃ ২। (ক) মহাকর্ষের উৎস কোথায়?
(খ) গ্রাভিটন কি?
(গ) আলোর চেয়ে বেশী গতিবেগসম্পন্ন বস্তু আছে কি?

সুশীলকুমার নাথ

উ: ১। একটি ছবিকে খুব ভালভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে—সেটি কতকগুলি কালো ও সাদা অংশের সমন্বয় মাত্র (এখানে অবশ্য রঙীন ছবিকে ধরা হচ্ছে না)। ছবিটির বিভিন্ন অংশ যেন বিভিন্ন পর্যায়ের ঔজ্জ্বল্যে রয়েছে—কোন অংশ খুব উজ্জ্বল (সাদা), কোন অংশ একেবারেই উজ্জ্বল নয় (কালো), অন্যান্য অংশ এই দুই-এর মাঝামাঝি। স্বভাবতঃই ছবির বিভিন্ন পর্যায়ের উজ্জ্বল অংশ থেকে বিভিন্ন পরিমাণ আলো আসে। উজ্জ্বলতম অংশ থেকে আসে অধিকতম আলো আর কালো অংশ থেকে আসে সর্ব্বাপেক্ষা কম আলো। ফটোইলেকট্রিক সেল নামে এক প্রকার যন্ত্রের সাহায্যে আলোককে বিদ্যুৎ-তরঙ্গে রূপান্তরিত করা যায়। যে রকম উজ্জ্বল আলো এসে ফটো-সেলের উপর পড়বে, সেই অনুপাতে বিদ্যুতের সৃষ্টি হবে। ফলে ছবিটির উজ্জ্বল অংশ থেকে আগত আলোক কালো অংশ থেকে আগত আলোকের চেয়ে অধিকতর বিদ্যুৎ উৎপন্ন করবে। এইভাবে ছবিটির সাদা-কালোর ব্যবধানকে বিভিন্ন পরিমাণের বিদ্যুৎ-তরঙ্গে রূপান্তরিত করা হয়। বেতার-তরঙ্গের মাধ্যমে অতঃপর এই বিদ্যুৎ-তরঙ্গকে চতুর্দিকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। টেলিভিশনের গ্রাহক-যন্ত্র বেতার-তরঙ্গকে ধরে তাথেকে বিদ্যুৎ-তরঙ্গকে পৃথক করে নেয়। টেলিভিশন গ্রাহক যন্ত্রের পর্দার উপরে একটি রশ্মি এসে পড়ে। এই রশ্মির ঔজ্জ্বল্যকে নিয়ন্ত্রিত করে আগত বিদ্যুৎ-তরঙ্গ। ফলে বিদ্যুৎ-তরঙ্গের শক্তির উপর নির্ভর করে পর্দার কোন অংশ সাদা, কোন অংশ কালো হয়ে ওঠে। এভাবে পর্দার উপর আসল ছবিটি ভেসে ওঠে।

এখানে একটা কথা মনে রাখতে হবে যে, সমস্ত ছবিটা একসঙ্গে পাঠানো যায় না। ছবিটাকে কতকগুলি অতি ক্ষুদ্র অংশে ভাগ করে নিয়ে এই অংশগুলিকে একের পর এক পাঠিয়ে দেওয়া হয়। তবে সমস্ত অংশকে একটি নির্দিষ্ট

সময়ের মধ্যে পাঠাতে হবে। এই সময়টি হল ১/১০ সেকেণ্ড। আমরা কোন কিছু দেখলে তার ছাপটা মনের মধ্যে এই সময় পর্যন্ত থাকে। ফলে ১/১০ সেকেণ্ডের মধ্যে সম্পূর্ণ ছবিটা পাঠালেই সেটাকে একটা গোটা ছবি বলে মনে হবে নতুবা ছাড়া ছাড়া লাগবে।

উঃ ২। (ক) মহাকর্ষ এমন একটা ব্যাপার যে, তার উৎস কি বা তা কেমন করে হচ্ছে—এর উত্তর বিজ্ঞানীদের পক্ষে দেওয়া সম্ভব হয় নি। মহাকর্ষ সম্বন্ধে আমরা নিশ্চিতভাবে যা জানি, তা হলো—বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে সকল বস্তুই পরস্পর পরস্পরকে আকর্ষণ করছে। বস্তুর ভর ও পরস্পরের মধ্যে দূরত্ব অনুযায়ী আকর্ষণ শক্তি বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন হয়ে থাকে। আমরা আরও জানি যে, মহাকর্ষজনিত বল বায়ুহীন শূন্য অঞ্চল অথবা অত্যধিক ঘনত্বসম্পন্ন বস্তু—উভয়ের মধ্য দিয়ে কর্মক্ষম। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বস্তুর কোন্ বিশেষ গুণের উপর এই আকর্ষণ নির্ভর করে, সে বিষয়ে কিছু জানা যায় নি। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে, দুটি বিপরীত বিদ্যুৎ-ধর্মী বস্তু পরস্পর পরস্পকে আকর্ষণ করে। কিন্তু এক্ষেত্রে বিদ্যুৎই হচ্ছে এই আকর্ষণের উৎস। আমরা ইচ্ছা করলে 'আবরক' ব্যবহার করতে পারি, যার মধ্য দিয়ে বৈদ্যুতিক বল অতিক্রম করবে না। কিন্তু মহাকর্ষের ক্ষেত্রে আমরা তা পারি না। মহাকর্ষ সর্বত্রগামী—সব কিছুকেই ভেদ করে চলে। মহাকর্ষের উৎস সম্বন্ধে তাই কিছু বলা সম্ভব নয়।

(খ) উপরের আলোচনায় বলা হয়েছে যে, মহাকর্ষজনিত বল ব্রহ্মাণ্ডের সর্বত্রগামী ও সর্বত্র কর্মক্ষম। এখন বিদ্যুৎ-চুম্বক জনিত বলের ক্ষেত্রে (যেমন আলোক) আমরা জানি যে, ফোটন কণিকা এক জায়গা থেকে অপর জায়গায় ভ্রমণ করে। মহাকর্ষের ক্ষেত্রেও এই জাতীয় কোন কণিকা আছে কিনা—বিজ্ঞানীদের মাথায় এই চিন্তার উদয় হয়। তাই তাঁরা ফোটনের অনুরূপ এক জাতীয় কণিকার কল্পনা করেছেন এবং নাম দিয়েছেন—গ্রাভিটন। বিজ্ঞানীদের মতে আকর্ষণের সময়ে গ্রাভিটন কণিকা এক বস্তু থেকে অপর বস্তুতে প্রবাহিত হয়ে থাকে। এদের সম্ভাব্য ধর্ম সম্বন্ধে বলা যায়—গ্রাভিটনের কোন ভর নেই এবং এরা বিদ্যুৎ-নিরপেক্ষ। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, মহাকর্ষজনিত বল এত ক্ষীণ যে, গ্রাভিটনের অস্তিত্ব থাকলেও তা কোন দিন আবিষ্কৃত হবে কিনা সন্দেহ।

(গ) আইনষ্টাইন তাঁর আপেক্ষিকতা তত্ত্বে দেখিয়েছেন—বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কোন বস্তুর গতিবেগ আলোর গতিবেগের চেয়ে বেশী হতে পারে না।

দীপক বসু

বিবিধ

পরলোকে ডাঃ ওপেনহাইমার

প্রিন্সটন থেকে প্রচারিত রয়টারের খবরে প্রকাশ—১৮ই ফেব্রুয়ারী আমেরিকার প্রথম পারমাণবিক বোমা নির্মাণকারী ডাঃ জে. রবার্ট ওপেনহাইমার পরলোক গমন করেছেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৬২ বছর।

ডাঃ ওপেনহাইমার হারভার্ড এবং কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় এবং জার্মেনীর গটিংগেন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করেন।

১৯৪৩-৪৫ সালে তিনি লস্ আলামসে সায়েন্স লেবরেটরির ডিরেক্টর ছিলেন। এই লেবরেটরীতেই পারমাণবিক বোমা প্রথম নির্মাণ করা হয়।

১৯৪৭ সালে তিনি প্রিন্সটনে উচ্চতর বৈজ্ঞানিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পদার্থবিদ্যার ডিরেক্টর নিযুক্ত হন।

১৯৫৪ সালে মার্কিন পারমাণবিক শক্তি কমিশন তাঁকে গোপন দলিলপত্র দেখাতে অসম্মত হন। কারণ কমিউনিষ্টদের প্রতি সহানুভূতি আছে বলে তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয়। কিন্তু নয় বছর পরে পারমাণবিক কমিশন তাঁর বৈজ্ঞানিক প্রতিভার জন্যে তাঁকে ৫০,০০০ ডলারের ফের্মি পুরস্কার দান করেন।

প্রাচীনতম মানুষের নিদর্শন

নাইরোবি থেকে রয়টার কর্তৃক প্রচারিত এক সংবাদে প্রকাশ—বিশ্বের খ্যাতনামা নৃতত্ত্ববিদ ডাঃ লুই লিকী এখানে বলেন যে, তিনি দুই কোটি বছরের পুরনো একটি ফসিল আবিষ্কার করেছেন, যাকে মানুষের প্রাচীনতম পূর্বপুরুষ বলা যায়।

ডাঃ লিকী এই নতুন আবিষ্কারটির নাম দিয়েছেন 'কেনিয়াপিথেকাস আফ্রিকানাস'। এই ফসিলটি তাঁর ছয় বছর আগে আবিষ্কৃত কেনিয়াপিথেকাস উইকারি-র চেয়ে অন্ততঃ দ্বিগুণ পুরনো। তিনি বলেন, এইটিই সবচেয়ে প্রাচীন মানব-পরিবারের নিদর্শন।

ডাঃ লিকী এটি আবিষ্কার করেন ভিক্টোরিয়া লেকে রুসিঙ্গা দ্বীপে।

সাংবাদিক বৈঠকে ডাঃ লিকী বলেন যে, এই নতুন আবিষ্কারে পুরুষ, স্ত্রীলোক ও শিশু মিলে নয় জনের মোট ১১টি হাড়ের টুকরা পাওয়া গেছে। বিশেষজ্ঞেরা ঐগুলি পরীক্ষা করে এই সিদ্ধান্তে পৌঁচেছেন যে,এগুলি প্রায় দুই কোটি বছরের পুরনো ফসিল।

বায়ু প্রবাহ থেকে বিদ্যুৎ

টোকিও থেকে রয়টার কর্তৃক প্রচারিত এক সংবাদে প্রকাশ—সম্প্রতি মস্কো বেতারে বলা হয়েছে, সোভিয়েট ইউনিয়ন বায়ু-প্রবাহ থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের ব্যবস্থা করেছে।

দশ হাজার থেকে বার হাজার মিটার উঁচুতে যেখানে বায়ু-প্রবাহ স্থায়ী, সেখানে বেলুন তুলে দিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্যে বেলুনের সঙ্গে টারবাইন ঝুলিয়ে দেওয়া হবে।

এই ভাবে বছরে এক কোটি কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করে তুন্দ্রা অঞ্চলে সরবরাহ করা হবে।

এই সংখ্যার লেখকগণের নাম ও ঠিকানা

১। শ্রীরুদ্রেন্দ্রকুমার পাল
৫৪, বালিগঞ্জ প্লেস
কলিকাতা-১৯

২। শ্রীসুজিৎকুমার মহলানবিশ
৯০, পার্ক ষ্ট্রীট, কলিকাতা

৩। শ্রীজিতেন্দ্রকুমার গুহ
৪৪।৫৫, বি. টি. রোড
কলিকাতা-৫০

৪। শ্রীঅমিতোষ ভট্টাচার্য
ডিফেন্স ইলেকট্রনিক্স রিসার্চ লেবরেটরী
চন্দ্রায়ন গুট্টা লাইন্স
হায়দরাবাদ-৫

৫। শ্রীনিত্যগোপাল পোদ্দার
Dept. of Inorganic Chemistry
Indian Association for the
Cultivation of Science. Jadavpur,
Calcutta-32

৬। শ্রীরঘুনাথ দাস
গ্রাম—আউষবালী
পোঃ—মসাট
জেলা—হুগলী

৭। শ্রীসতী চক্রবর্তী
২৪।বি, মনসাতলা লেন, খিদিরপুর,
কলিকাতা-২৩

৮। শ্রীশ্যামল সেন
গ্রাম—সুবুদ্ধিপুর
পোঃ—বারুইপুর
জেলা—২৪ পরগণা

৯। অরুণকুমার রায়চৌধুরী
বসু বিজ্ঞান মন্দির
৯৩।১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড,
কলিকাতা-৯

১০। দীপক বসু
ইনষ্টিটিউট অব রেডিও ফিজিক্স
সায়েন্স কলেজ,
কলিকাতা-৯

সম্পাদক—শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস কর্তৃক ২৯৪।২।১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড হইতে প্রকাশিত এবং গুপ্তপ্রেশ
৩৭।৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা হইতে প্রকাশক কর্তৃক মুদ্রিত

বিজ্ঞানবিষয়ক বক্তৃতা

শহর কলিকাতা ও শহরতলীর স্কুল, কলেজ, পাঠাগার প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানে বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ে লোকরঞ্জক বক্তৃতা দানের জন্য বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ হইতে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছে। বক্তৃতার বিষয়বস্তুকে প্রাঞ্জল ও চিত্তাকর্ষক করিবার জন্য স্লাইড ও চলচ্চিত্র প্রদর্শনের ব্যবস্থাও আছে। বর্তমান বৎসরে এই পর্যায়ের প্রথম অনুষ্ঠানটি আয়োজিত হইয়াছিল গত ১৮ই মার্চ '৬৭ তারিখে; **স্থান—বাগবাজার বহুমুখী বালিকা বিদ্যালয়, কলিকাতা।**

যে সকল প্রতিষ্ঠান এইরূপ বক্তৃতায় আগ্রহান্বিত, তাহাদিগকে বিজ্ঞান পরিষদের কার্যালয়ের সহিত যোগাযোগ করিতে অনুরোধ করা যাইতেছে

জয়ন্ত বসু
কর্মসচিব,
বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

২৯৪।২।১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড
কলিকাতা-৯ | ফোন : ৩৫-২৯১৪

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

বিংশতি বর্ষ | এপ্রিল, ১৯৬৭ | চতুর্থ সংখ্যা

সূর্য

দীপক বসু

ভূমিকা

পৃথিবীতে উদ্ভিদ এবং প্রাণিজগতের আবির্ভাব ও ক্রমবিকাশের ক্ষেত্রে সূর্যের অবদানের কথা বর্ণনা করা বাহুল্য মাত্র। কেবল পৃথিবীতেই নয়, অন্যান্য গ্রহ-উপগ্রহে যদি কখনও কোনরূপ প্রাণের আবির্ভাব ঘটে, তবে সে ক্ষেত্রেও সূর্যের প্রভাব অনস্বীকার্য। বস্তুতঃ গ্রহ-উপগ্রহগুলির অস্তিত্বের জন্যেও সূর্যই দায়ী। তাই সূর্য এক কথায় এই বিশাল সৌরমণ্ডলের পিতৃস্বরূপ।

মেঘমুক্ত ও জ্যোৎস্নাবিহীন রাত্রিতে আকাশের দিকে তাকালে খালি চোখেই দেখতে পাওয়া যাবে, উত্তর থেকে দক্ষিণে বিস্তৃত আব্‌ছা সাদা মেঘের মত বিশাল একখণ্ড আলোকপুঞ্জ —আমাদের ছায়াপথ। প্রকৃতপক্ষে অবশ্য আকাশের গায়ে খালি চোখে ছোট-বড় যত নক্ষত্র দেখতে পাওয়া যায়, তাদের সকলেই আমাদের ছায়াপথের অন্তর্ভুক্ত। এক দিক থেকে অপর দিকে এর বিস্তৃতি ১০০,০০০ আলোক-বর্ষ এবং মধ্যস্থলে প্রায় ২০,০০০ আলোক-বর্ষ গভীর। সূর্য তার গ্রহ-উপগ্রহদের নিয়ে ছায়াপথের এক কোণে পড়ে আছে—কেন্দ্র থেকে প্রায় ৩০,০০০ আলোক-বর্ষ দূরে।

আমাদের ছায়াপথের অসংখ্য নক্ষত্র সভ্যদের অন্যতম—সূর্য একটি সামান্য নক্ষত্র মাত্র। অনেক নক্ষত্রই সূর্যের চেয়ে বড়, আবার অনেকে অপেক্ষাকৃত ছোট। তবে সূর্যের বিশেষত্ব হচ্ছে এই যে, সে আমাদের নিকটতম নক্ষত্র। ফলে এর পৃষ্ঠদেশকে আমরা খুব স্পষ্টভাবে দেখতে পাই।

সূর্যের আলোক ও উত্তাপ-তরঙ্গের সঙ্গে আমরা সকলেই পরিচিত। কিন্তু সূর্য থেকে বিভিন্ন দৈর্ঘ্যের অন্যান্য বিদ্যুচ্চৌম্বক তরঙ্গও যে বিকিরিত হয়ে থাকে, তাদের সঙ্গে অনেকেরই পরিচয় নেই। এই তরঙ্গমালার পূর্ণ বিবরণ ১নং চিত্রে দেওয়া হলো। মূলতঃ এরা সবাই এক জাতীয় তরঙ্গ। এদের পরস্পরের মধ্যে তফাৎ শুধু তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের। দুর্ভাগ্যবশতঃ এই নানা জাতীয় তরঙ্গের মধ্যে সকলে ভূপৃষ্ঠ পর্যন্ত এসে পৌঁছাতে পারে না, পথে বায়ুমণ্ডল শুষে নেয়। চিত্রে দুটি মাত্র অংশকে সাদা দেখানো হয়েছে।
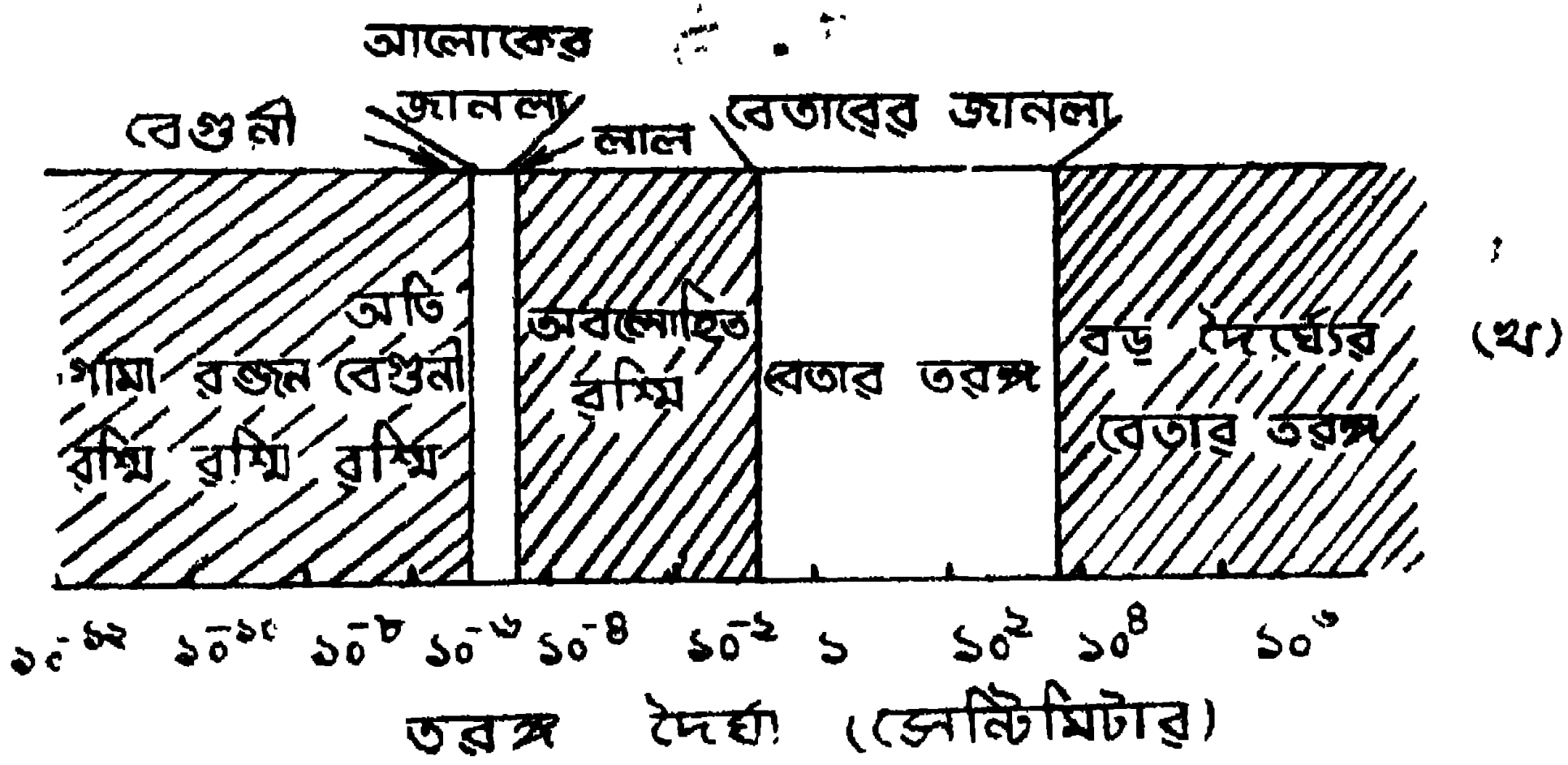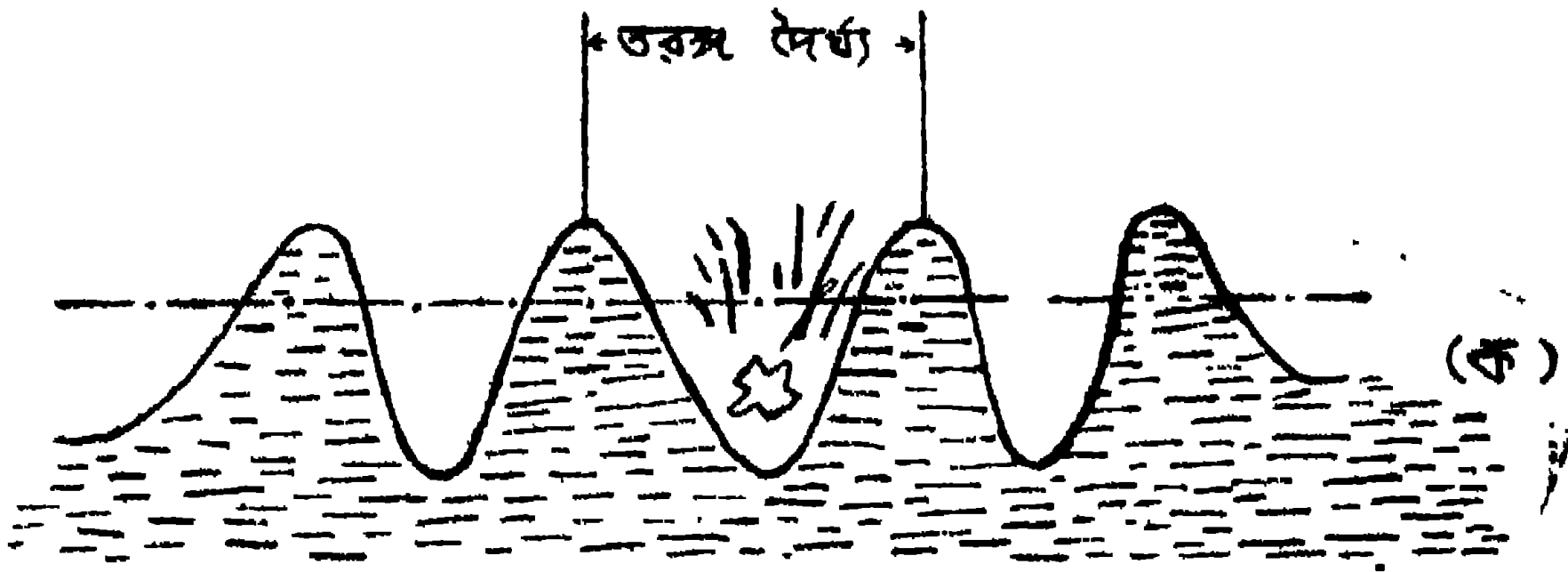
১নং চিত্র

(ক) জলে ঢিল ছুঁড়লে তরঙ্গের সৃষ্টি হয়। পাশাপাশি দুটি উচ্চতম স্থানের মধ্যবর্তী দৈর্ঘ্যকে তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য বলে।

(খ) জ্যোতিষ্ক থেকে আগত বিভিন্ন দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট বিদ্যুচ্চৌম্বক তরঙ্গমালা। এদের মধ্যে একমাত্র সাদা চিহ্নিত দৃশ্য আলোক ($৪ \times ১০^{-৫} - ৭.২ \times ১০^{-৫}$ সেঃ মিঃ) ও বেতার-তরঙ্গ (১ সেঃ মিঃ—৩০ মিঃ) ভূপৃষ্ঠ পর্যন্ত এসে পৌঁছায়। অন্যান্য সব তরঙ্গই পথে বায়ুমণ্ডল শুষে নেয়।

কেবলমাত্র এই সাদা চিহ্নিত দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট তরঙ্গই সকল বাধা অতিক্রম করে অবশেষে ভূপৃষ্ঠে এসে পৌঁছায়। সাদা অংশ দুটি যেন সেই বায়ুমণ্ডলরূপী প্রাচীরের গায়ে দুটি ‘জানালা’। একটিকে বলা যায় আলোকের জানালা—সেখান দিয়ে শুধু আলোক-তরঙ্গই প্রবেশ করতে পারে, অপরটি বেতারের জানালা—সেখান দিয়ে আসতে পারে শুধুমাত্র বেতার-তরঙ্গ। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যেতে পারে যে, রেডিও ষ্টেশন থেকে আগত যে বেতার তরঙ্গের সঙ্গে আমরা ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত, বহির্বিশ্ব থেকে আগত বেতার-তরঙ্গও

সেই একই জাতীয়। আলোক ও বেতার ছাড়া বায়ুমণ্ডলের প্রাচীর ভেদ করে অন্য কোন তরঙ্গের ভূপৃষ্ঠে প্রবেশাধিকার নেই।

প্রথম দিকে জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা শুধু আলোকের জানালার মধ্য দিয়েই সকল পর্যবেক্ষণ করেছেন। কিন্তু বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে নতুন নতুন যন্ত্রের উদ্ভাবন হয়েছে। ফলে তাঁদের সামনে খুলে গেছে আরও নতুন জানালা। শুধু তাই নয়, বিজ্ঞানীরা আজ যন্ত্রপাতি নিয়ে সূর্যকে সম্পূর্ণরূপে পর্যবেক্ষণের জন্যে বায়ুমণ্ডলের বাইরেও গিয়ে হাজির হয়েছেন। জ্যোতির্বিদদের অক্লান্ত গবেষণার ফলে বিভিন্ন পদ্ধতিতে সূর্য সম্বন্ধে যে সব তথ্য সংগৃহীত হয়েছে, আলোচ্য প্রবন্ধে তারই কিঞ্চিৎ আভাস দেওয়া হবে।

ঐতিহাসিক পর্যালোচনা

সূর্য সম্বন্ধে যুগান্তকারী আবিষ্কারগুলি কিন্তু সময়ের সঙ্গে সমানভাবে তাল রেখে চলতে পারে নি। আবিষ্কারগুলি ঘটেছে কতকগুলি বিশেষ বিশেষ সময়ে—নতুন নতুন সব গুরুত্বপূর্ণ যন্ত্রের উদ্ভাবনকে কেন্দ্র করে। দূরবীক্ষণ যন্ত্র আবিষ্কারের পর তার সাহায্যে সূর্যকে প্রথম পর্যবেক্ষণ করেন বিখ্যাত বিজ্ঞানী গ্যালিলিও ১৬১১ খৃষ্টাব্দে। দূরবীক্ষণের আবিষ্কার সাদা আলোর সাহায্যে বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণের সূত্রপাত করেছিল। এই ধারা চলেছিল প্রায় দীর্ঘ আড়াই শত বছর। এর পর ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে প্রসিদ্ধ জার্মান বিজ্ঞানী ফ্রনহফার স্পেক্ট্রোস্কোপ যন্ত্রকে সৌর গবেষণার কাজে প্রয়োগ করলেন। ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে হেইল স্পেক্ট্রোহিলিওগ্রাফ যন্ত্র আবিষ্কার করে সৌর-বিজ্ঞানকে এগিয়ে নিয়ে গেলেন অনেক দূর পর্যন্ত। এদিকে ১৯২০ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে একদল বিজ্ঞানী কাগজ-কলম নিয়ে অঙ্ক কষতে বসে গেলেন, পর্যবেক্ষণলব্ধ বিভিন্ন তথ্য ব্যাখ্যা করবার জন্যে। তাঁদের হাতিয়ার হলো জার্মান বিজ্ঞানী প্লাঙ্কের কোয়ান্টাম তত্ত্ব ও ভারতীয় বিজ্ঞানী মেঘনাদ সাহার আয়নীকরণ সংক্রান্ত সূত্রাবলী। ১৯৩০ খৃষ্টাব্দের পর থেকে অগ্রগতি উভয় দিকে বেশ দ্রুত হতে লাগলো। এর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে, ফরাসী বৈজ্ঞানিক লিও কর্তৃক করোনাগ্রাফ যন্ত্র উদ্ভাবন, সৌর বেতার-তরঙ্গের আবিষ্কার ও সে সম্বন্ধে ব্যাপক গবেষণা, ভি-২ রকেটের সাহায্যে সূর্যের অতিবেগুনী রশ্মির পর্যবেক্ষণ এবং পদার্থ-বিজ্ঞানের বিভিন্ন তত্ত্বকে সৌর গবেষণার ক্ষেত্রে প্রয়োগ।

সূর্যের বিভিন্ন স্তর

পৃথিবীর আবহাওয়া বা এখানকার পারিপার্শ্বিক চেহারার সঙ্গে কিন্তু সূর্যের অবস্থার কোনরূপ তুলনা করা চলে না। সূর্যের কোথাও তরল বা কঠিন পদার্থের চিহ্নমাত্র নেই। সবটাই ভীষণ উত্তপ্ত গ্যাসীয় পদার্থে গঠিত। কিন্তু এই প্রকাণ্ড জ্বলন্ত গ্যাসপিণ্ড একেবারে বৈশিষ্ট্যহীন নয়। সূর্যমণ্ডল প্রকৃতপক্ষে কয়েকটি স্তরে বিভক্ত (২নং চিত্র)। বিভিন্ন স্তরে নানারূপ বৈচিত্র্যপূর্ণ ঘটনা ঘটতে দেখা যায়।

কেন্দ্রীয় অঞ্চলটি হচ্ছে সূর্যের প্রাণস্বরূপ। শুধু সূর্যের কেন, সমগ্র সৌরমণ্ডলেরই সমস্ত শক্তির উৎস। এখানে উত্তাপ প্রায় ২০,০০০,০০০°। চাপ আমাদের বায়ুমণ্ডলের চাপের তুলনায় ১,০০০,০০০,০০০ গুণ বেশী। ফলে গ্যাসীয় কণাগুলি অত্যন্ত ঘন সন্নিবিষ্ট হয়ে রয়েছে। এই প্রচণ্ড উত্তাপে পরমাণু নিজেকে ধরে রাখতে পারে না—ভেঙ্গে গিয়ে আয়নে রূপান্তরিত হয়ে যায়। আয়নগুলি প্রচণ্ড বেগে ছুটাছুটি ও পরস্পরের সঙ্গে ধাক্কাধাক্কি করছে। এছাড়া রয়েছে এর চেয়েও অধিকতর গতিবেগসম্পন্ন প্রচুর সংখ্যক ইলেকট্রন। এই হলো সূর্যের কেন্দ্রীয় অঞ্চলের অবস্থা।

কেন্দ্র থেকে প্রায় ৭০,০০০ কিঃ মিঃ উপরে

গ্যাসের ঘনত্ব কিছুটা কমে গিয়ে অনেকটা স্বচ্ছ হয়ে এসেছে। কিন্তু এই অঞ্চল অত্যন্ত উজ্জ্বল এবং প্রচুর পরিমাণে আলোক ও তাপ বিকিরণ করে। প্রায় ৩০০ কিঃ মিঃ গভীর এই স্তরের নাম আলোকমণ্ডল বা ফটোস্ফীয়ার। এখানে উত্তাপ প্রায় ৬০০০°—কেন্দ্রের তুলনায় অনেকটা কম। পৃথিবীতে জীবনধারণের জন্যে প্রয়োজনীয় আলোক ও উত্তাপ আলোকমণ্ডলই সরবরাহ করে থাকে। পৃথিবী থেকে আমরা থালার মত একেই দেখি।

২নং চিত্র
সূর্যের বিভিন্ন স্তর।

শুভ্র আলোতে খালি চোখে তাকিয়ে সূর্যকে যা দেখায়, আসলে কিন্তু সূর্য তার চেয়েও অনেক বড়। আলোকমণ্ডলের বাইরের দিকে প্রায় ১০০০ কিঃ মিঃ পর্যন্ত অঞ্চলের গ্যাসরাশি অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা। ফলে এখানে বেশীর ভাগ পরমাণুই আয়নিত হয়ে যায় নি। এরা আলোক-তরঙ্গ থেকে কিছুটা শক্তি নিজের জন্যে শোষণ করে নেয়। ফলে আলোকমণ্ডল থেকে আগত আলোকের বর্ণালীতে কিছু সংখ্যক শোষণ-রেখা দেখতে পাওয়া যায়। ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে ফ্রনহফার এই সব রেখাগুলি নিয়ে বিশদভাবে গবেষণা করে এদের রহস্য উদ্ঘাটন করেছিলেন বলে এদের নাম দেওয়া হয়েছে ফ্রনহফার রেখা। সূর্যের এই অঞ্চলের নাম বিশোষণী মণ্ডল বা রিভার্সিং লেয়ার।

বিশোষণী মণ্ডল আস্তে আস্তে গিয়ে মিশেছে এর পরের স্তরে—যার নাম বর্ণমণ্ডল বা ক্রমোস্ফিয়ার। সাধারণ অবস্থায় আলোক-মণ্ডলের অত্যুজ্জ্বল আলোকের জন্যে বর্ণমণ্ডলকে খালি চোখে দেখা যায় না। তবে পূর্ণ সূর্য-

গ্রহণের সময়ে চাঁদ যখন আলোকমণ্ডলকে ঢেকে ফেলে, তখন বর্ণমণ্ডলকে সূর্যের চারদিকে একটা লাল চাকার মত দেখায়। এই জন্মেই এর নাম বর্ণমণ্ডল। বর্ণমণ্ডলের প্রধান উপাদান হাইড্রোজেন গ্যাসই হচ্ছে এর রঙের জন্মে দায়ী। হাইড্রোজেন ছাড়া এই অঞ্চলে ক্যালসিয়াম ও ও হিলিয়ামও আছে। বর্ণমণ্ডলের গভীরতা প্রায় ২০,০০০ কিঃ মিঃ এবং উষ্ণতা প্রায় ১০,০০০°।
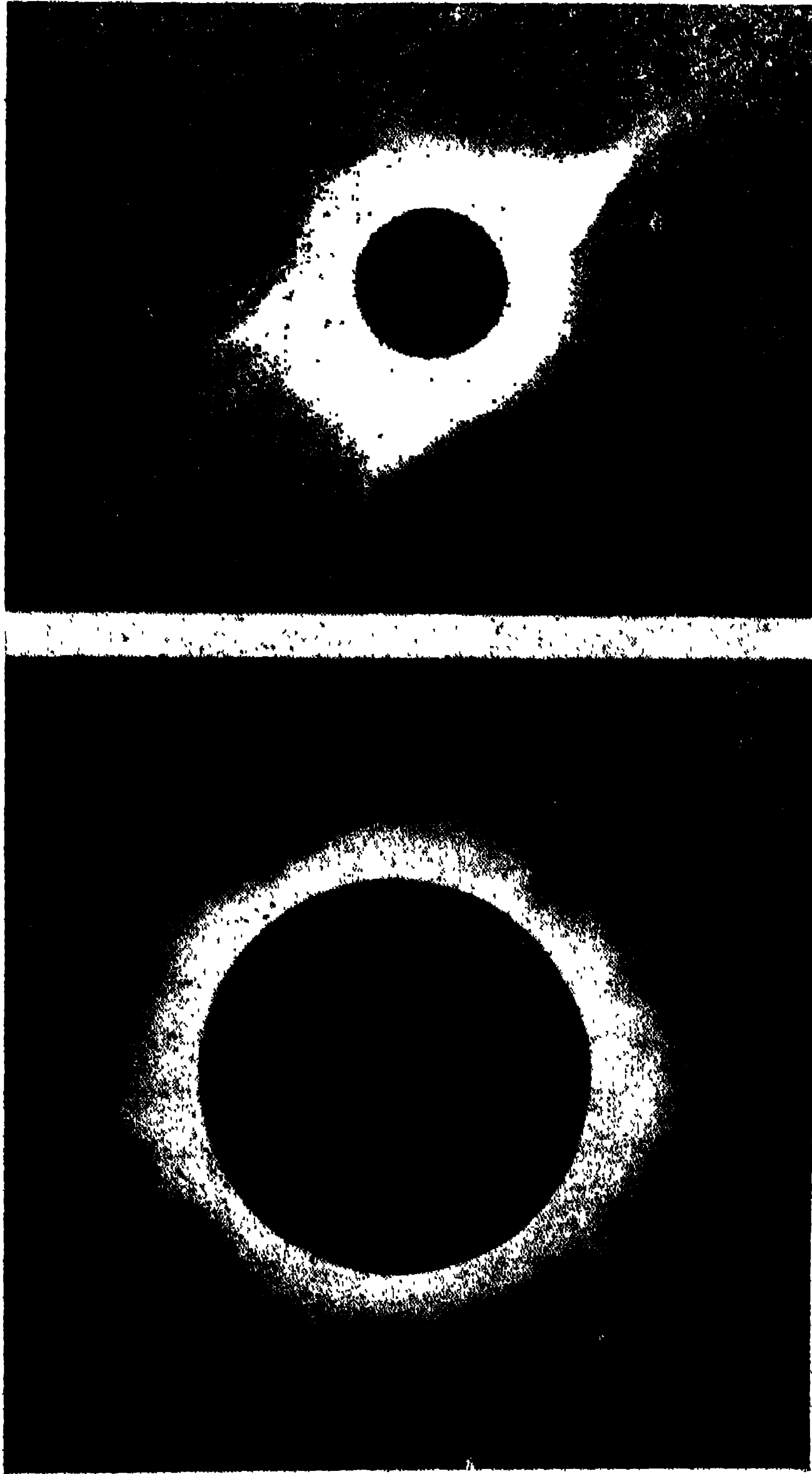
৩নং চিত্র

সূর্যের ছটামণ্ডল। উপরে—সৌরচক্রের চরম অবস্থা (১৯৫২ খৃষ্টাব্দের ২৫শে ফেব্রুয়ারী)। নীচে—সৌরচক্রের চরম অবস্থা (১৯২৭ খৃষ্টাব্দের ২৯শে জুন)

বর্ণমণ্ডলের পরেই রয়েছে সর্বশেষ স্তর—বিশাল ছটামণ্ডল বা করোনা। ছটামণ্ডলের বিকিরিত আলোক অত্যন্ত ক্ষীণ। তাই বর্ণমণ্ডলের মত একেও পূর্ণ সূর্যগ্রহণের সময় ছাড়া খালি চোখে দেখা সম্ভব নয়। গ্রহণের সময় কিন্তু এক অপূর্ব দৃশ্য দেখা যায়। মাঝখানে চাঁদে ঢাকা কালো আলোকমণ্ডল, তারপর রক্তবর্ণ বর্ণমণ্ডল এবং সবশেষে ছটামণ্ডল। ছটামণ্ডলের 'ছটাগুলি' ফুলের পাপড়ির মত চতুর্দিকে লক্ষ লক্ষ মাইল পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছে (৩নং চিত্র)। বস্তুতঃ ছটামণ্ডলের শেষ কোথায় বলা মুস্কিল। সর্বাধুনিক মতবাদ অনুযায়ী এটা পৃথিবী পর্যন্ত বিস্তৃত; অর্থাৎ আমরা প্রকৃতপক্ষে সূর্যের মধ্যেই ডুবে আছি। ছটামণ্ডলের উত্তাপ অত্যধিক—কোন কোন স্থানে প্রায় ১,০০০,০০০°। ফলে এই উত্তাপে পরমাণু এখানেও আয়নে পরিণত হয়। কোন কোন পরমাণু থেকে এমন কি ১০।১২টি পর্যন্ত ইলেকট্রন খসে যায়—তারও নিদর্শন বিজ্ঞানীরা পেয়েছেন। ছটামণ্ডল সম্বন্ধে আর একটা খুব মজার ব্যাপার হচ্ছে এই যে, এর আকার সব সময়ে এক রকম থাকে না। সৌরচক্রের (পরে ব্যাখ্যা করা হয়েছে) সঙ্গে সঙ্গে তা পরিবর্তিত হয়।

পূর্ণ সূর্যগ্রহণের স্থায়িত্ব মাত্র কয়েক সেকেণ্ড। পূর্ণগ্রাস পৃথিবীর সব জায়গা থেকে দেখা যায় না। কিন্তু এই কয়েকটি মুহূর্তকে কাজে লাগাবার জন্যে বিজ্ঞানীরা অনেক বিপদের ঝুঁকি মাথায় নিয়ে কয়েক বছর ধরে আয়োজন করে পৃথিবীর যে কোন দুর্গমতম স্থানে পর্যন্ত হাজির হয়ে থাকেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ এত পরিশ্রমও অনেক সময়ে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। হয়তো আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকলো বা দায়িত্বসম্পন্ন লোকদের কেউ হয়তো অসুস্থ হয়ে পড়লো বা আসল প্রয়োজনের সময়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ যন্ত্র কাজ করলো না। অথবা এমনও হতে দেখা গেছে—সব আয়োজন ঠিকমত হওয়া সত্ত্বেও দূরবীক্ষণের ভারপ্রাপ্ত কর্মী অত্যধিক উত্তেজনাবশতঃ সময়মত দূরবীক্ষণের ঢাকনা খুলতে ভুলে গেলেন! পরের সুযোগ আসতে আবার কয়েক বছর। আজকাল অবশ্য স্পেক্ট্রোহিলিওগ্রাফ ইত্যাদি যন্ত্রের উদ্ভাবনের ফলে বর্ণমণ্ডল ও ছটামণ্ডল সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণ সব সময়েই করা চলে—গ্রহণের জন্যে অপেক্ষা করবার কোন দরকার হয় না। তবে চোখে দেখতে হলে পূর্ণ গ্রহণই সুবিধাজনক।

সূর্যপৃষ্ঠের বিচিত্র ঘটনাবলী

যদিও খালি চোখে তাকালে সূর্যকে একটি সাদা থালা ছাড়া আর কিছুই মনে হয় না, কিন্তু আগেই বলা হয়েছে যে, এই অতিকায় জ্বলন্ত বাষ্পরাশি বৈচিত্র্যহীন নয়। প্রকৃতপক্ষে কোন পর্যবেক্ষক কিছুক্ষণ ধরে দূরবীনের মধ্য দিয়ে সূর্যের দিকে তাকিয়ে থাকলে সেখানকার নানারূপ বিচিত্র ঘটনাবলী দেখে বিস্ময়ে অভিভূত হবেন। তারই কিঞ্চিৎ বিবরণ নীচে দেওয়া হলো।

সূর্যপৃষ্ঠ—খালি চোখে তাকালে সূর্যপৃষ্ঠকে যেরূপ মসৃণ ও শান্ত দেখায়, আসলে মোটেই তা নয়। শক্তিশালী দূরবীনের ভিতর দিয়ে তাকালে দেখা যাবে, আলোকমণ্ডলের বাষ্পরাশি অত্যন্ত অশান্ত—যেন টগ্‌বগ করে ফুটছে। গোলাকৃতি শস্যদানার মত অসংখ্য বুদ্বুদ অভ্যন্তর থেকে পৃষ্ঠদেশে ভেসে উঠছে আর কিছুক্ষণ পরে আবার মিলিয়ে যাচ্ছে (৪নং চিত্র)। এদের প্রত্যেকের ব্যাস প্রায় ১৫০০ কিঃ মিঃ, আয়ু কয়েক মিনিট মাত্র এবং এরা পারিপার্শ্বিক অঞ্চল থেকে শতকরা প্রায় ১০ ভাগ অধিকতর উজ্জ্বল। আলোকমণ্ডলের নীচে বিক্ষুব্ধ অঞ্চলে উদ্ভূত পরিচলন প্রক্রিয়ার ফলে এই সব বুদ্বুদের সৃষ্টি হয় বলে বিজ্ঞানীদের বিশ্বাস।

সৌরকলঙ্ক—সূর্যের পৃষ্ঠদেশে অনুষ্ঠিত নানারূপ বিচিত্র ঘটনাবলীর মধ্যে সৌরকলঙ্কের আবির্ভাব সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। দূরবীনের মধ্য দিয়ে সৌরকলঙ্ককে দেখলে অঞ্চলে ভাগ করা যায়—ভিতরের গভীর কালো অংশটি হচ্ছে প্রচ্ছায়া এবং তাকে ঘিরে রয়েছে অপেক্ষাকৃত উজ্জ্বলতর উপচ্ছায়া। সমগ্র কলঙ্কটির মধ্যে প্রচ্ছায়া মাত্র একপঞ্চমাংশ পরিমিত
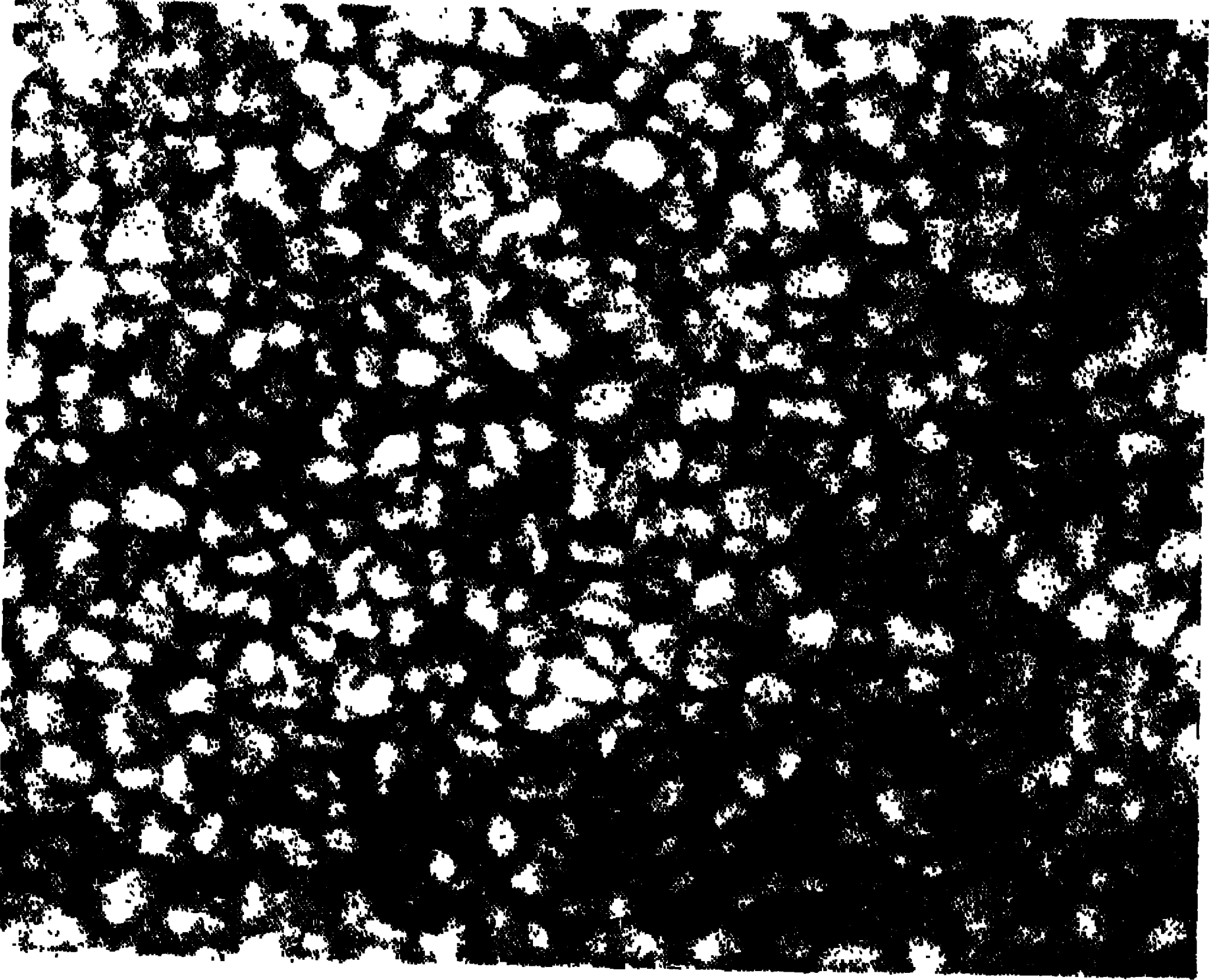
৪নং চিত্র

সূর্যপৃষ্ঠের বুদ্বুদ। দূরবীনের মধ্য দিয়ে আলোকমণ্ডলের দিকে তাকালে এই রকম দেখাবে।

সাদা আলোকমণ্ডলের গায়ে কতকগুলি কালো কালো দাগের মত দেখায় (৫নং চিত্র)। প্রকৃত পক্ষে এরা হচ্ছে সৌরদেহের উপর বিরাট বিরাট গহ্বর। এদের উত্তাপ সন্নিহিত আলোকমণ্ডলের উত্তাপের তুলনায় কিছুটা কম এবং এরা অত্যধিক চৌম্বক শক্তিসম্পন্ন হয়ে থাকে। সৌরকলঙ্কের আকৃতি নানারকম হতে পারে। খুব ছোট থেকে সুরু করে এদের এত বড়ও হতে দেখা গেছে যে, একাধিক পৃথিবীর তার মধ্য দিয়ে ঢুকে যাওয়া সম্ভব। প্রত্যেকটি সৌরকলঙ্ককেই দুটি স্থান অধিকার করে, বাকি সবটাই উপচ্ছায়া।

পর্যবেক্ষণের ফলে দেখা গেছে—এক একটি কলঙ্কের আয়ুষ্কাল কয়েক দিন থেকে কয়েক মাস পর্যন্ত হতে পারে। সৌরপৃষ্ঠের পূর্বপ্রান্তে এরা প্রথম আবির্ভূত হয়, তারপর ধীরে ধীরে পশ্চিমের দিকে অগ্রসর হতে থাকে। এই ভাবে মধ্য রেখা বা মেরিডিয়ান অতিক্রম করে পশ্চিম প্রান্তে গিয়ে এক সময়ে মিলিয়ে যায়। কিছুদিন পরে এই কলঙ্ককে আবার পূর্বপ্রান্তে আবির্ভূত হতে দেখা যায় এবং সে এই ভাবে কয়েক বার

সূর্যকে পরিক্রমা করে। সৌরকলঙ্কের এই আপাত পরিভ্রমণ থেকে বিজ্ঞানীরা বুঝেছেন যে, পৃথিবীর মতই সূর্যও তার মেরুদণ্ডের উপর ঘুরছে। এই ঘূর্ণনের বেগ মোটামুটি ভাবে ২৭ দিনে একবার। সৌরকলঙ্কের গতিবিধি বহুদিন

৫নং চিত্র
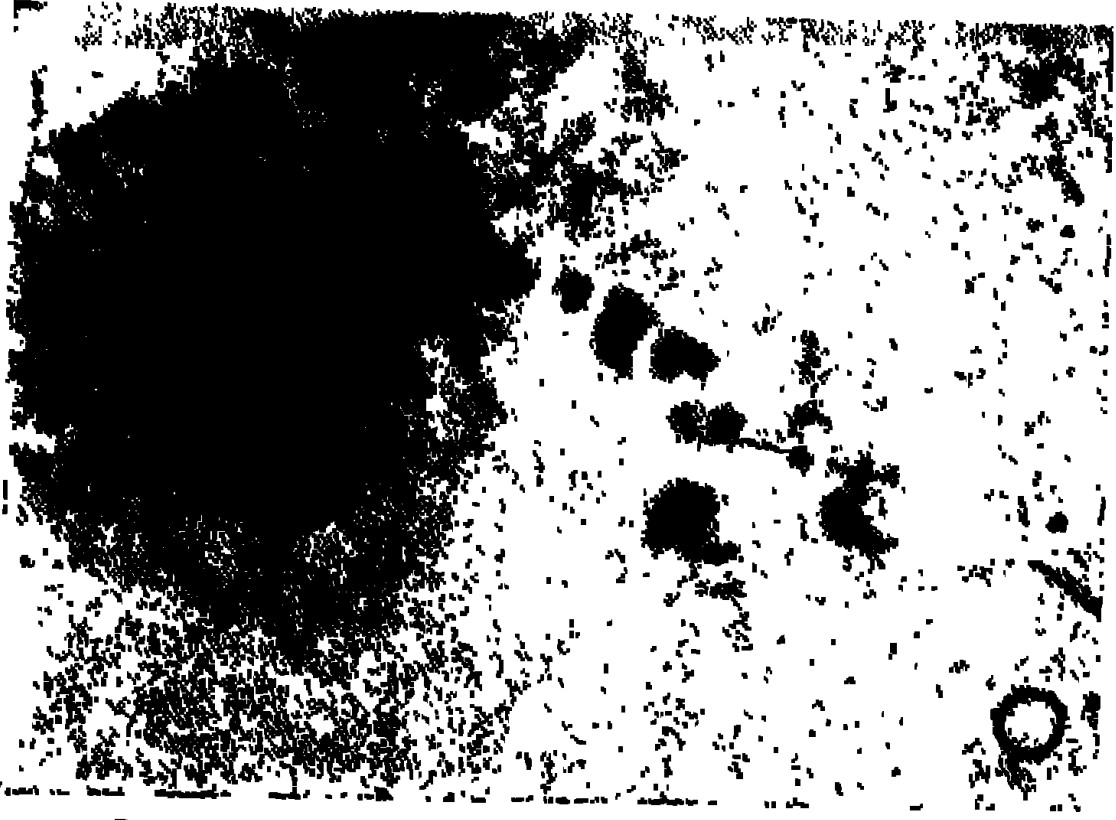
সৌরকলঙ্ক। ভিতরের দিকে কালো প্রচ্ছায়া। বাইরের দিকে অপেক্ষাকৃত উজ্জ্বলতর উপচ্ছায়া।

থেকে পর্যবেক্ষণ করে আরও দেখা গেছে যে, এরা প্রথম আবির্ভূত হয় ৪৫° অক্ষরেখার (উত্তর ও দক্ষিণে) কাছাকাছি স্থানে। তারপর ক্রমশঃ বিষুব অঞ্চলের দিকে অগ্রসর হতে থাকে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ভূপৃষ্ঠের মতই সৌর-পৃষ্ঠকেও সুবিধার জন্যে বিজ্ঞানীরা অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমাংশে ভাগ করে নিয়েছেন।

সৌরকলঙ্কের পরিমাপ করা হয় তার সংখ্যা বা আয়তনের দ্বারা। বিগত কয়েক শতাব্দী থেকে প্রতিদিনকার সৌরকলঙ্কের সংখ্যা ও আয়তন নিয়মিতভাবে লিপিবদ্ধ হয়ে আসছে। ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে বিজ্ঞানী শ্বাবে সৌরকলঙ্কের সম্বন্ধে এক তাৎপর্যপূর্ণ আবিষ্কার করেন। তিনি দেখান যে, প্রায় ১১ বছর পর্যায়ক্রমে সৌরকলঙ্কের পরিমাপ বাড়ে বা কমে। একেই বলে সৌরচক্র। সৌরচক্র অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। কারণ সূর্যের সকল প্রকার ক্রিয়াকলাপ নির্ধারিত হয় সৌরকলঙ্কের দ্বারা। সৌরকলঙ্ক যখন বাড়ে, তখন সূর্য খুব চঞ্চল হয়ে ওঠে অর্থাৎ অত্যন্ত বিক্ষুব্ধভাব ধারণ করে; সকল প্রকার বিকিরণের মাত্রা অত্যধিক বৃদ্ধি পায়। কলঙ্ক কমে আসলে একেবারে বিপরীত অবস্থা—সূর্য যেন একেবারে নিস্তেজ হয়ে পড়ে। তাই সৌরচক্রের চরম ও অবম অবস্থা অনুযায়ী বলা যেতে পারে, সূর্য যথাক্রমে সক্রিয় ও নিষ্ক্রিয় হয়। পৃথিবীর উপর তার প্রভাবও সেই অনুযায়ী বর্ধিত বা হ্রাসপ্রাপ্ত হয়ে থাকে। সৌরকলঙ্ক-বিশেষ করে কেন ১১ বছর পরপর বাড়ে ও কমে—সে সম্বন্ধে বিজ্ঞানীদের ধারণা এখনও স্পষ্ট নয়।

সৌরবিস্ফোরণ—সূর্যের সক্রিয়তা বা কর্ম-ক্ষমতার সর্বাপেক্ষা চমকপ্রদ উদাহরণ হচ্ছে সৌরবিস্ফোরণ। সৌরকলঙ্কের সন্নিহিত এক বিরাট অঞ্চল হঠাৎ অস্বাভাবিকরূপে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে—যেন সেখানে একটা প্রচণ্ড বিস্ফোরণ সংঘটিত হয়েছে (৬নং চিত্র)। সূর্যপৃষ্ঠের উপরে এদের আয়তন সাধারণতঃ কয়েক শত কোটি বর্গ কিঃ মিঃ পর্যন্ত এবং স্থায়িত্ব কয়েক মিনিট থেকে কয়েক ঘণ্টা পর্যন্ত হতে পারে। সৌরবিস্ফোরণ যদিও সৌরকলঙ্কের সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত, তথাপি তা ঠিক কখন ঘটবে, আগে থেকে বলা সম্ভব নয়। কোন একটি সৌরকলঙ্ক হয়তো পর পর অনেকগুলি বিস্ফোরণ ঘটাতে পারে, আবার এরকমও দেখা গেছে—সম আয়তনের অপর একটি কলঙ্কের ক্ষেত্রে একটিও বিস্ফোরণ ঘটলো না। অভিজ্ঞ পর্যবেক্ষক কলঙ্ক দেখলেই তার প্রকৃতি বুঝতে পারেন এবং তার উপর নজর রাখেন। বর্ণমণ্ডল অঞ্চলেই সৌরবিস্ফোরণ সংঘটিত হয়, যদিও এদের সঠিক উচ্চতা সম্বন্ধে বিজ্ঞানীরা এখনও নিশ্চিত নন।

সৌরপৃষ্ঠে এদের আয়তন, স্থায়িত্ব ও ঔজ্জ্বল্যের উপর নির্ভর করে সৌরবিস্ফোরণকে কতক-গুলি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে। শ্রেণীগুলি ১

(ক্ষুদ্রতম), ১+, ২, ২+, ৩ ও ৩+ (বৃহত্তম) —এই কয়টি সংখ্যার দ্বারা সূচিত হয়। এই শ্রেণী-বিভাগ অবশ্য খুবই স্থূল এবং তা অনেকটাই নির্ভর করে পর্যবেক্ষকের ব্যক্তিগত মতামতের উপর। তাহলেও এরূপ ব্যবস্থাই আজও চলে দৈর্ঘ্যের অত্যন্ত শক্তিশালী বিদ্যুচ্চৌম্বক তরঙ্গ বিকিরিত ও বিভিন্ন গতিবেগসম্পন্ন বিদ্যুৎ-কণিকা নিক্ষিপ্ত হতে থাকে। পৃথিবীর উপর এদের নানারূপ প্রভাব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সেকথা পরে আলোচনা করা হবে।
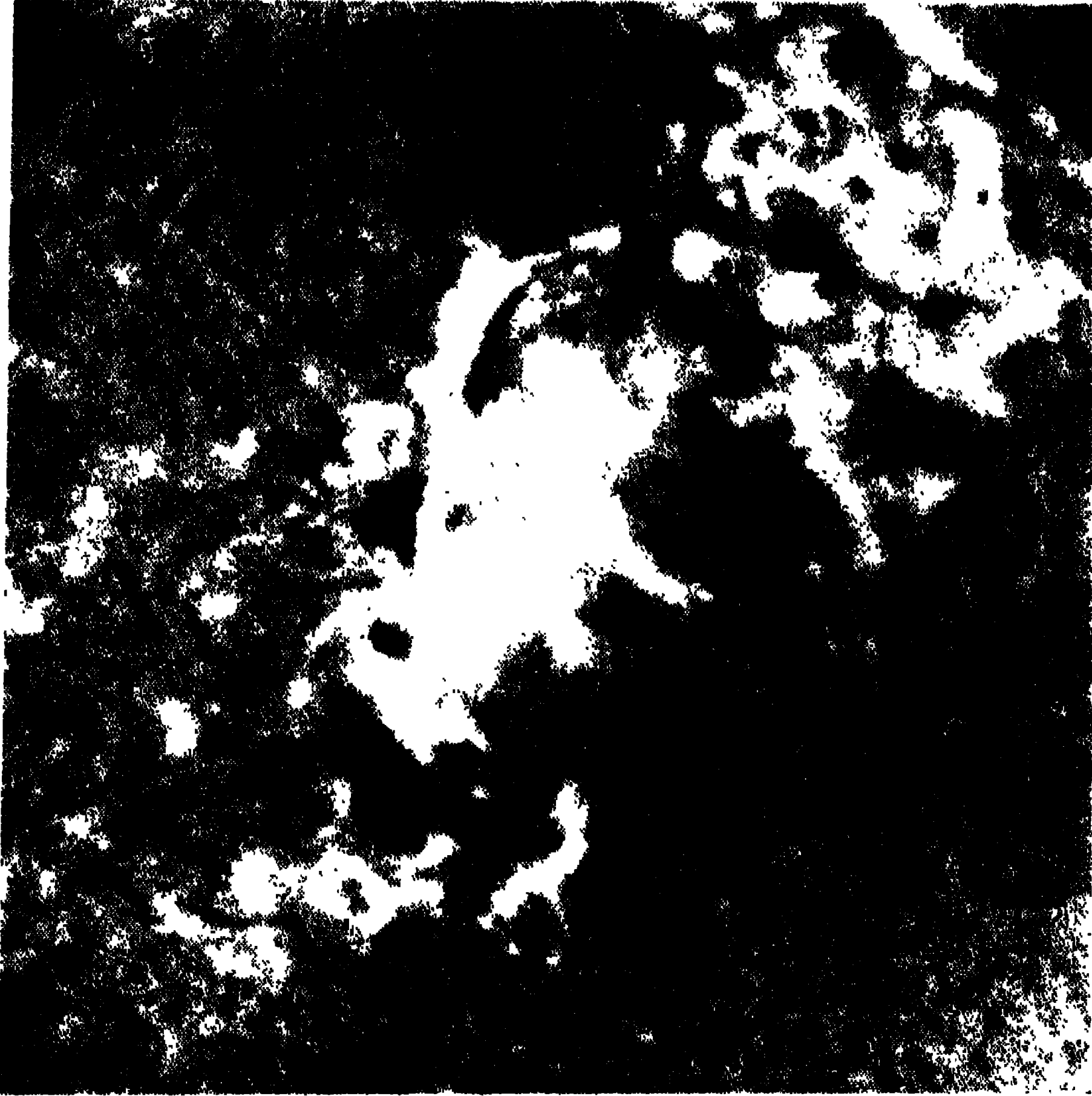
৩নং চিত্র

সৌরবিস্ফোরণ (শ্রেণী—৩)। ১৯৫৬ খৃষ্টাব্দের ১ই নভেম্বরের ঘটনা

আসছে। সারা পৃথিবীর উপর কয়েক শত মান-মন্দির থেকে সূর্যের উপর প্রায় ২৪ ঘণ্টা কড়া নজর রাখা হয়েছে। কখন এবং কোন্ অঞ্চলে বিস্ফোরণ ঘটলো, কতক্ষণ তা চললো, কোন শ্রেণীর বিস্ফোরণ—এই সব তথ্য সংগৃহীত ও বিজ্ঞানীদের কাছে সরবরাহ করা হচ্ছে।

সৌরবিস্ফোরণের আর একটা বিশেষত্ব হচ্ছে —এর সঙ্গে সঙ্গে সেই অঞ্চল থেকে নানা তরঙ্গ-

সৌরশিখা—সূর্যপৃষ্ঠের অপর এক বিস্ময়কর ঘটনা হলো সৌরশিখা। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড এবং বিচিত্র আকৃতির লেলিহান অগ্নিশিখা হঠাৎ সূর্যের পৃষ্ঠদেশের উপর বহুদূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়তে দেখা যায় (৭নং চিত্র)। সাধারণতঃ সৌর-কলঙ্ক ও সৌরবিস্ফোরণের সন্নিহিত অঞ্চলেই এদের দেখতে পাওয়া যায়। এরা লম্বায় ২০,০০০ থেকে ২০০,০০০ কিঃ মিঃ এবং উচ্চতায় ২০,০০০

থেকে ৫০,০০০ কিঃ মিঃ পর্যন্ত হয়ে থাকে। সূর্যের অভ্যন্তর থেকে জলন্ত গ্যাসরাশি প্রচণ্ড বেগে উর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত হয়। এই সব বস্তুর অধিকাংশই আবার মোটামুটি একই পথে সূর্যপৃষ্ঠে নেমে আসে, কিছুটা অংশ মহাশূন্যে মিলিয়ে যায়।

৭নং চিত্র
সৌরশিখা। অগ্নিশিখার মত এরা সূর্যপৃষ্ঠ থেকে সোজা উপরের দিকে উঠে যায়

এসব ছাড়াও আরও ছোট ছোট নানা চমকপ্রদ ক্ষণস্থায়ী ঘটনা সূর্যপৃষ্ঠে ঘটতে দেখা যায়। তাদের বিবরণ এখানে দেওয়া সম্ভব নয়।

সূর্যের বেতার-তরঙ্গ

সূর্য থেকে যে বেতার-তরঙ্গ আসতে পারে, সে কথা অনেক আগেই স্যার অলিভার লজ প্রমুখ মনীষীরা বলে গেছেন। উপযুক্ত যন্ত্রপাতির অভাবে তাঁরা পরীক্ষার দ্বারা দেখাতে পারেন নি। মহাশূন্য থেকে আগত বেতার-তরঙ্গ প্রথম ধরতে সক্ষম হন কার্ল ইয়ান্স্কি ১৯৩২ খৃষ্টাব্দে। এই আবিষ্কারকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে 'বেতার-জ্যোতির্বিদ্যা' নামে বিজ্ঞানের আধুনিক শাখা। সৌর বেতার-তরঙ্গের সন্ধান প্রথম পাওয়া যায় এক দৈব ঘটনার মাধ্যমে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে ১৯৪২ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে ইংল্যাণ্ডের উপকূলভাগে কার্যরত বৃটিশ রেডার যন্ত্রে এক অদ্ভুত ধরণের বেতার-সঙ্কেত ধরা পড়ে। বিশেষজ্ঞেরা প্রথমে একে শত্রুপক্ষের নতুন কোন ধাপ্পা বলেই ধরে নিয়েছিলেন। কিন্তু পরে স্যার জে এস. হে অনুসন্ধান করে বললেন যে, এই তরঙ্গের উৎস হলো সূর্য। বস্তুতঃ সূর্যের উপর সেই সময়ে বিরাট এক সৌরকলঙ্ক দেখা গিয়েছিল। যুদ্ধকালীন গোপনতার জন্যে অবশ্য এই খবর তখনকার মত চেপে রাখা হয়। কিন্তু যুদ্ধের পর যখন খবরটি প্রকাশিত হয়ে পড়ে, তখন হে-র এই আবিষ্কারের ফলে সারা পৃথিবীতে সাড়া পড়ে যায় এবং বিভিন্ন স্থানে গবেষণাগার গড়ে ওঠে।

গত পচিশ বছরের পর্যবেক্ষণের ফলে সৌর বেতার-তরঙ্গের প্রধানতঃ দুটি রূপের পরিচয় পাওয়া গেছে। এদের একটি সূর্যের শান্ত অবস্থা ও অপরটি বিক্ষুব্ধ অবস্থা সূচিত করে। 'শান্ত সূর্য' কথাটির অবশ্য কোন তাৎপর্য নেই। কারণ উপরের আলোচনা থেকে স্পষ্টই বোঝা যাবে যে, সূর্য কখনও‌ই শান্ত নয়। তার সারা দেহে সর্বদাই চলেছে প্রচণ্ড আলোড়ন। তাহলে আমরা সূর্যকে কখন শান্ত বলবো? সূর্যপৃষ্ঠের উপর যখন সৌরকলঙ্ক, সৌরবিস্ফোরণ বা এই জাতীয় কোন 'সক্রিয় অঞ্চল' না থাকে—সেই অবস্থাকে সূর্যের 'শান্ত' অবস্থা বলা হয়। তবে তখনও কিন্তু দেখা যায়, সূর্য থেকে বেতার-তরঙ্গ আসছে যদিও এই তরঙ্গ খুব স্থির, ক্ষণে ক্ষণে এর তীব্রতা পরিবর্তিত হয় না। অপর পক্ষে, কোন 'সক্রিয় অঞ্চল' সূর্য-পৃষ্ঠের উপর দেখা গেলেই আগত বেতার-তরঙ্গের শক্তি অতি মাত্রায় বেড়ে যায়। বিস্ফোরণ ঘটবার কয়েক মিনিটের মধ্যেই এই বৃদ্ধি কয়েক হাজার গুণ হতে পারে। তারপর অবশ্য আস্তে আস্তে আবার শান্ত অবস্থার মানে ফিরে আসে। সৌরকলঙ্ক ও বিস্ফোরণই যে সূর্যের বিক্ষুব্ধ অবস্থায় এই জাতীয় বেতার উচ্ছ্বাসের জন্যে দায়ী—সে বিষয়ে বিজ্ঞানীরা আজ একমত।

যদি আমাদের চোখ হঠাৎ কখনও আলোকের পরিবর্তে বেতার-তরঙ্গের প্রতি সচেতন হয়ে ওঠে, তাহলে সেই বেতারের চোখ দিয়ে সূর্যের দিকে তাকিয়ে আমরা কি দেখবো? চিরপরিচিত সূর্যের বদলে যাকে দেখবো, সে কিন্তু এর চেয়ে অনেক বড়। কতটা বড় তা নির্ভর করছে, কত মিটার তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যে দেখা হচ্ছে, তার উপর। শুধু তাই নয়, বিশাল সূর্যপৃষ্ঠের ঔজ্জ্বল্যও সর্বত্র সমান নয়। এক মিটার তরঙ্গের সূর্যের ঔজ্জ্বল্য অবশ্য সব জায়গায় প্রায় সমানই দেখা যাবে। কিন্তু তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য এর চেয়ে কম হলে কেন্দ্রের ঔজ্জ্বল্য অপেক্ষাকৃত কম এবং পরিধির দিকে ক্রমশঃ বেড়ে গিয়ে পরিধিতে একটি সুন্দর অত্যুজ্জ্বল বলয়ের সৃষ্টি করে। এক মিটারের বেশী দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট তরঙ্গের ক্ষেত্রে এই ঘটনাটা বিপরীত; অর্থাৎ কেন্দ্রের ঔজ্জ্বল্য সবচেয়ে বেশী পরিধির দিকে ক্রমশঃ কম হয়ে আসে। এদিকে আবার এই সবের মধ্যে দেখা যাবে, হঠাৎ কোন কোন জায়গায় ঝল্‌সে উঠছে বেতার-তরঙ্গের উচ্ছ্বাস—চোখ ধেঁধে যাবে! এই হচ্ছে বেতারের চোখে সূর্য বা বেতার-সূর্যের রূপ।

সূর্যের অন্যান্য রশ্মি ও পৃথিবীর উপর তাদের প্রভাব

আলোক এবং বেতারের জানালার মধ্য দিয়ে পর্যবেক্ষণ করে যে সব তথ্য জানা গেছে, এতক্ষণ তা আলোচনা করা হলো। ১নং চিত্রে যে বিশাল বিদ্যুচ্চৌম্বক তরঙ্গমালা দেখানো হয়েছে, তাদের অস্তিত্বের পরোক্ষ প্রমাণ বিজ্ঞানীরা অনেক আগেই পেয়েছিলেন। কিন্তু বায়ুমণ্ডলের মধ্য দিয়ে এই সব তরঙ্গের প্রবেশ নিষিদ্ধ বলে ভূপৃষ্ঠে বসে এদের পর্যবেক্ষণ সম্ভব হয় নি। অথচ এদের বাদ দিলে সূর্য সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান অসম্পূর্ণ থেকে যাবে, সে কথা বিজ্ঞানীরা বুঝেছিলেন। তাই তাঁরা নানাভাবে চেষ্টা করতে লাগলেন বায়ুমণ্ডলের বাইরে থেকে এদের ধরবার জন্যে। প্রথম দিকে সুউচ্চ পর্বতের উপর উঠে পর্যবেক্ষণ চালালেন। কিন্তু তাতেও বায়ুমণ্ডলের বাধা দূর হলো না। তারপর বেলুনে করে যন্ত্রপাতি পাঠাবার চেষ্টা করলেন। তাতে অবশ্য কিছুটা সুবিধা হলো। তবে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে জার্মানদের অবদান রকেটের আগমন বিজ্ঞানীদের অনেকটা সাহায্য করলো। ১৯৪৬ খৃষ্টাব্দে ভি-২ রকেট সূর্যের বর্ণালী পর্যবেক্ষণের কাজে লাগানো হলো। কিন্তু মুস্কিল দূর হলো না—কারণ রকেটের ঊর্ধ্বাকাশে স্থায়িত্ব খুব কম সময়ের জন্যে। ১৯৫৭ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা

অক্টোবর কৃত্রিম উপগ্রহ ক্ষেপণ বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যে যুগান্তর আনলো, তার ধাক্কা জ্যোতির্বিজ্ঞানকেও প্রচণ্ডভাবে নাড়া দিয়েছে। কৃত্রিম উপগ্রহ প্রকৃতপক্ষে জ্যোতির্বিজ্ঞানীকে বায়ুমণ্ডলের বাইরে নিয়ে এসেছে। এরা যে সব যন্ত্রপাতি বহন করে উপরে নিয়ে যায়, সেগুলি বায়ুমণ্ডলের বাইরে অনেক দিন পর্যন্ত থাকতে পারে। বহিরাকাশ সম্বন্ধে সংগৃহীত তথ্য তারা বেতারের মারফৎ ভূপৃষ্ঠে বিজ্ঞানীদের কাছে পাঠিয়ে দেয়।

এসব তথ্য বিশ্লেষণ করে জানা গেছে যে, সূর্যের শান্ত অবস্থাতেও আলোক ও বেতার-তরঙ্গের মত রঞ্জেন ও অতিবেগুনী রশ্মি বিকিরিত হয়ে থাকে ও পৃথিবীতে আসে (৮নং চিত্র)। এরা উচ্চ বায়ুমণ্ডলের পরমাণু-সমূহ থেকে ইলেকট্রনের বিচ্যুতি ঘটিয়ে তাদের আয়নে রূপান্তরিত করতে সক্ষম হয়। ভূপৃষ্ঠের উপর মোটামুটি ৫০ কিঃ মিঃ পর্যন্ত বিস্তীর্ণ
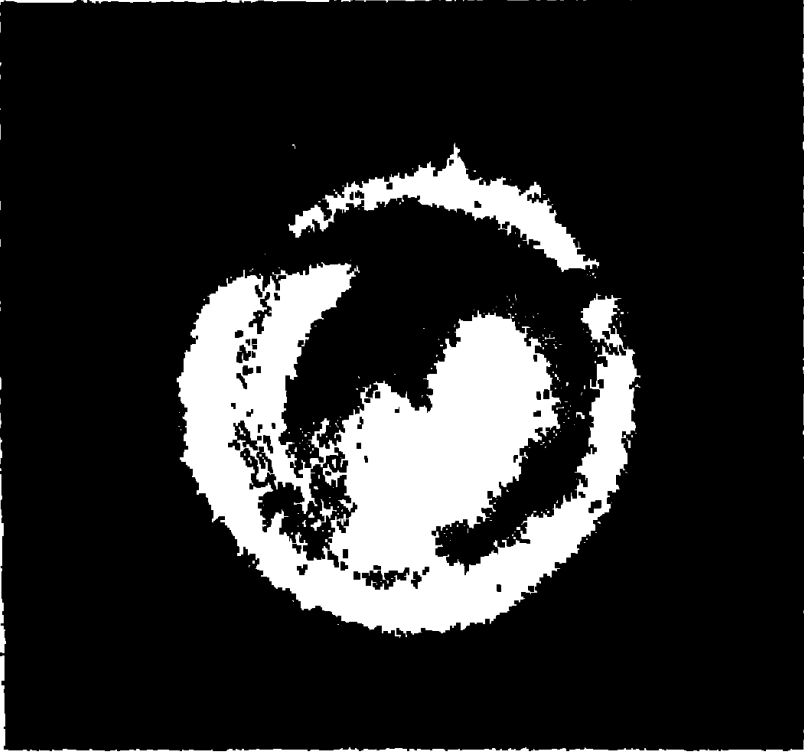
৮নং চিত্র
রকেটের সাহায্যে গৃহীত রঞ্জেনরশ্মির আলোতে সূর্যের চেহারা।

অঞ্চল এরূপ আয়নের দ্বারা গঠিত। এর নাম আয়নমণ্ডল। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ভূপৃষ্ঠের উপর দূর পাল্লার বেতার যোগা-যোগের ক্ষেত্রে আয়নমণ্ডল অপরিহার্য।

সূর্যের বিক্ষুব্ধ অবস্থায় যখন সেখানে বিস্ফোরণ ঘটতে থাকে, তখন অধিকতর শক্তিশালী রঞ্জেন ও অতিবেগুনী রশ্মি বায়ুমণ্ডলে এসে পড়ে। এরা আয়নমণ্ডলে অতিরিক্ত আয়ন ও ইলেকট্রনের সৃষ্টি করে। এর ফল কিন্তু আমাদের পক্ষে কিছুটা অসুবিধাজনক। দূরপাল্লার যোগা-যোগের জন্যে যে বেতার-তরঙ্গ আয়নমণ্ডলের মধ্য দিয়ে যায়, অতিরিক্ত আয়ন ও ইলেকট্রন তাদের শক্তি অনেকটা বা কোন কোন ক্ষেত্রে সবটাই শুষে নেয়। খবরের কাগজে যে মাঝে মাঝে বেতার যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হবার সংবাদ পাওয়া যায়, তা এই কারণেই ঘটে থাকে।

তরঙ্গমালা ছাড়া বিদ্যুৎ-কণিকাও পৃথিবীতে এসে পড়ে। সৌরকলঙ্কের সন্নিহিত অঞ্চল থেকেই সাধারণতঃ এরা আসে। আর বিস্ফোরণ ঘটলে অধিকতর শক্তিসম্পন্ন কণিকা নিক্ষিপ্ত হতে দেখা যায়। এদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী যারা—প্রায় আলোকের গতিবেগে চলে—তারা সোজা ভূপৃষ্ঠে এসে পড়ে। এরাই সূর্য থেকে আগত মহাজাগতিক রশ্মি। অপেক্ষাকৃত কম গতিবেগসম্পন্ন কণিকাগুলি—সেকেণ্ডে প্রায় ১৫০০ কিঃ মিঃ বেগে ধাবিত হয়ে বিস্ফোরণের ২৪ ঘণ্টা থেকে ৪৮ ঘণ্টা পরে পৃথিবীতে এসে পৌঁছায়। এরা কিন্তু ভূপৃষ্ঠে আসতে পারে না। পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্রের ফাঁদে পড়ে দুই মেরুঅঞ্চলের দিকে বেঁকে যায়। কারণ সেখানে চৌম্বক ক্ষেত্রের বল সর্বাপেক্ষা বেশী। মেরুঅঞ্চলে গিয়ে সেখানকার বায়ুকণাকে এরা উত্তেজিত করে। ফলে সেখানকার আকাশে দেখা যায় নানা রঙের খেলা—যার নাম মেরু-জ্যোতি। বিষুবঅঞ্চলের দিকে ক্রমশঃ চৌম্বক ক্ষেত্রের বল কমে আসে বলে সৌর কণিকাগুলি সাধারণতঃ এদিকে আসতে পারে না। তাই আমাদের অক্ষরেখায় আমরা প্রকৃতির এই শ্রেষ্ঠ উপভোগ্য দৃশ্য দেখবার সৌভাগ্য থেকে চিরদিন বঞ্চিত। এছাড়া এই সব কণিকা

পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্রে আলোড়ন সৃষ্টি করে। তার নাম চৌম্বক ঝটিকা।

সৌরশক্তির উৎস

উপরের আলোচনা থেকে বোঝা যাবে—কি বিপুল পরিমাণ শক্তি প্রতি মুহূর্তে নানা জাতীয় বিকিরণের আকারে সূর্য থেকে নির্গত হচ্ছে। খুব সাধারণভাবে হিসাব করলে এই পরিমাণ দাঁড়ায় ৫১×১০^২৩ অশ্বশক্তি বা ৩·৮×১০^২৩ কিলোওয়াট। স্বভাবতঃই প্রশ্ন উঠবে—এই অফুরন্ত শক্তির উৎস কোথায়?

আজ থেকে শতাধিক বছর পূর্বে বিখ্যাত পদার্থবিদ লর্ড কেলভিনের মাথায় এই চিন্তা এসেছিল। সূর্য যদি তার নিজের শক্তি ভাঙিয়ে খায়, তবে সহজেই দেখানো যায় যে, প্রতি বছরে তার উত্তাপ ২° করে কমবে। সে ক্ষেত্রে কয়েক হাজার বছরের বেশী তার আয়ু হতে পারে না। কেলভিন প্রথমে ভেবেছিলেন—সূর্যের আকর্ষণে প্রচণ্ড বেগে উল্কার ঝাঁক এসে তার উপর পড়ে এবং সেটাই হলো শক্তির উৎস। কয়েক বছর পরেই তিনি এই ধারণা পরিত্যাগ করে হেলম্‌হোল্টজের মতবাদ গ্রহণ করলেন। এই মতবাদ অনুযায়ী সূর্য যদি খুব ধীরে ধীরে সঙ্কুচিত হয়, তবে তার অভিকর্ষজনিত শক্তি উত্তাপ শক্তিতে রূপান্তরিত হবে। কিন্তু অঙ্ক কষে দেখা গেল—যে হারে প্রতিনিয়ত তাপ বিকিরিত হচ্ছে, তাতে এই উপায়ে অর্জিত শক্তিও মোটামুটি ২০ লক্ষ বছরের বেশী চলবে না। পক্ষান্তরে সর্বাধুনিক উপায়ে বিজ্ঞানীরা পৃথিবীর যে বয়স নির্ধারণ করেছেন, তা হলো ৩,৩০০ লক্ষ বছর। সূর্যের বয়স তো এর চেয়ে অনেকটাই বেশী হবে।

১৯০৫ খৃষ্টাব্দে বস্তুর শক্তিতে রূপান্তরণ সম্বন্ধে আইনষ্টাইনের বিখ্যাত মতবাদ ও সূত্র $E=mc^2$ প্রকাশিত হলো। এই সূত্র অনুযায়ী m গ্র্যাম বস্তুকে যদি শক্তিতে রূপান্তরিত করা হয়, তবে mc^2 পরিমাণ শক্তি পাওয়া যাবে। এখানে c হচ্ছে আলোকের গতিবেগ—সেকেণ্ডে ৩×১০^১০ সেঃ মিঃ। এদিকে আবার দেখা গেল যে, বিশেষ পরিবেশে চারটি হাইড্রোজেন পরমাণু মিলে একটি হিলিয়াম পরমাণু গঠন করতে পারে। কিন্তু চারটি হাইড্রোজেন পরমাণুর ভর একত্রে একটা হিলিয়াম পরমাণুর ভরের চেয়ে কিছুটা বেশী। তাহলে এই উদ্‌বৃত্ত পরিমাণ বস্তু কোথায় যায়? এই উদ্‌বৃত্ত বস্তুই আইনষ্টাইনের উপরিউক্ত সূত্র অনুসারে শক্তিতে রূপান্তরিত হয়ে যায়। সূর্যের অভ্যন্তরে যে অত্যধিক তাপ ও চাপ রয়েছে, তাতে এই বিক্রিয়া সংঘটিত হওয়া খুবই স্বাভাবিক। সূত্রটি থেকে সহজেই অনুমেয়, কি প্রচণ্ড পরিমাণ শক্তি এই উপায়ে নির্গত হতে পারে। দেখা গেল—এই প্রক্রিয়ায় সেই শক্তির ব্যাখ্যা করা চলে।

অপর দিকে সার জেম্‌স্‌ জীন্‌স্‌ বললেন যে, বিশেষ অবস্থায় পজিটিভ ও নেগেটিভ বিদ্যুৎ-কণিকা পরস্পরের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়ে নিজেদের সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করে শক্তি বিকিরণ করতে পারে। কিছুদিন এই দুই মতবাদ নিয়ে বাগ্‌বিতণ্ডা চললো। পরে দেখা গেল—জীনসের মতবাদ হলো সম্পূর্ণ কল্পনাপ্রসূত। পক্ষান্তরে পর্যবেক্ষণ থেকে সূর্যের অভ্যন্তরে হিলিয়ামের অস্তিত্ব টের পাওয়া গেল। তাই হাইড্রোজেনের হিলিয়ামে রূপান্তরণজনিত শক্তির উৎপত্তি সংক্রান্ত মতবাদই মেনে নেওয়া হয়েছে।

সূর্য কি একটা চুম্বক?

সূর্যের যে একটি চৌম্বক ক্ষেত্র আছে, সে কথা প্রথম সন্দেহ করা হয় ১৮৭৮ সালের সূর্যগ্রহণের পর। এই সময়ে দেখা গেল—ছটাগুলের ছটাগুলি যেন একটা চুম্বকের চতুষ্পার্শ্বস্থ বলরেখার ঢঙে সজ্জিত। এর পর সৌরচক্রের অবম অবস্থায়

ছটামণ্ডলের চেহারা দেখে ষ্টোর্মার প্রমুখ অনেক বিজ্ঞানীই সিদ্ধান্ত করলেন যে, সূর্য নিশ্চয়ই একটি চুম্বক। সৌরশিখার আকৃতি দেখেও অনেকে অনুরূপ মত প্রকাশ করলেন। এতে উৎসাহিত হয়ে হেইল্ সূর্যের চৌম্বক ক্ষেত্রের পরিমাণ গ্রহণ করবার ব্যবস্থা করলেন। হেইলের মতানুসারে সূর্যের পৃষ্ঠদেশে চৌম্বক ক্ষেত্র প্রায় ৫০ গাউস। কিন্তু বিজ্ঞানী থীসেন আরও সঠিকভাবে মেপে বললেন যে, এর পরিমাণ মাত্র ১ গাউসের কাছাকাছি। পরে ব্যাবককও থীসেনকেই সমর্থন করলেন। পর্যবেক্ষণ থেকে আরও জানা গেল যে, পৃথিবীর মত সূর্যের চৌম্বক ক্ষেত্রও দ্বিমেরুজ। কিন্তু পৃথিবীর ক্ষেত্রে ভৌগোলিক উত্তর-দক্ষিণ ও চৌম্বক উত্তর-দক্ষিণ যেমন পরস্পরের সঙ্গে কিছুটা কোণ করে আছে, সূর্যের ক্ষেত্রে তা নয়। সূর্যের দুই মেরুরেখা এক ও অভিন্ন। শুধু তাই নয়, সূর্যের মেরুদ্বয় পরস্পরের মধ্যে ঘন ঘন পরিবর্তনশীল; অর্থাৎ বর্তমানে যে দিক উত্তর ও যে দিক দক্ষিণ মেরু, কয়েক বছর পরে তা বিপরীত হয়ে যাবে। সম্ভবতঃ সৌরচক্রের সঙ্গে সঙ্গে এই পরিবর্তন সংঘটিত হয়। এই সম্বন্ধে এখনও পর্যবেক্ষণ ও গবেষণা চলছে।

উপসংহার ও মন্তব্য

আধুনিক বিজ্ঞান পৃথিবীর মানুষকে অনেক কিছু দিয়েছে। জল-স্থল-অন্তরীক্ষে তার অধিকার হয়েছে প্রতিষ্ঠিত। এমন কি, মহাশূন্যেও আজ তার পদক্ষেপ পড়েছে। কিন্তু প্রচণ্ড বৈজ্ঞানিক শক্তির বলে বলীয়ান এই যুগের মানুষও প্রকৃতির সাহায্য ছাড়া এক মুহূর্ত চলতে পারে না। সূর্যের অভাবের কথা তো কল্পনাই করা যায় না। তার বিকিরণ শক্তি যদি কিঞ্চিৎ হ্রাস পায়, পৃথিবীর উপর তার ফলাফল ভাবতে গেলেও শিউরে উঠতে হয়।

পৃথিবীতে জীবনধারণের জন্যে সূর্য অপরিহার্য। সেজন্যে সূর্য আমাদের বড় প্রিয় এবং সূর্যকে নানাভাবে জানবার জন্যে বিজ্ঞানীরা গোড়া থেকেই উঠেপড়ে লেগেছেন। আমরা এতদিন সূর্যকে দেখেছি, কারণ সূর্যের আলোক-তরঙ্গ এসে আমাদের চোখে পড়ছে—সূর্যের প্রভাব অনুভব করেছি। কারণ সূর্যের উত্তাপ-তরঙ্গ আমাদের শরীরকে উত্তেজিত করছে। বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে আমরা আজ সূর্যের 'কথা-বার্তা' শুনতে পারছি, কারণ রেডিও ষ্টেশনের মত সূর্য থেকে বেতার-তরঙ্গ এসে বিজ্ঞানীর যন্ত্রে ধরা পড়ছে। এতেও কিন্তু বিজ্ঞানীরা সন্তুষ্ট হতে পারেন নি। তাঁরা তাই বায়ুমণ্ডলের সীমানা ছাড়িয়ে এসেছেন সূর্যের অন্যান্য রশ্মির সন্ধানে, দুর্গম মেরুঅঞ্চলে হানা দিয়েছেন সূর্যের বিদ্যুৎ-কণিকা ধরবার জন্যে।

কোন এক দেশের বৈজ্ঞানিকের পক্ষে সম্ভব নয় এত বড় সূর্যের এত দিকে লক্ষ্য রাখা। তাই সমগ্র পৃথিবীর বিজ্ঞানীরা মিলিত হয়েছেন সঙ্ঘবদ্ধভাবে সূর্যের রহস্য সমাধানের জন্যে। এরই ফলে ব্যবস্থা হয়েছিল ১৯৫৭-৫৮ খৃষ্টাব্দে আন্তর্জাতিক ভূ-পদার্থতাত্ত্বিক বর্ষের। সূর্য ছিল তখন প্রচণ্ড বিক্ষুব্ধ—সৌরচক্রের চরম অবস্থায়। আবার ১৯৬৩-৬৪ সালে অনুষ্ঠিত হয়েছে আন্তর্জাতিক 'শান্ত সূর্য' বর্ষ। সূর্য তখন একেবারে শান্ত—সৌরচক্রের অধম অবস্থা। এই সব মিলিত প্রচেষ্টায় সংগৃহীত হয়েছে নতুন নতুন তথ্য; ফলে প্রচারিত হচ্ছে নতুন নতুন তত্ত্ব। আশা করা যায়—সূর্য সম্বন্ধে এখনও যে সব অজ্ঞাত রহস্য রয়েছে, তা অদূর ভবিষ্যতে উদ্ঘাটিত হবে।

কৃত্রিম রেশম

শ্রীপ্রণবকুমার কুণ্ডু

রেশমী পোষাক-পরিচ্ছদের কমনীয়তা শরীরের পক্ষে বেশ আরামদায়ক। প্রাকৃতিক রেশম পাওয়া যায় গুটিপোকা অর্থাৎ রেশম-কীট থেকে। গুটিপোকার উৎস ছাড়াই রেশম তৈরির পরিকল্পনা মানুষের মাথায় আসে অনেক দিন থেকে।

প্রাকৃতিক রেশম প্রোটিনের তন্তু, কিন্তু কৃত্রিম রেশম তৈরি হয় সেলুলোজ থেকে।

১৬৬৪ সালে ইংরেজ বিজ্ঞানী রবার্ট হুক সর্বপ্রথম সুনির্দিষ্টভাবে বলেন যে, কৃত্রিম উপায়ে রেশম তৈরি করা সম্ভব। তারপর অনেক বছর ধরে এই বিষয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলে। ১৮৫৫ সালে সুইডিস রসায়নবিদ জর্জ য়ুডেমারস সর্বপ্রথম কৃত্রিম রেশম তৈরির পেটেন্ট গ্রহণ করেন। মালবেরি এবং অন্যান্য গাছের ছাল থেকে সংগৃহীত সেলুলোজ থেকে তিনি রেশমের তন্তু তৈরি করেন। এই তন্তু কিন্তু কাপড় বোনবার মত যথেষ্ট শক্ত ছিল না।

১৮৮৩ সালে ইংরেজ পদার্থ-বিজ্ঞানী স্যর জোসেফ ডাব্লিউ. সোয়ান অপেক্ষাকৃত শক্ত রেশম-তন্তু প্রস্তুতে সক্ষম হন; তবে প্রাকৃতিক রেশমের চেয়ে এই রেশমের দাম পড়েছিল অনেক বেশী।

১৮৯০ সালে ফরাসী বিজ্ঞানী কাউন্ট হিলারী ডি চারডোনেন্ট প্রথম কাপড় বোনবার উপযোগী শক্ত কৃত্রিম রেশম তৈরি করেন। তিনি প্রসিদ্ধ ফরাসী বিজ্ঞানী লুই পাস্তুরের সহকারী ছিলেন। মালবেরি গাছের পাতা থেকে তিনি প্রথম সেলুলোজ সংগ্রহ করেছিলেন। পরে অবশ্য তুলা ইথারে ডুবিয়ে তার দ্রবণ তৈরি করে তা থেকে তিনি প্রয়োজনীয় সেলুলোজ সংগ্রহ করেছিলেন। তিনিই কৃত্রিম রেশম শিল্পের জনক বলে পরিচিত। তাঁর আবিষ্কৃত পদ্ধতিটি ছিল নিম্নরূপ:—

নাইট্রিক ও সালফিউরিক অ্যাসিডের পাতলা দ্রবণে সেলুলোজ যোগ করে সেলুলোজ মনো এবং ডাই-নাইট্রেট তৈরি করা হয়। কঠিন অবস্থায় তা পাইরোক্সিলিন নামে পরিচিত। এই পাইরোক্সিলিন ইথার-অ্যালকোহল মিশ্রণে দ্রবীভূত করে কলোডিয়ন পাওয়া সম্ভব। এই কলোডিয়নকে খুব সূক্ষ্ম ছিদ্রের মধ্য দিয়ে চাপ দিয়ে বাতাসে বেরিয়ে আসতে দিলে সেলুলোজ নাইট্রেটের তন্তু পাওয়া যায়। সেই তন্তু কষ্টিক সোডা বা সোডিয়াম হাইড্রোজেন সালফেটের দ্রবণ সহযোগে ফোটালে সেলুলোজ অর্থাৎ চারডোনেন্ট উদ্ভাবিত কৃত্রিম রেশম পাওয়া সম্ভব। কিন্তু ব্যবসায়িক ভিত্তিতে এই উপায়ে রেশম তৈরি করতে গেলে উৎপাদনের ব্যয় প্রচুর পড়ে যায়।

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে ১৯১১ সালের পর ব্যবসায়িক ভিত্তিতে কৃত্রিম রেশম তৈরি সুরু হয়। এই ব্যাপারে প্রধান উদ্যোক্তা ছিল আমেরিকান ভিস্‌কোজ কর্পোরেশন নামে এক বৃটিশ কোম্পানী।

ভিস্‌কোজ পদ্ধতিতে কৃত্রিম রেশম নিম্নলিখিত ভাবে তৈরি হয়:—

সেলুলোজ কষ্টিক সোডার দ্রবণ সহযোগে ফুটিয়ে তাতে কার্বন ডাইসালফাইড যোগ করা হয়। ফলে কতকগুলি বিভিন্ন সোডিয়াম জ্যানথেটের এক মিশ্রণ তৈরি হয়। মিশ্রণটি কষ্টিক সোডার দ্রবণে দ্রবণীয়। কষ্টিক সোডার জন্যে দ্রবণটি ক্ষারীয় অবস্থায় থাকে। এর সান্দ্রতা একটু বেশী হয়। এই সান্দ্র তরল পদার্থটিকে

খুব সূক্ষ্ম ছিদ্রের মধ্য দিয়ে চাপ দিয়ে পাঠালে এবং পাতলা সালফিউরিক অ্যাসিডের সঙ্গে যোগ করলে চক্‌চকে সুন্দর কৃত্রিম রেশমের তন্তু (সেলুলোজ) পাওয়া যায়। এই পদ্ধতিতে সবচেয়ে বেশী কৃত্রিম রেশম তৈরি হয়। কৃত্রিম রেশম সাধারণভাবে রেয়ন নামে পরিচিত। কৃত্রিম রেশম তৈরি করবার আরও দুটি পদ্ধতি আছে। তাদের একটিতে গাঢ় সালফিউরিক অ্যাসিড বা অনার্দ্র জিঙ্ক ক্লোরাইডের উপস্থিতিতে অ্যাসিটিক অ্যানহাইড্রাইডের সঙ্গে সেলুলোজ ফোটালে সেলুলোজ ট্রাই-অ্যাসিটেট পাওয়া যায়। রাসায়নিক বিক্রিয়া সমাপ্ত হলে জল যোগ করে সেলুলোজ ট্রাই-অ্যাসিটেটকে সম্ভবমত সেলুলোজ ডাই-অ্যাসিটেটে পরিণত করা হয়। ঐ সেলুলোজ ডাই-অ্যাসিটেটকে ধৌত করে শুকিয়ে নেবার পর অ্যাসিটোন-সমৃদ্ধ কতকগুলি জৈব তরল যৌগের মিশ্রণে দ্রবীভূত করা হয়। এই দ্রবণটিকে চাপ প্রয়োগে খুব ক্ষুদ্র ছিদ্রের মধ্য দিয়ে একটা উত্তপ্ত প্রকোষ্ঠে চালনা করলে উদ্বায়ী অ্যাসিটোন ইত্যাদি দ্রাবক বাষ্পীভূত হয়ে যায় এবং সেলুলোজ অ্যাসিটেটের কৃত্রিম রেশম তন্তু পাওয়া যায়। এই ভাবে তৈরী রেশম সহজদাহ্য নয়; কিন্তু এভাবে তৈরি করতে গেলে খরচা বেশী পড়ে।

আর একটি পদ্ধতিতে কৃত্রিম রেশম তৈরি করা যায়, যাকে বলা হয় কিউপ্রোঅ্যামোনিয়াম পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে সেলুলোজ অ্যামোনিয়া-যুক্ত কপার হাইড্রক্সাইডের দ্রবণে যোগ করে ফোটানো হয়। সেলুলোজ দ্রবীভূত হলে সেই দ্রবণ চাপ প্রয়োগে খুব সূক্ষ্ম ছিদ্রের মধ্য দিয়ে সালফিউরিক অ্যাসিডের সঙ্গে যোগ করা হয়। ফলে সেলুলোজের অর্থাৎ কৃত্রিম রেশমের তন্তু পাওয়া যায়। এই ধরণের রেশম খুব সস্তা হয়ে থাকে।

এই সব উপায়ে প্রস্তুত রেশম কৃত্রিম হলেও পুরাপুরি কৃত্রিম বলে দাবী করা যায় না; কারণ এই সব বিভিন্ন পদ্ধতিতে প্রয়োজনীয় মূল উপাদান সেলুলোজ উদ্ভিদ থেকেই সরাসরি সংগ্রহ করা হয়।

অ্যাসিটেট রেয়ন ভিস্‌কোজ রেয়নের চেয়ে বেশী টেঁকসই এবং বেশী সুন্দর। তবে অ্যাসিটেট রেয়নের দাম ভিস্‌কোজ রেয়নের চেয়ে বেশী। অ্যাসিটেট রেয়নকে শুধু অ্যাসিটেট এবং ভিস্‌কোজ রেয়নকে শুধু রেয়ন বলে অনেক সময় অভিহিত করা হয়।

সাধারণভাবে কৃত্রিম রেশম প্রাকৃতিক রেশমের চেয়ে অপেক্ষাকৃত কম সহজদাহ্য। প্রাকৃতিক রেশম পোড়ালে চুল পোড়া গন্ধের মত গন্ধ নির্গত হয়। কৃত্রিম রেশম পোড়ালে সে রকম কোন গন্ধ পাওয়া যায় না।

পর্যায় সারণী

শ্রীদিলীপকুমার মুখোপাধ্যায় ও
শ্রীশ্যামল ভট্টাচার্য

মৌলিক পদার্থের রাসায়নিক ধর্মের বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করিয়া ইহাদের একটি শ্রেণীতে সুষ্ঠুভাবে সজ্জিত করিবার চেষ্টা অনেক দিন পূর্ব হইতেই চলিতেছিল। কারণ শতাধিক মৌলিক পদার্থের প্রত্যেকটির ভৌত ও রাসায়নিক ধর্মাবলী পৃথক পৃথকভাবে মনে রাখা বা আলোচনা করা খুবই কঠিন। এক্ষেত্রে সমধর্মী মৌলিক পদার্থগুলিকে যদি কোনও উপায়ে একটি শ্রেণীতে পর পর সজ্জিত করা সম্ভব হয়, তাহা হইলে মৌলিক পদার্থগুলির ধর্মাবলী পর্যালোচনা করা সহজ হয়। এই সম্বন্ধে বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক বিভিন্ন মতবাদ প্রচার করেন। তাঁহাদের মধ্যে রাশিয়ার খ্যাতনামা বিজ্ঞানী মেণ্ডেলিফ ১৮৬৯ সালে যে মতবাদ প্রচার করেন, তাহাই সর্বাপেক্ষা কার্যকরী ও গ্রহণযোগ্য। মেণ্ডেলিফ যে ধারণার উপর ভিত্তি করিয়া মৌলিক পদার্থগুলিকে সজ্জিত করেন, তাহা এইরূপ :

'যদি মৌলিক পদার্থগুলিকে তাহাদের পারমাণবিক ওজনের ক্রমানুসারে সজ্জিত করা যায়, তাহা হইলে একটি নির্দিষ্ট সময় অন্তর বিভিন্ন মৌলিক পদার্থের ধর্মাবলী পুনরাবৃত্ত হয়।' এই সূত্রটি পর্যায় সূত্র (Periodic Law) নামে খ্যাত। মেণ্ডেলিফ উপরিউক্ত ধারণার বশবর্তী হইয়া কি উপায়ে মৌলিক পদার্থগুলিকে সজ্জিত করিয়াছিলেন, নিম্নে বিশদভাবে তাহার আলোচনা করা হইল।

মেণ্ডেলিফ কর্তৃক আবিষ্কৃত পর্যায় সারণীতে (Periodic Table) লম্বভাবে নয়টি স্তম্ভ এবং সমান্তরালভাবে সাতটি স্তম্ভ রহিয়াছে। লম্বমান স্তম্ভগুলি শ্রেণী (Groups) এবং সমান্তরাল স্তম্ভগুলি পর্যায় (Periods) নামে পরিচিত। প্রত্যেকটি পর্যায়ে সমান সংখ্যক মৌলিক পদার্থ নাই। প্রথম পর্যায়টির দিকে দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যাইবে যে, ইহাতে মাত্র দুইটি মৌলিক পদার্থ অবস্থান করিতেছে। ইহাদের মধ্যে একটি হাইড্রোজেন (H) এবং অপরটি হিলিয়াম (He)। এই জন্ত প্রথম পর্যায়টিকে অতিক্ষুদ্র পর্যায় বলা হয়। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় পর্যায় দুইটির প্রত্যেকটিতে আটটি করিয়া মৌলিক পদার্থ আছে। এই দুইটি পর্যায়কে ক্ষুদ্র পর্যায় বলা হয়। ক্ষুদ্র পর্যায় দুইটির পদার্থগুলিকে আদর্শ মৌলিক পদার্থ (Typical Elements) বলা হয়। চতুর্থ এবং পঞ্চম—এই উভয় পর্যায়ের প্রতিটিতে আঠারটি করিয়া মৌলিক পদার্থ আছে বলিয়া দীর্ঘ পর্যায় নামে পরিচিত। দীর্ঘ পর্যায় দুইটির মৌলিক পদার্থগুলি দুই ভাগে বিভক্ত—স্বাভাবিক মৌল (Normal elements) এবং পরিবর্তনশীল মৌল (Transitional elements)। চতুর্থ পর্যায়ে সেলিনিয়াম (Se) হইতে জিঙ্ক (Zn) পর্যন্ত দশটি এবং পঞ্চম পর্যায়ে ইটরিয়াম (Y) হইতে ক্যাডমিয়াম (Cd) পর্যন্ত দশটি মৌলিক পদার্থ পরিবর্তনশীল এবং উভয় পর্যায়ের অন্যান্য মৌলিক পদার্থগুলি স্বাভাবিক মৌল। এখন এই সকল স্বাভাবিক এবং পরিবর্তনশীল মৌলিক পদার্থগুলি সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা দরকার।

স্বাভাবিক মৌলিক পদার্থের পরমাণুর বাহিরের কক্ষটি (Shell) অসম্পূর্ণ থাকে। যখন একটি স্বাভাবিক মৌলিক পদার্থ রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলে অপর একটি মৌলিক পদার্থে পরিবর্তিত হয়,

PERIODIC TABLE

Groups		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII			O
		A B	A B	A B	A B	A B	A B	A B				
Period 1		H 1 1·008										He 2 4·003
„ 2		Li 3 6·940	Be 4 9·09	B 5 10·82	C 6 12·01	N 7 14·00	O8 16·00	F 9 19·00				Ne 10 20·183
„ 3		Na 11 23·00	Mg 12 24·32	Al 13 26·97	Si 14 28·06	P 15 31·00	S 16 32·06	Cl 17 35·46				A 18 39·944
„ 4	First Series	K 19 39·10	Ca 20 40·08	Sc 21 45·10	Ti 22 47·90	V 23 50·95	Cr 24 52·01	Mn 25 54·93	Fe 26 55·84	Co 27 58·94	Ni 28 58·69	
	Second Series	Cu 29 63·57	Zn 30 65·38	Ga 31 69·72	Ge 32 72·69	As 33 74·91	Se 34 78·96	Br 35 79·92				Kr 36 83·7
„ 5	First Series	Rb 37 85·48	Sr 38 87·63	Y 39 88·92	Zr 40 91·22	Nb 41 92·91	Mo 42 95·95	Tc 43 97·8	Ru 44 101·7	Rh 45 102·91	Pd 46 106·7	
	Second Series	Ag 47 107·88	Cd 48 112·41	In 49 114·76	Sn 50 118·76	Sb 51 121·76	Te 52 127·61	I 53 126·92				Xe 54 131·3
„ 6	First Series	Cs 55 132·91	Ba 56 137·36	La 57* 138·92	Hf 72 178·6	Ta 73 180·88	W 74 183·92	Re 75 186·31	Os 76 190·2	Ir 77 193·1	Pt 78 195·23	
	Second Series	Au 79 197·2	Hg 80 200·62	Tl 81 201·39	Pb 82 207·21	Bi 83 209·00	Po 84 210	At 85 210 (?)				Rn 86 222
„ 7		Fr 87 223	Ra 88 226·05	Ac 89 227	Th 90 232·12	Pa 91 231	U 92 238·07	→Transuranium elements				
*Rare Earths 58—71		Ce 58 140·13	Pr 59 140·9	Nd 60 144·27	Pm 61 ?	Sm 62 150·4	Eu 63 152	Gd 64 156·9				
		Tb 65 159·2	Dy 66 162·46	Ho 67 164·9	Er 68 167·2	Tm 69 169·4	Yb 70 173·04	Lu 71 174·99				

Figures after the symbols indicate atomic numbers and figures below atomic weights.

তখন ঐ অসম্পূর্ণ বহির্কক্ষে ইলেকট্রন যুক্ত হয়। পরিবর্তনশীল মৌলিক পদার্থের ক্ষেত্রে পরমাণুর একাধিক কক্ষ অসম্পূর্ণ থাকে; যথা—অন্তিম কক্ষ (Ultimate Shell) এবং উপান্ত কক্ষ (Penultimate shell)। ইলেকট্রন উহাদের যে কোনও একটি কক্ষে যুক্ত হইতে পারে বা একটি কক্ষ হইতে অপর কক্ষে স্থানান্তরিত হইতেও পারে। এই প্রকারের পারমাণবিক গঠনের জন্য পরিবর্তনশীল মৌলিক পদার্থগুলির মধ্যে নিম্নলিখিত ধর্মগুলি বর্তমান:

(ক) উহাদের যোজ্যতা (Valency) পরিবর্তনশীল,

(খ) ঐ সকল মৌলিক পদার্থগুলি রঙীন লবণ উৎপন্ন করে,

(গ) উহারা জটিল যৌগিক পদার্থ গঠন করিতে সক্ষম,

(ঘ) ঐ সকল মৌলিক পদার্থ অনুঘটক (Catalyst) রূপে ক্রিয়া করে।

ষষ্ঠ পর্যায়ে মোট বত্রিশটি মৌলিক পদার্থ বর্তমান। এই জন্য ইহাকে সুদীর্ঘ পর্যায় বলা হয়। এই বত্রিশটি মৌলিক পদার্থের মধ্যে Cs, Ba এবং Tl হইতে Rn অবধি আটটি হইতেছে স্বাভাবিক মৌল। অবশিষ্ট চব্বিশটি মৌলের মধ্যে Ce হইতে Lu অবধি চৌদ্দটি মৌলকে বলা হয় বিরল মৃত্তিকা মৌল (Rare Earth elements)। এই মৌলিক পদার্থগুলি প্রকৃতিতে খুব সামান্য পরিমাণে পাওয়া যায়। ইহা ভিন্ন অবশিষ্ট দশটি মৌলিক পদার্থ পরিবর্তনশীল।

সপ্তম পর্যায়টি অসমাপ্ত এবং ইহাতে কেবল মাত্র তেজস্ক্রিয় (Radio-active) এবং ইউরেনিয়ামোত্তর (Trans-Uranium) মৌলিক পদার্থগুলি স্থান পাইয়াছে।

প্রথম পর্যায় ভিন্ন অন্য পর্যায়গুলি ক্ষারীয় মৌলিক পদার্থ হইতে আরম্ভ করিয়া নিষ্ক্রিয় গ্যাসে শেষ হইয়াছে। যে কোন একটি মৌলিক পদার্থ হইতে গণনা আরম্ভ করিলে অষ্টম মৌলিক পদার্থটির ভৌত ও রাসায়নিক ধর্ম প্রথমটির অনুরূপ হইবে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, দ্বিতীয় পর্যায়ের ফ্লোরিনের (F) ধর্ম তৃতীয় পর্যায়ের ক্লোরিনের (Cl) ধর্মের অনুরূপ। এই ঘটনা পর্যায় সারণীর একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য।

পর্যায় সারণীর আরও একটি বৈশিষ্ট্য হইতেছে ইহার উপশ্রেণীগুলি। চতুর্থ, পঞ্চম এবং ষষ্ঠ পর্যায়ের মৌলিক পদার্থগুলি a ও b দুইটি উপশ্রেণীতে বিভক্ত। a উপশ্রেণীর মৌলিক পদার্থগুলি বাম দিকে এবং b উপশ্রেণীর মৌলিক পদার্থগুলি ডানদিকে স্থাপিত। এক একটি শ্রেণী বা উপশ্রেণীর মৌলিক পদার্থগুলি মূলতঃ সমধর্মী। প্রথম শ্রেণীর a উপশ্রেণীর মৌলগুলির (Li হইতে Fr) প্রত্যেকটি ক্ষারধর্মী। সপ্তম শ্রেণীর b উপশ্রেণীর হ্যালোজেনগুলি * সমধর্মী। শূন্য শ্রেণীর মৌলগুলি কোনরূপ যৌগ গঠন করে না। ইহাদিগকে বলা হয় নিষ্ক্রিয় মৌল। এই সকল বৈশিষ্ট্য ভিন্ন পর্যায় সারণীর আরও দুইটি বৈশিষ্ট্য রহিয়াছে। তাহা হইল—(১) তড়িৎ-রাসায়নিক ধর্ম (Electro-chemical behaviour) এবং (২) কৌণিক সম্পর্ক (Diagonal relationship)। এখন ইহাদের সম্বন্ধে ক্রমান্বয়ে কিছু আলোচনা করা হইতেছে।

পর্যায় সারণীর যে কোন একটি পর্যায় ধরিয়া প্রথম শ্রেণী হইতে সপ্তম শ্রেণীর দিকে যাইতে থাকিলে মৌলিক পদার্থগুলির ইলেকট্রো-পজিটিভ ধর্ম ধীরে ধীরে কমিতে থাকে; যেমন—সোডিয়াম (Na) উচ্চ ইলেকট্রো-পজিটিভ ধর্মী, কিন্তু ক্লোরিন (Cl) ইলেকট্রো-নেগেটিভ ধর্মী। আবার কোনও শ্রেণীর বরাবর উপর হইতে নীচে নামিতে থাকিলে মৌলিক পদার্থের ইলেকট্রো-নেগেটিভ ধর্ম ধীরে ধীরে কমিতে থাকে। কোন পর্যায় বরাবর

* ফ্লোরিন (F), ক্লোরিন (Cl), ব্রোমিন (Br) ও আয়োডিন (I) মৌলগুলি হ্যালোজেন নামে পরিচিত।

বাম হইতে দক্ষিণে মৌলিক পদার্থগুলির অক্সাইডের ক্ষারধর্ম (Basicity) ধীরে ধীরে কমিতে থাকে। যেমন—

Na_2O	MgO	Al_2O_3	SiO_2
তীব্র ক্ষারীয়	ক্ষারীয়	উভয় ধর্মী (Amphoteric)	মৃদু অ্যাসিড ধর্মী

P_2O_5	SO_3	Cl_2O_7
অ্যাসিড ধর্মী	তীব্র অ্যাসিড ধর্মী	অতি তীব্র অ্যাসিড ধর্মী

কোনও শ্রেণীর প্রথম মৌল পরবর্তী শ্রেণীর দ্বিতীয় মৌলের সমধর্মী। ইহাকে কৌণিক সম্পর্ক (Diagonal Relationship) বলা হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে—লিথিয়াম (Li), ম্যাগ্‌নেসিয়ামের (Mg) সমধর্মী; বেরিলিয়াম (Be) অ্যালুমিনিয়ামের (Al) সমধর্মী ইত্যাদি।

পর্যায় সারণীর ব্যবহার

(১) পর্যায় সারণী উদ্ভাবিত হইবার ফলে প্রায় ১০২টি মৌলিক পদার্থের বিভিন্ন ভৌতিক ও রাসায়নিক ধর্ম পৃথক পৃথক ভাবে জানিবার প্রয়োজন নাই, কেবলমাত্র নয়টি শ্রেণীর পাঠ আবশ্যক। যে কোন শ্রেণীর যে কোন মৌলিক পদার্থের ধর্মাবলী ঐ শ্রেণীর অন্যান্য মৌলিক পদার্থের ধর্মের সঙ্গে তুলনীয়।

(২) পারমাণবিক ওজনের সংশোধন—মেণ্ডেলিফের পর্যায় সারণী আবিষ্কারের পূর্ব পর্যন্ত মৌলিক পদার্থ ইণ্ডিয়ামের (In) যোজ্যতা (Valency) দুই ধরিয়া উহার পারমাণবিক ওজন ৭৬ স্থির করা হইয়াছিল। কিন্তু ইহার ফলে পর্যায় সারণীতে ইণ্ডিয়ামের স্থান লইয়া গোলযোগ উপস্থিত হইল। পর্যায় সারণীতে আর্সেনিক (As—পারমাণবিক ওজন ৭৪·৯) এবং সেলিনিয়ামের (Se—পারমাণবিক ওজন ৭৮·৯) মধ্যে কোন শূন্যস্থান নাই। কিন্তু মেণ্ডেলিফের পর্যায় সূত্রানুসারে মৌলিক পদার্থগুলি তাহাদের পারমাণবিক ওজনের ক্রমানুসারী সজ্জিত হইবে। সুতরাং ইণ্ডিয়ামের স্থান As ও Se-এর মধ্যে হওয়া উচিত। কিন্তু মেণ্ডেলিফ এই কথা মানিয়া লইলেন না, তিনি বলিলেন যে, ইণ্ডিয়ামের পারমাণবিক ওজন ভুল, উহা ৭৬ না হইয়া হইবে ১১৮; সুতরাং উহার যোজ্যতা হইবে তিন এবং পর্যায় সারণীতে ইহা ক্যাডমিয়াম (Cd) ও টিনের (Sn) মধ্যে স্থাপিত হইবে। পরবর্তী কালে ইণ্ডিয়ামের সঠিক যোজ্যতা নির্ণয়ের ফলে মেণ্ডেলিফের ধারণা অভ্রান্ত প্রমাণিত হয়।

(৩) নূতন মৌলের আবিষ্কার—মেণ্ডেলিফ যখন পর্যায় সারণী আবিষ্কার করেন তখন অনেক কম সংখ্যক মৌলিক পদার্থ আবিষ্কৃত হইয়াছিল। এই কারণে তখন পর্যায় সারণীতে অনেকগুলি ঘর শূন্য রহিয়া গিয়াছিল। পর্যায় সারণীতে এই সকল শূন্য স্থানগুলির অবস্থান লক্ষ্য করিয়া তিনি কয়েকটি অনাবিষ্কৃত মৌলের ধর্ম পূর্বাহ্নেই স্থির করিয়া ফেলিয়াছিলেন। তিনি এই মৌলগুলির নাম দেন একা-বোরন (Eka-Boron), একা-সিলিকন (Eka-Silicon) এবং একা-অ্যালুমিনিয়াম (Eka-Aluminium); অর্থাৎ তিনি বলেন যে, এই মৌল তিনটি বোরন, সিলিকন ও অ্যালুমিনিয়ামের সমধর্মী হইবে। প্রায় ১৫ বৎসর পরে ঐ তিনটি মৌলিক পদার্থ যখন আবিষ্কৃত হয়, তখন দেখা যায়—মেণ্ডেলিফ যে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন তাহা নির্ভুল।

পর্যায় সারণীর ব্যর্থতা

(১) চৌদ্দটি বিরল মৃত্তিকা (Rare Earth) মৌলকে পর্যায় সারণীতে স্থান দেওয়া সম্ভব হয় নাই।

(২) পর্যায় সারণীর কোথাও কোথাও উচ্চ পারমাণবিক ওজনসম্পন্ন মৌলের পরে

নিম্ন পারমাণবিক ওজনসম্পন্ন মৌল স্থাপিত হইয়াছে; যেমন—আর্গন (A), পটাসিয়াম (K), কোবাল্ট (Co), নিকেল (Ni), টেলুরিয়াম (Te), আয়োডিন (I), থোরিয়াম (Th) ও প্রোট্যাক্টিনিয়াম (Pa) ইত্যাদি। কিন্তু এই ঘটনা পর্যায় সূত্রের পরিপন্থী; সেই জন্ত পর্যায় সারণীতে কিছু রদবদলের প্রয়োজন হয়। মোজেলিকের পরবর্তী কালে বিজ্ঞানীরা বলিলেন যে, পর্যায় সারণীতে মৌলগুলিকে পারমাণবিক সংখ্যার (পরমাণুর মধ্যে প্রোটনের সংখ্যাকে পারমাণবিক সংখ্যা বলা হয়) ক্রমানুসারে সজ্জিত করিলে এই সমস্যা দূর হইবে এবং এই মতবাদ মানিয়া লওয়া হয়।

(৩) প্রথম শ্রেণীতে যেখানে ক্ষারীয় মৌলগুলি অবস্থান করিতেছে, তথায় কপার (Cu), সিলভার (Ag) এবং গোল্ড (Au) স্থান পাইয়াছে; কিন্তু ইহাদের সহিত ক্ষারীয় ধাতুগুলির ধর্মের সাদৃশ্য খুবই কম। ম্যাঙ্গানিজ (Mn) একটি ধাতু, কিন্তু ইহা সপ্তম শ্রেণীতে হ্যালোজেনগুলির সঙ্গে স্থাপিত হইয়াছে। আবার কতকগুলি সমধর্মী মৌল দূরে দূরে অবস্থান করিতেছে; যথা—কপার (Cu) ও মার্কারি (Hg); বেরিয়াম (Ba) ও লেড (Pb), বোরন (B) ও সিলিকন (Si); সিলভার (Ag) ও টেলুরিয়াম (Te) ইত্যাদি।

(৪) পর্যায় সারণীতে হাইড্রোজেনের অবস্থান বিতর্কমূলক। প্রথম শ্রেণীর ক্ষারীয় ধাতুর সহিত ইহার ধর্মের সমতা যেমন দেখা যায়, তেমনই সপ্তম শ্রেণীর হ্যালোজেনগুলির ধর্মের সহিতও ইহার ধর্মের মিল দেখা যায়। সেই জন্ত পর্যায় সারণীতে হাইড্রোজেনের স্থান নির্দেশ করা কঠিন। এখানে পর্যায় সারণীতে হাইড্রোজেনের স্থান কোথায় হইবে, তাহা আলোচিত হইল।

পর্যায় সারণীতে হাইড্রোজেনের স্থান

হাইড্রোজেনের দ্বারা গঠিত যৌগিক পদার্থগুলির বিষয় পর্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, হাইড্রোজেন অন্তান্ত মৌলিক পদার্থের সহিত যুক্ত হইয়া তিন প্রকারের যৌগিক পদার্থ গঠন করে। ক্ষারীয় ধাতুর সহিত যুক্ত হইয়া ইহা হাইড্রাইড গঠন করে। এই সকল হাইড্রাইড শুভ্র ও কঠিন। অধাতব মৌলিক পদার্থের সঙ্গে হাইড্রোজেন গ্যাসীয় হাইড্রাইড গঠন করে। এই সমস্ত গ্যাসীয় হাইড্রাইডগুলি সাধারণতঃ অম্লধর্মী। পর্যায় সারণীর মধ্যেকার উভয় ধর্মী (Amphoteric) মৌলগুলির (কার্বন, বোরন, সিলিকন ইত্যাদি) হাইড্রাইড গ্যাসীয় এবং ইহারা তড়িৎ-বিশ্লেষণক্ষম নয় (Non-electrolyte)। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, হাইড্রোজেনের সহিত বিভিন্ন মৌলের বিভিন্ন ধর্মের যৌগ গঠনের দৃষ্টান্ত অনুসারে পর্যায় সারণীতে হাইড্রোজেনের অবস্থান একটি আলোচ্য বিষয়। ইহাকে প্রথম অথবা সপ্তম এই দুই শ্রেণীতেই স্থান দেওয়া যায়।

হাইড্রোজেন একযোজী (Monovalent) মৌল এবং ক্ষারীয় ধাতুর ন্তায় ইহার পরমাণুর বাহিরের কক্ষে মাত্র একটি ইলেকট্রন থাকে। এই জন্ত ইহাকে ক্ষারীয় ধাতুর সহিত প্রথম শ্রেণীতে স্থাপন করা যায়। ইহা ছাড়াও হাইড্রোজেন একটি ইলেকট্রো-পজিটিভ মৌল। ইহা দ্রবণে পজিটিভ আয়ন (H^+) দেয়। ইহা অধাতুর সহিত যুক্ত হইয়া যৌগ গঠনে সক্ষম। যে কোনও অম্ল হইতে ইহার একটি একটি করিয়া পরমাণু প্রতিস্থাপিত করিতে পারা যায়। ইহার অক্সাইড ক্ষারীয় ধাতুর অক্সাইডের ন্তায় স্থায়ী। ইহা একটি বিজারক দ্রব্য (Reducing agent) এবং প্যালাডিয়ামের (Pd) সঙ্গে যুক্ত হইয়া সঙ্কর-ধাতু (Alloy) গঠন করে। প্যালাডিয়াম কর্তৃক হাইড্রোজেন শোষণ জাতীয় ঘটনাকে

অন্তর্ধৃতি (Occlusion) বলে। উপরিউক্ত কারণগুলির জন্ত হাইড্রোজেনের স্থান পর্যায় সারণীর প্রথম শ্রেণীতে হওয়া উচিত। কিন্তু হাইড্রোজেন কঠিন ও তরল অবস্থায় ধাতুর ন্তায় ব্যবহার করে না। আবার হাইড্রোজেনকে যদি প্রথম শ্রেণীতে স্থান দেওয়া যায়, তাহা হইলে হাইড্রোজেন ও হিলিয়ামের মধ্যে ছয়টি শূন্তস্থান থাকে। এই ছয়টি শূন্তস্থান ছয়টি অনাবিষ্কৃত মৌলিক পদার্থের ইঙ্গিত দেয়, যাহাদের পারমাণবিক ওজন এক হইতে চারের মধ্যে। কারণ হাইড্রোজেনের পারমাণবিক ওজন এক এবং হিলিয়ামের চার। কিন্তু ইহা সম্ভব নহে। সুতরাং হাইড্রোজেনকে প্রথম শ্রেণীতে স্থান দেওয়া চলে না।

হাইড্রোজেনের সহিত হ্যালোজেনগুলির ধর্মের কিছু কিছু সাদৃশ্য দেখিয়া ইহাকে সপ্তম শ্রেণীতেও স্থান দেওয়া চলিতে পারে। হাইড্রোজেন হ্যালোজেনের ন্তায় একযোজী (Monovalent) এবং দ্বি-পারমাণবিক (Di-atomic) গ্যাসীয় মৌল। ইহা হ্যালোজেনদের সহিত যুক্ত হইতে পারে অথবা জৈব যৌগিক পদার্থ হইতে হ্যালোজেনের দ্বারা প্রতিস্থাপিত হইতে পারে। অধিকন্ত হাইড্রোজেনকে সপ্তম শ্রেণীতে স্থাপন করিলে হাইড্রোজেন ও হিলিয়ামের মধ্যে কোন শূন্তস্থান থাকে না। কিন্তু হ্যালোজেনের ন্তায় হাইড্রোজেন জারকধর্মী (Oxidizing) মৌল নয়।

হাইড্রোজেন নেগেটিভ তড়িৎ-ধর্মী মৌলের (যেমন হ্যালোজেন) সহিত যুক্ত হইয়া অম্ল গঠন করে। এখানে হাইড্রোজেন ইলেকট্রো-পজিটিভ। আবার হাইড্রোজেন পজিটিভ তড়িৎ-ধর্মী মৌলের (যেমন—ক্যালসিয়াম, সোডিয়াম ইত্যাদি) সহিত যুক্ত হইয়া হাইড্রাইড গঠন করে। এখানে হাইড্রোজেন ইলেকট্রো-নেগেটিভ।

যদি আমরা হাইড্রোজেনের পারমাণবিক গঠন সম্বন্ধে আলোচনা করি, তাহা হইলে দেখিতে পাই যে, ইহার পরমাণুর নিউক্লিয়াসে একটি মাত্র প্রোটন এবং বাহিরের কক্ষে একটি মাত্র ইলেকট্রন আছে। ইলেকট্রনটি ত্যাগ করিয়া ইহা পজিটিভ আয়নে (H^+) পরিণত হয়; যথা—$H - e = H^+$। ইহাকে ক্ষারীয় ধাতুর সহিত তুলনা করা যায় $Na - e = Na^+$, আবার ইহা একটি ইলেকট্রন গ্রহণ করিয়া নেগেটিভ আয়নে (H^-) পরিণত হয়, যথা—$H + e = H^-$; ইহাকে হ্যালোজেনের সহিত তুলনা করা যায়, $Cl + e = Cl^-$।

উপরিউক্ত বিভিন্ন দৃষ্টান্ত দেখিয়া এই সিদ্ধান্ত লওয়া হইয়াছে যে, হাইড্রোজেন পর্যায় সারণীর কোন নির্দিষ্ট শ্রেণীতে অবস্থিত নয়। ইহার যথোপযুক্ত স্থান পর্যায় সারণীর শীর্ষে। ইহাকে পর্যায় সারণীর আদর্শ বা মূল বলা যায়।

হায়দরাবাদে বিজ্ঞান কংগ্রেস

রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রতি বছরের মত এবারও ইংরেজি নববর্ষ ভারতের বিজ্ঞানী বিজ্ঞান-কর্মী ও গবেষকদের কাছে একটি বিশেষ আহ্বান বহন করে এনেছিল। সে আহ্বান ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনে যোগদানের। এই বছর (১৯৬৭) বিজ্ঞান কংগ্রেসের ৫৪তম বার্ষিক অধিবেশনের আহ্বান জানিয়েছিলেন হায়দরাবাদের ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়। ইতিপূর্বে আরও দু-বার হায়দরাবাদে বিজ্ঞান কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশন হয়ে গেছে। প্রথম বার অধিবেশন হয়েছিল ১৯৩৭ সালে এবং দ্বিতীয়বার ১৯৫৪ সালে। কিন্তু সে দুটি অধিবেশনে যোগদানের সুযোগ আমাদের হয় নি। তাই আমাদের কাছে হায়দরাবাদে এবারের অধিবেশনে যোগদানের একটি বিশেষ আকর্ষণ ছিল। সে আকর্ষণ এক দিকে যেমন ভারতীয় ও বিদেশী বিশিষ্ট বিজ্ঞানীদের সঙ্গে মিলিত হবার ও তাঁদের বক্তব্য শোনবার, অপর দিকে তেমনি ইতিপূর্বে অদেখা কয়েকটি ইতিহাস-প্রসিদ্ধ শহর দেখবারও।

বিজ্ঞান কংগ্রেসের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপাচার্য ডাঃ ডি. এস. রেড্ডি, প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী, মূল সভাপতি অধ্যাপক টি. আর. শেষাদ্রি এবং প্রো-চ্যান্সেলার নবাব মুকারাম জাহ।

[ব্লক : 'অমৃত' পত্রিকার সৌজন্যে]

কলকাতা থেকে আমরা একটা বড় দল ৩রা জানুয়ারী সকালে উপনীত হয়েছিলাম একদা ভারত, তথা বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ধনী রাজন্য

নিজামের রাজধানী ও বর্তমান স্বাধীন ভারতের নবগঠিত অন্ধ্র প্রদেশের রাজধানী হায়দরাবাদ শহরে। অবশ্য আমরা নেমেছিলাম সেকেন্দ্রাবাদ রেলওয়ে ষ্টেশনে। কলকাতার হাওড়া ও শিয়ালদহ ষ্টেশনের মত সেকেন্দ্রাবাদ ষ্টেশন হলো একই শহরের যমজ-রেলওয়ে ষ্টেশন। কলকাতা থেকে আর একটি বড় দল বিজ্ঞান কংগ্রেস স্পেশাল ট্রেনযোগে তার আগের দিন সেখানে উপনীত হন। ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন ছাত্রাবাসে ভারতের বিভিন্ন রাজ্য থেকে আগত প্রায় দু-হাজার প্রতিনিধিদের থাকবার ব্যবস্থা করা হয়।

বিজ্ঞান কংগ্রেসের এবারের মূল অধিবেশন আয়োজিত হয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে সুরম্য ল্যাণ্ডস্কেপ গার্ডেন্‌স্‌-এ। ৩রা জানুয়ারী অপরাহ্নে ল্যাণ্ডস্কেপ গার্ডেনের সুসজ্জিত মণ্ডপে ভারত ও বিশ্বের বিভিন্ন দেশের বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ও প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে প্রধান মন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের ৫৪তম অধিবেশনের উদ্বোধন করেন। ১৩ বছর আগে তাঁর পিতা স্বাধীন ভারত রাষ্ট্রের প্রথম প্রধান মন্ত্রী জহওরলাল নেহরুও এই ল্যাণ্ডস্কেপ গার্ডেনেই বিজ্ঞান কংগ্রেসের ৪১তম বার্ষিক অধিবেশনের উদ্বোধন করেছিলেন। এবারের অধিবেশনের সূচনা হয় বন্দেমাতরম সঙ্গীতের সঙ্গে এবং তারপর অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডাঃ ডি এস. রেড্ডি সমবেত প্রতিনিধি ও বিদেশাগত বিশিষ্ট অতিথিদের স্বাগত সম্ভাষণ জানান।

উদ্বোধনী ভাষণে শ্রীমতী গান্ধী দেশের উন্নয়নে বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানীর ভূমিকার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি বলেন, দেশ এখন উন্নয়নের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পর্বে উপনীত হয়েছে—দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে সংগ্রামে বৈজ্ঞানিক ও কারিগরী পর্বে। বর্তমানে আমরা দেশের ক্রমবর্ধমান জনগণের খাদ্য জোগাবার জন্যে কৃষিগত বিপ্লব এবং শিল্প গড়ে তোলবার উদ্দেশ্যে দেশের সম্পদ সদ্ব্যবহারের চেষ্টায় ব্যাপৃত রয়েছি। এই বিরাট কর্মযজ্ঞের প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে নতুন কারিগরী বিদ্যার প্রয়োগ, উন্নত ধরণের বীজ ব্যবহার এবং সার ও কীটঘ্ন দ্রব্যের সাহায্যে কৃষির বৈজ্ঞানিকীকরণ। এই বিপ্লবের ধারক ও বাহক হচ্ছেন বিজ্ঞানীরা—তাঁদের হাতেই রয়েছে প্রগতি ও ধ্বংসের চাবিকাঠি। ভারতে দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে সংগ্রামে বিজ্ঞানীদের সরকার ও জনগণের সবচেয়ে বড় সহায়ক হতে হবে। শিক্ষাদাতা ও উদ্ভাবকরূপে তাঁদের ভারতীয় বিপ্লবের প্রথম সারিতে দাঁড়াতে হবে। অর্থনীতির চাবি রয়েছে যাঁদের হাতে, তাঁদের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে বিজ্ঞানীদের এগিয়ে আসতে হবে।

প্রধান মন্ত্রী আরও বলেন, একান্ত প্রয়োজন ছাড়া কারিগরী জ্ঞান ও অর্থনৈতিক সাহায্যের জন্যে আমরা পরনির্ভর হতে পারি না। আমাদের লক্ষ্য হলো, আগামী ১৯৭১ সালের মধ্যে খাদ্যে স্বনির্ভরতা অর্জন করা এবং ১৯৭৫ সালের মধ্যে সর্ববিধ বৈদেশিক সাহায্য থেকে মুক্ত হওয়া। এক্ষেত্রে বিজ্ঞানীদের দায়িত্ব সবচেয়ে বেশী। গত ২০ বছরে দেশের বিভিন্ন স্থানে বহু গবেষণাগার স্থাপিত হয়েছে এবং বিজ্ঞান গবেষণায় উৎসাহ দেবার জন্যে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারগুলি যথাসাধ্য অর্থব্যয় করছেন। অথচ আমরা দেখতে পাচ্ছি, এদেশের বহু বিজ্ঞানী উন্নততর সুযোগের আশায় বিদেশে চলে যাচ্ছেন এবং তাঁদের অনেকে আর এদেশে ফিরছেন না। এই ঘটনা বাস্তবিকই দুঃখের ও দুর্ভাবনার বিষয়। এই বিষয়ে বিজ্ঞানীদের চিন্তা করা প্রয়োজন। স্বদেশী হওয়াই হলো আজ বিজ্ঞানীদের কাছে একটা চ্যালেঞ্জস্বরূপ। সে চ্যালেঞ্জ তাঁদের গ্রহণ করা

উচিত। উপসংহারে তিনি বলেন, বিজ্ঞানের প্রতি সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন হওয়া প্রয়োজন। বিজ্ঞানীর মস্তিষ্ক ও মেধা যে সামাজিক অগ্রগতির জন্যে অপরিহার্য, এই বোধ জাগাতে না পারলে প্রকৃত বিজ্ঞান গবেষণা সার্থক হতে পারে না।

এবারের অধিবেশনে মূল সভাপতির আসন গ্রহণ করেন প্রখ্যাত রসায়ন-বিজ্ঞানী অধ্যাপক টি. আর. শেষাদ্রি। মূল সভাপতির ভাষণে তিনি এবার প্রচলিত রীতির কিছু পরিবর্তন সাধন করেন। এতদিন প্রচলিত রীতি ছিল মূল সভাপতি তাঁর ভাষণে দেশে বিজ্ঞানের গতি-প্রকৃতি সম্পর্কে সাধারণভাবে কিছু বলবার পর নিজস্ব বিষয়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেন। অধ্যাপক শেষাদ্রি এবার সে রীতি অনুসরণ না করে তাঁর ভাষণে 'বিজ্ঞান ও জাতীয় কল্যাণ' সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করেছিলেন।

প্রারম্ভে বিজ্ঞান কংগ্রেসের ভূমিকা আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, বিজ্ঞানী ও জনসাধারণের মধ্যে যোগসূত্র হিসাবে এই কংগ্রেসকে যাতে গড়ে তোলা যায়, তার উপায় অবলম্বন করা উচিত। বিজ্ঞানের প্রধান প্রধান উন্নয়ন ও জাতীয় কল্যাণে সে সবের প্রয়োগ সম্পর্কে আলোচনাই আমাদের বার্ষিক অধিবেশনে মুখ্য বিষয় হওয়া উচিত এবং সেই সঙ্গে স্কুল-কলেজের ছাত্রদের বিজ্ঞানশিক্ষার প্রতি অধিকতর গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন।

এরপর তিনি বিজ্ঞান ও আধ্যাত্মিকতা, বিজ্ঞানের মেধাগত ও সাংস্কৃতিক মূল্য, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ও অণুজগৎ, বিজ্ঞান-নীতি প্রসঙ্গে আলোচনা করেন। তিনি বলেন, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অসীমতা ও অণুজগতের সূক্ষ্মতা থেকে আমাদের দৈনন্দিন জীবনের জটিলতার চিন্তায় নেমে আসতে হবে। এখানে আমাদের খাদ্য, বস্ত্র, গৃহ-সংস্থান, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, যোগাযোগ ব্যবস্থা ও প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে।

এ-সমস্তই অতি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা এবং তার সমাধানকল্পে আমাদের সম্পদ ও দৃষ্টি আশু নিয়োগ করা প্রয়োজন। ফলিত বিজ্ঞানের উপরই এসবের সমাধান নির্ভর করে এবং এবিষয়ে সাফল্য অর্জিত হলে দেশের স্বাস্থ্য ও সম্পদ বৃদ্ধি পাবে এবং তখনই বিশুদ্ধ বিজ্ঞান গবেষণা ও কৃষ্টির পথ প্রশস্ত হতে পারে। দেশের বর্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের জাতীয় জীবনে ফলিত বিজ্ঞানে গবেষণার এত প্রয়োজন যে, বিশ্ববিদ্যালয়-গুলিকেও এবিষয়ে বিশেষ মনোনিবেশ করতে হবে। কারণ গণতান্ত্রিক ও বৈজ্ঞানিক যুগে জাতীয় কল্যাণই হচ্ছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

উপসংহারে অধ্যাপক শেষাদ্রি বলেন, একটা কথা আমাদের মনে রাখা দরকার যে, শুধু অর্থ ও উপকরণ থাকলেই সত্যিকারের বিজ্ঞান গবেষণা সার্থক হতে পারে না। এগুলির প্রয়োজন অবশ্যই আছে, কিন্তু আসল প্রয়োজন মানবিক উপাদান। অধ্যাপক শেষাদ্রি তাঁর ভাষণে কল্যাণরাষ্ট্রে বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানীর ভূমিকা সম্পর্কে এভাবে যেসব প্রশ্ন উত্থাপন করেন, সেবিষয়ে বিশিষ্ট বিজ্ঞানীরা পরে এক আলোচনা-সভায় মিলিত হন।

উদ্বোধনের দিনে মূল সভাপতির ভাষণের পর আর কোন অনুষ্ঠান-সূচী ছিল না। দ্বিতীয় দিন সকালে বিজ্ঞান কংগ্রেস উপলক্ষে আয়োজিত যন্ত্রপাতি এবং বিজ্ঞান-পুস্তক প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন অন্ধ্র প্রদেশের হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি শ্রীজগনমোহন রেড্ডি। প্রদর্শনী দুটি পৃথক ভবনে আয়োজিত হয়। গত বছর চণ্ডীগড় অধিবেশনের তুলনায় এবারের প্রদর্শনী অপেক্ষাকৃত ছোট মনে হয়েছে। তবে বৈজ্ঞানিক

যন্ত্রপাতি নির্মাণে এবং বিজ্ঞানের পাঠ্য ও অন্তবিধ পুস্তক প্রকাশনায় ভারতীয় প্রতিষ্ঠানগুলি আরও অগ্রসর হয়েছেন দেখে আমরা যেমন আনন্দিত হয়েছি, তেমনি আশান্বিতও হয়েছি।

প্রদর্শনী উদ্বোধনের পর দ্বিতীয় দিন থেকে বিভিন্ন শাখা সভাপতিদের ভাষণ, বিশেষ বক্তৃতা, গবেষণা-নিবন্ধ পাঠ, আলোচনা-চক্র ইত্যাদি শুরু হয় এবং ৮ই জানুয়ারী পর্যন্ত তা অব্যাহত ছিল। পদার্থবিদ্যা শাখার অধ্যাপক এফ. সি. আউলাক আলোচনা করেন 'র‍্যান্ডম ফ্র্যাগমেনটেশন' সম্পর্কে, উদ্ভিদ-বিজ্ঞানের সভাপতি অধ্যাপক আর. এন. ট্যাণ্ডন বলেন 'ছত্রাকজাত পুষ্টির কয়েকটি দিক', শারীরতত্ত্ব শাখার সভাপতি ডাঃ সুশীলরঞ্জন মৈত্র আলোচনা করেন 'কর্ম-শারীরতত্ত্ব : পশ্চাৎ-পট ও উপযোগিতা', মনস্তত্ত্ব ও শিক্ষাবিজ্ঞান শাখার সভাপতি অধ্যাপক এইচ. সি. গাঙ্গুলী বলেন 'মানসিক স্বাস্থ্য শিল্প' বিষয়ে, যন্ত্রবিদ্যা ও ধাতুবিজ্ঞান শাখার সভাপতি অধ্যাপক দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় আলোচনা করেন 'বিমান ও মহাকাশযানের চালনা পদ্ধতি', সংখ্যায়ন শাখার সভাপতি অধ্যাপক ভি. এস, হুজুরবাজার বলেন 'সম্ভাব্যতা বন্টনের অভেদক', রসায়ন শাখার সভাপতি অধ্যাপক আর. সি. মেহরোত্রা আলোচনা করেন 'অ্যালকোক্সাইড্‌স্ অ্যাণ্ড অ্যালকিল—অ্যালকোক্সাইড্‌স্ অফ মেটালস্ অ্যাণ্ড মেটালয়েডস্,' ভূতত্ত্ব ও ভূগোল শাখার সভাপতি অধ্যাপক আর. এল. সিং বলেন 'মরফোমেট্রিক অ্যানালিসিস্ অফ টেরেন,' প্রাণিবিদ্যা ও কীটতত্ত্ব শাখার সভাপতি অধ্যাপক শিবতোষ মুখোপাধ্যায় আলোচনা করেন 'সেল্‌স্ ইন টাইম অ্যাণ্ড ডিফারেনসিয়েশন, গণিত শাখার সভাপতি ইউ. এন. সিং আলোচনা করেন. 'জেনারেলাইজ্‌ড্ ফাংকশন, জেনারেলাইজ্‌ড্ ফোরিয়ার ট্রান্সফরম অ্যাণ্ড দেয়ার অ্যাপ্লিকেশন', কৃষি-বিজ্ঞান শাখার সভাপতি অধ্যাপক বিশ্বনাথ সাহু বলেন, 'ভারতকে ক্ষুধা থেকে রক্ষায় কৃষি-বিজ্ঞানীর সুযোগ-সুবিধা', ভেষজ ও পশু-বিজ্ঞান শাখার সভাপতি অধ্যাপক অমিয়ভূষণ চৌধুরী আলোচনা করেন 'অক্যাল্‌ট্ পরজীবী ও মানুষের উপর তার প্রতিক্রিয়া' এবং নৃতত্ত্ব ও পুরাতত্ত্ব শাখার সভাপতি ডাঃ অচ্যুতকুমার মিত্র বলেন খাদ্য বিপ্লবের সংগঠক এবং উত্তর পশ্চিম ভারতের কৃষিজীবী সম্প্রদায়' সম্পর্কে।

ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের বার্ষিক অধি-বেশনে বিদেশের বিভিন্ন রাষ্ট্রের বিশিষ্ট বিজ্ঞানীদের যোগদান ও অংশগ্রহণ হচ্ছে একটি প্রধান অঙ্গ। এবারও তার ব্যতিক্রম হয় নি। বিশ্বের বারোটি রাষ্ট্র থেকে সর্বসমেত ২৭ জন বিশিষ্ট বিদেশী বিজ্ঞানী এবারের অধিবেশনে যোগদান করে-ছিলেন। আফগানিস্থান থেকে এসেছিলেন ডাঃ মহম্মদ নুরী এবং মিঃ মহম্মদ আজম জেয়ার; সিংহল থেকে ডাঃ ডি. ভি. ডাবলিউ আবেগুণবর্ধন এবং মিঃ পি এ. জে. রত্নশ্রী; ডেনমার্ক থেকে অধ্যাপক বার্ণার্ড পেটারস্; ফ্রান্স থেকে ডাঃ পি লেপিন; জার্মান সাধারণতন্ত্র থেকে ডাঃ জর্জ মেলচারস, অধ্যাপক এইচ. জে. হোরস্তাথ এবং ডাঃ পল গ্রেগস্; হাঙ্গেরী থেকে অধ্যাপক আরতুর হর্ণ এবং অধ্যাপক ইস্তভান কোভাক্স; জাপান থেকে ডাঃ শোজিরো উয়েও; মালয়েশিয়া থেকে ডাঃ জে. এ. বুলক্স; পোল্যাণ্ড থেকে অধ্যাপক স্কিয়েলেভস্কি; যুক্তরাজ্য থেকে ডাঃ জে. এস. ফরেষ্ট এবং অধ্যাপক এম. বি. উইলকিন্স; মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে ডাঃ জোসেফ মায়ার, ডাঃ শ্রীমতী মারিয়া মায়ার, ডাঃ ওয়েষ্টন অ্যাণ্ডারসন এবং অধ্যাপক আর. দে. ঘোডিন এবং সোভিয়েট রাশিয়া থেকে এসেছিলেন নোবেল পুরস্কার বিজয়ী অ্যাকাডেমিশিয়ান এ. এম. প্রখোরভ, অ্যাকাডেমিশিয়ান পি. এন. ফেডোসিয়ে-য়েভ, অ্যাকাডেমিশিয়ান ভি. এম. গলুশকোভ, অ্যাকাডেমিশিয়ান এ. এস. সাদিকোভ,

অ্যাকাডেমিশিয়ান এম. এম. শিয়েমিয়াকিন, ডাঃ এস. জি. কোর্ণিয়েয়েক এবং মিঃ ভি. আই. একাচেনকো।

এঁদের মধ্যে অধ্যাপক প্রখোরফ এবং ডাঃ অ্যাণ্ডারসন পদার্থ-বিজ্ঞান শাখায়, অধ্যাপক সাদিকোফ, অধ্যাপক শিয়েমিয়াকিন এবং ডাঃ উয়েও রসায়ন-বিজ্ঞান শাখায়, অধ্যাপক উইলকিন্স প্রাণিবিদ্যা ও কীটতত্ত্ব এবং উদ্ভিদ-বিজ্ঞান শাখায়, ডাঃ লেপিন ভেষজ ও পশু-বিজ্ঞান শাখায়, অধ্যাপক গলুশকোফ এবং ডাঃ ফোরেষ্ট যন্ত্রবিদ্যা ও ধাতুতত্ত্ব শাখায় কয়েকটি বিশেষ বক্তৃতা এবং অধ্যাপক ফোডোসিয়েয়েক ও ডাঃ মেলচারস দুটি লোকরঞ্জন বক্তৃতা প্রদান করেন।

বিদেশাগত বিজ্ঞানীরা ছাড়া কয়েক জন বিশিষ্ট ভারতীয় বিজ্ঞানীও প্রতি বছর বিশেষ বক্তৃতা দিয়ে থাকেন। এই বছর চন্দ্রকলা হোরা স্মারক-বক্তৃতা প্রদান করেন ডাঃ বি. এস. ভীমাচার। তাঁর আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল 'ভারতে মৎস্য গবেষণার উন্নয়ন'। মূল সভাপতি অধ্যাপক শেষাদ্রি একটি লোকরঞ্জক বক্তৃতা দেন 'প্রকৃতিজ দ্রব্যের রসায়নে কয়েকটি মূল্যবান উন্নতি' সম্পর্কে। ডাঃ বিষ্ণুপদ মুখোপাধ্যায় এবার চতুর্থ বার্ষিক বীরেশচন্দ্র গুহ স্মারক-বক্তৃতায় 'বিজ্ঞান ও ক্যান্সার সমস্যা' সম্বন্ধে আলোচনা করেন। প্রবীণ রসায়ন-বিজ্ঞানী ডাঃ নীলরতন ধর 'বিশ্বের খাদ্য পরিস্থিতি' সম্পর্কে একটি মনোজ্ঞ বক্তৃতা দেন। তাঁর এই বক্তৃতাটি যেমন তথ্যের দিক থেকে, তেমনি প্রাঞ্জলতা ও সরসতায় সকলকে মুগ্ধ করে। অধ্যাপক আর. কে. শাকসেনা চতুর্থ বার্ষিক মুন্দকর স্মারক বক্তৃতা দেন। ডাঃ নরেন্দ্রনাথ সাহা আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু স্মারক বক্তৃতা প্রদান করেন। তাঁর আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল 'জৈব অণুর গঠনশৈলী ও কার্যকারিতা'। এছাড়া যাঁরা বিশেষ বক্তৃতা দেন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন ডাঃ পি. আর. রাও, ডাঃ জি. এস. সিধু, ডাঃ এম. কে. সিঙ্গাল এবং অধ্যাপক এস. কে. একম্বারম।

এবছর যে সব আলোচনা-চক্র আয়োজিত হয়েছিল, তার মধ্যে দুটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য—একটি হচ্ছে 'বিজ্ঞান ও সামাজিক অবস্থার পারস্পরিক সম্পর্ক' এবং দ্বিতীয়টি 'ভূগর্ভের উপরের স্তর প্রকল্প' বিষয়ে। শেষোক্ত আলোচনাটি আয়োজিত হয় ভূপদার্থিক গবেষণা বোর্ড, ভূপদার্থিক গবেষণা ইনষ্টিটিউট, ভারতীয় ভূপদার্থিক ইউনিয়ন, ভারতের ভূতত্ত্ব সমিতি, ভূতত্ত্ব সমীক্ষা এবং বিজ্ঞান কংগ্রেসের ভূতত্ত্ব ও ভূগোল শাখার যুক্ত উদ্যোগে এবং বহিরাগত কয়েকজন বিশিষ্ট বিজ্ঞানীও এতে অংশ গ্রহণ করেন।

প্রতি বছরের মত এবারও সারাদিনের গুরুগম্ভীর আলোচনার পর কয়েক দিন সন্ধ্যায় আনন্দানুষ্ঠানের দ্বারা চিত্তবিনোদনের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। ৪ঠা জানুয়ারী দক্ষিণ ভারতের আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্না নৃত্যশিল্পী কুমারী যামিনী কৃষ্ণমূর্তি পরিবেশন করেন ভারতের নৃত্যাবলী। তাঁর অনুষ্ঠান-সূচীতে ছিল, ভারত-নাট্যম, ওড়িশি ও কুচিপুরী নৃত্য। ৬ই জানুয়ারী বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিক্যাল ক্লাসের ছাত্রী কুমারী অখিলেশ্বরীও কুচিপুরী নৃত্য প্রদর্শন করেন এবং তারপর অন্ধ্র প্রদেশের বিশিষ্ট কাওয়ালী গায়ক জনাব আজিজ আহমেদ খাঁ উরসী সঙ্গীত পরিবেশন করেন। কুমারী যামিনী কৃষ্ণমূর্তি ও অখিলেশ্বরীর অনবদ্য নৃত্যকলা এবং আহমেদ খাঁর দরাজ কণ্ঠের কাওয়ালী সঙ্গীত আমাদের বিশেষ আনন্দ দিয়েছিল। কিন্তু ৫ই জানুয়ারীতে পরিবেশিত লক্ষ্ণৌয়ের শশিভূষণ বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের 'চণ্ডালিকা' বাংলা নৃত্যনাট্য সর্বতোভাবে আমাদের হতাশ করেছিল। বাঙালী প্রতিনিধিদের তো কথাই নেই, দক্ষিণ ভারতের বহু রসজ্ঞ দর্শককেও বলতে শুনেছিলাম—'এই কি রবীন্দ্রনাথের নৃত্যনাট্য!' জানি না কি কারণে রবীন্দ্রনাথের সুখ্যাত নৃত্যনাট্যের এই অসার্থক

প্রয়াসকে অনুষ্ঠান-সূচীর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। এই সব আনন্দানুষ্ঠান ছাড়া বৃটিশ কাউন্সিলের সৌজন্যে কয়েকটি আকর্ষণীয় চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হয়। ওস্‌মানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ এবং অভ্যর্থনা সমিতি ছুটি প্রীতিসম্মেলনে প্রতিনিধি ও বিদেশীয় অতিথিদের আপ্যায়িত করেন।

হায়দরাবাদ শহর ও আশেপাশের দ্রষ্টব্যগুলি প্রতিনিধিদের দেখাবার ব্যবস্থা করেছিলেন অভ্যর্থনা সমিতি। হায়দরাবাদের সালার জঙ মিউজিয়ামের সুখ্যাতি অনেকদিন আগেই শুনেছিলাম। এবার সেটি স্বচক্ষে দেখবার সুযোগ হয়েছিল। এই মিউজিয়ামের অতুলনীয় শিল্প সংগ্রহ দেখে দর্শকমাত্রেই বিস্ময়াবিষ্ট হন এবং আমরাও হয়েছিলাম। দীর্ঘ চার ঘণ্টা ধরে ১১টি কক্ষ ঘুরে দেখেও সব জিনিষ ভালভাবে দেখা হলো না বলে মনে হয়েছিল। শহরদর্শনের সূচীতে ইতিহাস-প্রসিদ্ধ গোলকুণ্ডা দুর্গ, চারমিনার, মক্কা মস্‌জিদ, হাইকোর্ট, ওস্‌মানিয়া হাসপাতাল, ঝোলানো বাগান, হিমায়েত সাগর ও সেকেন্দ্রাবাদ দেখবার সুযোগ হয়। আর একদিনের ভ্রমণ-সূচীতে হায়দরাবাদ থেকে প্রায় ১০০ মাইল দূরে কৃষ্ণানদীর উপর নির্মীয়মান নাগার্জুনসাগর বাঁধ দেখতে পেয়েছিলাম। বিজ্ঞান কংগ্রেসের অধিবেশনকালে হায়দরাবাদে একটি নিখিল ভারত শিল্প প্রদর্শনীর উদ্বোধন হয়। এই সুযোগে সেটিও আমরা দেখেছিলাম। এই বিরাট সম্মেলন আয়োজনের জন্যে অভ্যর্থনা সমিতি ধন্যবাদার্হ।

তাঁদের সকল ব্যবস্থাপনায় আমরা পরিতুষ্ট হতে পেরেছিলাম বলতে পারলে খুবই সুখী হতাম। কিন্তু এবার প্রতিনিধিদের অসন্তোষের নানা কারণ ঘটেছিল। এবারে অধিবেশনে আমাদের এমন কয়েকটি মর্মান্তিক অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে হয়েছিল, যা ইতিপূর্বে কোন অধিবেশনে হয় নি।

উপগ্রহের কক্ষপথ

গোপীনাথ সরকার

অজানাকে জানবার, না-দেখাকে দেখবার কৌতূহল মানুষের চিরকালের। তাই জল-স্থল-অন্তরীক্ষে আজ তার দুর্বার অভিযান। তার হুকুমে কৃত্রিম উপগ্রহ ও রকেট মহাশূন্যের বুক চিরে উদ্ঘাটন করছে অনন্ত রহস্য ও নিয়ে আসছে নতুন নতুন তথ্য।

সূর্যের চারদিকে ঘুরে চলেছে গ্রহ, আর গ্রহের চারদিকে উপগ্রহ। যে কোন সময়ে সূর্য থেকে গ্রহের দূরত্ব r হলে, সূর্যের দিকে গ্রহের ত্বরণ হবে $\frac{\mu}{r^2}$ আর এই সময় গ্রহের গতি-বেগের বর্গ v^2 হচ্ছে $\frac{2\mu}{r}$ থেকে ছোট। ফলে গ্রহের কক্ষপথ উপবৃত্তাকার। যদি এমন হতো যে, v^2, $\frac{2\mu}{r}$-এর সমান বা বড়, তাহলে গ্রহ ছুটে চলতো অধিবৃত্তাকার বা পরাবৃত্তাকার পথে। সাধারণভাবে বলা যায় যে, যদি কোন বস্তু বিশ্বের সকল বস্তুর আকর্ষণের বা প্রতিরোধের বাইরে থেকে চলতে পারতো, তাহলে অনন্তকাল ধরে অব্যাহত গতিতে সোজাপথে চলতে পারতো। আর কোন আকর্ষণ বা প্রতিরোধের মধ্যে এসে পড়লেই এর গতিপথ যাবে বেঁকে।

পৃথিবী থেকে যে সব কৃত্রিম উপগ্রহ মহাশূন্যে ছাড়া যায়, তারা হতে পারে দু-রকমের। হয় পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের প্রভাবে পড়ে এর চারদিকে বৃত্তাকার বা উপবৃত্তাকার পথে ঘুরবে; নয়তো পৃথিবীর বাঁধন ছিঁড়ে চলে যাবে চিরদিনের জন্যে, কোন দিনও ফিরে আসবে না। পৃথিবী ছেড়ে গেলেও সূর্যের আকর্ষণমুক্ত না হতে পেরে তার চারদিকে ঘুরতে পারে বা তার আকর্ষণমুক্ত হয়ে সৌরজগৎ পেরিয়ে মহাশূন্যের কোথাও উধাও হতে পারে।

কি ধরণের পথে উপগ্রহ ছুটে চলবে, তা নির্ভর করছে কোন্ গতিতে, কিভাবে তাকে পৃথিবী থেকে ছুড়ে দেওয়া হচ্ছে, তার উপর। সূর্যের আকর্ষণের যে নিয়মে গ্রহ চলে, পৃথিবীর আকর্ষণের সেই নিয়মই উপগ্রহের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। ফলে পৃথিবীর ব্যাসার্ধ R হলে পৃথিবীপৃষ্ঠে মাধ্যাকর্ষণজনিত ত্বরণ হবে $\frac{\mu}{R^2}=g$ অর্থাৎ $\mu=gR^2$।

কাজেই পৃথিবীর কেন্দ্র থেকে r দূরত্বে উপগ্রহের গতিবেগের বর্গ v^2 যদি $\frac{2gR^2}{r}$-এর সমান হয়, তাহলে পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ তাকে ধরে রাখতে পারবে না। ফলে পৃথিবীকে শেষ বারের মত বিদায় জানিয়ে উধাও হতে পারবে অধিবৃত্তাকার পথে, আর কোন দিনও ফিরবে না। পৃথিবীপৃষ্ঠ থেকে অবশ্য সেকেণ্ডে ৭ মাইল বা ঘণ্টায় ২৫২০০ মাইল বেগে ছুড়ে দিলেই উপগ্রহটি চিরদিনের জন্যে বিদায় নেবে। সেজন্যে এই গতিবেগকে বলা হয় 'এস্কেপ ভেলোসিটি' বা নির্গমন বেগ।

আর v^2 যদি $\frac{2gR^2}{r}$ থেকে বড় হয়, তাহলে? পৃথিবী বৃথাই উপগ্রহটিকে বেঁধে রাখবার চেষ্টা করবে। সব বাঁধন ছিঁড়ে সে উধাও হবে মহাশূন্যে পরাবৃত্তাকার পথে। পৃথিবী পৃষ্ঠ থেকে সেকেণ্ডে ৭ মাইলের বেশী বেগে যেতে পারলেই এটা সম্ভব। পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ থেকে মুক্তি পাবে বটে, কিন্তু সূর্যের আকর্ষণমুক্ত হওয়া সহজ নয়। ফলে সূর্যের চারদিকে ঘুরতে থাকবে। সূর্যের প্রবল আকর্ষণ থেকে মুক্তি পেতে হলে দরকার প্রচণ্ড গতির। যদি কল্পনা করা যায় যে, উপগ্রহটি সেকেণ্ডে প্রায় ২৭ মাইল বা ঘণ্টায় ৯৭২০০ মাইল বেগে স্থির পৃথিবী থেকে ছুট দিয়েছে, তাহলে সৌরজগতের বাইরে চলে যেতে পারবে।

এখন v^2 যদি $\frac{2gR^2}{r}$ থেকে ছোট হয়, তাহলে কোন্ পথে ছুটবে?

এক্ষেত্রে পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ উপগ্রহটিকে ধরে রাখতে পারবে এবং সেটি উপবৃত্তাকার পথে পৃথিবীর চারদিকে ঘুরতে থাকবে। এই উপবৃত্তের একটা 'ফোকাস' বা উপকেন্দ্র থাকবে পৃথিবীর কেন্দ্রে আর অন্যটি থাকবে—যেখান থেকে উপগ্রহটি ছাড়া হচ্ছে, তার কাছাকাছি। পৃথিবীপৃষ্ঠ থেকে সেকেণ্ডে ৭ মাইলের কম বেগে ছুড়ে দিলে এই ধরণের কক্ষপথ হয়।

বৃত্তাকার কক্ষপথেও উপগ্রহটি পৃথিবীর চারদিকে ঘুরতে পারে। তবে এক্ষেত্রে নির্ধারিত দূরত্বে যা নির্গমন গতি হবে, বৃত্তাকার পথের জন্যে গতিবেগ হবে তার ০.৭০৭ গুণ। তাছাড়া পৃথিবীর কেন্দ্র ও উপগ্রহের উৎক্ষেপণ-স্থান সংযুক্ত সরলরেখার সঙ্গে সমকোণ করে উপগ্রহটিকে উৎক্ষেপণ করতে হবে। এই নিয়মে পৃথিবীপৃষ্ঠ থেকে উৎক্ষেপণ করলে সেকেণ্ডে প্রায় ৫ মাইল গতিবেগ দরকার। আর চাঁদের দূরত্বে গতিবেগ হবে সেকেণ্ডে '৬৪ মাইল।

'নির্গমন বেগের' চেয়ে কম গতিবেগ দরকার বৃত্তাকার কক্ষপথের জন্যে। সেজন্যে এটা অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য বলে মনে হতে পারে। কিন্তু এর অসুবিধা হচ্ছে এই যে, একটা আবর্তন

সম্পূর্ণ করবার আগেই উপগ্রহটি পৃথিবীতে এসে ধাক্কা খায়। কাজেই দুই ধাপে গতিবেগ বাড়িয়ে একে নির্ধারিত উচ্চতায় তোলা হয়। রকেটের সাহায্যে উপগ্রহটিকে সোজা লম্বভাবে নির্দিষ্ট উচ্চতায় তুলে সমকোণ করে নিক্ষেপ করলে সেটি বৃত্তাকার পথে আবর্তন সুরু করে। অবশ্য অন্য পদ্ধতিও রয়েছে। এতে উপগ্রহটিকে লম্বভাবে না তুলে দিগন্তের দিকে নিক্ষেপ করে বিভিন্ন ধাপে গতিবেগ বাড়িয়ে নির্ধারিত বৃত্তাকার কক্ষে স্থাপন করা হয়। অধিবৃত্তাকার পথে পৃথিবীর মহাকর্ষের বাইরে চলে যেতে যে শক্তির প্রয়োজন, তার চেয়েও বেশী শক্তির প্রয়োজন হতে পারে কয়েকটি বৃত্তাকার পথের জন্যে। এদের দূরত্ব হবে পৃথিবীর ব্যাসার্ধের প্রায় ৩½ গুণের বেশী।

চাঁদ উপগ্রহ হয়ে পৃথিবীর চারদিকে ঘুরছে। এর কক্ষপথ প্রায় অনেকটা বৃত্তাকার। আর গতিবেগ হচ্ছে সেকেণ্ডে ·৬৪ মাইল। পৃথিবীর মহাকর্ষ ছেড়ে চলে যেতে হলে এর গতিবেগ হওয়া দরকার সেকেণ্ডে প্রায় ১ মাইল (·৯০৮ মাইল)। এর আকর্ষণও পৃথিবীর তুলনায় অনেক কম। সেজন্যে সেকেণ্ডে মাত্র ১½ মাইল বা ২·৪১ কিলোমিটার গতিবেগে চাঁদ ছেড়ে আসতে পারলেই এর প্রভাবমুক্ত হয়ে মহাশূন্যে উধাও হওয়া যায়। পৃথিবী যদি হঠাৎ তার আকর্ষণী শক্তি হারায়, তাহলে চাঁদের কি হবে? চাঁদের উপর পৃথিবীর যা আকর্ষণ, তার দ্বিগুণ আকর্ষণ সূর্যের। তাই চাঁদ তখন আর পৃথিবীর চারদিকে ঘুরবে না। সূর্যের চারদিকে ঘুরতে থাকবে এমন একটা পথে, যেটা পৃথিবীর বর্তমান কক্ষপথের অনেকটা অনুরূপ। পক্ষান্তরে সূর্য তার আকর্ষণী শক্তি হারালে পৃথিবী ও চাঁদ একসঙ্গে মহাশূন্যে উধাও হবে। আর তাদের আপেক্ষিক কক্ষপথের খুব সামান্যই পরিবর্তন ঘটবে।

কৃত্রিম উপগ্রহের কক্ষপথ মোটামুটি ঠিক থাকলেও কোন সময় পৃথিবী থেকে দূরে সরে যায়, কোন সময় বা পৃথিবীর দিকে সরে আসে। ফলে বৃত্তাকার কক্ষপথের অল্পবিস্তর পরিবর্তন ঘটে। আবার কক্ষপথে প্রতিরোধ-শক্তি থাকলে এর গতিবেগ যায় বেড়ে ও বৃত্তাকার পথের ব্যাসার্ধ যায় কমে। অবশ্য দু-একটা আবর্তনে এই পরিবর্তন বোঝা যায় না। বেশ অনেকগুলি আবর্তনে এই পরিবর্তন ধরা পড়ে। এই ভাবে গতিবেগ ও ব্যাসার্ধ ক্রমাগত পরিবর্তনের ফলে উপগ্রহ তার কক্ষ-গতি হারিয়ে ফেলে অবশেষে পৃথিবীতে এসে ধাক্কা খাবে।

সঞ্চয়ন

সৌর আবহাওয়া পর্যবেক্ষণ

১লা মার্চ,'৭১ ক্যালিফোর্ণিয়ার পয়েন্ট আর্গুয়েলের ওয়েষ্টার্ণ টেষ্ট রেঞ্জ থেকে আমেরিকান স্কাউট রকেটের সাহায্যে প্রথম ইউরোপীয় যুক্ত মহাকাশ গবেষণা উপগ্রহটি উৎক্ষিপ্ত হয়েছে।

ঠিক এই সময়ে উপগ্রহটিকে উৎক্ষেপণের একটা বিশেষ তাৎপর্য আছে। একমাত্র উচ্চযানের আন্তর্জাতিক সহযোগিতাই ইউরোপীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থার প্রথম উপগ্রহ উৎক্ষেপণ প্রকল্পকে সম্ভব করতে পারে। এই কারণে পরিকল্পনা অনুযায়ী সবকিছু কাজ সুষ্ঠুভাবে নির্বাহ করবার জন্যে বৃটেন, ফ্রান্স, হল্যাণ্ড ও যুক্তরাষ্ট্র একযোগে কাজ করে যাচ্ছে।

উৎক্ষেপণ সময়ের গুরুত্বের বিষয় বুঝতে হলে পরীক্ষার বিষয়গুলি জানতে হবে। সংখ্যায় এরা সাতটি। পাঁচটি করবেন বৃটেনের বিশ্ববিদ্যালয় দলগুলি ও একটি করবেন ফ্রান্সের পারমাণবিক বিজ্ঞান গবেষণাগার সেন্টার দেতুদে নিউক্লের ড স্যাকলে, আর একটি করবেন উট্রেখ্‌ট্‌ বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাচ গবেষক কর্মীবৃন্দ। এঁদের সকলেরই গবেষণা মহাকাশ থেকে পৃথিবীর দিকে আগত ইলেকট্রোম্যাগ্‌নেটিক বিকিরণ সম্পর্কে। অধিকাংশ বিকিরণ রশ্মি আসে সূর্য থেকে, তবে কিছু আসে খুবই দূর থেকে। যেখান থেকেই তারা আসুক না কেন, সূর্য নিজের ম্যাগ্‌নেটিক ফিল্ডের সাহায্যে তাদের প্রভাবিত করে। সূর্যের উপর মাঝে মাঝে যে প্রবলভাবে ক্রিয়াশীল অঞ্চলের সৃষ্টি হয়, তাদের সৌরকলঙ্ক বলা হয়ে থাকে। তাদের সঙ্গে সূর্যের এই ম্যাগ্‌নেটিক ফিল্ডগুলি ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত। সূর্যের ম্যাগ্‌নেটিক ফিল্ডগুলি সেই সব অঞ্চল থেকে সূর্য-পরিক্রমারত গ্রহগুলি পর্যন্ত বিস্তৃত।

বিদ্যুৎ-শক্তিযুক্ত কণার উপর ম্যাগ্‌নেটিক ফিল্ডের ক্রিয়া ঘটতে থাকে। প্রধানতঃ কণাগুলির গতি ও যাত্রাপথ বদ্‌লে যায়। সূর্যের ফিল্ডটি খুবই খেয়ালী। দশ বছর সৌরকলঙ্কের হ্রাস-বৃদ্ধির যে চক্র দেখা যায়, প্রধানতঃ সূর্যের ফিল্ডের খেয়ালীপনা তারই উপর নির্ভর করে। দশ বছর অন্তর এক বছর সৌরকলঙ্কের আধিক্য ঘটে। এই সময়কে বলা যায় 'সূর্যের গ্রীষ্মকাল'। এই শেষ 'গ্রীষ্ম' গিয়েছে ১৯৫৭-৫৮ সালে 'আন্তর্জাতিক ভূ-বিজ্ঞান বৎসরে'। সূর্যের দুই গ্রীষ্মের মধ্যবর্তী কালে সৌরকলঙ্কের সংখ্যা সবচেয়ে কম থাকে। সূর্যে যখন গণ্ডগোল উপস্থিত হয়, তখন সেখানে আগুন জ্বলে ওঠে, সৌরকলঙ্কগুলির মধ্যে বিস্ফোরণ ঘটে—অনেকটা বিরাটাকার পারমাণবিক বোমা বিস্ফোরণের মত। এর ফলে প্রচুর পরিমাণ দ্রুতগতিসম্পন্ন অতি উত্তপ্ত গ্যাস বের হয়ে আসে। এই গ্যাসের অধিকাংশই হাইড্রোজেন (সূর্যে এবং সর্বত্র সর্বাধিক দৃষ্ট উপাদান)। কিন্তু বিস্ফোরণের ফলে এই আয়নিত গ্যাস ভেঙ্গে যায় ও ইলেকট্রনবর্জিত হয়ে শুধু নিউট্রন ছেড়ে দেয়। এই গ্যাসের একটা বড় অংশ অনুরূপ ভগ্ন হিলিয়াম।

আয়নিত গ্যাস বা প্লাজ্‌মা মহাকাশে ছড়িয়ে পড়ে সেকেণ্ডে ২০০০ কিলোমিটার গতিতে এবং যেখানে যায়, সেখানে ম্যাগ্‌নেটিক ফিল্ডকেও প্রসারিত করে দেয়। এই ব্যাপারটাকে 'সূর্যের বায়ু-প্রবাহ' নাম দেওয়া হয়েছে। উপলখণ্ডের উপর দিয়ে জলস্রোতের

মত এই বায়ু-প্রবাহ ছড়িয়ে পড়ে গ্রহগুলির চতুর্দিকে। এখানে তার একটি ম্যাগ্‌নেটিক ফিল্ডের সঙ্গে দেখা হয়—যেমন ধরুন, পৃথিবীর ম্যাগ্‌নেটিক ফিল্ড—এখানে সে কিছু কণা হারায়। এই পথে আগত কণাগুলির গতি শুদ্ধ বা পরিবর্তিত হয়। একটি মজার ব্যাপার হলো এই যে, প্রবল সৌর বায়ু-প্রবাহের একেবারে মাঝামাঝি গিয়ে দাঁড়ালে একগাছি চুলও নড়বে না।

এদিকে সৌর ঝড়ের শীর্ষ সময়ে জটিল এবং বহু প্রসারিত সব ক্রিয়া চলতে থাকে। পরিক্রমারত কৃত্রিম উপগ্রহ এই ক্রিয়া-প্রক্রিয়া প্রত্যক্ষ করলে এমন সব তথ্য উদ্‌ঘাটিত হবে, যা বিজ্ঞানীরা পৃথিবীর পরমাণু ভাঙবার যন্ত্রের সাহায্যেও এযাবৎ লক্ষ্য করতে পারেন নি। এই সব বৃহৎ যন্ত্রের আংশিক ব্যয়েই মানুষ প্রকৃতির পরীক্ষা থেকে লাভবান হতে পারে।

গত সৌর গ্রীষ্মের সময় মহাকাশ গবেষণা শৈশব অবস্থায় ছিল, সৌর বায়ু-প্রবাহের কথাও অজানা ছিল। ১৯৬৮ সাল হবে প্রথম সৌর গ্রীষ্ম, যখন মহাকাশে যন্ত্রসমন্বিত কৃত্রিম উপগ্রহ সূর্যে অগ্নিকাণ্ডের প্রতিক্রিয়া ধরতে পারবে।

পৃথিবীর কাছাকাছি পরিবেশে যেখানে কৃত্রিম উপগ্রহ প্রধানতঃ চলাফেরা করে, সেখানে কি ঘটে ?

বড় রকমের অগ্নিকাণ্ড না ঘটলেও সূর্য থেকে নিকটবর্তী বিন্দুতে তার ক্রিয়ার আধিক্য অর্থাৎ সৌরমণ্ডলে বিস্তৃত চৌম্বক ক্ষেত্র গ্রহমণ্ডলীর বাইরে থেকে প্রবেশকারী বিদ্যুৎযুক্ত (Charged) কণিকার উপর আরও বেশী পরিমাণে ক্রিয়া করবে। এই কণিকার কিছু অংশ পৃথিবীর পরিবেশের মধ্যেও এসে পড়ে। এগুলিকে মহাজাগতিক রশ্মি (Cosmic rays) বলা হয়। কারণ এগুলি বিশ্বের বহু দূর প্রান্ত থেকে আসে—ঠিক কোথা থেকে এবং কেমন করে আসে, তা জানা যায় না। এদের কিছু নিশ্চয়ই আসে কোটি কোটি নক্ষত্র নিয়ে গঠিত এবং লক্ষ লক্ষ আলোক-বর্ষ দূরে অবস্থিত ছায়াপথ (Galaxy) থেকে। অন্য কিছু 'কসমিক-রে' আসে আরও দূরের নক্ষত্রপুঞ্জ থেকে।

এই উভয় প্রকার মহাজাগতিক রশ্মিই সূর্য থেকে বিচ্ছুরিত পারমাণবিক কণিকার অনুরূপ, কিন্তু পৃথিবীর কাছাকাছি অঞ্চলে তারা সৌরকণিকার তুলনায় সংখ্যায় অনেক কম। এদের প্রধান পার্থক্য শক্তিতে। সৌরকণিকাগুলির শক্তির পরিমাপ করা হয় মিলিয়ন ইলেকট্রন ভোল্ট (Mev) হিসাবে। আর মহাজাগতিক রশ্মির শক্তি পরিমাপ করা হয় সহস্র মিলিয়ন ইলেকট্রন ভোল্ট (Gev) দিয়ে। যদি এর চেয়ে কম শক্তিশালী হতো, তাহলে সেগুলি পৃথিবীতে এসে পৌঁছাতো না। সূর্যের যখন 'গ্রীষ্ম কাল' তখন গ্রহগুলির মধ্যবর্তী সৌরক্ষেত্র দুই প্রকার মহাজাগতিক রশ্মিরই প্রভাব হ্রাস করে। আর যখন সূর্যে অগ্নিকাণ্ড (Flare) ঘটে, তখন এই প্রভাব আরও বেশী রকম পরিলক্ষিত হয়।

পৃথিবীর নিজেরও চৌম্বক ক্ষেত্র রয়েছে প্রায় ৪০,০০০ মাইল পরিব্যাপ্ত। এই এলাকার সৌর-ক্ষেত্রের চেয়ে পৃথিবীর ক্ষেত্রের শক্তি বেশী। এই ক্ষেত্র তুলনামূলকভাবে অচঞ্চল ও নির্দিষ্ট আকারের।

এর ফলে বহিরাগত কণিকাগুলি চৌম্বক ক্ষেত্রের মেরুবিন্দুর (Pole) দিকে ধাবিত হয়—অবশ্য যদি তাদের ক্ষেত্রের মধ্যে প্রবেশ করবার শক্তি থাকে তবেই। বহু কণিকা হটে যায় এবং বহু বন্দী হয়। গত সৌর গ্রীষ্মের সময় প্রথম যন্ত্র সমন্বিত উপগ্রহের মাধ্যমে পৃথিবীর বিকিরণ বলয়ের আবিষ্কারে আমরা এই সব বন্দী কণিকার অস্তিত্বের সাক্ষ্য পেয়েছি। এই বলয়গুলি 'ভ্যান অ্যালান বেল্ট' নামে পরিচিত। কিন্তু এই বলয়-

গুলিতে কণাগুলি কেমন করে আট্কা পড়ে এবং সৌর আবহাওয়ার সঙ্গে তার সম্পর্কের বিষয় স্পষ্ট করে জানা যায় নি।

এর সঙ্গে সৌর অগ্নিকাণ্ডের একটা সম্পর্ক অনুমান করা যায় এবং এটা স্পষ্ট যে, সৌর অগ্নিকাণ্ডের সঙ্গে 'অরোরার' আচরণের সম্পর্ক রয়েছে। মেরুবিন্দুর চতুর্দিকে অরোরার আচরণ লক্ষ্য করা যায়। এথেকে বোঝা যায়—সেখানে আকাশের মাথার অংশ এমনই বিদ্যুৎযুক্ত হয় যে, সে স্থান আলোকিত হয়ে ওঠে। সম্ভবতঃ এরকম আলোকিত হয়ে ওঠবার কারণ—ভ্যান অ্যালান বেল্টে আটক-পড়া কণাগুলির বিপুল পরিমাণে মেরুবিন্দুতে জমা হওয়া। সৌর অগ্নিকাণ্ডজনিত ঝাপ্টায় কণাগুলি বিতাড়িত হয়ে পৃথিবীর মেরুবিন্দুতে এসে জমা হয়।

এই সব জটিলতার বিষয় বুঝাতে গেলে আকাশের উপরে থেকে বিদ্যুৎ-পৃষ্ট কণাগুলির পরিবর্তন এবং একই সময়ে সূর্যের ক্রিয়াকলাপ লক্ষ্য করা প্রয়োজন। এই কাজের জন্যেই প্রথম "এসরো" (ই-এস-আর-ও) কৃত্রিম উপগ্রহ উৎক্ষিপ্ত হয়েছে। পৃথিবীর আবহাওয়া ভূপৃষ্ঠের পক্ষে বিকিরণরোধক বর্মস্বরূপ, কিন্তু এর ওপাশে অদ্ভুত সব কাণ্ড ঘটছে।

ইউনিভার্সিটি কলেজ (লণ্ডন), লিসেস্টার ইউনিভারসিটি টীম ও উট্রেখ্ট্ বিশ্ববিদ্যালয়ের এক্স-রে যন্ত্রপাতি সূর্যের উপর নজর রাখবে। এক্স-রে সৌরকলঙ্ক শক্তির খুব সূক্ষ্ম নির্দেশক। তিনটি ইম্পিরিয়াল কলেজ এবং লীড্স্ ও স্যাক্সের পরীক্ষায় বিভিন্ন পদ্ধতিতে বিদ্যুৎ-পৃষ্ট কণার প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা হবে।

প্রাচীনতম মানুষ

শঙ্কর চট্টোপাধ্যায়

মানবজাতির বিবর্তনের ধারা খুঁজতে গিয়ে বিজ্ঞানীরা আজ একথা স্বীকার করেন যে, কোন এক উন্নত ধারার বনমানুষ থেকে আজকের সভ্য মানুষের উদ্ভব হয়েছিল। বনমানুষ থেকে মানুষের বিবর্তনের টুক্‌রা টুক্‌রা ইতিহাস বিজ্ঞানীরা পর পর সাজাতে বসেছেন। পাথরের স্তর থেকে খুঁজে বের করেছেন নিদর্শন। জীবজগতের ইতিহাসে মানুষের অস্তিত্ব একেবারে নতুন যুগের হলেও শিলালিপিতে তার নিদর্শন দুষ্প্রাপ্য। হয়তো সব ইতিহাস উদ্‌ঘাটিত হয় নি বলে অনেক কিছু অস্পষ্ট হয়ে আছে। মানুষের এই পূর্বপুরুষ খোঁজবার তাগিদে বহু বিজ্ঞানীই ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছেন।

মানুষের নিজেকে জানবার এক স্বাভাবিক আকর্ষণ ও দুর্বলতা আছে। তাই যখন কোন নতুন ফসিল-মানুষ আবিষ্কারের কথা জানা গেছে, তখন তাকে প্রাচীনতম বলে স্বীকৃতি দেবার এক স্বাভাবিক চেষ্টা হয়েছে। হয়তো পরবর্তী কালের আবিষ্কারে সে ধারণা বদ্‌লে গেছে। এমন কি, মাথার খুলি জাল করে 'পিল্টডাউন' মানুষকে মানুষের পূর্বপুরুষ বলে চালাবার চেষ্টা হয়েছিল।

জার্মেনীর নিয়াণ্ডার্থাল গিরিপথে ১৮৫৬ সালে এক গুহার মধ্যে পাওয়া গেল নিয়াণ্ডার্থাল মানুষের মাথার খুলি। প্রায় পঞ্চাশ বছর পরে এর এক আস্ত কঙ্কাল আবিষ্কৃত হলো, ফ্রান্সের এক গুহা থেকে। ১৮৬৮ সালে ফ্রান্সের এক চুনাপাথর চূর্ণের সময় আজ থেকে ৩০,০০০ বছর আগেকার ক্রোম্যাগনন মানুষের পাঁচটি আস্ত

কঙ্কাল পাওয়া গেল। ১৮৯০ সালে হল্যাণ্ডবাসী ডক্টর ইউজেন ডুবোয়া আগ্নেয়গিরি বেষ্টিত জাভা-দ্বীপে সোলো নদীর তীরে জাভা-মানুষের ফসিল আবিষ্কার করেন। ১৯২৫ সালে অধ্যাপক রেমণ্ড-ডার্ট দক্ষিণ আফ্রিকার বেচুয়ানাল্যাণ্ড থেকে আবিষ্কার করেন অষ্ট্রেলোপিথেকাস-এর ফসিল। ১৯২৭ সালে পিকিং শহরের কাছে পাওয়া গেল পিকিং-মানুষের ফসিল। প্রতিটি আবিষ্কারই মানব-জাতির বিবর্তনের ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করছে, কিন্তু এরা কেউই প্রাচীনতম মানুষ বলে স্বীকৃতি পায় নি। এদের মধ্যে মানুষ ও বনমানুষের অদ্ভুত সমন্বয় দেখা যায়। আমরা জানি, স্তন্যপায়ী জীবদের মধ্যে যে যত বেশী উন্নত পর্যায়ের জীব, তুলনামূলক ভাবে তার মস্তিষ্ক তত বেশী বৃহত্তর। বনমানুষ ও আজকের মানুষ অর্থাৎ 'হোমো স্যাপিয়েন্স'-এর মধ্যে সবচেয়ে বড় পার্থক্য এই যে, বনমানুষের মস্তিষ্কের আধার প্রায় ৬০০ সি.সি.-এর মত এবং সেই তুলনায় মানুষের ১৬০০ সি. সি। এছাড়া প্রথম মানুষ উপলখণ্ড দিয়ে ধারালো হাতিয়ার তৈরি করতে শিখেছিল। বনমানুষ তা পারে নি। তাই ফসিল-মানুষের সঙ্গে যদি সেই যুগের হাতিয়ার পাওয়া যায়, তবে তাকে মানুষের পূর্বপুরুষ বলতে কোন সংশয় থাকে না।

সম্প্রতি ডক্টর এল. এস. বি. লীকি আফ্রিকার কেনিয়া প্রদেশ থেকে প্রাচীনতম মানুষের ফসিল আবিষ্কারের কথা ঘোষণা করেছেন। আজ থেকে প্রায় দু'কোটি বছর আগেকার আদিম মানুষ 'কেনিয়াপিথেকাস আফ্রিকানাস' আবার নতুন করে আলোড়ন তুলেছে জীববিজ্ঞানী মহলে। ট্যাঙ্গানি-কার জনবিরল অলডুভাই উপত্যকায় লীকি পরিবার ১৯৩১ সাল থেকে তাঁদের অভিযান চালিয়ে যান। এই ফসিল-সজ্জিত উপত্যকার প্রথম সন্ধান পান ১৯১১ সালে একজন জার্মান প্রজাপতি-সংগ্রহকারী। ১৯১৩ সালে জার্মান অধ্যাপক রেকের অধীনে এক প্রাথমিক অভিযান চালান। কিন্তু প্রথম মহাযুদ্ধের সময় কাজ স্থগিত রাখা হয়। বহুদিন পরে ১৯৩১ সালে অধ্যাপক রেক ও ডক্টর লীকি সেই সিংহ, গণ্ডার, কেউটে, হায়েনা অধ্যুষিত জায়গায় অল্প সময়ের জন্যে অভিযান চালান। কঠিন লাভাস্রোতে জমা আগ্নেয় পাথরের উপর সঞ্চিত হয়েছিল পলি। এর মাঝে মাঝে ছড়িয়ে আছে ফসিলের টুক্‌রা। ডক্টর লীকির খুব ভাল লেগে গেল সেই জনবিরল উপত্যকা। তাঁর ধারণা হয়েছিল যে, মানুষের পূর্বপুরুষের নিদর্শন হয়তো এখানে পাওয়া যেতে পারে। সেই থেকে তিনি পাথরের স্তরে স্তরে হারিয়ে যাওয়া প্রায় ১৫০টা লুপ্ত জীবের সন্ধান পেয়েছেন।

ডক্টর লীকি নিত্যনতুন আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে পুরনো ধারণা পরিবর্তন করেছেন। তাঁর এই কাজে সাহায্য করেছেন তাঁর সহধর্মিণী ও সন্তান। ১৯৫৯ সালের ১৭ই জুলাই—ডক্টর লীকি অসুস্থ। মিসেস লীকি সে দিন একাই বেরিয়েছিলেন ফসিলের সন্ধানে। পিচ্ছিল, কর্দমাক্ত পথ—মাঝে মাঝে গাড়ী আটকে যাচ্ছে। কি দেখে তিনি তাড়াতাড়ি ফিরে এলেন ক্যাম্পে। উত্তেজিতভাবে বললেন—আমি পেয়েছি, আমি সেই মানবের সন্ধান পেয়েছি। ডক্টর লীকি সঙ্গে সঙ্গে উঠে পড়লেন সেই আদিম মানুষের ফসিল দেখবার জন্যে। একটা জায়গায় একটা মাথার খুলি পড়ে আছে দেখে ডক্টর লীকি সেটা তুলে ধরলেন। প্রায় তিরিশ বছরের অক্লান্ত সাধনার মূল্যায়ন করবার দিন এসেছে। আনন্দাশ্রু গড়িয়ে পড়লো মিসেস লীকির কপোলে। কয়েক সপ্তাহ ধরে তন্ন তন্ন করে খোঁজা হলো চতুর্দিকে। আরও কিছু হাড়ের সন্ধান পাওয়া গেল। সেই আদিম মানুষের নামকরণ করা হলো 'জিনজ্যানথ্রোপাস'। জিনজ, কথার অর্থ হলো—প্রিয় বালক। ডক্টর

লীকির মতে, জিনজ্যানথ্রোপাস আজকের সভ্য মানুষের ঠিক পূর্বপুরুষ নয়। তারা বনমানুষ অষ্ট্রেলোপিথেকাস-এর সমগোত্রীয়।

সমস্যা দেখা দিল কিছু প্রাগৈতিহাসিক পাথরের হাতিয়ার নিয়ে। বনমানুষ 'জিন্‌জ' এর ব্যবহার জানতো না। কাদের উদ্ভাবনী শক্তিতে এগুলি তৈরি হয়েছিল? তবে কি সত্যই প্রাচীনতম মানুষের সন্ধান পাওয়া যাবে? বেশ কয়েক মাস কেটে গেছে। উপত্যকার স্তর নিরীক্ষায় নিমগ্ন ছিলেন ডক্টর লীকি। পুত্র জনাথন হঠাৎ তাঁর অনুসন্ধানী দৃষ্টি দিয়ে এক টুকরা দাঁত তুলে ধরলেন—'সেবার-টুথ' জাতীয় বাঘের। পূর্ব-আফ্রিকায় প্রথম নিদর্শন পাওয়া গেল ঐ জাতীয় বাঘের। তখন খোঁজবার পালা চললো। খুঁজতে খুঁজতে সবাই বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে পড়েছেন। হঠাৎ মিসেস লীকির চোখ দুটা যেন অস্বাভাবিক উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। এ তো বাঘের দাঁত নয়—কিছু মানুষ জাতীয় জীবের মাথার খুলি···হাতের আঙুল···। খোঁড়া হলো পরিখা। জোর অনুসন্ধান চললো। অনুসন্ধানের ফলে কিছু করোটি, আরও সম্পূর্ণ·· নীচের পাটির চোয়াল···কিছু দাঁত পাওয়া গেল।

উত্তেজনার মধ্যে দিন কাটছে। হঠাৎ একদিন জন্‌ আবিষ্কার করলেন আর একটা নীচের চোয়াল—তাতে তেরটি দাঁত অবিকৃত অবস্থায় লাগানো আছে। ডক্টর লীকি নিঃসন্দেহ হলেন—এরা জিনজ্যানথ্রোপাস-এর চেয়ে অনেক পুরনো দিনের। এরাই কি তবে সেই পাথরের হাতিয়ারের মালিক? ডক্টর লীকি এর প্রাথমিক নামকরণ করেন 'হোমো হাবিলিস' অর্থাৎ হাতুড়ে মানুষ। সবচেয়ে আশ্চর্য—হাতুড়ে মানুষের মস্তিষ্কের আধার জিনজ্যানথ্রোপাস-এর মস্তিষ্কাধারের চেয়ে অনেক বড় এবং নীচের চোয়ালের সঙ্গে আধুনিক সভ্য মানুষের চোয়ালের সাদৃশ্য দেখা গেল।

আজকে সবাই অধীর হয়ে আছে অলডুভাই উপত্যকা থেকে নতুন কিছু শোনবার জন্যে। হাতুড়ে মানুষ আজ বহু বিতর্কিত নাম। এর নিদর্শন পাওয়া গেছে প্রায় চল্লিশটি দাঁত, চারটি মাথার খুলি, দু-পাটি নীচের চোয়াল, হাত ও পায়ের কিছু হাড় আর কণ্ঠাস্থির সাহায্যে। ডক্টর লীকি মনে করেছিলেন, তাঁর হাতুড়ে মানুষই প্রাচীনতম মানুষ বলে দাবী করতে পারে। তিনি এর পোষাকী নামকরণ করেছেন—কেনিয়াপিথেকাস উইকেরী। এই উল্লেখযোগ অবদানের জন্যে রয়েল জিওগ্রাফিক সোসাইটির পক্ষ থেকে তাঁকে স্বর্ণপদক প্রদান করা হয়।

বিস্ময়ের ঘোর কেটে না যেতেই পৃথিবীর সবাই আবার নতুন করে শুনলো কেনিয়াপিথেকাস আফ্রিকানাস-এর কথা। ডক্টর লীকি সংশোধন করে বলেছেন—তাঁর নবতম আবিষ্কার আজ থেকে প্রায় দু'কোটি বছর আগেকার মানুষের এবং কেনিয়াপিথেকাস আফ্রিকানাস যে প্রাচীনতম মানুষ, এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই—হাতুড়ে মানুষের চেয়ে প্রায় এক কোটি বছরের প্রাচীন। নাইরোবি থেকে প্রায় ২৫০ মাইল পশ্চিমে ভিক্টোরিয়া হ্রদের এক দ্বীপে ৯জন পুরুষ, নারী ও শিশুর প্রস্তরীভূত অস্থি-কঙ্কাল পেয়েছেন। ভাবী দিনের মানুষের কাছে হয়তো আরও নতুন আবিষ্কারের সঙ্গে মানবজাতির বিবর্তনের ইতিহাস অনেক স্পষ্ট হয়ে দেখা দেবে।

ভারতের শক্তির উৎস ও তাহার প্রয়োগ

শ্রীমণীন্দ্রকুমার ঘোষ

কোন দেশের লোকপিছু কত শক্তি প্রয়োগ হয়, তাহার উপর সেই দেশের উন্নতি নির্ভর করে। আমাদের প্রয়োজনীয় দ্রব্যসম্ভার প্রস্তুতিতে, যান-বাহন পরিচালনায় এবং আরও নানাভাবে শক্তির প্রয়োগ করা হয়। প্রাচীন কালে প্রাকৃতিক শক্তির উৎসের বিষয় তেমন কিছু জানা ছিল না। সেই জন্য পশু ও মানবদেহের শক্তির সাহায্যে অনেক কাজ চালান হইত। কিন্তু বর্তমান যুগে প্রাকৃতিক শক্তির ব্যবহারই প্রশস্ত। ইহাদের মধ্যে কতকগুলি উৎস সর্বজন-গ্রাহ্য আর বাকি কিছু কিছু ব্যবহৃত হইলেও তাহা চলিত শক্তির উৎসের মধ্যে ধরা হয় না। গ্রাহ্য উৎস হিসাবে নিম্নলিখিত শক্তি ধরা যাইতে পারে—(১) খনিজ কয়লা, (২) খনিজ তেল ও গ্যাস এবং (৩) জলপ্রপাত হইতে উদ্ভূত শক্তি। বর্তমান শতকে পারমাণবিক শক্তির ব্যবহার ক্রমে বৃদ্ধি পাইতেছে। কিন্তু মোট শক্তির তুলনায় তাহার পরিমাণ খুবই কম। ভারতে এই সকল উৎস কি পরিমাণে ব্যবহৃত হয়, তাহার আনুমানিক হিসাব হইল—

	মিলিয়ন টন	মোট ব্যবহৃত শক্তির শতকরা হার
খনিজ কয়লা—	৫৪·৬০	৩৩·০
খনিজ তেল—	৯·৫০	৫·৮
জলপ্রপাত—	০·৯০	০·৬

ইহা ভিন্ন শক্তির উৎস হিসাবে অন্য যাহা কিছু ব্যবহৃত হয়, তাহার পরিমাণও দেওয়া গেল।

গোবর—	৪৬·০০	২৭·৯
কাঠ—	৩৫·০০	২১.২
কৃষিজাত আবর্জনা—	১৯·০০	১১·৫
মোট—	১৬৫·০০	১০০·০

তেল বা অন্য যে সকল পদার্থের উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহা কয়লায় শক্তির তুল্য পরিমাণে দেওয়া হইয়াছে।

এখন দেখা যাউক, অন্য দেশের তুলনায় আমাদের দেশে মাথাপিছু কত শক্তি ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

দেশ—	লোকপিছু বাৎসরিক শক্তির পরিমাণ টন হিসাবে।
আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র—(ইউ.এস এ.)	৮·৬
বৃটেন (ইউ.কে.)—	৫·০
পশ্চিম জার্মেনী—	৩৬
নেদারল্যাণ্ড—	২·৫
ইটালী—	১·১
জাপান—	১·১
ভারত—	০·১

এই সকল সংখ্যায় অবশ্য গ্রাহ্য শক্তির উৎসকেই ধরা হইয়াছে। গোবর প্রভৃতির ব্যবহার ধরিলে ভারতের হিসাবে ০·২ বা ০·৩ টন বৃদ্ধি পাইতে পারে। দেখা যাইতেছে—ইউরোপ ও আমেরিকার তুলনায় ভারতে মাথাপিছু শক্তির পরিমাণ খুবই কম।

আমাদের দেশে শিল্প ও অন্যান্য প্রচেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে এই শক্তির পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে, সন্দেহ নাই। কিন্তু এখন আলোচনা করিয়া

দেখা যাউক, শক্তি বৃদ্ধির সম্ভাবনা কতটা বর্তমান আছে।

গোবর—শক্তি হিসাবে গোবরের প্রয়োগ হয় প্রধানতঃ রান্নার কাজে। মোটামুটি হিসাবে দেখা যায় যে, বৎসরে ১২০০ মিলিয়ন টন কাঁচা গোবর পাওয়া যায়। তাহার মধ্যে ৪০০ মিলিয়ন টন জালানী এবং ১২৫ মিলিয়ন টন সার হিসাবে ব্যবহৃত হয়। বাকিটা নষ্ট হয়।

কাঠ—জালানী হিসাবে ৬০ মিলিয়ন টন কাঠ ব্যবহৃত হয়। এই ৬০ মিলিয়ন টন কাঠ পাইতে হইলে প্রতি বৎসর প্রায় ৩০,০০০ একর বন কাটিয়া সাফ করা দরকার (ধরা যাইতে পারে প্রতি একরে ২০০০ টন কাঠ পাওয়া যাইতে পারে)। ফলে খুব অল্প দিনেই দেশের সমস্ত বনভূমি নষ্ট হইবে এবং ক্রমে মরুভূমিতে পরিণত হইবে। বন বিভাগ শত চেষ্টা করিয়াও এই বাৎসরিক ক্ষতি প্রতি বৎসরে পূরণ করিতে পারিবে না। সুতরাং যত শীঘ্র হয় জালানী হিসাবে কাঠের ব্যবহার বন্ধ করিয়া খনিজ কয়লার ব্যবহার বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।

খনিজ কয়লা—আবিষ্কৃত ও অনাবিষ্কৃত খনিজ কয়লার মোটামুটি হিসাবে আনুমানিক ১২৩০০০ মিলিয়ন টন কয়লা আমাদের দেশে পাওয়া যাইবে বলিয়া আশা করা যায়। ইহা ভিন্ন আরও ২০০০ মিলিয়ন টন লিগ্‌নাইট পাওয়া সম্ভব। এই পরিমাণ সারা পৃথিবীর খনিজ কয়লা-সম্পদের $\frac{1}{২০}$ অংশ বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে—লোকসংখ্যা হিসাবে আমাদের সারা পৃথিবীর $\frac{1}{৬}$ ভাগ। সুতরাং আমাদের দেশে খনিজ কয়লার সম্ভাবনা বেশী মনে হইলেও মাথাপিছু পৃথিবীর গড়পরতা হিসাব হইতে অনেক কম।

জলপ্রপাত—বৈদ্যুতিক কিলোওয়াট হিসাবে ধরিলে ১৯৬৬ সালে মোটামুটি ৫'০১ মিলিয়ন কিলোওয়াট শক্তি উৎপন্ন হইবার সম্ভাবনা। জল-বিদ্যুৎ উৎপন্ন হইবার মোট সম্ভাবনা হিসাব করিলে দেখা যায়, সবগুলি নদ-নদী কাজে লাগাইলে মোট ৪১'১৭ মিলিয়ন কিলোওয়াট শক্তি পাওয়া যাইতে পারে।

খনিজ তেল ও গ্যাস—আমাদের দেশে ইহার সর্বাত্মক সন্ধান চলিতেছে। ক্রমেই দেখা যাইতেছে, এই শক্তির উৎসের সম্ভাবনা প্রচুর। বর্তমানে ইহার মোট পরিমাণ অনুমান করা সম্ভব নয়। এই উৎসের সাহায্যে ১৯৬৬ সালে মোট যে শক্তি উৎপন্ন হইবে, তাহার মোট পরিমাণ ০'৪৪ মিলিয়ন কিলোমিটার।

পারমাণবিক শক্তি—আমাদের দেশে পারমাণবিক শক্তি উৎপাদনের সম্ভাবনা অন্য অনেক দেশ হইতে উজ্জ্বলতর বলিয়া মনে হয়। যে সকল খনিজ পদার্থের সাহায্যে পারমাণবিক শক্তি উৎপন্ন হয়, তাহা আমাদের দেশে অপেক্ষাকৃত বেশী পরিমাণে পাওয়া গিয়াছে। মাদ্রাজ ও কেরলের সমুদ্র-উপকূলে মোনাজাইট পাওয়া যায়, তাহা হইতে ৯'০ শতাংশ-যুক্ত ২০০,০০০ টন থোরিয়ামের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। বিহারেও বহু পরিমাণ ইউরেনিয়াম পাওয়া গিয়াছে। সেখানে যথেষ্ট পরিমাণে এই খনিজ পদার্থের মাইনিংও চলিতেছে। এই সকল খনিজ পদার্থের সন্ধান এখনও চলিতেছে। ভারতে ইহার মোট সম্ভাবনার কথা এখন বলা সম্ভব নয়।

এখানে যে সকল শক্তির উৎসের উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহার প্রায় সবগুলিই ব্যবহারে ক্ষয় প্রাপ্ত হয়; যেমন—খনিজ কয়লা, তেল অথবা থোরিয়াম বা ইউরেনিয়াম প্রভৃতি যাহা আমরা ব্যবহার করি, তাহা আর পুনরায় ফিরাইয়া পাওয়া যায় না। মানুষ আজ পর্যন্ত ইহাদিগকে অল্প সময়ের মধ্যে তৈয়ারও করিতে পারে না। কাজেই পৃথিবীতে এই সকল উৎস এককালে যাহা জমা হইয়াছে, আমরা সেই জমা সম্পদ খরচ করিয়া ক্রমে নিঃস্ব হইতেছি।

প্রোফেসর জেগর ১৯৩০ সালে এক হিসাব

লইয়া বলিয়াছিলেন যে, সারা পৃথিবীতে মোট খনিজ কয়লার পরিমাণ ২০০০ বিলিয়ন টন। ১৯৩০ সালের হিসাব মত সারা পৃথিবীতে প্রতি বৎসর ০.৫ বিলিয়ন টন কয়লা ব্যবহৃত হইত। ১৯৩০ সালে যে সকল দেশ পিছাইয়া ছিল, তাহাদের অনেকেই আজ স্বাধীন হইয়া দেশকে সমৃদ্ধশালী করিবার চেষ্টায় অনেক বেশী কয়লা ব্যবহার করিতেছে। ক্রমে যে তাহা বৃদ্ধি পাইবে, এই বিষয়ে সকলেই নিশ্চিত। এই সকল বিষয় বিচার করিয়া প্রোফেঃ জেগর মনে করেন যে, আমাদের কয়লা-সম্পদ সম্ভবতঃ আর ১০০০ বৎসর আমাদের শক্তি সরবরাহের কাজে লাগিবে।

ইংল্যাণ্ডের ন্যাশন্যাল ফিজিক্যাল লেবরেটরীর কর্তৃপক্ষ এক অনুসন্ধানী কমিটি গঠন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের রিপোর্টে বলা হইয়াছে যে, বর্তমান হারে খরচ হইলে ২০০০ বৎসর পর্যন্ত কয়লার ব্যবহার চলিতে পারে। তাহার পরে আর খনিজ কয়লা পাওয়া যাইবে না। ইংল্যাণ্ডের অবস্থা আরও শোচনীয়—২০০ বৎসর পর্যন্ত চলিতে পারে। তৈল-সম্পদ তার আগেই শেষ হইবে।

জল-শক্তি অবশ্য পৌনঃপৌনিক। ইহার ব্যবহারের পরেও জল আবার বাষ্প হইয়া বৃষ্টিরূপে পৃথিবীতে ফিরিয়া আসিবে—আমাদের নদী-নালা ভরাইয়া দিবে। আমরা তাহার সাহায্যে আবার বিদ্যুৎ উৎপাদন করিয়া কাজ চালাইব। কিন্তু ইহা আর কতটুকু! জল-শক্তি কি আর কয়লার অভাব পূরণ করিতে পারিবে? ১৯৩০ সালের হিসাবে পৃথিবীতে মোট সম্ভাব্য জল-শক্তির ৬ শতাংশ ব্যবহৃত হইত। সম্ভাব্য শক্তি কাজে লাগাইলেও তাহা কেবল আমেরিকার উৎস হইতে ব্যবহৃত শক্তির মাত্র ঃ অংশ হইবে।

বিজ্ঞানীরা ভবিষ্যৎ ভাবিয়া চিন্তিত। ভবিষ্যৎ শক্তির উৎস-সমস্যা সমাধানের চেষ্টায় কলকারেজে তাঁহারা মিলিত হইয়াছেন। তাঁহারা নিম্নলিখিত উৎসগুলি লইয়া পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিতেছেন—

(১) জোয়ার-ভাটার শক্তি।

(২) সমুদ্রের উপরিভাগ এবং গভীরে তাপমাত্রার তারতম্য হইতে অদ্ভুত শক্তি।

(৩) পারমাণবিক শক্তি।

(৪) সৌর শক্তি।

ইহাদের মধ্যে প্রথম দুইটি কেবল লেবরেটরীর পরীক্ষার মধ্যে সীমাবদ্ধ আছে। (৩) পারমাণবিক শক্তির প্রয়োগের চেষ্টা চলিতেছে এবং ইহার ব্যবহারও আরম্ভ হইয়াছে। শান্তির সময়ের কাজে ভারত ইহার ব্যবহার সুরু করিয়াছে। শক্তি উৎপাদনের জন্য দুইটি রিয়্যাক্টর ইতিমধ্যেই চালু হইয়াছে এবং আরও একটি স্থাপনের তোড়-জোড় চলিতেছে (ট্রম্বেতে ইহার সম্বন্ধে সর্বাত্মক গবেষণা চলিতেছে, ধ্বংসাত্মক কাজ বাদে)। কিন্তু ইহার মালমশলাও সীমিত। থোরিয়াম বা ইউরেনিয়াম প্রভৃতি ছাড়া সাধারণভাবে প্রাপ্য কোন পদার্থ হইতে উৎপন্ন করিতে না পারিলে ইহাও খুব বেশী দিন চলিবে না।

তাহা ছাড়া ইহার ব্যবহারে বিপদ আছে। এই সকল পদার্থ হইতে যে সকল রশ্মি নির্গত হয়, তাহা মানুষের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর। হিরোসিমা এবং নাগাসাকির কথা কেহই তোলে নাই। পারমাণবিক বোমায় যে ক্ষতি হয়, অতি অল্প পরিমাণে সেই সকল রশ্মির আঘাতও যথেষ্ট ক্ষতি করে। অনেক বিচক্ষণ জীববিজ্ঞানী এই সম্বন্ধে আমাদিগকে সাবধান করিয়াছেন। বোওয়েভ তাঁহার "The Atomic Age and Our Biological Future" নামক পুস্তকে এই সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—সন্তান জন্মিবার সময় যদি প্রারম্ভেই উৎপাদক সেলে (Cell) পারমাণবিক শক্তি হইতে উদ্ভূত রশ্মির আঘাত লাগে, তবে তাহা তখনই নষ্ট হইয়া যাইবে, সুতরাং ভবিষ্যতের ভয় নাই। কিন্তু

এই রশ্মির প্রভাবে যদি এতটা মিউটেশন হয় যে, সেল অবস্থায় নষ্ট না হইয়া তাহাকে অসম অবস্থায় পরিণত করে, তবে সেই সন্তান জন্মের পরেও উৎপাদনে সক্ষম হইবার পূর্বেই মারা যাইবে। সুতরাং তাহাদের লইয়াও বংশ-বিপত্তির সম্ভাবনা নাই। কিন্তু অনেক মিউটেশন এমন এক ধরণের হয়, যাহার কোন চিহ্ন এক পুরুষে লক্ষ্য করা যায় না। তাহাদের লইয়াই ভবিষ্যৎ জাতিগত বিপত্তি। কারণ এই রশ্মির ক্রিয়া শোধিত হয় না—ক্রমে জমা হইতে থাকে। সুতরাং বংশ হইতে বংশ বৃদ্ধিই পাইতে থাকিবে এবং ক্রমে মানবজাতিকে ধ্বংস করিবে অথবা বিকৃত করিয়া দিবে। পারমাণবিক শক্তি লইয়া যেখানে কাজ হয়, সকলেই এই সম্বন্ধে খুব সজাগ থাকেন এবং মাঝে মাঝেই কর্মীদের পরীক্ষা করা হয়, যাহাতে তাহারা রশ্মি-সম্পাত নির্ভয়-সীমা অতিক্রম না করে। কিন্তু তাহাতেও কতটা বিপদ এড়ান যাইবে, ভবিষ্যৎই তাহা নিরূপণ করিবে। কিন্তু এই কথা ঠিক, আমরা একটা ভবিষ্যৎ বিপদের ঝুঁকি লইয়াই এই দিকে অগ্রসর হইতেছি।

আর এক ভবিষ্যৎ শক্তির উৎস—সৌর শক্তি। সূর্য যে শক্তির উৎস, তাহা বহু প্রাচীন কাল হইতেই আমাদের জানা ছিল। বাস্তবিক পক্ষে আমরা কয়লা প্রভৃতি যে সকল উৎস ব্যবহার করি, তাহাও সূর্য-শক্তি হইতে উদ্ভূত। জল-শক্তি প্রভৃতি বা কাঠ, গোবরও সূর্য-শক্তিরই রূপান্তর। কিন্তু ইহারা পরোক্ষ। সূর্য-শক্তির প্রত্যক্ষ ব্যবহারের সম্ভাবনা প্রচুর। কিন্তু আমাদের বর্তমান সভ্যতায় কেন্দ্রীভূত শিল্প-প্রতিষ্ঠানে সৌর-শক্তির প্রত্যক্ষ প্রয়োগে অনেক অসুবিধা। আমরা খনির কয়লা প্রভৃতি সুবিধাজনক কেন্দ্রীভূত শক্তির উৎস হাতের কাছে পাইয়াছি বলিয়া এই দিকে নজর দেই নাই। ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা ইহার অবশ্যই আছে। আমাদের প্রয়োজনের অনেক বেশী শক্তি আমরা এই উৎস হইতে পাইয়া থাকি। এই পর্যন্ত সারা পৃথিবীতে আমরা যে শক্তি ব্যবহার করিয়া থাকি, প্রতি বৎসরে তাহার মোট পরিমাণ ২১×১০^{১২} কিলোওয়াট। ১৯৬৭ সালে আমেরিকার গভর্ণমেন্ট হিসাব দেখাইয়াছে যে, আমরা ১৬×১০^{১২} কিলোওয়াট পরিমাণ শক্তি কয়লা, তেল প্রভৃতি হইতে পাই এবং বাকি ৫×১০^{১২} কিলোওয়াট খরচ করি মানুষ ও গৃহপালিত পশুর খাদ্য ইত্যাদি রূপে। আমরা সূর্য হইতে প্রতি বৎসর $২\cdot০১ \times ১০^{১৮}$ কিলোওয়াট শক্তি পাইয়া থাকি। সুতরাং দেখা যাইতেছে, আমাদের প্রয়োজনের অনেক বেশী শক্তি পাই সূর্য হইতে। এই শক্তি ভালভাবে কাজে লাগাইতে পারিলে আমাদের কোন দিন শক্তির উৎসের অভাব হইবে না। বিভিন্ন দেশের বৈজ্ঞানিকেরা এই সম্বন্ধে গবেষণায় ব্যাপৃত আছেন এবং কিছু কিছু কার্যকরী পন্থায় সফলও হইয়াছেন। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে সূর্য-শক্তি প্রয়োগে যে খরচ পড়ে, কয়লা প্রভৃতি উৎস হইতে প্রাপ্ত শক্তির খরচের তুলনায় তাহা অনেকটা বেশী। সেই জন্য সৌর শক্তি সর্বাত্মকভাবে এখনও খুব জনপ্রিয় হয় নাই। খরচের প্রশ্ন ছাড়া অন্য অনেক অসুবিধাও আছে।

কোক-চুল্লী

শ্রীগৌতম বন্দ্যোপাধ্যায়

কোক শব্দটির অর্থ হয়তো অনেকেরই জানা আছে বা জানা নেই। যাঁদের জানা নেই তাঁদের জন্যে প্রথমেই কোক জিনিষটি কি, তা বলা প্রয়োজন। কয়লাকে বাতাসের সংস্পর্শে না আসতে দিয়ে যদি উচ্চতাপে উত্তপ্ত করা যায়, তবে যে কালো রঙের শক্ত জিনিষটি পড়ে থাকে, তাকে কোক বলে। সুতরাং সব কয়লা থেকেই কোক পাওয়া যাবে। কিন্তু বর্তমানে কোক শব্দটির অর্থ একটু আলাদা—এটি সব কয়লা থেকে পাওয়া যায় না। প্রথমেই জানা দরকার যে, কয়লার কয়েকটি শ্রেণীবিভাগ আছে। সব কয়লা থেকে একই রকমের কোক পাওয়া যায় না—কখনও বেশ শক্ত ও জমাট জিনিষ পাওয়া যায় আবার কখনও ভঙ্গুর কোক পাওয়া যায়। এটি নির্ভর করে. কয়লার উপর। শক্ত ও জমাট পদার্থকে কোক বলে এবং এই জিনিষটির দাম বর্তমান কালে অপরিসীম। এই কোক না থাকলে লৌহশিল্প গড়ে উঠতো না। সুতরাং যেখানে লৌহশিল্প গড়ে উঠেছে, সেখানেই কোকশিল্প গড়ে উঠেছে। প্রতি টন লৌহ উৎপাদনের জন্যে ০·৮ টন কোকের প্রয়োজন। তৃতীয় পরিকল্পনার পর ভারতবর্ষে ১০ মিলিয়ন টন (১ মিলিয়ন=১০ লক্ষ) লৌহ উৎপাদন হবার কথা—তবে উৎপাদন ১০ মিলিয়ন টনের কিছু কম অবশ্যই হচ্ছে। কারণ বোখারো কারখানা এখনও গড়ে ওঠে নি। চতুর্থ পরিকল্পনায় শেষে উৎপাদন আরও বেড়ে যাবে—তৃতীয় পরিকল্পনায় পর ভারত সরকারের অধীনস্থ দুর্গাপুর কারখানাতে ১·৬ মিঃ টন লৌহ উৎপাদন হচ্ছে বা হবার কথা এবং চতুর্থ পরিকল্পনার পর ৩·৪ মিঃ টন উৎপাদন হবে। রাউরকেলায় হচ্ছে ১·৮ মিঃ টন এবং পরে বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়াবে ২·৫ মিঃ টন। ভিলাইয়ে হচ্ছে ২·৫ মিঃ টন এবং চতুর্থ পরিকল্পনার পর দাঁড়াবে ৩·২ মিঃ টন। ১৯৭০ সালের পর বোখারো কারখানা থেকে ২·২ মিঃ টন উৎপাদন হবে। এগুলি ছাড়া আরও তিনটি ইস্পাত কারখানা ভারতে আছে—টাটা (২·০ মিঃ টন), বার্ণপুর (১·০ মিঃ টন) ও মহীশূর (০·১ মিঃ টন)। সুতরাং সহজেই বোঝা যায় যে, এই বিপুল পরিমাণ ইস্পাত তৈরি করবার জন্যে কত বেশী কোক উৎপাদন করা দরকার।

কোক উৎপাদনের পদ্ধতিকে বলা হয় Carbonization। এই পদ্ধতি দুই প্রকার—(ক) উচ্চ তাপ প্রয়োগে, (খ) নিম্ন তাপ প্রয়োগে। পদ্ধতি (ক) পৃথিবীর সর্বত্র ব্যবহৃত হয়ে থাকে—কারণ লৌহ উৎপাদনের কোক এই পদ্ধতি ছাড়া কোন উপায়ে তৈরি করা সম্ভব নয়। পদ্ধতি (খ) জনপ্রিয় নয়—তবে ক্রমশঃ এটি বৃদ্ধি পাবে, কারণ এতে তরল পদার্থ বেশী পাওয়া যায় এবং গৃহস্থের ব্যবহারের জন্যে এই কোক ব্যবহার করা যেতে পারে। (খ) পদ্ধতিতে গ্যাস কম পাওয়া যায়, কিন্তু গ্যাসের ক্যালোরিফিক মান বেশী থাকে। এই দুই পদ্ধতিতে যে ভাবে গ্যাসের রাসায়নিক সংযুক্তি পরিবর্তিত হয়, তার একটি তুলনামূলক ছক দেওয়া হলো।

গ্যাস	Coking temperature ৫০০° সেঃ—শতকরা ভাগ	Coking temperature ১০০০° সেঃ—শতকরা ভাগ
CO_2	৯.০	২.৫
C_nH_m	৪.০	৩.৫
CO	৫.৫	৪.০
H_2	১০.০	৫০.০
CH_4 & homologs	৬৫.০	৩৪.০
N_2	২.৫	২.০

এখন একটি প্রশ্ন জাগতে পারে, কেন কয়লাকে বাতাসের সংস্পর্শে না আসতে দিয়ে গরম করলে শক্ত হয়ে যায়—এর সঠিক কারণ অবশ্য এখনও বলা যায় না, তবে যেটুকু জানা গেছে, তা হলো ৩৪০° সেঃ—৪৫০° সেঃ তাপ প্রয়োগে কয়লা থেকে একটি তরল পদার্থ নিঃসৃত হয়। সেই তরল পদার্থটি কঠিন পদার্থের সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে একটি শক্ত জিনিষের সৃষ্টি করে, যেমন হয় Thermo-Setting resin, অর্থাৎ যে সব প্লাষ্টিক জাতীয় পদার্থ তাপ দেবার পর জমে যায় এবং তার আর কোন পরিবর্তন ঘটে না তাপ প্রয়োগে—বেশ কিছু উচ্চ তাপ পর্যন্ত। এখন এই যে তরল পদার্থের আবির্ভাব ঘটলো, এটি হতে পারে—(১) তাপ প্রয়োগে কয়লা থেকে কিছু অংশ ভেঙে গিয়ে (Thermal breaking of the coal substance) তরল পদার্থের সৃষ্টি করে অথবা (২) কয়লায় যে সব অল্প তাপ সহনশীল জৈব পদার্থ থাকে, সেগুলি তাপ প্রয়োগে তরল পদার্থে পরিণত হয়।

পূর্বেই বলা হয়েছে যে, সব কয়লা সমান নয়, কোন কয়লায় কোক তৈরি হবার ক্ষমতা বেশী আছে আবার কিছু কয়লায় কম আছে। সেজন্যে পৃথিবীর সর্বত্রই বিভিন্ন প্রকারের কয়লাকে বিভিন্ন অনুপাতে মিশ্রিত করা হয়ে থাকে, যাকে বলা হয় Blending। ভারতবর্ষের কয়লায় বেশী পরিমাণে ছাই থাকে। ভারতবর্ষের ভাল কয়লা এখন যেভাবে খরচ হচ্ছে, সেই ভাবে খরচ করতে থাকলে মাত্র ৫০ বছর পর আর কোন ভাল কয়লা পাওয়া যাবে না। সেই কারণে সর্বদাই blending করা হয়। কোক তৈরির জন্যে সাধারণতঃ আমাদের দেশে ৩৫—৪৫ ভাগ blending করা হয়।

প্রথমে যে চুল্লীর প্রচলন ছিল, তাকে বলা হতো বিহাইভ (Beehive) পদ্ধতি। এই পদ্ধতি বর্তমানের By-Product পদ্ধতি থেকে আলাদা। আগে একটি কয়লার গাদা তৈরি করে তাকে বাতাসের সঙ্গে আসতে না দিয়ে গরম করা হতো এবং যে গ্যাস নির্গত হতো, তা বাতাসেই ছেড়ে দেওয়া হতো। কিছু কোক পুড়েও যেত, আর কোকও খুব ভাল হতো না। যে বিপুল পরিমাণ গ্যাস বাতাসে ছেড়ে দেওয়া হতো তার ফলে সেই অঞ্চল খুবই কলুষিত হয়ে পড়তো। কিন্তু বর্তমান কালে এই পদ্ধতির প্রচলন একেবারেই বন্ধ হয়ে গেছে। বর্তমানের প্রচলিত পদ্ধতি—By-Product পদ্ধতিতে গ্যাস সংগ্রহ করা হয় এবং সেই গ্যাস থেকে বহু জিনিষ আলাদা করা যায়, যার প্রয়োজনীয়তা এখন খুবই বেশী এবং গ্যাসটিও জ্বালানী হিসাবে ব্যবহার করা হয়। আলোচ্য প্রবন্ধে এই পদ্ধতি সম্বন্ধে বিশেষভাবে আলোচনা করা হবে। ১নং চিত্রে একটি কোক-চুল্লী সামগ্রিকভাবে দেখানো হলো। ছবিটির বামদিকে যে জিনিষ দেখা যাচ্ছে, তাকে বলা হয় Quenching tower—চুল্লী থেকে নির্গত গরম কোক একটি গাড়ীর সাহায্যে ঐ স্থানে নিয়ে জল দিয়ে ঠাণ্ডা করা হয়। ছবিটির ডান দিকে দেখা যাচ্ছে Service Bunker—এখানে পরিমিত আয়তনের কয়লা জমা থাকে। চুল্লীকে যে গাড়ীর সাহায্যে ভর্তি করা হয় অর্থাৎ চার্জিং কার-

গুলি এই সার্ভিস বাঙ্কার থেকে সময়মত কয়লা নিয়ে চুল্লীতে ভর্তি করে দেয়। মাঝখানের অংশটিতে চুল্লীগুলি দেখানো হয়েছে। চুল্লীর সামনের অংশের (ছবিতে যে অংশ দেখা যাচ্ছে) নাম Coke wharf। এখানে কোককে জল দিয়ে ঠাণ্ডা করবার পর ফেলে দেওয়া হয় এবং এখান থেকে বেল্টের দ্বারা সুবিধামত জায়গায় নিয়ে যাওয়া হয়।

gas main। ৮নং অংশ চুল্লীর Charging hole অর্থাৎ যেখান দিয়ে চুল্লীতে কয়লা দেওয়া হয়। ৯নং অংশ Regenerator—গরম গ্যাস Regenerator দিয়ে প্রবেশ করানো হয়, ফলে এটি গরম হয়ে যায় এবং পরে যে গ্যাস পোড়ানো হবে, তাকে এর মধ্য দিয়ে প্রবেশ করাবার পর পোড়ালে বেশী পরিমাণে তাপ কাজে লাগাতে পারা যায়।
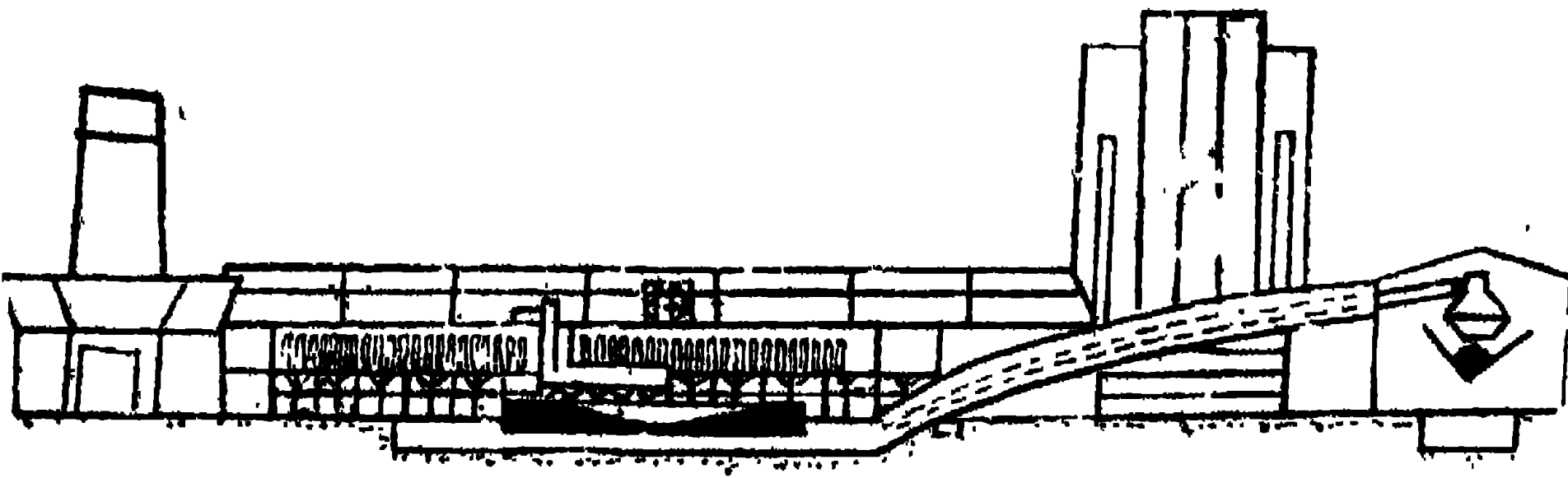
১নং চিত্র

২নং চিত্রে কোক-চুল্লীর আরও একটু নিখুঁত বর্ণনা দেবার চেষ্টা করা হয়েছে। ১নং অংশ হচ্ছে চার্জিং কার, যার দ্বারা চুল্লী ভর্তি করা হয়। ২নং অংশ হচ্ছে Pushing machine—এই যন্ত্রের সাহায্যে প্রথমে চুল্লীর দরজাটি খুলে দেওয়া হয় এবং একটি লম্বা লোহার বিমের দ্বারা সমস্ত কোক চুল্লী থেকে ঠেলে বের করে দেওয়া হয়। সর্বশেষে দরজাটি আবার বন্ধ করে চুল্লীকে ভর্তি করে দেওয়া হয়। ৩নং অংশের নাম কোক গাইড কার—এই অংশের দ্বারা অপর দিকের দরজাটি খুলে নেওয়া হয় এবং পরে ঠিক জায়গায় দরজাটিকে লাগানো হয়। ৪নং অংশে গরম কোক গ্রহণ করা হয় এবং ৫নং অংশে গরম কোক Quenching tower-এ ঠাণ্ডা করবার পর এখানে ফেলে দেওয়া হয়। ৬নং অংশে একটি চুল্লীকে আড়াআড়িভাবে দেখানো হয়েছে—এই অংশে কয়লা আছে। ৭নং অংশ হচ্ছে যেখান দিয়ে গ্যাস নির্গত হয়; অর্থাৎ Hydraulic

পূর্বেই বলা হয়েছে যে, আমাদের দেশের কয়লায় অনেক ছাই থাকবার জন্যে ব্যবহারে বেশ অসুবিধা হয়ে থাকে। তাই পৃথিবীর সব জায়গাতেই এবং আমাদের দেশেও যে পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়, তা হলো শোধন পদ্ধতি। কয়লাকে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে শোধন করে নেবার ফলে কাদা মাটি অনেকখানি কমে যেতে পারে এবং সেই কয়লা ব্যবহারের উপযোগী হয়ে থাকে। শোধন পদ্ধতি সম্বন্ধে এখানে এটুকুই বলা যেতে পারে যে, কয়লাকে নির্দিষ্ট মাপে ভেঙ্গে নিয়ে এমন একটি মাধ্যমে রাখা হয় এবং কৃত্রিম তরঙ্গের সৃষ্টি করা হয়, যার ফলে কয়লা উপরের দিক দিয়ে চলে যায় এবং কাদা মাটি জাতীয় অবাঞ্ছিত বস্তুগুলি নীচের দিকে জমে যায়।

সুতরাং কোক-চুল্লীতে যে কয়লা দেওয়া হবে, তাকে আগে থেকে নানাভাবে মিশিয়ে এমন করে নিতে হবে, যাতে এথেকে উৎপন্ন

কোককে মারুৎ-চুল্লীতে ব্যবহার করা যেতে পারে। প্রথমে উত্তপ্ত চুল্লীতে কয়লা ভরে দেওয়া হয় চার্জিং কারের সাহায্যে। চুল্লীর ভিতরের তাপ সর্বদাই ১০০০° সেঃ রাখা হয়। চুল্লীতে কয়লা ভরে দিয়েই উপরের ঢাক্‌নাগুলি বন্ধ করে দেওয়া হয় (যেখান দিয়ে কয়লা ভরা হয়)। সাধারণতঃ ১৬—১৯ ঘণ্টা সময় কাল মনে পড়ে যায়। By-Product শিল্পে যে গ্যাস উৎপন্ন হয়, তাকে নানা উপায়ে শোধন করে নেওয়া হয় এবং তার ফলে অনেক কিছুর সন্ধান মিলে যায় এবং গ্যাসও অনেকটা বিশুদ্ধ অবস্থায় পাওয়া যায়। এই গ্যাসের জ্বালানী ক্ষমতা থাকবার দরুণ এর চাহিদাও অনেক। প্রথমতঃ এই গ্যাসকে কোক-চুল্লীতেই
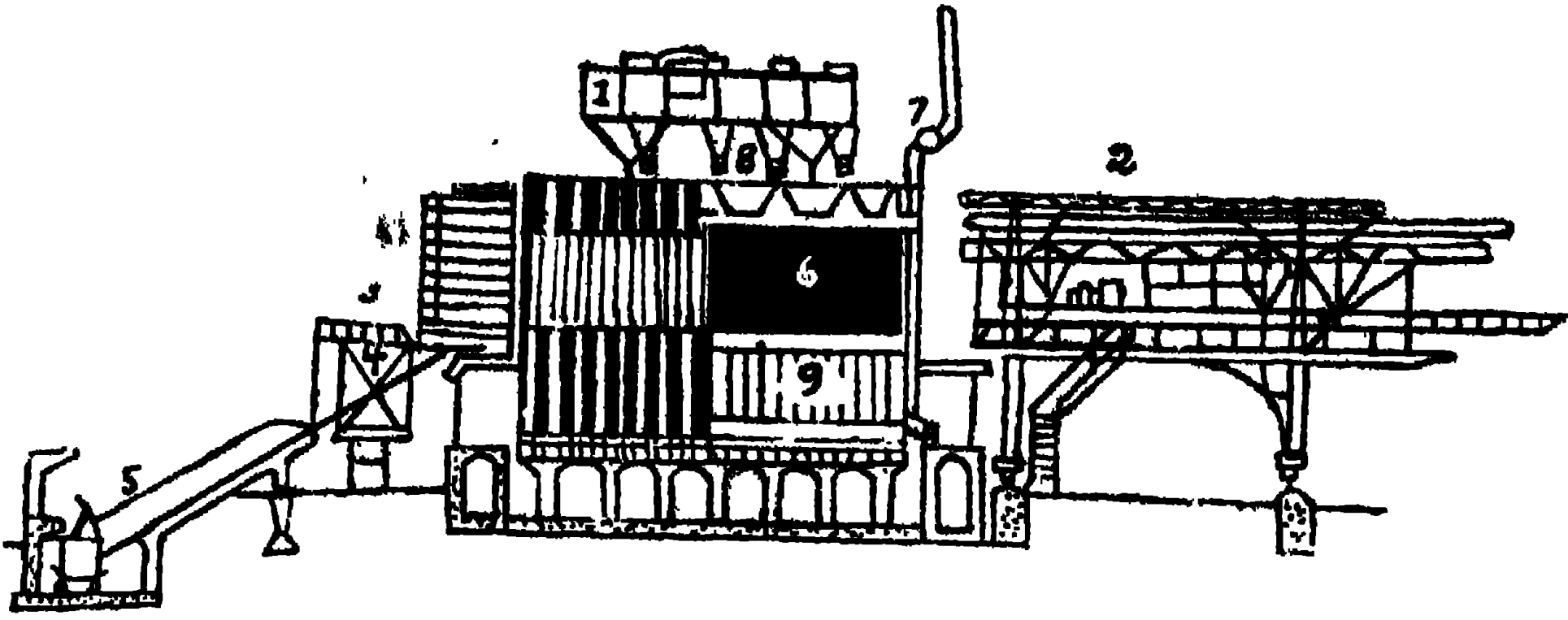
২নং চিত্র

লাগে কোক তৈরি করবার জন্যে। প্রথমে কয়লা উচ্চ তাপের সংস্পর্শে এসে ভাঙতে সুরু করে এবং বাদামী রঙের ধোঁয়া বের হতে থাকে। এই ধোঁয়া থেকে কত জিনিষ যে পাওয়া যায়, তা আগে কেউ কোন দিন কল্পনাও করতে পারে নি। কি না পাওয়া যায় এথেকে! মোটামুটি-ভাবে দরকারী জিনিষের কয়েকটি হলো - কোল-টার, অ্যামোনিয়া, বেনজিন, টলুয়িন, ন্যাপথালিন এবং কোল গ্যাস। এই কোল-টার থেকে হাজার হাজার জিনিষ পাওয়া যায়, যার জন্যে একে বলা হয় তরল সোনা বা Liquid gold। কত রকমের ওষুধ, প্রসাধন সামগ্রী এবং নিত্য প্রয়োজনীয় বস্তু, যেমন—প্লাস্টিক, সুতা (রাসায়নিক) এবং আরো অনেক কিছু। তাই আধুনিক কালে প্রত্যেক কোক-চুল্লীর সঙ্গে সঙ্গে এই শিল্পও গড়ে উঠেছে, যার নাম By-Product। কোক-চুল্লী বা Coke oven বলতে গেলেই Coke oven & By-Product নামটাই আজ-ব্যবহার করা যেতে পারে, কারণ কোক-চুল্লীকে সর্বদাই ১০০০° সেঃ উত্তাপে রাখতে হয়। এখানে দুটি চুল্লীর দেয়ালের মাঝখানে কোন জ্বালানী গ্যাস পোড়ানো হয়—হয় কোল গ্যাস, না হয় মারুৎ-চুল্লী থেকে নিঃসৃত গ্যাসের দ্বারা। দুটি গ্যাসই ব্যবহার করা হয় সুবিধামত। কোল গ্যাসের তাপ উৎপাদন ক্ষমতা অর্থাৎ Calorific value, মারুৎ-চুল্লী থেকে উৎপন্ন গ্যাস থেকে অনেক গুণ বেশী। তবে একটি কথা জেনে রাখা ভাল যে, কোন গ্যাসকে পোড়াবার আগে যদি বেশ গরম করে নিতে পারা যায়, তবে শেষ পর্যন্ত বেশী উচ্চ তাপ উৎপাদনে সক্ষম হওয়া যায়, যাকে বলা হয়ে থাকে Preheating of the gas। কিন্তু কোল গ্যাসে হাইড্রো-কার্বন থাকবার দরুণ তাকে পোড়াবার আগে গরম করা যায় না, কারণ তাহলে হাইড্রোকার্বন ভেঙ্গে যাবে এবং গ্যাসের উৎকর্ষও কমে যাবে। আবার মারুৎ-চুল্লীর গ্যাসে ঐ অসুবিধা

না থাকবার জন্তে পোড়াবার আগে ঐ গ্যাসকে উচ্চতাপে উত্তপ্ত করা যেতে পারে এবং তা করা হয়েও থাকে। এখন এটুকু জানা দরকার যে, একক পরিমাণ কয়লা থেকে উচ্চ তাপের—কার্বোনিজেশন পদ্ধতিতে নিম্ন অনুপাতে নিম্নোক্ত জিনিষগুলি পাওয়া যায়:—

কোক	—	শতকরা ৭৬ ভাগ
টার	—	" ৩ "
তেল	—	" ০·৭৫ "
অ্যামোনিয়া	—	" ০·২৫ "
গ্যাস	—	" ২০· "

এখন কোক-চুল্লীর গঠন সম্বন্ধে কিছু বলা দরকার। এই চুল্লীর সমস্ত অংশই তাপ-সহনশীল ইটের দ্বারা তৈরি। ৩নং চিত্রে চুল্লীর গঠন-বৈশিষ্ট্য দেখানো হয়েছে। চুল্লীর বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন ধরণের তাপ-সহনশীল ইটের দ্বারা তৈরি, চিত্রের সাহায্যে তা বর্ণনা করা হয়েছে।

৩নং চিত্র

চুল্লীর গঠন-প্রণালী খুবই জটিল। সাধারণতঃ ৮০টি চুল্লীবিশিষ্ট একটি ব্যাটারী তৈরি করতে প্রায় ২০,০০০ টন ইটের প্রয়োজন হয়। সাধারণতঃ চার রকমের ইট ব্যবহৃত হয়ে থাকে—

ফায়ার ক্লে রিফ্র্যাকটরিজ, সিলিকা রিফ্র্যাকটরিজ, ইনসুলেটিং অর্থাৎ যে রিফ্র্যাকটরিজের মধ্য দিয়ে তাপ চলাচল খুবই কম হয় এবং সাধারণ লাল ধরণের ইট। তবে সবচেয়ে বেশী লাগে ফায়ার ক্লে ও সিলিকা রিফ্র্যাকটরিজ। এই যে বিভিন্ন ধরণের ইট ব্যবহার করা হয়, তাদের আকারেরও প্রভেদ আছে। বহু আকারের ইট এখানে দরকার হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, প্রায় ৩০০ আকারের, যাকে ইংরেজিতে বলা হয় Shapes ফায়ার ক্লে রিফ্র্যাকটরিজ এবং প্রায় ৬০০ আকারের সিলিকা রিফ্র্যাকটরিজ ব্যবহার করা হয় কোক-চুল্লী তৈরি করবার সময়। ৩নং ছবির নীচের অংশকে বলা হয় Regenerator এবং উপরের অংশ আসল চুল্লী। চুল্লীর ভিতর কয়লা দেওয়া হয় এবং তা পরে কোকে পরিণত হয়। চুল্লীর দুই পার্শ্বে যে ফাঁক থাকে তাতে অবিরাম কোল গ্যাস বা মারুৎ-চুল্লীর গ্যাস পোড়ানো হয় এবং এমন ভাবে তাপ সৃষ্টি করা হয়, যাতে চুল্লীর ভিতরকার তাপমাত্রা ১০০০° সেঃ থাকে। সাধারণতঃ যেখানে গ্যাসকে পোড়ানো হয়, তার তাপমাত্রা ১৩০০° সেঃ থাকে। এখন ৩নং চিত্র থেকে প্রতীয়মান হবে যে, চুল্লীর নীচের অংশকে Regenerator বলা হয় এবং চুল্লীর দুই দিকে যে গ্যাস পোড়ানো হয় বায়ুর সাহায্যে, সেই গ্যাসের Product of combustion অর্থাৎ পোড়ানোর পর যে গ্যাসের সৃষ্টি হলো, সেই গ্যাসের Sensible heat অর্থাৎ বাইরের তাপ খুব বেশী থাকবার দরুণ সেই গ্যাসকে Regenerator-এর মধ্য দিয়ে চালনা করা হয়। এর ফলে অনেকখানি তাপ উদ্ধার করা সম্ভব হয়। কিছুক্ষণ পর, সাধারণতঃ আধঘণ্টা পর সেই উত্তপ্ত Regenerator-এর মধ্য দিয়ে বায়ু প্রবেশ করানো হয়। ফলে যখন বাতাস চুল্লীর ভিতর (অর্থাৎ চুল্লীর দুই দিকে) পোড়ানো হয় গ্যাসের সাহায্যে, তখন সেই তাপ কাজে লাগানো যায়। চুল্লীর নীচের অংশ অর্থাৎ Regenerator অংশ ফায়ার ক্লে রিফ্র্যাকটরিজ-এর দ্বারা নির্মিত। চুল্লীর অংশ সিলিকা রিফ্র্যাকটরিজের দ্বারা নির্মিত। সিলিকা রিফ্র্যাকটরিজ ব্যবহারে একটি জিনিষ সর্বদা স্মরণ রাখা প্রয়োজন এই যে, চুল্লীর তাপ কখনও ৮০০° সেঃ-এর নীচে নামানো চলবে না, তাহলে চুল্লী কিছু দিনেই ধ্বংস হয়ে যাবে। কারণ সিলিকা রিফ্র্যাকটরিজের বিশেষত্ব এই যে, তাপ প্রয়োগের ফলে সিলিকার নিয়ত-কারিতায় পরিবর্তন ঘটে এবং সিলিকার আয়তনেরও পরিবর্তন হয়। কিন্তু এই আয়তন পরিবর্তন ৮০০° সেঃ-এর উপরে আর ঘটে না। ফলে যদি সিলিকা রিফ্র্যাকটরিজকে সর্বদাই ৮০০° সেঃ-এর উপরে রাখা যায়, তাহলে কখনও এই অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয় না।

প্রথম চুল্লীতে যখন আগুন দেওয়া হয় অর্থাৎ কাজ আরম্ভ হয়, তখন অত্যন্ত ধীরে ধীরে চুল্লীকে গরম করা হয়—একবার ৮০০° সেঃ উত্তপ্ত হয়ে গেলে চিন্তার বিশেষ কারণ থাকে না। চুল্লীতে যে সিলিকা রিফ্র্যাকটরিজ ব্যবহার করা হয়, Indian Standard Institution-এর মান অনুসারে তার ঘনত্ব ২·৩৩—২·৩৫। সবচেয়ে বিপজ্জনক হলো Quartz থাকা, যার ফলে রিফ্র্যাকটরিজের ঘনত্ব বেড়ে যায়। সুতরাং এই ঘনত্ব দিয়েই রিফ্র্যাকটরিজের গুণাগুণ বিচার করা যেতে পারে। ভারত সরকারের অধীনে যে তিনটি ইস্পাত কার-খানা গড়ে উঠেছে, সেখানে যে সব কোক-চুল্লী আছে, মোটামুটি প্রথম স্তরে সেগুলি নিম্নরূপ ছিল—রাউরকেলায় ৭০টি চুল্লীবিশিষ্ট তিনটি সম্পূর্ণ ব্যাটারীর কাজ আরম্ভ হয় ১৯৫৮ সালের ডিসেম্বর মাসে। এগুলির ১২ লক্ষ টন কোক উৎ-পাদনের ক্ষমতা আছে। ভিলাইয়ে ৬৫টি চুল্লী-বিশিষ্ট তিনটি সম্পূর্ণ ব্যাটারী আছে—প্রথম ও দ্বিতীয়টি আরম্ভ হয় ১৯৫৯ সালে এবং তৃতীয়টি

আরম্ভ হয় ১৯৬০ সালে; এর ১২ লক্ষ টন কোক উৎপাদনের ক্ষমতা আছে। দুর্গাপুরে ৭৮টি চুল্লীবিশিষ্ট তিনটি সম্পূর্ণ ব্যাটারীর মধ্যে প্রথমটি ১৯৫৯ সালে এবং বাকী দুটি ১৯৬০ সালে, উৎপাদন ক্ষমতা—১৪ লক্ষ টন কোক। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অধীনে দুর্গাপুর প্রোজেক্টের কোক উৎপাদন আরম্ভ হয় ১৯৫৯ সালে—ক্ষমতা ২ লক্ষ টন কোক।

কোক-চুল্লী তৈরি করতে বিশেষ ক্ষমতার প্রয়োজন। আমাদের দেশে আজ পর্যন্তও কোন কোক-চুল্লী তৈরি করা সম্ভব হয় নি, কেবল মাত্র নিজেদের প্রচেষ্টায়। অদূর ভবিষ্যতে অবশ্য তৈরি করা সম্ভব হবে বলে মনে হয়। বর্তমানে রাশিয়া, আমেরিকা, ইংল্যাণ্ড, জাপান ও পশ্চিম জার্মেনী এই শিল্পে বিশেষ দক্ষ। আমাদের দেশে অবশ্য আমেরিকা ও জাপান এখনও কোন কোক-চুল্লী তৈরি করে নি। দেশের অগ্রগতি যতই বৃদ্ধি পাবে, কোকশিল্পের প্রসার ততই বৃদ্ধি পাবে।

বিজ্ঞান-সংবাদ

মশার বিরুদ্ধে নতুন অস্ত্র

লণ্ডনের নিকটবর্তী রোথামষ্টেড এক্সপেরিমেণ্টাল ষ্টেশনে একটি শক্তিশালী নতুন কীটনাশক দ্রব্য উদ্ভাবিত হয়েছে। এই কাজে পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন সরকারী উদ্যোগে স্থাপিত সংস্থা—ন্যাশন্যাল রিসার্চ ডেভেলপমেণ্ট কর্পোরেশন।

এটি শুধু মাছির বিরুদ্ধে সবচেয়ে কার্যকরী রাসায়নিক হবে না, কয়েক শ্রেণীর মশার বিরুদ্ধেও হবে সর্বাপেক্ষা সম্ভাবনাপূর্ণ কীটনাশক দ্রব্য। মাছি বিনাশের ব্যাপারে এই দ্রব্য স্বাভাবিক পাইরেথ্রিনের চেয়ে ২০ গুণ কার্যকরী হবে।

পাইরেথ্রাম সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ স্বাভাবিক কীটনাশক দ্রব্য। এটি ক্রিস্থানথিমাম সিনেরেরিয়ে ফোলিয়াম (Chrysanthemum cinerariae folium) নামক এক প্রকার সাদা ডেজি জাতীয় ফুলে পাওয়া যায়। কিন্তু খুব বেশী পরিমাণে এই স্বাভাবিক কীটনাশক দ্রব্য পাওয়া যায় না। সেজন্যে বর্তমানে এরূপ গুণসম্পন্ন কৃত্রিম দ্রব্য উৎপাদনের বহু চেষ্টা হয়েছে।

রোথামষ্টেডের ইনসেক্টিসাইড অ্যাণ্ড ফাঞ্জিসাইড দপ্তরে ডাঃ এম. ইলিয়ট ও তাঁর সহকর্মীরা বহু ধরণের ক্রিস্থানথিমিক অ্যাসিড নিয়ে গবেষণা সুরু করেন

১৯৬১ সালে তাঁরা একটি সাধারণ কম্পাউণ্ড তৈরি করেন, যা স্বাভাবিক পাইরিথ্রিনের চেয়ে প্রায় দ্বিগুণ কার্যকরী। পরে আরও অনেকগুলি কম্পাউণ্ড উদ্ভাবিত হয়, যা আরও বহুগুণ বেশী কার্যকরী।

প্রাথমিক পরীক্ষায় দেখা যায়, এই কম্পাউণ্ড মানুষ বা প্রাণীর উপর কোন বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে না এবং কীটনাশের উদ্দেশ্যে একে এক শক্তিশালী অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করা চলবে।

যখন সস্তায় এটি প্রস্তুত করা যাবে, তখন এর ব্যবহার শুধু মাছিবিনাশী এরোসল-এ সীমাবদ্ধ থাকবে না, বাগানে সংরক্ষিত খাদ্যের ক্ষেত্রেও একে ব্যবহার করা চলবে।

ঘূর্ণিবাত্যা বন্ধ করবার অভিনব ব্যবস্থা

মানুষের ক্ষতিসাধনের ক্ষমতা অর্জনের পূর্বেই ঘূর্ণিবাত্যার প্রচণ্ড গতি নষ্ট করে দেওয়া যেতে

পারে—এরকম একটি ব্যবস্থা ক্যালিফোর্ণিয়ায় আমেরিকার জাতীয় বিজ্ঞান ও মহাকাশ সংস্থা কর্তৃক পরিচালিত এম্‌স্‌ রিসার্চ সেন্টার নামে গবেষণা কেন্দ্রে ডাঃ ভার্ণন জে. রোসো কর্তৃক উদ্ভাবিত হয়েছে। তবে কোন প্রাকৃতিক ঘূর্ণিবাত্যার উপর এই প্রক্রিয়া এখনও প্রয়োগ করা হয় নি।

ঘূর্ণিবাত্যা কেন হয়? কি কারণে বাতাসের গতি মেঘগুলিকে চোঙের আকারে গড়ে তোলে এবং ঘণ্টায় কয়েক শত মাইল বেগে ছুটে যায়, ডাঃ রোসো গবেষণাগারে এই সকল সমস্যার তাত্ত্বিক সমাধান করেছেন।

তিনি বলেন—দুর্দান্ত ঝড়ের মেঘ ধন ও ঋণতড়িৎ-যুক্ত জলকণা সৃষ্টি করে। এই ধরণের দুটি মেঘখণ্ড এক মাইলের ব্যবধানে সমান্তরাল-ভাবে থাকলে ধনবিদ্যুতায়িত কণাসমূহ ঋণবিদ্যুতায়িত কণার দিকে এবং ঋণ-বিদ্যুতায়িত কণাসমূহ ধনবিদ্যুতায়িত কণার দিকে প্রবাহিত হয়। একে অন্যের দিকে ধাবমান জলকণাসমূহের মধ্যে যে বাতাস থাকে তাদের মধ্যে ঘূর্ণায়মান গতির সৃষ্টি হয়, সৃষ্টি হয় ঘূর্ণিবাত্যার। যতক্ষণ বিদ্যুতায়িত কণাসমূহের বিদ্যুৎ-শক্তি এভাবে সম্পূর্ণ ক্ষয় না হয়ে যায়, ততক্ষণ ঘূর্ণন চলতে থাকে।

এই ঘূর্ণন বন্ধ করবার জন্যে ডাঃ রোসো ৪০ মিলিমিটার ব্যাসের কামান থেকে ঐ মেঘখণ্ডে কয়েকটি অভিনব কামানের গোলা নিক্ষেপ করবার সুপারিশ করেছেন। ঐ সকল গোলার মধ্যে থাকবে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্যারাসুট এবং তাদের মধ্যে থাকবে মোট দু-মাইল দৈর্ঘ্যের ইস্পাতের তার। মেঘখণ্ডে গোলাবর্ষণের পর ঐ গোলা ফেটে পড়বার সঙ্গে সঙ্গে তাথেকে বেরিয়ে আসবে প্যারাসুটসমূহ এবং তাদের মধ্যে যে সকল ইস্পাতের তার থাকবে, তাদের বিস্তার ঘটবে। ঐ সকল তার মেঘের সংস্পর্শে আসবার ফলে দেখা দিবে বিদ্যুতের ঝল্‌কানি। ফলে যে বিদ্যুৎ-শক্তির জন্যে ঘূর্ণিবাত্যা চলতে থাকে, তা হ্রাস পাবে, ঘূর্ণিবাত্যাও থেমে যাবে।

ডাঃ রোসো গবেষণাগারে বাষ্পের মেঘ তৈরি করে এবং তাদের কণাগুলিকে বিদ্যুতায়িত করে ঘূর্ণিবাত্যা সৃষ্টি করে দেখিয়েছেন যে, বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ করে দিলেই ঘূর্ণন বন্ধ হয়ে যায়। তারের সাহায্যেও এই বিদ্যুৎ-শক্তি হ্রাস করে এই কৃত্রিম ঘূর্ণিবাত্যা বন্ধ করা যায়।

খরার বিরুদ্ধে মাটির গভীরে সার ইঞ্জেকসন

খরার বিরুদ্ধে জয়ী হবার উদ্দেশ্যে মাটির গভীরে সার সঞ্চারিত করে দেবার বিষয়টি দক্ষিণ ইংল্যাণ্ডের হার্টফোর্ডশায়ারের রোথামস্টেড এক্সপেরিমেন্টাল ষ্টেশনে পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে।

বিভিন্ন শস্যের প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে মাটির সঠিক খাদ্যগুণ নির্ণয়ের পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলেছে।

ঐ ষ্টেশনের ডেপুটি ডিরেক্টর ডাঃ ডাব্লিউ. জি. কুক বলেছেন, সার ইঞ্জেকসনের পদ্ধতিটি দীর্ঘ মূল সমন্বিত গাছের ক্ষেত্রে কার্যকরী হবে এই জন্যে যে, মাটির উপরের অংশ শুকিয়ে গেলেও নীচের অংশ ভিজা থাকে। পরীক্ষায় দেখা গেছে, মূল গাছে সার প্রয়োগ করলে তার শিকড়ের একটা বড় অংশ মাটির নীচে চলে যায়।

মিঃ কুক বলেন, এমন ফলের গাছ বা মূলজাতীয় সবজি নিশ্চয়ই আছে, যা মাটির গভীর থেকে খাদ্য সংগ্রহ করতে পারে। পটাশ ও ফস্‌ফেট থেকে এমন সার উৎপাদন করা সম্ভব, যা সহজেই জলে ধুয়ে মাটির গভীরে গিয়ে জমা হবে।

পলিথিলিন অক্সাইড মিশ্রিত জলের অদ্ভুত প্রকৃতি

জল স্বভাবতঃই নিম্নগামী। ঊর্ধ্বগামী জলও যে হতে পারে—এক গ্লাস থেকে আর এক গ্লাসে ঐ জল একটু ঢালবার পর আপনা থেকেই যে অন্য গ্লাসে গিয়ে পড়তে পারে, তা সম্প্রতি জানা গেছে। তবে ঐ জল বিশুদ্ধ জল নয়। ঐ জলে বিশুদ্ধ জলের ভাগ থাকে শতকরা ৯৯.৫ থেকে ৯৯.৮ ভাগ। এতে ০.২ ভাগ থেকে ০.৫ ভাগ থাকে পলিথিলিন অক্সাইড। এই জিনিষটি রং, প্লাস্টার ও কাপড়চোপড়ে ব্যবহার করা হয়।

অতি অল্প পরিমাণে ঐ জিনিষটি জলে মেশানো হলে ঐ জলের একটি অদ্ভুত প্রকৃতি ও গুণ দেখা যায়। ঐ মিশ্রিত জল একটি পাত্র থেকে আর একটি পাত্রে ঢালবার সময় দেখা যায়, কিছুটা ঢালবার পর পাত্রটি খাড়াভাবে দাঁড় করিয়ে রাখলেও প্রথম পাত্রটি শূন্য না হওয়া পর্যন্ত আপনা থেকেই ঐ জল দ্বিতীয় পাত্রে গিয়ে পড়ছে।

জাহাজ থেকে কোন মোটা দড়ি জাহাজের পাশে ফেলে দিলে যেমন হয়, এটি ঠিক তেমনি। এই দড়িটিকে ঠেলে না দিলেও আপনা থেকেই নীচের দিকে পড়তে থাকে। দড়ির ওজন আর তার নিজের গতিবেগ বা মোমেনটাম রয়েছে এর পিছনে। এখানেও পলিথিলিন অক্সাইড মিশ্রিত জল প্রথম যে পাত্রে ঢালা হলো, সেই পাত্রের জল বাকী জলটুকু টেনে নিয়ে আসবে।

ক্যালিফোর্ণিয়ার পাসাডেনার অবস্থিত ক্যালিফোর্ণিয়া ইনষ্টিটিউট অব টেক্‌নোলোজীর ২৭ বছর বয়স্ক তরুণ কর্মী ডেভিড জেম্‌স্ একদিন পলিথিলিন অক্সাইড মিশ্রিত জল একটি পাত্র থেকে আর একটি পাত্রে ঢালছিলেন। ঢালা বন্ধ করতে চাইলেও তিনি দেখলেন যে, জলপ্রবাহ বন্ধ হচ্ছে না। তখন তিনি পাত্রটিকে খাড়া করে রাখলেন। তারপর ঝাঁকুনি দিয়েও দেখলেন যে, ঐ প্রবাহ বন্ধ হচ্ছে না। তখন একটি গ্লাসে ভর্তি হবার পর কাঁচি দিয়ে কেটে সেই প্রবাহ বন্ধ করতে হলো। জেম্‌স্ এর কারণ ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছেন—এই পলিমার মিশ্রিত জলের অণুর গঠন বিশেষ রকম লম্বা ধরণের বলেই এই রকম হয়ে থাকে।

নতুন ধরণের আলোকচিত্র মুদ্রণ-যন্ত্র

নতুন ধরণের একটি বৃটিশ ফটোপ্রিন্টিং মেশিনে ঘণ্টায় ৭৫টি ছবি (৪০″×২৭″ আয়তনের) ছাপা যাবে। এই মেশিনে সেমি-ড্রাই ডাইলিন প্রোসেসে (Semi-dry dyeline process) কাজ হয়।

স্থাপত্য, ইঞ্জিনীয়ারিং ও ডিজাইন অফিসের কাজের জন্যে বিশেষ করে এই মেশিন উদ্ভাবিত হয়েছে।

এই যন্ত্রের আবৃত পেপার ডিসপেন্সার ৪৮ ইঞ্চি প্রশস্ত ৫০ গজ পর্যন্ত কাগজ ধারণে সক্ষম। একটি রিভার্স কন্ট্রোলও এর সঙ্গে সংযুক্ত।

মূল ও নেগেটিভ যন্ত্রের মধ্য দিয়ে দেওয়া হয়। তারা একটি আলোকিত গ্লাস সিলিণ্ডারের সামনে পরস্পর সংলগ্ন থাকে। এক্সপোজারের পর দুটিকে বিচ্ছিন্ন করে নেগেটিভকে ডেভেলপিং সেকশনের মধ্যে পুরে দেওয়া হয় এবং তা ব্যবহারযোগ্য হয়ে মেশিনের মাথায় উঠে আসে।

এই যন্ত্রের জন্যে ৮০ ওয়াটের ফ্লুরেসেন্ট ল্যাম্পের প্রয়োজন হয়—ভোল্ট ২০০/২৫০ এ-সি হওয়া চাই। পাঁচ অ্যাম্পিয়ারের মত কারেন্ট খরচ হয়।

ফ্লোজিষ্টনবাদ

শ্রীমৃণ্ময় সামন্ত

ষোড়শ শতাব্দীর কথা। অ্যালকেমিবিদ ও দার্শনিকেরা বস্তুর উপাদান সম্বন্ধে অনুসন্ধান করছিলেন। অ্যালকেমিবিদেরা বললেন, তিনটি মূল নীতির উপর বস্তুর ধর্ম প্রতিষ্ঠিত। প্রথমটি হলো পারদ, এটি বস্তুর ধাতব ধর্মের কারণ। আর একটি গন্ধক, যার উপর বস্তুর বর্ণ নির্ভর করে। তৃতীয়টি লবণ, বস্তুর দ্রাব্যতা ও আরও অনেক ধর্ম এর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। গ্রীক দার্শনিক অ্যারিষ্টটল বললেন—মাটি, বায়ু, জল ও আগুন—এই চারটি পদার্থের সমন্বয়ে সকল বস্তু গঠিত। ভারতীয় বিজ্ঞানী ও দার্শনিকেরা অ্যারিষ্টটলের মত সমর্থন করলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে বললেন, আকাশ হচ্ছে এমন একটি পদার্থ, যার মধ্যে উপরিউক্ত চারটি উপাদানই বর্তমান। মাটি, বায়ু, জল, আগুন ও আকাশ—এই পাঁচটিকে একত্রে ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রে পঞ্চভূত বলা হয়।

পদার্থের উপাদান সম্বন্ধে অ্যালকেমিবিদ ও দার্শনিকদের এই যে অভিমত, তা কিন্তু সবাই মেনে নিতে পারলেন না। ষোড়শ শতাব্দীর মাঝামাঝি রবার্ট বয়েল প্রকাশ্যভাবে এর বিরোধিতা করতে লাগলেন।

১৬৬৯ খৃষ্টাব্দে জার্মান বিজ্ঞানী জন বেকর আগুন সম্বন্ধে নিজস্ব এক অভিমত প্রচার করেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে বিজ্ঞানী ষ্টাল এরই পরিবর্ধন করে বললেন, প্রত্যেক দাহ্যবস্তুর মধ্যে এমন একটি পদার্থ আছে, যার জন্যে সেটি জ্বলে ওঠে। এই বস্তুর নাম রাখা হলো ফ্লোজিষ্টন। গ্রীক ভাষায় ফ্লোক্স শব্দটির অর্থ অগ্নিশিখা, আর এথেকেই ফ্লোজিষ্টন (অগ্নি-উৎপাদক) শব্দটির উৎপত্তি। ফ্লোজিষ্টনের প্রতিষ্ঠা সম্পূর্ণরূপে কল্পনার উপর, স্বাভাবিক অবস্থায় এটি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয়। দহনের সময় এটি অগ্নিশিখার আকারে আত্মপ্রকাশ করে এবং এই ছদ্মবেশেই পদার্থ থেকে বেরিয়ে যায়। দাহ্যবস্তুকে দহন করলে যে অংশ পড়ে থাকে, তাকে বস্তুভস্ম বলে। বস্তুকে নিঃসন্দেহে ফ্লোজিষ্টনতত্ত্ব অনুযায়ী বস্তুভস্ম ও ফ্লোজিষ্টনের যোগ বলা যায়; অর্থাৎ

বস্তু = বস্তুভস্ম + ফ্লোজিষ্টন।

ফ্লোজিষ্টনের পরিমাণ সকল বস্তুতে সমান নয়। কয়লা, তেল ইত্যাদি বস্তুর মধ্যে এর পরিমাণ খুব বেশী। আবার ধাতব পদার্থের মধ্যে এর পরিমাণ খুবই কম। কম ফ্লোজিষ্টনবিশিষ্ট যে কোন বস্তু বেশী ফ্লোজিষ্টনবিশিষ্ট অন্য বস্তু থেকে ফ্লোজিষ্টন গ্রহণ করতে পারে। সুতরাং ফ্লোজিষ্টনবাদ অনুসারে ফ্লোজিষ্টনবিহীন ধাতুভস্মকে দাহ্যবস্তুর সঙ্গে দহন করলে আবার ধাতু ফিরে পাওয়া সম্ভব।

দাহ্যবস্তু = বস্তুভস্ম + ফ্লোজিষ্টন

ধাতুভস্ম + ফ্লোজিষ্টন = ধাতু

বিজ্ঞানী প্রীষ্টলি সর্বপ্রথম প্রমাণ করেন যে, বায়ু দুটি উপাদানের সমন্বয়ে গঠিত—ফায়ার বায়ু ও ফাউল বায়ু। গ্যাস জারের মধ্যে সীসাভস্ম পুড়িয়ে তিনি ফায়ার বায়ু পান। তিনি লক্ষ্য করেন, ফায়ার বায়ুর মধ্যে নিঃশ্বাস নিতে বেশ আরাম লাগে। আরও লক্ষ্য করবার বিষয়, একটি মোমবাতিকে যদি জারের মধ্যে রাখা হয় তাহলে তা উজ্জ্বলভাবে জ্বলে ওঠে। আরও একটি পরীক্ষায় প্রীষ্টলি একটি বায়ুপূর্ণ একমুখ খোলা কাচের জারে লোহা নিয়ে জারটিকে উপুড় করে একটি জলের পাত্রে রেখে দিলেন। কয়েক দিন পরে

দেখা গেল, জারের এক-পঞ্চমাংশ বায়ুশূন্য হয়ে জলে ভরে গেছে। আশ্চর্যের বিষয়, জারের মধ্যে অবশিষ্ট বায়ুর ধর্ম ঠিক ফায়ার বায়ুর বিপরীত অর্থাৎ তাহা পুরাপুরি শ্বাসকার্য ও দহনকার্যের অসহায়ক। এই বায়ুই শীলির ফাউল বায়ু [শীলির ফায়ার বায়ু বর্তমানের অক্সিজেন ও ফাউল বায়ু বর্তমানের নাইট্রোজেন]।

বৃটিশ বিজ্ঞানী প্রিষ্টলি শীলির অনুরূপ ফল পান। তিনি যখন বায়ু সম্বন্ধে গবেষণা সুরু করেছেন, তখন বায়ুকে সোনা বা পারদের মত মৌলিক পদার্থ মনে করা হতো। ড্যানিয়েল রাদারফোর্ড এই সময় প্রমাণ করেন যে, বায়ু দুটি উপাদানে তৈরি। প্রথমটি বর্তমানের কার্বন ডাইঅক্সাইড—চুনের জলের সাহায্যে এর অস্তিত্ব প্রমাণ করা যায়। আর একটি বর্তমানের নাইট্রোজেন—শ্বাসকার্যের পর পরিত্যক্ত বায়ুকে কার্বন ডাইঅক্সাইড মুক্ত করলে এটা পাওয়া যায়। প্রিষ্টলি এসব পরীক্ষার কথা জানতেন। তিনি কিছু সীসাকে বাতাসে উত্তপ্ত করে সীসাভস্মে পরিণত করলেন। তারপর একটি বড় লেন্সের সাহায্যে সূর্যকিরণ কেন্দ্রীভূত করে বেল জারের মধ্যে রাখা সীসাভস্মে তাপ দিলেন। উৎপন্ন গ্যাসকে বোতলের মধ্যে পারদের উপর সংগ্রহ করা হলো। পারদের লাল রঙের অক্সাইড থেকেও তিনি একইভাবে গ্যাস সংগ্রহ করেন। প্রিষ্টলি দেখলেন, দুটি গ্যাসই অভিন্ন এবং উভয়েই দহনক্রিয়ার সহায়ক।

এর পর প্রিষ্টলি দুটি অনুরূপ গ্যাস জারের মধ্যে একটিতে তাঁর সৃষ্ট গ্যাস ও অপরটিতে সাধারণ বায়ু নিলেন। দুটি গ্যাস জারের মধ্যেই দুটি পোষা ইঁদুর রাখা হলো। পনেরো মিনিটের মধ্যে সাধারণ বায়ুতে রাখা ইঁদুরটি মারা গেল, অপর ইঁদুরটি তখনও উৎসাহের সঙ্গে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আরও পনেরো মিনিট পরে দ্বিতীয় ইঁদুরটি মারা যায়। প্রিষ্টলি নিশ্চিত সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন যে, তাঁর তৈরি গ্যাস (বর্তমানের অক্সিজেন) শ্বাসকার্যের জন্যে অপরিহার্য।

শীলি ও প্রিষ্টলি উভয়েই ছিলেন ফ্লোজিষ্টন তত্ত্বের সমর্থক। দুজনই মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন অক্সিজেন ফ্লোজিষ্টনবিহীন গ্যাস ছাড়া আর কিছুই নয়। সুতরাং দহনক্রিয়ার সময় এটা দাহ্যবস্তুর ফ্লোজিষ্টন দ্রুত গ্রহণ করে; ফলে বস্তু অধিকতর ঔজ্জ্বল্যে জ্বলে ওঠে।

প্রিষ্টলির ধারণা ছিল যে, দহনের ফলে যে ফ্লোজিষ্টন প্রতিনিয়ত পরিত্যক্ত হচ্ছে, গাছ সে সব গ্রহণ করছে—ফলে বায়ু দূষিত হতে পারছে না। তিনি প্রমাণ করে দেখান, গাছ দিনের বেলায় অক্সিজেন ত্যাগ করে। পরবর্তী কালে ওলন্দাজ বিজ্ঞানী ইনজেন হাউস প্রমাণ করেন, দিনের বেলায় গাছ যে অক্সিজেন ত্যাগ করে, তার পরিমাণ সূর্যকিরণের প্রখরতার উপর নির্ভরশীল।

ষোড়শ শতাব্দীতে সুইস চিকিৎসক প্যারাসেলসাস দেখান যে, সালফিউরিক অ্যাসিডে লোহার গুঁড়া দিলে একরকম গ্যাস উৎপন্ন হয়। এই গ্যাস দাহ্য ও বর্তমানের হাইড্রোজেন। বিজ্ঞানী হেলমণ্টও একই ফল পান। কিন্তু তাঁরা দু'জন আর বেশী দূর এগোন নি। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ক্যাভেণ্ডিস দেখান—দু'ভাগ হাইড্রোজেন ও একভাগ অক্সিজেনের রাসায়নিক মিলনে জল উৎপন্ন হয়।

প্রিষ্টলি ক্যাভেণ্ডিসের পরীক্ষার কথা জানতেন। তিনি বললেন, হাইড্রোজেন এমন একটি পদার্থ, যার মধ্যে প্রচুর ফ্লোজিষ্টন আছে। ক্যাভেণ্ডিসও ফ্লোজিষ্টন তত্ত্বের প্রভাবের বাইরে ছিলেন না। তাঁর মতে, হাইড্রোজেন হলো ফ্লোজিষ্টনপূর্ণ জল আর অক্সিজেন ফ্লোজিষ্টনহীন জল। অর্থাৎ

হাইড্রোজেন = জল + ফ্লোজিষ্টন

অক্সিজেন = জল − ফ্লোজিষ্টন

অর্থাৎ হাইড্রোজেন + অক্সিজেন = জল

বিজ্ঞানের উপর ফ্লোজিষ্টনের একাধিপত্য যখন প্রায় দেড়-শ' বছরের মত, তখন ল্যাভয়সিয়ার তাঁর গবেষণা সুরু করেছেন। তুলাদণ্ডের সাহায্যে তিনি ওজন করে দেখালেন, বস্তু অপেক্ষা বস্তুভস্মের ওজন বেশী। কিন্তু ফ্লোজিষ্টন তত্ত্ব অনুযায়ী বস্তু থেকে বস্তুভস্মের ওজন কম হবার কথা। কারণ

বস্তু = বস্তুভস্ম + ফ্লোজিষ্টন

ল্যাভয়সিয়ারের পরীক্ষার বিষয়বস্তু নিম্নলিখিত ভাবে বর্ণনা করা যেতে পারে :—

ধরা যাক 'ক' গ্র্যাম পারদকে 'প' গ্র্যাম বায়ুর মধ্যে রাখা হলো। একটা বড় লেন্সের সাহায্যে পারদে তাপ দেওয়া হলো। উৎপন্ন পারদভস্মের ওজন যদি 'খ' গ্র্যাম হয় ও অবশিষ্ট বায়ুর ওজন যদি 'ফ' গ্র্যাম হয়, তবে দেখা গেল

খ—ক = প—ফ

অর্থাৎ পারদভস্মের ওজন পারদ থেকে যতটা বাড়লো, বায়ুর ওজন ততটা কমলো। পাত্রে অবশিষ্ট 'ফ' গ্র্যাম বায়ু দহনক্রিয়া ও শ্বাসকার্যে সহায়তা করে না। এইবার পারদভস্ম আলাদা করে লেন্সের সাহায্যে তাপ দিলে আবার পারদ ও বায়ু উৎপন্ন হবে। ওজন করে দেখা গেল, ফেরৎ পাওয়া পারদ ও বায়ুর ওজন যথাক্রমে 'ক' ও (প—ফ) গ্র্যাম। ফেরৎ পাওয়া বায়ু শ্বাস-কার্য ও দহনক্রিয়ার সহায়ক।

এথেকেই প্রমাণ পাওয়া গেল, বায়ুর মধ্যে দুটি উপাদান বর্তমান,

(১) অক্সিজেন—শ্বাসকার্য ও দহনকার্যের সহায়ক।

(২) নাইট্রোজেন—শ্বাসকার্য ও দহনকার্যের অসহায়ক।

দহন আসলে পদার্থের সঙ্গে বায়ুর অক্সি-জেনের রাসায়নিক মিলন ও এর ফলে যে বস্তুভস্ম উৎপন্ন হয়, তা ধাতুর অক্সাইড ছাড়া আর কিছুই নয়।

ক্যাভেণ্ডিসের পরীক্ষা সম্বন্ধে ল্যাভয়সিয়ার বললেন, ফ্লোজিষ্টনপূর্ণ জল হলো হাইড্রোজেন আর ফ্লোজিষ্টনবিহীন জল হলো অক্সিজেন। হাইড্রোজেনের সঙ্গে অক্সিজেনের রাসায়নিক মিলনের ফলে জল উৎপন্ন হয়।

এতদিন ধরে জানা ছিল, এক বস্তু থেকে অন্য বস্তুতে ফ্লোজিষ্টনের জায়গা বদলের ফলে আগুনের সৃষ্টি হয়। ল্যাভয়সিয়ারই প্রথম ফ্লোজিষ্টনের আধিপত্য অস্বীকার করেন ও নির্ভুলভাবে প্রমাণ করে দেন যে, রসায়ন-বিজ্ঞানে ফ্লোজিষ্টনের কোন স্থান থাকতে পারে না।*

[প্রতি শুক্রবার সন্ধ্যা ৬টায় বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের কার্যালয়ে বিজ্ঞান বিষয়ক আলোচনা সভার ব্যবস্থা করা হয়েছে। গত ১০ই মার্চ (১৯৬৭) এই প্রবন্ধটি পাঠ করা হয়। আলো-চনার ভিত্তিতে প্রবন্ধটি পরিমার্জিত করে প্রকাশ করা হলো। স]

ডাঃ সি. রাধাকৃষ্ণ রাও রয়েল সোসাইটির ফেলো নির্বাচিত

ইণ্ডিয়ান ষ্ট্যাটিষ্টিক্যাল ইনষ্টিটিউটের রিসার্চ অ্যাণ্ড ট্রেনিং স্কুলের ডিরেক্টর বিখ্যাত পরিসংখ্যানবিদ্ ডাঃ সি. রাধাকৃষ্ণ রাও এই বৎসর রয়েল সোসাইটির (লণ্ডন) ফেলো নির্বাচিত হইয়াছেন। এই বৎসর তিনিই একমাত্র ভারতীয়, যিনি এই সম্মানে ভূষিত হইলেন।

ডাঃ রাও ১৯২০ সালের ১০ই সেপ্টেম্বর হাদাগলিতে (দঃ ভাঃ) জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৪০ সালে তিনি প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয় হইতে গণিতে এম. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৯৪৩ সালে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে পরিসংখ্যানে প্রথম শ্রেণীতে এম. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং স্বর্ণপদক লাভ করেন।

১৯৪১ সালে তিনি ইণ্ডিয়ান ষ্ট্যাটিষ্টিক্যাল ইনষ্টিটিউটে যোগদান করেন। ইণ্ডিয়ান ষ্ট্যাটিষ্টিক্যাল ইনষ্টিটিউট হইতে তিনি ডেপুটেশনে কেম্ব্রিজের ডাকওয়ার্থ লেবরেটরিতে প্রেরিত হন—গেবেল মস্নার (আফ্রিকা) প্রাচীন অধিবাসীদের উৎপত্তি সম্পর্কিত অ্যানথ্রোপোমেট্রিক প্রোজেক্ট সম্পর্কে গবেষণার জন্য।

এই প্রোজেক্টে গবেষণালব্ধ তথ্যের ভিত্তিতে নিবন্ধ রচনা করিয়া তিনি কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের পি-এইচ. ডি. ডিগ্রী লাভ করেন। পরবর্তী কালে পরিসংখ্যান সংক্রান্ত গবেষণার জন্য তিনি কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে সিনিয়র ডক্টরেট ডিগ্রি অর্জন করেন।

ডাঃ রাও ১৯৬৫ সালে লণ্ডনের রয়েল ষ্ট্যাটিষ্টিক্যাল সোসাইটির গাই রৌপ্যপদক লাভ করেন। ১৯৫১ সালে তিনি ইন্টারন্যাশন্যাল ষ্ট্যাটিষ্টিক্যাল ইনষ্টিটিউটের সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৫৩ সালে ন্যাশন্যাল ইনষ্টিটিউট অব সায়েন্সেস-এর ফেলো নির্বাচিত হন এবং ১৯৫৮ সালে ইউ.এস.এ-র ইনষ্টিটিউট অব ম্যাথেমেটিক্যাল ষ্ট্যাটিষ্টিক্স-এর ফেলো নির্বাচিত হন।

১৯৫৭ সালে তিনি ইণ্ডিয়ান সোসিয়োলজিক্যাল কনফারেন্সের ষ্ট্যাটিষ্টিক্স এবং ডেমোগ্রাফি শাখায় সভাপতিত্ব করেন। তিনি ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের ১৯৬০ সালের অধিবেশনে পরিসংখ্যান শাখার সভাপতি ছিলেন ইন্টারন্যাশন্যাল ষ্ট্যাটিষ্টিক্যাল ইনষ্টিটিউটের তিনি কোষাধ্যক্ষ (১৯৬২-১৯৬৫) ছিলেন। এতদ্ব্যতীত তিনি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট আছেন।

১৯৫৩-'৫৪ সালে ডাঃ রাও ইউ. এস. এ-র ইলিনয়েস বিশ্ববিদ্যালয়ে ম্যাথেম্যাটিক্যাল ষ্ট্যাটিষ্টিক্সের ভিজিটিং রিসার্চ প্রোফেসর হিসাবে কাজ করেন। ১৯৬৩-'৬৪ সালে তিনি ইউ. এস এ-র ষ্ট্যাণ্ডফোর্ড এবং বাল্টিমোরের জন হপকিন্স বিশ্ববিদ্যালয়ে ষ্ট্যাটিষ্টিক্সের ভিজিটিং প্রোফেসর হিসাবে কাজ করেন। ১৯৬১ সালে তিনি যুক্তরাজ্যে যান এবং বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও রয়েল ষ্ট্যাটিষ্টিক্যাল সোসাইটিতে বক্তৃতা দেন। তিনি টোকিও এবং ইউরোপের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়েও বক্তৃতা প্রদান করেন। ডাঃ রাও পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সময়ে অনুষ্ঠিত পরিসংখ্যান সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক সম্মেলনে যোগদান করেন।

তিনি পরিসংখ্যান সংক্রান্ত প্রায় ১০৩টি গবেষণা-পত্র প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি 'Advanced Statistical Methods in Biometric Research' এবং 'Linear Statistical Inference and its Applications' নামক দুইখানি পুস্তক লিখিয়াছেন এবং ইহা ছাড়া তিনখানি পুস্তকের তিনি যুগ্ম-লেখক।

কিশোর বিজ্ঞানীর দপ্তর

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

এপ্রিল—১৯৬৭

২০শ বর্ষ : ৪র্থ সংখ্যা

ডাঃ সি. রাধাকৃষ্ণ রাও এফ. আর. এস.

ইণ্ডিয়ান ষ্ট্যাটিষ্টিক্যাল ইনষ্টিটিউটের রিসার্চ অ্যাণ্ড ট্রেনিং স্কুলের ডিরেক্টর ডাঃ সি, রাধাকৃষ্ণ রাও এই বৎসর রয়েল সোসাইটির ফেলো নির্বাচিত হইয়াছেন।

করে দেখ

পয়সার নৃত্য

সোডাওয়াটার, সরবৎ বা জলভর্তি বোতল রেফ্রিজারেটরে রেখে ঠাণ্ডা করে নেওয়া হয়। ঠাণ্ডা-করা এক বোতল জল গ্লাসে ঢেলে নেবার পর খালি বোতলটা বেশ কিছুক্ষণ ঠাণ্ডা থাকে। খালি বোতলটাকে টেবিলের উপর রেখে তার খোলা মুখের উপর আঙুল দিয়ে দু-এক ফোঁটা জল লাগিয়ে দাও। এবার বোতলটার জল-লাগানো মুখের উপর একটা তামার পয়সা (পয়সা না পেলে ঐ রকমের একটা তামা বা পিতলের চাকৃতি হলেও চলবে) বসিয়ে দাও। পয়সাটা জলের সঙ্গে বোতলের মুখে এমনভাবে লেগে যাবে যে, কোথাও একটু ফাঁক থাকবে না।
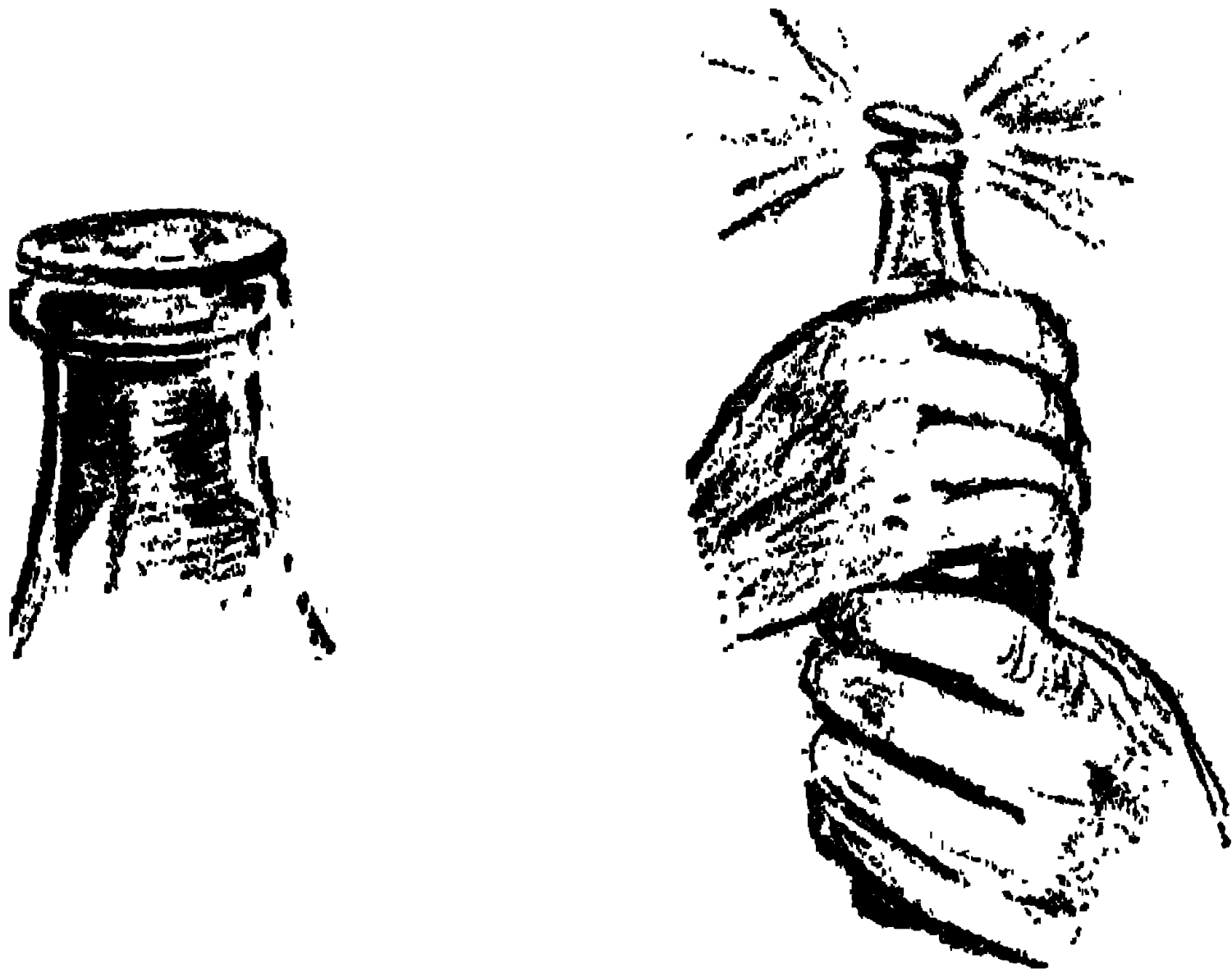
এবার দু-হাত দিয়ে বোতলটাকে বেশ শক্ত করে চেপে ধরে থাক। কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখবে—পয়সাটা একটু একটু ওঠা-নামা করছে এবং তার ফলে খুট্ খুট্ শব্দ হচ্ছে। এবার তোমার হাত সরিয়ে নিলেও দেখবে—তখনও পয়সাটার শব্দ সমানভাবেই চলছে। কেন এমন হয়, সেটা সহজেই বুঝতে পারবে। গরম দিলে বাতাস যে প্রসারিত হয়, এটা তারই একটা চমৎকার দৃষ্টান্ত। বোতলের মধ্যে যে ঠাণ্ডা বাতাস ছিল, হাতের গরমে সেটা প্রসারিত হয়ে বেরিয়ে যাবার দরুণই পয়সাটা ওঠা-নামা করে থাকে।

ক্ষুদে মাছি—ড্রসোফিলা

জীববিজ্ঞানের যে সমস্ত যুগান্তকারী আবিষ্কার হয়েছে তার সবগুলিই নিম্নস্তরের প্রাণীদের উপর গবেষণালব্ধ ফল। ঐ সমস্ত আবিষ্কারের ফল পরে উন্নত স্তরের প্রাণী এবং মানুষের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়। আজ তোমাদের কাছে একটি ক্ষুদে-মাছির কথা বলবো—যে মাছি দু-দু'বার নোবেল পুরস্কার পেয়েছে। অবশ্য প্রত্যক্ষভাবে মাছিটিকে নোবেল পুরস্কার বিজয়ী বলা চলে না। বিজ্ঞানীরা উক্ত মাছির উপর গবেষণা করে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন। তাঁদের পুরস্কারের মূলে আছে এই মাছির অবদান।

যে মাছিটির কথা বলছি, সেটি কিন্তু আমাদের ঘরের সাধারণ মাছির চেয়ে সম্পূর্ণ আলাদা এবং আকারেও খুব ছোট। তোমরা সকলেই হয়তো এই মাছিকে দেখেছ। কলা, আঙুর ইত্যাদি যে কোন ফল খোসা ছাড়িয়ে রেখে দিলে দেখবে, কিছুক্ষণের মধ্যেই এক রকম ক্ষুদে মাছি এসে সেখানে ভীড় করেছে। এগুলিই আমাদের আলোচ্য মাছি। এই মাছিগুলি এত ছোট যে, অণুবীক্ষণ যন্ত্র ছাড়া এদের সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দেখা যায় না। ফলের লোভে আসে বলে এদের ফল-মাছি (Fruit fly) বলা হয়। প্রাণী-বিজ্ঞানীরা এদের নাম দিয়েছেন ড্রসোফিলা (Drosophila)। ড্রসোফিলার অনেকগুলি প্রজাতি আছে—আমরা এখানে ড্রসোফিলা মেলানোগেষ্টার (Drosophila melanogestar) প্রজাতির কথা বলবো। যে কোন জীবের দুটি বৈজ্ঞানিক নাম থাকে। একটি হলো গণের নাম (Generic name) এবং আর একটি হলো প্রজাতির নাম (Specific name)। মানুষেরও বৈজ্ঞানিক নাম দুটি—হোমো স্যাপিয়েন্স (Homo sapiens)। প্রথমটি হলো গণের নাম এবং দ্বিতীয়টি প্রজাতির নাম। যাহোক, এবারে ড্রসোফিলা নিয়ে কিছু আলোচনা করছি।

প্রাণী-জগতে ড্রসোফিলার স্থান

নিম্নস্তরের প্রাণী মাত্রেই অমেরুদণ্ডী অর্থাৎ আমাদের মত এদের মেরুদণ্ড নেই। সুতরাং ড্রসোফিলাও নিঃসন্দেহে অমেরুদণ্ডী প্রাণী। প্রত্যেক প্রাণীই কোন না কোন পর্বের অন্তর্গত এবং প্রত্যেক পর্বেরই শ্রেণী থাকে। আবার শ্রেণীর অন্তর্গত বর্গ এবং বর্গের অন্তর্গত গোত্র থাকে। প্রত্যেক গোত্রের আবার গণ এবং প্রজাতি থাকে। প্রাণিবিদ্যানুযায়ী ড্রসোফিলার শ্রেণী বিভাগ এরূপ—

পর্ব — সন্ধিপদ

শ্রেণী — পতঙ্গ

বর্গ	—	দ্বিপক্ষবিশিষ্ট পতঙ্গ
গোত্র	—	ড্রসোফিলিডি
গণ	—	ড্রসোফিলা
প্রজাতি	—	মেলানোগেষ্টার

ড্রসোফিলা হলো সন্ধিপদ বর্গের অন্তর্গত; কারণ সন্ধিপদের নিম্নোক্ত লক্ষণগুলি আছে—

(১) ড্রসোফিলার শরীর কয়েকটি খণ্ডে বিভক্ত,
(২) প্রত্যেক খণ্ডের পা বা উপাঙ্গগুলি জোড়া লাগানো বা সন্ধিযুক্ত,
(৩) এদের শরীর বহিঃকঙ্কালের দ্বারা আবৃত,
(৪) এদের মাথায় পুঞ্জাক্ষি আছে।

ড্রসোফিলা কীট-পতঙ্গ শ্রেণীর অন্তর্গত; কারণ আরশোলা, গঙ্গাফড়িং, পিঁপড়ে ইত্যাদি পতঙ্গের মত এদের শরীর মস্তক, বক্ষ এবং উদর—এই তিনভাগে বিভক্ত। তাছাড়া এদের তিন জোড়া পা এবং একজোড়া শুঁড় আছে। দুটি ডানা আছে বলে ড্রসোফিলা দ্বিপক্ষ বর্গের অন্তর্গত।

গবেষণা-কার্যে ড্রসোফিলার অবদান—প্রজননবিদ্যা হলো জীববিদ্যার একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা। পিতামাতার গুণাবলী সন্তান-সন্ততিতে বংশানুক্রমে কিভাবে সঞ্চারিত হয়, প্রজননবিদ্যার সাহায্যে তা জানা যায়। ড্রসোফিলার উপর গবেষণা করে প্রজনন-বিদ্যার অনেকগুলি মূল্যবান তথ্য আবিষ্কৃত হয়েছে। ১৯০০ খৃষ্টাব্দের পর থেকে ড্রসোফিলা সমস্ত জীববিজ্ঞানীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বিজ্ঞানীরা এদের গবেষণার উপযোগী আদর্শ প্রাণী বলে মনে করেন।

এবারে কতকগুলি মূল্যবান আবিষ্কারের কথা আলোচনা করছি—যেগুলি ড্রসোফিলার উপর গবেষণালব্ধ ফল।

(১) টি. এইচ. মর্গ্যান সর্বপ্রথম ড্রসোফিলা নিয়ে গবেষণা সুরু করেন এবং 'জিন' থিওরীর প্রতিষ্ঠা করেন, যার জন্যে তাঁকে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়। প্রত্যেক জীবকোষের মধ্যে আণুবীক্ষণিক সূত্রবৎ পদার্থ থাকে, তার নাম ক্রমোসোম। এই ক্রমোসোমকে বংশানুক্রমের বাহক বলা হয়। মর্গ্যানের আবিষ্কার থেকে জানা যায় যে, প্রত্যেক ক্রমোসোমের মধ্যে অতি সূক্ষ্ম বিন্দু বিন্দু পদার্থ আছে—তার নাম জিন।

(২) সন্তান ছেলে হবে, না মেয়ে হবে, সেটা নির্ভর করে ক্রমোসোমের উপর। ক্রমোসোমের সাহায্যে লিঙ্গ নির্ধারণের এই প্রক্রিয়া ড্রসোফিলাতেই সর্বপ্রথম আবিষ্কৃত হয়।

(৩) কতকগুলি রোগ, যেমন—রাতকানা, বর্ণান্ধতা, হিমোফিলিয়া (Haemo-

philia—যার জন্যে রক্তের জমাট বাঁধবার ক্ষমতা নষ্ট হয়ে যায়; ফলে কোন ক্ষতস্থান থেকে অবিরত রক্তক্ষরণ হতে থাকে) ইত্যাদি রোগ বংশানুক্রমে সঞ্চারিত হয়। এই বংশগত রোগ যৌন ক্রমোসোমের সাহায্যে এক পুরুষ থেকে অন্য পুরুষে সঞ্চারিত হয়। এই ধরণের বংশানুক্রমের প্রক্রিয়াও ড্রসোফিলাতেই প্রথম আবিষ্কৃত হয়।

(৪) পারমাণবিক বোমা বিস্ফোরণকালীন যে বিকিরণ ঘটে, তার ফলে ক্রমোসোমের সারিবদ্ধ জিনে পরিবর্তন ঘটে এবং এই পরিবর্তিত জিন বংশপরম্পরায় পরিবাহিত হয়ে নানারকম রোগ ও মহামারীর সৃষ্টি করে। কৃত্রিম উপায়ে এই যে জিনের পরিবর্তন, তা সর্বপ্রথম ড্রসোফিলাতেই আবিষ্কৃত হয়। বিখ্যাত বিজ্ঞানী এইচ. জে. মূলার এক্স-রে'র সাহায্যে কৃত্রিম উপায়ে ড্রসোফিলার জিন পরিবর্তনে সাফল্য লাভ করেন। এই মূল্যবান আবিষ্কারের জন্যে তিনি ১৯৪৭ সালে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন।

সুতরাং তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে, সামান্য একটি ক্ষুদে মাছি—তাথেকে কত গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার সম্ভব হয়েছে।

শুভ্রা দেবনাথ

টাইটানিয়াম

সভ্যজগতের কর্মচাঞ্চল্য যে শুধু লৌহশিল্পের প্রসার ও প্রাধান্যেই বিস্তার লাভ করেছে, একথা আজকে বোধ হয় তোমাদের আর নতুন করে বলতে হবে না। কারণ পৃথিবীর অধিকাংশ ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পেই লৌহের ব্যবহার অপরিহার্য। এক কথায়—লৌহ ও ইস্পাত বর্তমান যন্ত্রযুগের ভিত্তিস্বরূপ। কিন্তু যে হারে লৌহের ব্যবহার হচ্ছে—তাতে আগামী শ'খানেক বছরের মধ্যেই ভাঁড়ার ফুরিয়ে যাবার দিন এলো বলে! কাজেই এখন থেকেই বিজ্ঞানীরা ভাবতে সুরু করেছেন। ভাববারই কথা—কেন না, পৃথিবীর লৌহভাণ্ডার শেষ হলে তো সভ্যজগতের প্রাণস্পন্দন স্তব্ধ হয়ে যাবে! সুতরাং বিজ্ঞানীরা ভাবছেন—কি করে লৌহভাণ্ডার শেষ হবার পূর্বে লৌহের ন্যায় আর একটি শক্তিশালী ধাতু আবিষ্কার করা যায়।

ভেবে ভেবে তাঁরা একটি ব্যবস্থাও ইতিমধ্যে করে ফেলেছেন, অর্থাৎ লোহার বদ্‌লি খুঁজে পেয়েছেন তাঁরা—এই পৃথিবীর মাটিতেই। মাটির প্রতিটি স্তরে এই শক্তিশালী ধাতু লুকিয়ে আছে। লোহার শেষ কণাটুকু শেষ হলেও কলকারখানাকে

সচল রাখতে। এই ধাতু দিয়ে আমরা কাজ চালিয়ে যেতে পারবো। আর দুশ্চিন্তার কোন কারণ নেই।

এই শক্তিশালী ধাতুটির নাম টাইটানিয়াম। এই ধাতুটি ইস্পাতের চেয়ে দ্বিগুণ শক্ত অথচ মজাটা কি জান? ইস্পাতের চেয়ে এই ধাতু অনেক বেশী হাল্‌কা। ফলে ইস্পাতের চেয়েও এর সম্ভাবনা বেশী। ভারী বা হাল্‌কা ইঞ্জিনিয়ারিং নানান যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম থেকে সুরু করে এরোপ্লেন, গ্যাস টারবাইন, রকেট ও অন্যান্য মহাকাশ যান ইত্যাদি বিভিন্ন রকম ক্ষেত্রে এর ব্যবহার দেখা যাবে একদিন। এর আর একটি সুবিধা হলো—এই তেজী ধাতুটি অন্যান্য ধাতুর চেয়ে ক্ষয় পায় খুব ধীর ধীরে। অন্যান্য প্রয়োজনীয় ধাতু, যেমন—লোহা, তামা, অ্যালুমিনিয়াম ইত্যাদির গড় আয়ু সাধারণতঃ পঁয়ত্রিশ থেকে চল্লিশ বছর পর্যন্ত ধরা যেতে পারে। কিন্তু টাইটানিয়ামের গড় আয়ু যদি জানতে চাও, তাহলে বলবো—একে অমর-অক্ষয়ও বলা যেতে পারে। অ্যাসিড, অ্যালক্যালি কিংবা লবণের সাধ্য নেই এর কোন ক্ষতি করে। সমুদ্রের তলায় হাজার হাজার বছর ফেলে রাখলেও এর গায়ে মরচে পড়বার কোন লক্ষণ দেখা যায় না। এমন কি, অ্যাকোয়া রিজিয়া অর্থাৎ ঘন হাইড্রোক্লোরিক ও নাইট্রিক অ্যাসিডের মিশ্রণ—যার কাছে সোনা, রূপা, প্লাটিনাম পর্যন্ত গলে জল হয়ে যায়—টাইটানিয়ামকে কাবু করতে পারে না। শুধু তাই নয়—এর তাপ সইবার ক্ষমতাও অসাধারণ। এর গলনাঙ্ক (Melting point) ১৭২৫° সেন্টিগ্রেড, ইস্পাতের চেয়ে ২০০° ডিগ্রি বেশী।

১৭৯০ সালে প্রথম টাইটানিয়াম অক্সাইডকে খনিজ পদার্থ থেকে আলাদা করা হয়। এর পরেও ১২০ বছর সময় লেগেছে এই ধাতুটিকে আলাদা করে পেতে। ধাতুশিল্পে এর ব্যবহার হয়েছে এই মাত্র সেদিন; অর্থাৎ ১৯৪৬ সালে। তারপর থেকে এর প্রয়োগ দিন দিনই বেড়ে চলেছে—বেড়ে চলেছে হাল্‌কা ও ভারী যন্ত্রশিল্পে। ১৯৪৮ সালে যেখানে মাত্র ১০ টন টাইটানিয়াম নিষ্কাশিত হয়েছিল, ১৯৫৪ সালে সেখানে হয়েছে ৭২০০ টন। আর ১৯৫৫ সালে হয়েছে ২০,০০০ টন। তাহলেই বুঝতে পারছো, কি বিরাট ভবিষ্যৎ নিয়ে এগিয়ে আসছে এই টাইটানিয়াম। একদিন আসবে যেদিন সত্য সত্যই লৌহভাণ্ডার শেষ হয়ে যাবে, সেদিন তার স্থান দখল করবে টাইটানিয়াম।

সুনীল সরকার

লুইগি গ্যালভ্যানি

লুইগি গ্যালভ্যানির নাম তোমরা হয়তো শুনে থাকবে। চল-বিদ্যুতের ইতিহাসে তাঁর নাম চিরস্মরণীয় হয়ে আছে। তাঁর গবেষণার ফল থেকেই চল-বিদ্যুতের সূত্রপাত হয়। গ্যালভ্যানি ১৭৩৭ সালের ৯ই সেপ্টেম্বর ইটালীর বলোনায় জন্মগ্রহণ করেন। ছোটবেলা থেকেই তাঁর ইচ্ছা ছিল তিনি যাজক হবেন। ধর্মশাস্ত্র অধ্যয়নের জন্যে তিনি প্রস্তুত হন। কিন্তু তাঁর বাবা তাঁকে চিকিৎসাবিদ্যা অধ্যয়নে রাজী করান। ডাক্তারী ডিগ্রি লাভের পর অচিরেই তিনি চিকিৎসাবিদ্যায় সুনাম অর্জন করেন। বলোনা বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিক্যাল কলেজে ডাঃ লুইগি গ্যালভ্যানি অ্যানাটমির অধ্যাপনা করতেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তিনি চিকিৎসা-ব্যবসায়ও সুরু করেন।

তিনি পাখার অস্থিসংস্থান সম্বন্ধে কিছু উল্লেখযোগ্য কাজও করেন এবং পাখীর শ্রবণ-যন্ত্র সম্বন্ধে তাঁর গবেষণা প্রশংসা অর্জন করে। গবেষণাগারে তাঁকে সাহায্য করতেন তাঁর স্ত্রী লুসি গ্যালিয়াজি ও তাঁর ছাত্রগণ। তাঁর গবেষণাগারে একটি বিদ্যুৎউৎপাদক যন্ত্র ছিল। মানুষ ও প্রাণিদেহে বৈদ্যুতিক শক্-এর প্রভাব অনুশীলনের জন্যে এই যন্ত্রটি ব্যবহৃত হতো। তখন অনেক চিকিৎসকই বিশ্বাস করতেন, বিদ্যুতের সাহায্যে মানুষের কোন কোন ব্যাধি নিরাময় করা সম্ভব। ডাঃ গ্যালভ্যানিও বিশ্বাস করতেন—বৈদ্যুতিক শক্ প্রয়োগে মানুষের কয়েক ধরণের স্নায়ু-বৈকল্য (Nervous disorder) নিরাময় করা যায়। তাঁর বিশ্বাসের সত্যতা নিরূপণের জন্যে তিনি নানাবিধ পরীক্ষাও করেন।

এক আকস্মিক ঘটনায় ডাঃ গ্যালভ্যানির যুগান্তকারী আবিষ্কারের সূচনা হয়। দুর্বল হয়ে পড়েন। তাঁর স্ত্রী হৃদ্‌রোগে ভুগে শরীর সবল রাখবার জন্যে রোজ তাঁকে ব্যাঙের মাংসের সুপ খেতে হতো এবং ডাঃ গ্যালভ্যানি প্রতিদিন নিজে সুপ তৈরি করতেন।

একদিন সকালে তাঁর গবেষণাগারে টেবিলের উপর কয়েকটি চামড়া ছাড়ানো ব্যাং পড়েছিল। কাছে ছিল বিদ্যুৎ-উৎপাদক যন্ত্র এবং একটা সরু ছুরি। ছুরিটি একটি মৃত ব্যাঙের উপর পড়ে ছিল। ডাঃ গ্যালভানি বেরিয়ে যাবার পর তাঁর স্ত্রী কোন কাজে গবেষণাগারে ঢুকে এক অদ্ভুত দৃশ্য দেখে অবাক হয়ে যান। তিনি দেখেন, টেবিলের উপর রক্ষিত মৃত ব্যাঙের ঠ্যাংটি স্পন্দিত হচ্ছে।

তিনি ছুটে গিয়ে ডাঃ গ্যালভ্যানিকে ঘটনাটা বলেন। কেন এমন হয়, তার কারণ খুঁজতে গিয়ে দেখা গেল, বিদ্যুৎ-উৎপাদক যন্ত্র থেকে উৎপন্ন বিদ্যুৎই এর জন্যে দায়ী। বিদ্যুৎ-উৎপাদক যন্ত্র বন্ধ রেখে ছুরি দিয়ে ব্যাঙের স্নায়ু স্পর্শ করে দেখা গেল

পেশীর স্পন্দন আর হয় না। পুনরায় যন্ত্রটি চালু করতেই পেশীটি স্পন্দিত হতে লাগলো। বিদ্যুৎ-উৎপাদক যন্ত্র থেকে উৎপন্ন বৈদ্যুৎ ছুরির মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে মৃত ব্যাঙের স্নায়ুর উপর কাজ করছিল। এই সব ঘটনা দেখে ডাঃ গ্যালভ্যানির মনে প্রশ্ন জাগে, বজ্রপাতের সময়েও তো মৃত ব্যাঙের ঠ্যাং ঠিক এভাবেই স্পন্দিত হতে পারে।

সব কাজ ছেড়ে ডাঃ গ্যালভ্যানি বিদ্যুৎ সম্পর্কে গবেষণায় মন দিলেন। তাঁর মনে আরও প্রশ্ন জাগে—জীবন ও বিদ্যুতের মধ্যে সম্পর্ক কি? বিদ্যুৎ কি জীবনের প্রকাশক? দিনের পর দিন তিনি এই সব প্রশ্নের সমাধান করবার জন্যে নানা পরীক্ষা রকম করতে থাকেন।

আকাশের বিদ্যুতে মৃত ব্যাঙের ঠ্যাং স্পন্দিত হয় কিনা, দেখবার জন্যে পরীক্ষার প্রস্তুতি চললো। কিন্তু আকাশের বিদ্যুতের জন্যে ঝড় ও বজ্রপাতের প্রয়োজন, আর তার জন্যে অপেক্ষা করতে হবে। অবশেষে ধাতব দণ্ড ও তারের সাহায্যে তিনি আকাশের বিদ্যুৎকে পরীক্ষাগারে আনতে সক্ষম হন। দেখা গেল—ঘর্ষণের ফলে বিদ্যুৎ-উৎপাদক যন্ত্রে যে স্ফুলিঙ্গ উৎপন্ন হয়, তা যেমন মৃত ব্যাঙের ঠ্যাংকে স্পন্দিত করে, আকাশের বিদ্যুৎও ঠিক তেমনি মৃত ব্যাঙের ঠ্যাংকে স্পন্দিত করে। কয়েক বার তিনি পরীক্ষাটা করে দেখেন। আকাশ থেকে লিডেন জারে বিদ্যুৎ সংগ্রহ করে তা মৃত ব্যাঙের ঠ্যাঙের মধ্য দিয়ে মোক্ষণ করে দেখা গেল—ব্যাঙের ঠ্যাং স্পন্দিত হয়। নানাভাবে পরীক্ষা চলতে থাকে। সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহ না হওয়া পর্যন্ত তিনি এই সম্বন্ধে কোন নিশ্চিত সিদ্ধান্ত করেন নি। ১৭৮৬ সালের অক্টোবর মাসে একদিন তিনি একটা মৃত ব্যাঙের ঠ্যাং তামার তারের আংটায় গেঁথে বারান্দায় লোহার রেলিংয়ে ঝুলিয়ে রেখেছিলেন। হঠাৎ তাঁর নজরে পড়লো, বাতাসে দোল খেয়ে যতবার ব্যাংটা লোহার রেলিং স্পর্শ করছে, ততবারই তার মাংসপেশী স্পন্দিত হচ্ছে। মনে হলো যেন মৃত ব্যাঙের দেহে প্রাণসঞ্চার হয়েছে। ডাঃ গ্যালভ্যানি অবাক হয়ে গেলেন। সব রকম আবহাওয়ায় যে কোন সময়ে তিনি এই অদ্ভুত ঘটনা লক্ষ্য করেন। ব্যাং নিয়ে এই অদ্ভুত পরীক্ষায় মেতে থাকতেন বলে লোকে তাঁকে উপহাস করে ব্যাং-নাচানো অধ্যাপক বলতো।

এসব গবেষণা থেকে ডাঃ গ্যালভ্যানির বিশ্বাস হলো—প্রত্যেক প্রাণীর শরীরে প্রকৃতি-দত্ত বিদ্যুৎ আছে। এই বিদ্যুৎ মস্তিষ্ক থেকে স্নায়ুতন্ত্রের মাধ্যমে সারা দেহে পরিব্যাপ্ত হয়; আর মাংসপেশী হচ্ছে এই বিদ্যুতের ভাণ্ডার। কিন্তু তাঁর এই বিশ্বাস যে ঠিক নয়, তা পরে প্রমাণিত হয়েছে। প্রাণীদের শরীরে বিদ্যুৎ থাকে না। তামার আংটা ও লোহার রেলিং-এর সংযোগে বিদ্যুৎ-প্রবাহের সৃষ্টি হয়; অর্থাৎ

ডাঃ গ্যালভ্যানি আর্দ্র মৃত ব্যাং, তামা ও লোহার সমবায়ে একটি সেকেলে বৈদ্যুতিক ব্যাটারীর সৃষ্টি করেছিলেন বলা যায়। ব্যাঙের ঠ্যাঙের স্পন্দন থেকে বোঝা যেত বিদ্যুৎ-সঞ্চালন সুরু হয়েছে। এর পূর্বে বিদ্যুৎ-প্রবাহ প্রদর্শনের অন্য কোন সহজ উপায় ছিল না, ডাঃ গ্যালভ্যানি দেখলেন ব্যাঙের ঠ্যাং সেই কাজ করে। তাঁর বিশ্বাস ঠিক না হলেও এই যুগান্তকারী গবেষণা বিদ্যুতের ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের সৃষ্টি করে। এই বিদ্যুতের সহায়তায়ই মানবসভ্যতার দ্রুত উন্নতি সাধিত হতে থাকে। এই পরীক্ষার পূর্ব পর্যন্ত বিদ্যুৎ বলতে বোঝাতো স্থির-বিদ্যুৎ এবং ঘর্ষণের দ্বারা এই বিদ্যুৎ উৎপন্ন করা হতো।

১৭৯১ সালে ডাঃ গ্যালভ্যানি তাঁর গবেষণার বিষয়বস্তু অবলম্বনে "Commentary on the Forces of Electricity in Muscular Motion" নামক মনোগ্রাফ প্রকাশ করেন।

ডাঃ গ্যালভ্যানির গবেষণায় দেখা গেল—বস্তুর নানা রকমের রাসায়নিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে সহজে প্রচুর বিদ্যুৎ উৎপন্ন করা যায়। এভাবে শক্তির এক নতুন উৎস আবিষ্কৃত হয়।

১৭৯৭ সালে নেপোলিয়ন ইটালী অধিকার করবার পর ডাঃ গ্যালভ্যানিকে রাজানুগত্যের শপথ নিতে বলা হয়। কিন্তু তিনি আনুগত্যের শপথ গ্রহণে অস্বীকৃত হন। ফলে তাঁর অধ্যাপনার কাজ চলে যায়। অভাব-অনটনে তিনি সাংঘাতিক কষ্ট ভোগ করতে থাকেন। কিন্তু পরে তাঁকে চাকুরীতে পুনর্বহাল করা হয় এবং রাজকীয় ঘোষণায় বলা হয় যে, তাঁর আনুগত্যের শপথ গ্রহণের প্রয়োজন নেই। ইতিমধ্যে তাঁর স্ত্রী মারা যান। নানা ঘাত-প্রতিঘাতে ডাঃ গ্যালভ্যানির শরীর ভেঙ্গে পড়ে এবং ১৭৯৮ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন।

শ্রীঅরবিন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রশ্ন ও উত্তর

প্রঃ ১। ফলিডল কি? মানুষ ও জীবজন্তু ইহা খেয়ে মরে কেন?

সৌমেন্দ্রনাথ সরকার

প্রঃ ২। (ক) ডপ্‌লার এফেক্ট কি?

(খ) মোসবাওয়ার এফেক্ট কি?

(গ) জোডিয়াক্যাল লাইট কি?

(ঘ) শরীরে প্রোটিন আধিক্যের ফল কি?

(ঙ) ধূমকেতুর লেজ সম্বন্ধে কিছু জানতে চাই।

মদনমোহন মুখোপাধ্যায়

উঃ ১। নানারূপ কীট-পতঙ্গ খাদ্যশস্যের গাছ ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় গাছপালা খেয়ে নষ্ট করে। সময়মত এদের বিনষ্ট না করলে প্রচুর ক্ষতি হবার সম্ভাবনা। ফলিডল হচ্ছে এক ধরণের কীটঘ্ন পদার্থ। গাছের উপর এই পদার্থটি ছড়িয়ে দেওয়া হয়। এগুলি অতি তীব্র বিষ। তাই মানুষ বা জীবজন্তু, পশুপক্ষী যে কেউ খাক না কেন, তার মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। তবে মাস খানেক পরে ঐসব গাছপালা খেলে কারো কোন ক্ষতি হবার সম্ভাবনা নেই।

উঃ ২। (ক) রেল লাইনের ধারে দাঁড়িয়ে থাকলে দূর থেকে একটা ইঞ্জিন যদি বাঁশী বাজাতে বাজাতে আসতে থাকে, তবে ঐ বাঁশীর শব্দটা একটু লক্ষ্য করলেই একটা অদ্ভুত প্রক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়—ইঞ্জিনটা যত কাছে আসছে, শব্দ ততই কর্কশতর হচ্ছে। যেই ইঞ্জিন সামনে দিয়ে চলে গেল, বাঁশীর শব্দও একেবারে ধপ্‌ করে নেমে গেল। এরপর ইঞ্জিন যত দূরে চলে যাচ্ছে, শব্দের কর্কশতাও ততই কমে আসছে। এখন শব্দের কর্কশতা নির্ভর করে তরঙ্গের কম্পন-সংখ্যার উপর। কম্পন-সংখ্যা যত বেশী, শব্দের কর্কশতা ততই তীব্র। কাজেই সাধারণভাবে বলা যায়, যদি তরঙ্গ-বিকিরণকারী কোন উৎস ও দর্শকের (আলোকের ক্ষেত্রে) বা শ্রোতার (শব্দের ক্ষেত্রে) মধ্যে কোন আপেক্ষিক গতি থাকে, তবে উৎস যত নিকটে আসে, বিকিরিত তরঙ্গের সংখ্যা তত বেড়ে যায় (শব্দ অধিকতর কর্কশ হয়ে ওঠে)। আর উৎসটি যত দূরে চলে যায়, তরঙ্গের কম্পন-সংখ্যাও ততই কমে আসে (শব্দের কর্কশতা কমতে থাকে)। এটাই হচ্ছে ডপ্‌লার এফেক্ট—বিজ্ঞানী ডপ্‌লার এর আবিষ্কর্তা।

(খ) মোসবাওয়ার এফেক্টের বিষয়টি অত্যন্ত জটিল। এই বিভাগের জন্যে

নির্দিষ্ট স্বল্প স্থানে তা বলা সম্ভব নয়। 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' ১৯৬৬ সালের জুন সংখ্যায় এই বিষয়ে একটা স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। সেটি দ্রষ্টব্য।

(গ) চন্দ্রবিহীন সন্ধ্যায় গোধূলীর ঠিক পরেই পশ্চিমাকাশে দিগন্তের উপরে অনেক সময় কোণাকৃতি একটা উজ্জ্বল আলোর ছটা দেখতে পাওয়া যায়। মধ্য এবং নিম্ন অক্ষরেখার অঞ্চলেই এটি বেশী দেখা যায়। এর ঔজ্জ্বল্য মোটামুটি আমাদের ছায়াপথের ঔজ্জ্বল্যের মত। অবশ্য নীচের দিকে ঔজ্জ্বল্য বেশী, উপর দিকে কম। প্রধানতঃ জোডিয়াক (রাশিচক্র বা সূর্যের আপাত গতিপথ) অঞ্চলেই এই ধরণের ঘটনা পরিলক্ষিত হয় বলে এর নাম জোডিয়াক্যাল লাইট। পৃথিবীর কাছাকাছি উল্কা জাতীয় কণিকা থেকে সূর্যরশ্মি প্রতিফলিত হয়ে জোডিয়াক্যাল লাইটের সৃষ্টি করে বলে বিজ্ঞানীদের বিশ্বাস।

(ঘ) প্রোটিন আমাদের শরীরে দুই ভাবে কাজ করে। শিশুর শরীরে প্রধানতঃ নতুন নতুন কোষ সৃষ্টির কাজে অ্যামিনো অ্যাসিডের দরকার এবং তা আসে প্রোটিন থেকে। বয়স্ক লোকেরও অবশ্য নতুন কোষ সৃষ্টির প্রয়োজন আছে, বিভিন্ন কোষের ক্ষয়পূরণের জন্যে। তবে শিশুদের তুলনায় এই প্রয়োজন অনেক কম। তাই অতিরিক্ত প্রোটিন সে ক্ষেত্রে শক্তির যোগান দিয়ে থাকে। শরীর যদি প্রোটিন থেকে উৎপন্ন অ্যামিনো অ্যাসিড অত্যধিক হজম করে, তবে তা কার্বহাইড্রেটের মত ফ্যাট বা চর্বি সৃষ্টি করতে পারে। আর প্রোটিনের পরিমাণ যদি এত বেশী হয় যে, হজম করা সম্ভব নয়—তবে তা বর্জন করা হয় এবং বর্জনীয় পদার্থের সঙ্গে শরীর থেকে বেরিয়ে যায়।

(ঙ) ধূমকেতুর লেজ একটা বিস্ময়কর ও রহস্যজনক বস্তু। ধূমকেতুর মাথাটা ছোট ছোট বস্তুকণিকার দ্বারা গঠিত। এই কণিকাগুলি ঘন সন্নিবিষ্ট নয়। তাই সূর্যরশ্মির চাপে সম্ভবতঃ কণিকাগুলি মাথার বাইরের থেকে ছিট্‌কে যায়। এরাই লেজ গঠন করে। একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে যে, সূর্যমুখী ফুল যেমন সব সময় সূর্যের দিকে তাকিয়ে থাকে, ধূমকেতুর লেজটা ঠিক তার উল্টো, অর্থাৎ সূর্যের বিপরীত দিকে ঘুরে থাকে। সূর্যরশ্মির চাপই যে এজন্যে দায়ী, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। ধূমকেতু যতই সূর্যের কাছে আসে, ততই লেজটা বড় হতে থাকে এবং সূর্যের কাছ থেকে দূরে চলে যাবার সময় লেজটা ক্রমশঃ ছোট হয়ে আসে। লেজটা যত বড়ই হোক না কেন, আসলে খুব হাল্কা, ঘনত্ব অত্যন্ত কম—এত হাল্কা যে, গোটা একটা ধূমকেতুকে গুটিয়ে পকেটে রেখে দেওয়া যায়, যদিও সেটা অনেক সময় ২৫,০০০,০০০ মাইল পর্যন্ত লম্বা হতে পারে।

দীপক বসু

বিবিধ

সৌর জগতের বাইরে

আগামী বারো-চৌদ্দ বছরের মধ্যেই মানুষের তৈরি চালকবিহীন মহাকাশ-যান সৌরমণ্ডলের বাইরে যেতে পারবে, দূরবর্তী গ্রহের আকাশেও তারা হানা দেবে।

মহাকাশ-বিজ্ঞানী ডক্টর হোমার জো স্টুয়ার্ট এক বিবৃতি প্রসঙ্গে বলেছেন, ১৯৭৮ সালের মধ্যে আমরা বৃহস্পতি, শনি, ইউরেনাস বা নেপচুনের দিকে মহাকাশ-যান পাঠাতে পারবো। নয় বছরের মধ্যে সেগুলি লক্ষ্যস্থলে পৌঁছুবে।

নেপচুনের আকাশে সরাসরি পৌঁছুতে লাগবে প্রায় ত্রিশ বছর, কিন্তু জেটবিমান যে আলোকপাত করেছে, তাথেকে আমরা এখন বুঝতে পারছি, একটি গ্রহের মহাকর্ষ ক্ষেত্র থেকে আর একটি গ্রহের মহাকর্ষ ক্ষেত্রে পৌঁছুতে অতি অল্প সময় লাগবে। সৌরমণ্ডলের দূরতম গ্রহেও আমরা নয় বছরের মধ্যে পৌঁছুতে পারবো।

মহাকাশ-যানখানা একটি গ্রহের দিকে ঝুঁকে পড়তে থাকলেই সে অকস্মাৎ শক্তি অর্জন করে গ্রহের দিকে ছিট্‌কে বেরিয়ে যাবে, শক্তির কোন নতুন উৎসের প্রয়োজন হবে না।

এক গ্রহের আকাশ থেকে অন্য গ্রহের আকাশে লাফিয়ে চলা—এমন কি, সৌর-মণ্ডলের বাইরে চলে যাওয়াও অসম্ভব হবে না এবং তা ১৯৮০ সালের মধ্যেই সম্ভব হবে বলে আশা করা যায়।

পরলোকে অপূর্বকুমার চন্দ

বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী অপূর্বকুমার চন্দ ১৪ই মার্চ দিল্লীতে পরলোক গমন করেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৫ বছর।

তাঁর জন্ম হয় শিলচরে, ১৮৯২ সালের ১২ই ফেব্রুয়ারী। তিনি সে যুগের প্রখ্যাত কংগ্রেস-নেতা স্বর্গতঃ কামিনীকুমার চন্দের জ্যেষ্ঠ পুত্র।

স্বর্গতঃ চারুচন্দ্র দত্তের কন্যা শ্রীমতী লোপা-মুদ্রার সঙ্গে অপূর্বকুমার চন্দের বিবাহ হয়। বিবাহের পাঁচ ছয় বছর পরেই তাঁর স্ত্রী মারা যান। তাঁর এক পুত্র ও দুই কন্যা বর্তমান।

কংগ্রেস আন্দোলনে জড়িত থাকবার ফলে তিনি শিলচর সরকারী শিক্ষায়তন থেকে বহিষ্কৃত হন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তাঁকে শান্তিনিকেতনে নিয়ে আসেন। তিনি অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম. এ. পাশ করেন এবং পরে আই-ই-এস হন।

শিক্ষকতার জীবনে তিনি ঢাকা গভর্ণমেন্ট কলেজ, ডেভিড হেয়ার ট্রেনিং কলেজ ও প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন। তিনি অবিভক্ত বাংলার প্রথম ভারতীয় জনশিক্ষা অধিকর্তা এবং পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদের প্রথম চেয়ারম্যান নিযুক্ত হয়েছিলেন। তিনি বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের আজীবন সদস্য ছিলেন।

১৯৩৬ সালে ভারত সরকারের প্রতিনিধি হিসাবে তিনি লীগ অব নেশন্‌স্‌-এ যোগদান করেন। ১৯৩৬ থেকে ১৯৪০ সাল পর্যন্ত কেন্দ্রীয় আইন সভার তিনি মনোনীত সদস্য ছিলেন।

এই সংখ্যার লেখকগণের নাম ও ঠিকানা

১। দীপক বসু
ইনষ্টিটিউট অব রেডিও ফিজিক্স
অ্যাণ্ড ইলেকট্রনিক্স
বিজ্ঞান কলেজ,
৯২, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড
কলিকাতা-৯

২। শ্রীপ্রণবকুমার কুণ্ডু
২২৩, মিত্রপাড়া রোড
নৈহাটি, ২৪ পরগণা

৩। শ্রীদিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়
ও শ্রীশ্যামল ভট্টাচার্য
অবধারক—শ্রীফণীমোহন মুখোপাধ্যায়
(সন্দেশ্বরতলা)
পোঃ—চুঁচুড়া, জেলা—হুগলী

৪। রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়
ক্যালকাটা কেমিক্যাল কোং লিঃ
৩৫, পণ্ডিতিয়া রোড,
কলিকাতা-২৯

৫। শঙ্কর চট্টোপাধ্যায়
৪৮, পঞ্চাননতলা লেন,
বেহালা, কলিকাতা—৩৪

৬। শ্রীমণীন্দ্রকুমার ঘোষ
২২০ আউটার সার্কেল রোড
জামশেদপুর-১

৭। গোপীনাথ সরকার
গণিত বিভাগ, চন্দননগর কলেজ
চন্দননগর,হুগলী

৮। গৌতম বন্দ্যোপাধ্যায়
অবধারক—এন. এন. মুখোপাধ্যায়
রিফ্র্যাক্টরিজ সেকশন
সেন্ট্রাল রিসার্চ অ্যাণ্ড কন্ট্রোল লেবরেটরি
দুর্গাপুর ষ্টিল প্লান্ট
দুর্গাপুর-৩

৯। শ্রীমৃন্ময় সামন্ত
পোষ্ট-গ্রাজুয়েট ছাত্রাবাস
১, বিদ্যাসাগর ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-৯

১০। শুভ্রা দেবনাথ
জীববিদ্যা বিভাগ
রাণীগঞ্জ কলেজ,
রাণীগঞ্জ, বর্ধমান

১১। শ্রীঅরবিন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়
৫ ও ৭, নেতাজী সুভাষচন্দ্র রোড
কলিকাতা-১

১২। শ্রীসুনীল সরকার
(ইনষ্ট্রাক্টর)
B. P. C. Junion Technical School
P. O. Krishnagar. Dist. Nadia

সম্পাদক—শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস কর্তৃক ২৯৪।২।১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড হইতে প্রকাশিত এবং গুপ্তপ্রেস
৩৭।৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা হইতে প্রকাশক কর্তৃক মুদ্রিত

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

বিংশতি বর্ষ　　মে, ১৯৬৭　　পঞ্চম সংখ্যা

জমির উর্বরতা ও সার

শ্রীগৌতম বন্দ্যোপাধ্যায়

বর্তমান ভারতবর্ষের প্রগতির অন্তরায় দুটি—খাদ্য ও জনসংখ্যা। দ্বিতীয়টি এখানে আলোচ্য বিষয় নয় এবং এই বিষয়টির উপর অনেক আলোচনা হয়েছে ও হচ্ছে। ভারতে খাদ্যের উৎপাদন ক্ষমতা খুবই কম। একর প্রতি আমাদের দেশে যে খাদ্যশস্য উৎপন্ন হয়, তা পৃথিবীর অন্যান্য দেশের (যেমন—আমেরিকা, জাপান, রাশিয়া, যুক্তরাজ্য ও অন্যান্য ইউরোপীয় দেশ) তুলনায় অত্যন্ত কম। ভারতবর্ষ এখনও কৃষি-প্রধান, যদিও ভারতে বিভিন্ন শিল্প প্রসার লাভ করেছে। এখনও ভারতের কৃষি-ব্যবস্থা মূলতঃ প্রাকৃতিক জলসেচ এবং অতি অল্প পরিমাণে সারের উপর নির্ভরশীল। বিভিন্ন প্রোজেক্ট অর্থাৎ ক্যানেল, গভীর নলকূপ ইত্যাদির ব্যবস্থা আমাদের দেশেও প্রচলিত আছে, কিন্তু তার পরিমাণ পর্যাপ্ত নয়; তাই কোন বছর ভাল, কোন বছর খারাপ। কাজেই পৃথিবীর স্বাবলম্বী দেশগুলির সাহায্যপ্রার্থী হওয়া ছাড়া আর আমাদের কোন উপায় থাকে না।

জমির ফলন যে কয়টি জিনিষের উপর নির্ভর করে, তার মধ্যে সার অন্যতম। সার জমির উর্বরতা বৃদ্ধি করে, একথা সর্বজনস্বীকার্য। উদ্ভিদের বৃদ্ধির জন্যে নিম্নোক্ত জিনিষের প্রয়োজন—(ক) অধিক পরিমাণে প্রয়োজনীয়—নাইট্রোজেন, ফস্ফরাস, পটাসিয়াম ও জল, (খ) অল্প পরিমাণে প্রয়োজনীয়—চুন, লোহা, ম্যাগ্‌নেসিয়াম, গন্ধক প্রভৃতি। নাইট্রোজেনের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে একটি প্রবাদ বাক্য প্রচলিত আছে—"Man

must feed nitrogen back into the soil or face a decrease in the supply of food". সার অর্থাৎ Fertilizer কথার অর্থ হলো, যা জমির উর্বরতা বৃদ্ধি করে। আগামী চতুর্থ পরিকল্পনায় কৃষি-ব্যবস্থার উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে; কারণ এছাড়া ভারতবর্ষের বর্তমানে আর কোনও উপায় নেই। প্রথম ও দ্বিতীয় পরিকল্পনায় কৃষি-ব্যবস্থার জন্যে যদিও কিছু করা হয়েছিল, তৃতীয় পরিকল্পনায় কিছুই করা হয় নি—সেখানে শিল্প-ব্যবস্থার উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল। ফলে চতুর্থ পরিকল্পনায় কৃষিকে অগ্রাধিকার দেবার বিশেষ প্রয়োজন হয়ে পড়ে। তার ফলেই সার উৎপাদনের ব্যবস্থা সম্বন্ধে বিশেষভাবে চিন্তা করতে হয়েছে।

জমির উর্বরতা বৃদ্ধির জন্যে যে সব জিনিষ ব্যবহৃত হয়ে থাকে, তাকে সাধারণতঃ দুটি শ্রেণীভুক্ত করা যেতে পারে—(ক) প্রাকৃতিক সার, (খ) কৃত্রিম সার বা রাসায়নিক সার। প্রাকৃতিক সারের মধ্যে গোবর সার, পচা পাতা, খইল ও ছাই ইত্যাদি অন্যতম। রাসায়নিক সারকে যথাক্রমে চার ভাগে ভাগ করা যায়—(১) নাইট্রোজেন সার, (২) ফস্‌ফরাস সার, (৩) পটাস সার ও (৪) মিশ্র সার। নাইট্রোজেন সারের মধ্যে আছে অ্যামোনিয়াম সালফেট বা চলিত কথায় সালফেট সার, ইউরিয়া, অ্যামোনিয়াম ফস্‌ফেট, নাইট্রো-লাইম। প্রকৃতির এমনি ব্যবস্থা আছে, যাকে বলা হয় নাইট্রোজেন সাইকল্—যার ফলে নাইট্রোজেন বায়ুমণ্ডল থেকে উদ্ভিদ ও প্রাণীর মাধ্যমে মাটির মধ্যে পর্যায়ক্রমে চলাচল করছে। প্রকৃতির বিচিত্র ব্যবস্থায় নাইট্রোজেনঘটিত বিভিন্ন যৌগিক পদার্থ খাদ্য হিসাবে উদ্ভিদ ও প্রাণীদের প্রয়োজন মিটিয়ে বিভিন্ন জীবাণুর প্রভাবে পুনরায় নাইট্রোজেনে পরিণত হয়। মাটির মধ্যে বিভিন্ন জীবাণুর প্রভাবে বায়ুমণ্ডলের নাইট্রোজেন অজৈব নাইট্রেটে পরিণত হয়। উদ্ভিদ তার পুষ্টি ও বৃদ্ধির জন্যে ওই সব নাইট্রেট টেনে নিয়ে আত্মসাৎ করে। উদ্ভিদদেহের নাইট্রোজেনঘটিত প্রোটিন জাতীয় পদার্থ আবার প্রাণীরা খাদ্যরূপে গ্রহণ করে। উদ্ভিদ ও প্রাণীর দেহ পচে মাটিতে মিশে যায়, প্রাণীদের মলমূত্রও মাটিতে মেশে। এভাবে নাইট্রোজেনঘটিত যৌগিক পদার্থ পুনরায় মাটিতে চলে যায়। জীবাণুর প্রভাবে এর কতকাংশ গ্যাসরূপে বায়ুমণ্ডলে ফিরে যায়, আর কতকাংশ নাইট্রেট রূপে পুনরায় উদ্ভিদদেহে ফিরে আসে।

এখানে প্রথমেই বলে রাখা ভাল যে, নাইট্রোজেনঘটিত সারের হিসাব টন নাইট্রোজেন-এ রাখা হয়। বর্তমানে ভারতের বিভিন্ন জায়গায় উৎপাদিত নাইট্রোজেন সারের হিসাব—

সিন্ধ্রী—	১১৭,০০০ টন নাইট্রোজেন
এফ. এ. সি. টি—	২০,০০০ " "
মহীশূর—	১,৩০০ " "
নাঙ্গাল—	৮০,০০০ " "
সাহ কেমিক্যাল্‌স্—	১০,০০০ " "

১৯৬৫-'৬৬ সালে নিম্নলিখিত নাইট্রোজেন সারের পরিমাণ নিম্নরূপ হবে—

অ্যামোনিয়াম সালফেট—	২৩০,০০০ টন নাইট্রোজেন
নাইট্রো-লাইম—	১৬০,০০০ " "
ইউরিয়া—	২৪০,০০০ " "
অ্যামোনিয়াম ফস্‌ফেট—	২৪০,০০০ " "
অ্যামোনিয়াম সালফেট/নাইট্রেট—	৩০,০০০ " "
নাইট্রো-ফস্‌ফেট—	৪০,০০০ " "

ফস্‌ফেট ফারটিলাইজার বলতে সাধারণতঃ সুপার ফস্‌ফেটকেই বোঝায়। যদিও অ্যামোনিয়াম ফস্‌ফেট, ডাইক্যালসিয়াম ফস্‌ফেটও এরই অন্তর্ভুক্ত। জমিতে নাইট্রোজেন সার ব্যবহার করে দেখা গেছে যে, এর সঙ্গে ফস্‌ফেট সার দেওয়া শুধু মাত্র উপকারীই নয়, প্রয়োজনীয়ও বটে। দ্বিতীয় পরিকল্পনা কালে নাইট্রোজেন ফস্‌ফেটের

যে বিসদৃশ অনুপাত ছিল ৩ : ১, তাকে তৃতীয় পরিকল্পনা কালে যদিও ১ : ১ অনুপাতে আনবার কথা ছিল, তথাপি এখন দেখা যাচ্ছে ২ : ১ অনুপাত পর্যন্ত নেমেছে।

পটাস সারের খুব বেশী প্রচলন নেই—পটাসিয়াম সালফেট ও পটাসিয়াম ক্লোরাইড বা মিউরিয়েট—এই দুটিই পটাসের উল্লেখযোগ্য সার। মিউরিয়েট সারের প্রয়োজন হয় বা উৎপন্ন হয় ২৪,০০০ টন এবং পটাসিয়াম সালফেট ৯০০০ টন।

মিশ্র সার আর কিছুই নয়, বিভিন্ন সারের মিশ্রণ মাত্র। মিশ্র সারকে সাধারণত: ৩-১২-৬ বা ২-১২-৬ বা ৫-১০-৫—এই ভাবে লেখা হয়। এই ভাবে লেখবার অর্থ হলো শতকরা ভাগ—৩-১২-৬ যথাক্রমে N, P_2O_5 ও K_2O এর অংশ; অর্থাৎ উল্লিখিত অনুপাতে কোন নাইট্রোজেন সার, ফস্‌ফেট সার ও পটাস সারকে মেশানো হয়েছে।

প্রতি বছর ফলনের পর জমির উর্বরতা হ্রাস পায়, কারণ গাছের বৃদ্ধির সময় জমি থেকে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি গ্রহণ করবার ফলে জমিতে ঐ সব জিনিষের ঘাটতি পড়ে এবং প্রতি বছর সার ব্যবহার করা আবশ্যক হয়ে পড়ে। উল্লিখিত সারগুলি জমির উর্বরতা বৃদ্ধির জন্যে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এখন দেখা গেছে যে, জমিতে যদি শুধু মাত্র অ্যামানিয়াম সালফেট ব্যবহার করা হয়, তবে জমির উর্বরতা প্রতি বছর হ্রাস পায় এবং জমিতে আশানুরূপ ফলন হয় না। এই ব্যাপারটি আমাদের দেশে খুবই দেখা যাচ্ছে। একটু অনুসন্ধানে আসল রূপটি সহজেই ধরা যায়। জমিতে শুধু মাত্র অ্যামোনিয়াম সালফেট সার দিলে যে সালফেট অংশ পড়ে থাকে, জমিতে তার রাসায়নিক ক্রিয়া ঘটে এবং সালফেট আয়ন সালফিউরিক অ্যাসিডে পরিণত হয়। ফলে সালফেট আয়ন এবং সালফিউরিক অ্যাসিডের যুক্ত প্রক্রিয়ায় উর্বরতা হ্রাস পায়। কাজেই যদি সালফেট সার ব্যবহার করতে হয়, তাহলে প্রতি বছর বা এক বছর অন্তর জমিতে কিছু পরিমাণ চুন ছড়িয়ে দিতে হবে। এর ফলে চুন সালফেট আয়ন ও অ্যাসিডের প্রভাব থেকে জমিকে রক্ষা করবে। চুনের পরিবর্তে অনেক সময় হাড়ের গুঁড়াও কাজ দেয়। হাড়ের গুঁড়া দুটি কাজ করে—এক দিকে জমিকে অম্লের প্রভাব থেকে রক্ষা করে, অন্য দিকে উর্বরতা বৃদ্ধি করে।

ফলনের জন্যে প্রাকৃতিক সার ও রাসায়নিক সার জমিতে ব্যবহারের প্রয়োজন—একথা অনস্বীকার্য। কিন্তু যদিও পূর্বে বলা হয়েছে তবুও একথা বলা দরকার যে, জমিতে উপযুক্ত পরিমাণে জল দেওয়া না হলে জমির ফলন হতে পারে না—জমির উর্বরতাকে কোন রকমে কাজে লাগানো যেতে পারে না। কাজেই উপযুক্ত ব্যবহারের জন্যে চাই প্রয়োজনীয় জল। এই জলের জন্যে প্রাকৃতিক অবস্থার উপর নির্ভর করে থাকলে চলবে না—কারণ প্রায়ই এরূপ অবস্থা হতে পারে; কাজেই সেচের কৃত্রিম ব্যবস্থার দরকার। কৃত্রিম জলসেচ ব্যবস্থা, প্রচুর পরিমাণে (অবশ্যই পরিমিত) সারের ব্যবহার আর বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে অধিক খাদ্য ফলানোই বর্তমান ভারতের সঙ্কট ত্রাণের একমাত্র উপায়।

এখানে এবার কৃত্রিম সার তৈরি সম্বন্ধে বলবার আগে আমাদের দেশে বর্তমান সারের অবস্থা অর্থাৎ কোন্ জায়গা থেকে এগুলি পাওয়া যায় এবং কারা তৈরি করে, তা একটু জানা দরকার। সার তৈরি হয় সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে। সরকারী প্রতিষ্ঠানটির নাম ফার্টিলাইজার কর্পোরেশন অব ইণ্ডিয়া। এর অধীনে ভারতবর্ষে বিভিন্ন জায়গায় কারখানা আছে। সর্বপ্রথম হচ্ছে সিন্ধ্রী, তাছাড়া একটি হচ্ছে

F. C. I-এর কেন্দ্রস্থল। আর আছে ট্রম্বে ফারটিলাইজার, দুর্গাপুর ফারটিলাইজার, নাজাল ফারটিলাইজার, নাইভেলী ফারটিলাইজার। আরও একটি হচ্ছে রাউরকেলা ফারটিলাইজার—এটির নাম আলাদা করে বলবার উদ্দেশ্য হলো, এটি F. C. I.-এর অন্তর্ভুক্ত নয়। এটি হিন্দুস্থান ষ্টিল লিমিটেড-এর অধীনে। F. C. I-এর অধীনে আরও দুটি কারখানার নাম এখানে করা উচিত—আসাম ও গোরক্ষপুর ফারটিলাইজার। FACT Fertilizer, যেটি ফারটিলাইজার অ্যাণ্ড কেমিক্যালস্, ত্রিবাঙ্কুরের একটি বৃহৎ প্রতিষ্ঠান। বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের মধ্যে আছে—সাহু কেমিক্যালস্, পেরী অ্যাণ্ড কোম্পানী, বিশাখাপত্তম ফারটিলাইজার, মধ্যপ্রদেশ ফারটিলাইজার, রাজস্থান ফারটিলাইজার প্রভৃতি। এখানে ফারটিলাইজার কারখানাগুলির অবস্থান, কোন সালে তৈরি শেষ হবে এবং কত পরিমাণ সার তৈরি হবে, তার একটি পরিসংখ্যান দেওয়া হলো।

(ক) সরকারী প্রতিষ্ঠান

কারখানা	প্রদেশ (অবস্থান)	যে সালে শেষ হবে	আরও কত তৈরি হবে টন অব নাইট্রোজেন	কোন্ ধরনের সার	কোন্ জিনিষ থেকে তৈরি হবে
রাউরকেলা	উড়িষ্যা	১৯৬৩-৬৪	১২০,০০০	নাইট্রো-লাইম	কোক ওভেন গ্যাস
দুর্গাপুর	পঃ বাংলা	১৯৬৯-৭০	৫৪,০০০	ইউরিয়া	অ্যামোনিয়া
ট্রম্বে	মহারাষ্ট্র	১৯৬৫-৬৬	৯০,০০০	ইউরিয়া ও নাইট্রো-ফস্‌ফেট	পেট্রো-কেমিক্যাল্‌স্
নাইভেলী	মাদ্রাজ	১৯৬৫-৬৬	৭০,০০০	ইউরিয়া	লিগ্‌নাইট
নামরূপ	আসাম	১৯৬৬-৬৮	৩২,০০০	ইউরিয়া ও সালফেট	অ্যাসোসিয়েটেড গ্যাস
FACT	কেরল	১৯৬৪-৬৫	৪০,০০০	অ্যামোনিয়াম সালফেট, ফস্‌ফেট, ক্লোরাইড	স্যাপ্‌থা
গোরখপুর	উত্তর প্রদেশ	১৯৬৬-৬৭	৮০,০০০	ইউরিয়া	ন্যাপ্‌থা

(খ) বেসরকারী প্রতিষ্ঠান

কারখানা	প্রদেশ (অবস্থান)	যে সালে শেষ হবে	আরও কত তৈরি হবে টন অব নাইট্রোজেন	কোন্ ধরনের সার	কোন্ জিনিষ থেকে তৈরি হবে
কাটনি	মধ্য প্রদেশ	১৯৬৪-৬৫	৫০,০০০	ইউরিয়া	কয়লা
হনুমানগড়	রাজস্থান	১৯৬৫-৬৬	৮০,০০০	অ্যামোনিয়াম সাল্‌ফেট	„
কোথাগুডিয়াম	অন্ধ্র	১৯৬০-৬৬	৮০,০০০	ইউরিয়া	„
বিশাখাপত্তম	„	১৯৬৫-৬৬	৮০,০০০	ইউরিয়া ও অ্যামোনিয়াম ফস্‌ফেট	ন্যাপ্‌থা
সাহু কেমিক্যাল্‌স্	উত্তর প্রদেশ	১৯৬৬-৬৭	১০,০০০	অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড	কয়লা
পেরী কোম্পানী	মাদ্রাজ	১৯৬৩-৬৪	৪,২০০	অ্যামোনিয়াম ফস্‌ফেট	ন্যাপ্‌থা
বাইপ্রোডাক্ট অব ষ্টীল প্ল্যান্ট	—	১৯৬৫-৬৬	১০,০০০	অ্যামোনিয়াম সালফেট	অ্যামোনিয়া

সিন্ধ্রী সার কারখানায় বর্তমানে ১১৭,০০০ টন নাইট্রোজেন সার তৈরি হয়। এই কারখানায় তৃতীয় পরিকল্পনার শেষে আরও ১১,০০০ টন নাইট্রোজেন (ইউরিয়া) ও ৩৬,০০০ টন নাইট্রোজেন (অ্যামোনিয়াম সালফেট/নাইট্রেট) তৈরি হচ্ছে। FACT কারখানার অধীনে উপরিউক্ত যোজনা ছাড়া আরও ২০,০০০ টন নাইট্রোজেনজনিত সার তৈরি হয়ে থাকে। নাঙ্গাল সার কারখানায় তৈরি হয় ৮০,০০০ টন নাইট্রোজেন (ক্যালসিয়াম অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট, বা নাইট্রো লাইম)

দ্বিতীয় পরিকল্পনা কালে প্রতি টন অ্যামোনিয়াম সালফেট সারের দাম ছিল ৩১৫ টাকা। ১৯৫৭ সালে ঐ দাম বেড়ে দাঁড়ায় ৩৫০ টাকা। ১৯৫৯ সালে টেরিফ কমিশন প্রতি টন সারের দাম ৩০০ টাকা রাখবার অনুরোধ জানান। বর্তমানে প্রতি টন সারের দাম বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩৭৫ টাকা।

এখন সার তৈরির পদ্ধতিগুলি সম্বন্ধে অল্প কিছু আলোচনা করা যাক। আলোচনা অবশ্য খুবই কম হবে, কারণ প্রতিটি পদ্ধতিই বিশাল এবং কোন একটি আলোচনা নিয়েই একটি প্রবন্ধ রচনা করা যেতে পারে। প্রথমেই ধরা যাক সর্বাধিক পরিমাণে ব্যবহৃত অ্যামোনিয়াম সালফেট। এই সার তৈরির জন্যে দুটি জিনিষের প্রয়োজন—অ্যামোনিয়া ও সালফিউরিক অম্ল। অ্যামোনিয়া সাধারণতঃ দুটি উপায়ে পাওয়া যায়—(১) নাইট্রোজেন ও হাইড্রোজেন গ্যাসকে ১ : ৩ অনুপাতে মিশিয়ে অনুঘটকের সাহায্যে রাসায়নিক সংযোগ সাধন—এটি অনেক উপায়ে (প্রায় ছয়টি) তৈরি করা যায়। আমাদের দেশে সিন্ধ্রী কারখানায় অ্যামোনিয়া তৈরি করা হয় Haver's process-এ নাইট্রোজেন ও হাইড্রোজেনের রাসায়নিক সংযোগ ঘটিয়ে। এই দুটির সংযোগ ঘটালেই—

$$2NH_4OH+H_2SO_4=(NH_4)_2SO_4+2H_2O$$

অ্যামোনিয়াম সালফেট

অ্যামোনিয়াম সালফেট মিলবে। কিন্তু কথাটা যত সহজে বলা হলো অত সহজে মিলবে না। কারণ তখন একটি জলীয় দ্রবণ মাত্র পাওয়া যাবে। এথেকে অ্যামোনিয়াম সালফেট সার পেতে গেলে বাষ্পীভবন, পাতন ও কেলাসীকরণ পদ্ধতির সাহায্যের প্রয়োজন। পৃথিবীর প্রায় সব জায়গায় এই পদ্ধতিই অনুসরণ করা হয়। কিন্তু আমাদের সিন্ধ্রীতে এই পদ্ধতির বদলে অন্য পদ্ধতির আশ্রয় নেওয়া হয়।

$$2NH_4OH+Ca\,SO_4+CO_2=(NH_4)_2SO_4+Ca\,CO_3\downarrow+H_2O.$$

জিপ্‌সাম অ্যামোনিয়াম সালফেট

প্রথমে জিপ্‌সামকে গুঁড়া করে জলে দেওয়া হয় এবং একই সঙ্গে অ্যামোনিয়া ও কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস ওই দ্রবণে চালনা করা হয়। ফলে উপরিউক্ত রাসায়নিক বিক্রিয়া সংঘটিত হয়। সঙ্গে সঙ্গে ক্যালসিয়াম কার্বনেটের অধঃক্ষেপ পড়ে এবং তাকে সরিয়ে ফেলা হয় এবং আগের পদ্ধতি অনুসরণ করে সার পাওয়া যায়। আমাদের দেশে গন্ধক খুবই কম আছে, প্রায় সবটাই বিদেশ থেকে আমদানী করতে হয়। কিন্তু জিপ্‌সাম আমাদের দেশে প্রচুর

পরিমাণে পাওয়া যায়। এই পদ্ধতি অনুসরণ করবার ফলে তাই আমাদের অনেক সুবিধা হয়েছে এবং কিছুটা দুর্ভাবনা কমেছে।

দ্বিতীয় এবং আধুনিক সার হলো ইউরিয়া। সার হিসাবে চাহিদা ছাড়াও প্লাষ্টিক শিল্পেও ইউরিয়ার প্রচুর চাহিদা আছে। এই সার তৈরি করতে দরকার হয় দুটি জিনিষের—অ্যামোনিয়া ও কার্বন ডাইঅক্সাইড।

$$CO_2 + 2NH_3 = NH_4 . CO_2NH_2 \text{ (অ্যামোনিয়াম কার্বামেট)}$$
$$NH_4 CO NH_2 = NH_2 . CO.NH_2 + H_2O$$
(ইউরিয়া)

অ্যামোনিয়া ও কার্বন ডাইঅক্সাইড—এই দুটির রাসায়নিক সংযোগ বিভিন্ন উপায়ে সংঘটিত হতে পারে। উপযুক্ত পরিমাণে দুটিকে একটি পাত্রে নিয়ে চাপ ও তাপ প্রয়োগ (১৬০°-১৮০° সেঃ ও ১৫০-২০০ বায়বীয় চাপ) করলে ইউরিয়া তৈরি হয় এবং আনুষঙ্গিক পদ্ধতিগুলি—যেমন, বাষ্পীভবন ইত্যাদি অবশ্যই আছে। এটি অবশ্য অনেকগুলি পদ্ধতির একটি—নাম সলভে পদ্ধতি (Solvay Process)।

অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট ($NH_4 NO_3$) অ্যামোনিয়া ও নাইট্রিক অম্ল—এই দুটির রাসায়নিক সংযোগে সৃষ্টি হয়। সুপার ফস্‌ফেট সারটি প্রস্তুত করা হয় রক ফস্‌ফেট নামক পাথর থেকে। ঐ পাথর গুঁড়া করে তার সঙ্গে সালফিউরিক অম্ল মেশালে সুপার ফস্‌ফেটে পরিণত হয়।

$$Ca_3 (PO_4)_2 + 2H_2 SO_4 + H_2 SO_4 = CaH_4 (PO_4)_2 + 2 (Ca SO_4 .2H_2O)$$
মনোক্যালসিয়াম ফস্‌ফেট জিপ্‌সাম
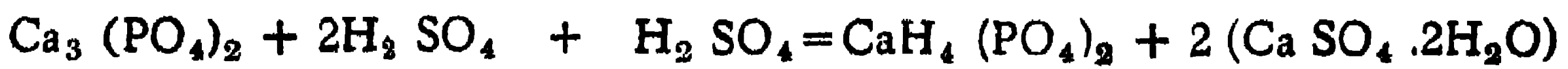
এই মনোক্যালসিয়াম ফস্‌ফেটই হচ্ছে সুপার ফস্‌ফেটের আসল জিনিষ। এই পদ্ধতির নাম ডেন পদ্ধতি (Den Procoss)। পৃথিবীর অন্য দেশে আর একটি সারের ব্যবহার আছে—অবশ্য দিনে দিনে তার ব্যবহার কমে আসছে। তার নাম চিলি সল্টপিটার (সোডিয়াম নাইট্রেট খনিজ)। নাম থেকেই প্রতীয়মান হয় যে, চিলি দেশই এর প্রাপ্তিস্থান। ব্যবহারের ফলে এটি প্রায় ফুরিয়ে এসেছে। আমাদের দেশে ঐ রকম খনিজ বিশেষ নেই, সুতরাং তার প্রচলনও কম।

আমাদের দেশ কৃষিপ্রধান হলেও প্রতি একরে ফলন খুবই কম। তার কতকগুলি কারণ আছে—(১) আমাদের দেশে চাষের পদ্ধতির বৈজ্ঞানিক ভিত্তি ও তার ব্যবহার কম। (২) আমাদের দেশে কতকগুলি কৃষি গবেষণাগারের অতি অল্প পরিমাণ জমিতে ভাল ভাবে চাষ হচ্ছে; ফলে সেটুকু জমিতেই ভাল ফলন হচ্ছে। কিন্তু গবেষণাগার থেকে বেরিয়ে এসে সব জমিতেই যাতে ভাল ফলন হয়, আমাদের এখন তার জন্যে সচেষ্ট হতে হবে। (৩) পৃথিবীর অন্যান্য দেশে ট্র্যাক্টর ইত্যাদির দ্বারা বিরাট ভূখণ্ডে একসঙ্গে চাষ হচ্ছে। ভাল করেই চাষ হচ্ছে একসঙ্গে বিপুল পরিমাণে, কিন্তু আমাদের দেশের অবস্থা একেবারেই অন্য রকম। বিশেষ বড় জমি একেবারেই দেখা যায় না। ছোট ছোট জমি ২ কাঠা, ৫ কাঠা, ১০ কাঠা ইত্যাদি এবং এক একটি জমির মালিকানা এক একজনের—ফলে চাষেরও হেরফের হয়। তাই আমাদের দেশে একসঙ্গে ভাল করে চাষ করবার অসুবিধা আছে। এক্ষেত্রে সরকার যদি

আইন করে সব জমি ৩-৪ একর টানা জমিতে পরিণত করে দিতে পারেন—কো-অপারেটিভ বা অন্য উপায়ে, তাহলে খুবই ভাল হয়। (৪) প্রাকৃতিক সার ও রাসায়নিক সার প্রতি বছর ভালভাবে ব্যবহার করতে হবে। কারণ চাষের ফলে প্রতি বছর জমির যে উর্বরতা নষ্ট হচ্ছে, তা পুরণ করে দিতে হবে। সারের ব্যবহার আমাদের দেশের জমিতে পরিমিত নয়। (৫) উপযুক্ত পরিমাণে জলের অভাব। জলসেচের ব্যবস্থা এমনই যে, যে সময় জলের দরকার, সেই সময় জল দিতে পারে না—যেটুকু জমিতে জল দেওয়া হয়, তা আমাদের দেশের সমস্ত জমির তুলনায় খুবই কম। তাই জলসেচ ব্যবস্থার প্রভূত উন্নতি সাধন আবশ্যক। (৬) উপযুক্ত বীজের অভাব। বীজ ভাল না হলে ভাল চাষ হলেও ফলন ভাল হবে না। তাই ভাল বীজ চাই। এবারের চাষে একটি নতুন বীজের সন্ধান পাওয়া গেছে, নাম 'তাই চুং'—যার ফলন খুবই আশাপ্রদ। কাগজে এই বীজের কথা কয়েক বারই প্রকাশিত হয়েছে। একটি বিশেষত্ব হচ্ছে যে, এই চাষে চাই বেশী জল ও বেশী সার। কিন্তু ফলন পাওয়া যাবে তিন গুণেরও বেশী।

ভারতবর্ষের জনগণের মনে আজ একটি মাত্র আকাঙ্ক্ষা—আমাদের স্বয়ংসম্পূর্ণতা। এই ব্যাপারটি সফল করতে হলে সর্বাগ্রে চাই খাদ্যে স্বয়ংনির্ভরতা। তাই অধিক পরিমাণে খাদ্য উৎপাদনই হচ্ছে আমাদের একমাত্র কর্তব্য। অধিক খাদ্য ফলাতে গেলে যে কয়টি বিশেষ বিষয়ের উপর আমাদের গুরুত্ব দিতে হবে, তার মধ্যে জমির উর্বরতা রক্ষা ও প্রচুর সার উৎপাদন অন্যতম। বর্তমানে দেশব্যাপী কৃষি-ব্যবস্থা ও খাদ্য-উৎপাদনের এই শোচনীয় ব্যর্থতা দেখে নিরাশ হলে চলবে না বা বিদেশ থেকে সাময়িকভাবে খাদ্য আমদানী করে সন্তুষ্ট থাকলেও চলবে না—আমাদের আত্মনির্ভরশীল হতেই হবে। নিষ্ঠা, পরিশ্রম ও আত্মবিশ্বাস নিয়ে আমাদের সামনে এগিয়ে যেতে হবে।

পরমাণুর গঠন-রহস্য উদ্ভেদে আলফা ও বিটা কণিকা

দেবব্রত মুখোপাধ্যায়

পারমাণবিক জগতে আলফা ও বিটা কণিকা হচ্ছে পদার্থ বিজ্ঞানীদের প্রেরিত প্রথম দূত এবং অতি সুষ্ঠুভাবেই এরা দৌত্যকার্য সমাধা করে পারমাণবিক জগতের অনেক খবরই এনে দিয়েছিল বিজ্ঞানীদের কাছে। পদার্থের অভ্যন্তরে এই সব কণিকা ছুঁড়ে দেবার পর এদের গতিপথের পরিবর্তন থেকে পদার্থের পারমাণবিক গঠন সম্বন্ধে একটা ধারণা পাওয়া যায়। কিন্তু সে সব আলোচনার ভিতর যাবার আগে আমাদের আলফা ও বিটা কণিকার ধর্মগত বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে একটা ধারণা থাকা আবশ্যক।

প্রকৃতপক্ষে আলফা ও বিটা কণিকা উভয়েই আমাদের কাছে বিলক্ষণ পরিচিত। বিশেষ অবস্থায় হিলিয়াম পরমাণুর কেন্দ্রক ও ইলেকট্রনই যথাক্রমে আলফা ও বিটা কণিকা ছদ্মনাম গ্রহণ করেছে মাত্র। পাঠকের নিশ্চয়ই জানা আছে যে, পর্যায়সারণীর শেষের দিকের মৌলিক পদার্থগুলি তেজস্ক্রিয় এবং তারা সব সময় তেজস্ক্রিয় রশ্মি বিকিরণ করে ক্রমে সীসায় পরিণত হয়।

প্রথমে এই রশ্মিকে শুধু মাত্র শক্তিশালী বিদ্যুচ্চুম্বকীয় বিকিরণ বলেই মনে করা হয়েছিল, কিন্তু চৌম্বক ক্ষেত্রের মধ্য দিয়ে এই রশ্মিকে অতিক্রম করিয়ে দেখা গেল যে, এই রশ্মি তিনটি ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। এই তিনটি রশ্মির জাতি-ধর্ম, নামধাম কিছুই জানা ছিল না বলে এদের নাম দেওয়া হলো আলফা, বিটা ও গামা রশ্মি। দেখা গেল, আলফা ও বিটা রশ্মি উভয়েই চৌম্বক ক্ষেত্রে সমকোণে ঝুঁকে পড়ে, কিন্তু এদের বক্রতার মুখ বিপরীত ও অসমান। আলফা রশ্মির তুলনায় বিটা রশ্মির দিক বিক্ষিপ্ত হয় অনেক বেশী। তৃতীয় অংশটির অর্থাৎ তথাকথিত গামা রশ্মির কোন দিক বিচ্যুতি ঘটে না। চৌম্বক ক্ষেত্র কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারে না এর গতির উপর। কিন্তু এর পদার্থ ভেদ করবার ক্ষমতা অসাধারণ বলে প্রমাণিত হলো। এই সব পর্যবেক্ষণ থেকে বোঝা গেল যে, আলফা রশ্মি হচ্ছে দ্রুতগতিসম্পন্ন ধনাত্মক তড়িৎ-কণিকার স্রোত এবং বিটা রশ্মি হচ্ছে ঋণাত্মক তড়িৎ কণিকার স্রোত। আরও পরীক্ষার ফলে এই সিদ্ধান্তগুলি সমর্থিত হলো এবং আলফা ও বিটা কণিকাকে হিলিয়াম কেন্দ্রক ও ইলেকট্রন বলে বৈজ্ঞানিকেরা বুঝতে পারলেন। দেখা গেল যে, গামা রশ্মি অতি উচ্চ শক্তিসম্পন্ন ও অতি ক্ষুদ্র তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের বিদ্যুচ্চুম্বকীয় বিকিরণ। বলা বাহুল্য, আলফা কণিকার তড়িৎ-শক্তি ইলেকট্রনের তড়িৎ-শক্তির দ্বিগুণ ও বিপরীত ধর্মী এবং এর ভর হাইড্রোজেন পরমাণুর প্রায় চার গুণ, অর্থাৎ একটি বিটা কণিকা বা ইলেকট্রনের ভরের প্রায় সাড়ে সাত হাজার গুণ। যেহেতু আলফা কণিকার ভর চার পারমাণবিক একক এবং এর বৈদ্যুতিক চার্জ দুই একক, সেহেতু স্পষ্টতঃই বোঝা যায়, এরা দুটি প্রোটন ও দুটি নিউট্রনের সমন্বয়ে গঠিত। আমরা হয়তো প্রয়োজনের অতিরিক্ত অগ্রসর হয়েছি, এবার প্রকৃত প্রসঙ্গে ফিরে যাওয়া যাক। আলফা ও বিটা কণিকার আয়তন যে কোন মৌলিক পদার্থের পারমাণবিক আয়তনের তুলনায় নগণ্য। সুতরাং পরমাণুর পরিপ্রেক্ষিতে এগুলিকে তড়িৎ-বিন্দু (Point charge) বলে গণ্য করা যেতে পারে। তেজস্ক্রিয় পদার্থ থেকে নির্গত আলফা কণিকার প্রারম্ভিক গতিবেগ ২.২২×১০^{৯} সে. মি. থেকে ১.৪৫×১০^{৯} সে. মি.-এর মধ্যে সচরাচর হয়ে থাকে; অর্থাৎ কণিকাগুলির গতিশক্তি যথাক্রমে ১.৫৩×১০^{-৫} আর্গ থেকে $.৬৪৫ \times ১০^{-৫}$ আর্গের মধ্যে থাকে। আলফা বা বিটা কণিকাগুলির শক্তি নির্ভর করে তাদের জন্মদাতা তেজস্ক্রিয় পদার্থের উপর। বিটা কণিকাগুলি অতি মন্থর গতি থেকে সুরু করে অতি উচ্চ গতিবেগসম্পন্ন হতে পারে। .৫ ভোল্ট বিভব পার্থক্যের মধ্য দিয়ে পাঠালে ইলেকট্রনের গতিবেগ হয় ৪.২×১০^{৭} সে. মি. প্রতি সেকেণ্ডে; অর্থাৎ আলোর গতিবেগের .০০১৪ গুণ। উচ্চতম গতিবেগসম্পন্ন বিটা কণিকাগুলির গতিবেগ প্রায় আলোর গতিবেগের .৯৯৮ গুণ পর্যন্ত হয়ে থাকে এবং এই সব ইলেকট্রনের গতিশক্তি হয় $১.২ - ১০^{-৫}$ আর্গ পর্যন্ত। আমরা গতিশীল ইলেকট্রনগুলিকে প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী ক্যাথোড কণিকা বলে অভিহিত করবো।

দ্রুতগতিসম্পন্ন আলফা কণিকা ও ইলেকট্রন-স্রোতের ধর্মগত অনেক সাদৃশ্য দেখা যায়। একটি নির্দিষ্ট আকারের ছিদ্রের মধ্য দিয়ে নির্গত একটি সমান্তরাল আলফা অথবা ক্যাথোড রশ্মিকে যদি উচ্চ বায়ুশূন্যতার মধ্য দিয়ে অতিক্রম করিয়ে একটি ফটোগ্রাফিক প্লেটের উপর ফেলা যায়, তবে উক্ত ছিদ্রটির একটি পরিষ্কার প্রতিচ্ছবি প্লেটের উপর অঙ্কিত হয় এবং এক্ষেত্রে ছিদ্রটির সীমারেখা অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে থাকে। কিন্তু যদি ছিদ্র আর ফটোগ্রাফিক প্লেটের মধ্যবর্তী স্থানে কোন পদার্থ (কোন গ্যাস অথবা পাতলা ধাতব পাত) রাখা হয়, তবে ছিদ্রটির প্রতিকৃতির সীমারেখা

অস্পষ্ট হয়ে যায়। অর্ধস্বচ্ছ কোন তরল পদার্থের মধ্য দিয়ে আলোক রশ্মি পাঠালে যেমন অবস্থা হয়, অনেকটা সেই রকমেরই। আলফা ও ক্যাথোড কণিকার দ্বারা সংঘটিত উপরিউক্ত ঘটনা বিক্ষেপণ (Scattering) নামে পরিচিত। প্রকৃত ব্যাখ্যাও খুব সহজেই পাওয়া গিয়েছিল। পাঠকও নিশ্চয় বুঝতে পারবেন যে, পদার্থের অণুর সঙ্গে কণিকাগুলির সংঘর্ষের ফলেই তাদের সমান্তরাল ও সরলরৈখিক গতিবেগ কিঞ্চিৎ ব্যাহত হয়। এই সহজ সরল ব্যাখ্যাটি প্রথম লর্ড রাদারফোর্ড কর্তৃক প্রদত্ত হয়। কিন্তু এই ঘটনার মধ্যে সবচেয়ে লক্ষণীয় ছিল যা, তা হচ্ছে এই যে, এক একটি আলফা কণিকার বিক্ষেপণ হয় প্রায় ৯০° কিংবা তারও বেশী, যদিও একমাত্র ভারী মৌলিক পদার্থের ক্ষেত্রেই এই ধরণের ঘটনা ঘটতে দেখা যায়। এর কারণ হচ্ছে এই যে, ভারী মৌলিক পদার্থের পরমাণু-কেন্দ্রের (নিউক্লিয়াসের) তড়িৎ-শক্তি হাল্‌কা মৌলিক পদার্থের চেয়ে অনেক বেশী এবং এই কারণে হাল্‌কা মৌলিক পদার্থের পরমাণু-কেন্দ্রক ও একটি আলফা কণিকার মধ্যে যে তড়িতের স্থৈতিক বিকর্ষণ-শক্তি কাজ করে, তা ভারী মৌলিক পদার্থের ক্ষেত্রে যে বিকর্ষণ-শক্তি কাজ করে, তার চেয়ে অনেক কম এবং সেজন্যে আলফা কণিকার দিক বিচ্যুতিও প্রথমোক্ত ক্ষেত্রে কম হয়ে থাকে। সুতরাং এই ঘটনা লর্ড রাদারফোর্ডের পরমাণুর চিত্রকে আরো দৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করে।

আলফা ও বিটা উভয় প্রকৃতির কণিকাই কোন গ্যাসের মধ্য দিয়ে যাবার সময় তাকে আয়নিত করে এবং নিজেদের গতিশক্তি ক্রমশঃই হারিয়ে ফেলে। আয়ন উৎপাদনকারী কণিকাটির গতিবেগ একটি সীমার নীচে নেমে গেলে আর তা আয়ন উৎপাদন করতে পারে না। আবার একটি সর্বোচ্চ আয়ন উৎপাদনকারী গতিবেগ আছে, যার থেকে কণিকাটির কম বা বেশী গতিবেগ হলে উৎপন্ন আয়নের সংখ্যা হ্রাস পায়। আলফা ও ক্যাথোড কণিকার ক্ষেত্রে এই গতিবেগ প্রায় সমান এবং এর আঙ্কিক পরিমাপ হচ্ছে ৮.৪ × ১০^৮ সে. মি. প্রতি সেকেণ্ডে। অবশ্য একথা মনে করলে খুবই ভুল করা হবে যে, এই গতিবেগ-সম্পন্ন একটি আলফা কণিকা যত আয়ন উৎপাদন করবে, একটি বিটা কণিকাও তত আয়ন উৎপাদন করবে। প্রকৃতপক্ষে একই গতিবেগসম্পন্ন একটি আলফা ও ক্যাথোড কণিকার তুলনামূলক বিচার করলে দেখা যায় যে, আলফা কণিকার আয়ন উৎপাদনের ক্ষমতা ক্যাথোড কণিকার প্রায় দশ গুণ।

উভয় প্রকার কণিকাই পদার্থের দ্বারা শোষিত হয়ে থাকে; অর্থাৎ কোন পদার্থকে ভেদ করবার সময় আলফা অথবা বিটা রশ্মির কণিকার সংখ্যা এবং গতিবেগ উভয়ই হ্রাস পায়। আলফা কণিকার গতিবেগ হ্রাস পেয়ে গ্যাসীয় আণবিক গতিবেগের পর্যায়ে গিয়ে দাঁড়ায় এবং আলফা কণিকাগুলি তার আগে গ্যাসের মধ্য দিয়ে মোটামুটিভাবে একটি সুনির্দিষ্ট দূরত্ব অতিক্রম করে থাকে। এই দূরত্বকে আলফা কণিকাগুলির পাল্লা (Range) বলা যেতে পারে। খুব কম সংখ্যক কণিকাই থেমে যায় অথবা রশ্মির মূল গতিপথ থেকে বিচ্যুত হয়। আলফা কণিকার ক্ষেত্রে কোন পদার্থকে অতিক্রম করবার সময় কণিকাগুলির গতিবেগই মূলতঃ হ্রাস প্রাপ্ত হয়, কিন্তু বিটা কণিকার ক্ষেত্রে হ্রাস-প্রাপ্তি হয়ে থাকে মূলতঃ কণিকার সংখ্যার দিক থেকে। আলফা ও বিটা কণিকা শোষণের পার্থক্য প্রধানতঃ এখানেই।

প্রসঙ্গতঃ এখানে বলা যেতে পারে যে, পদার্থের অভ্যন্তরে ক্যাথোড রশ্মির শোষণ সংক্রান্ত ঘটনাগুলি পারমাণবিক পদার্থবিদ্যার ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। সুতরাং ক্যাথোড রশ্মির শোষণের উপর আমরা একটু বিশেষ রকম মনোযোগ দেব।

পদার্থ ভেদকারী ক্যাথোড রশ্মির জীবনের দুই রকমের ঘটনা, যা আমাদের কাছে বিশেষ লক্ষণীয় বলে মনে হয়েছে, সেগুলি হচ্ছে, প্রথমতঃ ক্যাথোড কণিকার সংখ্যা হ্রাস ও দ্বিতীয়তঃ ক্যাথোড কণিকার গতিবেগ হ্রাস। এই ঘটনা দুটি তত্ত্বগতভাবে পৃথক পৃথকরূপে বিজ্ঞানীরা আলোচনা করেছেন, কিন্তু সে সব তত্ত্বকে পরীক্ষামূলকভাবে যাচাই করা খুব সহজসাধ্য নয়, অন্ততঃ আগে ছিল না।

বিস্তারিত পরীক্ষামূলক অনুসন্ধানের ফলে লেনার্ড দেখালেন যে, ক্যাথোড রশ্মি শোষণের ক্ষেত্রে ক্যাথোড কণিকার গতিবেগ সাধারণতঃ আস্তে আস্তে হ্রাস পায় না। অধিকাংশ ক্ষেত্রে ক্যাথোড কণিকাগুলি কোন অণুর সঙ্গে সংঘাতের ফলে নিজস্ব প্রাথমিক গতিবেগ হারিয়ে ফেলে এবং তার গতিবেগ গ্যাসীয় আণবিক গতিবেগের পর্যায়ে এসে দাঁড়ায়। লেনার্ড দেখালেন যে, ক্যাথোড রশ্মির তীব্রতা* শোষক পদার্থটির বেধ বা পুরুত্বের সঙ্গে সঙ্গে এক্স-পোনেনশিয়াল নিয়ম অনুসারে হ্রাস প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ যদি I_0 তীব্রতাবিশিষ্ট ক্যাথোড রশ্মিকে x বেধবিশিষ্ট কোন পদার্থের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করানো হয়, তবে নির্গত ক্যাথোড রশ্মির তীব্রতা নিম্নলিখিত সূত্রানুযায়ী সূচিত হবে।

$$I = I_0 e^{-ax}$$

a রাশিটিকে পদার্থের শোষণ-গুণাঙ্ক (Absorption coefficient) বলা হয়। ক্যাথোড কণিকার গতিবেগ অপরিবর্তিত থাকলে কোন বিশেষ পদার্থের ক্ষেত্রে এটি একটি ধ্রুবক রাশি হয়ে থাকে, তবে বিভিন্ন পদার্থের ক্ষেত্রে এর মান বিভিন্ন হয়। স্পষ্টতঃই দেখা যায়, যে পদার্থের শোষণ ক্ষমতা যত বেশী, a-র মানও তার ক্ষেত্রে তত বেশী হয়ে থাকে। হাইড্রোজেনের চেয়ে অ্যালুমিনিয়ামের শোষণ-গুণাঙ্ক বেশী। আবার অ্যালুমিনিয়ামের চেয়ে সীসার শোষণ-ক্ষমতা আরও বেশী; তাই সীসার শোষণ-গুণাঙ্ক আরও বড়।

উপরিউক্ত সমীকরণটি লেনার্ড এবং বেকারের পরীক্ষায় সত্য বলে প্রমাণিত হয়। কিন্তু a-র মান যেহেতু গতিবেগের (ক্যাথোড কণিকার) উপর নির্ভর করে, সেহেতু পরীক্ষাধীন পদার্থটির বেধ এমনভাবে নেওয়া প্রয়োজন, যাতে ক্যাথোড কণিকাগুলির গতিবেগ মোটের উপর অপরিবর্তিতই থাকে। এই সাবধানতা অবলম্বন করা সত্ত্বেও ক্যাথোড কণিকার গতিবেগের সম্ভাব্য পরিবর্তনের জন্যে পরীক্ষালব্ধ ফলাফলকে সংশোধিত করে নেওয়া আবশ্যক হয়ে পড়ে। কারণ, দেখা গেছে যে, ক্যাথোড কণিকাগুলির গতিবেগ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পদার্থের শোষণ-গুণাঙ্ক a অতিক্রত হ্রাস পায়। ক্যাথোড রশ্মির শোষণ সম্পর্কে লেনার্ডের 'ভর শোষণ নীতি' (Mass absorption law) বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ এবং এখানে নীতিটি উল্লেখ করলে হয়তো খুব অপ্রাসঙ্গিক হবে না। নীতিটি বেশ সরল অথচ চমকপ্রদ। লেনার্ডের নীতিটি হচ্ছে এই যে, কোন পদার্থের ক্যাথোড রশ্মি শোষণ-ক্ষমতা তার ঘনত্বের সঙ্গে সমানুপাতিক। এই নীতির বৈজ্ঞানিক মূল্য মোটামুটিভাবে তাত্ত্বিক ও পরীক্ষামূলক উভয় ভিত্তিতেই প্রতিষ্ঠিত, তবে এস্থলে আমরা সে সব জটিলতার মধ্যে প্রবেশ করবো না।

*ক্যাথোড রশ্মির গতিপথের লম্ব প্রস্থচ্ছেদ করবার একটি সমতল কল্পনা করলে তার একক ক্ষেত্রফলের উপর প্রতি সেকেণ্ডে যত ইলেকট্রন পড়ে, তাকে ক্যাথোড রশ্মির তীব্রতা বলা হয়।

যক্ষ্মারোগ প্রতিরোধে ভল্লাতকের প্রয়োগ

শ্রীসূর্যকান্ত রায়

সুপ্রাচীন কাল থেকে ভল্লাতক (চলিত ভাষায় পরিচিত ভেলা) মানুষের কষ্টসাধ্য কতকগুলি রোগ চিকিৎসার জন্ম আয়ুর্বেদশাস্ত্রে বর্ণিত ভেষজসম্ভারের মধ্যে অন্যতম ভেষজরূপে পরিগণিত। বৈদিক গ্রন্থে ইহার উল্লেখ পাওয়া না গেলেও বাল্মীকি রামায়ণ ও ব্যাসদেবের মহাভারতে উল্লেখ পাওয়া যায়। বর্তমানে প্রচলিত চরক, সুশ্রুত, বাগভট্ প্রভৃতি সুপ্রাচীন আয়ুর্বেদীয় গ্রন্থসমূহে ইহার বহুল ব্যবহারের উল্লেখ দেখা যায়। চিকিৎসার্থে ব্যবহার ছাড়াও এই বৃক্ষের ফলের আঠার সাহায্যে রজকেরা কাপড় চিহ্নিত করে বলিয়া ইহা Marking nut হিসাবেও অনেকের নিকট সুপরিচিত।

ভারতের সন্নিহিত হিমালয়ের সকল প্রদেশে—এমন কি, পূর্ব আসাম প্রভৃতি স্থানে ইহার জন্ম। সাধারণত: বীরভূম, হাজারিবাগ, বানেশ্বর, বোটানিক্যাল গার্ডেনস্—শিবপুর অঞ্চলেও প্রভূত পরিমাণে জন্মিতে দেখা যায়। বৃক্ষ বেশ উচ্চ হয় (প্রায় ২৫।৩০ ফুট)। কাণ্ড ঋজু, ধূসর বর্ণ এবং বহু ক্ষুদ্র শাখা সমন্বিত। পত্র সুপ্রশস্ত ও দীর্ঘ, অগ্রভাগ গোলাকার ও পৃষ্ঠদেশ শ্বেতাভ। পুষ্প হরিদ্রাভ পীতবর্ণ। ফল ১ ইঞ্চি লম্বা, দেখিতে অনেকটা হৃৎপিণ্ডের মত আকৃতিবিশিষ্ট—মসৃণ, উজ্জ্বল, কৃষ্ণবর্ণ ও চ্যাপ্টা-নাকের মত। ফলের ভিতরে কাগজী-বাদামের মত এক রকম ছোট বাদাম থাকে; সেটা অনেকে চিবাইয়া খায়। কাঁচা ফলের রস শ্বেতবর্ণ, পাকিলে কালো হয়। মে-জুন মাসে গাছে ফুল হয় এবং ডিসেম্বর-জানুয়ারী মাসে ফল পাকে। এই গাছের কাঠে প্রচুর আঠা থাকে। এই আঠা অথবা ফলের রস গায়ে লাগিলে চুলকণা (Erruption), ক্ষত (Ulcer) এবং হাত-পায়ের ফুলা (Swelling) উৎপাদন করিতে পারে বলিয়া ইহা খুব সাবধানে নাড়াচাড়া করিতে হয়। এমন কি, ভল্লাতক বৃক্ষতলে শয়ন করিলে বা বৃক্ষের ফুলের হাওয়া লাগিলে ঐ সকল লক্ষণ দেখা যায় এবং কখনও বা মূত্রদোষের লক্ষণও প্রকাশ পায়। এই কারণেই লোকে ভল্লাতককে বিষাক্ত ফল বলিয়া মনে করে। কিন্তু প্রকৃতির কি বিচিত্র রহস্য—যেহেতু এই ফলের আঠা বা রস বিষাক্ত, সেহেতু ইহার ফলত্বক খুব পুরু ও শক্ত এবং সহজে ভাঙা যায় না। আয়ুর্বেদশাস্ত্রে ইহা ভল্লাতক ছাড়া আরও বহু নামে পরিচিত। তাহার মধ্য হইতে কতকগুলি সার্থক পরিচয় ও গুণ-প্রকাশক নামের উল্লেখ করা হইল; যথা—পরিচয়-জ্ঞাপক নাম শৈলবীজ অর্থাৎ পর্বতময় প্রদেশে জন্মে বলিয়া; তৈলবীজ অর্থাৎ ইহার ফলে যথেষ্ট তৈল বর্তমান; বীরতরু অর্থাৎ ইহার কাষ্ঠে প্রচুর আঠা আছে বলিয়া ছেদনকার্য কষ্টসাধ্য। গুণ-প্রকাশক নাম অরুষ্কর অর্থাৎ ক্ষতোৎপাদক; বাতারি অর্থাৎ আমবাতনাশক (Enemy of Rheumatism); কৃমিঘ্ন অর্থাৎ কুষ্ঠ প্রভৃতি ব্যাধির বীজাণুনাশক; অর্শোহিত—অর্শরোগের পক্ষে হিতকর; শোফকৃৎ—ফুলা উৎপাদন করে। ইহার বৈজ্ঞানিক নাম—Semicarpus anacardium, Linn. এবং ইংরেজী নাম—Marking nut।

ইহার ফলের ভিতরে যে তৈলবহুল রসাল আঠা থাকে, তাহাই চিকিৎসার্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কিন্তু যেহেতু ইহার আঠার ব্যবহার খুব নিরাপদ নহে, সেহেতু ব্যবহারের

পূর্বে উত্তমরূপে শোধন করিয়া লওয়া উচিত। শোধন করিবার নিয়ম হইতেছে, ভেলা ও ইটের গুঁড়া একসঙ্গে নিবিড়ভাবে ঘর্ষণ করিয়া ফলগুলি জলে ধুইয়া লইলে দোষ কাটিয়া যায় অথবা ভেলাগুলি ডাবের জলে ভিজাইয়া রাখিবার পর ধুইয়া লইলেও শোধিত হয়। প্রসঙ্গক্রমে এখানে বলা যাইতে পারে যে, ভেলার আঠার সংস্পর্শে বা প্রভাবে যদি পূর্ববর্ণিত কুফল দেখা দেয়, তাহা হইলে নেয়াপাতি ডাবের জল পান, ধৌতকার্যে ব্যবহার এবং নারিকেল তেল মাখিলে ঐ দোষমুক্ত হওয়া যায়। সুতরাং এইগুলিকে ভল্লাতকের দোষ প্রতিষেধকরূপে গণ্য করা যায়।

তীক্ষ্ণ গুণসম্পন্ন হইলেও আয়ুর্বেদ মতে যদি যথোপযুক্তভাবে শোধন করিয়া প্রয়োগ করা হয়, তবে ভল্লাতক অমৃতের ন্যায় ফলদান করে এবং বহু কৃচ্ছ্রসাধ্য রোগ আরোগ্য করে। ইহাতে যে সকল অন্তর্নিহিত ধর্ম আছে, তাহার উল্লেখ প্রসঙ্গে আয়ুর্বেদশাস্ত্রে বলা হইয়াছে যে, ইহা মধুর ও কষায়, লঘু, স্নিগ্ধ, তীক্ষ্ণ, উষ্ণবীর্য, ছেদক, বিপাকান্তে মধুর রস প্রদায়ক, অগ্নিকারক, পুষ্টিকর, তর্পক, বায়ু, কফ ও পিত্তনাশক। ইহা কুষ্ঠ (Leprosy), অর্শ (Piles), গ্রহণী (Chronic diarrhœa), আনাহ (Flatulence), শোফ (Swelling), জ্বর (Fever), কৃমি (Helminthic and bacterial disorders), বৃষ্য (Aphrodisiac), বৃংহণ (Nutrient and developer), কেশ্য (Hair tonic) এবং উদর রোগ—বিশেষভাবে প্লীহা-বিবৃদ্ধিজনিত (Splenomegalia), শ্বিত্র (Leucoderma) প্রভৃতি রোগে ব্যবহৃত হয়। শোনা যায় যে, কর্কট রোগে (Cancer) এই ভেষজটির ব্যবহারের উপযোগিতা সম্পর্কে সম্প্রতি ভারতের বহু গবেষণা কেন্দ্রে গবেষণা চলিতেছে।

ব্যাপকভাবে যদিও এই ভেষজটির বহু রোগে প্রয়োগের উল্লেখ দেখা যায়, কিন্তু চরকে রসায়নার্থে (Rejuvinator) এবং সুশ্রুতে কুষ্ঠ, অর্শ ও বিষাক্ত কীটাদির দংশনের ক্ষেত্রে ব্যবহারের জন্যে ইহা বিশেষভাবে প্রশংসিত হইয়াছে, অর্থাৎ প্রায়ই একক এই ভেষজের ব্যবহারের উল্লেখ আছে। ভেষজ-গুণাগুণ সমন্বিত আধুনিক মতবাদসম্পন্ন পাশ্চাত্য গ্রন্থসমূহে ব্যবহার ছাড়াও শ্বাস, কাশ ও আমবাত প্রভৃতি রোগে ব্যবহারের উল্লেখ দেখা যায়।

উল্লিখিত রোগসমূহে ইহার ব্যবহার ছাড়াও রাজযক্ষ্মা রোগে (Pulmonary Tuberculosis) ব্যবহার করা যায় কিনা, তাহাই এই আলোচনার অন্যতম বিষয়বস্তু। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, আয়ুর্বেদের মতে ইহা কৃমিঘ্ন। এই ক্ষেত্রে কৃমি শব্দের দ্বারা ইহা অন্ত্রস্থ কৃমি (Worms) এবং পাশ্চাত্য মতানুযায়ী রোগোৎপাদক বীজাণুকেও (Pathogenic bacteria) বুঝাইতে পারে। কারণ আয়ুর্বেদে রক্তজ, কফজ প্রভৃতি বহু কৃমির উল্লেখ দেখা যায়। ইহা মনে করা অসঙ্গত হইবে না যে, ইহাতে কুষ্ঠরোগের বীজাণুনাশক শক্তি আছে বলিয়াই ইহা কুষ্ঠরোগে বিশেষ কার্যকরী। পাশ্চাত্য মতানুযায়ী কুষ্ঠ ও যক্ষ্মা রোগের বীজাণু উভয়েই 'Acid fast' গোষ্ঠীর অন্তর্গত এবং ইহারা কতকাংশে সমধর্মী ও দেখিতে দণ্ডাকৃতি (Rod shaped)। এই কারণেই ইহা অযৌক্তিক মনে হয় না যে, কুষ্ঠরোগে বহুল ব্যবহৃত ভল্লাতকের কৃমিঘ্ন, শ্বাসনাশক, জ্বরঘ্ন, রসায়ন প্রভৃতি গুণ থাকিবার ফলে ইহা যক্ষ্মারোগে ব্যবহার করিলে সুফল পাওয়া যাইতে পারে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, রসায়নার্থে ভল্লাতক সুস্বাদু হালুয়ার আকারে (সুজি, গরুর দুধ, গব্যঘৃত এবং ভল্লাতকের ক্বাথের মিশ্রণে প্রস্তুত) ব্যবহার রাজস্থানের কতিপয় পরিবারে এখনও প্রচলিত। এইরূপ শুনা যায় যে, জনৈক দুঃস্থ যক্ষ্মারোগীর কোনরূপ ব্যয়সাধ্য

চিকিৎসার সামর্থ্য না থাকায় কেবলমাত্র 'ভল্লাতক হালুয়া' সেবন করিয়া সুস্থ হইয়াছিলেন। অবশ্য আধুনিক বৈজ্ঞানিক মতে তাঁর আরোগ্যের কারণ যাচাই করা সম্ভব হয় নাই।

যাহা হউক উপরিউক্ত যুক্তির বলে ভল্লাতক হালুয়া কতিপয় (ছয় জন) পরীক্ষিত ও স্থিরীকৃত যক্ষ্মারোগীর উপর পাতিপুকুর যক্ষ্মা-হাসপাতালে প্রয়োগ করা হয়। ইহাদের সকলেরই প্রধান উপসর্গ ছিল শ্বাসকষ্ট, ক্ষুধামান্দ্য, প্রবল কাশি ও জ্বর। একজন রোগীর গ্রহণী ছিল, যাহা অহিফেনঘটিত ঔষধেও বাগে আনা সম্ভব ছিল না। একজন রোগীর উপরিউক্ত সকল উপসর্গ ছাড়াও পাদশোথ (Oedema feet) ছিল। এই ছয় জন রোগীকে এক সপ্তাহ হইতে তিন মাস কাল পর্যন্ত ভল্লাতক হালুয়া ১·০৫ গ্র্যাম হইতে ৬ গ্র্যাম পর্যন্ত রোগীর বলাবল ও ভেষজ-সহিষ্ণুতা বিবেচনা করিয়া খাওয়ান হয়। ফলাফলে দেখা যায়, চার জন রোগী উপরিউক্ত উপসর্গগুলির কবল হইতে মুক্ত হইয়াছে, ক্ষুধা বিশেষভাবে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে, শ্বাসকষ্ট প্রশমিত হইয়াছে, সুনিদ্রা হইয়াছে এবং রক্ত পরীক্ষায় রোগের হ্রাস-বৃদ্ধিসূচক মাপ (Sedimentation rate) সন্তোষজনকভাবে নামিয়া আসিয়াছে। যাহার গ্রহণী রোগ বশে আনা সম্ভব হইতেছিল না, তাহা সম্পূর্ণ আয়ত্তাধীনে আসিয়াছে। অপর দুই জন রোগীর মধ্যে এক জনের কয়েক দিন সেবনের পর রক্ত নির্গমনের অন্তর সংক্ষিপ্ত হওয়ায় ও কাশি কিছুটা বৃদ্ধি পাওয়ায় এবং অপর জনের গায়ে চুলকণা (যাহা ডাবের জলের দ্বারা ধৌত ও নারিকেল তেল মালিসে চার দিনেই প্রশমিত হয়) প্রকাশ পাওয়ায় এই চিকিৎসা বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। যদিও কাহারও কাহারও মতে প্রথমে রক্ত নির্গমন বৃদ্ধি পাইলেও উহা প্রয়োগ করিতে থাকিলে পরে তাহা বন্ধ হইয়া যায়। যাহা হউক, এই ছয় জন রোগীর উপর প্রয়োগের ফলাফল বিশেষ নৈরাশ্যজনক নহে বরং আশাপ্রদ বলা যাইতে পারে।

উপরিলিখিত ফলাফলের পরিপ্রেক্ষিতে ইহা অনুমান করা অসঙ্গত নহে যে, যে যুক্তির বশবর্তী হইয়া পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হইয়াছিল, তাহা খুব অযৌক্তিক নহে। তবে পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে ইহার সঠিক প্রয়োগ-মাত্রা ও ফলের কোন্‌টি বিশেষ-ভাবে কার্যকরী অংশ, তাহা স্থির করিয়া লইতে হইবে। কারণ মাত্রা বিশেষতঃ কার্যকরী অংশের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত আয়ুর্বেদশাস্ত্রে পরিষ্কারভাবে দৃশ্যমান নহে বলিয়া মনে হয়। সুতরাং আশা করা যায় যে, আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত পরীক্ষা-নিরীক্ষার সাহায্যে রোগ নির্ণয় পরবর্তী কালে যথাযথ পর্যবেক্ষণ এবং আয়ুর্বেদ মতানুযায়ী রোগ নির্ধারণ ও চিকিৎসার দ্বারা গবেষণা চালাইয়া গেলে হয়তো যক্ষ্মারোগের পরমৌষধ ভল্লাতক হইতে আবিষ্কৃত হওয়া কিছু মাত্র বিস্ময়ের কারণ হইবে না।

যক্ষ্মারোগের আক্রমণের বিরুদ্ধে ভল্লাতকের ব্যবহার একটি তেজী ও তীক্ষ্ণ অস্ত্র হিসাবে গণ্য হইবার সম্ভাবনা নিতান্ত অনুজ্জ্বল নহে বলিয়াই মনে হয়।*

---

* পাতিপুকুর যক্ষ্মা-হাসপাতালের রোগীদের তথ্যাদি সংগ্রহ ও প্রবন্ধ প্রকাশের অনুমতি দানের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বাস্থ্য বিভাগ এবং যাঁহার ঐকান্তিক আগ্রহ ও সহযোগিতায় এই প্রবন্ধ লেখা সম্ভব হইয়াছে সেই পরম সুহৃদ শ্রীমাধবেন্দ্রনাথ পাল মহাশয়কে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। লেখক।

প্রসরণশীল বিশ্ব

সুখেন্দু সোম

সীমাহীন বিরাট ও অবিশ্বাস্যরূপে বিপুল এই মহাবিশ্বে রয়েছে অজস্র নক্ষত্র-জগৎ (Gallaxy)। ইংরেজ জ্যোতির্বিজ্ঞানী সার আর্থার এডিংটনের (১৮৮২—১৯৪৪) মতে, এক-একটা নক্ষত্র-জগৎ সাধারণভাবে এক-শ' কোটি তারকায় গঠিত। এরূপ কোটি কোটি নক্ষত্র-জগৎ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের এধারে-ওধারে প্রায় সমভাবে ছড়িয়ে বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে রয়েছে। শক্তিশালী বেতার-দূরবীক্ষণের সাহায্যে পৃথিবীর মানুষ অসীম আকাশের গায়ে পাঁচ হাজার কোটি আলোক-বর্ষ দূরেও তার দৃষ্টি-শক্তি প্রসারিত করে এযাবৎ এক হাজার কোটি নক্ষত্র-জগতের সন্ধান পেয়েছে। এর পরেও যে কত আছে, তা কে জানে?

ওলবার ধাঁধা (Olber's Paradox)—খুব বেশী দিনের কথা নয়—১৮২৬ সাল। খ্যাতনামা জার্মান জ্যোতির্বিজ্ঞানী উইলহেম ওলবার (১৭৫৮—১৮৪০) লক্ষ্য করেন যে, মহাকাশে ক্রমবর্ধমান ব্যাসযুক্ত অসংখ্য গোলক পেঁয়াজের কোয়ার মত আমাদের ঘিরে আছে। এরূপ পর পর দুটি গোলকের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত নক্ষত্র-জগতের সংখ্যা বর্ধিত ব্যাসার্ধের বর্গফলের সমানুপাতিক। আবার বিপরীত বর্গের সূত্রানুসারে (Inverse Square Law) নক্ষত্র-জগতের দীপনমাত্রা তার দূরত্বের বর্গের ব্যস্তানুপাতিক। এর ফলে দূরত্বের জন্যে নক্ষত্র-জগতের আলো যতটা কমে আসে, ঠিক ততটুকু আবার বেড়ে যায় তাদের সংখ্যাবৃদ্ধিতে। অগণিত নক্ষত্র জগতের সম্মিলিত আলোকরশ্মির অগ্নিবৃষ্টিতে কেন আমরা তবে পুড়ে ছাই হয়ে যাই না?—ওলবারের এই অদ্ভুত প্রশ্নের ধাঁধা দীর্ঘদিন ধরে বিজ্ঞানী-মহলে যথেষ্ট আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। মহাশূন্যে ইন্টারস্টেলার ম্যাটারের জন্যে এই আলোর একটা মোটা অংশ লয়প্রাপ্ত হলেও শেষ পর্যন্ত যেটুকু পৃথিবীতে এসে পৌঁছায়, তাতেও আমাদের সমগ্র আকাশ দিনরাত সর্বদা সূর্য অপেক্ষাও অধিক ঝলমল করতো।

উনবিংশ শতাব্দীর একদল বিজ্ঞানী মনে করতেন যে, শুধু মাত্র আমাদের নক্ষত্র-জগৎ ছাড়া মহাবিশ্ব একেবারেই ফাঁকা। তাই একটি নক্ষত্র-জগৎ থেকে কতটুকুই বা আলো আমরা পেতে পারি! কিন্তু ওলবার ধাঁধা সমাধানে এই যে প্রয়াস, তা ব্যর্থ বলে প্রমাণিত হলো বিংশ শতাব্দীর সূচনায়, যখন মানুষ শক্তিশালী দূরবীক্ষণের ভিতর দিয়ে চেয়ে দেখলো যে, আমাদের জগতের পরপারেও আরো অসংখ্য জগৎ বিদ্যমান। কারো কারো মতে, জন্ম থেকে সুরু করে যে সব দূর-দূরান্তের জগতের আলো পৃথিবীতে এখনও এসে পৌঁছায় নি, আমাদের আকাশের ঔজ্জ্বল্যে তাদের কোন অবদান নেই। তাই হয়তো আকাশ তত দীপ্তিমান নয়। কিন্তু তবুও যে পরিমাণ আলো এসে পড়ে, তাতেও রাতের আকাশের এতটা অন্ধকার হওয়া উচিত ছিল না।

লাল অভিমুখী প্রতিসরণ (Red Shift)—ওলবার ধাঁধার সন্তোষজনক উত্তর পাওয়া গেছে সাম্প্রতিক কালে। সূক্ষ্ম বর্ণালীবীক্ষণ যন্ত্রে নক্ষত্র-জগতের আলোর বর্ণরেখার লাল রঙের দিকে স্থানচ্যুতির কারণ নির্দেশ করতে গিয়ে কোন কোন জ্যোতির্বিজ্ঞানী বলেন যে, সুদীর্ঘ পথ বেয়ে আসবার সময় আলোকরশ্মি কিছুটা তেজ ও

তদনুরূপ কম্পন-বেগ হারিয়ে বড় বড় ঢেউ তুলে লালের দিকে ঝুঁকে পড়ে। কিন্তু তরঙ্গবাদ বা কণিকাবাদ কোনটাই মহাশূন্যে আলোর এই তেজক্ষয় স্বীকার করে না। আবার কোন কোন মহল থেকে এমনও শোনা যায় যে, আলোকরশ্মির খানিকটা তেজ কেড়ে নেয় মহাজাগতিক ধূলিকণার দল, যার ফলে বর্ণালীরেখার এরূপ স্থানচ্যুতি ঘটে। কিন্তু পরীক্ষা ও হিসাবে যখন দেখা গেল যে, এই স্থানচ্যুতির মাত্রা ও হারানো তেজের পরিমাণে কোন মিল নেই, তখন এই অদ্ভুত যুক্তি আর টিকলো না। শেষ পর্যন্ত কিন্তু বর্ণরেখার এই স্থানচ্যুতির সন্তোষজনক ব্যাখ্যা পাওয়া গেল অষ্ট্রিয়ার পদার্থবিদ সি. জে. ডপ্‌লারের (১৮০৩—১৮৫৩) সূত্র প্রয়োগ করে। জানা গেল—নক্ষত্র-জগৎ প্রতিনিয়তই দূরে দূরে সরে যাচ্ছে অর্থাৎ মহাবিশ্ব প্রসারিত হচ্ছে। এই সব অপসৃয়মান জগৎ থেকে নির্গত আলোর কম্পন-হার ক্রমাগত কমে গিয়ে তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য বেড়ে যায়, যার ফলে বর্ণরেখাসমূহ লাল রঙের দিকে প্রতিসরিত হয়। দেখা গেছে, এই প্রতিসরণের মাত্রা নক্ষত্র-জগতের অপসরণ-বেগের সমানুপাতিক। বীক্ষণাগারে পরীক্ষায় একথা প্রমাণিত হয়েছে যে, যতই দূরে যাওয়া যায়, ততই এই অপসরণ-বেগ, তথা বর্ণরেখার স্থানচ্যুতির মাত্রা বৃদ্ধি পায়। প্রচণ্ড বেগে দূরে সরে-যাওয়া নক্ষত্র-জগতের জলন্ত গ্যাস-কণিকাসমূহের ভিতর যেগুলি আমাদের দিকে ছুটে আসে, তাদের এই গতিবেগ যদি অপসরণ-বেগ থেকে বেশী হয়, তবে এই সব কণিকা বেগুনী-অভিমুখী বর্ণরেখা প্রদান করে। বহির্নক্ষত্র-জগতের মধ্যে আমাদের সব চেয়ে নিকটতম হলো অ্যাণ্ড্রোমিডা মণ্ডলের কুণ্ডলাকৃতির নীহারিকা, যেটি প্রতি সেকেণ্ডে ২০০ মাইল বেগে আমাদের দিকে ছুটে আসছে। কিন্তু দূরত্বের সঙ্গে সঙ্গে নক্ষত্র-জগতের অপসরণ-বেগ ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়ে যখন আমাদের দিকে ছুটে-আসা তার গ্যাস-কণিকাগুলির বেগ ছাড়িয়ে যায়, তখনই তার বর্ণরেখাগুলি লাল রঙের দিকে সরে পড়ে। খুব কাছের দু-একটি ছাড়া সাধারণভাবে মহাবিশ্বের প্রায় সব নক্ষত্র-জগৎ তীব্রবেগে দূরে সরে যায়। এজন্যেই জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা মনে করেন, এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড প্রতিনিয়তই প্রসারিত হচ্ছে। যদিও প্রত্যেকটি জগতের প্রতিটি নক্ষত্র এক-একটি বিশাল আলোর খনি, তবুও যেহেতু এরা অবিরাম প্রচণ্ড বেগে দূর থেকে দূরে চলে যায়, সেহেতু এদের আলোর কোটি কোটি ভাগের চেয়েও কম আলো আমাদের উপর ঝরে পড়ে। বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানীরা এভাবেই ওলবার্স ধাঁধার সমাধান করেছেন।

হাব্‌ল সূত্র—ক্যালিফোর্নিয়ার মাউন্ট উইলসন বীক্ষণাগারে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর এডুইন পি. হাব্‌ল (১৮৮৯—১৯৫৩) লক্ষ্য করেন যে, নক্ষত্র-জগতের অপসরণ-বেগ তার দূরত্বের সমানুপাতিক এবং এই মর্মে ১৯২৫ সালে তিনি যে সূত্র আবিষ্কার করেন, তা এই—

$$\text{অপসরণ-বেগ} = \text{ধ্রুবক} \times \text{দূরত্ব}$$

যদি এই দূরত্ব ও গতিবেগ যথাক্রমে সেণ্টিমিটার ও সেণ্টিমিটার পার সেকেণ্ডে মাপা হয়, তবে এই ধ্রুবকের মান দাঁড়ায় ১.৯×১০^{-১৭}। পরীক্ষায় দেখা গেছে যে, প্রতি এক কোটি পারসেক (১ পারসেক = ৩.২৬ আলোক-বর্ষ) দূরত্ব বৃদ্ধির জন্যে এই অপসরণ-বেগ সেকেণ্ডে ১০০ মাইল করে বৃদ্ধি পায়। বিভিন্ন নক্ষত্র-জগতের এই সরে যাবার গতি ও দূরত্ব নিয়ে লেখচিত্র অঙ্কন করলে মূল উৎস বিন্দু দিয়ে যে সরল রেখা পাওয়া যাবে, তাকে অসীমের দিকে বাড়িয়ে অনেক অনেক দূরের নক্ষত্র-জগতের অপসরণ-বেগ নির্ণয় করা যায়। তবে বাস্তব ক্ষেত্রে এর সত্যতা যাচাই করা সম্ভব নয়—কেন না, বহু

দূর-দূরান্ত থেকে আগত আলোকরশ্মির তেজ এতই কমে আসে যে, তা শক্তিশালী যন্ত্রেও সাড়া জাগায় না।

বিকেন্দ্রিক মহাবিশ্ব—বেতার দূরবীক্ষণে যতদূর দৃষ্টি চলে, তাতে একথা প্রমাণিত হয়েছে যে, এই মহাবিশ্ব আমাদের চতুর্দিকে সমভাবে বিস্তৃত হচ্ছে। এতে স্বভাবতঃ একথাই মনে হয় যে, আমাদের নক্ষত্র-জগৎ, তথা স্থানীয় গ্রুপ বুঝি মহাবিশ্বের কেন্দ্র। অনুরূপভাবে অন্য কোন নক্ষত্র-জগৎ-বাসী (?) তার চতুষ্পার্শ্বের বিশ্বস্ফীতি দেখে একই কারণে মনে করবে যে, তারাও বুঝি মহাবিশ্বের কেন্দ্রে রয়েছে। অতএব মহাবিশ্বের কোন নির্দিষ্ট কেন্দ্র নেই।

বিশ্বের বয়স—কোন নক্ষত্র-জগতের বর্তমান দূরত্বকে তার এই মুহূর্তের অপসরণ বেগ দিয়ে ভাগ করে যে ভাগফল পাওয়া যায়, তা সব নক্ষত্রের বেলায় সমান, যাকে বলা হয় হাব্‌ল ধ্রুবক। এর মান হলো $\frac{১}{১৯ \times ১০^{-১৭}}$ সেকেণ্ড—$১\cdot৮ \times ১০^{৯}$ বছর; অর্থাৎ ১·৮ মহাপদ্ম বছর আগে এই বিশ্বস্ফীতি সুরু হয়, যার ফলে বিভিন্ন নক্ষত্র-জগতের সৃষ্টি হয়। কিন্তু আকাশ ও পদার্থ-বিজ্ঞানীরা আমাদের জগতের অনেকগুলি নক্ষত্রের নিউক্লিয়াস জ্বালানী পুড়ে যাবার হার ও তেজস্ক্রিয় ইউরেনিয়াম ধাতুর সীসায় রূপান্তরিত হবার কাল দেখে হিসাব করেছেন যে, উক্ত বয়স তিন মহাপদ্ম বছরেরও বেশী। তাই হাব্‌ল ধ্রুবক নির্ণয় করতে গিয়ে নিশ্চয়ই বেগ ও দূরত্ব মাপবার কাজে একটা বড় রকমের ভুল রয়ে গেছে। আধুনিক কালে অতি সূক্ষ্ম শক্তিশালী যন্ত্রের দ্বারা নির্ণীত চার শত কোটি পারসেক দূরে অবস্থিত হ্রদসর্প (Hydra) নক্ষত্র-জগৎপুঞ্জ (Cluster of Gallaxies) নেওয়া হয়েছে, যেখানে গ্যাস-কণিকাগুলির ছুটাছুটি লাল প্রতিসরণে খুব কমই অংশ গ্রহণ করে। যথাসম্ভব নির্ভুলভাবে অতি সতর্কতার সঙ্গে বর্ণরেখাসমূহের স্থানচ্যুতির মাত্রা বের করে ডপ্‌লার সূত্রের সাহায্যে এই নক্ষত্রপুঞ্জের অপসরণ-বেগ সেকেণ্ডে ৬০,০০০০ কিলোমিটার বের করা হলো। এক্ষণে এই দূরত্বকে গতিবেগ দিয়ে ভাগ করে হাব্‌ল ধ্রুবক বা বিশ্বের বয়স যে সাত মহাপদ্ম বছর পাওয়া গেল, তা নানা দিক থেকে বাস্তবের অনুগামী।

অতিঘন তত্ত্ব (Super dense theory)—সাত মহাপদ্ম বছর আগে বিশ্বস্ফীতি সুরু হবার পূর্বে অতি অল্প পরিসর জায়গায় মহাবিশ্বের বস্তু-কণাসমূহ যখন অতি ঘনীভূত অবস্থায় জমাট বেঁধে ছিল, তখন বিশ্বের ঘনত্ব ছিল জলের ঘনত্বের চেয়েও এক-শ' হাজার মহাপদ্ম গুণ বেশী। সেই সময়ে প্রতি ঘনসেন্টিমিটার স্থানে এক-শ' কোটি টন পদার্থ অবস্থান করতো। শেষে একদিন কোন এক অজ্ঞাত কারণে, জর্জ গ্যামোর অনুমান অনুসারে প্রচণ্ড বিস্ফোরণের ফলে যে বিস্ফারণ সুরু হলো, তার রেশ আজও অব্যাহত রয়েছে। ক্রমাগত প্রসরণের দরুণ মহাবিশ্বের ঘনত্ব ক্রমশঃ কমে গিয়ে জলের ঘনত্বের কোটি কোটি ভাগের এক হাজার ভাগে গিয়ে দাঁড়ালো এবং সম্ভবতঃ তখন নক্ষত্র-জগতের সৃষ্টির সূচনা হলো। এই অতি ঘন তত্ত্ব অনুসারে যাবতীয় নক্ষত্র-জগতের বয়স হাব্‌ল ধ্রুবক থেকে যে কিছুটা কম, তার স্বাক্ষর বহন করে আমাদের জগৎ, যার বয়স হলো ছয় মহাপদ্ম বছর।

আইনষ্টাইন বিশ্ব—মহাবিজ্ঞানী আইনষ্টাইনের (১৮৭৯—১৯৫৫) মহান অবদান হলো, তাঁর বিখ্যাত আপেক্ষিকতা তত্ত্বে বিশ্বস্থানের বক্রতার আবিষ্কার। এই বক্রতা দুই প্রকার—যোগবোধক ও বিয়োগবোধক। যোগবোধক বক্রতা ভিতরের দিকে বাঁকানো—যেমন একটা গোলাকার বর্তুলের পৃষ্ঠদেশ। আর বিয়োগবোধক বক্রতা হলো, যা বাইরের দিকে বেঁকে গেছে—এর দৃষ্টান্ত হলো ঘোড়ার পিঠের গদী। এই উভয় প্রকার ঘন-

ইউক্লিডীয় বক্রতাযুক্ত স্থানের মাঝে রয়েছে অবক্র স্থান, যা ইউক্লিডীয় ও সমতল। সমতল স্থানে কোন গোলকের আয়তন তার ব্যাসার্ধের ঘন ফলের সঙ্গে সমহারে বর্ধিত হয়, কিন্তু যোগ-বোধক স্থানে এই হার কম এবং বিয়োগবোধক স্থানে বেশী। বিভিন্ন আয়তনের বিশ্বস্থানের নক্ষত্র-জগতের সংখ্যা গণনা করে যদি দেখা যায় যে, দূরত্বের ঘন ফলের তুলনায় সেটা নিম্ন বা উচ্চ হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে, তবে ঐ স্থানের বক্রতা যোগ-বোধক বা বিয়োগবোধক। কিন্তু মুস্কিল এই যে, বহু দূর-দূরান্তের নক্ষত্র-জগতের দূরত্ব সঠিক-ভাবে নির্ণয় করবার কোন উপায় নেই। অবশ্য দীপনমাত্রার ক্রমক্ষীয়মানতা দেখে বিপরীত বর্গের সূত্রানুযায়ী তাদের দূরত্ব সম্পর্কে মোটামুটি একটা ধারণা করা চলে বটে, তবে একথা স্মরণ রাখতে হবে যে, এখন যে সব জগৎ দেখছি, সেগুলি সুদূর অতীতের। ইতিমধ্যে হয়তো অনেক পরিবর্তন এসে গেছে।

আকাশ-পদার্থ-গণিতবেত্তা আইনষ্টাইনের মতে, অজস্র বস্তুপিণ্ডের উপস্থিতিতে বিশ্বস্থানে যোগবোধক বক্রতার সৃষ্টি হয়েছে, যার ফলে মহাবিশ্ব বিরাট গোলকের মত সীমাবদ্ধ ও প্রান্ত-হীন হয়ে পড়েছে। আইনষ্টাইনের বিশ্ব অনন্ত নয় বটে, কিন্তু তার ব্যাসার্ধ বিরাট—১৫ কোটি আলোক-বর্ষ মাইল। 'সীমার মাঝে অসীম'—এই আইনষ্টাইন বিশ্বে আলো পুরাপুরি ঘুরে এসে তার উৎস বিন্দুতে মিলনে সক্ষম। এর ফলে তত্ত্বের দিক থেকে দর্শক একদিন তার নিজের পৃষ্ঠদেশ দেখতে পাবে—তবে এর জন্যে কোটি কোটি বছর অপেক্ষা করতে হবে।

আপেক্ষিকতা তত্ত্বানুযায়ী মহাবিশ্বে দুটি শক্তি কাজ করে—একটি হলো নিউটনের মহাকর্ষ শক্তি, যা দূরত্বের বর্গফলের ব্যস্তানুপাতিক, আর একটি হলো আইনষ্টাইন মহাজাগতিক বিকর্ষণী শক্তি ($G\mu\nu = \lambda G\mu\nu$), যা দূরত্বের সমানুপাতিক। এই বিকর্ষণী শক্তি যদিও সৌরজগতের বেলায় খুবই কম ($G\mu\nu = O$), কিন্তু দূরের নক্ষত্র-জগতের ক্রমবিস্তৃতিতে এটি ক্রমবর্ধমানরূপে ক্রিয়াশীল। আইনষ্টাইন তাঁর অদ্ভুত ও অসাধারণ গাণিতিক প্রতিভা বলে যে বিশ্ব রচনা করেছেন, সেখানে তাঁর বিকর্ষণী শক্তি ও নিউটনের আকর্ষণী শক্তি—এই উভয়ই সমান হয়ে গেছে। এই দুই বিরোধী শক্তির সমতার ফলে আইনষ্টাইন বিশ্ব স্থিতি-স্থাপকতা (Equilibrium) লাভ করেছে। যদি কোন কারণে এই স্থিতিশীল বিশ্বের বস্তুমান কমে যায়, তবে এই আকর্ষণী শক্তি হ্রাস পাবে। কিন্তু বিকর্ষণের প্রভাবে বিশ্বের বিস্ফারণ সুরু হবে এবং এই বিস্তারণের সঙ্গে বিশ্বের বস্তুপিণ্ডসমূহের ভিতরকার দূরত্ব বৃদ্ধি পাবে, যার ফলে আকর্ষণ ক্রমাগত দুর্বল হয়ে বিকর্ষণ সবল হয়ে উঠবে; অর্থাৎ বিশ্ব দ্রুতগতিতে বেড়েই চলবে। আবার যদি কোন কারণে আইনষ্টাইনের স্থিতিশীল বিশ্বের বস্তুমান বেড়ে যায়, তবে এর সাম্য নষ্ট হয়ে যাবে এবং নিউটনের আকর্ষণী শক্তি ক্রমশঃ জোরদার হয়ে বিশ্বের ক্রমসঙ্কোচন ঘটাবে।

কিন্তু গবেষণাগারের পর্যবেক্ষণের ফলাফলের সঙ্গে আইনষ্টাইন বিশ্ব যথার্থভাবে সঙ্গতি রক্ষা করতে ব্যর্থ হলো। শুধু তাই নয়, এই বিরাট মহাবিশ্বের প্রতিফলন একটা সীমাবদ্ধ গোলকের পক্ষে কিছুতেই সম্ভব নয়।

ডি সিটার বিশ্ব—এর কিছু পরে এলেন হল্যাণ্ডের জ্যোতির্বেত্তা লাইডেনের অধ্যাপক উইলহেম ডি সিটার (১৮৭২—১৯৩৪)। আইন-ষ্টাইন বিশ্বের মত ডি সিটারের বিশ্বে বস্তুসঙ্ঘ মোটেই ভিড় করে নেই, বরং ক্রমবর্ধমান বিকর্ষণী শক্তির প্রচণ্ড ক্রিয়ার অসম্ভব রকম বিস্ফারণের ফলে ডি সিটার বিশ্বের ঘনত্ব কমে প্রায় শূন্যের কোঠায় এসে দাঁড়িয়েছে। তাই আইনষ্টাইনের জগৎ হলো বস্তুপ্রধান, কিন্তু

গতিহীন; অপর পক্ষে ডি সিটারের জগৎ হলো গতিপ্রধান কিন্তু বস্তুহীন।

দুটি আদর্শ বিশ্ব—আমাদের বর্তমান বিশ্ব—যেখানে বস্তুও রয়েছে আর গতিও রয়েছে, সে কিন্তু ঠিক ঠিক আইনষ্টাইন বা ডি সিটারের বিশ্ব কাউকেই মেনে চলে না। তাই প্রশ্ন জাগে, তবে বিশ্বের আসল স্বরূপ কি?

রাশিয়ার গণিতবেত্তা আলেকজাণ্ডার ফ্রিড্‌ম্যান এবং বেলজিয়ামের জ্যোতির্বিদ জর্জ লেমাইতার—এই উভয়ের মতে আমাদের বিশ্বের দুই প্রান্তে রয়েছে দুটি আদর্শ বিশ্ব—তার একটি হলো আইনষ্টাইনের, অপরটি হলো ডি সিটারের। সুদূর অতীতে কোন এক সময় আইনষ্টাইন বিশ্ব দিয়ে আমাদের যাত্রা হয়েছিল সুরু। তারপর প্রচণ্ড বিস্ফোরণের ফলে যেমনি মহাবিশ্ব ক্রমাগত সম্প্রসারিত হতে লাগলো, তেমনি তার ঘনত্বও ক্রমশঃ কমতে লাগলো এবং সঙ্গে সঙ্গে তা ডি সিটারের বিশ্বের দিকে এগিয়ে গেল। বর্তমানে আমরা এই দুই আদর্শ বিশ্বের মাঝে কোথাও আছি এবং কোটি কোটি বছর পরে ডি সিটারের শূন্য বিশ্বের খুব কাছাকছি পৌঁছে যাব। ক্রমবর্ধমান বিশ্বে যে আমাদের বাস, তার বাস্তব প্রমাণও মেলে। ৫ কোটি আলোক-বর্ষ দূরে কন্যা রাশিতে নক্ষত্র-জগতের স্তবক, ৬৫ কোটি আলোক-বর্ষ দূরে সপ্তর্ষি মণ্ডলে, ৯৪ কোটি আলোক-বর্ষ দূরে উত্তর কিরীট মণ্ডলে, ১১০ কোটি আলোক-বর্ষ দূরে বুটিশ মণ্ডলে অবস্থিত নক্ষত্র-জগতের স্তবক যথাক্রমে প্রতি সেকেণ্ডে ৭৫০, ৯৩০০, ১৩৪০০, ২৪০০০ মাইল বেগে আমাদের জগৎ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে।

স্থিতাবস্থা তত্ত্ব (Steady State Theory)—বিশ্বের ঘনত্ব সর্বদাই কমে যাচ্ছে—এই কথা কিন্তু মেনে নিতে পারলেন না ইংরেজ গণিতজ্ঞ হার্মান বণ্ডী ও টমাস গোল্ড। তাঁরা একযোগে প্রচার করলেন যে, বিশ্বের যে কোন স্থান অতীতে যেমনটি ছিল, বর্তমানে তাই আছে এবং ভবিষ্যতেও তাই থাকবে। প্রতিনিয়ত নক্ষত্র-জগতের অপসরণের ফলে মহাবিশ্বের যে ঘনত্ব কমে যাচ্ছে, তা রোধ করে স্থিতাবস্থা বজায় রাখবার জন্যে এই দুই গণিত-বিজ্ঞানীর মতে নিত্য নতুন পদার্থ সৃষ্ট ও ঘনীভূত হয়ে পুরনো নক্ষত্র-জগতের স্থলে অনুরূপ নতুন জগতের জন্ম দিচ্ছে। বণ্ডী ও গোল্ডের সমঘন জগতে বস্তুহীনতা থেকে যে বস্তুর সৃষ্টি হয়, এতে অনেকের আপত্তি থাকা সত্ত্বেও আর এক জ্যোতির্বেত্তা ফ্রেড হয়েল বণ্ডী-গোল্ডের সঙ্গে যোগ দিয়ে আইনষ্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতা তত্ত্বের মৌলিক সমীকরণগুলির প্রয়োজনীয় পরিবর্ধন সাধন করে এই আপত্তি খণ্ডন করেন। অতি ঘন তত্ত্বে ও সংশোধিত মহাকর্ষ তত্ত্বে সমুদয় নক্ষত্র-জগতের বয়স ন্যূনাধিক ছয় মহাপদ্মের মত, কিন্তু যেহেতু বণ্ডী-গোল্ড-হয়েল বিশ্বে নিয়তই নক্ষত্র-জগৎ সৃষ্টি হচ্ছে, সেহেতু সবগুলির বয়স এক হতে পারে না। এই ক্ষেত্রে হিসাব করে দেখা গেছে, নক্ষত্র-জগতের গড়পড়তা বয়স হাব্‌ল ধ্রুবকের এক-তৃতীয়াংশ।

বিবর্তনশীল বিশ্ব—১৯৪৮ সালে দুজন মার্কিন জ্যোতির্বিজ্ঞানী জোল ষ্টেব্‌বিন্স ও আলবার্ট ই. হুইটফোর্ড বহুদূরের কতিপয় নক্ষত্র-জগতের আলো বিশ্লেষণ করে বিস্মিত হয়ে দেখলেন যে, তা ডপ্‌লারের লাল পরিবর্তন অপেক্ষাও ৫০% বেশী লাল। কারো কারো মতে মহাজাগতিক ধূলি-কণা কর্তৃক আলোক বিচ্ছুরণ এই অতিরিক্ত রক্তিম আভার কারণ। কিন্তু এতে এত অধিক পরিমাণ ধূলিকণার প্রয়োজন যে, হিসাবে তা দাঁড়ায় সমগ্র নক্ষত্র-জগতের বস্তুমানের এক-শ' গুণ, যা মহাবিশ্বে পদার্থের বণ্টন ও বিশ্বস্থানের বক্রতার মাপকাঠিতে একেবারেই অসম্ভব। তাছাড়া যখন একই গুচ্ছে অবস্থিত সব নক্ষত্র-জগৎ একই রকম লাল দেখায় না, তখন সহজেই বলা যেতে পারে যে, এটা ধূলিকণার কারসাজি নয়।

জ্যোতির্বিজ্ঞানী ব্যাড্‌ ডে কর্তৃক বিভক্ত দুই শ্রেণীর নক্ষত্র-জগতের ভিতরে যেগুলি কুণ্ডলাকৃতির, সেখানে রয়েছে প্রচুর ধূলি গ্যাস কণিকার মেঘ সহ 'পপুলেসন-১' গোত্রীয় নীলাভ তারকার সংখ্যাধিক্য, আর দ্বিতীয় শ্রেণী অর্থাৎ উপবৃত্তাকার নক্ষত্র-জগৎ হলো লাল তারকায় (পপুলেসন-২) সমৃদ্ধ, কিন্তু ধূলি-গ্যাস কণিকা বিমুক্ত। প্রথমোক্ত জগতে প্রবীণ তারকাদের মৃত্যু ঘটলেও সেখানকার ধূলি-গ্যাস কণিকা থেকে নবীন তারকার জন্মলাভের ফলে সাধারণভাবে তারকার সংখ্যার সমতা বজায় থাকে। কিন্তু উপবৃত্তাকার জগতে আয়ুশেষে যখন বয়স্ক তারকা নিবে যায়, তখন ধূলিকণার অভাবে সেখানে কোন নতুন তারার সৃষ্টি হয় না। প্রথমে ষ্টেব্‌বিন্স ও হুইটফোর্ড উপবৃত্তাকার নক্ষত্র-জগতে যে অধিকতর লাল আলো দেখতে পেয়েছিলেন, পরবর্তী কালে হুইটফোর্ড একাকী পর্যবেক্ষণের কাজ চালিয়ে কুণ্ডলাকৃতির জগতে কিন্তু সে রকমটি দেখতে না পেয়ে অবাক হয়ে যান। প্রায় সমদূরত্বে অবস্থিত পাশাপাশি এই দুই জাতীয় জগতের ভিতরে শুধু উপবৃত্তাকার জগতের অত্যধিক রক্তিম আভা যে ধূলিকণার কারসাজি নয়, এটা তিনি বুঝতে পারলেন। বর্তমানে আমরা যে লাল রঙের উপবৃত্তাকার তারকার জগৎ দেখছি, প্রকৃতপক্ষে তা অনেক আগেকার—যখন লাল তারকার সংখ্যা অপেক্ষাকৃত বেশী ছিল, কিন্তু সময় অতিবাহিত হবার সঙ্গে সঙ্গে ক্রমান্বয়ে এই সংখ্যা কমে গেছে। সময়ের সঙ্গে নক্ষত্র-জগতের এই যে ক্রমবিবর্তন, তা কিন্তু গোল্ড-হয়েলের স্থিতিস্থাপক বিশ্বের বিরোধী।

বিয়োগবোধক বক্রতা—অনেক গণিতজ্ঞের মতে ক্রমবর্ধমান বিশ্বের প্রসরণশীলতা অনন্ত কাল ধরে চলবে। তাঁরা হিসাব করে দেখেছেন যে, নক্ষত্র-জগতের অপসরণ বেগজনিত গতীয় শক্তি নিউটনের মহাকর্ষ-সৃষ্ট স্থিতিস্থাপকতা শক্তির প্রায় ৬৫০ গুণ, যার ফলে পরস্পর দুটি জগতের অপসরণ বেগ তাদের নিষ্ক্রমণ বেগকে (Escape velocity) ছাড়িয়ে যায়, যার দরুণ এরা পরাবৃত্তাকার পথে দূর থেকে দূরে সরে যায়, অর্থাৎ সোজা কথায় বিশ্বস্ফীতির কোন শেষ নেই। হাব্‌ল অতি সতর্কতার সঙ্গে বিপরীত বর্গসূত্র প্রয়োগে সুদূর নক্ষত্র-জগতের ঔজ্জ্বল্য বিচার ও দূরত্ব নির্ণয় করে দেখতে পেলেন যে, নক্ষত্র-জগতের সংখ্যা দূরত্বের ঘনফলের বৃদ্ধির হার থেকে অধিকতর দ্রুতবেগে বেড়ে যাচ্ছে। এই দেখে তিনি সিদ্ধান্ত করেন যে, বিশ্বস্থান বিয়োগবোধক বক্রতাসম্পন্ন। তাই এটি অনন্ত ও অসীম। কিন্তু নক্ষত্র-জগতের ঔজ্জ্বল্যের ভিত্তিতে হাব্‌ল যে দূরত্ব বের করেছেন, তা ষ্টেব্‌বিন্স-হুইটফোর্ডের বিবর্তনবাদ অনুযায়ী পরিবর্তনশীল। এই কারণে দূরত্ব নির্ণয়ে কিছুটা সংশোধনের প্রয়োজন রয়েছে।

গণিতের সাহায্যে একথা প্রমাণিত হয়েছে যে, বিশ্বস্ফীতির প্রাথমিক পর্যায়ে—

$$(\text{হাবল্ ধ্রুবক})^{২} = ৫{\cdot}৮ \times ১০^{-১৭} \; [\text{গড়পড়তা ঘনত্ব}] \quad \cdots\cdots (১)$$

বিশ্বের সর্বাধিক সঙ্কোচন মুহূর্ত থেকে সময় গণনা করে গণিত প্রমাণ করেছে—

$$\text{বিশ্বের উত্তাপ} = \frac{১{\cdot}৫ \times ১০^{১০}}{(\text{সময়})^{\frac{১}{২}}} \quad \cdots\cdots (২)$$

$$\text{বিশ্ববস্তুর ঘনত্ব} = \frac{\text{ধ্রুবক}}{(\text{সময়})^{\frac{১}{২}}} \quad \cdots\cdots (৩)$$

২ ও ৩নং সমীকরণ থেকে সহজেই অনুমেয় যে, বিশ্বের বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে তার উত্তাপ ও ঘনত্ব ক্রমশঃ কমে যায়। ২নং সমীকরণে সময় = হাব্‌ল ধ্রুবক = $\frac{১০^{১৭}}{১{\cdot}৮}$ সেকেণ্ড ধরলে বিশ্বের বর্তমান পরম উত্তাপ (Absolute temperature) যে ৫০° বের হয়, তা বাস্তবের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। ১ ও ৩নং সূত্র থেকে একথা সহজেই প্রমাণিত হয়

যে, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে হাব্‌ল ধ্রুবকেরও কিছুটা পরিবর্তন ঘটে।

স্পন্দন বাদ—বিশ্বের আসল রূপ ঠিক করে বলা আজও সম্ভব হয় নি। এই বিষয়ে নানা মুনির নানা মত। কেউ বলেন বিশ্ব সসীম, আবার কেউ বলেন অসীম এবং এর প্রসরণ চলবে অনন্ত কাল। কিন্তু বর্তমানে স্পন্দন বাদে বিশ্বাসী বিজ্ঞানীদের মতে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের এই বিস্তৃতি চিরকাল ধরে চলবে না। ক্যালিফোর্ণিয়ার ইন্‌ষ্টিটিউট অব টেক্‌নোলজীর ডাঃ আর. সি. টলম্যান বলেন, যখন মহাবিশ্বের ভর নির্দিষ্ট সন্ধিমান ছাড়িয়ে যাবে, তখন আপনা-আপনিই তার বিস্ফারণ বন্ধ হয়ে যাবে। তারপরে সুরু হবে সঙ্কোচনের পালা। দীর্ঘকাল ক্রমবর্ধমান সঙ্কোচনের ফলে যখন বিশ্ব ন্যূনতম আয়তন লাভ করবে, তখন আবার সুরু হবে প্রসরণ। এভাবেই স্পন্দনশীল বেলুনের মত পর্যায়ক্রমে চলতে থাকবে মহাবিশ্বের সঙ্কোচন ও প্রসরণ। বিভিন্ন মতবাদ নিয়ে বিজ্ঞানীমহলে জল্পনা-কল্পনার অন্ত নেই, তবে একটা বিষয়ে সবাই একমত যে, বর্তমান বিরাট বিশ্ব প্রতিনিয়ত বিপুল বেগে সম্প্রসরিত হচ্ছে।

মাউণ্ট উইলসন মানমন্দিরের ১০০ ইঞ্চি দূরবীক্ষণ যন্ত্র ২১০ কোটি আলোক-বর্ষ দূরে অবস্থিত নক্ষত্র-জগতের স্তবক পর্যন্ত আমাদের নিয়ে এসেছে এবং মাউণ্ট প্যালোমার বীক্ষণাগারের ২০০ ইঞ্চি দূরবীক্ষণ আমাদের দৃষ্টিশক্তি ৬৫০ কোটি আলোক-বর্ষেরও বেশী প্রসারিত করেছে। কিন্তু এখানেই বিশ্বের ইতি নয়—এরপর বেতার-দূরবীক্ষণের সাহায্যে আমাদের দৃষ্টির শেষ সীমায় যে অস্পষ্ট নক্ষত্র-জগতের সন্ধান পাওয়া গেছে, তাতে জানা যায় যে, এর অপসরণ বেগ হলো আলোর বেগের নয়-দশমাংশ। এর পরেও এমন সব জগৎ রয়েছে, যাদের বেগ আলোর বেগের সমান। কিন্তু এদের পরিচয় মানুষ কোন দিনই পাবে না। তাই বিশ্বকে জানা কখনও সম্ভব নয়। এই অন্তহীন বিশ্বে মানুষ কত মর্মান্তিকভাবে অকিঞ্চিৎকর, কিন্তু তবুও মূর্খের মত তার দুর্জয় সাহস—বিশ্বকে জানতে হবে।

সুগন্ধ মিশ্রণের ধারা ঃ বিজ্ঞানী পাউচার

শ্রীপ্রভাসচন্দ্র কর

সুগন্ধ তৈরি ও মিশ্রণের ধারা প্রাচীন। আমাদের দেশে আতর তৈরি ও ব্যবহারের বিষয়ে অনেক কিছুই জানা যায়। নূরজাঁহা নাকি গোলাপী আতরের উদ্ভাবন করেছিলেন। বিজ্ঞানী পাউচারের বইয়ে এই বিষয়ে নিম্নোক্তরূপ উল্লেখ রয়েছে—মুঘলদের একজন তাঁর উদ্যানে গোলাপ জল দিয়ে জলাশয়গুলি ভর্তি করে রাখতেন। রাজকুমারীদের মধ্যে একজন এই রকম জলের উপরে ভাসতে দেখলেন তৈলাক্ত জিনিষ এবং তিনি তা সংগ্রহ করালেন। দেখা গেল, তা অত্যন্ত সুগন্ধময় এবং রাজকুমারী তাকে সযত্নে রেখে দিলেন।

গোলাপজাত দুটি জিনিষের খুব বেশী প্রচলন—অটো (Otto) ও আতর। মনে রাখা দরকার যে, দুটির মধ্যে প্রভেদ রয়েছে। গোলাপের খাঁটি গন্ধবহ তেলটি হলো—অটো। আর আতর হলো, চন্দন তেলে ডুবিয়ে রাখা

গোলাপ ফুলের নির্যাস। ইউরোপে অটোর প্রচলন (দেশী আতরের চেয়ে) বেশী।

সুগন্ধ প্রস্তুত করতে হলে কয়েকটি উপাদান মিশিয়ে করা যায়—একথা স্বীকার্য ও সর্বজনবিদিত। তবে যদি কার্য-কারণ সম্পর্ক রহিত অবস্থায় তা করা হয়, তবে জাপানীদের কৃত ইংরেজি প্রবাদ Out of sight, out of mind-এর হাস্যকর ভাবান্তর Unseen is insane-এর মতই হয়ে দাঁড়ায়; অর্থাৎ বিজ্ঞানানুগভাবে সুগন্ধ প্রস্তুত না হলে তার মধ্যে দোষ-ত্রুটি অনেক কিছুই রয়ে যাবে। দীর্ঘস্থায়িত্বের অভাব, অদ্রব অবস্থায় কোন কোন উপাদানের উদ্ভব, দোকানে বা খরিদ্দারের কাছে অন্য রকম অবাঞ্ছিত প্রতিক্রিয়ায় সঞ্চার হতেই পারে, যদি বিজ্ঞানসম্মত নিয়মে সুগন্ধ মিশ্রিত না হয়ে থাকে।

সুতরাং সংক্ষেপে বলতে হয় এই যে, সুষ্ঠুভাবে প্রস্তুত হলে সুগন্ধের ফলাফলও নিশ্চয়ই সুষম হবে—অর্থাৎ সেরূপ ক্ষেত্রে সুগন্ধ হয়ে উঠবে সব রকমের কুক্রিয়াবর্জিত, এক শালীনতাপূর্ণ বিজ্ঞানসম্মত রুচিকর সৌরভ। স্বভাবতঃই এই রকমের সুগন্ধ হবে নাসিকাগ্রাহ্য।

দেখা গেছে যে, গন্ধবহ তেলের (Essential oil) ধরণ ও ধাঁজ নির্ভর করে 'দেশে কালে চ পাত্রে চ'। তাছাড়া প্রভাব রয়েছে জলবায়ুর, সংগ্রহকালীন সময়ের, আনুষঙ্গিক উদ্ভিদের পুষ্টি ও বৃদ্ধির সময়ে আবহ অবস্থা ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকারের সরল ও জটিল বিষয়ের। একথা নির্বিবাদে বলা যেতে পারে যে, উপযুক্ত কারণগুলির যে কোন একটি সুগন্ধবহ তেলের মান নির্ণায়ক। এছাড়াও কত রকমের অন্য কারণ রয়েছে, যারা অলক্ষ্যে ক্রিয়াশীল হয়ে গন্ধবহ তেলের গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করে।

অনেকের মনে হয়তো স্বভাবতঃই প্রশ্ন জাগবে যে, তবে যে কোন এক নির্দিষ্ট সময়ে বা এক-দেশ থেকে যথেষ্ট পরিমাণে সুগন্ধবহ তেলের সঞ্চয় এই সমস্যার হাত থেকে অন্ততঃ কিছু কালের জন্যে নিষ্কৃতি দেবে না কি? কিন্তু সে ক্ষেত্রেও অন্তরায় রয়েছে। সুগন্ধবহ তেল দীর্ঘকাল জমা হয়ে পড়ে থাকলে ধীরে ধীরে বিকৃত হতে থাকে, বিকৃতি পরিশেষে সুগন্ধকে কোন্ পর্যায়ে পরিচালিত করবে, তা বলা দুষ্কর। এমনও হতে পারে যে, পূতিগন্ধই তার শেষ পরিণতি।

শুধু কি তাই? ধরে নেওয়া গেল যে, এক দেশের একই ফলন-কালের ফুল সংগৃহীত হলো। তাতেও সমতা বজায় রাখবার হাত থেকে নিস্তার নেই। যে পদ্ধতিতে নির্যাস নিষ্কাশিত হবে (যেমন Enfleurage, Chassis ইত্যাদি পদ্ধতির দ্বারা), তার উপরও নির্ভরশীল সুগন্ধের গুণাগুণ ও মাত্রাধিক্য।

বিভিন্নরূপে প্রাপ্ত যুঁই ফুলের অ্যাবসলিউট একটা প্রকৃষ্ট উদাহরণ। পূর্বোক্ত দুটি পদ্ধতির দ্বারা প্রাপ্ত অ্যাবসলিউটের মধ্যে সুগন্ধের বেশ কিছু তারতম্য হয়ে থাকে। আবার তদুপরি দ্রাবক মাধ্যমের (যেমন, বেন্‌জিন, পেট্রোলিয়াম ইথার) উপরেও সুগন্ধের মাত্রাভেদ হয়ে থাকে।

আবহ ও ভূতাত্ত্বিক পার্থক্যের দরুণ পূর্বভারতীয়, পশ্চিম অষ্ট্রেলিয়ান ও ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের চন্দনের তেলে সৌরভ ও উপাদানের কত প্রভেদই না রয়েছে! পূর্বভারতীয় চন্দন তেলের বৈশিষ্ট্য (সুগন্ধ বিজ্ঞানে যাকে বলা হয় Balsamic note) পশ্চিম অষ্ট্রেলিয়ান চন্দন তেলের নেই বলে মনে হয়।

সম-মানের উপাদান ব্যবহৃত হলে তবেই তো সর্বদা আশা করা যায় হুবহু সুগন্ধের উৎপাদন। তাই সম-মানের উপাদান সংগ্রহ করবার জন্যে

কত প্রয়াসই না হয়েছে এবং হচ্ছে। বিশ্বস্তসূত্রে এমনও খবর পাওয়া গেছে যে, কোন এক বিদেশী প্রতিষ্ঠানের সুগন্ধ প্রস্তুতকালে যে সমস্ত উপাদান ব্যবহৃত হয়, সেগুলির সংখ্যা নিতান্ত বেশী নয়। তথাপি সেই প্রতিষ্ঠানের একখানি খাতা রয়েছে, যার পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠায় প্রত্যেক সুগন্ধের নাম, বৈশিষ্ট্য, রাসায়নিক ধ্রুবাঙ্ক (Constant), সরবরাহকারী স্থানের নাম, ফলনের সময়, উদ্ভিদের বয়স ইত্যাদি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে লিপিবদ্ধ করে রাখা হয়েছে। মান-নির্ণায়করূপে নিঃসন্দেহে এই পদ্ধতির দ্বারা বেশ সুফল পাওয়া যায় এবং পাওয়ারই কথা। তবে এই ব্যাপারে খাতার ভিতরে ভাষায় সবটাই তো ব্যক্ত করা সম্ভব নয়, সেখানে ভাষা হয়ে দাঁড়ায় ব্যঞ্জনা, আভাস ও ইঙ্গিত। ভেষজ-বিদ্যার পরিপোষকরূপে রয়েছে 'ফারমাকোপিয়া' শ্রেণীর বই। কিন্তু সুগন্ধ-বিজ্ঞানে এমন বই অসম্ভব; কয়েকটা রাসায়নিক গুণাবলীর সংগ্রহই সেখানে যথেষ্ট নয়। উপরন্তু প্রয়োজন রয়েছে তীব্র ও তীক্ষ্ম ঘ্রাণশক্তির।

সুগন্ধ মিশ্রণের ধারা লিপিবদ্ধ-করা যে খাতা বা বই থাকবে, তাতে উৎস বা সরবরাহকারী দেশ, প্রতিষ্ঠানের নাম ইত্যাকারের আনুষঙ্গিক ব্যাপার তো থাকবেই। কারণ সুগন্ধের উপর এদের প্রভাব সর্বাধিক। তাছাড়া বিভিন্ন ধরণের প্রাপ্য সুগন্ধ বা গন্ধবহ তেলের উৎসও জানা দরকার। ধরা যাক, এনিসিক অ্যালডিহাইড-এর কথা। সচরাচর দুটি উপায়ে এটি পাওয়া যায়—প্যারা-ক্রেশল অথবা এনিথল থেকে। জিরেনিয়ল পাওয়া যেতে পারে পামারোজা (Ex-palmarosa) অথবা পিনিন (Ex-pinene) থেকে। তেমনি লিনালিল অ্যাসিটেটের উৎস—বয়েস ড্য়রোজ, পেটিটগ্রেন, শিউ অথবা পিনিন। বলা বাহুল্য পৃথক পৃথক উৎসজাত সুগন্ধের মাত্রারও তারতম্য রয়েছে। যে সুগন্ধের মিশ্রণে বিশেষ ধরণের যে উপাদান ব্যবহৃত হয়, বরাবরই তা ব্যবহৃত হওয়া উচিত; অর্থাৎ গোলাপের কোন কৃত্রিম গন্ধ প্রস্তুতকালে যদি জিরেনিয়ল (পামারোজাজাত) ব্যবহৃত হয়ে থাকে, তবে বরাবরই তা ব্যবহার করতে হবে। অন্য উপায়ে প্রাপ্ত (যেমন পিনিন থেকে) জিরেনিয়ল ব্যবহার করা চলবে না বা চলা উচিত নয়। এর কারণ অতি সরল। এই রকমের সঙ্কীর্ণ পদ্ধতি অবলম্বিত না হলে সুগন্ধের মান-বিভ্রম ঘটবে।

অ-ডি-কোলন এবং ল্যাভেণ্ডার জল জাতীয় সুগন্ধ প্রস্তুতকালে খুব বেশী উপাদান লাগে না, নিরোলি, ল্যাভেণ্ডার শ্রেণীর গুটিকয়েক উপাদান প্রচুর অ্যালকোহল (Alcohol) বা সুরাসার সহযোগে এগুলি প্রস্তুত হয়। অল্পসংখ্যক উপাদানের দরুণ প্রতিটি উপাদানের মানের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা অপরিহার্য বিষয়। এসব মিশ্রণের বেলায় ফলন-কালের প্রতি নজর রাখা অতি প্রয়োজন। কারণ সকল ঋতুতে একই ফসলের সমান সুগন্ধ থাকে না। জিরেনিয়াম অয়েলের তিনবার ফলন-কাল—বসন্ত সমাগমে, জুন মাসে এবং কদাচিৎ অক্টোবর, নভেম্বরে। প্রথম ফলনটিই এর মধ্যে প্রশস্ত। ফলন তখনই সংগ্রহ করা হয়, যখন পাতাগুলি হলদে হতে সুরু করে; কারণ এমনি সময়েই লেবুর গন্ধ থেকে গোলাপের গন্ধ পরিবর্তিত হতে দেখা গেছে।

সুগন্ধ প্রস্তুতকালে মিশ্রণযোগ্য উপাদানগুলির সবই যে জলবৎ তরল হবে—এমন কোন কথা নেই। হয়তো ভ্যানিলিন, কুমারিন, হেলিওট্রোপিন, মাস্ক, রেজিনোইড্‌স্ শ্রেণীর গুঁড়া বা আঠালো জিনিষেরও ভূরি ভূরি ব্যবহার রয়েছে। মিশ্রণ-ধারার ভিতর যদি কোন দ্রাবক (যেমন ডাই-ইথাইল থলেট, বেনজারিল বেনজোয়েট) না থাকে, তবে সমস্যায় পড়তে হয়—কিসে গুঁড়া বা

কঠিন উপাদানগুলি দ্রব করা যাবে। গরম জলের কুণ্ডের (Water bath) উপর স্বল্পকাল গরম করলে ফিনাইল ইথাইল অ্যালকোহল, বেঞ্জায়িল অ্যাসিটেট অথবা জিরেনিয়ল শ্রেণীর তরল উপাদানগুলি দ্রাবকরূপে নিরাপদে কার্যকর থাকে। তবে সাবধান হতে হয় লেবুজাতীয় উপাদানের বিষয়ে। এগুলি গরম করা মোটেই নিরাপদ নয়। মিশ্রণকালে এদের মাত্রাধিক্য হয়তো থাকতে পারে। তা সত্ত্বেও এদের গরম করবার অর্থ এদের সুগন্ধের বিনাশসাধন ও দ্রুত হারে পরিবর্তন।

অনেক সময় এমন সব উপাদানের ব্যাপারে সাবধানতা অবলম্বন করতে হয়, যেগুলির মিশ্রণ কালে বিস্ফোরণের সম্ভাবনা থাকে। তারপর রয়েছে অধঃক্ষেপ (Precipitate) উদ্ভাবনের সমস্যা। দেশী সুইট অরেঞ্জ তেলের সঙ্গে রোজমেরীর তেল মিশ্রিত হলে মিশ্রণটি ঘোলা হয়ে যায়। কখনও কখনও গুঁড়া গুঁড়া Precipitate-ও মিশ্রণ-পাত্রের তলদেশে জমা হয়। এই ধরণের ব্যাপার একেবারেই পরিত্যাজ্য। তারপর রয়েছে কয়েক শ্রেণীর সুগন্ধ বা দ্রাবকের (ত্বকের উপরে) দুষ্প্রভাব। যেমন, একটা প্রকৃষ্ট উদাহরণ হলো মিথাইল হেপ্টিন কার্বনেট। লিপস্টিক (Lipstick) সুগন্ধিত করতে যে সুগন্ধ ব্যবহার করা হয়, তাতে সামান্য মাত্রায় মিথাইল হেপ্টিন কার্বনেট থাকলে অধর-ওষ্ঠ ক্ষতিগ্রস্ত হতে দেখা গেছে।

সুগন্ধ তৈরির জটিল মিশ্রণের ধারা কিভাবে নিয়ন্ত্রিত হওয়া উচিত এবং কত রকমের প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে, তার একটা মোটামুটি বিবরণ নিয়ে দেওয়া গেল :—

(ক) মিশ্রিত উপাদানের ভিতর যদি মুক্ত (বা অসংযুক্ত) অম্ল ও অ্যালকোহল থাকে, তবে উভয়ে এস্টার তৈরি করবে।

$$R_1.COO\,\boxed{H+HO}\cdots R_2 \rightarrow H_2O+R_1.COOR_2$$
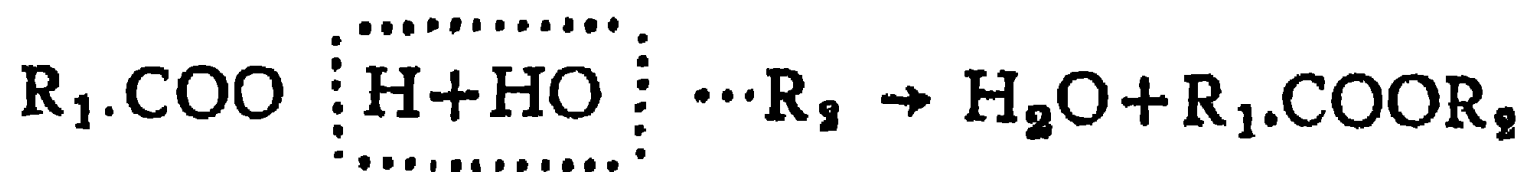
অম্ল অ্যালকোহল

(খ) এস্টারগুলির পরস্পর বিনিময় সাধন (Trans-esterification)

$$R_1.COOR_2+R_3.COOR_4 \rightarrow R_1\,COOR_4+R_3.COOR_2$$

(গ) মুক্ত অ্যালডিহাইড ও অ্যালকোহল সহযোগে অ্যাসিটাল অথবা অধিকতর সম্ভাব্য হেমি-অ্যাসিটাল উৎপাদন।

(ঘ) ট্রান্স-অ্যাসিটালিজেসন।

(ঙ) অ্যালডল উৎপাদন ইত্যাদি। এই বিষয়ে বিস্তারিতভাবে উল্লেখের দ্বারা প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি নিষ্প্রয়োজন।

শাখাপল্লব সমন্বিত এক বিরাট মহীরুহ যেমন তার চতুষ্পার্শ্বে সুশীতল ছায়ার সৃষ্টি করে, এর প্রতিটি শাখা-প্রশাখা-পত্রই এই ব্যাপারে অবদান যোগায়। অনুরূপভাবে বিজ্ঞানানুগভাবে মিশ্রিত হলে সুগন্ধের রূপায়ণ হয় সার্থক এবং তখন প্রতিটি উপাদানই নাসিকাগ্রাহ্য মনমাতানো স্নিগ্ধ পরিবেশ রচনায় সহায়ক হয়।

সুগন্ধ-বিজ্ঞানী পাউচার

বিশ্বের খ্যাতিমান সুগন্ধ-বিজ্ঞানীদের মধ্যে অন্যতম হলেন উইলিয়াম আর্থার (অথবা আরও পরিচিত 'ওয়াল্টার') পাউচার (William Arthur Poucher)। এঁর জন্ম ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে; জন্মস্থান—হর্নক্যাসল, লিঙ্কনশায়ার। প্রাথমিক

বিদ্যালয়—বাথ কলেজ এবং লণ্ডনের কিংস কলেজে শিক্ষাপ্রাপ্তির পর ইনি এক কেমিষ্ট-প্রতিষ্ঠানে চার বছর কাজ করেন। বিকাশোন্মুখ জীবনে সঙ্গীতের প্রতি তাঁর আকর্ষণ দেখা যায়। ষোড়শ বর্ষ বয়ঃক্রমের পূর্বেই সাধারণের কনসার্টে অংশগ্রহণ করতেন। এই সময়ে দিনে ছ-ঘন্টা ধরে পিয়ানো বাজাতে অভ্যাস করেছিলেন। এইরূপ একাগ্র আত্মনিয়ন্ত্রণ মন্ত্র ভাবী জীবনে সূক্ষ্ম সুগন্ধ-বিজ্ঞানে তাঁকে বিজেতার আসন দান করেছিল।

পাউচার হলেন Perfumes, Cosmetic and Soaps নামক অতি সারবান পুস্তকের রচয়িতা। ইনি ফার্মাসিষ্ট, রসায়নশাস্ত্রী ও প্রসাধন বিশেষজ্ঞ, আমেরিকার সোসাইটি অফ কস্‌মেটিক কেমিষ্টস্-এর সুবর্ণপদক দ্বারা সম্মানিত (১৯৫৪) এবং বিগত অর্ধশতাব্দীর মধ্যে নিঃসন্দেহে সর্বাধিক খ্যাতিমান বৃটিশ সুগন্ধ-বিজ্ঞানী।

জীবনের প্রারম্ভে পাউচার চিকিৎসক হবার আশায় St. Bartholomew-এর হাসপাতালে যোগদান করেন। ১৯১৪ খৃষ্টশতকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে সোম (Somme) নদের তীরে যুদ্ধে ফার্মাসিষ্টরূপে নিযুক্ত ছিলেন। ১৯১৯ সালে তিনি উপদেষ্টা রসায়ন-বিজ্ঞানীরূপে স্থিত হলেন এবং তখনই উপর্যুক্ত পুস্তকখানি প্রণয়ন করেন। বিগত ৪০ বছরে পুস্তকটির ৭টি সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে এবং ফরাসী ও জাপানী ভাষায় পুস্তকখানির অনুবাদ হয়েছে।

ছবি তোলা (ফটোগ্রাফি) উপর পাউচারের ঝোঁক দীর্ঘকালের। লিখেছেন—'Escape to the Hills', এছাড়া স্কটল্যাণ্ড সম্বন্ধে পাঁচখানি, লেক ডিষ্ট্রিক্ট বিষয়ে দুখানি, উত্তর ওয়েলস বিষয়ক তিনখানি, Pennines সম্বন্ধে দু'খানি এবং আয়ারল্যাণ্ড, সুর্‌রে (Surrey) এবং ডোলোমাইটস্—প্রত্যেক বিষয়ে একখানি বই লিখেছেন। পর্বতারোহণের প্রতি তাঁর স্বতঃস্ফূর্ত আকর্ষণ রয়েছে। তাঁর সংগ্রহের মধ্যে রয়েছে ২৫,০০০ মনোক্রোম নেগেটিভ এবং ১০,০০০ কলার ট্র্যান্সপারেন্সি এবং বহু এনলার্জড্ প্রিন্ট। কিন্তু এই ৩৫,০০০ ছবির সংগ্রহ এমন সুষ্ঠুভাবে সাজানো আছে যে, প্রায় নিমেষের মধ্যে যে কোন ছবি তিনি বের করে ফেলতে পারেন। বহু সদ্‌গ্রন্থ প্রণেতা পাউচার এমনও দুর্লভ স্থানে বিচরণ করেছেন, যেখানে তিনিই হলেন প্রথম ইংরেজ ভ্রমণকারী। তাঁর দূর ভ্রমণ চলেছে অবাধে—Zermatt, Chamonix, Canada, New Mexico এবং Grand Canyon। এঁর প্রিয় খেলা হলো গল্‌ফ্। মোটর গাড়ী চালনায়ও তিনি সুদক্ষ ও সাবধানী। সুগন্ধ-বিজ্ঞানী পাউচার, পর্বতারোহণকারী, ফটোগ্রাফার ও গল্‌ফ্ ক্রীড়াযোদী ও রয়েছেন এত প্রবীণ বয়সে।

থার্মো-ইলেকট্রিসিটি

শ্রীসৌরেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য

আমাদের চতুষ্পার্শ্বের বস্তুজগতে অহরহ সংঘটিত হচ্ছে কত ঘটনা। আমরা সচেতন ভাবে না দেখলে বা না জানলেও এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড কোন সময় থেমে নেই—প্রতি মুহূর্তে আগের থেকে পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছে। জড়জগতের এই পরিবর্তনকে আমরা কয়েকটা ধাঁচে ফেলে বিচার করতে পারি। যেমন বস্তুর সঙ্গে বস্তুর বিক্রিয়া, শক্তি ও বস্তুর বিক্রিয়া, শক্তির এক রূপ থেকে অন্য রূপে পরিবর্তন প্রভৃতি। এর মধ্যে তৃতীয় ধাঁচের এক বিশেষ ঘটনা—থার্মো-ইলেকট্রিক এফেক্ট বা তাপ-শক্তির বিদ্যুতে পরিবর্তন বর্তমান আলোচ্য বিষয়।

শক্তির রূপ পরিবর্তন বিজ্ঞানের এক মূল নীতি। এই নীতিরই প্রকাশ দেখি আলোক শক্তির বিদ্যুতে রূপান্তরে—ফটো-ইলেকট্রিক এফেক্টে; রাসায়নিক শক্তির বিদ্যুতে রূপান্তরে—সাধারণ বৈদ্যুতিক সেল-এ। তাপ-শক্তিকেও যে অনুরূপভাবে বিদ্যুতে পরিবর্তিত করা যায়—এই তথ্য প্রথম আবিষ্কার করেছিলেন সীবেক ১৮২১ সালে।

তিনি দেখান যে, দুটি বিভিন্ন ধাতুর তার দিয়ে একটা বর্তনী (Circuit) তৈরি করে ধাতুদ্বয়ের সংযোজক দুটি স্থানের মধ্যে তাপ-মাত্রার প্রভেদ রাখলে বর্তনী দিয়ে তড়িৎ-স্রোত বা কারেন্ট প্রবাহিত হতে থাকে। তিনি এর নাম দেন থার্মো-ইলেকট্রিসিটি। ১নং চিত্রে দেখানো হয়েছে—তামা ও লোহার তার দিয়ে একটা বর্তনী করা হয়েছে। বর্তনীতে তড়িৎ-প্রবাহ নির্দেশক একটা গ্যালভ্যানোমিটারও রাখা হয়েছে। প্রারম্ভে A ও B ধাতুদ্বয়ের উভয় সংযোগকেই 0° সেঃ তাপমাত্রায় রেখে দেওয়া হলো। তারপর কোন এক সংযোগ, ধরা যাক A-কে সব সময়ই 0° সেঃ তাপমাত্রায় রেখে B-কে আস্তে আস্তে তাপ দেওয়া হতে লাগলো। কিছুক্ষণের মধ্যেই গ্যালভ্যানোমিটারে কাঁটার বিক্ষেপণ দেখা যাবে; অর্থাৎ বর্তনীতে তড়িৎ-স্রোত প্রবাহিত

১নং চিত্র

হতে থাকবে। প্রবাহের গতিপথ হবে গরম সংযোগ স্থানে তামা থেকে লোহায় এবং ঠাণ্ডা সংযোগে লোহা থেকে তামায় (তীর চিহ্ন দিয়ে দেখানো হয়েছে)। যতই গরম সংযোগের তাপমাত্রা বাড়ানো হবে, ততই এই প্রবাহের পরিমাণ বাড়তে থাকবে। অবশেষে প্রায় ২৭৫° সেঃ তাপমাত্রায় তড়িৎ-প্রবাহের মান হবে সর্বোচ্চ। তাপমাত্রা আরও বাড়ালে মান কমতে থাকবে—কমতে কমতে ৫৫০° সেঃ তাপমাত্রায় মান হবে শূন্য অর্থাৎ তড়িৎ-প্রবাহ বন্ধ হয়ে যাবে। তাপমাত্রা আরও বাড়ালে তড়িৎ-প্রবাহ আবার সুরু হবে, তবে এবার হবে বিপরীত দিকে; অর্থাৎ গরম সংযোগে লোহা থেকে তামায় এবং ঠাণ্ডা সংযোগে তামা থেকে লোহায় (২নং চিত্র)। এরূপ তাপমাত্রার পারিভাষিক নাম Inversion temperature।

সীবেক কর্তৃক আবিষ্কৃত এই ঘটনার নাম দেওয়া হয়েছে সীবেক এফেক্ট এবং এই এফেক্টে অংশ গ্রহণকারী ধাতুদ্বয়ের যুগ্ম-ভূমিকার নাম থার্মো-কাপ্‌ল্।

শুধু তামা ও লোহার মধ্যেই নয়, অন্য যে কোন দুটি বিভিন্ন ধাতু দিয়েও এই পরীক্ষা চালানো যেতে পারে। তবে তড়িৎ-প্রবাহের মান ও দিক যে আগের মতই হবে, তার কোন মানে নেই। সেটা নির্ভর করবে ধাতুদ্বয়ের পরস্পরের আপেক্ষিক ধর্মের উপর ও সংযোগ-স্থল দুটিতে তাপমাত্রার প্রভেদের উপর। সীবেক পরীক্ষার ফলাফল হিসেবে একটা তালিকা করে তাতে অনেকগুলি ধাতু সাজিয়ে দিয়েছেন। অংশতঃ এই তালিকা হলো :

Bi—Ni—Co—Pd—Pt— U—Cu—Mn—Ti—Hg—Pb—Sn—Cr—Mo—Rh—Ir—Au—Ag—Zn—W—Cd—Fe—As—Sb—Te। এই তালিকায় দুটি তাৎপর্য আছে—১। এর যে কোন দুটি ধাতু দিয়ে পূর্বোক্ত পরীক্ষা করলে যে ধাতু আগে থাকবে, তাথেকে পরের ধাতুতে (গরম সংযোগ দিয়ে) তড়িৎ-প্রবাহ যাবে। ২। তালিকায় ধাতুদ্বয়ের দূরত্ব মোটামুটি সেই কাপ্‌লের তড়িৎ-প্রবাহের মাত্রার পরিচায়ক; যেমন—বিসমাথ (Bi) ও অ্যান্টিমনির (Sb) থার্মো-কাপ্‌ল, লোহা (Fe) ও তামার (Cu) থার্মো-কাপ্‌লের চেয়ে বেশী শক্তিশালী। কারণ Bi ও Sb-এর দূরত্ব Cu ও Fe-এর দূরত্ব অপেক্ষা অনেক বেশী। এই তালিকায় অবশ্য ধরে নেওয়া হয়েছে যে, গরম সংযোগের তাপমাত্রা সব সময় Inversion temp.-এর নীচে থাকবে।

২নং চিত্র

Inversion ঘটনাটা আবিষ্কার করেছিলেন কামিং, সীবেকের আবিষ্কারের কিছুকাল পরে। তিনি পরীক্ষা করে দেখলেন যে, যদি পূর্বোক্ত তামা-লোহার কাপ্‌লে ঠাণ্ডা সংযোগের তাপমাত্রা 0° সেঃ না রেখে, ধরা যাক ১০° সেঃ রাখা যায়, তাহলেও বর্তনীতে সর্বোচ্চ তড়িৎ-প্রবাহ যাবে, যখন গরম সংযোগের তাপমাত্রা ২৭৫° সেঃ। কিন্তু এবার তড়িৎ-প্রবাহের মান শূন্য ও তার দিক পরিবর্তন ঘটবে ৫৫০° সেঃ-এ নয়, ৫৪০° সেন্টিগ্রেডে। সুতরাং গরম সংযোগের যে তাপমাত্রায় তড়িৎ-প্রবাহ সর্বোচ্চ হয়, তা প্রত্যেক কাপ্‌লের জন্যে নির্দিষ্ট। এই তাপমাত্রার নাম দেওয়া হয়েছে নিরপেক্ষ তাপমাত্রা (Neutral temp.)। কিন্তু উক্ত সংযোগের যে তাপমাত্রার জন্যে তড়িৎ-প্রবাহ শূন্য ও বিপরীতমুখী হতে আরম্ভ করবে, তা নির্দিষ্ট নয়। ঠাণ্ডা সংযোগের তাপমাত্রা নিরপেক্ষ মান থেকে যত কম, Inversion তাপমাত্রা উক্ত মানের চেয়ে তত বেশী।

কাপ্‌লের কার্যকারিতা নির্ণীত হয় তার থার্মো-ইলেকট্রিক পাওয়ার দিয়ে। একথা সবাই জানেন যে, তড়িচ্চালক বলের (e. m. f.) জন্যেই কোন বর্তনীতে তড়িৎ-স্রোত প্রবাহিত হতে পারে। আলোচ্য ক্ষেত্রেও তড়িৎ-প্রবাহ চলবার জন্যে বর্তনীতে উদ্ভূত একটা তড়িচ্চালক বল কাজ করে। এখন প্রথমে উভয় সংযোগকে T° তাপমাত্রায় রেখে এক সংযোগের মান ΔT° বাড়ালে উদ্ভূত তড়িচ্চালক বল যদি ΔE হয়, তবে T°-তে কাপ্‌লের থার্মো-ইলেকট্রিক পাওয়ার হচ্ছে $\Delta E/\Delta T$; অর্থাৎ সাধারণভাবে T° ও $(T+1)^\circ$ তাপমাত্রাদ্বয়ের জন্যে কাপ্‌লে কত তড়িচ্চালক বল উদ্ভূত হয়।

সংযোগদ্বয়ের তাপমাত্রার পার্থক্য ও কাপ্‌লের তড়িচ্চালক বলের সম্পর্কটা মজার। তাপমাত্রার পার্থক্যকে x-অক্ষ ও তড়িচ্চালক বলকে y-অক্ষ ধরলে উভয়ের রেখচিত্র প্রাথমিক দৃষ্টিতে দেখতে হয় অধিবৃত্তাকার (Parabolic)। অবশ্য কয়েক ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রমও আছে।

পেলশার এফেক্ট (Peltier effect)—১৮৩৪ সালে পেলশার সীবেক এফেক্টের উল্টো ঘটনা অর্থাৎ বিদ্যুতের তাপে পরিবর্তনের ঘটনা আবিষ্কার করেছিলেন। দুটি বিভিন্ন ধাতু জুড়ে একটা থেকে অন্যটায় তড়িৎ-স্রোত পাঠালে সংযোগ স্থল—হয় ঠাণ্ডা, নয় তো উত্তপ্ত হয়ে ওঠে; অর্থাৎ তাপের শোষণ হয় কিংবা উদ্ভব ঘটে। দিক পরিবর্তন করে তড়িৎ-স্রোত পাঠালে আগে যা হচ্ছিল, তার বিপরীত হতে থাকে।

সীবেকের বর্তনীর অনুরূপ একটা বর্তনী নেওয়া যাক। তবে এই বর্তনীতে সংযোগদ্বয়ের তাপমাত্রা সমান রেখে একটা ব্যাটারী দিয়ে তড়িৎ-স্রোত পাঠানো হচ্ছে। তুলনার জন্যে তড়িৎ-প্রবাহের গতিপথ প্রথমোক্ত পরীক্ষার মতই রাখা হলো। দেখা যাবে, এবার B সংযোগ ধীরে ধীরে ঠাণ্ডা এবং A সংযোগ ধীরে ধীরে গরম হতে থাকবে; অর্থাৎ সীবেক এফেক্টে তড়িৎ-প্রবাহ পাঠাবার জন্যে যে সংযোগকে গরম করতে হয়েছিল, পেলশার এফেক্টে ব্যাটারী দিয়ে একই দিকে তড়িৎ-প্রবাহ পাঠালে সেই সংযোগই ঠাণ্ডা হতে থাকবে। এথেকে বোঝা যায় যে, যখন শুধু তাপমাত্রার প্রভেদ হেতু সীবেক তড়িৎ-স্রোত প্রবাহিত হতে থাকে, তখনও B-তে তাপ শোষণ এবং A-তে তাপোদ্ভব হতে থাকে। B ও A-তে যথাক্রমে তাপের উৎস ও শোষক না রাখলে কিছুক্ষণের মধ্যে উভয়ের তাপমাত্রা সমান হয়ে যাবে ও তড়িৎ-স্রোত বন্ধ হয়ে যাবে। সীবেক তড়িৎ-প্রবাহ চালু রাখতে গেলে বাইরে থেকে তাপ সরবরাহের প্রয়োজন, এথেকে তা পরিষ্কার বোঝা যায়। পেলশার এফেক্ট Reversible অর্থাৎ তড়িৎ-প্রবাহের দিক পরিবর্তন করলে সংযোগ-

দ্বয়ের এফেক্টও অদলবদল হয়ে যায়—একথা আগেই বলা হয়েছে।

পেলশার এফেক্ট ও জুল এফেক্টের গোলমাল হয়ে যাবার সম্ভাবনা থাকায় উভয়ের পার্থক্যটা বলে নেওয়া ভাল। যে কোন বর্তনীতে তড়িৎ-প্রবাহ চললে বর্তনীর রোধের (Resistance) দরুণ কিছু তাপ উৎপন্ন হয়। এই তাপকে বলা হয় জুল-তাপ (Joule-heating)। প্রবাহ যে দিকেই চলুক না কেন, এই তাপ সব সময়েই উৎপন্ন হবে, কখনও শোষিত হবে না, অর্থাৎ এটা তড়িৎ-প্রবাহের দিক নিরপেক্ষ। এজন্যে জুল-তাপকে বলা হয় Irreversible, কিন্তু পেলশার এফেক্ট Revrsible। এখানেই উভয়ের মূলগত পার্থক্য।

উভয় এফেক্টের ব্যাখ্যায় সরল ইলেকট্রন তত্ত্ব

সরল ইলেকট্রন তত্ত্ব দিয়ে আলোচ্য এফেক্ট-দ্বয়ের প্রাথমিক দিকগুলি বেশ সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করা যায়। আমরা জানি, ধাতু বিদ্যুতের পক্ষে সুপরিবাহী। আধুনিক তত্ত্ব অনুযায়ী পরিবাহী বস্তুগুলি তাদের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে মুক্ত ইলেকট্রন ধরে রাখে। এই ইলেকট্রনগুলি অন্তরাণবিক শূন্যে মুক্তভাবে ছুটাছুটি করে বেড়ায়। সে দিক দিয়ে এদের ব্যবহার অনেকটা গ্যাসের অণুর মত হওয়ায় এদের অনেক সময় ইলেকট্রন-গ্যাস বলেও অভিহিত করা হয়। একক আয়তনে এদের সংখ্যা (ঘনত্ব) ধাতু এবং ধাতুর তাপমাত্রার উপর নির্ভর করে। যখন দুটি বিভিন্ন ধাতু একপ্রান্তে যুক্ত করা হয়, তখন একের ইলেকট্রন-ঘনত্ব সাধারণতঃ অন্যের ঘনত্ব থেকে পৃথক হওয়ায় উচ্চ ঘনত্বের ধাতু থেকে নিম্ন ঘনত্বের ধাতুতে ইলেকট্রন পরিব্যাপ্ত হতে থাকে। এভাবে ইলেকট্রন স্থানান্তরিত হবার ফলে 'দাতা' ধনাত্মক এবং 'গ্রহীতা' ঋণাত্মক তড়িৎ-গ্রস্ত হয়ে পড়ে। ফলে উভয়ের মধ্যে একটা তড়িৎ-ক্ষেত্র স্থাপিত হয়, যার মান বাড়তে বাড়তে শেষ পর্যন্ত এমন হয় যে, আর ইলেকট্রন স্থানান্তরিত হতে পারে না। দাতা ও গ্রহীতার মধ্যে 'Dynamic equilibrium' হয়ে নির্দিষ্ট তাপমাত্রার এক নির্দিষ্ট বিভব-প্রভেদ স্থাপিত হয়। ধাতু দুটি অন্য প্রান্তে সংযুক্ত করলে সেখানেও অনুরূপ বিভব-প্রভেদের সৃষ্টি হয়। কিন্তু উভয় সংযোগে সৃষ্ট বিভব-প্রভেদ থেকে উদ্ভূত তড়িচ্চালক বলদ্বয় পরস্পরের সমান ও বিপরীতমুখী হওয়ায় বর্তনী সম্পূর্ণ হলেও তড়িৎ-স্রোত প্রবাহিত হয় না। সংযোগদ্বয়ে তাপমাত্রার প্রভেদ থাকলে এক সংযোগের বিভব-প্রভেদ ও তড়িচ্চালক বল অন্য সংযোগের বিভব-প্রভেদ ও তড়িচ্চালক বলের সমান হয় না। কারণ আগেই বলেছি, ইলেকট্রনের ঘনত্ব তাপমাত্রার উপর নির্ভরশীল। ফলতঃ উভয় বলের বিয়োগ ফলের পরিমাণ তড়িচ্চালক বল বর্তনীতে কাজ করে তড়িৎ-প্রবাহ চালাতে থাকে।

এই তো গেল সীবেক এফেক্টের ব্যাখ্যা। এই তত্ত্ব দিয়ে পেলশার এফেক্টেরও ব্যাখ্যা করা যায়। এক্ষেত্রে সংযোগদ্বয়কে একই তাপমাত্রায় রাখা হয় এবং আগের মতই উভয় সংযোগে বিপরীতমুখী তড়িচ্চালক বলের সৃষ্টি হয়। এখন ব্যাটারী দিয়ে বর্তনীতে তড়িৎ-স্রোত পাঠালে এক সংযোগে প্রবাহকে বিভব-প্রভেদের অনুকূলে এবং অন্য সংযোগে প্রতিকূলে যেতে হয়। একটা পাহাড়ের উপর উঠতে গেলে আমাদের যেমন পরিশ্রম করতে হয়, তেমনি প্রতিকূল স্থানে তড়িৎ-স্রোতকে বিভব-প্রভেদের প্রতিরোধের বিরুদ্ধে কাজ করে এগুতে হয়। সেই কাজই তাপ-শক্তিতে রূপান্তরিত হয় এবং সেই সংযোগ গরম হয়ে ওঠে। অনুকূল সংযোগে তড়িৎ-স্রোত যেন বিভব-প্রভেদের ঢাল বেয়ে গড়িয়ে পড়ে। এক্ষেত্রে কাজ করে বর্তনীর বিভব-প্রভেদ, সংযোগের তাপ সঞ্চয় থেকে। ফলে সেই স্থানটি তাপ হারিয়ে আস্তে

আস্তে ঠাণ্ডা হতে থাকে। এথেকে সহজেই বোঝা যায় যে, সীবেক তড়িৎ-প্রবাহ চালাবার জন্যে যে সংযোগ গরম রাখতে হয়েছিল, পেলশার তড়িৎ-প্রবাহে সেই সংযোগই কেন ঠাণ্ডা হতে থাকে।

টমসন এফেক্ট—সার উইলিয়াম টমসন তত্ত্বগতভাবে সীবেক-তড়িচ্চালক বলের পরিমাপ বের করতে গিয়ে দেখেন—যদি কেবলমাত্র সংযোগদ্বয়ের তাপমাত্রার পার্থক্যই উক্ত বলের কারণ হতো, তবে সেই বল তাপমাত্রার পার্থক্যের সমানুপাতিক হবে; অর্থাৎ তড়িচ্চালক বল ও তাপমাত্রার পার্থক্য সরল রৈখিক সম্বন্ধে আবদ্ধ হবে। কিন্তু আগেই বলেছি, এদের সম্বন্ধে হলো অধিবৃত্তাকার। টমসন অনুমান করলেন যে, বর্তনীতে নিশ্চয়ই আরো কোন তড়িচ্চালক বলের সন্ধান মিলবে। ইলেকট্রন তত্ত্ব দিয়েই তিনি এর সন্ধান পেলেন। তিনি দেখলেন, ইলেকট্রনের ঘনত্ব তাপমাত্রার উপর নির্ভর করে—কম তাপমাত্রায় ঘনত্ব বেশী ও বেশী তাপমাত্রায় ঘনত্ব কম। সুতরাং কোন ধাতুতে যদি তাপমাত্রার ঢাল (Temp. gradient) থাকে, তবে ঢাল অনুযায়ী ইলেকট্রন বন্টনের জন্যে ধাতুতে একটা তড়িচ্চালক বলের সৃষ্টি হতে পারে। তিনি পরীক্ষা করেও দেখান যে, এক্ষেত্রেও ব্যাটারী দিয়ে তড়িৎ-প্রবাহ পাঠালে যেখানে প্রবাহকে তড়িচ্চালক বলের বিপরীতে যেতে হচ্ছে, সেখানে তাপ উদ্ভূত হয় এবং যেখানে অনুকূলে যেতে হচ্ছে, সেখানে তাপ শোষিত হয়। এই এফেক্টের নাম দেওয়া হয়েছে টমসন এফেক্ট। সীবেক এফেক্টে গরম সংযোগ থেকে ঠাণ্ডা সংযোগ পর্যন্ত তাপমাত্রার ঢাল থাকে এবং সেখানে টমসন-তড়িচ্চালক বল কাজ করে। একে বল হিসাবে ঢুকিয়ে টমসন আশানুরূপ ফল পেলেন।

কিন্তু একটা ঘটনায় এই তত্ত্ব ব্যাখ্যা দিতে পারে না। তত্ত্ব অনুযায়ী দেখা যাচ্ছে, পরিবাহী বস্তুতে তড়িচ্চালক বল সর্বদা উচ্চ তাপমাত্রা থেকে নিম্ন তাপমাত্রার অঞ্চল অভিমুখী হবে। কারণ উচ্চ তাপমাত্রায় ইলেকট্রনের ঘনত্ব কম থাকায় সেই স্থানটি উচ্চতর বিভব প্রাপ্ত হয়। কিন্তু বাস্তবে এর বিপরীতও দেখা যায়; যেমন—বিস্‌মাথ, কোবাল্ট, লোহা প্রভৃতির ক্ষেত্রে তড়িচ্চালক বল উচ্চ তাপমাত্রা থেকে নিম্ন তাপমাত্রা অভিমুখী, কিন্তু তামা, রূপা, ক্যাডমিয়াম প্রভৃতির ক্ষেত্রে নিম্ন তাপমাত্রা থেকে উচ্চ তাপমাত্রা অভিমুখী।

থার্মো-ইলেকট্রিসিটির ব্যবহার

নীচে থার্মো-ইলেকট্রিসিটির তিনটি ব্যবহারের কথা সংক্ষেপে বলা হলো।

(১) তাপমান যন্ত্র হিসাবে থার্মোকাপ্‌লের প্রয়োগ খুব প্রচলিত। কোন বস্তুর তাপমাত্রা মাপতে হলে কাপ্‌লের এক সংযোগ বস্তুস্পর্শে রেখে অন্য সংযোগ বরফে ডুবিয়ে রাখা হয়। তাপমাত্রার বৈষম্যের ফলে যে তড়িৎ-প্রবাহ উদ্ভূত হয়, তা একটি ক্যালিব্রেটেড মাইক্রো-অ্যামিটার দিয়ে মাপা হয়। এতে তড়িৎ-প্রবাহের মানকে একেবারে বস্তুর তাপমাত্রা হিসাবে দেখানো হয়। নিকেল-নাইক্রোম কাপ্‌ল্ দিয়ে প্রায় ১২০০° সেঃ পর্যন্ত তাপমাত্রা মাপা যায়। তামা ও কন্‌স্টানটান কাপ্‌ল দিয়ে —২০০° সেঃ থেকে ৬০০° সেঃ পর্যন্ত তাপমাত্রা মাপা যায়। থার্মোকাপ্‌লে উদ্ভূত তড়িৎ-স্রোত খুবই কম। উদাহরণস্বরূপ—তামা ও লোহার কাপ্‌লে সংযোগদ্বয়ের তাপমাত্রা ০° সেঃ ও ১০০° সেঃ হলে উদ্ভূত তড়িচ্চালক বল হবে মোটে ০'০০১৩ ভোল্ট। এজন্যে অনেকগুলি কাপ্‌ল এক সঙ্গে জুড়ে থার্মোপাইল নামে একটা যন্ত্র আছে, যা দিয়ে খুব সামান্য পরিমাণ বিকিরিত তাপও মাপা চলে। একান্তরভাবে থার্মো-সংযোগ-

গুলিকে বিকিরিত তাপের সামনে ধরা হয় ও অন্য সংযোগগুলিকে কোন নির্দিষ্ট ঠাণ্ডা তাপমাত্রায় রাখা হয়।

(২) তড়িৎ-প্রবাহ নির্দেশক যন্ত্র হিসাবেও এর ব্যবহার আছে। জে. এ. ফ্লেমিং পরিবর্তী তড়িৎ-স্রোত নির্দেশক একটা যন্ত্র তৈরি করেছেন।

(৩) তড়িৎ-শক্তির উৎস হিসাবে আমরা থার্মোকাপ্‌লকে পেতে পারি। এজন্যে বর্তনীতে খুব কম প্রতিরোধ (Resistance) রাখা প্রয়োজন। আজকাল মহাকাশ-যাত্রায় যে সৌর-ব্যাটারীর কথা শোনা যায়, তা এই নীতির উপর ভিত্তি করেই গঠিত।

সঞ্চয়ন

সূর্যদেহ পরীক্ষার জন্যে মার্কিন উপগ্রহ কক্ষপথে প্রেরিত

সূর্যদেহে বিস্ফোরণ ও সৌরকলঙ্ক বর্তমানে চরম পর্যায়ে উপনীত হতে চলেছে। অশান্ত সূর্যকে নানাদিক থেকে পরীক্ষার এটাই উপযুক্ত সময়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তাই সূর্যদেহ পরীক্ষার জন্যে নয়টি যন্ত্র সহ একটি কৃত্রিম উপগ্রহ সম্প্রতি কক্ষে প্রেরণ করেছে।

জাতীয় বিমান বিজ্ঞান ও মহাকাশ সংস্থার পক্ষ থেকে বলা হয়েছে—এই উপগ্রহ উৎক্ষেপণের কাজ প্রাথমিক পর্যায়ে ভালই চলে। কক্ষ পরিক্রমারত সৌর মানমন্দির ও. এস-ও-৩ মহাকাশযানটি মহাকাশে নিজের অবস্থান ঠিক করে নিয়ে সূর্যের দিকে মুখ ফিরিয়ে তার যন্ত্রপাতিগুলি চালু করে।

৬২১ পাউণ্ড ওজনের এই উপগ্রহটি ৩৫০ মাইল উর্ধ্বে কক্ষপথে প্রেরিত হয়। উৎক্ষেপক হিসাবে ডেল্টা রকেটটি খুবই নির্ভরযোগ্য। যুক্তরাষ্ট্রের মহাকাশ পরিকল্পনায় ১৯৬০ সাল থেকে এইবার নিয়ে মোট ৪৬ বার এই রকেট ব্যবহৃত হলো।

সূর্যদেহ পরীক্ষা করে এই কৃত্রিম উপগ্রহটি সৌর ঝটিকা সম্পর্কে এমন সব তথ্য প্রকাশ করবে বলে আশা করা যাচ্ছে, যার ফলে হয়তো ভবিষ্যতে এই সম্পর্কে পূর্বাভাস দেওয়া সম্ভব হবে।

এই পরিকল্পনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মার্কিন বিজ্ঞানী ওয়ার্ণার নিউপার্ট বলেন—প্রথম দুটি সৌর মানমন্দির সৌর বিস্ফোরণ সম্পর্কে জ্ঞান সঞ্চয়ে সাহায্য করেছিল। তিনি বলেন, এখনও কিন্তু এই সম্পর্কে অনেক কিছুই আমাদের জানা নেই। কাজেই এখনই কিছু ভবিষ্যদ্বাণী করবার চেষ্টা করা চলে না।

সূর্যদেহে প্রচণ্ড বিস্ফোরণের ফলে সৌর-জগতের মধ্য দিয়ে যে মারাত্মক তেজ বিকিরিত হয়, তা চন্দ্রগামী মহাকাশচারীদের পক্ষে গুরুতর বিপদের কারণ হয়ে দেখা দিতে পারে। এই তেজ পৃথিবীর আবহমণ্ডলে আঘাত করে বেতার-বার্তা আদান-প্রদান বন্ধ করে দেয়, চৌম্বক ঝঞ্ঝা ঘটায় এবং পৃথিবীর আবহাওয়ার উপরও প্রভাব বিস্তার করে।

সূর্যের প্রচণ্ডতা তার ১১ বছরের চক্রাবর্তনে কখনও হ্রাস পায়, কখনও বা বৃদ্ধি পায়। বর্তমানে সূর্যদেহের বিস্ফোরণ প্রভৃতি ক্রিয়াকলাপ চরমে পৌঁছাবার দিকে এগিয়ে চলেছে। ১৯৬৯ সালে তা চরম পর্যায়ে উপনীত হবে।

ও. এস. ও-৩ মহাকাশযানে টেলিভিশনের অনুরূপ একটি যন্ত্র আছে। এই যন্ত্র সূর্যের ছবি পাঠাবে পৃথিবীতে। একটি তীক্ষ্ণ অনুভূতিশীল ব্যারোমিটার সৌরবিস্ফোরণের তথ্যাদি পাঠাবে।

মঙ্গলগ্রহে কি জীবন আছে?

নকল মঙ্গলগ্রহের পরিবেশ সৃষ্টিকারী একটি ইউনিট সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের অ্যাকাডেমির মাইক্রোবায়োলোজিক্যাল ইনষ্টিটিউটে তৈরি করা হয়েছে। এখানকার একটি স্বচ্ছ দেয়ালের আড়ালে একটি প্রকোষ্ঠে মঙ্গলগ্রহের নকল পরিবেশ সৃষ্টি করা হয়; যেমন—সৌরবিজ্ঞানের তথ্যাদি অনুসারে কৃত্রিমভাবে সৃষ্টি করা হয় মঙ্গলগ্রহের জলবায়ু, গ্রহপৃষ্ঠে সংঘটিত দৈনন্দিন বৈচিত্র্য, তাপমাত্রার চাপ, আর্দ্রতা, আবহাওয়ার বাষ্পীয় গঠন, অতিবেগুনী বিকিরণ ও মঙ্গলগ্রহের অন্যান্য বৈশিষ্ট্য।

রহস্যাবৃত লোহিত গ্রহটিতে যদি জীবনের অস্তিত্ব থেকে থাকে, তাহলে জৈব পদার্থও থাকবে। জৈব পদার্থের অস্তিত্বের সঙ্গে অপরিহার্যভাবেই নানা রকম ক্ষুদ্র জীব মানিয়ে নিতে পারে কিনা, প্রথমতঃ তা নিরূপণ করবার জন্যে এবং যদি পারে তাহলে এরূপ মানিয়ে নেবার অনুকূল কারণসমূহ খুঁজে বের করবার জন্যে নকল মঙ্গলগ্রহের পরিবেশে পরীক্ষা সুরু হয়েছে।

আগেকার পরীক্ষা-নিরীক্ষায় ক্ষুদ্র জীবসমূহের উপর উচ্চ ও নিম্ন তাপমাত্রা এবং অতিবেগুনী বিকিরণের ফলাফল কি হয়, তা দেখা হতো। বহু ব্যাক্টিরিয়া এর প্রভাব প্রতিরোধ করতে পারে। কিন্তু এর আগে পর্যন্ত ক্ষুদ্র জীবগুলিকে একবার একটি উপাদান প্রতিরোধ করা সম্পর্কে পরীক্ষা করা হতো। কিন্তু আলোচ্য প্রকোষ্ঠে যে সব ক্ষুদ্র জীব নিয়ে পরীক্ষা করা হচ্ছে, সেগুলির উপর বিভিন্ন উপাদানের মিলনের যুগপৎ প্রতিক্রিয়া দেখা হচ্ছে।

এমন কি, প্রাথমিক পর্যবেক্ষণে উল্লেখযোগ্য ফলাফলও পাওয়া গেছে। দেখা গেছে, রঞ্জিত ব্যাক্টিরিয়া অরঞ্জিত ব্যাক্টিরিয়ার চেয়ে মঙ্গলগ্রহের পরিবেশ অধিকতর প্রতিরোধ করতে পারে। রঞ্জিতকরণের ফলে ব্যাক্টিরিয়া অতিবেগুনী বিকিরণের মারাত্মক প্রতিক্রিয়া থেকে রক্ষা পায়। এই প্রসঙ্গে এরূপ অনুমান করা অযৌক্তিক নয় যে, মঙ্গলপৃষ্ঠে দৃষ্ট রং বদলের কারণ হয়তো কোন না কোন ভাবে ক্ষুদ্র জীবের ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে যুক্ত।

ভেঙ্গে ভেঙ্গে জাহাজকে বন্দরে ভিড়ানো

জাহাজ সম্পর্কে সর্বাধুনিক কল্পনা হলো—মাল ওঠানো বা নামানোর সুবিধার জন্যে তাকে বিশেষ বিশেষ অংশে বিচ্ছিন্ন করে ফেলা।

এই নতুন ধরণের জাহাজকে দেখতে হবে অনেকটা তৈলবাহী জাহাজের মত; অর্থাৎ ইঞ্জিন, নাবিকের ঘর ইত্যাদি থাকবে পিছনের দিকে। জাহাজটি হবে মোট চার-পাঁচ অংশে বিভক্ত এবং প্রত্যেকটি অংশই আলাদাভাবে ভেসে থাকতে পারবে।

জাহাজটি যখন বন্দরে প্রবেশ করবে, মালবাহী অংশগুলিকে তখন বিচ্ছিন্ন করে টেনে নিয়ে যাওয়া হবে মাল খালাস করবার জন্যে। যে সব অংশের মাল ইতিপূর্বেই খালাস হয়ে গেছে, সেগুলিকে টেনে জাহাজের ইঞ্জিনের অংশের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হবে। এর ফলে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই জাহাজ অন্য গন্তব্য-স্থলের উদ্দেশ্যে পাড়ি দিতে পারবে।

এই জাহাজের পরিকল্পনা করেছেন একটি বৃটিশ মেরিন ইঞ্জিনীয়ারিং ফার্ম। এটি বর্তমানে বৃটিশ সরকার কর্তৃক গঠিত ন্যাশন্যাল রিসার্চ ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশনের বিবেচনাধীন রয়েছে। এই কর্পোরেশন নতুন পরিকল্পনা ও আবিষ্কারে সাহায্য করে থাকেন।

একটি বৃটিশ জাহাজ নির্মাতা কার্মের আর একটি পরিকল্পনা হলো—সমুদ্রে ষ্টেশন নির্মাণের ব্যবস্থা করা।

সমুদ্রের উপর বিমানপথ ধরে এই ষ্টেশনগুলি নির্মিত হবে। এই ষ্টেশনগুলি থেকে বিমানকে আবহাওয়া সংক্রান্ত খবর ও নির্দেশ দেওয়া হবে এবং বিপদের সময় উদ্ধারকার্যও পরিচালনা করা যাবে।

প্রত্যেকটি ষ্টেশনে হবে বড় বড় গোলাকার ষ্টীলের প্ল্যাটফরম—অনেকটা তৈল ও গ্যাসের সন্ধানে নর্থ-সীতে ব্যবহৃত জল-ষ্টেশনগুলির মত।

বৃটেনের সিপ ইয়ার্ডে এরকম সাতটি জল-ষ্টেশনে নির্মিত হচ্ছে। সী-কোয়েষ্ট নামক ষ্টেশনটি বৃহত্তম। এর তিনটি পায়ার প্রত্যেকটির দৈর্ঘ্য ১৪১ ফুট। এগুলি হয় সমুদ্রের তলদেশকে স্পর্শ করে, নয় তো কূপ-খনন বীটটিকে স্থির রাখতে সাহায্য করে।

এই তিনটি পায়ার উপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে ফুটবল মাঠের চেয়ে বড় ত্রিকোণাকার একটি ডেক। ওই ডেকের উপরই কূপ-খনন যন্ত্রটি বসানো থাকে। এর উপরে রয়েছে ৫০ জন কর্মীর জন্যে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত বাসস্থান এবং একটি হেলিকপ্‌টার নামবার প্ল্যাটফরম।

প্রোটিন

কল্যাণকুমার চক্রবর্তী

দেহবর্ধক, পুষ্টিকারক ও ক্ষতিপূরক খাদ্যরূপে প্রোটিনের অবদান সুবিদিত। প্রোটিন মানবদেহের প্রায় ১৫ শতাংশই অধিকার করে আছে। উদ্ভিদ নানারকম অজৈব পদার্থ থেকে প্রোটিন প্রস্তুত করে। এই প্রোটিন কঠিন বস্তু অথবা উদ্ভিদ-কোষে দ্রবীভূত অবস্থায় থাকতে পারে। উদ্ভিজ্জ প্রোটিনের অ্যামিনো অ্যাসিডের অংশ প্রাণীদেহে সৃষ্টি করে প্রাণীজ প্রোটিন। মানুষের পক্ষে অন্যান্য প্রাণীদের মত উদ্ভিজ্জ প্রোটিন সম্পূর্ণরূপে হজম করা সহজ বা সম্ভব নয়। খাদ্যের আর্দ্র-বিশ্লেষণের ফলে অ্যামিনো অ্যাসিড, হর্মোন বা উত্তেজক রস (যথা—ACTH—Adrenocorticotropic hormone, Insulin ইত্যাদি) ও পিত্তলবণে পরিণত হয়। [অ্যামিনো-অ্যাসিড=গ্লাইসিন, লিউসিন, হিস্টিডিন, এরূপ প্রায় ২৫টি যৌগ]। কোন কোনটি আবার যকৃৎ ও বৃক্কে ডিঅ্যামিনেশন ঘটায় এবং এইভাবে উদ্ভূত অ্যামোনিয়া প্রস্তুত করে ইউরিয়া এবং অ্যামিনো অ্যাসিডের অবশিষ্টাংশ তৈরি করে গ্লুকোজ কিংবা ফ্যাট অ্যাসিড অথবা জারিত হয়ে কার্বন ডাইঅক্সাইড ও জল উৎপন্ন করে। একজন বয়স্ক ব্যক্তির দৈনিক যে ৩০০০ ক্যালরি তাপের প্রয়োজন হয়, তন্মধ্যে প্রোটিনের দান খুব সামান্যই। নতুন কোষ-সংস্থানের বৃদ্ধি ও ক্ষয়ক্ষতির পরিপূরণ করাই হলো এর প্রধান কাজ। প্রতি গ্রাম প্রোটিনে উৎপন্ন হয় ৪.৪০ কিলোক্যালরি তাপ।

আমাদের সাধারণ খাদ্যদ্রব্যের মধ্যে প্রোটিনের শতাংশ নিয়ে দেওয়া হলো-

উদ্ভিজ্জ প্রোটিন

উৎস	প্রোটিনের শতাংশ
চাল	৮
গম	১৪
ভুট্টা	১০
রাই	১১
ওট্ বা যই	১০
মটর	২১
চীনা বাদাম	২৯
পাউরুটি	৬.৫
কাঁচা আলু	২
শুক্‌নো আলু	৬
কলা	১.৫
মুসুর ডাল	২৫.১
মুগ ডাল	২৪.০
অড়হর ডাল	২২.৩
ছোলার ডাল	১৭.১

প্রাণীজ প্রোটিন

উৎস	প্রোটিনের শতাংশ
মাতৃদুগ্ধ	১.৩
ছাগদুগ্ধ	৪.৫
মহিষ-দুগ্ধ	৪.৫

প্রাণীজ প্রোটিন

উৎস		প্রোটিনের শতাংশ
গোদুগ্ধ		৩.৬
মাখন		০.৭৫
পণির		৩৩
মাছ		২১
মুরগীর মাংস (রন্ধন করা)		২৪
গোমাংস (রন্ধন করা)		২৬
হাঁসের ডিম	সাদা অংশ	১১.১
	কুসুম	১৬.৮
মুরগীর ডিম	সাদা অংশ	১২.২
	কুসুম	১৫.৭
মাছ—		
কই		২৩.৩
মাগুর		১৯.৫
শিঙ্গী		২৪.৫৬
ট্যাংরা		১৭.৩
মৃগেল		১৮.৭
রুই		১৭.৩
কাৎলা		১৮.২৫
ইলিশ		২০.৫

গ্রীক শব্দ প্রোটিয়োস (Proteios=প্রাথমিক) থেকে প্রোটিন কথাটির উদ্ভব। এটি কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, নাইট্রোজেনের সমন্বয়ে গঠিত একটি জটিল যৌগিক পদার্থ। কোনটিতে আবার ফস্‌ফরাস, লোহা, তামা বা আয়োডিনও আছে। মোটামুটিভাবে প্রোটিনে বিভিন্ন মৌলিক পদার্থের পরিমাণ এইরূপ—

C=৫০.৫৫%, H=৬.৫–৭.৩%, O=১৯.২৪%, N=১৫.১৯%, S=০.৩–২.৪%।

প্রোটিনের আণবিক ওজন অনেক বেশী—কোন কোনটির প্রায় ২০,০০০,০০০ ও হতে পারে। এটি নির্ধারণের পুরনো পদ্ধতি হলো এর শতাংশিক গঠন এবং কোনও মৌলের শতাংশ থেকে এর ক্ষুদ্রতম আণবিক ওজন নির্ণয় করা। হিমোগ্লোবিনে ০.৩৩৫% লোহা বর্তমান, আবার যেহেতু একটি হিমোগ্লোবিন অণুতে এক পরমাণুর চেয়ে কম লোহা থাকা সম্ভব নয়, সুতরাং আণবিক ওজন কমপক্ষে ১৬,৭০০।

লোহার পারমাণবিক ওজন=৫৬=প্রোটিনের আণবিক ওজনের ০.৩৩৫%

$$\text{অতএব, } \frac{৫৬}{\text{আণবিক ওজন}} = \frac{০.৩৩৫}{১০০};$$

$$\therefore \text{আণবিক ওজন} = ১৬,৭০০।$$

এভাবে দুটি বা তিনটি পরমাণু থাকলে তদনুযায়ী যথাক্রমে ৩৩,৪০০ (=১৬,৭০০×২) ও ৫০,১০০ হবে।

আলট্রাসেন্ট্রিফিউজ-এর (Ultracentrifuge) ব্যবহার, অসমোটিক চাপ ও ডিফিউশনের গতির পরিমাপ করেও আণবিক ওজন নির্ণয় করা সম্ভব। কয়েকটি প্রোটিনের আণবিক ওজন নিম্নরূপ—

প্রোটিনের নাম	আণবিক ওজন
ডিমের অ্যালবুমিন	৪০,০০০—৪৫,০০০
সিরাম (ঘোড়ার অ্যালবুমিন)	৬৮,০০০—৭৩,০০০
হিমোগ্লোবিন	৬৩,০০০—৬৮,০০০
ল্যাক্টোগ্লোবিউলিন	৩৮,০০০—৪১,০০০
গ্লিয়াডিন	৪২,০০০—৪৪,০০০

আর্দ্র-বিশ্লেষণের ফলে প্রোটিনের প্রকাণ্ড অণু ক্রমেই নিম্ন থেকে নিম্নতর আণবিক ওজনের বিভিন্ন যৌগে পরিণত হয়।

প্রোটিন → মেটা-প্রোটিন → প্রোটিওস → পেপটোন → পলিপেপ্‌টাইড

অ্যামিনো অ্যাসিড (প্রধানতঃ) ↓

কার্বোহাইড্রেট ← সহজতর পেপ্‌টাইড

পিউরিন ও পিরিমিডিন

এই সব পরীক্ষা থেকে মন্তব্য করা হয়েছে যে, প্রোটিন হলো পেপ্‌টাইড লিঙ্কের দ্বারা যুক্ত কতকগুলি অ্যামিনো অ্যাসিডের শৃঙ্খল। বিভিন্ন ক্ষেত্রে এই অ্যামিনো অ্যাসিডগুলিও বিভিন্ন; যেমন—রক্তের হিমোগ্লোবিনে ১১ শতাংশ হিষ্টিডিন আছে। সিল্ক ফাইব্রয়েনে আছে গ্লাইসিন (৫০%), অ্যালানিন (২৫%), টাইরোসিন (৬.৬%) এবং কম পরিমাণের অন্যান্য অ্যাসিড। অগ্ন্যাশয়-নিঃসৃত ইনসুলিনে আটটি অ্যামিনো অ্যাসিড বর্তমান; যথা—৩০% লিউসিন, ২১% গ্লুটামিক অ্যাসিড, ১২% সিষ্টাইন, ১২% টাইওসিন, ৮% হিষ্টিডিন—ইত্যাদি।

ডিমের শুভ্রাংশ জলে ফুটালে যে ঘোলাটে ভাব দেখা যায় বা দুধ থেকে যে ছানা কাটে, তাই উক্ত খাদ্যে প্রোটিনের অস্তিত্ব প্রমাণ করে। আর একটি সনাক্তকরণ হলো এই যে, আমাদের হাতে ঘন নাইট্রিক অ্যাসিড পড়লে, হাতের চামড়া তৎক্ষণাৎ হলদে হয়ে যায় এবং কোনও ক্ষার বা ক্ষারজাতীয় বস্তুর (যেমন, সাবান) সংস্পর্শে এলে তা কমলা রঙে পরিবর্তিত হয়।

কোনও প্রোটিন স্ফটিকাকার (যেমন—ইনসুলিন, ডিমের অ্যালবুমিন ইত্যাদি), আবার কোনটি আঁশালো (যথা—সিল্ক, চুল প্রভৃতি)। কিন্তু যে সব প্রোটিন আঁশালো নয়, সেগুলি আঁশরূপে পাওয়া যায়। প্রোটিন থেকে আর্ডিল নামক আঁশ তৈরি করা হয়। বৃটেনে আই. সি. আই. কোম্পানী মটরবাদামের প্রোটিন থেকে ভিকারা জাতীয় আঁশ প্রস্তুত করে থাকে। এছাড়া অন্যত্র প্রস্তুত করা হয় সয়াবিন ও দুধ থেকে বিবিধ প্রোটিন ফাইবার। ইটালীতে ল্যানিট্যাল নামে যে কৃত্রিম পশম আবিষ্কৃত হয়েছে, তা মূলতঃ কেজিন—কষ্টিক সোডাতে কেজিন এবং কার্বন ডাইসালফাইডের দ্রবণ সূক্ষ্ম ছিদ্রের মধ্য দিয়ে সালফিউরিক অ্যাসিডের পাত্রে ঠেলে দেওয়া হয় এবং ফরম্যালডিহাইডের সঙ্গে ব্যবহার করে কঠিন বস্তুতে পরিণত করা হয়।

ফরম্যালডিহাইডের সঙ্গে দুধের কেজিনের বিক্রিয়া ব্যবহৃত হয় প্লাষ্টিকের বোতাম, কাগজের সাইজিং (Sizing) করতে ও কেজিন প্রস্তুতিতে। প্লাজ্‌মা-প্রোটিনের জলীয় দ্রবণ (রক্ত থেকে কেন্দ্রাপসারণী বলের সাহায্যে রক্তকোষ দূরীভূত করে) বৃহত্তর অস্ত্রোপচার কিংবা সাংঘাতিক আঘাতের সময় অত্যধিক পরিমাণে ব্যবহৃত হয়।

খাদ্যশস্যের অঙ্কুর, খই, ভাতের আঠালো পদার্থ ইত্যাদির মধ্যেকার প্রোটিনের সঙ্গে ঘন কস্টিক সোডার বিক্রিয়ায় যে অ্যামিনো অ্যাসিডের 'সাবান' প্রস্তুত হয়, তা নোনাজলে সামুদ্রিক সাবান অপেক্ষা অধিকতর পরিষ্কারক ও নির্গন্ধ বলে সামুদ্রিক সাবানের প্রতিস্থাপনযোগ্য।

প্রোটিনের মধ্যে যে পেপটাইড অণু বা সংযোজক রয়েছে, তাকে জৈবসংশ্লেষিত করা (Biosynthesis) সম্ভব হলেও প্রোটিনকে সোজা-সুজিভাবে করা সম্ভব হয় নি। কিন্তু প্রাকৃতিক উৎস থেকে প্রোটিনের নিষ্কাশন আজকাল সম্ভব হচ্ছে।

খ্যাতনামা ইংরেজ জৈবরসায়নবিদ্ ডক্টর এন. ডাব্লিউ. পিরী গাছের পাতা থেকে প্রোটিন নিষ্কাশন ও প্রস্তুতিকরণে সক্ষম হয়েছেন। অনেকগুলি বিশেষ প্রোটিনের সমবায়ে গঠিত পাতার এই প্রোটিন, প্রাণীজ প্রোটিনের (ডিম ও দুধ ছাড়া) সমতুল্য। রাসায়নিক বিশ্লেষণ এবং শূকর, ইঁদুর, মুরগী ও শিশুর খাদ্যে প্রয়োগ করবার ফলে একথা প্রমাণিত হয়েছে। নিষ্কাশনাদির পর এই প্রোটিনের একটি ঘন সবুজ রং হয়। এর গন্ধ চা অথবা স্পিনাকের (Spinach) ন্যায়। বৃক্ষপত্র গবাদি-পশুর খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হলে তাদের মাংস যদি মানুষের আহার্য হিসাবে গৃহীত হয়, তাহলে মূল প্রোটিনের মাত্র এক-দশমাংশ পায় মানুষ। সুতরাং পাতা থেকে নিষ্কাশিত প্রোটিন মানুষের খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হওয়া উচিত এবং নিষ্কাশনের পর পাতার ছিব্‌ড়াতে যে প্রোটিনাংশ থাকে, তা গবাদিপশুর খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হতে পারে।

এছাড়া জাপানে অ্যালজি (Algae) নামক প্রোটিনবহুল একপ্রকার সামুদ্রিক শ্যাওলা বিভিন্ন খাদ্য প্রস্তুতে ব্যবহৃত হয়। এজন্যে সেখানে প্রতি বছর ৩৪০,০০০ টন অ্যালজির প্রয়োজন হয়। আসামের জোড়হাটে অ্যালজি জন্মাবার পদ্ধতি সম্বন্ধে পরীক্ষা চলছে।

প্রোটিনের আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎসের সন্ধান মিলেছে। সেটি হলো পেট্রোলিয়াম। বিভিন্ন দেশে এসম্বন্ধে গবেষণা হচ্ছে। ফ্রান্সে কেরোসিন ও লুব্রিকেটিং অয়েলের মাঝামাঝি একটি গ্যাস অয়েল ব্যবহার করা হয়। এর পদ্ধতি অনুকরণে আমাদের দেশে জোড়হাটে এই বিষয়ে কাজ চালানো হচ্ছে; আর অন্যদিকে চলছে কাঁচা পেট্রোলিয়ামের ব্যবহার সম্বন্ধে পরীক্ষা। এক ফরাসী গণনানুযায়ী পৃথিবীর মোট প্রাণীজ প্রোটিনের বাৎসরিক উৎপাদন যে ২০০ লক্ষ টন, তা প্রায় ৪০০ লক্ষ টন পেট্রোলিয়াম থেকে প্রস্তুত হতে পারে।

অষ্ট্রেলিয়ার সিডনীর নিকটবর্তী কোনও এক পশু-গবেষণাগারের বৈজ্ঞানিক পি. জে. রীজ ও স্বর্গতঃ পি. জে, শিঙ্কেল বলেছেন যে, খুব অল্প পরিমাণে কোন প্রোটিন, আর সিষ্টাইন সালফার জাতীয় সালফারবিশিষ্ট অ্যামিনো অ্যাসিড ভেড়ার অ্যাবোম্যাজাম (Abomasum) নামক চতুর্থ পাকস্থলীতে সোজাসুজিভাবে প্রবেশ করালে পশমোৎপাদন বেড়ে গিয়ে প্রায় শতকরা দু'শ ভাগ পর্যন্ত হতে পারে। পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, কোন দৈনিক আহার্যপ্রাপ্ত ভেড়া যেখানে বছরে ৬½ পাউণ্ড পশম উৎপাদন করতে সক্ষম, সেখানে উপরিউক্ত পদ্ধতি অবলম্বনে বাৎসরিক উৎপাদন ১৫ থেকে ২০ পাউণ্ডে দাঁড়ায়।

শিক্ষা প্রসঙ্গ

মার্কিন বিদ্যালয়ে বিজ্ঞান শিক্ষা পদ্ধতি

কোনও কেন্দ্রীয় সংস্থার হাতে বেশী ক্ষমতা অর্পণ করা মার্কিন ঐতিহ্যের বিরোধী। মার্কিন শিক্ষা ব্যবস্থার বেলায়ও একথা সত্য। যদিও ১৬ বছর বয়স অবধি প্রত্যেক মার্কিন ছেলে-মেয়েকে বাধ্যতামূলকভাবে বিদ্যালয়ে যেতে হয়, কিন্তু সেই বিদ্যালয়ে তারা কি শিখবে এবং কিভাবে শিখবে, তা সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের উপর। সেই কর্তৃপক্ষের উপর জেলা বা নাগরিক (Municipal) সরকারের কিছু প্রভাব থাকলেও রাজ্যের বা কেন্দ্রীয় সরকারের প্রভাব অল্প ও নিতান্তই পরোক্ষ।

বর্তমান অর্থনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতে সব শিক্ষা পরিষদকেই কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে অর্থসাহায্য চাইতে হয়। কেন্দ্রীয় সরকারে শিক্ষাবিদ যাঁরা আছেন, তাঁদের মন রাখতে না পারলে অর্থ-সাহায্য পাওয়া কঠিন। এই কারণে স্থানীয় শিক্ষা সংস্থাগুলি নিজেদের শিক্ষা পদ্ধতিকে একটা বিশিষ্ট মানের মধ্যে রাখবার চেষ্টা করে। এছাড়া কোনও প্রত্যক্ষ প্রভাব কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের নেই।

এই কারণে মার্কিন শিক্ষা পদ্ধতি সম্বন্ধে কিছু বলা কঠিন। এইটুকু শুধু বলা চলে যে, যে সব স্থানীয় শিক্ষা-কর্তৃপক্ষগুলির (School Board) দৃষ্টিভঙ্গী উন্নত, তাঁরা কি ধরণের শিক্ষা ব্যবস্থা করছেন।

গত ৮।৯ বছরে মার্কিন উচ্চ বিদ্যালয়ে বিজ্ঞান-শিক্ষার মান অনেক উন্নতি লাভ করেছে। এর কারণ দুটি। এক, রুশ বৈজ্ঞানিকেরা মার্কিন বৈজ্ঞানিক-দের আগে নকল-চাঁদ বা স্পুটনিক তৈরি করবার ফলে আমেরিকায় একটা ধুয়া ওঠে যে, হয়তো মার্কিন বিজ্ঞানের মান, রুশ বিজ্ঞানের চেয়ে নিকৃষ্ট। কথাটা খুব সত্য ছিল না। সত্য ছিল এই যে, নকল-চাঁদ বানাতে যে ধরণের যন্ত্রবিদ্যা লাগে, তার খাতে গবেষণার জন্যে মার্কিন সরকার সে সময় পর্যন্ত অর্থব্যয় করেন নি।

আর একটা সত্য কথা ছিল এই যে, যে ধরণের বিদ্যা নকল চাঁদ তৈরি করায় লাগে, সে বিদ্যায় পারদর্শী বৈজ্ঞানিকের সংখ্যা দেশে কম ছিল। কারণ, সে ধরণের বিদ্যার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে কোনও জাতীয় সচেতনতা ছিল না। রুশ বৈজ্ঞানিকেরা নকল-চাঁদ তৈরি করায় এই সচে-তনতা বেড়ে উঠলো।

এই সচেতনতা বৃদ্ধির আর একটা কারণ ছিল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় বহু বৈজ্ঞানিক যুদ্ধের ব্যাপারে লিপ্ত হয়েছিলেন। এর ফলে রেডার, পারমাণবিক বোমা, গাইডেড মিসাইল ইত্যাদির আবিষ্কার ও যুদ্ধে জয়-পরাজয়ের উপর সেই সকল আবিষ্কারের প্রচণ্ড প্রভাবের কথা জনসাধারণের জানা ছিল। ফলে সমাজে, বৈজ্ঞানিকদের অবদান সম্বন্ধে একটা শ্রদ্ধার ভাব গড়ে উঠেছিল

এই সব কারণে ১৯৫৮ সাল থেকে বিজ্ঞানের ব্যাপারে দেশে একটা প্রচণ্ড উৎসাহ আসে। এছাড়া সরকার নকল-চাঁদ, আন্তর্গ্রহ যান ও

ব্যালিষ্টিক যান তৈরির কাজে অর্থব্যয় সুরু করবার সঙ্গে সঙ্গে পদার্থবিদ্যা ও নানা যন্ত্রবিদ্যায় পারদর্শী বৈজ্ঞানিকের চাহিদা খুব বেড়ে যায়। বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে প্রবেশের জন্যে বহু উচ্চ বিদ্যালয়ের পাশ করা ছাত্র আবেদন করতে থাকে। তখন দেখা যায়, দেশের বহু উচ্চ বিদ্যালয়ে বিজ্ঞান-শিক্ষার যা মান, তাতে ছাত্রেরা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্যে ঠিকভাবে তৈরি হচ্ছে না। ফলে উচ্চ বিদ্যালয়ের বিজ্ঞান-শিক্ষার মান উন্নয়নের জন্যে একটা সাড়া পড়ে যায়।

স্থানীয় শিক্ষা সংস্থাগুলির পক্ষে এধরণের মান উন্নয়ন সম্ভব ছিল না। তাঁরা বাধ্য হয়ে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের কাছে সাহায্য চান। বিশ্ববিদ্যালয় ও উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের নিয়ে কতকগুলি সমিতির সৃষ্টি হয়, এই উন্নয়নের সাহায্যের জন্যে। এর ফলে যে সব নতুন শিক্ষা মানের সৃষ্টি হয়েছে, দেশের বহু প্রগতিশীল স্থানীয় শিক্ষা সংস্থা সেই মান অনুসারে পড়াবার ব্যবস্থা করেছেন। এর ফলে দেশের বহু শিক্ষা সংস্থা কতকগুলি কেন্দ্রীয় সমিতির প্রভাবে এসেছে। এই প্রবন্ধে কেন্দ্রীভূত শিক্ষা ব্যবস্থার কথাও আলোচনা করবো।

উপরে যে সব নতুন সমিতিগুলির কথা বলা হয়েছে, এদেশের পুস্তক প্রকাশকেরাও এঁদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন ও এঁদের নতুন শিক্ষা পদ্ধতিতে পাঠ্যপুস্তক লিখতে অনুরোধ করেন। বিদ্যালয়গুলিতে এই নতুন পাঠ্যপুস্তক থেকে পড়ানো হচ্ছে। প্রতি বছরের শেষে এই বইগুলির পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করা হয়।

এই নতুন শিক্ষা-পদ্ধতির সম্বন্ধে কিছু বলবার আগে এখানকার বিদ্যালয়গুলির গঠন সম্বন্ধে একটু বলা দরকার। এখানকার ৫ থেকে ১১ বছরের ছেলেমেয়েরা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যায়। এর পরের দু-বছর তারা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পড়ে ও শেষ চার বছর উচ্চ বিদ্যালয়ে যায়। এই প্রবন্ধে প্রধানতঃ উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষার কথা বলা হবে। বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় জোর দেওয়া সুরু হয় প্রধানতঃ উচ্চ বিদ্যালয়ে। স্বভাবতঃ গণিত শিক্ষায় প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলি থেকেই জোর পড়তে থাকে।

উচ্চ বিদ্যালয়ে, বিজ্ঞান শিক্ষার ব্যাপারে যে গবেষণা হচ্ছে, তাদের মধ্যে প্রধানগুলির নাম হলো, পদার্থবিদ্যায় পি. এস. সি. এস. বা Physical Sciences Curriculum Study। রসায়ন কেমষ্টাডি (Chem. Study) এবং জীববিদ্যায় বি. এস. সি. এস. (Biological Sciences Curriculum Study)। এছাড়া ভূ-বিদ্যা (Geology) শিক্ষা ব্যবস্থার পরিবর্তন হয় আধুনিক ভূ-বিজ্ঞান (Modern Earth Science) নাম দিয়ে। আধুনিক ভূ-বিজ্ঞানে, ভূবিদ্যা, ভূগোল, জ্যোতির্বিজ্ঞান, মহাকাশবিদ্যা ও পৃথিবীর জন্ম ইতিহাস সম্বন্ধে পড়ানো হয়।

এই প্রবন্ধে প্রধানতঃ জীববিদ্যার কথা বলা হবে। বি. এস. সি. এস পদ্ধতির স্রষ্টা সমিতির নাম হলো American Institute of Biological Sciences বা A. I. B. S.। এরা প্রধানতঃ মাধ্যমিক ও উচ্চ বিদ্যালয়ের পাঠ্য-তালিকা ও শিক্ষা পদ্ধতি নিয়ে গবেষণা করেন। অবশ্য আগেই বলা হয়েছে যে, এই নতুন পদ্ধতির প্রভাব প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির উপরও পড়েছে।

এ. আই. বি. এস-এর প্রধান কার্যালয় কলোরাডো বিশ্ববিদ্যালয়ে। জাতীয় বিজ্ঞান সংস্থা (National Science Foundation) এদের প্রচুর অর্থ সাহায্য করে।

পুরাতন শিক্ষা পদ্ধতিতে ছাত্রেরা প্রধানতঃ কতকগুলি আবিষ্কৃত সত্যের কথা পড়তো এবং জীববিদ্যার চর্চায় যে সব ধারণা থাকা প্রয়োজন, সেগুলি পাখী পড়ার মত শেখানো হতো এবং জীববিদ্যার প্রধান আবিষ্কৃত নিয়মগুলির (Principles) উপর জোর দেওয়া হতো। এতে ছাত্রেরা

বিজ্ঞান শিখতো, কিন্তু বৈজ্ঞানিক হতো না। নতুন পদ্ধতিতে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর বিবর্তনের ইতিহাস এরা শেখে এবং পরীক্ষার মাধ্যমে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার কি ভাবে হয়, সেটা বোঝে। এই পদ্ধতিতে উপপাদ্য (Hypothesis) তৈরি করা, পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষার দ্বারা তার সত্যতা নির্ধারণ করা—এসব বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হয়।

পাঠ্যপুস্তক ও লেবরেটরীর সাহায্য ছাড়া আরও অন্যান্য বহু জিনিষের সাহায্যে জীববিদ্যা পড়ানো হয়। ঐ জিনিষগুলির মধ্যে ওভারহেড প্রোজেক্টর, ফিল্ম, লেবরেটরী, ব্লক, চার্ট, মডেল ইত্যাদি বিশেষভাবে ব্যবহার করা হয়।

ওভারহেড প্রোজেক্টর ব্যবহার করবার মস্তবড় সুবিধা এই যে, শিক্ষক ছাত্রদের সামনে দাঁড়িয়েই ছবি বা কোন লেখা পিছনের দেয়ালে বা পর্দার উপর প্রক্ষেপ করতে পারেন। এর জন্যে শিক্ষককে পিছনে ফিরতে হয় না। বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ের উপর স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের উপযুক্ত নানা ধরণের ফিল্ম তৈরি করা হয়েছে।

লেবরেটরী ব্লক মানে, জীববিদ্যার কোন কোন বিশেষ বিষয়ের উপর কতকগুলি বই খুব বিস্তারিতভাবে লেখা। এই বইগুলি বহু ইউনিভার্সিটির বিশিষ্ট অধ্যাপকের দ্বারা লিখিত।

উচ্চ বিদ্যালয়ে বিজ্ঞানের কারিকুলাম বদ্‌লাবার সঙ্গে সঙ্গে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের বিজ্ঞানের সিলেবাস বদ্‌লানো হয়। ১-৬ শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্রছাত্রীদের সহজ পরীক্ষার ভিতর দিয়ে বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া হয়। সাধারণতঃ বিজ্ঞানের কোনও পাঠ্যপুস্তক প্রথম ৬ শ্রেণীতে ধার্য করা হয় না। ছাত্রদের বিজ্ঞানের প্রতি কৌতূহল জাগানোই প্রধান উদ্দেশ্য। প্রতিটি শ্রেণীতে শিক্ষক বেশীর ভাগ সময়েই Group project করেন। তাতে প্রতিটি ছাত্রছাত্রী যোগদান করে।

প্রথম থেকে তৃতীয় শ্রেণীতে প্রকৃতি পর্যবেক্ষণের (Nature Study) উপর জোর দেওয়া হয়। চতুর্থ থেকে ষষ্ঠ শ্রেণীতে পদার্থবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা ও জীববিদ্যা সম্বন্ধে ছাত্রদের মোটামুটি ধারণা দেওয়া হয়। এই প্রসঙ্গে একটি উদাহরণ দেই। যেমন—ষষ্ঠ শ্রেণীতে পদার্থবিদ্যা সম্বন্ধে ছাত্রছাত্রীদের যে ধরণের শিক্ষা দেওয়া হয়, তার একটির নাম হলো Kitchen Physics।

সপ্তম থেকে নবম শ্রেণীতে ভূবিদ্যা ও সাধারণ বিজ্ঞান পড়ানো হয়। দশম শ্রেণীতে মৃত্তিকা বিজ্ঞান (Earth Science) এবং একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীতে পদার্থ, রসায়ন ও জীববিদ্যায় শিক্ষা দেওয়া হয়। মোটকথা উচ্চ বিদ্যালয় থেকে ছাত্রছাত্রীদের দশম শ্রেণী থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ভিতর বিজ্ঞানের যে কোনও দুটি শাখার শিক্ষা বাধ্যতামূলক।

নতুন পদ্ধতিতে পড়াবার ক্ষমতা বহু পুরনো শিক্ষকের না থাকায় তাদের শিক্ষার (Training) ব্যবস্থাও করা হয়। এর জন্যে শিক্ষকদের নানা ধরণের স্কলারশিপের ব্যবস্থাও আছে। গরমের ছুটিতে (৩ মাস) শিক্ষকদের বিভিন্ন ইউনিভার্সিটিতে শিক্ষা দেওয়া হয়।

এছাড়া প্রতিটি উচ্চ বিদ্যালয়েই নতুনভাবে লেবরেটরী তৈরি করা হয়েছে। এই লেবরেটরীতে ছাত্রেরা নিজেদের রিসার্চ বা এক্সপেরিমেন্ট করবার সুযোগ পায়।

প্রতিটি শিক্ষকই বিদ্যালয়ের পরিবেশ বুঝে নিজে জীববিদ্যার কারিকুলাম ঠিক করে নেন। প্রতিদিনই ৪৫ মিনিট বিজ্ঞানের ক্লাশ থাকে। এছাড়া সপ্তাহে ২ দিন লেবরেটরীর কাজ ধার্য করা থাকে। প্রতিটি লেবরেটরীর জন্যে আরও ৪৫ মিনিট সময় দেওয়া হয়। ঐ দুই দিন ছাত্রেরা ক্লাসে সবশুদ্ধ ৯০ মিনিট সময় পায়। ঐ সময়ের বেশীর ভাগই ছাত্রদের এক্সপেরিমেন্ট করতে দেওয়া হয়।

অধিকাংশ বিদ্যালয়েই ছাত্রদের সারা বছরে

২।৩টি টার্ম পেপার লিখতে দেওয়া হয়। কোন্ বিষয়ে টার্ম পেপার লেখা হবে, তা শিক্ষকের সাহায্যে ছাত্রেরা ঠিক করে। বিজ্ঞানের ভাল ভাল পত্রিকা, যেমন Scientific American বা Science ইত্যাদি থেকেও কোনও প্রবন্ধ পছন্দ করে ছাত্রেরা তার উপর টার্ম পেপার লিখতে পারে। তাছাড়াও কোনও কোনও বিদ্যালয়ে ছাত্রদের সারা বছরে একটি Original Research Problem-এর উপর কাজ করতে দেওয়া হয়। সাধারণতঃ বছরের শেষে ছাত্রেরা রিসার্চে বেশী সময় ব্যয় করে।

প্রতিটি বিদ্যালয়ের লাইব্রেরীতে ছাত্রদের জন্যে যথেষ্ট বই রাখা হয়। বিভিন্ন বই পড়ে ছাত্রেরা তাথেকেই অনেক সময় রিসার্চের ধারণা পায়। ক্লাসে শিক্ষক ও ছাত্রদের ভিতর খোলাখুলি আলোচনার ব্যবস্থাও আছে।

জীববিদ্যার উপর কোনও একটি বিষয় (Topic) ঠিক করা হয়। সেই বিষয়ে ছাত্রেরা নানা বই পড়ে তৈরি হবার পর ক্লাসে আলোচনা করে। শিক্ষক সেই আলোচনায় মডারেটরের কাজ করেন এবং ছাত্রেরা ভুল করলে শুধরে দেন।

স্থানীয় মিউজিয়ামগুলিতে মাঝে মাঝে বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিকেরা উচ্চ-বিদ্যালয়ের উপযুক্ত বক্তৃতা দেন। অধ্যাপকদেরও কখনও কখনও আমন্ত্রণ জানানো হয়, কোনও বিষয়ে বক্তৃতার জন্যে। প্রতিটি বিদ্যালয় থেকেই Field Trip-এর বন্দোবস্ত করা হয়। স্থানীয় কারখানা, হাসপাতাল, মিউজিয়াম ইত্যাদিতে ছাত্রদের মাঝে মাঝে বেড়াতে নিয়ে যাওয়া হয়।

পূর্ণিমা বন্দ্যোপাধ্যায়

খাদ্যোপযোগী নতুন সামুদ্রিক আগাছার চাষ

১৯৬৩ সালের প্রথম থেকে ফরাসী পেট্রো-লিয়াম ইনষ্টিটিউট (আই. এফ. পি.) সমুদ্রজাত নীল রঙের এক রকম সামুদ্রিক আগাছার চাষ সম্পর্কে অনুসন্ধান চালাচ্ছেন। মধ্য আফ্রিকার কোন কোন জাতের লোকেরা এই সামুদ্রিক আগাছার পুষ্টিমূল্যের কথা ভালভাবেই জানে। ১৯২৯ থেকে ১৯৬৪ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন অভিযানের বিবরণীতে প্রথমে এই আগাছাকে Arthrospira এবং পরে Spirulina নামে উল্লেখ করা হয়। যথেষ্ট আগ্রহ ও কৌতূহলের বিষয় হলেও এই সামুদ্রিক আগাছা সম্পর্কে আজ পর্যন্ত কোন বিবরণই প্রকাশিত হয় নি।

সমুদ্রজাত নীল রঙের এই সামুদ্রিক আগাছা মধ্য আফ্রিকায় প্রায় তিন একর বা তারও বেশী অঞ্চল জুড়ে লবণাক্ত জলের উপরিভাগে জলপদ্মের মত ভেসে থাকে।

প্রাচীন কাল থেকেই স্থানীয় অধিবাসীরা খাদ্য এবং বাণিজ্যিক পণ্য হিসাবে এই জলজ

আগাছাগুলিকে ব্যবহার করে আসছে। চানার (Millet) সঙ্গে একত্রে এটি আজও এই অঞ্চলের অধিবাসীদের প্রধান খাদ্য।

এই অঞ্চল থেকে সংগৃহীত নমুনার প্রাথমিক পরীক্ষায় দেখা গেছে—এই জাতীয় অন্যান্য জলজ উদ্ভিদের মধ্যে এই সায়ানোফাইসির প্রাচুর্য সর্বাধিক। এই জলাভূমির জলে প্রচুর পরিমাণে খনিজ পদার্থ মিশ্রিত আছে। খনিজ মিশ্রণের অধিকাংশই সোডিয়াম লবণ থেকে কার্বোনেট, বিশেষ করে বাইকার্বোনেট আকারে আসে। সুতরাং এই জল অতিমাত্রায় ক্ষারীয় অবস্থায় থাকে। কাজেই ফরাসী পেট্রোলিয়াম ইনষ্টিটিউটে এই বিষয়ে বিশ্লেষণমূলক পরীক্ষা আরম্ভ হয় এবং তাঁদের অনুরোধে কয়েকটি খ্যাত-নামা বিশেষজ্ঞ বৈদেশিক লেবরেটরীতেও এর গবেষণা চলে।

এই আগাছার পুষ্টিমূল্য অনস্বীকার্য। এটি একটি উৎকৃষ্ট খাদ্যরূপে পরিগণিত এবং বর্তমানে জ্ঞাত প্রোটিন-সমৃদ্ধ খাদ্যের মধ্যে এটি অন্যতম। বিশ্লেষণের ফলে জানা গেছে, এই প্রোটিনগুলির—FAO—1955 অনুযায়ী নির্দিষ্ট সমন্বয়ের একমাত্র সালফা অ্যামিনো অ্যাসিড ছাড়া, প্রয়োজনীয় সবগুলি অ্যামিনো অ্যাসিড সমান বা বেশী মাত্রায় আছে। একমাত্র সালফার অ্যামিনো অ্যাসিডের পরিমাণ সংশোধন করা দরকার। তাহলে তত্ত্বগতভাবে এই সামুদ্রিক আগাছা অ-সম প্রোটিন খাদ্যদ্রব্যে একটি চমৎকার সংযোজন হবে।

বর্তমানে এক দিকে প্রোটিনের নতুন উৎস সন্ধানের সমস্যা সুবিদিত। অপর দিকে পেট্রো-লিয়ামজাত দ্রব্যাদি দহনের ফলে অধিক পরিমাণে উৎপন্ন কার্বন ডাইঅক্সাইড (পূর্বে যা কাজে লাগানো হতো না) ফটোসিন্থেসিসের জন্যে ব্যবহার করা যেতে পারে। এই জন্যে আই. এফ. পি. এই খাদ্যোপযোগী জলজ আগাছা সম্বন্ধে গত তিন বছরেরও বেশী সময় ধরে তাত্ত্বিক ও ফলিত পর্যায়ে গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছেন।

উন্মুক্ত স্থানে এই জলজ আগাছার চাষের পদ্ধতি নিখুঁত করে তোলবার উদ্দেশ্যে বর্তমানে ফ্রান্সের দক্ষিণে বৃহৎ জলাধার নির্মিত হয়েছে এবং লেবরেটরীতে সংশ্লেষিত মাধ্যমে চাষ, পরিস্রাবণ ও ফসল সংগ্রহের বিষয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে।

বৃদ্ধির হার, ফসল সংগ্রহ এবং শুষ্ক খাদ্য হিসাবে এই সামুদ্রিক আগাছার ফলন হিসাব করা হয়েছে—বছরে প্রতি একরে ১৬-১৮ টন। আই. এফ. পি-র পক্ষে মানুষ ও প্রাণীর খাদ্য হিসাবে এর ব্যবহারের জন্যে চাষের খরচ সম্ভবতঃ খুবই কম হবে এবং সামুদ্রিক আগাছা অনুৎপাদক অঞ্চলে এই উৎকৃষ্ট উদ্ভিজ্জ পদার্থ প্রচুর পরিমাণে সরবরাহ করাও সম্ভব হবে।

ডক্টর সহায়রাম বসু সংবর্ধনা

বাংলা, তথা ভারতের বিশিষ্ট উদ্ভিদ-বিজ্ঞানী ডক্টর সহায়রাম বসুর অশীতিতম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে ৮ই এপ্রিল কলকাতার আর. জি. কর মেডিক্যাল কলেজ হলে একটি মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানে গুণমুগ্ধ সুহৃদ, ছাত্র ও অনুরাগীদের পক্ষ থেকে তাঁকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন ডক্টর বসুর পঞ্চসপ্ততিতম জন্মোৎসব উপলক্ষে

ডক্টর সহায়রাম বসু

গঠিত কমিটি এবং অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জাতীয় অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু।

ভারতে উদ্ভিদ-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ডক্টর সহায়রাম বসু একটি গৌরবোজ্জ্বল নাম। ১৮৮৮ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারী হুগলী জেলার নাগবোল গ্রামে সহায়রাম জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা বেণীমাধব বসু বাংলার প্রাদেশিক বিচার বিভাগে সরকারী চাকরি করতেন। হুগলী কলেজিয়েট স্কুল থেকে এণ্ট্রান্স পরীক্ষা পাস করে সহায়রাম কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হন। ১৯০৭ সালে তিনি 'বি' কোর্সে স্নাতক ডিগ্রী এবং ১৯০৮ সালে এম. এ. ডিগ্রী লাভ করেন। পিতার পরামর্শে তিনি আইন বিষয়ে পড়া সুরু করেন এবং ১৯১০ সালে বি. এল. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। কিন্তু তাঁর আইনবৃত্তি দীর্ঘস্থায়ী হয় নি, মাত্র ৬ বছর তিনি হাইকোর্টে ছিলেন। এই সময় তিনি সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, সার রাসবিহারী ঘোষের সংস্পর্শে আসেন। ১৯০৯ সালে বঙ্গবাসী কলেজের প্রতিষ্ঠাতা আচার্য গিরিশচন্দ্র বসু তাঁর নবগঠিত কলেজে উদ্ভিদবিদ্যায় অধ্যাপনার জন্যে সহায়রামকে আহ্বান জানান এবং ছত্রাক-বিজ্ঞানে গবেষণা করতে উপদেশ দেন। এই সময় সহায়রামের মনে দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়—আইন না উদ্ভিদবিদ্যা—কোন্‌টিকে তিনি জীবিকা হিসাবে গ্রহণ করবেন! শেষ পর্যন্ত উদ্ভিদবিদ্যায় আত্মনিয়োগ করাই স্থির করেন। ১৯১৬ সালে তিনি তৎকালীন কারমাইকেল মেডিক্যাল কলেজে (বর্তমান আর. জি. কর মেডিক্যাল কলেজ) উদ্ভিদবিদ্যার অধ্যাপক নিযুক্ত হন।

এই সময় সহায়রাম কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের জীববিদ্যার অধ্যাপক একেন্দ্রনাথ ঘোষের সান্নিধ্যে আসেন। অধ্যাপক ঘোষ তরুণ সহায়রামের সুপ্ত প্রতিভার সন্ধান পেয়ে তাঁকে বাংলাদেশ ও পার্শ্ববর্তী প্রদেশের 'পলিপোর' শ্রেণীর ছত্রাক সম্বন্ধে গবেষণায় অনুপ্রাণিত করেন। কারমাইকেল মেডিক্যাল কলেজে অধ্যাপনার কাজে যোগ দেবার কিছুকাল পরেই তিনি সেখানে গবেষণা সুরু করেন। প্রখ্যাত ছত্রাক-বিজ্ঞানী টম পেচ-এর অধীনে উদ্ভিদ শ্রেণীবদ্ধকরণ বিদ্যার বিশেষ শিক্ষা গ্রহণের জন্যে তাঁকে

সিংহলের রয়েল বোটানিক গার্ডেনে পাঠানো হয়।

সিংহল থেকে ফিরে এসে সহায়রাম ছত্রাক বিষয়ক গবেষণায় গভীরভাবে মনোনিবেশ করেন এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে থিসিস দাখিল করেন। তাঁর গুরুত্বপূর্ণ গবেষণার স্বীকৃতিতে বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে উদ্ভিদ-বিজ্ঞানে ডক্টরেট ডি গ্রীতে ভূষিত করেন।

ছত্রাক-বিজ্ঞান সম্পর্কে উচ্চতর গবেষণার জন্যে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাসবিহারী ঘোষ ভ্রমণ-বৃত্তি লাভ করে তিনি এক বছরের জন্যে ইউরোপে গমন করেন। এই সময় তিনি ইউরোপের বিশিষ্ট ছত্রাক-বিজ্ঞানীদের সান্নিধ্যে আসেন এবং বৃটিশ মিউজিয়ামের কিউ গার্ডেন ও প্যারিসের প্রাকৃতিক ইতিহাস মিউজিয়ামের হার্বেরিয়ামে কাজ করেন। ইউরোপ থেকে ফিরে এসে তিনি এক বছরকাল বসু বিজ্ঞান মন্দিরে আচার্য জগদীশচন্দ্রের সহযোগীরূপে কাজ করেন।

ছত্রাক-বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ে ডক্টর বসু ব্যাপক গবেষণা করেছেন। ভারতে জাত আহারোপযোগী ছত্রাক সম্বন্ধেও তিনি গবেষণা করেন এবং এই জাতীয় ছত্রাকের চাষ সুরু করবার জন্যে ভারতের কৃষি বিভাগকে পরামর্শ দেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় 'পেনিসিলিয়াম নোটাটাম' নামক ছত্রাক থেকে 'পেনিসিলিন' অ্যান্টিবায়োটিক আবিষ্কারের সংবাদে উৎসাহিত হয়ে ডক্টর বসু পলিপোর জাতীয় ছত্রাকের ভেষজমূল্য অনুসন্ধানে ব্যাপক গবেষণা করেন এবং 'পলিপোরিন' নামে একটি অ্যান্টিবায়োটিক আবিষ্কারে সক্ষম হন। পরবর্তী কালে 'ক্যাম্পষ্টেরিন' নামে আর একটি অ্যান্টিবায়োটিকও আবিষ্কৃত হয়। এই দুটি অ্যান্টিবায়োটিকের ভেষজগত উপযোগিতার সন্ধান পাওয়া গেছে এবং বর্তমানে তাদের কার্যকর-উপাদান পৃথকীকরণের চেষ্টা চলছে। প্রায় ৪৪ বছরব্যাপী ডক্টর বসু ছত্রাক সম্পর্কে গবেষণা করেছেন এবং ১৯৬৩ সাল পর্যন্ত ইউরোপ, আমেরিকা ও এশিয়ার বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক পত্রিকায় তাঁর ১১৭টি গবেষণা-নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে।

ছত্রাক-বিজ্ঞানে অনন্য গবেষণার জন্যে ডক্টর বসু স্বদেশ ও বিদেশের বহু সম্মানে ভূষিত হয়েছেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে তিনবার গ্রিফিথ স্মৃতি পুরস্কার, বিহার কৃষিবিভাগ তাঁকে উডহাউস স্মৃতি পুরস্কার এবং বাংলার এশিয়াটিক সোসাইটি তাঁকে ক্রস স্মৃতিপদক ও বার্কলে স্মৃতিপদক প্রদান করেন। পলিপোর সংক্রান্ত গবেষণার জন্যে লণ্ডনের রয়েল সোসাইটি তাঁকে তিন বছরকাল গবেষণাবৃত্তি দিয়েছিলেন। ১৯২৫ সালে ডক্টর বসু এডিনবরার রয়েল সোসাইটির ফেলো এবং ১৯৩০ সালে ইতালীর আন্তর্জাতিক মাইক্রো-বায়োলজি সোসাইটির সম্মানিত সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৩৭-৩৮ সালে তিনি ভারতের বোটানিক্যাল সোসাইটির সভাপতিপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি ভারতের জাতীয় বিজ্ঞান পরিষদ এবং বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের প্রতিষ্ঠাকালীন সদস্য। ছত্রাক-বিজ্ঞান সংক্রান্ত গবেষণা ও আন্তর্জাতিক সম্মেলন উপলক্ষে তিনি একাধিকবার ইউরোপ ও আমেরিকায় যান এবং বিভিন্ন গবেষণাগার পরিদর্শন করেন। ১৯৫০ সালে স্টকহোলমে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক উদ্ভিদ-বিজ্ঞান কংগ্রেসে তিনি ছত্রাক-বিজ্ঞান শাখার সহ-সভাপতি নির্বাচিত হন। ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসে উদ্ভিদ-বিজ্ঞান শাখায় তিনি সভাপতিত্ব করেছেন। ১৯৫৭ সালে ফরাসী শিক্ষা দপ্তরের আমন্ত্রণে তিনি জাতীয় বিজ্ঞান গবেষণা সংস্থায় (C. N. R S.) গবেষণা-অধ্যক্ষরূপে কাজ করেন। ১৯৬০ সালে তিনি কলকাতার স্কুল অফ ট্রপিক্যাল মেডিসিন-এ ভেষজ ছত্রাকবিদ্যার অধ্যাপকরূপে কাজ করেন। ১৯৬৩ সালে তিনি আর. জি. কর মেডিক্যাল কলেজের এমেরিটাস অধ্যাপক-

পদে বৃত হন। ১৯৬৪ সালে ভারতীয় উদ্ভিদ-নিদানতত্ত্ব সমিতি এবং বাংলার উদ্ভিদ-বিজ্ঞান সমিতি তাঁকে সম্মানিত ফেলো নির্বাচন করেন।

মানুষ হিসেবে ডক্টর বসু নিরহঙ্কার, অমায়িক ও আত্ম-উদাসীন এবং আধ্যাত্মিকতাবাদী। তাঁর সংস্পর্শে এসে সকলেই মুগ্ধ হয়েছেন। বিলম্বে হলেও এই নীরব বিজ্ঞান-সাধককে দেশবাসী সংবর্ধনা জ্ঞাপন করায় আমরা পরম আনন্দিত।

রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়

বিজ্ঞান-সংবাদ

নতুন ধরণের স্বয়ংক্রিয় আলুর খোসা ছাড়ানো যন্ত্র

ঘণ্টায় চার টনেরও বেশী আলু পরিষ্কৃত করে খোসা ছাড়াতে পারে, এমন একটি স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র উদ্ভাবন করেছেন একটি বৃটিশ কোম্পানি। ফুড প্রোসেসিং প্ল্যাণ্টের কাজে এটি ব্যবহৃত হবে। এর সাহায্যে আলু ছাড়া গাজর প্রভৃতি অন্যান্য মূল জাতীয় ফসলও ছাড়ানো যাবে।

প্রথমে আলু বা অন্য সব্জি একটি হপারে ঢালা হয়। সেখান থেকে এলিভেটারের সাহায্যে সেগুলি যায় ব্যাচিং হপারে। তার নীচে বসানো থাকে বৈদ্যুতিক প্রোব গজ। সেটি ছোট-বড় আলু বাছাই করে সেগুলিকে ষ্টীম চেম্বারে রাখবার পর আকস্মিকভাবে চেম্বারের চাপ কমিয়ে দেওয়া হয়।

ষ্টীম প্রবেশ করানো ও আলুগুলির পরস্পর ঘষড়ানির ফলে আলুর খোসাগুলি উঠে যায়। তারপর একটি পীল রিমুভ্যাল ড্রামে জলের স্রোতের সাহায্যে খোসাগুলি একেবারে তুলে ফেলা হয়।

উদ্ভাবক ফার্ম দাবী করেছেন যে, এই নতুন যন্ত্রটি এই ধরণের অন্যান্য যন্ত্রের তুলনায় মাত্র এক চতুর্থাংশ স্থান জুড়ে থাকে। এই পদ্ধতিতে অপব্যয় খুব অল্পই। প্রতি সাত পাউণ্ড সব্জীর জন্যে মাত্র এক পাউণ্ড ষ্টীমের প্রয়োজন হয়।

নতুন ফটো-প্রিন্টিং মেশিন

প্রস্থে ১২০ সেণ্টিমিটার মুদ্রণক্ষম বৃটিশ অ্যামোনিয়া প্রিণ্টিং মেশিনটি মাঝারি ধরণের ইঞ্জিনীয়ারিং, আর্কিটেক্চার্যাল ও ব্যবসায়িক কাজের পক্ষে আদর্শ যন্ত্রস্বরূপ হবে। এর ২.৮ কিলোওয়াটের ল্যাম্পটি অন্যান্য মাঝারি ধরণের ফটো-প্রিণ্টিং মেশিনের তুলনায় হবে খুবই নমনীয়।

যন্ত্রটির পরিচালন-ব্যয় বেশী নয় এবং পরিচালন করাও সহজ। এটি এয়ার মেলের কাগজ থেকে মাঝারি ও শক্ত কাগজ—এমন কি, অস্বচ্ছ কাপড় এবং অ্যালুমিনিয়ামযুক্ত প্লাষ্টিক কার্ড-এরও ফটোকপি করতে পারে। যন্ত্রটি মিনিটে ১৫ ফুট পর্যন্ত ফটো মুদ্রণ করতে সক্ষম।

অপারেটর যাতে খুব অল্প পরিশ্রমে পরিচালনা করতে পারে, সেই দিকে লক্ষ্য রেখে যন্ত্রটি নির্মিত। দ্রুত ও নিখুঁত পরিচালনার সুবিধার্থে নিয়ন্ত্রণকারী বোতামগুলি একটিমাত্র প্যানেলে সাজানো থাকে।

মনুষ্য-দেহ থেকে তথ্য সংগ্রহ

কর্মরত মানুষের দেহ থেকে তথ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে বৃটেনের মেডিক্যাল রিসার্চ কাউন্সিল একটি যন্ত্র উদ্ভাবন করেছেন।

এই যন্ত্র দেহের সঙ্গে যুক্ত করলে সেটি কর্মরত শ্রমিক, ঘরণী বা অফিসারের শরীর সংক্রান্ত তথ্য সরবরাহ করবে।

কাউন্সিলের হ্যাম্পষ্টেড (লণ্ডন) লেবরেটরীর মিঃ এইচ. এস. উল্‌ফ বলেন, এই নতুন যন্ত্র, কোন মানুষ কাজে বেরোবার পর তার কয়েক ঘণ্টার বা দু-তিন দিনের হৃৎস্পন্দন, তাপমাত্রা ইত্যাদির খবর রেকর্ড করে রাখবে, ঠিক যেমন মহাকাশচারীদের ক্ষেত্রে করা হয়ে থাকে।

এই যন্ত্রটি হলো একটি ছোট্ট ইলেকট্রো-কেমিক্যাল সেল—দুটি ইলেকট্রোডকে একটি সুক্ষ্ম তার দিয়ে জোড়া। যন্ত্রটি এত ছোট যে, এটি পরলে বাইরে দেখা যায় না। এর কোন শব্দও হয় না। বাস ড্রাইভার, কনডাক্টর, বিমানচালক, ও স্কুলের ছেলেদের নিয়ে এই যন্ত্রটির পরীক্ষা করা হয়েছে।

উদ্ভিদের স্নায়ুমণ্ডলী

উদ্ভিদের স্নায়ুমণ্ডলীর মত একটা কিছু আছে। মস্কোর তরুণ গবেষক ভিতালি গোর-চাকফ গবেষণার ফলে এই তথ্যটির কথা বলেছেন।

ব্যাপকভাবে এই বিশ্বাস প্রচলিত ছিল যে, উদ্ভিদ কখনো সংবাদাদি আদান-প্রদান করতে পারে না। পোকামাকড় ধরবার পাতাযুক্ত ডাইওনিয়া, মাছির ফাঁদযুক্ত ডিউ প্ল্যাণ্টের প্রতি-ক্রিয়াগুলি তার অদ্ভুত ব্যতিক্রম।

ভিতালি গোরচাকফ প্রমাণ করেছেন যে, এই উদ্ভিদগুলিতে তাপ ও রাসায়নিক দ্রব্যের প্রভাবের প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। এই প্রতিক্রিয়ার গতি অনেক জীবের—যেমন, শামুক ও ব্যাঙের তুলনায় দ্রুততর। তিনি বহু উদ্ভিদ নিয়ে পরীক্ষা করেছেন; যেমন—সীম, মটর ইত্যাদি।

গোরচাকফ উদ্ভিদের মধ্যে বোধশক্তির অস্তিত্ব সম্পর্কে কোন বিতর্ক উত্থাপন করেন নি, তবে তিনি মনে করেন, উদ্ভিদ যে সঙ্গীত সম্পর্কে আগ্রহহীন—একথা বলা যায় না। উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত উদ্ভিদের বৃদ্ধি দ্রুততর করে, তবে জাজ সঙ্গীত বৃদ্ধির ক্ষতি করে। উদ্ভিদকে নিয়ন্ত্রিতভাবে বাড়তে দেবার মধ্যে যে প্রতিক্রিয়া হয়, তা ধরবার জন্যে যন্ত্র ব্যবহারের সমস্যা নিয়ে গোরচাকফ এখন কাজ করছেন।

শরীরের তাপ কমিয়ে চিকিৎসা

আমেরিকার কোন এক ক্যান্সারগ্রস্ত অধ্যাপক চিকিৎসকদের অনুরোধ করেছিলেন যে, তাঁর মৃত্যুর ঠিক পূর্বে তাঁকে যেন ঠাণ্ডায় জমিয়ে ফেলা হয়, যাতে ক্যান্সারের কোন ওষুধ আবিষ্কারের পর ডাক্তাররা তাঁকে বাঁচিয়ে তুলতে পারেন। কিন্তু বিশেষজ্ঞদের আলোচনা থেকে জানা গেছে যে, সে ব্যবস্থা অচল, যেহেতু কোন উন্নত শ্রেণীর জীবকে অতিরিক্ত ঠাণ্ডার মধ্যে রাখলে বেশী দিন বাঁচিয়ে রাখা যায় না।

এবারে এই সম্বন্ধে পশ্চিম জার্মেনীতে যে সব পরীক্ষা হয়েছে, তাথেকে জানা গেছে, সাবকুলিং-এর ফলে মস্তিষ্কের কোষ নষ্ট হয়ে মানুষের মৃত্যু হয়, হৃদ্‌স্পন্দন বা শ্বাস-প্রশ্বাসের ক্রিয়া বন্ধ হবার ফলে নয়। মনুষ্যেতর জীবজন্তুর উপর হাইপো-থারমিক্স বা সাবকুলিং পরীক্ষা চালিয়ে দেখা গেছে যে, শূন্য ডিগ্রীর নীচে দেহের তাপ কমালেও পুনরুত্তপ্ত প্রক্রিয়ার সময় স্বাস্থ্যের কোন গুরুতর ক্ষতি পরিলক্ষিত হয় না বটে, কিন্তু দেহের ভৌতিক রূপান্তর ঘটে ও মস্তিষ্কের কোষ বিনষ্ট হয় এবং তার ফলে একটি নির্দিষ্ট সময়ের পর এসব জীব-জন্তুর আর জ্ঞান ফিরিয়ে আনা সম্ভব হয় না। পরীক্ষায় আরও দেখা গেছে যে, সাবকুলিং প্রক্রিয়ার সময় দেহের কোষগুলির মধ্যে বরফকুঁচি জমে এবং তার মধ্যে যে লবণ থাকে, তা দেহের টিস্যুগুলিকে অবধারিতরূপে নষ্ট করে। এই সম্বন্ধে পশ্চিম জার্মেনীতে ব্যাপক পরীক্ষা চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

কিশোর বিজ্ঞানীর দপ্তর

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

মে—১৯৬৭

২০শ বর্ষ : ৫ম সংখ্যা

বোয়িং কোম্পানী যুক্তরাষ্ট্রের জন্যে সুপারসোনিক ট্রান্সপোর্ট (S S T) নামে এরূপ অতিকায় জেট বিমান নির্মাণ করছে। ১৯৭০ সালের মধ্যেই এর উড্ডয়নের-পরীক্ষা হবে। ৩৫০ জন যাত্রীবাহী এই জেট লাইনারের সর্বোচ্চ গতিবেগ হবে ঘণ্টায় ২,৮৮০ কি. মিটার।

করে দেখ

ম্যাজিক কাচ

তোমার কোন বন্ধুকে তিন অঙ্কের যে কোন একটি সংখ্যা লিখতে বল। তবে মনে রাখতে হবে, সংখ্যাটির প্রথম ও তৃতীয় অঙ্ক দুটির মধ্যে যেন অন্ততঃ ২-এর তফাৎ থাকে। তোমার বন্ধু অবশ্য তোমাকে না দেখিয়ে যে কোন সংখ্যা লিখবে এবং তোমার নির্দেশ মত যোগ-বিয়োগ করে যে ফল পাবে, সেটা তুমি এক অদ্ভুত উপায়ে তাকে জানিয়ে দিতে পার। ধর, সে লিখলো—৩১৭। এবার তাকে সংখ্যাটা উল্টে লিখতে বল। তাহলে সংখ্যাটা হবে ৭১৩। ৭১৩ থেকে ৩১৭ বিয়োগ দিতে বল। বিয়োগ ফল হবে ৩৯৬। এই বিয়োগ ফল ৩৯৬-কে আবার

উল্টে দিতে বল। উল্টে দিয়ে পাওয়া যাবে ৬৯৩। এবার ৩৯৬ ও ৬৯৩ যোগ করতে বল। যোগফল হবে ১০৮৯। এই নিয়ম অনুসারে যে কোন সংখ্যা নিয়ে যোগ, বিয়োগ করলেই দেখবে, তার ফল হবে—১০৮৯।

এবার খেলাটার কথা বলছি। একটা গ্লাসে জল নিয়ে তাতে খানিকটা সাবান গুলে নাও। ঐ সাবান-জলে আঙুল ডুবিয়ে সেই আঙুল দিয়ে জানালার কাচের গায়ে ১০৮৯ সংখ্যাটি লিখে দাও। শুকিয়ে যাবার পর লেখার কোন চিহ্নই দেখা যাবে না।

শেষ যোগফলটা বের করবার পর তোমার বন্ধুকে সেই নির্দিষ্ট জানালাটার কাছে গিয়ে কাচের উপর জোরে ফুঁ দিতে বল। বন্ধুটি দেখে অবাক হয়ে যাবে যে, কাচখানা কুয়াশাচ্ছন্ন হয়ে গেছে, কিন্তু তার মধ্যে তারই লিখিত অঙ্কের যথাযথ উত্তর ১০৮৯ সংখ্যাটি ফুটে উঠেছে। এর কারণ আর কিছুই নয়—সাবান-জলে ডোবানো আঙ্গুল দিয়ে কাচের যে জায়গাটুকু স্পর্শ করা হয়—সেখানে কুয়াশা জমে না।

এই খেলাটা শীতকালেই ভাল দেখানো যায়। গরমের সময় ফুঁ দিলে কাচের গায়ে কুয়াশা জমবে না। তবে অবশ্য কৃত্রিম ব্যবস্থায় খেলাটা দেখানো যেতে পারে।

—গ—

আকাশযানের ক্রমবিকাশ

তোমরা জান, বিশাল আকৃতির আকাশযানগুলি আজকাল শতাধিক যাত্রী নিয়ে শব্দের চেয়েও দ্রুততর গতিতে আকাশপথে একটানা হাজার হাজার মাইল অতিক্রম করে যাচ্ছে। কিন্তু আকাশপথে পরিভ্রমণের এই অভাবনীয় সাফল্যের পিছনে যে কতকালের সাধনা ও প্রস্তুতি রয়েছে, সে কথা চিন্তা করলে বিস্ময়ে অবাক হতে হয়।

ঠিক কোন্ সময় থেকে মানুষ সত্য সত্যই আকাশে ওঠবার জন্যে উদ্যোগী হয়েছিল, সে সম্বন্ধে সঠিকভাবে কিছু বলা না গেলেও যতদূর জানা যায় তাতে মনে হয়, রোজার বেকনই বোধ হয় সর্বপ্রথম বেলুনের মত কোন ফাঁপা গোলকের সাহায্যে আকাশে বিচরণের সম্ভাব্যতার কথা চিন্তা করেছিলেন। ষোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভে বিখ্যাত চিত্রকর ও বৈজ্ঞানিক লিওনার্ডো দা ভিন্সি আকাশে ওড়বার একটি যন্ত্র তৈরির পরিকল্পনা করেছিলেন। উড্ডয়নক্ষম যন্ত্র নির্মাণ এবং তাকে পরিচালনার জন্যে প্রোপেলারের কথা তিনি বলেছিলেন। হাতের জোরে পাখীর ডানার মত বিরাট ডানা সঞ্চালিত করে আকাশে ওড়বার কথাও তিনি ভেবেছিলেন। তারপর আকাশে ওড়বার জন্যে অনেকেই অনেক রকম যন্ত্র তৈরি করেছিলেন বটে, কিন্তু কোনটাই উদ্দেশ্য সিদ্ধির পক্ষে সহায়ক হয় নি।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে যোসেফ মঁগোলফিয়ে এবং এটনে মঁগোলফিয়ে নামক দুজন ফরাসী যুবক কাপড়ের তৈরি বেলুন ধোঁয়ায় ভর্তি করে আকাশে ওড়ালেন ১৭৮৩ সালে। বেলুনে চড়ে সর্বপ্রথম আকাশে ওঠে একটা ভেড়া, একটা হাঁস

ও একটা মুরগী। এরপরে বেলুনে চড়ে ডি রোজিয়ার নামে একজন যুবক প্রথম আকাশে ওঠবার গৌরব অর্জন করেন। তিনি মিনিট পাঁচেকের মত আকাশে ছিলেন এবং ৮০ ফুটের বেশী উপরে ওঠেন নি। কারণ বেলুনটা ৮০ ফুট লম্বা একটা দড়ির সঙ্গে বাঁধা ছিল। এরপর মাসখানেকের মধ্যে তিনি আর একজন সঙ্গী নিয়ে মুক্ত বেলুনে চড়ে ৩০০ ফুট উপর দিয়ে আধ ঘণ্টার কম সময়ে পাঁচ মাইল পথ অতিক্রম করেন। এর ফলে বেলুনে চড়ে আকাশ-ভ্রমণে অনেকেই ক্রমশঃ উৎসাহিত হয়ে ওঠেন। কিন্তু বেলুনকে বায়ুপ্রবাহের সঙ্গে সঙ্গে চলতে হয়, ইচ্ছামত নিয়ন্ত্রণ করা যায় না; তাছাড়া গতিবেগও কম। অবশেষে জীন মেরি ব্যাপ্‌টিষ্ট মিউজনিয়ার নামে একজন ফরাসী ইঞ্জিনিয়ার সিগারের মত আকৃতিবিশিষ্ট একটি বেলুন তৈরি করেন এবং নীচে ঝুলানো গণ্ডোলার সঙ্গে হাতে ঘোরানো প্রোপেলার লাগিয়ে দেন। নতুন ধরণের এই বেলুনটা তেমন কার্যকরী না হলেও এই পন্থা অবলম্বন করেই পরবর্তী কালে ইচ্ছামত পরিচালনার উপযোগী এয়ার সিপ বা ডিরিজিবল তৈরি করা সম্ভব হয়েছিল।

১৮৪৩ সালে মঙ্ক ম্যাসন নামে একজন ইংরেজ ভদ্রলোক মিউজনিয়ার টাইপের একটি ডিরিজিবল নির্মাণ করে সাফল্যের সঙ্গে তার পরীক্ষা প্রদর্শন করেন। এর অল্পকাল পরেই হেনরি জেফার্ড নামে একজন ফরাসী ইঞ্জিনিয়ার ১৪৩ ফুট লম্বা সিগারের মত একটা ডিরিজিবল তৈরি করেন এবং গতিপথ নিয়ন্ত্রণের জন্যে ৩ অশ্বশক্তির ভারী একটা ষ্টীম ইঞ্জিনের সাহায্যে প্রোপেলার চালিয়ে ১৭ মাইল দূরে নির্দিষ্ট স্থানে নির্বিঘ্নে অবতরণ করেন।

এভাবে বিভিন্ন লোকের চেষ্টায় ক্রমশঃই ডিরিজিবলের উন্নতি সাধিত হতে থাকে। আকাশ-ভ্রমণে ডিরিজিবলের সাফল্য দর্শনে ইংল্যাণ্ড ও আমেরিকায়ও কেউ কেউ উন্নত ধরণের ডিরিজিবল নির্মাণে উৎসাহিত হয়ে ওঠে। তবে এই ব্যাপারে সবচেয়ে বেশী অগ্রসর হয়েছিল জার্মেনী। জার্মান গভর্ণমেণ্টের সহায়তায় ১৯০০ সালে কাউণ্ট ভন জেপেলিন সুদৃঢ় কাঠামোয় গঠিত বিরাট আকৃতির অতি শক্তিশালী এক এয়ারসিপ নির্মাণ করেন। নির্মাতার নাম অনুযায়ী এই জাতীয় এয়ারসিপের নাম রাখা হয়—জেপেলিন। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় একটা জেপেলিনই লণ্ডনের উপর বোমা ফেলে ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি করেছিল। কিন্তু পরে দেখা গেল, এই ধরণের এয়ারসিপ সম্পূর্ণ বিপন্মুক্ত নয়। এরপর গ্রাফ জেপেলিন এবং হিণ্ডেনবার্গ নামে আটলাণ্টিক পাড়াপাড়কারী বিশাল আকৃতির যাত্রীবাহী এয়ারসিপ নির্মিত হয়। এগুলিকে বলা হতো সুপার জেপেলিন। বৃটিশ কর্তৃপক্ষও R-33, R-34, R-100, R-101 প্রভৃতি নামে কতকগুলি বিরাট আকৃতির এয়ারসিপ নির্মাণ করেছিলেন। কিন্তু পর পর কতকগুলি মারাত্মক দুর্ঘটনা ঘটবার ফলে উভয় দেশই এয়ারসিপের ব্যবহার বন্ধ করে দেয়।

বেলুন আবিষ্কারের বহুকাল আগে থেকেই বাতাসের চেয়ে ভারী যন্ত্রের সাহায্যে মানুষ আকাশে উড়ে বেড়াবার চেষ্টা করছিল। বেলুন যখন আরোহী নিয়ে আকাশে দীর্ঘ পথ অতিক্রমে সক্ষম হয়েছে, বাতাসের চেয়ে ভারী উড়ন-যন্ত্র তখনও তার ভ্রূণাবস্থা অতিক্রম করতে পারে নি। তখনও সে উঁচু জায়গা থেকে লাফিয়ে হাঁস-মুরগীর মত বাতাসে ভর করে কয়েক-শ' গজ যেতে পারতো মাত্র। এই যন্ত্রকে বলা হয় গ্লাইডার। অনেক রকমের গ্লাইডার উদ্ভাবিত হয়েছিল। হাত-পা সঞ্চালন এবং শরীরকে ব্যালান্স করে গ্লাইডারের সাহায্যে কেউ কেউ বেশ কিছু সময়ের জন্যে আকাশে ভেসে থাকতেও সক্ষম হয়েছিলেন বটে, কিন্তু এতে আকাশে উড়ে বেড়াবার কোনই সুবিধা হয় নি। এই সময়ে ভারী যন্ত্রের সাহায্যে আকাশ-ভ্রমণের ব্যাপারে যাঁরা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে জার্মেনীর অটো লিনিয়েন্থালের নামই সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। ১৮৯৬ সালে ৪৮ বছর বয়সে একদিন উড়তে গিয়ে গ্লাইডার সমেত পড়ে গিয়ে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। আকাশ বিচরণে তিনি কৃতকার্য হতে না পারলেও ভারী যন্ত্রের উড্ডয়ন সম্পর্কে অনেক প্রয়োজনীয় তথ্য আহরণ করেছিলেন। তাঁর মৃত্যুর সাত বছর পরে সর্বপ্রথম এরোপ্লেন আবিষ্কারে এই তথ্যগুলি যথেষ্ট সহায়ক হয়েছিল।

১৯০৩ সালের ১৭ই ডিসেম্বর—অরভিল ও উইলবার রাইট নামে আমেরিকার অধিবাসী দুই ভাই সর্বপ্রথম এরোপ্লেনে করে আকাশে ওঠেন। রাইট ভ্রাতারা অনেক দিন ধরেই গ্লাইডার নিয়ে পরীক্ষা করছিলেন। তারপর লিনিয়েন্থালের তথ্যাদির অনুসরণে নতুন ধরণের একখানি গ্লাইডার তৈরি করে তাতে প্রোপেলার ও ইঞ্জিন জুড়ে কিটি হকের মাঠে প্রথম বারেই তাঁরা সাফল্য অর্জন করেন। এরোপ্লেনে করে সেদিন আকাশে ওড়া দেখবার জন্যে তাঁরা অনেক লোককেই আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। সেদিন সকাল থেকেই প্রবল বেগে ঠাণ্ডা হাওয়া বইছিল। দুই ভাই তাঁদের এরোপ্লেন নিয়ে কিটি হকের মাঠে উপস্থিত হলেন। কিন্তু এই গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা দেখবার জন্যে সেদিন পাঁচজনের বেশী লোক উপস্থিত ছিল না (তার মধ্যে একটি আবার বালক)—এমন কি, এই ঐতিহাসিক ঘটনার সংবাদ জনসাধারণকে জানাবার জন্যে খবরের কাগজের কোন সংবাদদাতাও ছিলেন না। যাহোক, অরভিল বাইপ্লেনে উঠে বসলেন। নির্দিষ্ট সময়ে প্লেন ছাড়া হলো। প্রবল বাতাসের মধ্যেই প্লেনখানা আকাশে উঠে গেল। মাত্র বারো সেকেণ্ড উড়ে ৫৪০ গজ দূরে গিয়ে প্লেনখানা ভূমিতে অবতরণ করলো। এরপরে উইলবার প্রায় আধ মাইল পথ অতিক্রম করেছিলেন, কিন্তু ৫৯ সেকেণ্ড ওড়বার পর প্রবল বাতাসের ধাক্কায় প্লেনখানা মাটিতে পড়ে গিয়ে গুরুতরভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

তারপর তাঁরা বড় আর একখানা প্লেন তৈরি করে ডেটনের নিকট হফ্ম্যান

প্রান্তরে জনসাধারণের কাছে আকাশে ওড়বার পরীক্ষা দেখাবার আয়োজন করেন; কিন্তু আবহাওয়ার প্রতিকূলতায় কৃতকার্য হতে পারেন নি। ১৯০৫ সালের শেষভাগে তাঁরা একটানা প্রায় সাড়ে চব্বিশ মাইল উড়তে সক্ষম হন। এভাবে পর পর কয়েক বছর ধরে চেষ্টা করে তাঁরা একটানা অনেক দূরের পথ অতিক্রমে কৃতকার্য হন। রাইট ভ্রাতাদের সাফল্য লাভের পর ইউরোপে অনেকে এরোপ্লেনে ওড়বার পরীক্ষা করছিলেন। লর্ড নর্থক্লিফ ঘোষণা করেন—এরোপ্লেনে করে যিনি প্রথম ইংলিশ চ্যানেল পার হতে পারবেন, তাঁকে তিনি এক হাজার পাউণ্ড পুরস্কার দেবেন। ১৯০৯ সালে হিউবার্ট লেথাম তাঁর প্লেনে করে ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রম করতে চেষ্টা করেন। তিনি পুরস্কার লাভ করতে পারেন নি। তার দিন পাঁচেক পরেই লুই ব্লেরিও নামে একজন ফরাসী বৈজ্ঞানিক ইংলিশ চ্যানেল পার হয়ে বাজি জিতে নেন। পরের বছরে খবরের কাগজের পক্ষ থেকে ঘোষণা করা হয়, প্রথমে যিনি ২৪ ঘণ্টার ভিতরে লণ্ডন থেকে ম্যাঞ্চেষ্টার পর্যন্ত উড়ে যেতে পারবেন, তাঁকে দশ হাজার পাউণ্ড পুরস্কার দেওয়া হবে। এরোপ্লেনে ১৮০ মাইল পথ অতিক্রম কবা সম্ভব হবে—এটা কেউ বিশ্বাস করতে পাবে নি। গ্রেহাম হোয়াইট নামে একজন ইংরেজ এবং লুই পলহাঁ-ই যথাসময়ে গন্তব্যস্থানে পৌঁছে প্রতিযোগিতায় জয়ী হন।

বিভিন্ন লোকের চেষ্টার ফলে এভাবে এরোপ্লেনের পাল্লা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেতে থাকে। প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়েই এরোপ্লেনের অনেক উন্নতি সাধিত হয়। ক্রমে ক্রমে নতুন করে দূর-দূরান্তরে এরোপ্লেনের অভিযান সুরু হয়। ইতিমধ্যে আমেরিকায় হাইড্রো-প্লেন উদ্ভাবিত হয়। এই প্লেন যেমন আকাশে উড়তে পারে, জলের উপরেও তেমন চলতে পারে। ১৯১৯ সালে আমেরিকার হাইড্রো-প্লেন NC-4 লেঃ কমাণ্ডার রীডকে নিয়ে নিউফাউণ্ডল্যাণ্ড থেকে লিসবনে পৌঁছায়।

এরপর দ্রুতগতিতে আকাশযানের উন্নতি সাধিত হতে থাকে। সে সব কাহিনী খুবই বিস্ময়কর। কিন্তু এখানে আলোচনা করা সম্ভব নয়। পরে তোমরা সে সব কথা জানতে পারবে।

শ্রীঅনিল চক্রবর্তী

রবার্ট ওপেনহাইমার

প্রথম পারমাণবিক বোমা নির্মাণকারী হিসাবে রবার্ট ওপেনহাইমারের নাম আজ সুবিদিত। ওপেনহাইমারের আগেই বহু বিজ্ঞানী পরমাণুর প্রকৃতি এবং পারমাণবিক শক্তি সংক্রান্ত নানারকম গবেষণা চালিয়ে বহুবিধ তথ্য আবিষ্কার করেছিলেন। এই সব তত্ত্ব ও তথ্যের সাহায্যে পারমাণবিক বোমা তৈরি করবার কৃতিত্ব প্রধানতঃ ওপেনহাইমারেরই প্রাপ্য। এই জন্যে বিজ্ঞান-জগতের অনেকেই তাঁকে 'The man who made the bomb' বলে উল্লেখ করে থাকেন।

রবার্ট ওপেনহাইমার

১৯০৪ খৃষ্টাব্দের ২২শে এপ্রিল নিউইয়র্ক শহরের এক অভিজাত ইহুদী পরিবারে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর শৈশবের টুক্‌রা টুক্‌রা ঘটনা থেকেই তাঁর প্রতিভার পরিচয় পাওয়া গিয়েছিল। পাঁচ বছর বয়সে তিনি তাঁর পিতামহের কাছ থেকে বিভিন্ন ধরণের

কয়েকটি পাথর উপহার পাওয়ার পরেই ভূতত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁর প্রগাঢ় ঔৎসুক্য দেখা যায়। শৈশবেই তিনি তাঁর মায়ের কাছে চিত্রাঙ্কন ও সঙ্গীতের শিক্ষা পান। এই সময়ে তিনি ভাবতেন যে, ভবিষ্যতে তিনি একজন কৃতি স্থপতি হিসাবে খ্যাতি লাভ করবেন। কিন্তু সাত বছর বয়স হবাব আগেই তিনি স্থির করে ফেললেন যে, স্থপতি হয়ে কোন লাভ নেই, তাকে কবি হতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে তিনি কবিতা লিখতে সুরু করে দিলেন। তাঁর সেই বয়সের কবিতাই প্রতিষ্ঠিত কবিদেব ঈর্ষার কারণ হতে পারতো। তাঁর সবচেয়ে প্রিয় খেলনা ছিল একটি অণুবীক্ষণ যন্ত্র। সেই যন্ত্রের সাহায্যে সব জিনিষ নিরীক্ষণ করা ছিল তাঁব প্রিয় খেলা।

এভাবে বাল্যকালে ওপেনহাইমার প্রতিভাব পরিচয় দিয়েছিলেন বলে তাঁকে Ethical Culture School নামে একটি স্কুলে পড়তে পাঠানো হলো। অত্যন্ত মেধাবী বা প্রতিভাশালী না হলে এই স্কুলে পড়া কারুর পক্ষেই সম্ভব হতো না। এই সময়ে বিভিন্ন ভাষা শেখবার দিকে তাঁর ঝোঁক চাপলো। তিনি অতি দ্রুত গ্রীক, ফ্রেঞ্চ, স্প্যানিশ এবং ইটালিয়ান ভাষা শিখে ফেললেন। তিনি স্থির করলেন—পৃথিবীর সমস্ত ভাষা, তাদের সাহিত্য এবং সেই সাহিত্যের ইতিহাস অধ্যয়ন করেই তিনি সারা জীবন কাটিয়ে দেবেন। কিছুদিনের মধ্যেই তিনি ল্যাটিন ভাষায় কথাবার্তা বলতে সুরু করলেন এবং ঐ ভাষাতেই সনেটের পর সনেট লিখে চললেন। গ্রীক ভাষায় তিনি এমন সুন্দরভাবে এবং এত দ্রুত কথা বলতে পারতেন যে, গ্রীকরাও তাঁকে হিংসা করতে সুরু করেছিল। তিনি প্রায়ই ফরাসী ভাষায় কবিতা লিখে তার ছন্দ-বৈচিত্র্য অপরিবর্তিত রেখে সেই কবিতা গ্রীক এবং ইটালিয়ান ভাষার অনুবাদ করতেন।

এই সময়ে ভূতত্ত্বের প্রতি আবার তাঁর অনুরাগ বৃদ্ধি পায়। তিনি ভূতত্ত্ব সংক্রান্ত অনেক বই পড়ে ফেললেন এবং একটি লাইব্রেরীও তৈরি করেন এবং বিভিন্ন রকমের পাথর সংগ্রহ করতে সুরু করলেন। আমেরিকার যেখানে যত ভূ-তত্ত্ববিদ এবং ভূ-তত্ত্বের অধ্যাপক ছিলেন, তাঁদের সঙ্গে তিনি নিয়মিত পত্রালাপ করতে লাগলেন। তাঁকে শীঘ্রই নিউইয়র্ক শহরের Minerological Club-এর সভ্য করে নেওয়া হলো। তাঁর বয়স তখন এগার বছর। এর কিছুদিন পরেই ভূতত্ত্ব সংক্রান্ত বক্তৃতা দেবার জন্যে ঐ ক্লাব থেকে তাঁর কাছে আহ্বান এলো। কেবলমাত্র পত্রের মাধ্যমেই তিনি ঐ ক্লাবের সভ্য হয়েছিলেন। ক্লাবের প্রবীণ সদস্যেরাও ঘুণাক্ষরে বুঝতে পারেন নি যে, মাত্র এগার বছরের বালককে তাঁরা সভ্য করে নিয়েছেন। ঐ আহ্বান আসবার পর ওপেনহাইমার প্রথমে একটু ভয় পেয়েছিলেন, কিন্তু পরে তাঁর মনে সাহস ও বিশ্বাস ফিরে আসে। তিনি তাঁর পিতার সঙ্গে নির্দিষ্ট দিনে ক্লাবে গিয়ে হাজির হলেন। বালক ওপেনহাইমারকে দেখে ক্লাবের কর্তাব্যক্তিরা তো হতবাক। প্রাথমিক বিস্ময়

কাটিয়ে ওঠবার পর তাঁরা মনযোগ সহকারে তাঁর বক্তৃতা শোনলেন। শ্রোতাদের অনেকেই স্বীকার করলেন যে, ম্যানহাট্টান দ্বীপের শিলার গঠন-বৈচিত্র্য এবং প্রকৃতি সম্পর্কে এই বালকের বক্তৃতা থেকে তাঁরা অনেক নতুন তথ্য জেনেছেন। ক্লাবের পত্রিকায় এই বক্তৃতাটি প্রকাশিত হয়েছিল।

স্কুলের পড়া শেষ হবার পর তিনি পিতার সঙ্গে ইউরোপের সর্বত্র ভ্রমণ করেন। কৈশোরেই ইউরোপের সঙ্গে এই নিবিড় পরিচয় তাঁর উত্তর-জীবনে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিল।

উনিশ বছর বয়সে তিনি হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে এলেন। তাঁর প্রধান বিষয় ছিল রসায়ন। রসায়ন ছাড়া অন্যান্য যত বিষয় নেওয়া সম্ভব, তিনি তাঁর সব কটিই পাঠ্য করেছিলেন। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক পরীক্ষায় যত নম্বর পেয়ে তিনি উত্তীর্ণ হলেন, তত নম্বর আর কোন ছাত্র কোন দিনও পান নি। পদার্থ-বিজ্ঞানের অধ্যাপক তাঁর সম্পর্কে বলেছিলেন—'That boy will either shake up physics or the world'—উত্তরকালে ওপেনহাইমার উভয়কেই কাঁপিয়েছিলেন।

হার্ভার্ড থেকে তিনি গেলেন কেম্ব্রিজে। সেখানকার বিখ্যাত ক্যাভেণ্ডিস লেবরেটরীতে তিনি গবেষণা সুরু করেন এবং এখানেই তিনি লর্ড রাদারফোর্ড, নীল বোর প্রমুখ জগদ্বিখ্যাত পরমাণু-বিজ্ঞানীদের সংস্পর্শে আসেন। এরপর তিনি গেলেন জার্মেনীর গটিংগেন বিশ্ববিদ্যালয়ে। তাঁর পূর্বপুরুষ জার্মান দেশেরই অধিবাসী ছিলেন, কিন্তু তিনি জার্মান ভাষা জানতেন না। অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি জার্মান ভাষা শিখে নিয়ে সেই ভাষায় 'কোয়ান্টাম ম্যাথামেটিক্স' নামক অত্যন্ত জটিল বিষয়ে একটি নিবন্ধ রচনা করেন। এই নিবন্ধের জন্যে তিনি ডক্টর অব ফিলসফি ডিগ্রী লাভ করেন। এরপর তিনি গেলেন জুরিখ বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং তারপর গেলেন লীডেন বিশ্ববিদ্যালয়ে। মাত্র দু-সপ্তাহ পরে তিনি সেখানে ডাচ ভাষায় বক্তৃতা দেন। প্রতিভার এমন বিকাশ খুব কম বৈজ্ঞানিকের জীবনেই দেখা যায়—অন্ততঃ এত অল্প বয়সে। তখনও তাঁর চব্বিশ বছর পূর্ণ হয় নি।

তাঁর অসামান্য কৃতিত্ব এবং প্রতিভার জন্যে ইউরোপের অনেকগুলি বিশ্ববিদ্যালয় থেকেই অধ্যাপনা করবার জন্যে তাঁর কাছে আহ্বান জানানো হয়। তিনি অবশ্য আমেরিকায় ফিরে গিয়ে ক্যালিফোর্নিয়া ইনষ্টিটিউট অব টেক্‌নোলজী এবং ইউনিভার্সিটি অব ক্যালিফোর্নিয়ায় অধ্যাপনা সুরু করেন। এই সময়ে তিনি সংস্কৃত শিখে এই দেশীয় কাব্য ও দর্শন অধ্যয়নে মনোনিবেশ করেন।

এর কিছুকাল পর থেকেই ইউরোপ এবং আমেরিকার সেরা বিজ্ঞানীরা ক্রমান্বয়ে পারমাণবিক শক্তি বিষয়ক চমকপ্রদ আবিষ্কার করে চলছিলেন। ১৯৪০ সালে আইনষ্টাইনের অনুরোধে এবং জার্মান সমরশক্তি পর্যুদস্ত করবার উদ্দেশ্যে প্রেসিডেন্ট

রুজভেল্ট পারমাণবিক শক্তি প্রকল্প গড়ে তোলবার ব্যবস্থা করেন। এই প্রকল্পটির জন্যে তিনি দু-শ' কোটি ডলার মঞ্জুর করেন। প্রসঙ্গত: উল্লেখযোগ্য যে, এর আগের বছরেও আইনষ্টাইন প্রেসিডেন্টকে অনুরূপ অনুরোধ করেছিলেন এবং প্রেসিডেন্ট সে বছর মাত্র ছয় হাজার ডলার মঞ্জুর করেছিলেন।

নিউ মেক্সিকোর লস আলামসে এই প্রকল্পটি গড়ে তোলা হলো। এই প্রকল্পটির ব্যাপারে অতি মাত্রায় সতর্কতা এবং গোপনীয়তা রক্ষার ব্যবস্থা করা হলো। এই প্রকল্পটির সর্বময় কর্তৃত্ব দেওয়া হলো মিঃ ব্র্যাডলিকে। ইনি আর কেউই নন, সুপরিচিত বৈজ্ঞানিক রবার্ট ওপেনহাইমার। বিজ্ঞানীদের সবাইকেই অনুরূপ ছদ্মনাম এবং ছদ্মবেশ ধারণ করতে হলো। এই প্রকল্পটির সুষ্ঠু রূপায়ণের জন্যে ওপেনহাইমার বছরের পর বছর আহার-নিদ্রা ভুলে কঠিন পরিশ্রম করতে লাগলেন। এই প্রকল্পটিকে সাহায্য করবার জন্যে ওপেনহাইমারের তত্ত্বাবধানে আরও দুটি শাখা প্রকল্প গঠন করা হলো। টেনেসীর ওকরীজ প্রকল্পে ৭৫০০০ এবং ওয়াশিংটনের হ্যানফোর্ড প্রকল্পে ৭০,০০০ লোক কাজ করতে লাগলো।

অবশেষে পারমাণবিক বোমা তৈরি হলো। ১৯৪৫ খৃষ্টাব্দের ১৬ই জুলাই ভোর সাড়ে পাঁচটায় লস আলামস থেকে প্রায় দু-শ' মাইল দূরে ট্রিনিটের মরু অঞ্চলে বোমাটি ফাটানো হলো। বোমা ফাটাবার ফলাফল কল্পনাতীত। সাড়ে চার-শ' মাইল দূরের লোকেরা আলো, ধোঁয়া এবং বিস্ফোরণের শব্দে হতবাক হয়ে গেল। প্রচণ্ড উত্তাপে মরুভূমির বালুকারাশি কাচে পরিণত হলো। আশেপাশের সমস্ত জীবন শেষ হয়ে গেল। যারা শেষ হয় নি, তারা পরে দুরারোগ্য ব্যাধিগ্রস্ত হলো। বোমা ফাটাবার পর ওপেনহাইমার সংস্কৃত শ্লোক উচ্চারণ করেছিলেন। সেই শ্লোকের অর্থ—'আমি আজ জগৎ-ধ্বংসকারী মহামরণে পরিণত হয়েছি'।

এর তিন সপ্তাহ পরে নাগাসাকি ও হিরোসিমায় দুটি বোমা ফেলা হলো। লক্ষ লক্ষ লোক একেবারে শেষ হয়ে গেল। এইভাবে পারমাণবিক বোমার ব্যবহার ওপেন-হাইমারের মোটেই পছন্দ হয় নি। তিনি পারমাণবিক শক্তি প্রকল্প থেকে নিজেকে ফিরিয়ে আনলেন ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে। পারমাণবিক শক্তি বিশেষজ্ঞ হিসেবে অবশ্য প্রায়ই তাঁর ডাক পড়তে লাগলো রাজ দরবারে। এরপর তিনি প্রিন্সটনে উচ্চতর বৈজ্ঞানিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কর্তৃত্বভার গ্রহণ করেন। পৃথিবীর সকলের কাছে পারমাণবিক শক্তির রহস্য জানানো সম্বন্ধে তাঁর মতামত জানতে চাওয়া হলে তিনি বলেছিলেন—'Secrecy strikes at the very root of what science is and what it is for'।

এর বছর কয়েক পরে ১৯৫৪ খৃষ্টাব্দে আমেরিকার পারমাণবিক শক্তি কমিশন তাঁর বিরুদ্ধে এই অভিযোগ করে যে, তিনি কমিউনিষ্টদের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন। এই

অজুহাতে তাঁর কমিশনের গোপনীয় দলিলপত্র দেখবার অধিকার পর্যন্ত কেড়ে নেওয়া হয়। অথচ এর নয় বছর পরে এই কমিশনই তাঁর অসাধারণ বৈজ্ঞানিক প্রতিভার জন্যে তাঁকে ৫০,০০০ ডলার পুরস্কার প্রদান করে। পারমাণবিক শক্তির ব্যবহার সম্পর্কে ওপেনহাইমার বলেছেন—'The peoples of this world must unite or they will perish'।

১৯৬৭ সালের ১৮ই ফেব্রুয়ারী প্রায় ৬৩ বছর বয়সে নিউ জার্সির প্রিন্সটন শহরে রবার্ট ওপেনহাইমার পরলোক গমন করেছেন। অসম্ভব শক্তিশালী পারমাণবিক অস্ত্রের সন্ধান দেবার জন্যে বিজ্ঞান-জগৎ তাঁকে চিরদিন স্মরণ করবে। এই অস্ত্রের সাহায্যে পৃথিবী ধ্বংস করা সম্ভব হলেও তার জন্যে ওপেনহাইমারকে দায়ী করা উচিত হবে না বলেই বিশ্বাস করি।

প্রভাতকুমার দত্ত

ঘড়ির কথা

প্রাচীনকাল থেকেই মানুষ সময় স্থির করবার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে আসছিল এবং বিভিন্ন দেশের মানুষ বিভিন্ন উপায়ে মোটামুটিভাবে সময় স্থির করবার এক-একটা ব্যবস্থা করে নিয়েছিল। সময় নির্ধারণের জন্যে প্রাচীন ভারতে এক প্রকার জল-যন্ত্রের প্রচলন ছিল। তলদেশে সূক্ষ্ম ছিদ্রবিশিষ্ট নির্দিষ্ট আয়তনের একটি তাম্রপাত্র তার চেয়ে বৃহত্তর অপর একটি জলপূর্ণ পাত্রে ভাসিয়ে রাখা হতো। ছিদ্রপথে জল প্রবেশ করে পাত্রটি ডুবে যেতে যতটা সময় লাগতো, তাকেই একদণ্ড ধরা হতো। সারা দিন-রাতে পাত্রটি ৬০ বার জলপূর্ণ হতে পারতো। কথিত আছে প্রসিদ্ধ জ্যোতির্বিদ ভাস্করাচার্যের কন্যা লীলাবতীর বিবাহের সময় এরূপ একটি ঘটিকাযন্ত্র ব্যবহৃত হয়েছিল। কোষ্ঠীবিচারে লীলাবতীর বৈধব্য দোষ দেখে তা খণ্ডন করবার জন্যে ভাস্করাচার্য একটি বিশেষ লগ্নে তার বিবাহের ব্যবস্থা করেন। বিবাহের দিন সঠিকভাবে লগ্ন নিরূপণের জন্যে জলঘড়ির ব্যবস্থা করা হয়। কৌতূহলবশে লীলাবতীও জলপাত্রটিকে দেখছিলেন। সবার অলক্ষ্যে তাঁর মস্তকাভরণ থেকে দৈবাৎ একটা মুক্তা স্খলিত হয়ে ভাসমান পাত্রটিতে পড়ে এবং তার ছিদ্র বন্ধ করে দেয়। এর ফলে শেষ পর্যন্ত অবশ্য ভবিতব্যই জয়যুক্ত হয়েছিল।

এরপর গ্রহাদির গতিবিধি দেখে সময় নির্ণয়ের ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। দিন, মাস ও বছর হিসাবে সময়কে তিন ভাগে ভাগ করে নেওয়া হয়। পরবর্তী কালে দিনকে যখন আরও ক্ষুদ্রতর অংশে ভাগ করবার প্রয়োজন অনুভূত হলো,

তখন ক্রমান্বয়ে নানারকম উপায় উদ্ভাবিত হতে লাগলো। প্রথমতঃ লম্বভাবে স্থাপিত স্তম্ভ বা দণ্ডাদির ছায়া দেখে দিনের ভগ্নাংশ নির্ধারিত হতো। পাশ্চাত্য দেশগুলিতেও তখন এই উপায়েই দিনকে সমান কতকগুলি ভাগে ভাগ করে নেবার ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। তারপর ক্রমশঃ সূর্যঘড়ি বা রবিচক্র (Sundial), জলঘড়ি (Clepsydra), বালিঘড়ি (Sand glass) প্রভৃতি নানাবিধ সময়-নির্দেশক কৌশল উদ্ভাবিত হয়। সূর্যের উদয় থেকে অস্ত পর্যন্ত ছায়াপাত দেখে রবিচক্রের সময় নিরূপিত হতো। কোন পাত্রের সূক্ষ্ম ছিদ্রপথে নির্দিষ্ট পরিমাণ বালিকণা বেরিয়ে আসতে যতটা সময় লাগে, তাকেই সময়ের নির্দিষ্ট ভগ্নাংশ হিসাবে ধরা হতো। গাত্রতাপ নির্ধারণের জন্যে রোগীর শরীরে কতক্ষণ থার্মোমিটার লাগিয়ে রাখা দরকার, অনেক হাসপাতালে আজও তা ছোট ছোট বালিঘড়ির সাহায্যে নির্ণীত হয়ে থাকে। এক রকমের জল-ঘড়িতে সম-আয়তনের ছুটি পাত্রের একটিকে খালি রেখে অপরটিকে জলপূর্ণ করে রাখা হতো। সূক্ষ্ম ছিদ্রপথে এক পাত্র থেকে নির্দিষ্ট পরিমাণ জল অপর পাত্রে যেতে যতটা সময় লাগতো, তাকেই সময়ের এক নির্দিষ্ট অংশের পরিমাপ হিসাবে ধরা হতো।

পরবর্তী কালে বিবিধ কৌশল অবলম্বনে জলঘড়ির অনেক বিস্ময়কর উন্নতি সাধিত হয়েছিল। বাগদাদের খলিফা হারুন-অল-রশিদের সঙ্গে ফ্র্যাঙ্করাজ শার্লিম্যানের (শার্লিম্যানের রাজত্বকাল ৭৬৮ খৃষ্টাব্দ থেকে ৮১৪ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত) বন্ধুত্বের সম্বন্ধ স্থাপিত হয়েছিল। এই সূত্রে খলিফা বহুবিধ দ্রব্যসামগ্রীর সঙ্গে শার্লিম্যানকে একটি অদ্ভুত জলঘড়ি উপহার দিয়েছিলেন। বারোটা বাজবার সঙ্গে সঙ্গেই ঘড়িটার চতুর্দিকের ১২টা জানালা খুলে যেত। সেই জানালাগুলির ভিতর থেকে ছোট ছোট ১২টা ঘোড়সোয়ারের মূর্তি বেরিয়ে আসতো এবং সঙ্গে সঙ্গে বাজনা বেজে উঠতো। বাজনা শেষ হওয়ামাত্র মূর্তিগুলি আবার ভিতরে ঢুকে পড়তো এবং সঙ্গে সঙ্গে জানালাগুলিও বন্ধ হয়ে যেত।

বহুকাল পর্যন্ত সময়-নির্দেশক এই সকল ব্যবস্থাদি প্রচলিত থাকবার পর ইউরোপেই বোধ হয় সময়-নির্দেশক যান্ত্রিক কৌশল উদ্ভাবনের চেষ্টা সুরু হয়। সঠিক সময় নির্ধারণের জন্যে গতি-বিজ্ঞানের নিয়ম অনুসারে সর্বপ্রথম কার দ্বারা ঘড়ি উদ্ভাবিত হয়েছিল, তা জানবার উপায় নেই; তবে এই কথা জানা গেছে যে, ৯৯৬ খৃষ্টাব্দে পোপ সিলভেস্টার (দ্বিতীয়) প্রথম যান্ত্রিক ঘড়ি নির্মাণ করিয়েছিলেন। প্রকৃত প্রস্তাবে ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকেই ইউরোপের বিভিন্ন দেশে ঘড়ির প্রচলন হতে থাকে। ১২৮৮ খৃষ্টাব্দে ওয়েস্টমিনস্টারের পূর্বেকার ক্লক টাওয়ারের উপর একটি ঘড়ি স্থাপন করা হয়েছিল এবং ১২৯২ খৃষ্টাব্দে ক্যান্টারবারি ক্যাথিড্রেলেও একটি ঘড়ি স্থাপিত হয়। জ্যোতির্বিদ্যার কাজে ব্যবহারের জন্যে ১৩২৬ খৃষ্টাব্দে সেন্ট আলবান্সে একটি ঘড়ি স্থাপিত হয়েছিল। ১৩৪৮ খৃষ্টাব্দে ডোভার ক্যাসেলে যে ঘড়িটি স্থাপিত হয়েছিল, ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে তথাকার বিজ্ঞান-প্রদর্শনীতে সেটিকে চালু অবস্থাতেই দেখানো হয়।

এই সব ঘড়ি সারা দিনমানের সময় নির্দেশ করতো বটে, কিন্তু প্রায়ই সময়ের তারতম্য ঘটতো। মাঝে মাঝে জ্যোতিষ্কাদির অবস্থান অথবা সূর্যঘড়ি দেখে সেগুলিকে সংশোধন করে নিতে হতো, কিন্তু মেঘলা দিনে এভাবে সংশোধন করা কোন রকমেই সম্ভব হতো না। কাজেই সঠিকভাবে সময় নির্ণয়ের জন্যে এমন কোন যান্ত্রিক ব্যবস্থা উদ্ভাবনের প্রয়োজন হয়ে পড়লো, যাতে সময়ের সূক্ষ্ম ভগ্নাংশগুলির গতির মাত্রা সর্বদা একই রকম থাকতে পারে। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন লোকের চেষ্টায় ক্রমশঃ নানা রকম যান্ত্রিক কৌশল উদ্ভাবিত হতে লাগলো। তখনকার দিনে ঘড়ির পেণ্ডুলাম ছিল না এবং ঘড়ি একবার যেখানে স্থাপন করা হতো, বরাবর সেখানেই রাখতে হতো, স্থানান্তরিত করা চলতো না। ঘড়ির গতি উৎপাদনের জন্যে অনুভূমিক-ভাবে স্থাপিত মোটা একটা রোলারের গায়ে এক প্রান্ত আবদ্ধ একটা রজ্জু কয়েক পাক জড়াবার পর তার শেষ প্রান্তে একটা ভার ঝুলিয়ে দেওয়া হতো। ভারের টানে রজ্জুর পাক খোলবার সঙ্গে সঙ্গে রোলারটি ঘুরে তৎসংলগ্ন চাকাগুলির গতি উৎপাদন করতো। নির্দিষ্ট হারে গতি নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে চতুর্দশ শতাব্দীতেই 'ভার্জ এসকেপমেণ্ট' নামে একপ্রকার যান্ত্রিক কৌশল উদ্ভাবিত হয়েছিল। ষোড়শ শতাব্দীর পূর্ব পর্যন্ত এই যান্ত্রিক কৌশলের কিছু কিছু উন্নতি সাধন করে তখনকার দিনে ঘড়ি নির্মিত হতো। এই সব ঘড়িকে বলা হতো 'ব্যালান্স ক্লক'। স্প্রিং এবং পেণ্ডুলাম না থাকলেও এই সব ঘড়ি মোটামুটি ভালই কাজ দিত বটে, কিন্তু তাপমাত্রার হ্রাস-বৃদ্ধিতে কিছু দিন পর পর সময়ের বেশ কিছুটা গোলযোগ দেখা যেত।

ষোড়শ শতাব্দীর তৃতীয় দশকের পর থেকে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নেওয়া যায়—এরূপ ঘড়ি নির্মাণের চেষ্টা সুরু হয়। ঐ সময়েই বা আরও কিছু পূর্বে গতি উৎপাদনের জন্যে স্প্রিংয়ের ব্যবহার আরম্ভ হয়েছিল। ১৫৮১ খৃষ্টাব্দে গ্যালিলিও একদিন পিসা নগরীর ক্যাথিড্রালের বারান্দায় পায়চারী করেছিলেন। হঠাৎ তাঁর নজরে পড়লো—সিলিং থেকে ঝুলনো একটা বাতির ঝাড় হাওয়ায় দোল খাচ্ছে। কৌতূহলের বশে তিনি নিজের নাড়ী-স্পন্দনের সঙ্গে মিলিয়ে দেখলেন—প্রত্যেক বারই দোলনের বিস্তার পূর্ণ হতে একই সময় লাগছে। এথেকেই তিনি দোলক বা পেণ্ডুলামের সমগতির সূত্র আবিষ্কার করেন। এর পর থেকেই ঘড়িতে পেণ্ডুলাম সংযোজনের ব্যবস্থা হয়। ব্যালান্স এসকেপমেণ্টের সঙ্গে পেণ্ডুলাম সংযোগ করে হয়গেন্স ঘড়ির প্রকৃত উন্নতি সাধন করেন। এই পেণ্ডুলাম ও এস্কেপমেণ্টই হলো ঘড়ির সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এসকেপমেণ্ট না রেখে ঘড়িতে দম দিলে চাকাগুলি দ্রুতগতিতে ঘুরতে থাকে এবং কয়েক মিনিটের মধ্যেই দম ফুরিয়ে যায়। অল্প সময়ের মধ্যে যাতে দম ফুরাতে না পারে, সেজন্যে পেণ্ডুলাম সংলগ্ন এসকেপমেণ্টের কাঁটা দুটি দোলনের

সঙ্গে সঙ্গে পর্যায়ক্রমে ওঠা-নামা করে সর্বাধিক দ্রুতগতি-সম্পন্ন চাকাটির গতি নিয়ন্ত্রণ করে। অর্থাৎ নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর বাধা সৃষ্টি করে তার গতি মন্দীভূত করে। কেবল তাই নয়, ওঠা-নামা করবার সময় প্রত্যেক বারেই পেণ্ডুলামকে সামান্য একটু ধাক্কা দিয়ে যায়। এর ফলে পেণ্ডুলামের দোলন কখনই বন্ধ হয় না, বরাবর একইভাবে দুলতে থাকে। এই হলো ঘড়ির মোটামুটি মূল পরিচলন-পদ্ধতি। যান্ত্রিক কৌশলের নানারকম উন্নতি সাধিত হলেও এই পদ্ধতিতেই যাবতীয় ঘড়ি পরিচালিত হয়ে থাকে।

এর পর হুক কর্তৃক অধিকতর নির্ভরযোগ্য অ্যাঙ্কর বা রিকয়েল এস্কেপমেণ্ট উদ্ভাবিত হয়। কিছুকালের মধ্যেই হেয়ার স্প্রিংয়ের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ব্যালেন্স হুইল এবং মেন স্প্রিংয়ের ঘূর্ণয়ক্ষম ব্যারেল উদ্ভাবিত হবার ফলে টাইমপিস, টেবিল ক্লক, পকেট ঘড়ি, ক্রোনোমিটার প্রভৃতি নির্মাণ করা সম্ভব হয়। আজ পর্যন্ত পেণ্ডুলাম ঘড়ির মধ্যে ঘণ্টা-বাদক ঘড়ি, বাজনদার ঘড়ি, দিন-তারিখ নির্দেশক ঘড়ি, এক দমে বছর-চলা ঘড়ি, ইলেকট্রিক ঘড়ি এবং পকেট ও রিষ্ট ওয়াচের মধ্যে যে কত রকমের ঘড়ি নির্মিত হয়েছে, তার ইয়ত্তা নেই।

—গ—

প্রশ্ন ও উত্তর

প্রঃ ১। রবট কাকে বলে? এর কাজ কি?

এস. কে. বিশ্বাস, নদীয়া

প্রঃ ২। (ক) দহন কাকে বলে?
(খ) ব্লাড-প্রেসার কখন ও কি কারণে হয়?
(গ) আয়ন-বিনিময় কি? ইহার প্রয়োজনীয়তা কি?
(ঘ) স্পেয়ার-পার্টস্ সার্জারী কাকে বলে?

রঞ্জনা ব্যানার্জী, চিত্তরঞ্জন

প্রঃ ৩। সূর্যগ্রহণের সময় খালি চোখে তাকালে অন্ধ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে কেন?

কালীপদ মণ্ডল, হাটগাছা

প্রঃ ৪। প্রতি-বস্তু ও প্রতি-জগৎ বা বিপরীত বিশ্ব কি ?

অলককুমার বসু, কলিকাতা-১২
ও
সিদ্ধেশ্বর পাহাড়ী, মেদিনীপুর

উঃ ১। রবট (Robot) কথাটি এসেছে চেকোশ্লোভাকীয় শব্দ Robit থেকে—যার অর্থ হচ্ছে কাজ। রবট বলতে এখন আমরা বুঝি যান্ত্রিক মানুষ—অর্থাৎ এমন একটি যন্ত্র, যা মানুষের মতই অনেক কাজ করতে পারে এবং এই ভাবে তার শ্রম লাঘবও করে থাকে। এধরণের যন্ত্র-মানবের কথা মানুষ বহু দিন থেকেই কল্পনা করে এসেছে। পুরনো আমলের পুঁথি-পত্রে এই জাতীয় চিন্তাধারার অনেক পরিচয় পাওয়া যায়। বর্তমানে শিল্পক্ষেত্রে যন্ত্র-মানবকে মানুষের কাজে লাগানো হয়েছে। এসব যন্ত্রের অতি প্রখর স্পর্শেন্দ্রিয় ও শ্রবণেন্দ্রিয় আছে—অর্থাৎ তারা বাইরে থেকে প্রদত্ত নির্দেশ গ্রহণ ও সে অনুযায়ী কাজ করতে পারে। পূর্ব নির্ধারিত প্রশ্নের সঠিক জবাবও এই সব যন্ত্র দিতে সক্ষম। ফটো-সেলের সাহায্যে দৃষ্টি সম্বন্ধে এদের আংশিকভাবে সচেতন করা সম্ভব হয়েছে। ফলে কলকারখানায় এমন সব ব্যবস্থা করা গেছে, যাতে স্বয়ংক্রিয়ভাবে তাপ, চাপ, আর্দ্রতা ইত্যাদি নিয়ন্ত্রিত হয়। যন্ত্রপাতি চালান ও বন্ধ করা, কাঁচামাল উপযুক্ত পরিমাণে যন্ত্রের মধ্যে সরবরাহ করা, যন্ত্রসংক্রান্ত নানারূপ বিপদ থেকে মানুষকে উদ্ধার করা—এসবও স্বয়ংক্রিয়ভাবে চলেছে। অঙ্ক কষবার ব্যাপারে যন্ত্র-মানব আজ মানুষের ক্ষমতাকেও অনেক ছাড়িয়ে গেছে। মুহূর্তের মধ্যে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গুণ, ভাগ করছে, বড় বড় সমীকরণ সমাধান করে দিচ্ছে। অদূর ভবিষ্যতে রবটের আরও উন্নতি হবে বলে আশা করা যায়।

উঃ ২ (ক) দহন হচ্ছে, কোন বস্তুর জ্বলন-প্রক্রিয়া। কিন্তু এই জ্বলনের জন্যে অক্সিজেনের মাধ্যম অপরিহার্য। তাই প্রকৃতপক্ষে দহনকে বলা যায় দাহ্যবস্তুর সঙ্গে অক্সিজেনের সংযোগ—যার ফলে আলো ও উত্তাপ (আগুন) উৎপন্ন ও বিকিরিত হয়ে থাকে।

(খ) যে কোন পাত্রে তরল পদার্থ থাকলেই তা পাত্রের গায়ে চাপ সৃষ্টি করে। এই চাপ সব দিকে সমান হয়ে থাকে। রক্তনালীর মধ্যস্থিত রক্তও তাই নালীতে চাপ প্রদান করে। একেই আমরা বলি ব্লাড-প্রেসার (রক্ত-চাপ)।

একথা সকলেরই জানা আছে যে, রক্ত নালীগুলির মধ্যে স্থির হয়ে নেই, প্রবাহিত হচ্ছে। রক্তের এই প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করে হৃৎপিণ্ড। হৃৎপিণ্ড যেন একটা পাম্প। সে একবার সঙ্কুচিত হয় এবং আবার প্রসারিত হয়। সঙ্কোচনের সময় রক্তনালীতে অতিরিক্ত চাপ পড়ে এবং প্রসারণের সময় চাপ হ্রাস পায়। এই প্রক্রিয়ার দ্বারাই রক্ত-

চলাচল নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। ফলে রক্তচাপের একটা সর্বোচ্চ মান (সঙ্কোচনজনিত) ও একটা সর্বনিম্ন মান (প্রসারণজনিত) পাওয়া যায়। সাধারণ পূর্ণবয়স্ক মানুষের ক্ষেত্রে এই দুই মান যথাক্রমে ১২০ মিঃ মিঃ ও ৮০ মিঃ মিঃ উঁচু স্তম্ভাকারে স্থাপিত পারদের চাপের সমান। তবে রক্তচাপ সকলের ক্ষেত্রে সমান নয়। আবার একই ব্যক্তির রক্তচাপ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রকার হতে পারে। শিশুদের ক্ষেত্রে চাপ অনেক কম, বয়সের সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধি পায়। স্ত্রীলোকের রক্তচাপ পুরুষের তুলনায় কিঞ্চিৎ কম। যাদের ওজন বয়সের অনুপাতে অত্যধিক, তাদের চাপও বেশী। ঘুমাবার সময় রক্তচাপ অনেক কম থাকে; কিন্তু শারীরিক পরিশ্রম করলে বা মানসিক উত্তেজনায় তা বৃদ্ধি পায়।

(গ) সাধারণ অবস্থায় সকল পরমাণুই বিদ্যুৎ-নিরপেক্ষ থাকে। কারণ কেন্দ্রে অবস্থিত প্রোটনসমূহের মোট পজিটিভ বিদ্যুৎ ও কেন্দ্রের বাইরে ঘূর্ণায়মান ইলেকট্রনসমূহের মোট নেগেটিভ বিদ্যুৎ পরস্পরের সমান। কোন কারণে নিরপেক্ষ পরমাণু থেকে একটি বা একাধিক ইলেকট্রন বা প্রোটন বিচ্যুত হলে পরমাণুটি বিদ্যুৎভাবাপন্ন হয়ে যায়। এই অবস্থায় পরমাণুকে বলা হয় আয়ন।

রাসায়নিক যৌগিক পদার্থ অনেক ক্ষেত্রেই আয়নের দ্বারা গঠিত। খুব সহজ উদাহরণ হচ্ছে, সোডিয়াম ক্লোরাইড। দেখা গেছে এর অধিকাংশ পরমাণুই চেষ্টা করে, যেন তার বাইরের কক্ষে আটটি ইলেকট্রন থাকে। এটি হচ্ছে সর্বাপেক্ষা স্থায়ী অবস্থা। সোডিয়াম পরমাণুতে বাইরের কক্ষে একটিমাত্র ইলেকট্রন আছে, আর ক্লোরিনের আছে সাতটি। ফলে সোডিয়াম তার বহিঃস্থ ইলেকট্রনটিকে ছেড়ে দেয় ও ক্লোরিন সেটি নিয়ে নেয়। এই ভাবে উভয়েই স্থিতাবস্থা প্রাপ্ত হয়। কিন্তু এদিকে সোডিয়াম একটি ইলেকট্রন হারিয়ে পজিটিভ বিদ্যুৎ-ধর্মী হয়ে গেছে আর ক্লোরিন একটি ইলেকট্রন গ্রহণ করে নেগেটিভ বিদ্যুৎ-ধর্মী হয়েছে। এই পরস্পর বিরোধী বিদ্যুৎ-ধর্মসম্পন্ন আয়ন দুটি একে অপরকে আকর্ষণ করে ও সোডিয়াম ক্লোরাইডের অণু গঠন করে।

বিপরীত-ধর্মী আয়নের দ্বারা গঠিত এই জাতীয় অণু থেকে আয়নগুলি বিচ্ছিন্ন করা বেশ কষ্টসাধ্য। কিন্তু এস্থলে পজিটিভ আয়নকে সরিয়ে সেখানে তার জায়গায় অন্য কোন পজিটিভ আয়ন বসিয়ে দেওয়া যায়। অনুরূপ ভাবে নেগেটিভ আয়নের বদলে অপর কোন নেগেটিভ আয়ন স্থাপিত করা চলে। একেই বলে আয়ন-বিনিময়।

আয়ন-বিনিময় প্রক্রিয়ার প্রয়োগ সর্বপ্রথম পরিলক্ষিত হয় উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে, যখন বিজ্ঞানী ওয়ে মাটির আয়ন-বিনিময় ক্ষমতা লক্ষ্য করেন। মাটিতে সার ব্যবহারের কাজে এই ধর্ম বিশেষ সহায়তা করে। বর্তমানে নানাজাতীয় কৃত্রিম আয়ন-বিনিময়কারী পদার্থ প্রস্তুত এবং শিল্প ও অন্যান্য বহুস্থলে ব্যবহৃত হচ্ছে। এই সব ব্যবহারের

মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে—জল বিশুদ্ধিকরণ, পাকস্থলীর পরিপাক প্রক্রিয়ায় সহায়তা, প্রোটিন ও অন্যান্য জৈব রাসায়নিক বস্তু সম্বন্ধে গবেষণায় সাহায্য—ইত্যাদি।

(ঘ) স্পেয়ার-পার্টস্ কথাটির সঙ্গে আমরা পরিচিত। বড় বড় যন্ত্রপাতির—তা কলকারখানাও হতে পারে বা মোটর গাড়ী ইত্যাদিও হতে পারে—অংশবিশেষ অনেক সময় নানাকারণে বিগড়ে যেতে পারে। সে ক্ষেত্রে গোটা যন্ত্রটাকে বাতিল করে না দিয়ে তার সেই অংশটুকু বদ্‌লে নিলেই আবার পুরাদমে কাজ চলতে পারে। দামী দামী যন্ত্রের ক্ষেত্রে যে সব অংশ অকেজো হয়ে যাবার সম্ভাবনা থাকে, অনেক সময়ে যন্ত্রের সঙ্গে সেই সব অংশও আলাদা করে সরবরাহ করা হয়। একেই বলে স্পেয়ার-পার্টস্।

মনুষ্যের শরীরও একটি অতি জটিল যন্ত্রবিশেষ—এবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। একথাও সকলেই জানে যে, এই যন্ত্রেরও অনেক অংশ প্রায়ই বিকল হয়ে যায়। সে ক্ষেত্রে অপারেশন করে সেই অংশটুকু বাদ দিয়ে অনুরূপ অন্য অংশ সেখানে লাগিয়ে নিলেই কাজ হতে পারে। এই প্রক্রিয়ার নাম স্পেয়ার-পার্টস্ সার্জারী। স্বভাবতঃই প্রশ্ন উঠবে, প্রতিস্থাপন করবার জন্যে শরীরের প্রয়োজনীয় বিভিন্ন অংশ পাওয়া যাবে কোথা থেকে? বিজ্ঞানীরা মনে করেন, সংরক্ষণ ব্যবস্থার উন্নতি করতে পারলে সদ্যমৃত ব্যক্তির শরীর থেকে অক্ষত অংশ তুলে নিয়ে রেখে দেওয়া যেতে পারে—ভবিষ্যতে সেগুলি রোগাক্রান্ত ব্যক্তির শরীরে লাগিয়ে দেওয়া হবে। চক্ষু-ব্যাঙ্কের কথা অনেকেই শুনে থাকবেন। চোখের সামনের দিকের স্বচ্ছ অংশের নাম কর্ণিয়া। একে সংরক্ষণ করবার ব্যবস্থাকে কেন্দ্র করেই চক্ষু-ব্যাঙ্ক স্থাপিত হয়েছে। ভবিষ্যতে অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ক্ষেত্রেও এটা সম্ভব হবে বলে বিজ্ঞানীরা আশা করেন।

উঃ ৩। সূর্যের আলোর সঙ্গেই আমরা পরিচিত। কিন্তু সূর্য থেকে আলো ছাড়া আরও নানাজাতীয় রশ্মি বিকিরিত হয় ও পৃথিবীতে এসে পড়ে। আলো যে অংশ থেকে আসে, সাদা থালার মত সে অংশের নাম আলোকমণ্ডল। কিন্তু সূর্য প্রকৃতপক্ষে আরও অনেক বড়। আলোকমণ্ডলের পর আরও দুটি প্রধান অংশ আছে—বর্ণমণ্ডল ও ছটামণ্ডল। এগুলি থেকেও বিকিরণ আসে। তবে আলোকমণ্ডল অপেক্ষা এই সব বিকিরণ অপেক্ষাকৃত ক্ষীণতর। তাই আলোকমণ্ডলের অতি শক্তিশালী আলোকের জন্যে এদের প্রাধান্য সাধারণ সময়ে উপলব্ধি করা যায় না। কিন্তু গ্রহণের সময়ে আলোকমণ্ডল চন্দ্র কর্তৃক আবৃত হয়ে যায়। ফলে ছটামণ্ডল থেকে আগত রশ্মি তখন প্রবলাকারে পৃথিবীতে এসে পড়ে। এরাই চোখে পড়লে চোখের ক্ষতি সাধন করে।

উঃ ৪। যে কোন বস্তুরই ক্ষুদ্রতম অংশ হলো পরমাণু। এই পরমাণু আবার তিন রকম কণিকার দ্বারা গঠিত—ইলেকট্রন, প্রোটন ও নিউট্রন। এদের মধ্যে

ইলেকট্রন হলো নেগেটিভ, প্রোটন পজিটিভ ও নিউট্রন বিদ্যুৎ-নিরপেক্ষ কণিকা। বিজ্ঞানীরা প্রথমে অঙ্ক কষে ও পরে পরীক্ষার দ্বারা দেখিয়েছেন যে, এই তিন প্রকার কণিকারই একটি করে প্রতি-কণিকা আছে। ইলেকট্রনের ক্ষেত্রে প্রতি-ইলেকট্রনের নাম দেওয়া হয়েছে পজিট্রন। এটি ভর এবং অন্যান্য সব দিক দিয়েই ইলেকট্রনের মত, কেবল ইলেকট্রনের যতটা নেগেটিভ বিদ্যুৎ আছে, পজিট্রনের ঠিক ততটা পজিটিভ বিদ্যুৎ আছে। বিখ্যাত পদার্থবিদ্ ডিরাক প্রথমে অঙ্ক কষে পজিট্রনের অস্তিত্ব সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। পরে অ্যাণ্ডারসন তা গবেষণাগারে পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণ করেন। প্রোটন এবং নিউট্রনের ক্ষেত্রে প্রতি-কণিকাদ্বয় যথাক্রমে প্রতি-প্রোটন ও প্রতি-নিউট্রন আবিষ্কার করেন চেম্বারলীন ও তাঁর সহকর্মী। প্রতি-প্রোটনও আর সব দিক দিয়ে প্রোটনের মত, শুধু নেগেটিভ বিদ্যুৎ-ধর্মী। প্রতি-নিউট্রনের ব্যাপারটা একটু জটিল। কারণ নিউট্রন বিদ্যুৎভাবাপন্ন কণিকা নয়।

এখন একটি পরমাণু যদি ইলেকট্রন, প্রোটন ও নিউট্রনের পরিবর্তে এদের প্রতি-কণিকা—যথাক্রমে পজিট্রন, প্রতি-প্রোটন ও প্রতি-নিউট্রনের দ্বারা গঠিত হয়, তবে আমরা যা পাব, তা পরমাণু নয়—প্রতি-পরমাণু। এই জাতীয় প্রতি-পরমাণু দিয়ে যে সব বস্তু গঠিত হয়, তাদেরই বলা হয় প্রতি-বস্তু। এর সহজতম উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে প্রতি-হাইড্রোজেন পরমাণু। হাইড্রোজেন পরমাণুর কেন্দ্রে থাকে একটি প্রোটন ও তার চারদিকে ঘুরে বেড়ায় একটি ইলেকট্রন। প্রতি-হাইড্রোজেনের ক্ষেত্রে দেখা যাবে—কেন্দ্রে রয়েছে প্রতি-প্রোটন ও তার চারদিকে ঘুরছে একটি পজিট্রন।

দেখা গেছে—ইলেকট্রন ও পজিট্রন বা প্রোটন ও প্রতি-প্রোটন বা নিউট্রন ও প্রতি-নিউট্রন পরস্পরের কাছাকাছি আসলে বিস্ফোরণের ফলে পরস্পর পরস্পরকে ধ্বংস করে ফেলে ও শক্তিতে রূপান্তরিত হয়ে যায়। তাই বস্তু ও প্রতি-বস্তু যদি কখনও কাছাকাছি আসে, তারাও বিস্ফোরণ ঘটাবে সন্দেহ নেই। বিজ্ঞানীরা প্রতি-বস্তুর অস্তিত্ব কল্পনা করেছেন মাত্র, বিশ্বের কোথাও তা আছে কিনা—তাঁদের জানা নেই। প্রতি-কণিকা একত্রিত করে প্রতি-বস্তু গঠন করা তাঁদের পক্ষে এখনও সম্ভব হয় নি। তবে উপরিউক্ত কারণে প্রতি-বস্তুর সন্ধান পেলে তাকে বস্তুর কাছ থেকে অনেক দূরে সরিয়ে রাখতে হবে।

বস্তু দিয়ে গঠিত সব কিছু নিয়ে হচ্ছে আমাদের জগৎ বা বিশ্ব। প্রতি-বস্তু দিয়ে গঠিত যদি কোন জগতের কল্পনা করা যায়, তবে সেটাই হবে প্রতি-জগৎ বা বিপরীত বিশ্ব।

দীপক বসু

বিবিধ

মহাকাশে মহাকাশচারীর প্রথম মৃত্যু

মস্কো থেকে টাস কর্তৃক প্রচারিত এক সংবাদে জানা যায়—সোভিয়েট ইউনিয়ন ২৩শে এপ্রিল সকালে মনুষ্য-চালিত মহাকাশযান 'সয়ুজ-১' মহাকাশে পাঠিয়েছে। মহাকাশচারীর নাম ভ্লাডিমির কোমারভ।

পরবর্তী সংবাদে জানা যায়—সোভিয়েট মহাকাশচারী তাঁর মহাকাশ পরিক্রমা শেষ করে ২৪শে এপ্রিল নেমে আসছিলেন। নামবার পথে মহাকাশযানের গতি হ্রাসের জন্যে একটি প্যারাসুট ব্যবহার করা হয়। মহাকাশযানটি যখন পৃথিবীর সাত কিলোমিটার উপরে তখন প্যারাসুটের দড়ি জড়িয়ে যায়। ফলে মহাকাশচারী ভ্লাডিমির কোমারভ মহাকাশেই মারা গিয়েছেন। মহাকাশে মহাকাশচারীর মৃত্যু এই প্রথম।

সার্ভেয়ার-৩ কর্তৃক চাঁদের ছবি প্রেরণ

পাসাডেনা (ক্যালিফোর্ণিয়া) থেকে রয়টার কর্তৃক প্রচারিত এক খবরে প্রকাশ—চালকবিহীন দ্বিতীয় মার্কিন মহাকাশযান সার্ভেয়ার-৩ অনায়াসে চাঁদের ঝঞ্ঝা-সাগরে গিয়ে নেমেছে। নামবার এক ঘন্টার মধ্যেই সেখানকার টেলিভিশন-ছবি পাঠাতে সুরু করে।

সার্ভেয়ার-৩ ১৭ই এপ্রিল কেপ কেনেডি থেকে যাত্রা করে। ৬৫ ঘন্টায় ২১১০০০ মাইল পাড়ি দিয়ে ২০শে এপ্রিল ভোর ৪টায় (গ্রীঃ সঃ) চাঁদে পৌঁছায়।

অফিসারেরা বলেন, এখানকার নির্দেশ মহাকাশযানটি মেনে নিচ্ছে। তবে কিছুটা আলানী-সমস্যা দেখা দিতে পারে। সে সম্পর্কে অনুসন্ধান করা হচ্ছে।

চাঁদের বুকে গিয়ে যাতে না আছড়ে পড়ে, সেজন্যে চাঁদের ৫২ মাইল দূরে থাকতেই সার্ভেয়ার-৩-এ ব্রেক-রকেটগুলি সক্রিয় হয়ে ওঠে। মহাকাশযানের গতিবেগ কমে গিয়ে ঘন্টায় প্রায় ৩০০ মাইল হলে উল্টা-গতি রকেট ব্যবস্থা চালু করা হয়।

অবতরণ পর্যন্ত এখানকার সব নির্দেশ সার্ভেয়ার-৩ যথাযথভাবে পালন করে। কিন্তু অবতরণের পর পরিচালন-শক্তির ব্যবহার বন্ধ করে দেবার নির্দেশ দেওয়া সত্ত্বেও তা পালিত হয় নি। শক্তির এই অপব্যবহার কেন তা খুঁটিয়ে দেখা হচ্ছে।

মহাকাশচারী সমেত মানবচালিত মহাকাশযানের ভার বহনে চাঁদ সক্ষম কিনা চাঁদের বুক খুঁড়ে সার্ভেয়ার-৩ তা যাচাই করে দেখবে।

থুম্বা থেকে মহাকাশে রকেট উৎক্ষেপণ

পি. টি আই. কর্তৃক প্রচারিত এক খবরে প্রকাশ—১২ই মার্চ বিকালে থুম্বা রকেট ঘাঁটি থেকে দু'পর্যায়ের নাইক-আপেচে রকেট সোডিয়াম বাষ্প ও ল্যাংমুর যন্ত্র ভর্তি করে মহাকাশের দিকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। ল্যাংমুর খুব ভাল সঙ্কেত পাঠালেও সোডিয়াম বাষ্প রকেট-আধার থেকে বের হয় নি।

মহাকাশে সোডিয়াম বাষ্প ছড়িয়ে দিয়ে পরীক্ষা চালাবার চেষ্টা এই তৃতীয়বার ব্যর্থ হলো।

ইউ. এন. আই. কর্তৃক প্রচারিত পরবর্তী সংবাদে জানা যায় ১৯শে এপ্রিল বেলা ১১-৪৪ মিনিটের সময় থুম্বা উৎক্ষেপণ কেন্দ্র থেকে একটি দ্বি-স্তর রকেট উৎক্ষেপণ করা হয়। উৎক্ষেপণ

কেন্দ্রের পরীক্ষা সংক্রান্ত অধিকর্তা শ্রী জি. এস. মূর্তি জানান যে, এই দিনের রকেট উৎক্ষেপণ সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে।

শীঘ্রই চাঁদে মানুষের পদার্পণ হতে পারে

ক্যালিফোর্ণিয়া থেকে এ. এফ. পি. কর্তৃক প্রচারিত এক সংবাদে প্রকাশ—জড্রেল ব্যাঙ্ক মানমন্দিরের ডিরেক্টর সার লোভেল বলেন যে, রাশিয়া চাঁদে মানুষ পাঠাবার জন্যে একটি মহাকাশযান তৈরির কাজে ব্যস্ত আছে। ঐ মহাকাশযানটি শীঘ্রই চাঁদে পাড়ি দিতে পারে। সম্ভবতঃ মহাকাশযানটি চাঁদে গিয়ে আবার পৃথিবীতে ফিরে আসবে।

সার লোভেল গ্রোসমন্ট কলেজে বক্তৃতার সময় আরও বলেন যে, মস্কোর খবরের উপর ভিত্তি করেই তিনি এই কথা বলেছেন। চাঁদে মানুষ পাঠাবার প্রতিযোগিতায় কে জিতবে—আমেরিকা না রাশিয়া—এ প্রশ্নের উত্তরে সার লোভেল কোন কথা বলেন নি।

হৃদরোগ নির্ণয়ে কম্পিউটার যন্ত্র উদ্ভাবন

সম্প্রতি ইউ. এন. আই. কর্তৃক প্রচারিত এক সংবাদে প্রকাশ—এমন এক কম্পিউটার যন্ত্র আবিষ্কৃত হয়েছে, যা হৃদ্‌রোগ আক্রমণের ৪০ মিনিট আগে ডাক্তারকে সতর্ক করে দিতে পারে। সম্প্রতি লণ্ডনের এক প্রদর্শনীতে এই যন্ত্রটি দেখানো হয়। যন্ত্রটির নাম হলো 'প্রি-এরেষ্টার'। রোগীর হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া ঠিক চলছে কি না, তার নির্দেশ দেওয়াই যন্ত্রটির কাজ। হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বিকল হলেই যন্ত্রে বৈদ্যুতিক নির্দেশ ধরা পড়ে। এই যন্ত্র উদ্ভাবনে হৃদ্‌যন্ত্র-বিশেষজ্ঞদের যথেষ্ট উপকার হবে।

নুনমাটিতে জেটের জ্বালানী তেল উৎপাদন

গৌহাটির কাছে নুনমাটিতে রাষ্ট্রায়ত্ত তেল শোধনাগারে জে. পি-৪ জেট প্রোপালসন তেল উৎপাদন ১লা এপ্রিল থেকে সুরু হয়েছে। এর ফলে প্রতিরক্ষার কাজে সুপারসনিক জেট বিমানের জ্বালানী উৎপাদনে দেশ স্বয়ম্ভরতা অর্জন করবে।

এই শোধানগারে বছরে ২৫ হাজার মেট্রিক টন জেটের জ্বালানী উৎপন্ন হবে। এতে ৬০ লক্ষ টাকার বিদেশী মুদ্রা সাশ্রয় হবে।

সম্পূর্ণ প্রকল্পটির নক্সা করেছেন শোধনাগারের ইঞ্জিনীয়ার ও প্রযুক্তিবিদেরা।

এপর্যন্ত দেশে জেট বিমানের জ্বালানী আমদানী করা হচ্ছিল। কিন্তু এখান থেকে গৌহাটি শোধনাগার অন্য দুটি রাষ্ট্রায়ত্ত শোধনাগারের সঙ্গে একযোগে জে. পি-৪ তেল উৎপন্ন করবে। ওই দুটি শোধনাগার হলো কোয়েলি ও বারুণী। সেখানে মার্চ মাস থেকে উৎপাদন সুরু হয়ে গেছে।

এই সংখ্যার লেখকগণের নাম ও ঠিকানা

১। গৌতম বন্দ্যোপাধ্যায়
অবধায়ক—শ্রীপার্বতীশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়
গ্রাম ও ডাকঘর—লাভপুর
জেলা—বীরভূম

২। দেবব্রত মুখোপাধ্যায়
২৭, পার্ক অ্যাভেনিউ
টালা পার্ক, কলিকাতা-২

৩। শ্রীসূর্যকান্ত রায়
যামিনীভূষণ অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদ মহাবিদ্যালয়
১৭০, রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রীট
কলিকাতা-৪

৪। সুখেন্দু সোম
ব্রজমোহন কলেজ
(পদার্থবিদ্যা বিভাগ)
বরিশাল, পূর্ব পাকিস্থান

৫। সৌমেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য
৬২।২।বি, টালিগঞ্জ রোড
কলিকাতা—৩৩

৬। শ্রীপ্রভাসচন্দ্র কর
বঙ্গলক্ষ্মী সোপ ওয়ার্কস্
২৭, অক্ষয়কুমার মুখার্জী রোড
কলিকাতা-৫০

৭। কল্যাণকুমার চক্রবর্তী
৩৬৪।২২, নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু রোড
নাকতলা, কলিকাতা-৪৭

৮। পূর্ণিমা বন্দ্যোপাধ্যায়
25, Russet Road,
Kendall Park, N. J. 08824,
U. S. A.

৯। রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়
দি ক্যালকাটা কেমিক্যাল কোং লিঃ
৩৫, পণ্ডিতিয়া রোড,
কলিকাতা-২৯

১০। শ্রীপ্রভাতকুমার দত্ত
৩৬।বি, বকুলবাগান রোড
কলিকাতা-২৫

১১। শ্রীঅনিল চক্রবর্তী
৪, চিত্তরঞ্জন অ্যাভেনিউ
কলিকাতা-১৩

১২। দীপক বসু
ইনষ্টিটিউট অব রেডিও ফিজিক্স
অ্যাণ্ড ইলেকট্রনিক্স
বিজ্ঞান কলেজ,
কলিকাতা-৯

সম্পাদক—শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস কর্তৃক ২৯৪।২।১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড হইতে প্রকাশিত এবং গুপ্তপ্রেশ
৩৭।৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা হইতে প্রকাশক কর্তৃক মুদ্রিত
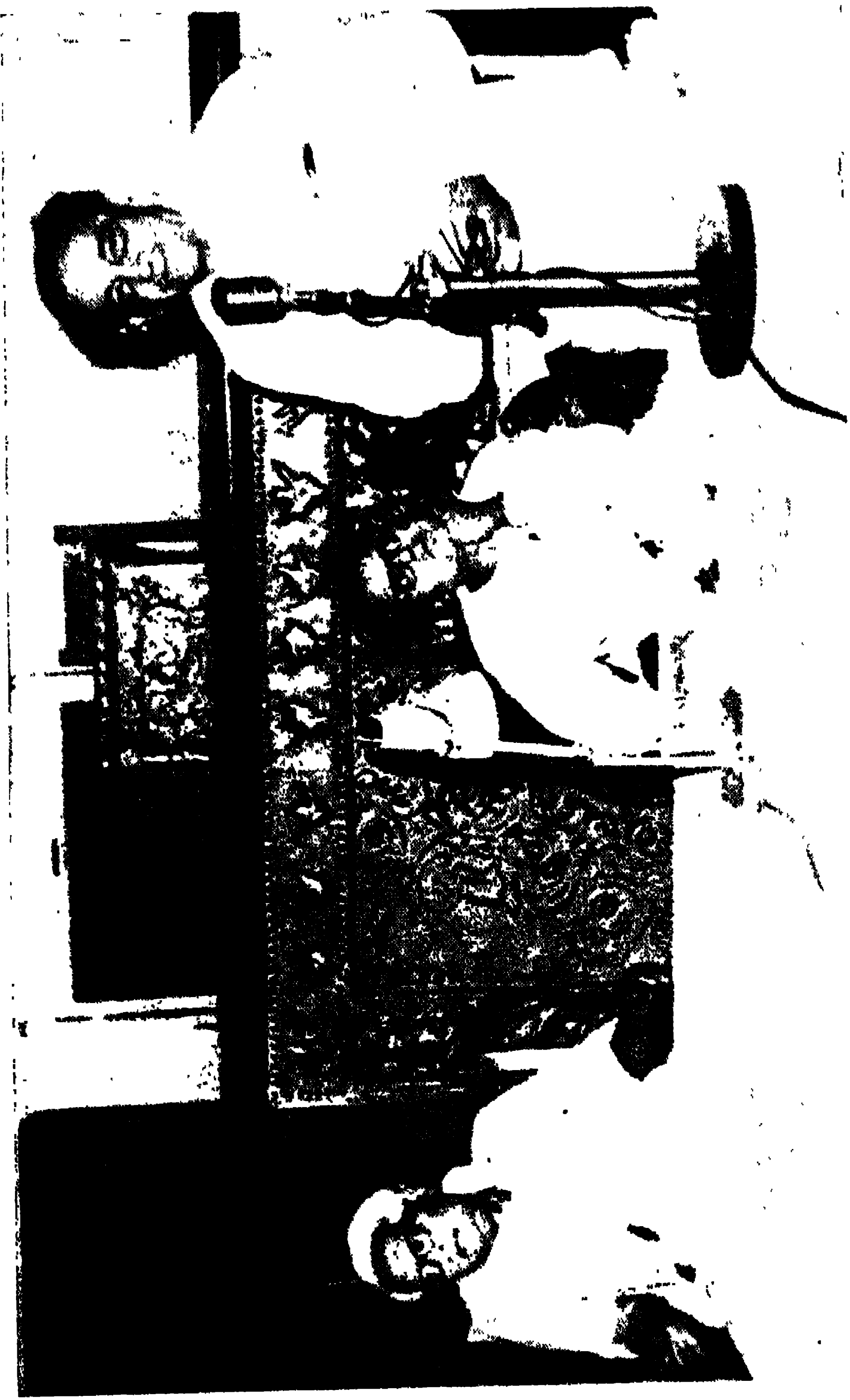
বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের ঊনবিংশ বার্ষিক প্রতিষ্ঠা-দিবস অনুষ্ঠানের সভাপতি ডক্টর দেবেন্দ্র মোহন বসু ভাষণ দিচ্ছেন। তাঁর পাশে উপবিষ্ট রয়েছেন যথাক্রমে পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষামন্ত্রী শ্রীজ্যোতিভূষণ ভট্টাচার্য এবং বিজ্ঞান পরিষদের সভাপতি অধ্যাপক সত্যেন্দ্র নাথ বসু।

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

বিংশতি বর্ষ | জুন, ১৯৬৭ | ষষ্ঠ সংখ্যা

উনবিংশতিতম প্রতিষ্ঠা-দিবসের নিবেদন

গত ৫ই মে, ১৯৬৭, মনোরম পরিবেশে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের উনবিংশতিতম প্রতিষ্ঠা-দিবসের অনুষ্ঠান প্রতিপালিত হয়েছে। স্বাধীনতা লাভের অব্যবহিত পরে ১৯৪৮ সালে মাতৃভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞান প্রচার ও প্রসারের উদ্দেশ্যে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ প্রতিষ্ঠিত হয়। বিজ্ঞান বিষয়ক পত্রিকা ও পুস্তকাদি প্রকাশ, গ্রন্থাগার স্থাপন ও পাঠাগার পরিচালন, বিজ্ঞান প্রদর্শনীর ব্যবস্থা, বিজ্ঞান বিষয়ক বক্তৃতাদির আয়োজন, বিজ্ঞান শিক্ষার আসর স্থাপন—প্রভৃতি বিবিধ ব্যবস্থার মাধ্যমে উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্যে গত উনিশ বছর যাবৎ পরিষদ নিরলসভাবে চেষ্টা করে আসছে। কেবল মাত্র বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণের ক্ষেত্রেই নয়, বিজ্ঞান-শিক্ষার সর্বস্তরে মাতৃভাষার ব্যবহার যে একান্ত আবশ্যক—এই সহজ কথাটি বিজ্ঞান পরিষদ তার জন্মকাল থেকেই প্রচার করে আসছে। সুখের বিষয় এই যে, এই বিষয়টি সম্প্রতি সরকারী স্বীকৃতি লাভ করেছে এবং অচিরেই মাতৃভাষাকে শিক্ষার বাহন করবার জন্যে নানা প্রকার চেষ্টার কথা শোনা যাচ্ছে। এই নৈতিক বিজয়ের মুহূর্তে পরিষদের দায়িত্ব ও অধিকার বহুলাংশে প্রশস্ততর হয়ে পড়েছে। কাজেই পরিষদ কর্তৃক পরিকল্পিত কর্মপ্রচেষ্টা ত্বরান্বিত করবার জন্যে নতুন উদ্যমে অগ্রসর হবার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। এই প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেই এবারের অনুষ্ঠানে অতিরিক্ত কার্যসূচী সংযোজিত হয়েছিল। 'বিজ্ঞানীর সামাজিক দায়িত্ব' বিষয়ক একটি আলোচনা-চক্রের অনুষ্ঠান ছিল এই কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত। এই আলোচনা-চক্রে অংশগ্রহণকারী কয়েক জনের বক্তব্য তাঁদের স্বলিখিত প্রবন্ধ হিসাবে এই সংখ্যাটিতে সন্নিবেশিত হয়েছে। আমরা আশা করি—পরিষদের সভ্য, সমর্থক ও জনসাধারণের শুভেচ্ছা ও সহযোগিতায় পরিষদ উদ্দেশ্য সিদ্ধির পথে দ্রুততর গতিতে অগ্রসর হবে। এই আশা নিয়েই পরিষদ-পরিকল্পিত কর্মসূচী রূপায়ণের প্রচেষ্টা ত্বরান্বিতকরণের সূচনার প্রতীক হিসাবে বর্তমান সংখ্যাটি বিশেষ সংখ্যারূপে প্রকাশিত হলো।

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

ঊনবিংশ বার্ষিক প্রতিষ্ঠা-দিবস অনুষ্ঠান

গত ৫ই মে শুক্রবার অপরাহ্ণে বসু বিজ্ঞান মন্দিরের বক্তৃতা-কক্ষে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের ঊনবিংশ বার্ষিক প্রতিষ্ঠা-দিবস অনুষ্ঠান উদ্‌যাপিত হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বসু বিজ্ঞান মন্দিরের অধ্যক্ষ দেবেন্দ্রমোহন বসু। প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষামন্ত্রী শ্রীজ্যোতিভূষণ ভট্টাচার্য। পরিষদের সভাপতি অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু এবং বহু বিশিষ্ট বিজ্ঞানী, শিক্ষাবিদ ও বিজ্ঞানের ছাত্র-ছাত্রী সভায় উপস্থিত ছিলেন। ব্রাহ্মবালিকা শিক্ষালয়ের ছাত্রীদের দ্বারা উদ্বোধন সঙ্গীত পরিবেশিত হয়।

অনুষ্ঠানের প্রারম্ভে পরিষদের কর্মসচিব ডাঃ জয়ন্ত বসু তাঁর নিবেদনে উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানান। অতঃপর তিনি পরিষদের উদ্দেশ্য, আদর্শ ও কার্যবিবরণী পেশ করেন। ডাঃ বসু বলেন যে, পরিষদের অনেক জনশিক্ষামূলক পরিকল্পনা থাকা সত্ত্বেও আর্থিক অসঙ্গতি ও নানা প্রতিকূল অবস্থার জন্যে পরিষদ তার অনেকগুলি যথোপযুক্তভাবে এখনও কার্যে রূপান্তরিত করতে পারে নি।

প্রধান অতিথির ভাষণে শিক্ষামন্ত্রী শ্রীজ্যোতিভূষণ ভট্টাচার্য বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের বিভিন্ন কর্মপ্রচেষ্টার ভূয়সী প্রশংসা করেন। মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের গুরুত্ব সম্বন্ধে উল্লেখ করে তিনি বলেন যে, বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত শিক্ষার সর্বস্তরে মাতৃভাষাই মাধ্যম হওয়া উচিত। তবে তিনি মনে করেন যে, সর্বস্তরে মাতৃভাষা করবার মত উপযোগী যথেষ্ট পাঠ্যপুস্তক আমাদের দেশে এখনও পাওয়া যাচ্ছে না। শীঘ্রই সরকার বাংলায় পাঠ্যপুস্তক রচনার জন্যে এক ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ করবে বলে শিক্ষামন্ত্রী ঘোষণা করেন। বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের শুভানুধ্যায়ী উপস্থিত বিজ্ঞানী ও শিক্ষাবিদদের এই ব্যাপারে সরকারকে সাহায্য করবার জন্যে তিনি আবেদন জানান। এই প্রসঙ্গে শ্রীভট্টাচার্য আরও বলেন যে, পাঠ্যপুস্তকের ব্যাপারে ব্যবসায়ী মনোভাব পরিত্যাগ করে মাতৃভাষার প্রসার ও শিক্ষার সুবিধার জন্যে পুস্তক রচনার দিকে সকলকে মনোনিবেশ করতে হবে।

পরিষদের সভাপতি অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু বলেন যে, বাংলা দেশে অবিলম্বে সর্বস্তরে বাংলাভাষায় শিক্ষাদানের ব্যবস্থা চালু হওয়া উচিত। তবে তিনি মনে করেন যে, প্রকৃত পক্ষে বইয়ের অভাবই আসল সমস্যা নয়, সরকার এবং বিশ্ববিদ্যালয় যদি এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে, সর্বস্তরে মাতৃভাষায় শিক্ষা দেওয়া হবে এবং ছাত্র-ছাত্রীরা সেই ভাষাতেই পরীক্ষা দিতে পারবে, তাহলে অল্প সময়ের মধ্যেই পাঠ্যপুস্তক পাওয়া যাবে—এই তাঁর ধারণা। কর্মসচিবের বিবরণীতে পরিষদের উন্নতির জন্যে যে সব সাহায্য চাওয়া হয়েছে, সে সবের প্রতি তিনি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

এরপর একটি আলোচনা-চক্রের আয়োজন করা হয়। বিষয়বস্তু—'বিজ্ঞানীর সামাজিক দায়িত্ব'। এতে অংশ গ্রহণ করেন অধ্যাপক সুশীলকুমার মুখোপাধ্যায়, ডক্টর অমিয়কুমার বসু, অধ্যাপিকা অসীমা চট্টোপাধ্যায়, শ্রীনদীয়াবিহারী অধিকারী ও অধ্যাপক জ্ঞানেন্দ্রলাল ভাদুড়ী। এঁরা যথাক্রমে কৃষি, চিকিৎসা, ভেষজ, শিল্প এবং শিক্ষাক্ষেত্রে

দেশের বিজ্ঞানীদের দায়িত্ব সম্বন্ধে মনোজ্ঞ আলোচনা করেন।

সভাপতির সংক্ষিপ্ত ভাষণে অধ্যাপক দেবেন্দ্র মোহন বসু বলেন যে, তিনি বাংলাভাষায় বিজ্ঞান বিষয়ক বিবিধ আলোচনা শুনে বিশেষ আনন্দিত হয়েছেন। ভবিষ্যতে আরও এই ধরণের আলোচনা-সভার আয়োজন করবার জন্যে তিনি বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদকে অনুরোধ জানান।

পরিশেষে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের পক্ষ থেকে সমবেত সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন ডাঃ মৃণালকুমার দাশগুপ্ত।

দীপক বসু

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের উনবিংশ বার্ষিক প্রতিষ্ঠা-দিবস অনুষ্ঠানে কর্মসচিবের নিবেদন

মাননীয় সভাপতি ও প্রধান অতিথি মহাশয়, শ্রদ্ধেয় সুধিবৃন্দ ও সমবেত ভদ্রমণ্ডলী, বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের প্রতিষ্ঠা-দিবস বার্ষিকীর এই অনুষ্ঠানে পরিষদের পক্ষ থেকে আমি আপনাদের স্বাগত অভ্যর্থনা জানাই। পরিষদের বিংশতিতম বর্ষের প্রারম্ভ উপলক্ষ্যে আয়োজিত এই সম্মেলনে যোগদান করে আপনারা পরিষদের প্রতি যে শুভেচ্ছা ও সহমর্মিতা প্রদর্শন করেছেন, তার জন্যে আপনাদের জানাই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ।

আজ এই অনুষ্ঠানে অধ্যাপক দেবেন্দ্রমোহন বসু মহাশয়কে সভাপতিরূপে পেয়ে আমরা বিশেষ গৌরব বোধ করছি। তিনি একদিকে যেমন নিজে লব্ধপ্রতিষ্ঠ বিজ্ঞানী ও সেই সঙ্গে বিজ্ঞানী-দের প্রেরণার উৎস, অন্যদিকে আমাদের দেশে সাধারণ বিজ্ঞান-শিক্ষার ক্ষেত্রেও তাঁর একটি বিশেষ অগ্রণী ভূমিকা রয়েছে। বিজ্ঞানীর ভবিষ্যৎ গঠনেই শুধু নয়, ভবিষ্যৎ বিজ্ঞানী গঠনেও তাঁর অদম্য শক্তি নিয়োজিত। আমাদের পরিষদের তিনি একজন প্রতিষ্ঠা-কালীন সদস্য; পরিষদের বহু কর্মপ্রচেষ্টার সাফল্যের সঙ্গে জড়িত আছে তাঁর সুচিন্তিত উপদেশ ও সক্রিয় সহযোগিতা। পরিষদের কর্মপ্রচেষ্টাকে কিভাবে আরো সার্থক ও সাফল্যমণ্ডিত করে তোলা যায়, সেই সম্পর্কে তাঁর মূল্যবান অভিমত শোনবার জন্যে আমরা আগ্রহান্বিত হয়ে আছি।

আমাদের শিক্ষামন্ত্রী অধ্যাপক জ্যোতিভূষণ ভট্টাচার্য মহাশয়কে এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি-রূপে পেয়ে আমরা অত্যন্ত উৎসাহিত বোধ করছি। বিশেষ কর্মব্যস্ততা সত্ত্বেও তিনি যে এই সম্মেলনে যোগদান করে আমাদের অনুপ্রেরণা দান করেছেন, তার জন্যে আমরা তাঁর নিকট কৃতজ্ঞ। অধ্যাপক ভট্টাচার্য নিজে একজন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও সমাজনীতিজ্ঞ। তিনি নিশ্চয় আমাদের সঙ্গে একমত হবেন যে, প্রগতির পথে আমাদের সমাজকে ত্বরান্বিত করতে হলে অনেক পুরনো দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন করা দরকার, গতানুগতিকতার ধারা ত্যাগ করে দরকার নতুন অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষার। উদাহরণ হিসাবে শিক্ষাক্ষেত্রের একটি সমস্যার বিষয় উল্লেখ করি। বিজ্ঞানের উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে অর্থ ও উদ্যম নবীকরণের হার যে অনুপাতে বৃদ্ধি পাচ্ছে, তার তুলনায় কতখানি গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে বৈজ্ঞানিক মনোভাবের প্রসার ও বিজ্ঞান-প্রয়োগের প্রচেষ্টাতে? যাই হোক, আমরা মনে করি, পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই সকল সমস্যা সম্পর্কে

অবহিত হয়ে এইগুলির প্রতিকার সাধনে উত্তরোত্তর সচেষ্ট হবেন। সারা বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে বিজ্ঞানকে জনপ্রিয় ও জনকল্যাণ-মূলক করবার ব্যাপারে বিজ্ঞান পরিষদের মত প্রতিষ্ঠান নতুন কি কার্যকর ব্যবস্থা অবলম্বন করতে পারে, সরকারের জনশিক্ষামূলক প্রকল্প-গুলিতে পরিষদ কেমনভাবে সক্রিয় সহযোগিতা করতে পারে এবং অপরপক্ষে পরিষদের কর্ম-প্রচেষ্টায় সরকারের সাহায্য ও সহযোগিতা কিভাবে ও কতখানি পাওয়া যেতে পারে, অধ্যাপক ভট্টাচার্য তাঁর ভাষণে এই সকল বিষয়ে আলোকপাত করে আমাদের কর্মপ্রসার ও সাফল্যের পথ নির্দেশ করবেন বলে আমরা আশা করছি।

আমরা জানি যে আর্থিক অবস্থার কিছুটা উন্নতি হওয়া সত্ত্বেও বিজ্ঞানীদের অনেকের মনে একটা হতাশা ও নৈরাশ্যের ভাব বিরাজ করছে। আমরা মনে করি যে, এই গ্লানি আমাদের সমাজের দুরবস্থারই প্রতিফলন। তবে আপাততঃ বিজ্ঞানীরা যতই হতাশাগ্রস্ত হন, মনে মনে তাঁরা চরম আশাবাদী। কারণ তাঁরা আশা করেন, তাঁদের গবেষণার মধ্য দিয়ে ক্রমশঃই তাঁরা চরম সত্যের দিকে এগিয়ে চলেছেন। আমরা বলবো যে, তাঁদের এই আশাবাদের বলিষ্ঠতা শুধু গবেষণার ক্ষেত্রে নয়, সমাজের সর্বস্তরে সঞ্চারিত করতে হবে। মনে রাখতে হবে যে, একজন বিজ্ঞানী গঠন করতে সমাজের যথেষ্ট অর্থব্যয় হয়ে থাকে। শিক্ষা কমিশনের বিবরণী অনুযায়ী স্নাতক শ্রেণীর বিজ্ঞানের প্রতিটি ছাত্রের জন্যে বাৎসরিক ব্যয়ের পরিমাণ ১১৬৭ টাকা। বিজ্ঞানের স্নাত-কোত্তর ছাত্রদের সম্পর্কে ঐ বিবরণীতে বলা হয়েছে যে, ১৯১৫-৭৬ সালে ছাত্র-পিছু প্রতি বৎসর ব্যয় হবে ৫৭০০ টাকা। সমাজের এই ঋণ শোধ করবার দায়িত্ব কি বিজ্ঞানীর নেই? সমাজ-জীবনে বিজ্ঞানীর কর্তব্য সম্বন্ধে পর্যালোচনা করবার জন্যে বর্তমান অনুষ্ঠান উপলক্ষে 'বিজ্ঞানীর সামাজিক দায়িত্ব' বিষয়ক একটি আলোচনা-চক্রের আয়োজন করা হয়েছে। অধ্যাপক জ্ঞানেন্দ্রলাল ভাদুড়ী, অধ্যাপিকা অসীমা চট্টোপাধ্যায়, শ্রীনদীয়াবিহারী অধিকারী ডক্টর অমিয়কুমার বসু ও অধ্যাপক সুশীলকুমার মুখোপাধ্যায় এই আলোচনায় যোগদান করবার স্বীকৃতি দিয়ে আমাদের কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন। কৃষি, খাদ্য, স্বাস্থ্য, শিল্প, শিক্ষা প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে বিজ্ঞানীদের দায়িত্বের কথা এঁরা আলোচনা করবেন। আমরা আশা করি, আলোচনাটির ফলে অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আমরা জানতে পারবো এবং গঠনমূলক অনেক প্রস্তাবের আমরা সন্ধান লাভ করবো। এই আলোচনার বিবরণী পরিষদের মুখপত্র 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকায় প্রকাশিত হবে।

পরিষদের উদ্দেশ্য ও আদর্শ

বিজ্ঞানধর্মী বর্তমান যুগে প্রগতির পথের ছাড়-পত্র, বলা বাহুল্য, বিজ্ঞানের জ্ঞান ও তার যথাযথ প্রয়োগ এবং এই বিজ্ঞানকে কেবল বৈজ্ঞানিক গবেষণার মণিকোঠায় বা পাঠ্যপুস্তকের পিঞ্জরে আবদ্ধ করে রাখলে চলবে না, সূর্যের আলোর মত তাকে সর্বত্র ছড়িয়ে দিতে হবে সমাজের সর্বস্তরে—কৃষক, শ্রমিক, মধ্যবিত্ত, সকলের মধ্যে। সেজন্যে বিজ্ঞান ও তার প্রযুক্তিবিদ্যার সঙ্গে দেশের জনসাধারণের পরিচয় করিয়ে দেওয়া এবং দেশের মানস-লোকে একটি বৈজ্ঞানিক চেতনার সৃষ্টি করা—এই হচ্ছে বিজ্ঞান পরিষদের উদ্দেশ্য ও আদর্শ।

বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণের এই যে আদর্শ, জনগণের নিজেদের ভাষার মাধ্যমেই কেবল তার সাফল্যলাভ সম্ভব। অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের নেতৃত্বে পরিষদের প্রতিষ্ঠা-কাল থেকেই সেজন্যে বিজ্ঞানের মাধ্যম হিসাবে মাতৃ-

ভাষাকে পরিষদ বরণ করে নিয়েছে এবং সেই সঙ্গে বিজ্ঞান-শিক্ষার সর্বস্তরেই মাতৃভাষার গুরুত্ব সম্পর্কে পথের নির্দেশ দিয়েছে। আনন্দের কথা, কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ডক্টর ত্রিগুণা সেন, আমাদের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয়কুমার মুখোপাধ্যায় ও শিক্ষামন্ত্রী শ্রীজ্যোতিভূষণ ভট্টাচার্য এবং ভারতের অন্যান্য রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রীগণ—সকলেই শিক্ষার ক্ষেত্রে মাতৃভাষার গুরুত্ব সম্পর্কে অনুরূপ অভিমত প্রকাশ করেছেন।

কার্য-বিবরণী

পরিষদের উদ্দেশ্য ও আদর্শ সিদ্ধির জন্যে নানাবিধ প্রচেষ্টার কথা আপনারা অবগত আছেন। সেগুলি সম্বন্ধে এবার আমি সংক্ষেপে কিছু বলবো।

'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকা

পরিষদের অন্যতম কৃতিত্ব হচ্ছে, গত উনিশ বছর যাবৎ 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' নামক বিজ্ঞানের মাসিক পত্রিকার নিয়মিত প্রকাশ। কিঞ্চিৎ বিলম্বিত হলেও পত্রিকাটির গ্রাহক-সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই পত্রিকার জনপ্রিয়তা বৃদ্ধির জন্যে বিভিন্ন পরিকল্পনা রূপায়ণের চেষ্টাও চলেছে। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, বহু মূল্যবান প্রবন্ধ, বৈজ্ঞানিক তথ্য ও চিত্রাদিতে সজ্জিত হয়ে পত্রিকাটির গত অক্টোবর সংখ্যাটি নব-কলেবরে এই প্রথম শারদীয় সংখ্যা হিসাবে প্রকাশিত হয়েছে। সুখের বিষয়, এই শারদীয় সংখ্যাটি বিজ্ঞানশিক্ষার্থী ও বিজ্ঞানানুরাগীদের বিশেষ সমাদর লাভ করে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষা-বিভাগ পরিষদের নিকট থেকে শারদীয় সংখ্যাটির ১৪০০ কপি ক্রয় করে বিভিন্ন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে বিতরণের ব্যবস্থা করায় পরিষদ তাঁদের নিকট কৃতজ্ঞ।

তবে শুধু একটি বিশেষ সংখ্যাই নয়, বাংলা-ভাষায় বিজ্ঞানের এই একমাত্র মাসিক পত্রিকাটির নিয়মিত সংখ্যার ১৫০০ বা ২০০০ কপি ক্রয় করে বিভিন্ন স্কুল, কলেজ, পাঠাগার প্রভৃতি শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে পাঠাবার জন্যে আমরা রাজ্য-সরকারকে বিশেষ অনুরোধ করি। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা চলে যে, কয়েকটি পত্রিকা সম্পর্কে এরূপ সরকারী ব্যবস্থার প্রচলন বহুদিন থেকেই রয়েছে।

সরকারের নিকট আমাদের আর একটি নিবেদন আছে। 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকা প্রকাশের জন্যে ১৯৪৮ সাল থেকেই সরকার পরিষদকে বাৎসরিক মাত্র ৩৬০০ টাকার সাহায্য করে আসছেন। কিন্তু ইতিমধ্যে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির জন্যে পত্রিকা প্রকাশনের ব্যয় যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে, অথচ সাধারণ পাঠকদের আর্থিক অবস্থার কথা চিন্তা করে পত্রিকাটির মূল্য বৃদ্ধি করা সমীচীন বলে মনে হয় না। এই অবস্থায় পত্রিকাটির নিয়মিত প্রকাশন আর্থিক কারণে ক্রমশঃই দুঃসাধ্য হয়ে উঠছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নিকট আমাদের এই আবেদন যে, তাঁদের বাৎসরিক সাহায্যের পরিমাণ যথোপযুক্ত বৃদ্ধি করে তাঁরা এই জনশিক্ষামূলক পত্রিকাটির ভবিষ্যৎ উজ্জীবিত করুন।

বিজ্ঞান বিষয়ক পুস্তক

বিজ্ঞান বিষয়ক লোকরঞ্জক পুস্তক প্রকাশ ও সেগুলি যথাসম্ভব স্বল্পমূল্যে পরিবেশন করা পরিষদের একটি উল্লেখযোগ্য কাজ। এযাবৎ পরিষদ কর্তৃক এরূপ মোট ২৭ খানা পুস্তক প্রকাশিত হয়েছে। বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণের উদ্দেশ্যে এই সব পুস্তক ব্যয়ানুপাতে অত্যন্ত স্বল্পমূল্যে জন-সাধারণের মধ্যে পরিবেশিত হয়ে থাকে। সেটা সম্ভব হয় এই কারণে যে, পরিষদের পুস্তকগুলি প্রধানতঃ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অর্থ-সাহায্যেই প্রকাশিত হয়; সেজন্যে আর্থিক দায়দায়িত্ব পরিষদের বিশেষ কিছু থাকে না। দেশে বিজ্ঞান

শিক্ষার প্রসার সাধনে পরিষদের এই প্রয়াসে রাজ্যসরকারের এরূপ শুভেচ্ছা ও সাহায্যের জন্যে সরকারকে আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ।

বাংলাভাষায় লোকরঞ্জক পুস্তকই শুধু নয়, বিজ্ঞানের বিবিধ তথ্য ও পরিভাষা সম্বলিত একটি বিজ্ঞানকোষ প্রকাশের পরিকল্পনা গ্রহণ করবার কথাও পরিষদ চিন্তা করছে। ঐ বিজ্ঞানকোষ ৫ বা ৬ খণ্ডে বিভক্ত হবে; পৃষ্ঠাসংখ্যা হবে মোট প্রায় ৩০০০। বাংলাভাষায় বিজ্ঞান-শিক্ষা যখন স্বীকৃত, তখন এরূপ একখানা বিজ্ঞানকোষ প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা সকলেই স্বীকার করেন। এই পরিকল্পনাটি রূপায়ণে যে অর্থ, লোকবল, সংগঠন প্রভৃতির প্রয়োজন, সেই সব বিষয় এখন পরিষদ কর্তৃক আলোচিত হচ্ছে। এরূপ তথ্য-পুস্তক প্রকাশনে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অর্থ-সাহায্যের যে উদার ঐতিহ্য রয়েছে, আমরা আশা করি, বিজ্ঞানকোষ প্রকাশনের পরিকল্পনা গৃহীত হলে আমরাও সেই ঐতিহ্যের ধারা থেকে বঞ্চিত হবো না।

যে কোন দেশের শিক্ষার বনিয়াদ গঠিত হয় দেশের বিদ্যালয়গুলিতে। আমাদের দেশের বিদ্যালয়গুলিতে বিজ্ঞানের যে সব পাঠ্যপুস্তক প্রচলিত আছে, সেগুলির অধিকাংশই বেশ কিছুটা উন্নতির অপেক্ষা রাখে। পরিষদ কর্তৃক অতীতে বিজ্ঞানের কয়েকটি পাঠ্যপুস্তক প্রকাশিত হয়েছিল। পরিষদের পরিচালনায় ও খ্যাতনামা বিজ্ঞানীদের সমবেত প্রচেষ্টায় বিজ্ঞানের আদর্শ পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন ও প্রকাশ করবার যে সম্ভাবনা রয়েছে, এই প্রসঙ্গে তার উল্লেখ করা বোধ হয় অসমীচীন হবে না।

গ্রন্থাগার ও পাঠাগার

বিজ্ঞানবিষয়ক বিভিন্ন পুস্তক ও পত্রিকাদি পাঠে জনসাধারণকে উৎসাহিত করবার উদ্দেশ্যে পরিষদ কর্তৃক একটি গ্রন্থাগার ও পাঠাগার বহুদিন যাবৎ পরিচালিত হচ্ছে। এই গ্রন্থাগারের জন্যে কলিকাতা পৌর সংস্থার শিক্ষাবিভাগ থেকে বাৎসরিক ১৫০০ টাকার সাহায্য আমরা পেয়ে থাকি। কিন্তু দুঃখের বিষয়, গত ৩ বছরের আর্থিক সাহায্য এখনো পর্যন্ত পাওয়া সম্ভব হয় নি। এই আর্থিক সঙ্কটের জন্যে এবং তাছাড়া স্থানাভাবের দরুণও পাঠাগারটির উন্নতিবিধানে আশানুরূপ সাফল্য লাভ করা যায় নি। যাই হোক, আমরা আশা করি, পরিষদের যে নিজস্ব গৃহ নির্মাণের প্রস্তুতি চলেছে, সেই গৃহটি নির্মিত হলে সর্বপ্রকার বৈজ্ঞানিক পুস্তকসমন্বিত একটি গ্রন্থাগার ও আধুনিক ধরণের একটি পাঠাগার স্থাপন করা পরিষদের পক্ষে সম্ভব হবে। বিজ্ঞান বিষয়ক মূল্যবান পাঠ্যপুস্তকাদি সংগ্রহ করতে না পেরে অনেক মেধাবী দরিদ্র ছাত্রের উচ্চশিক্ষার ব্যাঘাত ঘটে। এজন্যে পরিষদের গ্রন্থাগারের একটি পাঠ্যপুস্তক-বিভাগও খোলা হবে এবং বিজ্ঞান বিষয়ক সর্বপ্রকার পাঠ্যপুস্তক তাতে থাকবে—এরূপ একটি পরিকল্পনাও পরিষদের রয়েছে।

বিজ্ঞান-প্রদর্শনী

পরিষদ কর্তৃক আয়োজিত বিজ্ঞান-প্রদর্শনী-গুলির বিষয় আপনারা নিশ্চয় অবগত আছেন। শ্রদ্ধেয়া অবলা বসুর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে গত বছর ফেব্রুয়ারী মাসে যে প্রদর্শনীটি আয়োজিত হয়, কর্মসচিবের গত বছরের বার্ষিক বিবরণীতে সে সম্পর্কে উল্লেখ আছে। পারিতোষিক ও মানপত্র বিতরণের জন্যে যে অনুষ্ঠানের কথা সেই বিবরণীতে ঘোষণা করা হয়েছিল, সেই অনুষ্ঠান পরে সুষ্ঠুভাবে প্রতিপালিত হয়েছে।

যাই হোক, এই ধরণের প্রদর্শনী বিশেষ জনপ্রিয় হলেও এদের জীবনকাল অত্যন্ত সীমিত। সেজন্যে পরিষদের নিজস্ব গৃহ নির্মিত হলে একটি স্থায়ী প্রদর্শনী ও সেই সঙ্গে একটি 'খেয়াল খুশী কেন্দ্র' স্থাপনের পরিকল্পনাও পরিষদের রয়েছে।

ঐ খেয়াল-খুশী কেন্দ্রে ছাত্র-ছাত্রীরা নিজেদের হাতে বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি তৈরি করে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যায় উৎসাহ লাভ করবে।

বিজ্ঞান বিষয়ক বক্তৃতা

বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ে নিয়মিতভাবে লোক-রঞ্জক বক্তৃতাদানের ব্যবস্থার জন্যে পরিষদের পরিকল্পিত গৃহে একটি বক্তৃতা-কক্ষও নির্মিত হবে। তবে বিজ্ঞান-শিক্ষার প্রাথমিক স্তরে বিজ্ঞান-শিক্ষার্থীরা যদি পরিষদের নিকট না আসে, তাহলে পরিষদকেই তাদের নিকট গিয়ে উপস্থিত হতে হবে এবং সেই কাজ ইতিমধ্যেই সুরু হয়ে গিয়েছে। স্কুল, কলেজ, পাঠাগার প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানে শিক্ষামূলক লোকরঞ্জক বক্তৃতা দানের আয়োজন করা হয়েছে। ঐ সব বক্তৃতার বিষয়বস্তু হলো—অণু-পরমাণুর জগৎ, টেলিভিসন, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কাহিনী, মহাকাশ অভিযান ইত্যাদি। বক্তৃতায় নতুন নতুন বিষয়বস্তু সম্পর্কে আলোচনা করবার জন্যে এবং নতুন বক্তাদের বক্তৃতায় পারদর্শিতা করবার উদ্দেশ্যে প্রতি শুক্রবার সন্ধ্যায় পরিষদের কার্যালয় কক্ষে একটি আলোচনা-চক্রের ব্যবস্থা করা হয়েছে। আলোচ্য বক্তৃতাগুলিকে অধিকতর মনোজ্ঞ করবার জন্যে স্লাইড সহযোগে আলোকচিত্র এবং আনুষঙ্গিক বিষয়ে চলচ্চিত্র প্রদর্শনেরও ব্যবস্থা আছে।

বর্তমান বছরে এই পর্যায়ের প্রথম বক্তৃতাটি অনুষ্ঠিত হয় ১৮ই মার্চ; স্থান—বাগবাজার বহুমুখী বালিকা বিদ্যালয়। অত্যন্ত আনন্দের কথা, শহর কলকাতা বা শহরতলী থেকেই শুধু নয়, কলকাতার বাইরে বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলেও এইরূপ বক্তৃতার আয়োজন করবার জন্যে পরিষদকে অনুরোধ করা হচ্ছে। একথা আমরা জানি যে, কলকাতা থেকেও বাংলাদেশের অন্যান্য শহরে, বিশেষতঃ গ্রামাঞ্চলে বিজ্ঞান প্রচারের অধিকতর প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। কারণ রবীন্দ্র-নাথের ভাষায় বলতে গেলে 'কেবল মুখেই যদি রক্তসঞ্চার হয়, তবে তাহাকে স্বাস্থ্য বলা যায় না।' কিন্তু ম্যাজিক লণ্ঠন, ফিল্ম প্রজেক্টর প্রভৃতি যন্ত্র-পাতিসহ যাতায়াতের অসুবিধার জন্যে কলকাতার বাইরে বক্তৃতার যথেষ্ট ব্যবস্থা করা এখনো সম্ভব হয় নি। যন্ত্রপাতি পরিবহনযোগ্য একখানা গাড়ী সংগ্রহ করবার ব্যাপারে আপনাদের সকলের সহযোগিতা পেলে এই অত্যাবশ্যক কাজটি আমরা অচিরেই সুরু করতে পারবো।

পরলোকগত বিজ্ঞানী ও সুসাহিত্যিক রাজশেখর বসু মহাশয়ের প্রদত্ত দানের অর্থে পরিষদ কর্তৃক প্রতি বছর 'রাজশেখর বসু স্মৃতি বক্তৃতা' নিয়মিতভাবে আয়োজিত হচ্ছে। বর্তমান বছরে এই বক্তৃতা দান করবেন শ্রীইন্দুভূষণ চট্টোপাধ্যায়। বিষয়বস্তু: ভারতের গো-মহিষ ও তাদের পুষ্টি-সমস্যা। আমাদের কৃষি ও খাদ্যসমস্যার কথা স্মরণ করে ঐ বিষয়বস্তু নির্ধারিত হয়েছে। আগামী ১২ই মে, '৬৭ শুক্রবার অপরাহ্ণ ৫-৩০টার সময় ৯২, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোডস্থ সাহা ইন-ষ্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার ফিজিক্স-এর বক্তৃতা-কক্ষে উক্ত বক্তৃতাটির আয়োজন করা হচ্ছে। সেই সভায় যোগদান করবার জন্যে আপনাদের সকলকে সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

নূতন দিগন্ত

আমাদের দেশের সমাজ-জীবনে আধুনিক যুগোপযোগী একটা পরিবর্তনের আগ্রহ আজ সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। বিজ্ঞানের দৌলতে জ্ঞানের পরিধি যত বৃদ্ধি পাচ্ছে, ততই এক উন্নততর জীবনের জন্যে দেশবাসী উন্মুখ হয়ে উঠছে এবং তদনুরূপ সমাজব্যবস্থা গঠনের জন্যে উত্তরোত্তর সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করছে। এই যে এক নতুন দিগন্তের আজ আভাস পাওয়া যাচ্ছে, তার পরিপ্রেক্ষিতে বিজ্ঞান পরিষদের মত জনশিক্ষামূলক

প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব ও অধিকার বহুলাংশে প্রশস্ত হয়ে পড়ছে। এই সব দায়িত্বের কথা আমার বক্তব্যের মধ্য দিয়ে আমি আপনাদের সামনে সংক্ষেপে উপস্থাপিত করেছি। আমরা আশা করি, আপনাদের আলোচনা ও সমালোচনার মধ্য দিয়ে আমাদের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা দৃঢ়তর হবে। অপরপক্ষে মনে রাখতে হবে যে, এই পরিষদ মূলতঃ বাংলাদেশের জনসাধারণের প্রতিষ্ঠান, আপনাদের সকলের প্রতিষ্ঠান। সুতরাং আপনাদের শুভেচ্ছা ও সক্রিয় সহযোগিতার উপর পরিষদের কিছুটা অধিকার আছে বললে বোধ করি অন্যায় হবে না।

আপনারাও যে পরিষদের অধিকার সম্বন্ধে সচেতন, তার প্রমাণ হচ্ছে—আপনারা ধৈর্য সহকারে কর্মসচিবের নিবেদন এতক্ষণ শুনেছেন। সেজন্যে আপনাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য এইখানে শেষ করছি। ইতি

কলিকাতা জয়ন্ত বসু
৫ই মে, ১৯৬৭ কর্মসচিব,
বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

[ঊনবিংশতিতম প্রতিষ্ঠা-দিবসে আয়োজিত আলোচনা-চক্রে যাঁরা অংশগ্রহণ করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে ডক্টর অসীমা চট্টোপাধ্যায়, শ্রীনদীয়াবিহারী অধিকারী, ডক্টর সুশীলকুমার মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি কয়েক জনের বক্তব্য বিষয় তাঁদের স্বলিখিত প্রবন্ধ হিসাবে প্রকাশিত হলো। —সঃ]

ভারতীয় সমাজ-জীবনে ভেষজ-বিজ্ঞানের ভূমিকা

অসীমা চট্টোপাধ্যায়

মানব-সভ্যতার ক্রমবিকাশে ভেষজ-বিজ্ঞান সুপ্রাচীন কাল থেকে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে এসেছে। প্রাগৈতিহাসিক মানুষ জীবন-ধারণের তাগিদে যেমন শস্য উৎপাদনের পদ্ধতি আবিষ্কার করেছিল, তেমনি জরা, ব্যাধি ও মৃত্যুর কবল থেকে আত্মরক্ষার প্রয়োজনে লতাগুল্ম ও বৃক্ষাদির মধ্যে খুঁজে বের করেছে নানাবিধ ভেষজ। পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও প্রয়োগলব্ধ অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে মানুষ বহু বনৌষধির সন্ধান পেয়েছে। জনকল্যাণমূলক এই মহান ব্রত সাধনে ভারতবর্ষ যে এক সময়ে সারা বিশ্বে অন্যতম পুরোধার ভূমিকা গ্রহণ করেছিল, প্রাচীন ভারতের মনীষীদের গবেষণালব্ধ তথ্যাদি সম্বলিত বিভিন্ন প্রামাণিক আয়ুর্বেদীয় গ্রন্থাবলী আজও তার সাক্ষ্য বহন করছে। চরক ও সুশ্রুত সংহিতার কাল থেকে বৌদ্ধযুগ পর্যন্ত ভারতবর্ষ চিকিৎসা-বিজ্ঞানে এক গৌরবময় অধ্যায় রচনা করেছিল। এমন, একদিন ছিল, যখন ভেষজের ক্ষেত্রে ভারত যে কেবল স্বয়ম্ভরই ছিল তা নয়, পৃথিবীর পণ্যের বাজারেও ছিল ভারতের ভেষজ একটি গুরুত্বপূর্ণ রপ্তানী দ্রব্য। ভারতীয় ভেষজ যে বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা আহরণ করতো, স্বভাবতঃই তা ছিল বহু দেশের ঈর্ষা ও আতঙ্কের কারণ। বিশিষ্ট রোমান রাজনীতিবিদ প্লিনি তাই দুঃখ করে বলেছিলেন—ভেষজের পরিবর্তে রোম থেকে যে পরিমাণ সোনা ভারতে চলে যাচ্ছে, তার ফলে রোমের অর্থনীতিতে দেখা দেবে এক গভীর সঙ্কট।

পরবর্তী কালে পরাধীন ভারতবর্ষ বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের দুর্বার গতিশীলতার সঙ্গে আপন মানসিকতার নিবিড় যোগসূত্র স্থাপন করতে না পারায় সেই গৌরবময় ঐতিহ্যকে সংরক্ষণ করতে পারে নি। যে আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসা-পদ্ধতি একদিন সারা বিশ্বে শ্রদ্ধার আসন লাভ করেছিল, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী আরোপ করে তাকে যুগোপযোগী করতে না পারায় তার সার্বজনীনতা উত্তরোত্তর হ্রাস পেয়ে গেল। একটা সঙ্কীর্ণ সীমাবদ্ধ গণ্ডীর মধ্যে আয়ুর্বেদ তাই আশানুরূপ প্রসার লাভ করতে পারে নি। কিন্তু ভেষজ-বিজ্ঞানের জয়যাত্রা আদৌ থেমে যায় নি। পৃথিবীর অন্যান্য দেশ জৈব রসায়ন, উদ্ভিদ-বিজ্ঞান, শারীরবিদ্যা, আধুনিক চিকিৎসা-বিজ্ঞান এবং প্রধানতঃ যন্ত্র-বিজ্ঞানের সহায়তায় ভেষজ-বিজ্ঞানের প্রভূত উন্নতিসাধন করেছে। দুঃখের বিষয়, ভারতবর্ষ এই উন্নতির সম্যক অংশীদার হতে পারে নি।

ভারতবর্ষ রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন করেছে সত্য, কিন্তু এখনও পরনির্ভরশীলতার গ্লানি কাটিয়ে উঠতে পারে নি। তাই ভারতীয় সমাজ-ব্যবস্থায় আজও রয়ে গেছে পুরনো ব্যবস্থার অবশেষ। তিনটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা শেষ হবার পরেও শিল্পক্ষেত্রে আমরা ঈপ্সিত লক্ষ্যের কাছাকাছিও পৌঁছুতে পারি নি। জাতীয় সম্পদের অসম বন্টনের ফলে জনসাধারণের জীবন ও জীবিকার অনিশ্চয়তার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হিসাবে সমাজ-জীবনে বহুবিধ দুরারোগ্য ব্যাধির প্রাবল্য ক্রমেই বেড়ে চলেছে। শ্রমের তুলনায় উপযুক্ত পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবে ক্ষয়-রোগাক্রান্ত জনসাধারণের এক বিরাট অংশ সমগ্র জাতিকে এক চরম অবক্ষয়ের পথে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। উদ্‌ভ্রান্ত, অনিয়মিত জীবনধারার পরিণতি হিসাবে ভারতীয় জনসাধারণের শতকরা প্রায় ৮০ ভাগ লোক কোন না কোন যকৃতের রোগ, বাত, অালসার, কোলাইটিস অথবা ক্রনিক অ্যামিবায়োসিসে ভুগছে। গ্রামাঞ্চলে ম্যালেরিয়া এবং কালাজ্বরের প্রকোপ এখনও দূরীভূত হয় নি। কলেরা, বসন্ত এখনও প্রতি বছর কোন কোন স্থানে মহামারীরূপে দেখা দিচ্ছে। নানা প্রকার মনোবিকৃতিজনিত ব্যাধি ও উন্মাদরোগের প্রাবল্য ভারতীয় সমাজ-জীবনে উত্তরোত্তর বেড়েই যাচ্ছে। কুষ্ঠ, ধবল এবং নানাপ্রকার চর্মরোগীর সংখ্যাও কম নয়। এছাড়া মেনিন্‌জাইটিস, নিউমোনিয়া, ডায়াবেটিস, নানা ধরণের হৃদ্‌রোগ, ক্যান্সার এবং নানা ভাইরাসজনিত দুরারোগ্য ব্যাধি আমাদের সমাজে আজ অতি সাধারণ রোগে পর্যবসিত হয়েছে।

এই সব রোগ নিরাময়ের জন্যে আমরা প্রধানতঃ সংশ্লেষণজাত ঔষধই (Synthetic Drugs) ব্যবহার করে থাকি। শিল্পায়নে অনগ্রসরতার ফলে এই সব কৃত্রিম ঔষধের অধিকাংশই আমাদের বিদেশ থেকে আমদানী করতে হয়। এর জন্যে ভারতকে কোটি কোটি বৈদেশিক মুদ্রা অর্থাৎ সোনা ব্যয় করতে হয়। তারই কয়েকটি ভেষজ ও সংশ্লেষণজাত ঔষধের তালিকা নীচে দেওয়া হলো।

১নং পরিসংখ্যান সারণী
ভেষজ ঔষধ

ঔষধের নাম

১। ষ্ট্রিকনিন
২। রেসারপিন
৩। ক্যাফিন ও ক্যাফিন জাতীয় ঔষধ
৪। এফিড্রিন ও এফিড্রিন হাইড্রোক্লোরাইড
৫। স্যানটোনিন
৬। কুইনিন ও কুইনিন জাতীয় ঔষধ
৭। সিঙ্কোনা উপক্ষার (Cinchona alkaloids)
৮। আফিং উপক্ষার
৯। এমিটিন (Emetine)

১০। ডিজিটেলিসের গ্লাইকোসাইডস্ (Digitalis)
১১। আরগট উপক্ষার ও আরগট জাতীয় ঔষধ
১২। স্কোপোলামিন
১৩। ভিটামিন-পি
১৪। পেপেইন
১৫। কোকেন
১৬। অ্যাট্রোপিন সালফেট

সংশ্লেষণজাত ঔষধ ও অ্যান্টিবায়োটিক্স

১। পেনিসিলিন
২। ক্লোরামফেনিকল
৩। এরিথ্রোমাইসিন
৪। অক্সিটেট্রাসাইক্লিন
৫। স্ট্রেপটোমাইসিন
৬। টাইরোথ্রিসিন
৭। অন্যান্য অ্যান্টিবায়োটিক্স

গন্ধকজাতীয় ঔষধ (Sulpha Drug)

১। থ্যালিল সালফাথায়াজল
২। " সালফাডাইমেটিন
৩। সালফাসিটামাইড
৪। সালফ আইসোঅক্সাজোল
৫। সালফাগোয়ানিডিন
৬। সালফানিলামাইড
৭। সালফাথায়াজল
৮। সালফাডায়াজিন
৯। সালফামেরাজিন
১০। অন্যান্য গন্ধক জাতীয় ঔষধ

যক্ষ্মা-প্রতিষেধক ঔষধ

১। পি এ. এস (প্যাস) ও তার লবণ
২। আই এন. এইচ. (আইসোনিকোটিনিক হাইড্রাজাইড)

কুষ্ঠ প্রতিষেধক ঔষধ

১। ডি. ডি. এস. এবং ডি. ডি. এস. জাতীয় ঔষধ (সালফোন জাতীয় ঔষধ)
২। থায়োএসিটাজোন

আমাশয়-প্রতিষেধক ঔষধ

১। আয়োডোক্লোরো এবং ডাই আয়োডো-হাইড্রক্সি কুইনোলিন
২। কারবারসোন

ম্যালেরিয়া-প্রতিষেধক ঔষধ

১। ক্লোরোকুইন এবং ক্লোরোকুইন ফস্ফেট
২। অ্যামোডায়াকুইন
৩। ডারাপ্রিন

ভিটামিন

১। ভিটামিন-এ
২। নিকোটিনিক অ্যাসিড এবং নিকোটিনামাইড
৩। ভিটামিন বি$_১$, বি$_২$, বি$_৬$, বি$_{১২}$
৪। ফোলিক অ্যাসিড
৫। ভিটামিন-সি
৬। " কে
৭। " ডি
৮। " ই

ডায়াবেটিস-প্রতিষেধক ঔষধ

১। ইনস্থলিন
২। কারবুটামাইড
৩। টলবুটামাইড
৪। ক্লোরোপ্রোপামাইড

অ্যানালজেসিক্স, অ্যান্টিপাইরেটিক্স প্রভৃতি যন্ত্রণানাশক ঔষধ

১। স্যালিসাইলিক অ্যাসিড, অ্যাসপিরিন
২। সোডিয়াম স্যালিসাইলেট
৩। ফেনাসেটিন
৪। অ্যামিডোপাইরিন
৫। ফিনাইল বিউটাজোন

অ্যানথেলমিনটিক্স

(ক্রিমি ও ক্রিমি-জাতীয় পোকা-বিনাশক ঔষধ)

১। পাইপেরাজিন, অ্যাডিপেট

কাইলেরিয়া-প্রতিবেধক ঔষধ

১। ডাই-ইথাইল কার্বামাজিন সাইট্রেট

কার্ডিয়াক ষ্টেবিলাইজার

১। নিকেথামাইড

অ্যান্টিকোয়াগুলেন্টস্

১। অ্যাসিনোকুমানল

২। ইথাইল বিস-কুমাসিটেট

অ্যানাস্থেটিক্স

জ্ঞানলোপকারী রাসায়নিক দ্রব্য

১। ইথার

২। ক্লোরালহাইড্রেট

৩। ইথাইল ক্লোরাইড

৪। ক্লোরোফর্ম

৫। প্রোকেইন হাইড্রোক্লোরাইড

৬। জাইলোকেইন

৭। ফেনোবারবিটোন ও ফেনোবারবিটোন সোডিয়াম

অ্যান্টিহিষ্টামিনিক্স

১। ডাইফিনাইল হাইড্রামিন হাইড্রোক্লোরাইড

২। বুক্লিজিন

৩। ক্লোরোসাইক্লিজিন হাইড্রোক্লোরাইড

৪। মেক্লোজিন

৫। সাইক্লিজিন হাইড্রোক্লোরাইড

৬। মেপাইরামিন ম্যালিয়েট

৭। প্রোমেথাজিন ও প্রোমেথাজিন হাইড্রোক্লোরাইড

৮। সিনোপেন

সিমপ্যাথোমিনেটিক্স ও অ্যান্টিরিউম্যাটিক্স

১। আইসোপ্রেনালিন সালফেট

২। মেফেনটারমিন সালফেট

৩। ডাইমিথাইল অ্যাম্ফিটামিন

ট্র্যাঙ্কুইলাইজারস্

১। হাইড্রক্সিজিন হাইড্রোক্লোরাইড

২। মেপ্রোবামেট

৩। নিয়ালামাইড

৪। প্রোমাজিন

৫। ক্লোরোপ্রোমাজিন হাইড্রোক্লোরাইড

এর জন্যে প্রতি বছর আমাদের কি পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা খরচ হচ্ছে, নিম্নবর্ণিত ২নং পরিসংখ্যান সারণী থেকে তার কিছুটা ধারণা করা যেতে পারে।

২নং পরিসংখ্যান সারণী

ঔষধের নাম	১৯৬৫-৬৬ সালে আমদানীজাত ঔষধের দাম
(ক) গন্ধক জাতীয় ঔষধ	১৩৬৮৭৪৯৯·০০ টাকা
(খ) অ্যান্টিবায়োটিক্স	২২৫৭১১৩০·০০ ,,
(গ) যক্ষ্মা-প্রতিষেধক	৭৮৭৬৯৯·০০ ,,
(ঘ) ভিটামিন জাতীয় ঔষধ	৫৯৬৫৫৭২·০০ ,,
(ঙ) ম্যালেরিয়া-প্রতিবেধক	১৫৮৪৯৬৩·০০ ,,
(চ) ডায়াবেটিস-প্রতিবেধক	৯২৩৭০৮·০০ ,,

অত্যন্ত দুঃখের বিষয় এই যে, আধুনিক চিকিৎসা-পদ্ধতির একপেশে চিন্তাধারার ফলে রোগ নিরাময়ে ভেষজ ঔষধের প্রচলন ক্রমে ক্রমে অবলুপ্ত হতে বসেছে এবং এখনও যে পরিমাণ ভেষজ আমরা ব্যবহার করে থাকি, তারও এক বৃহৎ অংশ কোটি কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময়ে বিদেশ থেকে আমদানী করা হচ্ছে, যদিও এই সব ঔষধ নিষ্কাশনের জন্যে যথেষ্ট কাঁচামাল আমাদের দেশেই রয়েছে। নিম্নে বর্ণিত ৩নং আংশিক পরিসংখ্যান সারণী থেকে এই বিষয়ে একটা মোটামুটি আন্দাজ পাওয়া যায়।

৩নং পরিসংখ্যান সারণী

ভেষজের নাম		১৯৬৫-৬৬ সালে আমদানীজাত ঔষধের মূল্য
(ক) ক্যাফিন ও ক্যাফিন জাতীয় ঔষধ	...	৯৫৬৭৫৫০'০০ টাকা
(খ) এফিড্রিন ও এফিড্রিন হাইড্রোক্লোরাইড	...	৭২২৫৪'০০ ,,
(গ) কুইনিন ও কুইনিন জাতীয় ঔষধ এবং অন্যান্য সিঙ্কোনা উপক্ষার	...	১২৩৯৬'০০ ,,
(ঘ) আফিং এবং আফিং উপক্ষার	...	১৫৭০৭ ০০ ,,
(ঙ) আরগট উপক্ষার	...	৩৩৯০৯০ ০০ ,,
(চ) ভিটামিন-পি	...	১৫৫৭৬'০০ ,,
(ছ) পেপেইন	...	১৭৬১০'০০ ,,

এখানে সামান্য কয়েকটির হিসাব দেওয়া হলো এবং এর দাম প্রায় সাড়ে ছয় কোটি টাকা। অবশ্য তার পরিমাণ দাঁড়াচ্ছে দশ কোটি (বর্তমান মুদ্রামান হ্রাসের জন্যে)। ভারতবর্ষ আজ এক গভীর অর্থনৈতিক সঙ্কটে জর্জরিত। এই সঙ্কটের সমাধানকল্পে আমাদের এক আত্ম-নির্ভরশীল অর্থনৈতিক বনিয়াদ গড়ে তোলা প্রয়োজন। এর জন্যে বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে কর্তব্য হিসাবে বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় কমিয়ে সম্ভাব্য ক্ষেত্রে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের ব্যবস্থা করা বাঞ্ছনীয়। এইরূপ অর্থনৈতিক সঙ্কটের পরিপ্রেক্ষিতে তাই ভারতীয় চিকিৎসা-পদ্ধতিরও আমূল পরিবর্তন সম্বন্ধে আমাদের চিন্তা করতে হবে। রোগ নিরাময়ে কৃত্রিম সংশ্লেষণজাত ঔষধের একচেটিয়া প্রয়োগের পরিবর্তে ভারতীয় ভেষজের ব্যাপক প্রচলনের দ্বারা আমাদের অর্থনৈতিক সঙ্কটের আংশিক সমাধান করা যায়। ভারতবর্ষের বিস্তৃত বনরাজির লতা-গুল্ম ও বৃক্ষাদির অমূল্য খনি থেকে আজও বহু যুগান্তকারী ভেষজ আহরণ করবার উজ্জ্বল সম্ভাবনা রয়েছে—শুধু তাই নয়, সারা বিশ্বের বিজ্ঞানীরা এই রত্নখনি থেকে রত্ন আহরণে ভারতব্যাপী অভিযান চালিয়ে যাচ্ছেন। এই সম্ভাবনাকে সফল রূপ দেবার জন্যে এক সুনির্দিষ্ট ও সুচিন্তিত পরিকল্পনা অবিলম্বে গ্রহণ করা উচিত। তার জন্যে ভারতের যাঁরা ভাগ্যনির্ণায়ক, তাঁদের আপ্রাণ চেষ্টা করতে হবে।

স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, বর্তমান যুগে যে সমস্ত কৃত্রিম ঔষধ রোগ নিরাময়ে অভাবনীয় বিস্ময় সৃষ্টি করেছে, তাদের আবিষ্কারের মূলে রয়েছে ভেষজ-বিজ্ঞানের এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। তাই ভেষজ-বিজ্ঞানের ব্যাপক প্রচলন ভাবীকালের বহু যুগান্তকারী কৃত্রিম ঔষধ আবিষ্কারের পথ খুলে দেবে, এরূপ আশা করা মোটেই অহেতুক

নয়। যে সব ক্ষেত্রে কৃত্রিম ঔষধ ভেষজ অপেক্ষা অধিকতর ক্রিয়াশীল এবং যে সমস্ত ক্ষেত্রে কৃত্রিম ঔষধের পরিবর্তে কোন যোগ্য ভেষজ আজও আবিষ্কৃত হয় নি, সে সব ক্ষেত্রে কৃত্রিম ঔষধ অবশ্যই প্রয়োগ করতে হবে এবং এই সব ঔষধ যাতে আমাদের দেশেই তৈরি করা যায়, সে বিষয়ে দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। সৌভাগ্যবশতঃ এই বিষয়ে আমরা বিগত কয়েক বছরের প্রচেষ্টায় কিঞ্চিৎ সাফল্য লাভে সক্ষম হয়েছি। সম্প্রতি প্রকাশিত পরিসংখ্যানে (ষ্টেট্‌স্‌ম্যান পত্রিকা, ২রা মে, ১৯৬৭) দেখা যায় যে, কিছুসংখ্যক কৃত্রিম ঔষধ উৎপাদনে আমরা মোটামুটি আত্মনির্ভরশীল হতে পেরেছি। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে, পেনিসিলিন, ক্লোরামফেনিকল, ভিটামিন-এ ও বি$_{১২}$, নিয়াসিন, নিয়াসিন অ্যামাইড, ইনসুলিন, করটিকোষ্টেরয়েড শ্রেণীর প্রেড্‌নিসোন, প্রেড্‌নিসোলোন, করটিসোন, হাইড্রোকরটিসোন, মিথাইলটেষ্টোষ্টেরোন, আই. এন. এইচ. এবং থিয়াসিটোনোন প্রভৃতি কৃত্রিম ঔষধ বর্তমানে বিদেশ থেকে খুব সামান্য পরিমাণেই আমদানী করতে হচ্ছে। কৃত্রিম ঔষধ উৎপাদন শিল্পের সামগ্রিক বিচারে দেখা যায় যে, তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার প্রারম্ভিক বছরে ও ১৯৪৮ সালে ভারতে যথাক্রমে ১০ ও ১২ কোটি টাকা মূল্যের কৃত্রিম ঔষধ উৎপন্ন হতো—তা ১৯৬৬ সালে এসে দাঁড়িয়েছে ১৭৫ কোটি টাকায়। আশাব্যঞ্জক হলেও এই অগ্রগতি উপরিউক্ত ঔষধের ক্ষেত্রেই এখনও সীমাবদ্ধ। আরও বহুবিধ কৃত্রিম ঔষধ-শিল্পায়নের ক্ষেত্রে এখনও আমরা আত্মনির্ভরশীল হতে পারি নি। এই সব কৃত্রিম ঔষধ উৎপাদনের সহায়ক হিসাবে উপযুক্ত রসায়ন শিল্পের প্রসারের একান্ত প্রয়োজন।

বহু গবেষণা ও অভিজ্ঞতার মাধ্যমে দেখা গেছে যে, অনেক কৃত্রিম ঔষধ সাময়িকভাবে অপূর্ব ফলদায়ক হলেও একই রোগীর উপর অধিক কাল প্রয়োগের ফলে রোগ প্রতিষেধক বা প্রতিরোধক ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। কিন্তু এই সব ক্ষেত্রে অনেক ভেষজ-দ্রব্য কৃত্রিম ঔষধের তুলনায় সাময়িকভাবে কম ক্রিয়াশীল হলেও দীর্ঘস্থায়ী রোগ প্রতিষেধক ক্ষমতার অধিকারী বলে প্রমাণিত হয়েছে। যেমন ছোট চাঁদর ও বড় চাঁদর (১নং চিত্র)—এর ভেষজগুণ মানসিক ব্যাধি প্রশমনে অপূর্ব ফলদায়ক। সিঙ্কোনা গাছ থেকে নিষ্কাশিত ভেষজ আর এক জলন্ত প্রমাণ। এক সময়ে আমাদের দেশে সিঙ্কোনার ব্যাপক চাষ করা হতো এবং সিঙ্কোনাজাত ভেষজ-দ্রব্য বিদেশে রপ্তানী করে আমরা প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করতাম। পরবর্তী কালে নতুন নতুন সংশ্লেষণজাত ম্যালেরিয়া-প্রতিষেধক (Synthetic antimalarials) প্রস্তুতির ফলে সিঙ্কোনার কদর কমে গেল। আমাদের সিঙ্কোনার চাষ অনেক কমিয়ে দিতে হলো। কিন্তু বর্তমানে কৃত্রিম ম্যালেরিয়া-প্রতিষেধকের তুলনায় সিঙ্কোনাজাত ভেষজের উৎকর্ষ প্রমাণিত হওয়ায় ভারতবর্ষে সিঙ্কোনা (২নং চিত্র) চাষের এক বিরাট সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। এছাড়া সিঙ্কোনা থেকে উপজাত দ্রব্য কুইনিডিন সালফেট দ্রবণ হিসাবে হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া নিয়মিত করবার কাজে বিশেষ ফলপ্রদ বলে প্রমাণিত হয়েছে। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে কৃত্রিম ঔষধ অধিক ব্যবহারের ফলে রোগীর দেহে তীব্র বিষক্রিয়া (Toxic effect) ও অন্যান্য ক্ষতিকারক উপসর্গের সৃষ্টি হয়। গন্ধক জাতীয় বহু কৃত্রিম ঔষধ এই প্রকার দোষে দুষ্ট। ভেষজ-দ্রব্যে এই ধরণের ক্ষতিকারক প্রভাব বিশেষ পরিলক্ষিত হয় না।

অভিজ্ঞতার মাধ্যমে আরও প্রমাণিত হয়েছে যে, অতি পুরাতন অপাঙ্‌ক্তেয় আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসা-পদ্ধতি বহু দুরারোগ্য ব্যাধি নিরাময়ে এমন বিস্ময়কর ভেষজের সন্ধান দিয়েছে, যার সমকক্ষ

কোন কৃত্রিম ঔষধ আজও আধুনিক চিকিৎসা-বিজ্ঞান আবিষ্কার করতে সক্ষম হয় নি। তাই আধুনিক চিকিৎসা-পদ্ধতির সর্বপ্রথম কর্তব্য হচ্ছে, সর্বপ্রকার গোঁড়ামির উর্ধ্বে থেকে ব্যবহৃত ঔষধের মূল্যমান নির্ধারণ করা এবং এই আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসা-পদ্ধতির বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে আধুনিকীকরণ এবং তাথেকে প্রাপ্ত অভিজ্ঞতার সঙ্গে জৈব রসায়ন ও শারীরবিদ্যার সাহায্যপুষ্ট আধুনিক চিকিৎসা-বিজ্ঞানের পরীক্ষা-নিরীক্ষালব্ধ তত্ত্বের নিবিড় সমন্বয় সাধন করা। তাই

১নং চিত্র
বড় চাঁদর

কাজ সঠিকভাবে পরিচালিত হলে দেখা যাবে যে, ভারতের সমাজ-জীবনে যে সব সাধারণ রোগ পরিলক্ষিত হয়, তা নিরাময়ে দেশীয় ভেষজ এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণে সক্ষম। আবার ভেষজ-দ্রব্যের মূল্যমান নির্ধারণের জন্যে প্রয়োজন, উপেক্ষিত আয়ুর্বেদজ্ঞ, জৈব রাসায়নিক, উদ্ভিদ ও শারীর-বিজ্ঞানী এবং আধুনিক চিকিৎসা-বিজ্ঞানীদের এক সুসংগঠিত সংস্থার নিরলস কর্মযজ্ঞের মাধ্যমেই কেবলমাত্র জনকল্যাণে ভেষজ-বিজ্ঞানের বিরাট সম্ভাবনাকে সঠিকভাবে বাস্তবায়িত করা যায়। এইরূপ একটি ঐক্যবদ্ধ সংগঠনের মাধ্যমে

ইতিপূর্বে আবিষ্কৃত ভেষজের পূর্ণ মূল্যায়ন করবার সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষের বিশাল বনসম্পদ থেকে বিধিবদ্ধ ব্যাপক অনুশীলনের দ্বারা নতুন নতুন ভেষজ আবিষ্কার করে ভারতীয় চিকিৎসা-পদ্ধতিতে আমুল পরিবর্তন সাধন করা সম্ভব। সকল উন্মেষে এই পরিকল্পনা বিশেষ সহায়ক হতে পারে। তাই ভেষজ-বিজ্ঞানের এইরূপ সংগঠিত প্রকল্পের সফল রূপায়ণের মাধ্যমে ভারতবর্ষ একদিকে যেমন চিকিৎসা-ক্ষেত্রে আত্মনির্ভরশীল হতে পারে এবং উন্নততর পদ্ধতির সাহায্যে
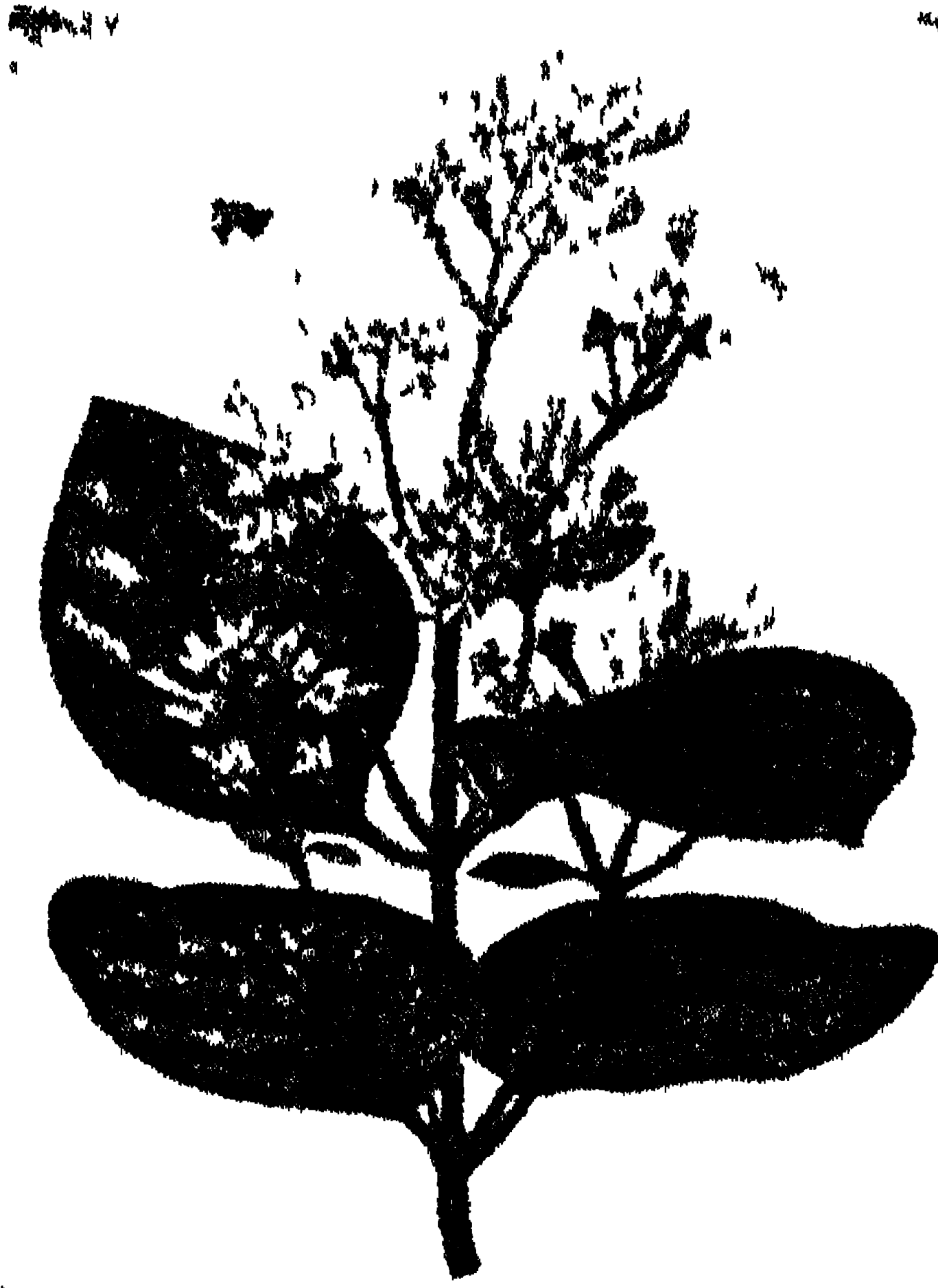
২নং চিত্র
সিঙ্কোনা

ভেষজের বৃহদাকার উৎপাদনের জন্যে যে সব গাছগাছড়া থেকে এই সব ঔষধ নিষ্কাশিত করা হবে, তাদের ব্যাপক চাষের ব্যবস্থা করা। এর জন্যে যে বিশাল লোকশক্তির প্রয়োজন, তাতে ভারতের জনসংখ্যার এক বৃহৎ অংশের কর্ম-সংস্থান করা সম্ভব। তাছাড়া ভেষজ-বিজ্ঞান সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিযুক্ত বহু বৈজ্ঞানিক প্রতিভার নিষ্কাশিত দেশীয় ভেষজ রপ্তানী করে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করতে পারে, তেমনি যে বেকার সমস্যা আজ এক গভীর জাতীয় সমস্যারূপে দেখা দিয়েছে, তারও আংশিক সমাধান করতে সক্ষম।

এভাবেই জাতীয় জীবনে এবং সমাজকল্যাণ-কর কাজে রসায়ন-বিজ্ঞানীদের কর্তব্য ও দায়িত্ব

যথেষ্টই আছে এবং তার সঙ্গে অন্যান্য বিজ্ঞানীদের সমবেত চেষ্টা এবং সহযোগিতারও প্রয়োজন রয়েছে। লেখিকার অভিমত এই যে, দেশের যাঁরা নেতা ও কর্ণধার, তাঁরা যদি অভিজ্ঞ, বহুদর্শী বিজ্ঞানীদের সাহায্য গ্রহণ করেন এবং তাঁদের পরামর্শে কৃষি শিল্প বা ভেষজ ও সংশ্লেষণজাত ঔষধের শিল্প প্রতিষ্ঠান গঠন এবং তাদের প্রসারের চেষ্টা করেন, তাহলে দেশের প্রকট এবং গুরু-সমস্যার সমাধান কিছু হতে পারে। তবে প্রশ্ন হচ্ছে, বিজ্ঞানীরা সব সময়েই সাহায্য করতে প্রস্তুত, তাঁরা হাতে-কলমে কাজ করতে আগ্রহী, দেশের আহ্বানে তাঁরা আত্মোৎসর্গ করতে বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করবেন না, কিন্তু তাঁদের আমন্ত্রণ করছে কে?

সবশেষে জানাই আমার আন্তরিক ধন্যবাদ আমার ছাত্র ডাঃ প্রিয়লাল মজুমদার এবং ডাঃ সরলনাথ ঘোষকে, যাঁরা এই হস্তলিপির ব্যাপারে সহায়তা করেছেন।

বিজ্ঞানীর সামাজিক দায়িত্ব

নদীয়াবিহারী অধিকারী

আজকের সমাজ জীবনে সাধারণভাবে দায়িত্ব এড়িয়ে যাওয়াই প্রায় নিয়মে দাঁড়িয়ে যাচ্ছে। ঠিক এই সময়ে দায়িত্ব স্বীকার করে নিয়ে তার হিসাব-নিকাশ করা সাহসিকতার পরিচায়ক। বিজ্ঞানীরা যে সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম, তা আলোচনার বিষয়বস্তু নির্বাচনেই প্রকাশ। বিজ্ঞানীদের পারিপার্শ্বিক সমাজ ও বৃহত্তর মানব সমাজ—এই দুইটির নিকট বিজ্ঞানীদের দায়িত্ব সাধারণ মানুষের সীমাবদ্ধ সামাজিক দায়িত্বের চেয়ে অনেক বেশী।

বিজ্ঞানীর আজ আর একান্তে একক সাধনার দিন নেই। একক সাধনায় সারা জীবনে একটি বিষয়ের চূড়ান্ত সমীক্ষা শেষ নাও হতে পারে এবং অন্য দেশে হয়তো সেই বিষয়টিই যৌথ দায়িত্বে সংঘবদ্ধভাবে বিভিন্ন দলের মধ্যে ভাগা-ভাগি করে ২০ বছরের কাজ ২০ মাসেই চূড়ান্ত পর্যায়ে আসতে পারছে। তাছাড়া জগতে প্রথম হবার জন্যে সব দেশের মধ্যেই একটা প্রতিযোগি-তার আবহাওয়া বর্তমান। প্রথম হয়ে বাজী জেতবার দৌড়ে তাই সব দেশই ঐকান্তিক আগ্রহে এগিয়ে যাবার চেষ্টায় ব্যস্ত। এই পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের দেশের বিজ্ঞানীরা অনেক পিছিয়ে আছেন। সংঘবদ্ধভাবে কাজে এগিয়ে যাবার সুযোগ ও সুবিধার অভাব এবং কার দান কত গুরুত্বপূর্ণ এবং কার স্থান কার নীচে বা উপরে হবে, এর সমাধানেই কাজের উৎসাহ ও উদ্দীপনা ঝিমিয়ে আসে। আসল কাজ অর্থাৎ যাতে দেশের সুনাম ও দশের উপকার হবে, সেটা হয়তো আরম্ভ করাই হয় না বা হলেও শেষ পর্যন্ত চলে না। এখানেই শেষ নয়—রেশারেশি বিশ্ববিদ্যালয়, জাতীয় গবেষণাগার, বিভিন্ন মন্ত্রকের গবেষণাগার ছাড়িয়ে শিল্পে পাবলিক সেক্টর ও প্রাইভেট সেক্টর পর্যন্ত যায়। শিল্পে নিযুক্ত বিজ্ঞানীদের স্থান সমাজে কোথায়, তা তাঁরা নিজেরাই জানেন না। তবে এটা ঠিক যে, পাবলিক সেক্টর, প্রাইভেট সেক্টরের উপরে।

শিল্পে নিযুক্ত বিজ্ঞানীদের টিঁকে থাকবার জন্যে সকলের সঙ্গে মিলেমিশেই এগিয়ে যেতে হবে। গবেষণা হোক বা উৎপাদন হোক, মান

নির্ণয়ই হোক বা স্থায়িত্ব-গুণ নির্ণয়ই হোক, সবগুলি কাজই একজনের পক্ষে সুষ্ঠু ও সঠিকভাবে সতর্কতার সঙ্গে তাড়াতাড়ি শেষ করা প্রায় অসম্ভব। অল্প সময়ে বিষয়বস্তুটির সব দিক থেকে পর্যালোচনা করে স্থির সিদ্ধান্তে আসতে হলে কতকগুলি লোকের এক সঙ্গে যৌথ দায়িত্বেই কাজে হাত দিতে হয় এবং তাড়াতাড়ি সমস্যার সমাধান করতে হয়। দায়িত্বের এখানেই শেষ নয়। শিল্পে মূল্য নিরূপণ একটা প্রধান কাজ এবং সেজন্যে বিশেষ সমীক্ষার প্রয়োজন। সাধারণতঃ দেখা যায়, বিজ্ঞানীর আত্মতৃপ্তি একটি জিনিষ তৈরির সঠিক উপায় নির্ধারণেই শেষ হয়ে যায়। কিন্তু শিল্পের জন্যে উৎপাদন করতে হলে জানতে হবে, কত কম মূল্যের উপাদানে, কত কম পরিশ্রমে, কত কম সময়ে, কত কম পরিমাণ উপাদানে কত বেশী বিশুদ্ধ ও উচ্চ মানের দ্রব্য পাওয়া যাবে। আবার উৎপাদনের প্রক্রিয়া এমন হওয়া দরকার, যাতে বিশেষ ধরণের যন্ত্রাদি বাদেই অর্থাৎ বেশী মূলধন না খাটিয়েই কাজটি চালিয়ে যাওয়া যায়।

বিজ্ঞানীকে আরও দেখতে হয় যে, প্রক্রিয়ার মধ্যে কোন বাষ্প উঠে কাজের জায়গার আবহাওয়া বা কর্মীদের বিষাক্ত করছে কিনা। শিল্পে গবেষণা ও সমীক্ষার (Research & development) এজন্যে আরম্ভ আছে কিন্তু শেষ নেই।

শিল্পে নিযুক্ত বিজ্ঞানীর দায়িত্ব পালন করা সহজ হয়, যদি তিনি সকলের সহযোগিতা আকর্ষণ করতে পারেন। সহকর্মীদের যেমন বিজ্ঞানীর উপদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করা দরকার, তেমনি পুঁজি-নিয়োগকারীরও সম্পূর্ণ আস্থা বিজ্ঞানীর উপর থাকা দরকার। বিজ্ঞানীরা অনেক সময় কতকগুলি জিনিষ অনুমান করতে পারেন, কিন্তু তার স্বপক্ষে কোন প্রমাণ উপস্থিত করতে পারেন না। এমন জায়গায় খুব বেশী ব্যয়সাধ্য না হলে বিজ্ঞানীর অনুমানকেই প্রত্যক্ষ বলে ধরে নিলে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে লাভই হয়। সর্বাঙ্গীণ উন্নতির জন্যে নতুন উদ্ভাবনেই হোক, উন্নততর প্রক্রিয়ার সন্ধানেই হোক বা প্রক্রিয়ার সংখ্যা সাশ্রয়েই হোক, উন্নতিশীল শিল্পে বিজ্ঞানী, গবেষক ও সমীক্ষকের সংখ্যা বেড়েই চলে।

নতুন নতুন বিজ্ঞানীদের আর একটা বিশেষ দায়িত্ব হচ্ছে, বিজ্ঞানীদের সমীক্ষার কাজে প্রশিক্ষণ। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সুরু থেকেই শিল্পে প্রশিক্ষণ বিজ্ঞান শিক্ষা বিশেষ করে ফলিত বিজ্ঞান শাখাগুলির ক্ষেত্রে একটা আবশ্যিক বিষয় হিসাবে নেওয়া হয়েছে। এতে মনে হয় বুঝি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার পরিপূরক হলো শিল্পে অল্পস্থায়ী এই হাতে-কলমে কাজ। কার্যক্ষেত্রে কিন্তু পরীক্ষায় পাশ করবার জন্যে এই অল্পস্থায়ী শিল্পে শিক্ষা বিশেষ কাজে আসে না। সেজন্যে শিল্পে নিযুক্ত হলে পুরাতন বিজ্ঞানীদের কাজ হয় নতুনদের ওখানকার কাজের ধারার সঙ্গে পরিচিত করা ও একক দায়িত্বের গবেষণা ও সমীক্ষার কাজে উদ্বুদ্ধ করা। Operational research-এর বিষয়ে হাতেখড়িও এখানেই আরম্ভ হয়।

শিল্প প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বিজ্ঞান-সভা ও আলোচনা-চক্র গড়ে তোলা বিজ্ঞানীদের দায়িত্বের মধ্যে আসে—যেখানে ঐ সঙ্গে বিজ্ঞানী ছাড়া অন্যান্য কর্মীদেরও আলোচনায় যোগ দিতে দেওয়া হয় এবং দৈনন্দিন জীবনে বিজ্ঞানের ভূমিকা সম্বন্ধে সজাগ করে দেওয়া হয়। সেখানে বিজ্ঞানীদের সামাজিক দায়িত্বও পালিত হয়। তাছাড়া শিল্পে উৎপাদনের মধ্য দিয়ে যাতে অসামাজিক কাজ না হতে পারে, তার দায়িত্বও বিজ্ঞানীদের উপরেই ন্যস্ত থাকে। বিজ্ঞানীদের সমবেত দৃষ্টি এদিকে থাকলে অসামাজিক কাজ

শিল্পে হতেই পারবে না। কর্তব্যনিষ্ঠ বিজ্ঞানীদের দৃষ্টি আমি এদিকে আকর্ষণ করতে চাই।

বৃহত্তর সমাজের নিকট নিজেদের দায়িত্ব পালনের জন্যে শিল্পে নিযুক্ত বিজ্ঞানীরা Indian Patent & Designs Act—দেশের ও দশের উন্নতির জন্যে, কালোপযোগী আমূল সংশোধনের জন্যে সরকারের দৃষ্টি বিভিন্ন সময়ে আকর্ষণ করে আসছেন। একদল বিশিষ্ট বিজ্ঞানী খাদ্য, ওষুধ ও রাসায়নিক ঔষধির সব Patent বাতিল করবার সুপারিশ করেন। তাঁদের মতে দেশের ভেষজ-বিজ্ঞানের উন্নতি এতে ত্বরান্বিত হবে। কিন্তু সত্যি কি তাই? Patent Act-এর আওতায় আসে না, এমন বহু প্রয়োজনীয় ওষুধ ও রাসায়নিক দ্রব্য এখনও আমাদের দেশে তৈরি হয় না। কারণ যদিও পরীক্ষাগারে সেগুলি তৈরির প্রক্রিয়া বিজ্ঞানীদের জানা, কিন্তু ব্যবসায়িক ভিত্তিতে দেশের চাহিদা মেটাবার জন্যে প্রক্রিয়া বা যন্ত্রাদির সমাবেশ এখনও অজানা বা কাঁচা উপাদান দেশে পাওয়া যায় না অথবা প্রয়োজনীয় বিশেষ ধরণের যন্ত্রাদি (Equipment) দেশে তৈরি হয় না। এই অবস্থায় Patent Act বাতিল করলে কিছু ব্যবসায়ী হয়তো সস্তায় কাঁচামাল আমদানী করে লাভের অঙ্ক বাড়িয়ে নিতে পারে বা দুই-একজন উদ্যমী উৎপাদনকারী দেশীয় কাঁচামালের সাহায্যে ২।৪টি দ্রব্যের উৎপাদন হাতে নিতে পারে। এতে ভেষজ শিল্পের দীর্ঘমেয়াদী উপকার হবে কি? এতেই কি আমাদের দেশের শিল্প পশ্চিমের এই জাতীয় শিল্প সংস্থার সমকক্ষ হবে?

শিল্পে নিযুক্ত বিজ্ঞানীরা মনে করেন, এতে দেশের ভেষজ শিল্পের উদ্যম ব্যাহত হবে। কেন না, এই শিল্পে গবেষণা ও সমীক্ষার কাজে নিযুক্ত বিজ্ঞানীর সংখ্যা এমনিতেই খুব কম এবং বৈজ্ঞানিকের গবেষণা ও সমীক্ষার প্রয়োজনীয়তা শিল্পে কেবল স্বীকৃতি লাভ করতে আরম্ভ করেছে। এই অবস্থায় সহজ লাভের পথ উন্মুক্ত হলে কষ্টকর ও সহজসাধ্য বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও সমীক্ষার দীর্ঘমেয়াদী সর্বাঙ্গীণ উন্নতির পথে বিশেষ বাধার সৃষ্টি করতো। সৌভাগ্যের বিষয়, ভারত সরকারও কালোপযোগী পরিবর্তন করতে রাজী হয়ে একটি বিল উপস্থিত করেছেন, কিন্তু সেটা লোকসভায় পাশ করিয়ে নেবার সময় গত এক বছরের মধ্যেও হয়ে ওঠেনি।

এই বিল পাশ হলে খাদ্য, ওষুধ ও ঔষধির প্রস্তুত সংক্রান্ত Patent ষোল বছরের জায়গায় দশ বছর বলবৎ থাকবে। তিন বছরের মধ্যেই যদি Patent-ভুক্ত দ্রব্য Patent-গ্রহীতা বা তার পক্ষে কেউ ভারতবর্ষে তৈরি না করেন, তাহলে তা বাজেয়াপ্ত হয়ে যাবে (Automatic revocation)। Patent-গ্রহীতাকে ভারতীয় কাঁচামাল থেকে Patent-এ বর্ণিত পুরা প্রক্রিয়া এই দেশেই করতে হবে। এতে Patent-এর আড়ালে একচেটিয়া আমদানী বন্ধ হবে এবং দেশের শিল্পে বিদেশী মূলধন এবং বিজ্ঞানী ও শিক্ষিত কর্মীর নিয়োগ বাড়বে। বর্তমান Patent Act-এ বস্তু ও প্রক্রিয়া এমন গোলমেলে ভাবে জড়িয়ে আছে, যার জট ছাড়াবার জন্যে সব সময়েই ব্যয়সাপেক্ষ ও সময়সাপেক্ষ বিচার বিভাগের নির্দেশ নিতে হয়। নতুন বিলে শুধু প্রক্রিয়ার জন্যেই Patent হতে পারবে, বস্তুর জন্যে নয়। এতে সমীক্ষকদের নতুন নতুন উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় দেবার সুযোগ বাড়বে এবং বিজ্ঞানীরা ব্যক্তিগতভাবে তাঁদের সফলতার জন্যে আর্থিক পুরস্কার পাবারও অধিকারী হবেন। এতে দেশের মধ্যে গবেষণার কাজ বেড়ে যাবে। অনেকে মনে করেন যে, আমাদের দেশের গবেষণাগারগুলিতে পৃথিবীর বাজারে বেচবার মত Patent এপর্যন্ত সম্ভব না হওয়াতেই গবেষণারত বিজ্ঞানীদের অক্ষমতা ঢাকা দেবার জন্যেই Patent তুলে দেবার কথা উঠেছে। হয়তো এর মধ্যে কিছু সত্য

আছে। এমন দুই-চারটি দেশ আছে যারা বিদেশী Patent এবং Know how কিনে তার উৎকর্ষ সাধন করে আবার মূল Patent-এর দেশেই বিক্রয় করছে। এমন কি, সাধারণভাবে Patent বিক্রয় করে France-এর বেশ মোটা বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জন হয়।

এই বিল যাতে না পাশ হয়, তার জন্যে বিদেশী ভেষজ শিল্পের অধিপতিগণ ও তাঁদের ভারতীয় শাখা বা যুক্ত প্রতিষ্ঠানগুলি একযোগে চেষ্টা শুরু করেছেন। Manufacturing Chemists Association (U. S. A) তাঁদের দেশের সরকারের উপর চাপ দিচ্ছেন, যাতে এই বিল পাশ না হয়। ইংল্যাণ্ডে Patent Act সংশোধনের জন্যে তোড়জোড় চলেছে। সেখানেও আমেরিকার কোম্পানীগুলির সঙ্গে ওখানকার নিজস্ব কোম্পানীগুলির মতের মিল হচ্ছে না। আমাদের দেশের এই বিল পাশ হলে অন্যান্য অনেক দেশেই অনুরূপ সংশোধন আসতে পারে।

এছাড়াও বিজ্ঞানভিত্তিক বস্তুমান সম্বন্ধে জনসাধারণের মধ্যে তথ্য বিতরণ বিজ্ঞানীদের দায়িত্বের আওতায় আসে।

বিজ্ঞানীর খোলা মনের বিচারের অভাবে যাতে সাধারণ মানুষ বিজ্ঞান সম্বন্ধে বিভ্রান্ত ও বীতশ্রদ্ধ হয়ে না পড়েন, সে দিকেও দৃষ্টি রাখা দরকার। খাদ্যপ্রাণ আবিষ্কার হবার পর থেকে বাংলাদেশে সেদ্ধ চাল সম্বন্ধে বিজ্ঞানী এবং অবাঙালী ভারতীয়গণ একযোগে খাদ্যপ্রাণ নষ্ট করবার অভিযোগ করেন। এই সম্বন্ধে বায়োকেমিষ্টদের বহু গবেষণামূলক প্রবন্ধে বাঙালীদের এই প্রাচীন বদ অভ্যাস সম্বন্ধে আলোচনা করা হয় এবং বক্তৃতা দেওয়া হয়। কিন্তু গত মহাযুদ্ধের মধ্যে আমেরিকার বিজ্ঞানীগণ কর্তৃক প্রমাণিত হয় যে, ধান সেদ্ধ করে চাল প্রস্তুত করবার প্রণালী বিজ্ঞানসম্মত। কারণ এতে চালের খাদ্যপ্রাণ নষ্ট হবার সম্ভাবনা কম। আতপ চাল তৈরির পদ্ধতিতে চালের খাদ্যপ্রাণ অনেক বেশী নষ্ট হয়। এমন কি, সরকার এখন সমগ্র দেশে যাতে সেদ্ধ-চাল তৈরি হয়, তার ব্যবস্থা করেছেন। টিংচার ডিজিটেলিস নামক ওষুধটি আদর্শ অবস্থায় যত বেশী দিন থাকে, তত বেশী তার শক্তিক্রম নষ্ট হয়। এই সম্বন্ধে আমাদের দেশে বহু গবেষণাপত্র ছাপা হয়েছে। বিগত মহাযুদ্ধের মধ্যে আমেরিকার ফার্মাসিউটিক্যাল অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতির ভাষণে বলা হয় যে, টিংচার ডিজিটেলিস-এর শক্তিক্রম কালক্রমে ক্রমশঃ নষ্ট না হয়ে ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে। এর কারণ ঐ ভেষজের মধ্যে শক্তিক্রম দাবিয়ে রাখবার একটি জিনিষ থাকে, যা পরে নষ্ট হয়ে যায়। এতে শক্তিক্রম বেশী হলো বলে মনে হয়। আবহাওয়াতত্ত্ববিদ্‌দের পূর্বাভাস একটি স্থায়ী হাস্যকৌতুকের নমুনা হিসাবে সাধারণ মানুষ মনে করে।

এই শতাব্দীর প্রারম্ভে 'বেঙ্গল কেমিক্যাল অ্যাণ্ড ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস্' রেজেষ্ট্রি করবার পূর্বেই প্রফুল্লচন্দ্র 'ঈষ্টার্ণ সিরাপ' বাজারে ছাড়েন। বি. কে. পাল কোম্পানীর স্বর্গীয় ভূতনাথ পাল মহাশয় তাঁকে জানান যে, আপনার 'ঈষ্টার্ণ সিরাপ' ইংল্যাণ্ড থেকে আমদানী করা সিরাপের সমতুল্য নয়, কারণ আপনার সিরাপের রং সাদা কিন্তু ইংল্যাণ্ড থেকে আনা মালের রং হল্‌দে অথবা জরদা। এই অবস্থায় আপনার তৈরি জিনিষটি চিকিৎসকগণ নিকৃষ্ট মানের বলে মনে করছেন। আচার্য রায় তখন পাল মহাশয়কে বোঝান যে, টাট্‌কা তৈরি ওষুধের রং সাদা হয় ও বহুদিন রাখলে তার রং ধীরে ধীরে হল্‌দে হয়ে যায়। কিন্তু চিকিৎসকদের সহানুভূতি আকর্ষণ করবার জন্যে আচার্য রায়কে কৃত্রিম উপায়ে তার রং হল্‌দে পরিবর্তিত করে দিতে হয়। আচার্য রায় তাঁর বন্ধু ডাঃ নীলরতন সরকার এবং অন্যান্য চিকিৎসকদের সাহায্যে সাধারণ চিকিৎসকদের ভুল

ধারণা দূর করতে চেষ্টা করেন এবং দশ বছরের মধ্যেই সফলকাম হন। দেশে এখনও লাল রঙের বোরিক তুলা বাজারে বিক্রয় হয়, যদিও তুলা বা বোরিক অ্যাসিড কোনটির রং লাল নয়। এই লাল রং করবার কারণ হচ্ছে, জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করা। বোরিক তুলা সাদা হলে জনসাধারণ তাকে ভেজাল বা নিকৃষ্ট মানের মনে করে।

এইরূপ দৃষ্টান্ত আরও অনেক দেওয়া যায়। বিজ্ঞানীরা প্রত্যেকে নিজ নিজ বিষয় সম্বন্ধে সাধারণের ভ্রান্ত ধারণা দূর করবার চেষ্টা করলে দেশের ও দশের উপকার করা হবে। বিজ্ঞানী ভিন্ন এই কাজ সম্ভব নয়।

বিজ্ঞানীর সামাজিক দায়িত্ব

সুশীলকুমার মুখোপাধ্যায়

কৃষি-বিজ্ঞানী হিসেবেই আমি এই আলোচনা-চক্রে যোগদান করছি। বলা নিষ্প্রয়োজন যে, এই দায়িত্ব যোগ্যতর ব্যক্তির উপর ন্যস্ত হলে আপনারা অধিকতর লাভবান হতেন। কারণ, যদিও কৃষি-বিজ্ঞান বিভাগে কৃষি-রসায়ন বিষয়ে অধ্যাপনার কার্যে নিযুক্ত আছি, তাহলেও বলতে সাহস পাচ্ছি না যে, কৃষি-বিজ্ঞানের মত জটিল বিষয়ে সামান্যও আলোকপাত করতে পারবো। অন্যান্য বিজ্ঞানীদের মত কৃষি-বিজ্ঞানীর সামাজিক দায়িত্ব বহুধা বিস্তৃত। ভারতের তিন-চতুর্থাংশের অধিক লোক কৃষির উপর প্রত্যক্ষভাবে নির্ভরশীল, বাকী অংশও, বলাবাহুল্য পরোক্ষভাবে কৃষির উপর নির্ভরশীল হতে বাধ্য। চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় সরকারী মোট বরাদ্দ অর্থের পরিমাণ ১৬০০০ কোটি টাকা, তার মধ্যে কৃষি-উৎপাদন খাতে বরাদ্দ হয়েছে ৫৪০০ কোটি টাকা। এই দুটি তথ্যের দ্বারাই কৃষি, তথা কৃষি-বিজ্ঞানীর দায়িত্বের পরিধি উপলব্ধি করা যাবে।

এডুকেশন কমিশন যে সুবৃহৎ রিপোর্টটি কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীর নিকট পেশ করেছেন, তার কৃষিশিক্ষা সংক্রান্ত অধ্যায়ের ভূমিকায় যে বক্তব্য রাখা হয়েছে, তা এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। প্রয়োজনীয় অংশের টানা অনুবাদ করলে এই রকম দাঁড়ায়:

কৃষির উন্নতিকল্পে যা যা করণীয়, সে সম্পর্কে আমাদের কর্তব্য সুস্পষ্ট। আগামী ১৫ বছরের মধ্যে আমাদের খাদ্য-উৎপাদন দ্বিগুণ করতে হবে এবং পরবর্তী কালে উন্নতির হার উপযুক্তভাবে বজায় রাখতে হবে। আমরা খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তন করবো, বৃষ্টির উপর কৃষির নির্ভরতা কমিয়ে ফেলবো, কৃষি-প্রতিষ্ঠানগুলিতে নানা ধরণের উন্নততর বীজ প্রস্তুত করবো। এতদ্ব্যতীত বনজ সম্পদ এবং মৎস-সম্পদ এমনভাবে বৃদ্ধি করবো, যার ফলে বর্তমান গ্রামীণ জনসাধারণ উন্নততর সমাজ গঠনে অগ্রসর হতে পারে।

এই লক্ষ্যে পৌঁছুতে হলে একমাত্র বিজ্ঞান ও কারিগরীবিদ্যার প্রয়োগের দ্বারাই সম্ভব। এই জন্যে সেচ-ব্যবস্থা, সার-উৎপাদন ও তার উপযুক্ত প্রয়োগ, কীটনাশক রাসায়নিক দ্রব্যাদির ব্যবহার, উন্নততর বীজ ব্যবহার, কৃষকদের সুবিধাজনক পদ্ধতিতে ঋণদান, উৎপন্ন দ্রব্যের সুষ্ঠু সংরক্ষণ ও বন্টন ব্যবস্থা, যানবাহন ও বিদ্যুৎ সরবরাহ ইত্যাদির বিশেষ প্রয়োজন। কিন্তু এগুলিই যথেষ্ট নয়—বস্তুতঃ আমাদের বিশেষ প্রয়োজন উন্নত

ধরণের কৃষিসংক্রান্ত শিক্ষা ও গবেষণা-ব্যবস্থার। এসব ছাড়া কৃষিজ দ্রব্যের উৎপাদন ত্বরান্বিত করা একেবারেই সম্ভব নয়। অন্যথায় অর্থের অপচয় অনিবার্য। এই অপচয় প্রতিরোধকল্পে কমিশনের সুপারিশ এই যে, অনতিবিলম্বে কয়েকটি কৃষি-বিশ্ববিদ্যালয় গঠন করা হোক এবং কৃষি-মহাবিদ্যালয়গুলির আশু উন্নতি বিধান করা হোক, যাতে যত শীঘ্র সম্ভব গবেষণা, অধ্যাপনা ও ব্যবহারিক প্রয়োগের কাজ সুনির্দিষ্ট পথে অগ্রসর হতে পারে এবং উপযুক্ত ও মেধাবী ছাত্র, শিক্ষক ও গবেষক কৃষি-বিজ্ঞানের দিকে আকৃষ্ট হতে পারে।

কৃষি-বিজ্ঞানীর সামগ্রিক দায়িত্ব সম্পর্কে উদ্ধৃত অংশ থেকে আমরা একটি স্বল্পবিস্তর স্পষ্ট ও সম্পূর্ণ চিত্র আমাদের সামনে রাখতে পারি। কিন্তু দেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে অধিকতর খাদ্যোৎপাদনই কৃষি-বিজ্ঞানীর আশু ও প্রধান দায়িত্ব বলে প্রতীয়মান হচ্ছে। সুতরাং এই দিকে দৃষ্টি রেখেই কয়েকটি বক্তব্য রাখবার চেষ্টা করবো। বলাবাহুল্য, খাদ্যোৎপাদন এবং তার বৃদ্ধি নানা বিষয়ে অভিজ্ঞ বিজ্ঞানী ও কর্মীর সহযোগিতায়ই সম্ভব। এখানে প্রধানতঃ কৃষি-বিজ্ঞানীর দৃষ্টি দিয়েই সমস্যার বিচার ও সমাধানের উল্লেখ করবো।

এডুকেশন কমিশন তাদের বিবরণীতে কৃষি সংক্রান্ত উচ্চতর শিক্ষা ও গবেষণার উপর অধিকতর জোর দিয়েছেন। এটা তো আশা করা যায়, কিন্তু উৎপাদন বৃদ্ধিকল্পে কৃষি-গবেষণার অবদান একটুও আশাপ্রদ নয়। দীর্ঘকাল ধরে বহু অর্থ ব্যয় হয়েছে উন্নত জাতের ধানের বীজ উৎপাদন সংক্রান্ত গবেষণা-কার্যে, অথচ আমরা নিজস্ব দায়িত্বের কথা ভুলে গিয়ে বহিরাগত বীজের উৎকর্ষ নিয়ে মেতে উঠেছি। আমরা এতদিন কি করেছি—সেই নিয়ে তো কোন সতর্ক বাণী উচ্চারিত হচ্ছে না। গমের বেলায়ও ঐ একই অভিযোগ খাটে। জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছা করে, বিজ্ঞানীরা কি সকল প্রকার জবাবদিহির বাইরে? এই বিফলতার কাহিনী সত্ত্বেও গবেষক ও বিজ্ঞানীরা কি তাঁদের দায়িত্ব পালন করছেন বলা যায়?

পূর্বেই বলেছি যে, বর্তমান পরিস্থিতিতে খাদ্যোৎপাদনই কৃষি-বিজ্ঞানীর অন্যতম প্রধান দায়িত্ব। আমি পশ্চিমবঙ্গের খাদ্য পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে এই দায়িত্ব সম্পর্কে আলোচনা করবো।

ধানই পশ্চিমবঙ্গের প্রধান খাদ্যশস্য। সুতরাং ধানের উৎপাদন বৃদ্ধির বিষয়েই সমধিক দৃষ্টি রাখা বাঞ্ছনীয়। খাদ্যোৎপাদনের প্রয়োজনীয়তা নানাভাবে স্বীকৃত হয়েছে। আমাদের বর্তমান দৈনিক খাদ্যের পরিমাণ স্বাস্থ্যের পক্ষে যথেষ্ট না হলেও ঠিকমত খেতে জানলে স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটবার কোন কারণ নেই। ক্রমবর্ধমান লোক-সংখ্যার অনুপাতে খাদ্যোৎপাদনের হার যথেষ্ট অধিক হলে নিশ্চিন্ত হওয়া যায়। লোক বৃদ্ধির সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ক্রমবর্ধমান দ্রব্যমূল্য। কৃষি উৎপাদনে ঘাটতি এবং দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির ফলেই আমাদের রপ্তানীর কোন উন্নতি হয় নি। দ্রব্য-মূল্য স্থিতিশীল করতে হলে কৃষি-উৎপাদন বাড়াতে হবে। এই উপলব্ধি থেকেই চতুর্থ পরিকল্পনায় কৃষির উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। মনে হয়, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি এবং কৃষি-উৎপাদনে ঘাটতি মুদ্রা অবমূল্যায়ণের অন্যতম কারণ। তা সত্ত্বেও চতুর্থ পরিকল্পনা রূপায়ণে অসুবিধা, ত্রুটি এবং অন্তরায় কি, এই বিচার না করেই ব্যয়ের ক্ষেত্রে নতুন ঝুঁকি নেওয়া হয়েছে।

উপরিউক্ত বক্তব্যগুলি আপাত চিন্তায় অবান্তর মনে হলেও উদ্দেশ্য নিয়েই অবতারণা করছি। যে ভাবেই হোক, পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাগুলিতে আমাদের জীবনমান ও তৎসম্পর্কিত চিন্তাধারা প্রতিফলিত হওয়া স্বাভাবিক। একথা বৈজ্ঞানিক

গবেষণা, বিশেষতঃ কৃষি ও শিল্পোৎপাদনের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। সুতরাং পরিকল্পনায় যে যে বিষয়ের দিকে জোর দেওয়া হয়েছে, তার সঙ্গে সামাজিক পরিবর্তনের সম্পর্ক নিকটতর হতে বাধ্য।

খাদ্যোৎপাদন বৃদ্ধির জন্যে প্রধানতঃ দুটি পন্থা অবলম্বন করা যায়। প্রথমতঃ শস্যক্ষেত্রের বিস্তৃতি; দ্বিতীয়তঃ সার, উন্নতজাতের বীজ, জলসেচ এবং মাটির যথাযথ ব্যবহারের দ্বারা ফলন বৃদ্ধি। প্রথমোক্ত সুযোগ ভারতবর্ষ কেন, পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও ক্রমশঃই কমে আসছে। দ্বিতীয় উপায়ের সুযোগ যথেষ্ট রয়েছে এবং আমরা এখনও তার সদ্ব্যবহার করি নি।

কৃষি-বিজ্ঞানী গবেষণার দ্বারা দেখেছেন যে, প্রতি কিলোগ্র্যাম নাইট্রোজেন ও ফস্‌ফরাস সার প্রয়োগে যথাক্রমে ১০-১১ ও ৬-৭ কিলোগ্র্যাম ফসল বাড়তে পারে। এই প্রকার গবেষণার একটি সর্ত রয়েছে—অর্থাৎ ফসল বাড়াবার জন্যে প্রয়োজনীয় অন্যান্য ব্যবস্থা সুনির্দিষ্ট আছে, যথা—উপযুক্ত বীজ, মাটি ও জলসেচ। সেইরূপে জলসেচের সাহায্যে ফসল দ্বিগুণ করা সম্ভব—এই হারও নির্ভর করে জমির অন্যান্য গুণের মধ্যে আর্দ্রতা রক্ষার ক্ষমতা এবং উন্নত জাতের বীজ ও প্রয়োজনীয় পরিমাণ সার ব্যবহারের উপর। মোট কথা, ফলন বৃদ্ধির উপাদানগুলি পরস্পরের উপর নির্ভরশীল। কৃষি-বিজ্ঞানীর দায়িত্ব কেবলমাত্র গবেষণার ক্ষেত্রেই যদি সীমাবদ্ধ থাকতো, তাহলে তাঁরা ঐ দায়িত্ব সম্পূর্ণরূপে পালন করেছেন বলা যায়, কারণ পরবর্তী কাজ অর্থাৎ গবেষণালব্ধ জ্ঞানের ব্যবহারিক প্রয়োগ অন্য অভিজ্ঞ ব্যক্তির উপর ন্যস্ত। সেখানে যদি ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘটে, তাহলে কৃষি-বিজ্ঞানীকে অপরাধী করা চলে না। কিন্তু বক্তব্য এই যে, যে আদর্শ অবস্থার মাধ্যমে বিজ্ঞানী সাধারণতঃ গবেষণার ফল লাভ করেন, বাস্তব ক্ষেত্রে তা অনেক সময়েই সম্পূর্ণ রূপায়িত করা সম্ভব নয়। তখন নতুন করে বিজ্ঞানীর উপর দায়িত্ব এসে পড়ে। অতএব যে সব সুযোগ-সুবিধা অথবা অসুবিধা রয়েছে, তারই মধ্যে কিভাবে কাজ করলে বাস্তব ক্ষেত্রে সর্বাধিক ফল লাভ করা যায়, বিজ্ঞানীকে তারও পন্থা এবং নির্দেশ দিতে হবে। বরং বলা চলে যে, প্রথম থেকেই বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে বিজ্ঞানীর গবেষণা করা উচিত ছিল। এই সতর্ক উক্তি অন্যান্য গবেষণার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

যে পরিমাণ সার দিলে, যে পরিমাণ জলসেচ প্রয়োগ করলে, যে পরিমাণ উন্নত জাতের বীজ ব্যবহার করলে আমরা গবেষণালব্ধ ফল সম্পূর্ণ ভাবে লাভ করতে পারতাম, সে পরিমাণ সার, সেচের জল এবং বীজ আমাদের নেই এবং এও সত্যি কথা যে, আমাদের কোন্ কোন্ মাটি এরূপ উন্নত ধরণের চাষের উপযুক্ত, তা আমরা সঠিক জানি না। অথচ আশু ফল লাভের জন্যে বিলম্বিত গবেষণার আশ্রয় গ্রহণ করা সমীচীন হবে না। সুতরাং যেটুকু সম্বল আছে, তার উপযুক্ত ব্যবহার করবার প্রচেষ্টাই শ্রেয়। নিঃসন্দেহে ভবিষ্যতে এই সম্পর্কে পূর্ণতর গবেষণার সুযোগ গ্রহণ করা যাবে।

খাদ্যোৎপাদন বৃদ্ধির উপায়রূপে যে সিদ্ধান্ত-গুলি উপস্থাপিত করবো, তার জন্যে পশ্চিমবঙ্গ কৃষি বিভাগীয় অধিকর্তা শ্রীআশুতোষ সান্যাল মহাশয়ের নিকট ঋণ স্বীকার করছি। তাঁর সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনার সুযোগ পেয়ে এই সিদ্ধান্তগুলির বাস্তব প্রযুক্তির প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছি।

পশ্চিমবঙ্গে ৮০% ভূমিতে অর্থাৎ প্রায় ১.১৫ লক্ষ একর জমিতে ধান চাষ করা হয় এবং তার ৮৫% ভাগই আমন ধান। আমন ধান ৪-৬ মাস জমি অধিকার করে থাকে, যার জন্যে আমন জমি এক ফসলী হতে বাধ্য, বিশেষতঃ যেখানে বারিপাতের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করতে হয়। অনেক ক্ষেত্রে জমি যেখানে বেলে, সেখানেও প্রচলিত পদ্ধতি অনুসারে আমন বীজ বপন করা

হয়, অথচ জমি ঐ জন্যে সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত। বিগত কয়েক বছরে প্রতি জেলার খাদ্যোৎপাদনের পরিমাণ তুলনা করলে নজরে পড়ে যে, যে বছর সামগ্রিক ফলন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছে (১৫%-২০%), তা কেবলমাত্র কয়েকটি জেলার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, প্রায় প্রতি জেলায়ই অল্প-বিস্তর বেড়েছে। সঙ্গে সঙ্গে বারিপাতের সময় ও পরিমাণ তুলনা করে দেখা গেল যে, ঐ বছর ঠিক পরিমাণ ও সুসময়ে বৃষ্টি হয়েছে। অতএব সার বা উন্নত বীজ ব্যতীত কেবলমাত্র জলের সদ্ব্যবহারের দ্বারাই কিয়দংশ ফলন বৃদ্ধি সম্ভব। যথেষ্ট জল পেলে একটি ফসলের পরিবর্তে দুটি কিম্বা তিনটি ফসলও নেওয়া যায়। এই সংক্রান্ত দৃষ্টান্ত বিরল নয়।

আমন ধান সাধারণতঃ জুলাই, অগাষ্ট বা সেপ্টেম্বরে বপন করা হয়। সুতরাং বৃষ্টির উপর নির্ভরশীল চাষের জমিতে আউস ধান, পাট ইত্যাদির সম্ভাবনা রয়েছে। বস্তুতঃ যেখানেই আমনের পূর্বে ১০০ দিন জমি খালি পাওয়া যাবে, সেখানেই আউস রোপণ করা সম্ভব। বৃষ্টির জল কম থাকলে ডাঙ্গাজমির আউস বপন করা যায়, কিন্তু যথেষ্ট জল পেলে রোয়া আউস লাগানো সম্ভব। শেষোক্ত উপায়ে ফলন বৃদ্ধি অনিবার্য। ডাঙ্গাজমির আউস হিসাবে 'দুলার' জাতের ধান অতি উপযুক্ত। এই ধান প্রায় ৯০ দিনেই পেকে উঠে। রোয়া আউস বপন করা সম্ভব হলে জমি বাস্তব পক্ষে প্রায় ৭৫ দিন ব্যবহৃত হয়, কারণ বাকী ২০-২৫ দিন চারা অবস্থায় অন্যত্র অতিবাহিত হয়। আমনের পূর্বে আউস ধান থেকে যে খড় পাওয়া যাবে, তাকে অনায়াসে সবুজ অবস্থায়ই মাটির সঙ্গে চাষ করে দেওয়া যায় এবং এই পদ্ধতি পরবর্তী আমনের পক্ষে খুবই উপযুক্ত হবে। এখানে বলা প্রয়োজন যে, আউসের খড় অধিক দিন সংরক্ষণ করা যায় না, সুতরাং সবুজ অবস্থায়ই মাটিতে চাষ করা বাঞ্ছনীয়। তাছাড়া এই খড় অতিরিক্ত ফসল থেকে পাওয়া, সুতরাং গবাদি পশুর খাদ্যরূপে ব্যবহার করবার প্রশ্নই ওঠে না। এভাবে পাট চাষের সময়েও পত্রাদি সঞ্চিত হয়ে যে জৈব সার মৃত্তিকার সঙ্গে যুক্ত হয়, তাতে পরবর্তী ধানের ফলন বৃদ্ধি পায়। সুতরাং পাট বন্ধ করে ধানের ক্ষেত বিস্তার করবার প্রচার বৈজ্ঞানিক তথ্যের উপর ভিত্তিশীল নয়।

আপত্তি হতে পারে যে, আউস ও আমনের পর পর বপনের পদ্ধতিতে আমনের জন্যে যথেষ্ট সময় পাওয়া যাবে না, অতএব ফলন হ্রাসের সম্ভাবনা রয়েছে। এখানেই বিজ্ঞানীদের গবেষণালব্ধ ফল প্রচলিত প্রথার ভুল প্রমাণ করছে। আমন ধান বিশেষ ঋতুতে বপন করবার প্রথা আবহমান-কাল থেকে চলে আসছে। কিন্তু অধ্যাপক সৌরীন্দ্রমোহন সরকার, ডক্টর ভুপেন্দ্রনাথ ঘোষ প্রমুখ উদ্ভিদতত্ত্ববিদ এবং কৃষি-বিজ্ঞানী শ্রীআশুতোষ সান্যাল দেখিয়েছেন যে, এই ধারণার বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই। 'বোরো' ঋতুতেও তথাকথিত আমন ধান রোপণ করা যায়। পশ্চিমবঙ্গের বিখ্যাত আমন ধান 'লাটিসাইল' বোরো ঋতুতে বপন করে প্রচুর ফলন বৃদ্ধি করা হয়েছে। চাকদহস্থিত পশ্চিমবঙ্গ সরকারী কৃষি কেন্দ্রে এই পরীক্ষা-কার্য এখনও চলছে—প্রতিবেশী ও অন্যান্য কৃষকগণও ঐ পদ্ধতি নিশ্চিন্ত মনে গ্রহণ করেছে। বলা বাহুল্য, এই সকল ক্ষেত্রে পরিমিত জলের প্রয়োজন মেটাবার ব্যবস্থা থাকা দরকার। উপরিউক্ত কৃষিকেন্দ্রে গভীর টিউব ওয়েলের সাহায্যে জলের ব্যবস্থা করা হয়েছে। হয়তো অনেকেই জানেন না যে, পশ্চিমবঙ্গে প্রায় ১,৫৪০টি গভীর টিউব ওয়েল বসানো হয়েছিল। কিন্তু তন্মধ্যে মাত্র ৩৫০টি চালু, তাও সবকয়টি পূর্ণমাত্রায় নয়। এই প্রসঙ্গে কূপ ও পুষ্করিণী খননকার্য ত্বরান্বিত করবার প্রতি দৃষ্টি দিলে ভাল হয়। পরিমিত জল পেলে চারটি পর্যন্ত ফসল পাওয়া যেতে পারে—এরূপ নিবিড় চাষের নমুনা চাকদহ কৃষিকেন্দ্রে দেখানো হয়েছে। একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। (বিস্তারিত তথ্য কৃষি দপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত পুস্তিকায় দ্রষ্টব্য, ক্রমিক সংখ্যা ১৯৬৫, সেপ্টেম্বর, ১৯৬৫)

পাট	তুলার (আউস)	ভাসামাণিক আমন	বোরো (লাটিসাইল)
২০/২—১৯/৬ (১৭'৬৫ মণ/ একর)	২৬/৬—৯/৯ (১৮'৬৫ মণ/ একর)	১৫/৯—২২/১২ (৩৩'৪ মণ/ একর) অথবা কলাই ২৬/৯—১৪/১২ (৬ মণ/একর)	২৮/১২—৩০/৫ (৬৭'৬৫ মণ/ একর)

লাটিসাইল ছাড়া অন্যান্য আমন ধান ব্যবহারে অধিকতর ফলন পাওয়া গেছে। এছাড়া অন্য প্রকার শস্য-আবর্তন পদ্ধতিও গ্রহণ করা যায়।

দেখা গেছে যে, উপযুক্ত জল ও সার প্রয়োগের দ্বারা সর্বসাকুল্যে ১৪০ মণ/একর ফসল পাওয়া যেতে পারে। যে পদ্ধতিতে এই ফলন বৃদ্ধি সম্ভব হয়েছে, তাতে কোন প্রকার ব্যয়সাপেক্ষ যন্ত্রাদি বা অধিক পরিমাণ সার ব্যবহার করা হয় নি। জল, উপযুক্ত বীজ ও প্রয়োজনীয় সার ব্যবহার করেই এই ফল পাওয়া গেছে—এমন কি, বহিরাগত শস্য-বীজও ব্যবহার করা হয় নি। অতএব সাধারণ কৃষক এই পদ্ধতি গ্রহণ করতে পারে এবং বাস্তব ক্ষেত্রে করছেও।

ফলন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে উর্বরতা সংরক্ষণের দিকে দৃষ্টি দিতে হবে। সবুজ সার এবং আউসের খড় কেবলমাত্র জৈব সারের কাজই করবে না, এদের সঙ্গে যুক্ত উদ্ভিদ-খাদ্য, যথা—নাইট্রোজেন, পটাশ এবং ফস্‌ফরাসও জমিতে ফিরে আসবে। কিন্তু যাতে কার্বন/নাইট্রোজেন অনুপাত ও ফস্‌ফরাস সুনির্দিষ্ট থাকে, তার জন্যে বাইরে থেকে একর প্রতি ১০-২০ পাউণ্ড নাইট্রোজেন ও ফস্‌ফরাস খুবই কার্যকরী হবে। প্রায় ২৫-৩০ দিন লাগবে খড় পচতে; সুতরাং যেখানে জমিতে খড় ইত্যাদি চাষ করবার সময় হবে না, সেখানে বাইরে পচিয়ে নেওয়া সমীচীন হবে।

উল্লিখিত গবেষণার দ্বারা আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, আউস ও আমন একই জমিতে অনায়াসে নিতে পারি। খাদ্যোৎপাদন বৃদ্ধির জন্যে কেবলমাত্র এই ব্যবস্থাই যদি পরিপূর্ণভাবে গ্রহণ করা যায়, তাহলে অনায়াসে আমরা খাদ্যে স্বনির্ভর হতে পারি। এই পদ্ধতি অনুসারে নিম্নলিখিত সময়-তালিকা প্রস্তুত করা যায়।

আউস ধান		আমন ধান
বপনকাল	ফলনকাল	বপনকাল
১৫/৩	১/৬	১৫/৭—২৫/৭
১৫/৪	১/৭	১/৮—৭/৭
১৫/৫	২০/৮	২৩/৮—৩০/৮

প্রথমোক্ত দুটি ক্ষেত্রে আউসের খড় জমিতে চাষ করা সম্ভব হবে, কিন্তু শেষোক্ত ক্ষেত্রে বাইরে পচানো দরকার হবে।

পশ্চিমবঙ্গের বৃষ্টিপাতের পরিমাণ থেকে দেখা যায় যে, উক্ত সময়-তালিকাভুক্ত মার্চ-এপ্রিল মাসের বপনকার্য সমগ্র জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, শিলিগুড়ি এবং পশ্চিম দিনাজপুরের কোথাও কোথাও অনুসরণ করা যায়। এছাড়া মে মাস পর্যন্ত বপন সময় বাড়িয়ে দিয়ে হুগলী, ২৪ পরগণা, নদীয়া ও মুর্শিদাবাদের কোথায়ও কোথায়ও বৃষ্টির জলের সাহায্যেই আউস ধান বপন করা সম্ভব। সেচের বন্দোবস্ত থাকলে সর্বত্র এই পদ্ধতি প্রচলন করা সম্ভব। জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, দার্জিলিং, পশ্চিম দিনাজপুর অঞ্চলের প্রায় অধিকাংশই বর্তমানে এক ফসলী, বিশেষ করে যেখানে আমন

বপন করা হচ্ছে। সেখানে অনায়াসে আমনের পূর্বে আউসের প্রচলন সম্ভব।

আউসের বীজ প্রায়ই দুষ্প্রাপ্য, কারণ আউস প্রধানতঃ কৃষকদের খাদ্যের জন্যেই উৎপাদন করা হয়। তাছাড়া আউস ধানের বীজের একটি অসুবিধা রয়েছে। সামান্য জল পেলেই এই ধানের বীজ অঙ্কুরিত হয়। সুতরাং ফসল তোলবার সঙ্গে সঙ্গে শুষ্ক করবার ব্যবস্থা থাকা দরকার, অন্যথায় আগামী বছরের জন্যে সেগুলিকে বীজ হিসাবে ব্যবহার করা যাবে না। আউস বীজের প্রয়োজন কালে যাতে মূল্যবান সময় নষ্ট না হয়, সেজন্যে কৃষকদের নিকট থেকে আমনের পরিবর্তে সমপরিমাণ আউস ধান সময়মত বিনিময় করা বাঞ্ছনীয়। এই সব কারণে মনে হয় যে, অপেক্ষাকৃত শুষ্ক অঞ্চল, যেমন—নদীয়া, মুর্শিদাবাদ এবং পশ্চিমাঞ্চলের জেলাগুলি থেকে আউস ধান সংগ্রহ করা সমীচীন হবে।

আউস/আমন পদ্ধতি সর্বত্র প্রচলিত হলে (কোন কোন অঞ্চলে বর্তমানে চালু আছে) কৃষকদের উপর কাজের চাপ স্বভাবতঃই বৃদ্ধি পাবে। সুতরাং যাতে কৃষক-মজুরদের অভাবে কাজ বন্ধ না থাকে সেজন্যে অন্য ব্যবস্থা, বিশেষ করে যান্ত্রিক সহায়তা অবলম্বনের কথা ভাবতে হবে। এই সম্পর্কে ছোট ছোট বিদ্যুৎ-চালিত যন্ত্রের ব্যবহার বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এইরূপ যন্ত্রাদি আমাদের দেশে তৈরি হচ্ছে বটে, কিন্তু যথেষ্ট সংখ্যায় নয়। এই প্রসঙ্গে জাপান থেকে 'পাওয়ার টিলার' আমদানী করবার পরামর্শ গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়। কৃষকদের স্বল্প মূল্যে অথবা ভাড়া প্রথায় ব্যবহারের জন্যে এই সব যন্ত্রাদি অনায়াসে দেওয়া যেতে পারে। ১৫।২০ একর জমির জন্যে একটি ছোট যন্ত্রই যথেষ্ট। প্রয়োজনমত ঐ যন্ত্রই ধান মাড়াইয়ের কাজে ব্যবহৃত হতে পারে। এই দিকে আমাদের যন্ত্র-বিজ্ঞানীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

খাদ্যাদি ফসল সংগ্রহের ব্যাপারে জাপান এবং রাশিয়া যে পদ্ধতি গ্রহণ করে, সেরূপ ব্যবস্থার কথাও এই প্রসঙ্গে চিন্তা করা যায়। ফসল সংগ্রহের একটি উপযুক্ত এবং নির্দিষ্ট তারিখ দিয়ে যদি কৃষকদের জানানো হয় যে, ঐ তারিখের মধ্যে ফসল জমা দিলে দ্বিগুণ মূল্য পাওয়া যাবে এবং পরে দিলে আনুপাতিকভাবে মূল্য হ্রাস পাবে, তাহলে কৃষক ও মজুরগণ অধিকতর পরিশ্রম করবার উৎসাহ লাভ করবে। ঐ সব দেশে এই ব্যবস্থায় সংগ্রহ-কার্য সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা হচ্ছে; সুতরাং আমরাও অনুরূপ কৃতকার্যতা আশা করতে পারি। বলা বাহুল্য জমি যদি কৃষককের নিজস্ব না হয়, তাহলে তাদের মনে এই উৎসাহ ও প্রেরণা আসতে পারে না।

উপরে যে কার্যক্রমের মোটামুটি একটি কাঠামো উপস্থিত করা হলো, তাকে কার্যকরী করতে হলে স্বভাবতঃই উপযুক্ত কর্মীর প্রয়োজন। কেবল তাই নয়, প্রয়োজনমত বর্তমান অবস্থার এখানে-ওখানে পরিবর্তন করতে হলে বিজ্ঞান-সম্মত দৃষ্টিভঙ্গীসম্পন্ন কর্মী সংগ্রহ করা উচিত। বর্তমান সরকারী ব্যবস্থার পরিবর্তন বিষয়ে এখানে আলোচনা অবান্তর। তা সত্ত্বেও সাধারণ-ভাবে বলা যায় যে, জেলায় জেলায় কৃষি-সংক্রান্ত অফিসার ও কর্মীদের সরাসরি কৃষি বিভাগের অধীনে রাখাই বাঞ্ছনীয়, নতুবা কাজ ত্বরান্বিত করবার পথে বাধা উপস্থিত হতে পারে। এছাড়া কৃষি-বিজ্ঞানে অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের মহাধি-করণের বাইরে বিভিন্ন এলাকার ভারপ্রাপ্ত করে পাঠিয়ে দিলে বাস্তব ক্ষেত্রে প্রসার-কার্য ফলপ্রসূ হবে।

প্রসঙ্গতঃ খাদ্যোৎপাদনের সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িত কয়েকটি বিষয়ের অবতারণা করা সঙ্গত মনে করি। বৈজ্ঞানিক প্রথায় খাদ্যোৎ-পাদনের ব্যাপারে এগুলির সংযোগ ক্ষীণ হলেও

এটুকু স্বীকার করতে হবে এবং বোঝবারও প্রয়োজন রয়েছে যে, খাদ্যোৎপাদন যথেষ্ট পরিমাণে হলেই খাদ্যাভাব এবং তৎসংক্রান্ত সমস্যাদির সমাধান সুনিশ্চিত হবে না। খাদ্যের সঙ্গে যতদিন কূটনৈতিক কিম্বা রাজনৈতিক উত্থান-পতন জড়িয়ে থাকবে, ততদিন অধিকতর খাদ্যোৎপাদনই একমাত্র সমস্যা নয়। উদ্বৃত্ত প্রদেশেও দুর্ভিক্ষের কালো ছায়া দেখেছি, সে যে কেবল সুষ্ঠু বন্টন ব্যবস্থার অভাব এবং চোরা কারবারীদের দৌরাত্ম্যজনিত, তার প্রমাণ রয়েছে। এই দুর্ব্যবস্থার দায়িত্ব সম্পূর্ণ প্রশাসনিক। বলা যায় যে, বন্টন ব্যবস্থা যদি ঠিক হতো, তাহলে আমাদের বর্তমান অভাব এত বেশী মারাত্মক হতো না, যার জন্যে বাইরে থেকে ক্রমাগত অধিকতর পরিমাণে খাদ্য আমদানী করতে হচ্ছে। আমার দৃঢ় মত এই যে, যতদিন পর্যন্ত আমরা অনাবশ্যক আমদানী বন্ধ করতে না পারি, ততদিন পর্যন্ত কোন প্রকার উৎপাদন বৃদ্ধির কাজই ঠিকমত প্রচলন করা যাবে না অথবা করলেও নিরর্থক হতে বাধ্য। যদি খাদ্য আমদানী একান্তই আবশ্যক হয়, তাহলে উপযুক্ত ক্রয়মূল্য দিয়েই যেন আমদানী করা হয়, অন্যথায় স্বনির্ভরতার প্রচেষ্টা ব্যাহত হবে। বন্টন ব্যবস্থায় গলদ থাকবার আর একটি হানিকর পরিণাম এই যে, একটি বিশেষ শ্রেণী লাভবান হচ্ছে এবং সেজন্যেই মূল্যস্ফীতি রোধ করা যাচ্ছে না।

চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় কৃষিখাতে বরাদ্দের একটি বৃহৎ অংশই ব্যয়িত হবে কৃষি-উৎপাদন সংক্রান্ত বিষয়ে, অথচ তার সুফল সমস্ত কৃষকের মধ্যে ছড়িয়ে পড়বে না। সারের মোটা অংশ ব্যবহৃত হবে রপ্তানীযোগ্য ফসলের জন্যে। বাকী যেটুকু খাদ্যোৎপাদনের জন্যে ব্যয়িত হবে, তাও যাবে অপেক্ষাকৃত অবস্থাপন্ন কৃষকদের হাতে, যারা বেশী জমি চাষ করে, কিন্তু নিজের হাতে নয়; অর্থাৎ তাদের উৎসাহ অনন্ত। অতএব যারা সার, জলসেচ ইত্যাদি সুযোগ-সুবিধাগুলি উপযুক্তভাবে গ্রহণ করতে পারতো, তারাই হবে বঞ্চিত। সেচের জল অর্ধেকেরও কম ব্যবহৃত হয়, তার কারণ যে অর্ধেকের নিজেদের জমি নেই, তারা আর্থিক অক্ষমতার জন্যে জল ব্যবহারের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হলো। তাছাড়া অনেক ক্ষেত্রে জলের অনবরত অপচয় ঘটছে, অথচ কৃষকের জমিতে পৌঁছাবার জন্যে প্রয়োজনীয় খাল বা নালা তৈরি হচ্ছে না। বর্ষাকালে বহুব্যয়ে প্রস্তুত বাঁধের বাড়তি জল না ছেড়ে দিলে বাঁধ রক্ষা পায় না, অথচ কৃষকের তখন ঐ জলের প্রয়োজন নেই। সেই জল যদি পুষ্করিণী ইত্যাদিতে সংরক্ষিত করা যেতো তাহলে প্রয়োজনের সময়ে ব্যবহার করা সম্ভব হতো। অন্য দিকে বাঁধের জল প্রত্যাহার করবার অব্যবহিত পূর্বে যথেষ্ট জল অপ্রয়োজনীয়ভাবে নষ্ট হয়, সেই জলও সঞ্চিত রাখবার ব্যবস্থা বাঞ্ছনীয়। কোথাও কোথাও পাম্পের বন্দোবস্ত থাকলে জলের অপচয় লাঘব করা যায়।

বর্তমান কৃষিঋণ ব্যবস্থায় ধনী কৃষকই উপকৃত হচ্ছে, অথচ যার ঋণের প্রয়োজন সর্বাধিক সেই থাকলো বঞ্চিত হয়ে। শুধু তাই নয়, তারা অন্যত্র অধিক সুদে ঋণ করতে বাধ্য হয় এবং ক্রমশঃ জমি তুলে দেয় ধনী কৃষকদের হাতে অথবা ফসল তুলে দেয় জোতদার এবং মজুত-দারের হাতে, যার জন্যে ফসল জমা হচ্ছে তাদের ঘরে। এই প্রথায় ক্রমশঃ কৃষি-মজুরের অবস্থার সামগ্রিক অবনতি ঘটছে। এই দুরবস্থার অবসান ঘটাতে হলে মূলগত ভূমিসংস্কার প্রয়োজন। অন্যথায় খাদ্যোৎপাদনের কোনরূপ ব্যাপক ব্যবস্থাই কার্যকরী হতে পারবে না।

শাক-সব্জী, কন্দ মূল ও হাঁস-মুরগী পালন খাদ্য-ব্যবস্থার যে কোন সামগ্রিক পরিকল্পনার অনিবার্য অংশ। এই সব ব্যবস্থা সাধারণতঃ খুব বেশী ব্যয়বহুল নয় এবং প্রয়োজনীয় বৈজ্ঞানিক তথ্যাদি

জানাও খুব শ্রমসাধ্য নয়। দুগ্ধ উৎপাদন আমাদের প্রয়োজনের তুলনায় খুবই কম। বর্তমানে আমাদের বহু অপ্রয়োজনীয় গবাদি পশু রয়েছে। সেগুলি দরিদ্র কৃষকের পক্ষে নিরতিশয় ভারবহ হয়ে পড়ছে। দুঃখের বিষয় যে, ধর্মীয় বাধা সৃষ্টির দ্বারা এই ভার লাঘবের পথ দুরতিক্রম্য করে তোলা হয়েছে। গোড়াতেই গলদ রয়েছে, সুতরাং এখন কঠিন হস্তে এর প্রতিকার না করলে খাদ্যোৎপাদন বৃদ্ধির প্রচেষ্টাও নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

উদ্ভিদ-হর্মোন—অক্সিন

প্রবীরকুমার মুখোপাধ্যায়

সাধারণভাবে প্রাণীজ হর্মোন আমাদের কাছে যতটা পরিচিত, উদ্ভিদের হর্মোন ততটা নয়। আসলে উদ্ভিদ-হর্মোনের উপর বিস্তৃত গবেষণার ইতিহাস বেশী দিনের নয়, বোধ হয় মাত্র অর্ধশতাব্দীর। বিগত ৪০-৫০ বছরে উদ্ভিদের হর্মোন সম্বন্ধে গবেষণা হয়েছে প্রচুর—পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের গবেষণাগারে। এর ফলে হাতে এসেছে গবেষণালব্ধ অসীম ক্ষমতা, যার সার্থক প্রয়োগে স্বাধীন ভারতে একটি স্বয়ংনির্ভর বলিষ্ঠ কৃষি-ব্যবস্থা গড়ে ওঠবার সম্ভাবনা রয়েছে।

ইতিহাস—উদ্ভিদ-জীবনের বিচিত্রমুখী প্রকাশ যে বহুলাংশে নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে উদ্ভিদেরই কোষে প্রবাহিত কিছু রাসায়নিক পদার্থের দ্বারা—এই কথা প্রাচীন ভারতীয়দের অজানা ছিল না। বিবর্তনবাদের জনক চার্লস ডারুইনের লেখা 'The Power of Movements in plants' বইটিতে বর্ণিত ছোট-খাটো পরীক্ষাগুলি উদ্ভিদদেহে এই ধরণের রাসায়নিক উত্তেজক পদার্থের উপস্থিতির কথাই নির্দেশ করে।

জার্মান বিজ্ঞানী জুলিয়াস স্যাক্স (১৮৮০, '৮২) উদ্ভিদদেহে হর্মোনের উপস্থিতির বিষয় অবহিত ছিলেন বলেই জানা যায়। অবশ্য এই জাতীয় রাসায়নিক পদার্থের হর্মোন নামকরণ করেন সর্বপ্রথম ফিটিং (১৯০৯)।

উদ্ভিদের হর্মোন—উদ্ভিদের কোষে সচরাচর নানা প্রকারের হর্মোন উৎপন্ন হয়ে থাকে; যথা—জিবারেলিন (Gibberellins), কাইনেটিন (Kinetin), ডরমিন (Dormin), অ্যানথেসিন (Anthesin)*, অক্সিন (Auxins) ইত্যাদি।

উদ্ভিদদেহের বিভিন্ন হর্মোনের মধ্যে অক্সিন একটি বহু আলোচিত নাম। সাধারণভাবে অক্সিন বলতে বোঝায় উদ্ভিদকোষের সেই জাতীয় রাসায়নিক জৈব পদার্থকে, যার অত্যন্ত লঘু দ্রবণ অতি সামান্য পরিমাণে[১] উদ্ভিদ-অঙ্গের বৃদ্ধিতে প্রভাব বিস্তার করে এবং উদ্ভিদের অনেক শারীরবৃত্তিক কার্যাদি নিয়ন্ত্রিত করে।

অক্সিন তৈরির কেন্দ্র—উদ্ভিদদেহে অক্সিন তৈরির প্রধান প্রধান কেন্দ্রগুলি হলো—কচি পাতা, মুকুল, ফুল, পুষ্পমঞ্জরী এবং পুষ্পবৃন্তিকা। ভ্যান ওভারবিক এবং বনার (১৯৩৮) বলেন

* কোন কোন সোভিয়েট বিজ্ঞানী উদ্ভিদ-কোষে অ্যানথেসিনের অস্তিত্বে বিশ্বাসী।

১। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়—আনারস গাছের কাণ্ডের শীর্ষভাগ থেকে (প্রতি কিলোগ্র্যামে) অক্সিন নিষ্কাশিত করলে পাওয়া যাবে মাত্র ০.০০৬ মিলিগ্র্যাম।

যে, উদ্ভিদের মূলের অগ্রভাগের তন্তুতেও নাকি অল্প পরিমাণে অক্সিন উৎপন্ন হয়ে থাকে।

উদ্ভিদকোষে স্বাভাবিকভাবে উৎপন্ন অক্সিনের অন্যতম—ইনডোল অ্যাসেটিক অ্যাসিড (Indole acetic acid or IAA) তৈরি হয়ে থাকে অ্যামিনো অ্যাসিড ট্রিপ্টোফেন (Tryptophane) থেকে। ট্রিপ্টোফেন থেকে প্রথমে হয় ইন্‌ডোলঅ্যাসিট্যালডিহাইড (Indoleacetaldehyde); পরে এথেকেই তৈরি হয় ইনডোল-অ্যাসেটিক অ্যাসিড। এই রূপান্তরের মধ্যবর্তী বিক্রিয়াগুলিকে বহুলাংশে নিয়ন্ত্রিত করে থাকে এনজাইম, তাপমাত্রা এবং জিঙ্ক বা দস্তা।

জার্মেনী থেকে Eike Libbert জানিয়েছেন যে, মটর গাছের কাণ্ড থেকে ৫৮টি বিভিন্ন প্রজাতির ব্যাক্টিরিয়ার সন্ধান পাওয়া গেছে, যারা ট্রিপ্টোফেনকে ইনডোল অ্যাসেটিক অ্যাসিডে রূপান্তরিত করতে সক্ষম।

বিভিন্ন ধরণের অক্সিন—১৯৩৪ সালে ক্যোগ et al জৈব উৎস থেকে অক্সিনধর্মী তিনটি রাসায়নিক পদার্থ বিশুদ্ধ স্ফটিকাকারে নিষ্কাশিত করেন। এগুলি হলো—অক্সিন-এ (Auxin. a: C_{18} H_{32} O_5), অক্সিন-বি (Auxin b: $C_{18}H_{30}O_4$) এবং হেটারো-অক্সিন (Heteroauxin: ($C_{10}H_9O_2N$)। এদের রাসায়নিক নাম হলো যথাক্রমে—অক্সেনট্রিয়োলিক অ্যাসিড (Auxentriolic acid), অক্সেনোলোনিক অ্যাসিড (Auxenolonic acid) এবং ইনডোল ৩-অ্যাসেটিক অ্যাসিড (Indole 3-acetic acid)। উদ্ভিদদেহে স্বাভবিকভাবে উৎপন্ন অক্সিনের মধ্যে ইনডোল অ্যাসেটিক অ্যাসিড (IAA) প্রধান।

উদ্ভিদদেহে অক্সিনের প্রবাহ—অন্যান্য হর্মোনের মত অক্সিনও উৎপত্তিস্থল থেকে কর্মস্থলে বিশেষ নিয়ম অনুযায়ী পরিবাহিত হয়। অক্সিনের এই প্রবাহ সচরাচর উদ্ভিদের উপরিভাগ থেকে নিম্নভাগে হয়ে থাকে বলে ধারণা করেন ওয়েন্ট এবং হোয়াইট (১৯৩৯)। মাটিতে কিম্বা উদ্ভিদের গোড়ায় অক্সিন প্রয়োগ করলে তা শোষিত হয় এবং বায়ুমোচনের স্রোতে (Transpiration stream) অক্সিনের অণুগুলি উদ্ভিদের উপরিভাগে চালিত হয় (হিচ্‌কক্‌ এবং জিমারম্যান, ১৯৩৫, '৩৮; কেরী ১৯৪৫)। অক্সিনের এই বিশেষ প্রবাহের কোন কারণ জানা যায় নি। শুধুমাত্র দেখা গেছে, উদ্ভিদের কোষগুলিই এই প্রবাহের সময় সক্রিয় ভূমিকা নিয়ে জীবন্ত থাকে।

ক্লার্ক (১৯৩৮) বলেন যে, উদ্ভিদের তন্তুসমূহে বৈদ্যুতিক বিভবের (Electrical potential) বৈষম্যই এর কারণ। এই তথ্যের পরীক্ষালব্ধ প্রমাণ অবশ্য পাওয়া যায় নি।

উদ্ভিদ জীবনে অক্সিনের প্রভাব—উদ্ভিদদেহে অক্সিনের প্রভাব পরিষ্কারভাবে অনুধাবন করা সম্ভব হয় যই গাছে (Avena sativa, Linn. ইং—Oat plant. বাং—যই)। ঘাস পরিবারের (Graminae) অন্যান্য সদস্যদের মতই যই গাছ যখন মাটি ফুঁড়ে বীজ থেকে অঙ্কুরিত হয়, তরুণ ভ্রূণমুকুলের অগ্রভাগ (Stem tip) তখন প্রথম কচিপাতা এবং মুকুলাবরণী (Coleoptile) দিয়ে আচ্ছাদিত থাকে। ১৯২৫ সালে স্তোডিং দেখলেন, মুকুলাবরণী সমেত ভ্রূণমুকুলের শীর্ষভাগের কয়েক মিলিমিটার নীচের অংশটি কেটে অপসারিত করলে গাছটির বৃদ্ধি সঙ্গে সঙ্গেই ব্যাহত হয়। তিনি আরও লক্ষ্য করলেন যে, কর্তিত অংশটি (সেই গাছের বা অন্য কোন যই গাছের) যদি আবার যথাস্থানে প্রতিস্থাপিত করা যায়, তাহলে গাছটি আবার স্বাভাবিকভাবেই বাড়তে থাকে। এথেকে তিনি ধারণা করেন—নিশ্চয়ই কোন উত্তেজক রাসায়নিক পদার্থ ভ্রূণমুকুলটির শীর্ষদেশ থেকে নিঃসৃত হয়ে মুকুলাবরণীর মাধ্যমে শিশু-উদ্ভিদটির নিম্নাংশে প্রবাহিত হচ্ছে এবং তার বৃদ্ধি ত্বরান্বিত করছে।

ওয়েন্ট ও (১৯২৮,-'৩৫) অনুরূপ একটি পরীক্ষা করেন। যই গাছের মুকুলাবরণী সমেত কর্তিত অগ্রভাগটি নিয়ে তিনি ৩% অ্যাগারের চৌকা একটি পাত্‌লা ব্লকের উপর রাখলেন। ঘন্টাখানেক বাদে অ্যাগারের সেই ব্লকটি শুধু যই গাছটির কর্তিতাংশে প্রতিস্থাপিত করে দেখলেন, গাছটির বৃদ্ধি আগের মতই হতে লাগলো। কিন্তু ঐ অংশে শুধুমাত্র বিশুদ্ধ অ্যাগারের ব্লক চাপিয়ে কোন ফল পাওয়া গেল না। এই পরীক্ষা করে ওয়েন্ট সিদ্ধান্ত করলেন যে, যই গাছের কর্তিত অগ্রভাগ থেকে নিশ্চয়ই সেই উত্তেজক রাসায়নিক পদার্থটি অ্যাগারের ব্লকে এসে জমেছিল, যার জন্যে অ্যাগারের ব্লকটি কর্তিত অংশে প্রতিস্থাপিত করায় ভ্রূণমুকুলটির বৃদ্ধি অব্যাহত ছিল। উদ্ভিদের বৃদ্ধির ব্যাপারে সহায়তা করা ছাড়াও অক্সিন উদ্ভিদের কার্বোহাইড্রেট বিপাকে সহায়তা করে থাকে। উদ্ভিদের পাতায় এবং কাণ্ডে অক্সিন প্রয়োগ করে মিচেল এবং হোয়াইটহেড (১৯৪০) দেখিয়েছেন যে, অক্সিন উদ্ভিদকোষে শ্বেতসারের (Starch) আর্দ্রবিশ্লেষণে (Hydrolysis) সহায়তা করে। থাইম্যান (১৯৪১) মনে করেন, উদ্ভিদের শ্বাসকার্যও অনেকাংশে অক্সিন কর্তৃক প্রভাবিত হয়। অক্সিন কোষের বৃদ্ধিতে সহায়তা করে এবং কোষ-প্রাচীরের গায়ে সেলুলোজ অণুর অতিরিক্ত আস্তরণ ফেলে।

অক্সিন ও নিউক্লিক অ্যাসিড—জীবনের বহুমুখী বিচিত্র প্রকাশকে বহুলাংশে নিয়ন্ত্রিত করে থাকে কোষস্থ দুই ধরণের নিউক্লিক অ্যাসিড। এরা হলো—ডি এন. এ. (DNA : Deoxyribonucleic acid) ও আর. এন. এ. (RNA : Ribonucleic acid)।

আমরা জানি, জীবনের সঙ্গে প্রোটিনের সম্বন্ধ নিবিড়। উদ্ভিদকোষের ডি. এন. এ. তিন রকমের আর. এন. এ'র সহায়তায় প্রোটিন সংশ্লেষণ করে থাকে। এস. পি. সেন মটর গাছের কাণ্ডে ইণ্ডোল-অক্সিন প্রয়োগ করে আর. এন. এ অণুর দ্রুত সংশ্লেষণ লক্ষ্য করেছেন; আর নিউক্লিক অ্যাসিড সংশ্লেষণ নিঃসন্দেহে উদ্ভিদের বৃদ্ধির সঙ্গে সম্পর্কিত।

অক্সিন কিভাবে কাজ করে—অক্সিন উদ্ভিদ-কোষের বিভিন্ন এনজাইমের প্রোটিন অংশের সঙ্গে মিলিত হয়ে ক্রিয়া করে থাকে। স্কুগ et al (১৯৪২) বলেন যে, অক্সিন অণুর গঠন সম্ভবতঃ এনজাইমের প্রোটিন অণুর সঙ্গে যুক্ত হবার পক্ষে অনুকূল।

উদ্ভিদের অন্যান্য হর্মোনের সঙ্গে অক্সিনের সম্পর্ক—এস. এন. মাথুর দেখেছেন যে, মটর গাছের মুকুলের (অন্ধকারে বর্ধিত) বৃদ্ধিকে অক্সিন বাধা দিয়ে থাকে (Growth of the bud of etiolated Pisum seedlings) আর কাইনেটিন (Kinetin) সেই বাধা অপসারিত করতে সক্ষম; অর্থাৎ উদ্ভিদের বৃদ্ধির ব্যাপারে অক্সিন ও কাইনেটিনের যোগসাজস থাকা অসম্ভব নয়। দেখা গেছে, জিবারেলিন (Gibberellic acid or G. A.) অক্সিনের ক্রিয়ার উপর প্রভাব বিস্তার করে থাকে। আরও দেখা গেছে, কতকগুলি ভিটামিনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে অক্সিন ভাল কাজ দিয়ে থাকে।

আধুনিক কৃষি-ব্যবস্থায় অক্সিনের ভূমিকা—অক্সিনধর্মী কিছু কিছু রাসায়নিক পদার্থ সম্প্রতি কৃত্রিম উপায়ে তৈরি করা সম্ভব হয়েছে। আপাতদৃষ্টিতে এই সব যৌগিক পদার্থের মধ্যে পার্থক্য দেখা গেলেও আণবিক গঠনের দিক থেকে তারা বহুলাংশে অভিন্ন। আধুনিক কৃষি-ব্যবস্থায় নানাভাবে অক্সিনকে কাজে লাগিয়ে সুফল পাওয়া যাচ্ছে।

অক্সিন—২, ৪—ডাইক্লোরোফেনক্সি অ্যাসেটিক অ্যাসিড (2,4-Dichlorophenoxyacetic acid or 2, 4-D) কিম্বা আইসোপ্রোপাইলফিনাইল-কার্বামেট (Isopropylphenylcarbamate)-এর

০·১% দ্রবণ কৃষিক্ষেত্রে ছড়িয়ে ঘাস ও অন্যান্য অবাঞ্ছিত আগাছা সহজেই নির্মূল করা সম্ভব। টাফাজিন (Tafazine) দিয়েও আগাছা মারা যাচ্ছে। মেনডক (Mendok: 2, 3-Dichloroisobutyrate) এবং ডালাপন (Dalapon: Sodium 2, 2—Dichloropropionate) এই ব্যাপারে সুফল দিতে পারে বলে মনে করেন—এইচ. ওয়াই. মোহনরাম এবং পি. এন. রুস্তাগী।

উদ্ভিদের কাটিংয়ের (Cuttings) সাহায্যে বংশবৃদ্ধি করানো একটি সুপ্রাচীন পদ্ধতি। কাটিংয়ে যত তাড়াতাড়ি শিকড় গজাবে, মাটিতে তত তাড়াতাড়ি উদ্ভিদটি ধরে যাবে। ন্যাপথালিন অ্যাসিটামাইড (Napthaleneacetamide), ইণ্ডোলবিউটারিক অ্যাসিড (Indolebutyric acid) প্রভৃতি অক্সিন কাটিংয়ে যথাস্থানে প্রয়োগ করে সত্বর শিকড় গজানো সম্ভব।

আলফা-ন্যাপথালিন অ্যাসিড (α-Napthaleneacetic acid), ২, ৪-ডাইক্লোরোফেনক্সি-অ্যাসেটিক অ্যাসিড (2, 4-D) প্রভৃতি অক্সিন আনারস গাছে প্রয়োজনানুযায়ী প্রয়োগ করে গাছটিকে নির্ধারিত সময়ের পূর্বেই পুষ্পিত করা সম্ভব হয়েছে। লিয়োপোল্ড এবং থাইম্যান (১৯৪৯) পরীক্ষা করে দেখিয়েছেন যে, আলফা-ন্যাপথালিনঅ্যাসেটিক অ্যাসিডের লঘু দ্রবণ যেমন বার্লি গাছে সত্বর ফুল ফোটায়, বেশী ঘন দ্রবণ প্রয়োগ করলে তেমনি উল্টো ফল হবারই সম্ভাবনা।

কলা, আপেল, ন্যাসপাতি প্রভৃতি ফল দ্রুত পাকাবার জন্তেও 2, 4-D জাতীয় কয়েকটি অক্সিন খুব ভাল কাজ দেয়। আলু সঞ্চয় করে রাখবার সময় যাতে মুকুলিত না হয়, অক্সিন-ন্যাপথালিনঅ্যাসেটিক অ্যাসিডের মিথাইল এষ্টার প্রয়োগ করে সে ব্যবস্থা অনায়াসে করা যায়।

পাকা ফল পাড়বার আগেই গাছ থেকে মাটিতে পড়ে থেঁৎলে গিয়ে যাতে নষ্ট না হয়—সে ব্যবস্থাও অক্সিন দিয়ে করা যায়। গার্ডনার (১৯৪০) বলেন, ন্যাপথালিন-অ্যাসেটিক অ্যাসিড ও ন্যাপথালিন অ্যাসিটামাইড পাকা ফল পাড়বার সপ্তাহখানেক আগে গাছের আপেলগুলির উপর ছিটিয়ে দিলে আপনা থেকেই ফল আর মাটিতে পড়ে নষ্ট হবে না।

পরাগসংযোগ না হলেও 2, 4-D জাতীয় অক্সিন প্রয়োগ করে টোম্যাটোর ফুল থেকে ফল উৎপাদন করা সম্ভব হয়েছে। গাসটাপসন (১৯৩৬) দেখিয়েছেন— ইনডোলঅ্যাসেটিক অ্যাসিড, ইনডোলপ্রোপ্রায়োনিক অ্যাসিড (Indoleproprionic acid) প্রভৃতি অক্সিন লাউ, টোম্যাটো, ষ্ট্রবেরী প্রভৃতির অনিষিক্ত ফুলের গর্ভমুণ্ডে প্রয়োগ করে অপুংজনিত ফল (Parthenocarpic fruits) উৎপাদন করা সম্ভব।

আবার প্রতিটি গাছ থেকে তুলা আহরণের কষ্ট স্বীকার না করে, তুলা তোলবার সময় হলে ক্ষেতে তুলা গাছের উপর অক্সিন ছড়িয়ে দিলেই কাজ হয়ে যাবে—তুলা সব আপনা থেকেই ঝরে পড়বে।

কটকে Central Rice Research Institute-এ কে. এস. মূর্তি এবং নরসিং রাও পরীক্ষা করে দেখেছেন, ইনডোলঅ্যাসেটিক অ্যাসিড বা ন্যাপথালিন অ্যাসেটিক অ্যাসিডের (NAA) লঘু দ্রবণ (I ppm.) ধান গাছের উপর ছড়িয়ে ধানের উৎপাদন শতকরা ১০ থেকে ২৫ ভাগ বাড়ানো সম্ভব। পাট গাছের উপর IAA, NAA এবং ইনডোলবিউটারিক অ্যাসিড (IBA) প্রয়োগ করে দেখা গেছে যে, এই সব হর্মোন ক্যাম্বিয়ামের (Cambium) উপরেও প্রভাব বিস্তার করে। পাটের উৎপাদনও অনেকাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে—এমন কি, পাটের আঁশের গুণাগুণও কিছু কিছু প্রভাবিত হয়েছে। তবে নাইট্রোজেন-

সমৃদ্ধ সারের সঙ্গে এই জাতীয় হর্মোন প্রয়োগ করে আরও বেশী সুফল পাওয়া গেছে।

আসামের Tocklai Experimental Station-এ ডি. এন. বড়ুয়া চা গাছের কাটিং-এ ইনডোল-৩-বিউটারিক অ্যাসিড (20-100 ppm.) প্রয়োগ করে দেখেছেন যে, এর দ্বারা অপেক্ষাকৃত কম সময়ে শিকড় গজানো সম্ভব। আম, পেয়ারা, তুঁত (Mulberry) গাছের কাটিংয়ে এভাবে অক্সিন প্রয়োগ করে সুফল পাওয়া গেছে।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এস. এম. সরকারের গবেষণাগারে কচুরীপানা (Water Hyacinth)[২] থেকে হর্মোন (যার মধ্যে অক্সিনও রয়েছে) নিষ্কাশিত করা গেছে এবং ধান ও পাট গাছের গঠন ও বিপাকীয় তন্ত্রের (Metabolic system) উপর তার গভীর প্রভাব লক্ষ্য করা গেছে।

গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ে এন. দাস এবং কে. এস. সিং লাউ, কুমড়া প্রভৃতি গাছের উপর ন্যাপথালিন অ্যাসেটিক অ্যাসিড (NAA) প্রয়োগ করে (40-60 ppm.) বীজহীন ফল তৈরির ব্যাপারে কৃতকার্য হয়েছেন।

উদ্ভিদের রোগ প্রতিরোধের ক্ষেত্রেও অক্সিনের ব্যবহার ফলপ্রদ হয়েছে। ভাইরাস ঘটিত রোগের প্রাবল্য (যেমন—তামাক গাছের Tobacco Mossaic Virus বা TMV-র কথাই ধরা যাক) 2, 4-D জাতীয় অক্সিন প্রয়োগ করে কিছুটা হ্রাস করা সম্ভব হয়েছে।

এ তো গেল অক্সিনের সামান্য কয়েকটি কাজের কথা। এছাড়া অক্সিন যে আরও কতভাবে কৃষিকার্যে মানুষের কাজে লাগছে, তা বলে শেষ করা যায় না। অক্সিনের অসাধারণ ক্ষমতাকে সার্থকভাবে কাজে লাগাতে হলে এখন প্রধানতঃ দুটি বিষয়ে আমাদের গবেষণা চালাতে হবে—এক—অক্সিন সম্বন্ধে যে সব তথ্য এখনও অজানা, সেগুলিকে জানতে হবে। দুই—এরই সঙ্গে সঙ্গে উপায় উদ্ভাবন করবার চেষ্টা করতে হবে, কি ভাবে কম খরচে অক্সিনের বহুল ব্যবহার করা যেতে পারে।

[বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগের যৌথ উদ্যোগে উদ্ভিদ-হর্মোনের উপর যে আন্তর্জাতিক আলোচনা-চক্র সম্প্রতি (২৩-২৮শে জানুয়ারী '৬১) কলকাতায় অনুষ্ঠিত হয়ে গেল, তা থেকে এই প্রবন্ধের অনেক উপাদান সংগৃহীত হয়েছে, এজন্যে লেখক সংশ্লিষ্ট সকলের নিকট কৃতজ্ঞ।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগের প্রধান অধ্যাপক এস. এম. সরকার মহাশয়ের উৎসাহ ও সাহায্যের জন্যে লেখক আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছেন।]

২। Eichhornia crassipes Mort. Solms.

স্কিজোফ্রেনিয়া ও বংশানুক্রম

অরুণকুমার রায়চৌধুরী

মনোবিজ্ঞানীদের অনেকেরই ধারণা যে, সর্বপ্রকার মানসিক রোগ পরিবেশের প্রভাবেই সৃষ্ট হয়। রোগের আবির্ভাবের মূলে বংশানুক্রমের প্রভাব তাঁরা আদৌ স্বীকার করেন না। তথ্যকে যদি বিশ্বাস করতে হয়, তাহলে তাঁদের এই ধারণা সহজে মেনে নেওয়া যায় না। Huntington's Chorea নামে এক প্রকার মারাত্মক মানসিক রোগ আছে, যা অবিসংবাদিতভাবে বংশগত রোগ বলে প্রতিপন্ন হয়েছে। আবার ক্রোমো-সোম ও বিপাক-বিশৃঙ্খলার ফলে সন্তান-সন্ততির মধ্যে যে মস্তিষ্ক-বিকৃতির লক্ষণ দেখা যায়, তাও বংশগত রোগ বলে স্বীকৃত হয়েছে। মানসিক রোগের চিকিৎসকেরা এই সব রোগের চিকিৎসা করতে অক্ষমতা প্রকাশ করে থাকেন।

বংশানুক্রম ও পরিবেশের সমন্বয়ে গড়ে ওঠে মানুষের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য। কোন বৈশিষ্ট্যকে সম্পূর্ণ বংশগত বা সম্পূর্ণ পরিবেশের অধীন বলে স্বীকার করা যায় না, বরং উভয়ের যুগ্ম প্রভাব বৈশিষ্ট্যের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। মানুষের গায়ের রং বংশানুক্রমের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হলেও পরিবেশের প্রভাবে পরিবর্তিত হয়ে থাকে। পুরীতে গিয়ে কিছুদিন থাকলে, গায়ের রং কালো হয়ে যায়, আবার কলকাতায় ফিরে এলে ফর্সা হয়ে ওঠে। গায়ের রঙের ন্যায় মানুষের দৈহিক উচ্চতাও বংশানুক্রম ও পরিবেশের উপর নির্ভরশীল। মানুষের মানসিক কার্যকলাপও সেই রকম।

বর্তমান প্রসঙ্গে স্কিজোফ্রেনিয়া নামক মানসিক রোগের উৎপত্তিতে বংশানুক্রমের প্রভাব সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। জনসাধারণের মধ্যে এই রোগের প্রাদুর্ভাব প্রায় এক শতাংশ। স্কিজোফ্রেনিয়া রোগকে 'বিভক্তমনা' বা 'বিভক্ত ব্যক্তিত্ব' হিসাবে আখ্যা দেওয়া হয়। মধ্যবয়স্কদের অপেক্ষা অল্পবয়স্ক যুবক-যুবতীদের মধ্যে এই রোগের হার বেশী। স্কিজোফ্রেনিয়া রোগীর বিভিন্ন ধরণের লক্ষণ দেখা যায়। হাবার মত একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকা, বাস্তব জ্ঞানবর্জিত অবস্থায় থাকা প্রভৃতি সাধারণ স্কিজোফ্রেনিয়া রোগীর বৈশিষ্ট্য। অনেক সময় রোগীকে অনেকক্ষণ ধরে কোন এক বিশেষ অবস্থায় নিশ্চল হয়ে পড়ে থাকতে বা পাথরের মূর্তির মত দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায়। যদি কেউ তার সেই অবস্থা পরিবর্তন করবার চেষ্টা করে, তবে সে রেগে ওঠে এবং বাধা দেয়। কিন্তু যেই তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়, তৎক্ষণাৎ সে আবার পূর্বের অবস্থায় ফিরে আসে বা দাঁড়িয়ে থাকে—এমন কি, কখন কখন সকলের সামনে নগ্ন অবস্থায় থাকতেও সঙ্কোচ বোধ করে না। তাদের কথায় ও কার্যে অস্বাভাবিক অসঙ্গতি লক্ষ্য করা যায়। যদি রোগীকে কোন দুঃসংবাদ দেওয়া যায়, তবে সে তখন ফিক্‌ফিক করে হেসে ওঠে। আবার এক শ্রেণীর স্কিজোফ্রেনিয়া রোগী আছে, যারা সব সময় অহেতুক ভয় ও সন্দেহের মধ্যে বাস করে। এই রকমের রোগী ভাবে—তাকে মেরে ফেলবার জন্যে তার ভাতে বিষ মিশিয়ে দেওয়া হয়েছে বা তার পিছনে গুণ্ডা লাগানো হয়েছে—ইত্যাদি। লক্ষণের শ্রেণীবিভাগ করে স্কিজোফ্রেনিয়া রোগকে সাধারণতঃ চার ভাগে ভাগ করা হয়। মাঝে মাঝে বিভিন্ন শ্রেণীর লক্ষণ একই রোগীর মধ্যে বিভিন্ন

সময়ে প্রকাশ পায়; ফলে মানসিক রোগের চিকিৎসকের পক্ষে স্কিজোফ্রেনিয়া রোগীর শ্রেণী-বিভাগ করা সময়বিশেষে কঠিন হয়ে পড়ে।

স্কিজোফ্রেনিয়া রোগের উৎস সম্বন্ধে বিভিন্ন মতবাদ প্রচলিত আছে। কেউ বলেন বিপাক বিশৃঙ্খলার ফলে, কেউ বলেন মনস্তাত্ত্বিক বিপর্যয়ের ফলে এই রোগের উৎপত্তি হয়ে থাকে। আবার কেউ পরিবেশকে এবং কেউ বংশানুক্রমকে দায়ী করেন। যে কোন শারীরিক ব্যাধির ন্যায় স্কিজো-ফ্রেনিয়া মানসিক রোগ এত সাধারণ যে, অনেকে এই রোগকে বংশগত বলে স্বীকার করতে চান না। স্কিজোফ্রেনিয়া রোগের উৎপত্তির মূলে বংশানুক্রমের প্রভাব পূর্ণভাবে না থাকলেও আংশিকভাবে যে আছে, যমজ সন্তান পরীক্ষার সাহায্যে তার পরিচয় পাওয়া গেছে।

যমজ সন্তান দুই প্রকার—এককোষী যমজ (Monozygotic twin) ও দ্বিকোষী যমজ (Dizygotic twin)। কোষ-বিভাজনের প্রাক্কালে নিষিক্ত ডিম্ব (Fertilized ovum) দুভাগে বিভক্ত হয়ে স্বাধীনভাবে ক্রমান্বয়ে কোষ-বিভাজনে দুটি সন্তানে পরিণত হয়। এই দুটি সন্তানকে এককোষী যমজ বলে। দুটিই তারা ছেলে, অথবা মেয়ে হয়ে থাকে। একই নিষিক্ত ডিম্ব থেকে উৎপন্ন হয় বলে তারা একই উপাদানে তৈরি। অপর পক্ষে দ্বিকোষী যমজ সন্তান পৃথক দুটি নিষিক্ত ডিম্ব থেকে উৎপন্ন হয় বলে তাদের বংশানুক্রম সম্পূর্ণ আলাদা। তারা দুটি ছেলে বা দুটি মেয়ে অথবা একটি ছেলে ও অপরটি মেয়ে হতে পারে। একটি ছেলে ও একটি মেয়ে একই সঙ্গে জন্ম-গ্রহণ করলে নিসংশয়ে বলা যেতে পারে যে, তারা দ্বিকোষী যমজ সন্তান। সাধারণ ভাষায় এককোষী ও দ্বিকোষী যমজকে যথাক্রমে সদৃশ যমজ (Identical twin) ও অসদৃশ যমজ (Non-identical twin) বলা হয়। সদৃশ যমজ সন্তান-দ্বয়ের মধ্যে রক্তশ্রেণী, আঙুলের ছাপ, গায়ের রং, চোখের মণির রং প্রভৃতি বৈশিষ্ট্যের যেমন আশ্চর্য রকম মিল দেখা যায়, অসদৃশ যমজ সন্তানদ্বয়ের মধ্যে তেমন মিল দেখা যায় না।

বিভিন্ন পরিবেশে প্রতিপালিত সদৃশ যমজ ও একই পরিবেশে প্রতিপালিত অসদৃশ যমজের সাহায্যে প্রজনন-বিজ্ঞানীরা কোন বৈশিষ্ট্যের বংশা-নুক্রম ও পরিবেশের তুলনামূলক প্রভাব সম্বন্ধে গবেষণা করে থাকেন। বিভিন্ন পরিবেশে সদৃশ যমজ সন্তানদ্বয়ের কোন বৈশিষ্ট্যের পার্থক্য দেখা গেলে তা পরিবেশের পার্থক্য থেকেই উৎপন্ন হয়েছে বলে মনে করা হয়। আবার একই পরিবেশে অসদৃশ যমজ সন্তানদ্বয়ের কোন বৈশিষ্ট্যের পার্থক্যকে দুটি ভিন্ন বংশানুক্রমের পার্থক্য বলে গ্রহণ করা হয়।

আমেরিকা, ইংল্যাণ্ড, জার্মেনী ও জাপানের গবেষণা থেকে জানা যায় যে, একই পরিবেশে প্রতিপালিত দুজন সদৃশ যমজ সন্তানের স্কিজোফ্রে-নিয়ায় আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা ৮০%, কিন্তু অসদৃশ যমজের ক্ষেত্রে মাত্র ১৩%। স্কিজোফ্রেনিয়ার কারণ হিসেবে যদি একমাত্র পরিবেশকে দায়ী করা হয়, তাহলে একই পরিবেশে প্রতিপালিত হয়ে শতকরা সাতাশীটি অসদৃশ যমজ সন্তানের মধ্যে একজন রোগাক্রান্ত ও অপর জন নীরোগ হয় কেন? আবার বংশানুক্রমের প্রভাবকে যদি পুরাপুরিভাবে স্বীকার করা হয়, তাহলে শতকরা কুড়িটি সদৃশ যমজ সন্তানের মধ্যে একজনের রোগের লক্ষণ দেখা যায় এবং অপর জনের মধ্যে দেখা যায় না কেন? তুলনামূলক-ভাবে বিচার করে বলা যেতে পারে যে, স্কিজোফ্রেনিয়া উৎপত্তির মূলে বংশানুক্রমের প্রভাব যত বেশী, পরিবেশের প্রভাব তত নয়।

একজন প্রজনন-বিজ্ঞানী শুধুমাত্র সদৃশ যমজ সন্তানের সাহায্যে দেখিয়েছেন যে, যে ক্ষেত্রে সদৃশ যমজের দুজন স্কিজোফ্রেনিয়া মানসিক রোগে আক্রান্ত হয়ে থাকে, তাদের পরিবারের আত্মীয়-

স্বজনদের মধ্যে বেশী সংখ্যক রোগগ্রস্ত ব্যক্তি দেখা যায়, কিন্তু যে ক্ষেত্রে মাত্র একজন রোগাক্রান্ত ও অপর জন নীরোগ হয়ে থাকে, তাদের পরিবারের আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে স্কিজোফ্রেনিয়া রোগী কম দেখা যায়। এই তথ্য থেকে একথাই প্রমাণিত হয় যে, স্কিজোফ্রেনিয়ার উৎপত্তিতে বংশানুক্রমের বিশেষ প্রভাব আছে।

কালমান (Kallmann) নামে আর একজন প্রজনন-বিজ্ঞানী একই পরিবেশে ও ভিন্ন পরিবেশে প্রতিপালিত সদৃশ যমজ সন্তানদের দুই দলে ভাগ করে দেখেছেন যে, দুজন যমজ সন্তান রোগাক্রান্ত হবার সম্ভাবনা প্রথম ক্ষেত্রে ৮৬% এবং দ্বিতীয় ক্ষেত্রে ৭৮%। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, সদৃশ যমজ সন্তানদের দুজন একই বা ভিন্ন পরিবেশে প্রতিপালিত হলেও দুটি সম্ভাবনার হারের পার্থক্য খুব বেশী নয়।

প্রজনন-বিজ্ঞানীদের গবেষণা শুধুমাত্র যমজ সন্তানের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। তাঁরা বিভিন্ন পরিবার বিশ্লেষণ করে স্কিজোফ্রেনিয়া রোগের উৎপত্তির কারণ অনুসন্ধান করবার চেষ্টা করেছেন। আগেই বলা হয়েছে যে, জনসাধারণের মধ্যে স্কিজোফ্রেনিয়া রোগের প্রাদুর্ভাব শতকরা প্রায় একজনের মধ্যে দেখা যায়। স্কিজোফ্রেনিয়া রোগীর আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে যত বেশী রোগাক্রান্ত ব্যক্তির সন্ধান পাওয়া যায়, সুস্থ ব্যক্তির আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে অত দেখা যায় না এবং তার হার শতকরা একজন অপেক্ষা অনেক বেশী। আমেরিকায় এক সমীক্ষায় দেখা গেছে যে, রোগগ্রস্ত ব্যক্তির ভাইবোন, পিতামাতা ও সন্তান-সন্ততিদের মধ্যে স্কিজোফ্রেনিয়া রোগে আক্রান্ত হবার হার যথাক্রমে ১৪.২%, ১০.৩% ও ১৬.৪%।

প্রজনন-তাত্ত্বিক পরামর্শে (Genetic counseling) উপরিউক্ত তথ্য কাজে লাগানো হয়। পিতামাতার মধ্যে যে কোন একজন স্কিজোফ্রেনিয়া রোগগ্রস্ত হলে তাঁদের যে কোন সন্তান ঐ রোগে আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা এক ষষ্ঠাংশ এবং কালমানের হিসেব অনুযায়ী পিতামাতা উভয়েই রোগগ্রস্ত হলে তাদের অর্ধেক সন্তানসন্ততির রোগাক্রান্ত হবার সম্ভাবনা থাকে।

স্কিজোফ্রেনিয়া রোগের প্রকৃত উত্তরাধিকার সূত্র এখনও পরিষ্কারভাবে জানা যায় নি এবং জটিল বলেই অনেকের ধারণা। কালমানের অনুমান, স্কিজোফ্রেনিয়া রোগ প্রচ্ছন্ন জিন-এর (Recessive gene) দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। যারা এই রোগের দুটি প্রচ্ছন্ন জিন বহন করে, তারা রোগগ্রস্ত হয়ে থাকে; কিন্তু যারা একটি জিন বহন করে, তাদের মধ্যে অল্পমাত্রায় রোগের লক্ষণ প্রকাশ পায়। তাঁর অনুমান কতদূর সত্য, তা বলা শক্ত। সাম্প্রতিক গবেষণায় জানা গেছে যে, স্কিজোফ্রেনিয়া রোগের উৎপত্তিতে ক্রোমোসোম বিশৃঙ্খলার কারণও জড়িত আছে।

যাহোক যমজ সন্তান পরীক্ষা ও পরিবার সমীক্ষা থেকে এই সিদ্ধান্তে আসতে হয় যে, স্কিজোফ্রেনিয়া রোগের উৎপত্তির মূলে প্রতিকূল পরিবেশ ছাড়াও বংশানুক্রমের যে বিশেষ প্রভাব আছে, তা কোন মতেই অস্বীকার করা যায় না।

পরমাণু-কেন্দ্রীনের গঠন ও সম্ভাব্য চিত্র

শ্রীকল্যাণকুমার গোস্বামী

খৃষ্টজন্মের বহু পূর্ব থেকেই বস্তু এবং তার গঠন সম্বন্ধে জিজ্ঞাসু ব্যক্তিদের মনে প্রশ্ন উঠেছিল। ভারতীয় ঋষি কণাদ বলেছিলেন যে, প্রত্যেক পদার্থকেই ভাগ করে চললে শেষ পর্যন্ত এমন এক অবস্থা আসবে, যখন আর তাকে কোন-মতেই ভাগ করা সম্ভব হবে না। গ্রীক দার্শনিক ডিমোক্রিটাসেরও মত ছিল যে, সকল বস্তুই অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণার সমষ্টি এবং এই ক্ষুদ্র কণাকে আর ভেঙে ছোট করা সম্ভব নয়। ডিমোক্রিটাস মূল কণার নাম দেন অ্যাটম অর্থাৎ অবিভাজ্য। কিন্তু বিখ্যাত গ্রীক পণ্ডিত অ্যারিষ্টটল এই মতের বিরুদ্ধবাদী ছিলেন এবং তিনি বিশ্বাস করতেন যে, বস্তুর কোন ক্ষুদ্রতম কণা থাকতে পারে না। পদার্থের গঠন সম্বন্ধে নতুন করে ভাবনার সূত্রপাত হলো বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক নিউটনের আমল থেকে। নিউটন বললেন—প্রত্যেক বস্তুই এক প্রকার অতি ক্ষুদ্র নিরেট ও শক্ত মৌলিক কণার দ্বারা গঠিত। পরমাণু-বিজ্ঞানকে বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর দৃঢ়ভাবে প্রথম প্রতিষ্ঠিত করেন জন ডালটন ১৮১০ সালে। তিনি বলেন যে, প্রত্যেক মৌলিক পদার্থ কতকগুলি পরমাণু বা অবিভাজ্য মৌলিক কণার সমষ্টি। একই মৌলিক পদার্থের পরমাণুগুলির ওজন ও ধর্ম এক এবং পৃথিবীর যাবতীয় বস্তুই ৯২ প্রকার মৌলিক পদার্থের দ্বারা গঠিত; কারণ পৃথিবীতে মোট ৯২টি মৌলিক পদার্থ আছে। ডালটনের পরমাণু-বাদকে কিছুটা পরিবর্তন করে মৌলিক পদার্থের ক্ষুদ্রতম অংশ হিসাবে অণুর কল্পনা করা হয়েছে। বস্তুর ক্ষুদ্রতম অংশ—যার মধ্যে বস্তুর নিজস্ব ধর্ম বর্তমান, তাকে বলা হয় সেই বস্তুর অণু। এই অণুকেও আবার ভাঙলে পাওয়া যায় পরমাণু এবং একটি অণু একাধিক পরমাণুর সংযোগে গঠিত হতে পারে। পরমাণুর দুটি অংশ—অন্তর্ভাগ ও বহির্ভাগ। আমরা পরমাণুর অন্তর্ভাগ অর্থাৎ পরমাণুর কেন্দ্রীনের গঠনাকৃতি ও চিত্র সম্বন্ধে আলোচনা করবো।

১৮৬০ সালেও বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক লর্ড কেলভিন তাঁর এক ছাত্রের প্রশ্নের উত্তরে বলেছিলেন যে, অ্যাটম ভাঙা সম্পূর্ণ অসম্ভব। কিন্তু এই ধারণার অবসান হলো ১৮৯৭ সালে, যখন সার জে. জে. টমসন ইলেকট্রনের অস্তিত্ব আবিষ্কার করেন। টমসনের আবিষ্কার থেকে জানা গেল যে, সকল বস্তুতেই ইলেকট্রন আছে, অর্থাৎ ইলেকট্রন সকল বস্তুর পরমাণুর উপাদান। এর ওজন একটি হাইড্রোজেন পরমাণুর প্রায় ১৮৩৬ ভাগের একভাগ মাত্র এবং এই কণাটি ঋণাত্মক তড়িতাধানে আহিত। একটি সম্পূর্ণ পরমাণু তড়িৎ-শূন্য। কাজেই পরমাণুর মধ্যে নিশ্চয়ই আর কোন কণা আছে, যা ধনাত্মক তড়িতাধানে আহিত। টমসন এই কণার নাম দেন প্রোটন। কিন্তু পদার্থের পরমাণুতে কয়টি ইলেকট্রন, কয়টি প্রোটন আছে এবং পরমাণুর মধ্যে ইলেকট্রন ও প্রোটনগুলি কিভাবে সজ্জিত আছে, সে প্রশ্নই বিজ্ঞানীদের ভাবিয়ে তুললো। টমসন বললেন যে, ইলেকট্রন এবং প্রোটনগুলি পর পর এক-একটা খোসায় (Shell) সাজানো আছে, ঠিক যেন পেঁয়াজের খোসার মত। কিন্তু রাদারফোর্ড বিভিন্ন ধাতব পাতের মধ্য দিয়ে আলফা কণাকে (একটি আলফা কণা প্রোটনের

চার গুণ ভারী এবং দুই একক ধনাত্মক তড়িতাধানে আহিত) চালাবার পরীক্ষায় দেখলেন যে, কণাগুলি ধাতব পাতের চারদিকে ছিটকে পড়ছে। ধাতুর পরমাণুর মধ্যেকার প্রোটন যদি ছাড়াছাড়িভাবে থাকে, তবে তো তার পক্ষে ভারী আলফা কণাকে ধাক্কা দেওয়া সম্ভব নয়! রাদারফোর্ড সিদ্ধান্ত করলেন যে, প্রোটনগুলি পরমাণুর কেন্দ্রে একটা পিণ্ডের মত হয়ে রয়েছে। ইলেকট্রনগুলি এই কেন্দ্রীনের চারদিকে ঘুরছে—ঠিক যেন সূর্যের চারদিকে গ্রহগুলি পাক খাচ্ছে। পরমাণুর গঠনের এই চিত্র অবলম্বন করে অধ্যাপক বোর হাইড্রোজেন বর্ণালীর বিশেষত্ব মোটামুটিভাবে ব্যাখ্যা করে দিলেন এবং তখন থেকেই পরমাণুর গঠনের এই চিত্র সঠিক বলে ধরা হয়েছে।

রাদারফোর্ড আরও বললেন যে, পরমাণুর কেন্দ্রীন ইলেকট্রন ও প্রোটন দিয়ে গঠিত; কিন্তু কতকগুলি পরীক্ষার ফলাফল রাদারফোর্ডের এই সিদ্ধান্ত গ্রহণে বাধা দিল। ঠিক এই সময়ে আবিষ্কৃত হলো নিউট্রন, পজিট্রন, নিউট্রিনো প্রভৃতি মৌলিক কণা। পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, পরমাণুর কেন্দ্রীন নিউট্রন ও প্রোটন দিয়ে গঠিত এবং নিউট্রনের ভর প্রোটনের চেয়ে সামান্য কিছু বেশী। ইলেকট্রন, পজিট্রন ও নিউট্রিনো প্রভৃতি কণা কেন্দ্রীনের ভিতর থাকতে পারে না। পরমাণুর কেন্দ্রীন ভাঙবার ফলেই তাথেকে ইলেকট্রন, পজিট্রন, নিউট্রিনো ইত্যাদি কণাগুলি বেরুতে থাকে—ঠিক যেমন বন্দুকের গুলি ছুঁড়লে তাথেকে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বেরোয়।
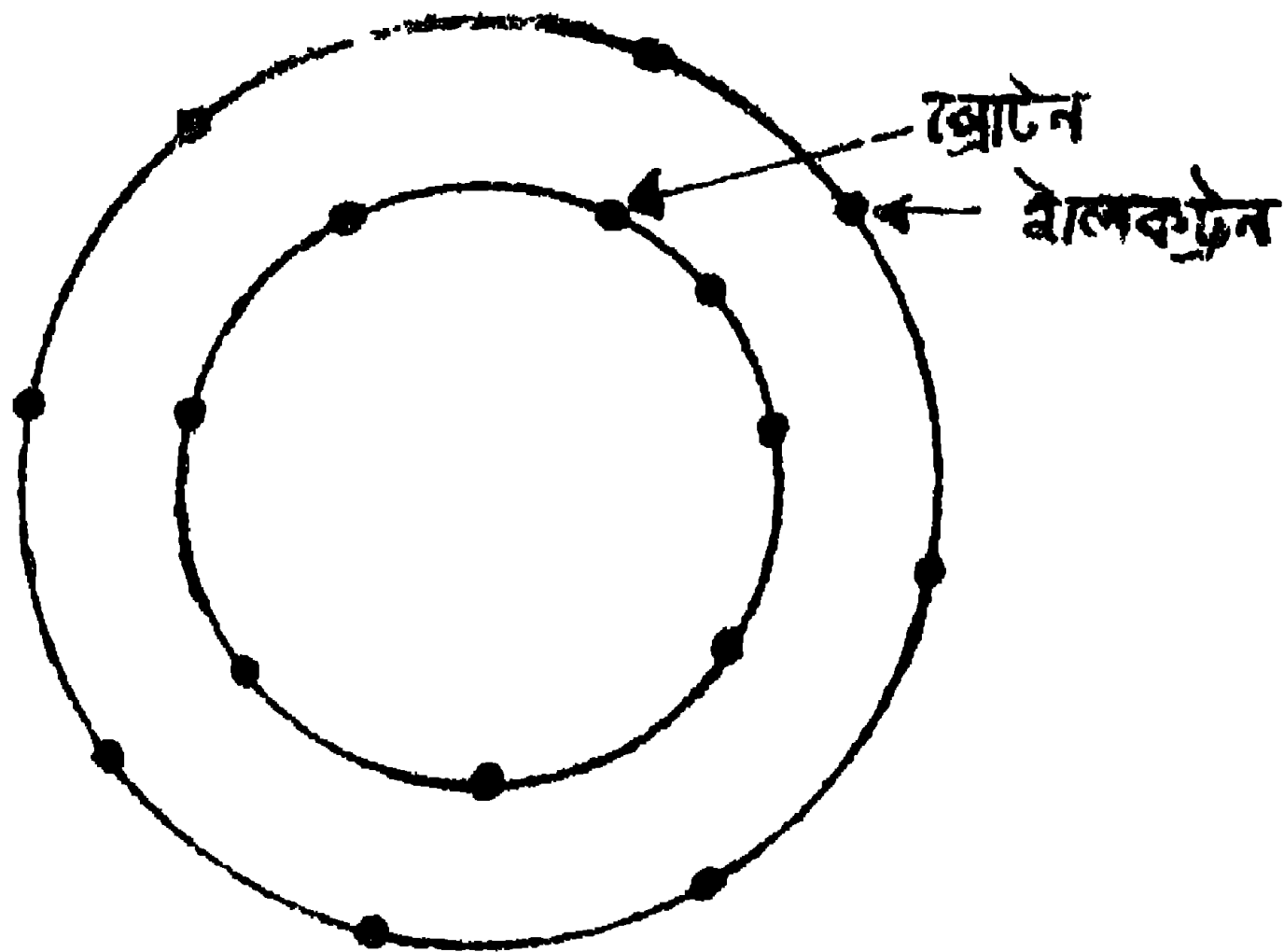
১নং চিত্র
টমসন-কল্পিত পরমাণুর চিত্র
প্রোটন ও ইলেকট্রনগুলি বিভিন্ন খোসায় ঘুরছে।

বিভিন্ন পরীক্ষার দ্বারা দেখা যায় যে, পরমাণুর কেন্দ্রীনের মধ্যেকার আধান কেন্দ্রীনের সমস্ত আয়তনের মধ্যে সমানভাবে ছড়িয়ে নেই। প্রত্যেক কেন্দ্রীনের মধ্যে ফলের শাঁসের মত একটা অংশ থাকে, যার মধ্যে আধানের ঘনত্ব সমান, কিন্তু বাইরের খোসার মত অংশে আধানের ঘনত্ব ক্রমশঃ কমতে থাকে। সব রকমের কেন্দ্রীনের ক্ষেত্রেই এই খোসার মত অংশটি প্রায় $২\cdot৪ \times ১০^{-১৩}$ সে. মি. চওড়া। সুবিধার জন্যে $১০^{-১৩}$ সে. মি.-কে ধরা হয় এক ফের্মি। দেখা গেছে যে, পরমাণুর কেন্দ্রীনের ব্যাসার্ধ কেন্দ্রীনের ভর-সংখ্যা অর্থাৎ নিউট্রন ও প্রোটন সংখ্যার সমষ্টির ঘনমূলের সংখ্যা যত, প্রায় তত ফের্মি।

হাল্কা কেন্দ্রীনের ক্ষেত্রে ভিতরকার শাঁসের মত অংশটি প্রায় থাকে না বললেই চলে এবং সে ক্ষেত্রে খোসার মত অংশটির বেধই হলো কেন্দ্রীনের ব্যাসার্ধ। ভর-সংখ্যা যত বাড়তে থাকে, কেন্দ্রীনের ব্যাসার্ধও তত বাড়তে থাকে। কেন্দ্রীনের ঘনত্বের কথা শুনলেও একেবারে অবাক

পারমাণবিক ভর মাত্র। বাকী ·০৩০৩৯ পারমাণবিক ভরটুকু কোথায় হারিয়ে গেল! এই হারিয়ে যাওয়া ভরকে বিজ্ঞানীরা খুঁজতে লাগলেন এবং অবশেষে এর সন্ধানও পেলেন। হারিয়ে যাওয়া ভরটুকু আইনষ্টাইনের $E=mc^2$ সূত্র অনুসারে শক্তিতে পরিণত হয়ে গেছে এবং এই
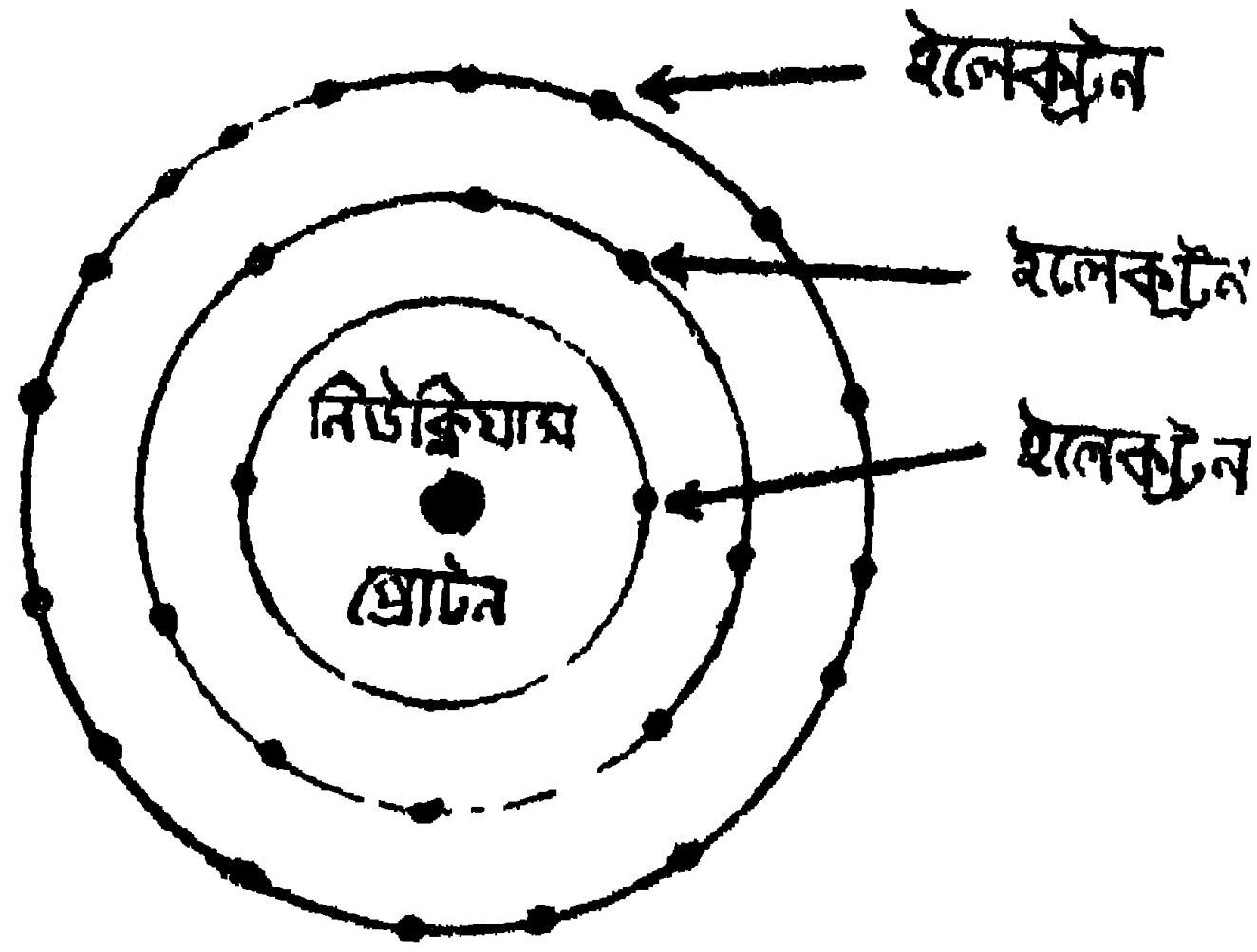
২নং চিত্র

রাদারফোর্ড-কল্পিত পরমাণুর চিত্র
কেন্দ্রীনের চারদিকে ইলেকট্রনগুলি বিভিন্ন খোসায় ঘুরছে।

হয়ে যেতে হয়। বিভিন্ন পরমাণু থেকে ইলেকট্রনগুলি বাদ দিয়ে যদি ১ ঘনসেন্টিমিটার কেন্দ্রীন এক জায়গায় করা যায়, তবে তার ওজন হবে প্রায় ২৪০০ লক্ষ টন।

প্রত্যেক কেন্দ্রীন নিউট্রন ও প্রোটন দিয়ে তৈরি। বিজ্ঞানীরা তাই পরীক্ষা করে দেখলেন যে, কেন্দ্রীনের মধ্যেকার নিউট্রন ও প্রোটনের ভরের যোগফল বিভিন্ন পরীক্ষা থেকে পাওয়া কেন্দ্রীনের ভরের সঙ্গে সমান হয় কিনা। যেমন একটি আলফা কণার দুটি নিউট্রনের ভর ২×১·০০৮৯৩ পারমাণবিক ভর এবং দুটি প্রোটনের ভর ২×১·০০৮১৬ পারমাণবিক ভর। কাজেই সে দিক থেকে আলফা কণার মোট ওজন হওয়া উচিত ৪·০৩৩১৮ পারমাণবিক ভর। কিন্তু পরীক্ষা থেকে দেখা গেল যে, এর ভর ৪·০০২৭৯

শক্তিই আলফা কণার দুটি প্রোটন ও দুটি নিউট্রনকে বেঁধে রেখেছে, যাতে এরা সহজে পরস্পরের কাছ থেকে ছিট্‌কে বেরিয়ে না যায়। ·০৩০৩৯ পারমাণবিক ভর সমান হচ্ছে প্রায় ২৮০ লক্ষ ইলেকট্রন ভোল্ট শক্তি। কাজেই প্রত্যেক কণার বন্ধন শক্তি হচ্ছে প্রায় ৭০ লক্ষ ইলেকট্রন ভোল্ট শক্তি। বিভিন্ন কেন্দ্রীনের ক্ষেত্রে প্রতি কণার বন্ধন শক্তি প্রায় এক হলেও কিছু তফাৎ আছে। ৪নং চিত্রের লেখচিত্র থেকেই এটা বোঝা যাবে। চিত্র থেকে দেখা যায় যে, ৫৬ ভর সংখ্যাবিশিষ্ট লোহার কেন্দ্রীনের ক্ষেত্রেই প্রতিটি কণার বন্ধন শক্তি সবচেয়ে বেশী। ৫৬ ভর সংখ্যার নীচের কেন্দ্রীনগুলির ক্ষেত্রে ভরসংখ্যা বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিটি কণার বন্ধন শক্তিও বেড়ে যায়। কিন্তু ৫৬-এর পরের কেন্দ্রীনগুলির

ক্ষেত্রে ভরসংখ্যা বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিটি কণার বন্ধন শক্তিও কমে যায়।

পরমাণুর কেন্দ্রীন কেন এত সুদৃঢ় থাকবে—বিজ্ঞানীদের কাছে এটি এক চিন্তার বিষয় হয়ে দাঁড়ালো। কেন্দ্রীনে আছে আধান-নিরপেক্ষ নিউট্রন আর ধনাত্মক আধানযুক্ত প্রোটন। তাদের মধ্যে আকর্ষণের জন্যে এই বাঁধন হতে পারে না। বরং সম-আধানে আহিত প্রোটন-গুলির মধ্যে বিকর্ষণ হবে এবং তার জন্যে প্রোটনগুলিরই কেন্দ্রীন থেকে ছিট্‌কে বেরিয়ে যাবার কথা। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে, ব্যাপারটা সম্পূর্ণ বিপরীত—কেন্দ্রীনের বাঁধন খুব দৃঢ়। এক্ষেত্রে বিজ্ঞানীরা এমন একটা শক্তির কল্পনা করলেন, যে শক্তি কেন্দ্রীনের মধ্যেকার কণাগুলিকে আট্‌কে রেখেছে এবং এই শক্তির পরিমান সমদূরত্বের কুলম্ব বিকর্ষণ বলের চেয়ে অনেক বেশী। কিন্তু এই শক্তির প্রকৃতিই বা কি রকম? এটা কি মহাকর্ষ বল হতে পারে? না, তা হতে পারে না। কারণ নিউট্রন বা প্রোটনের মত ক্ষুদ্র ভরবিশিষ্ট বস্তুর ক্ষেত্রে মহাকর্ষ বল নগণ্য। কোন বিজ্ঞানীই এসম্বন্ধে সঠিক কিছু বলতে পারছিলেন না। অবশেষে জাপানের বিজ্ঞানী ওকাওয়া এই শক্তির সন্ধান করতে গিয়ে একরকম নতুন কণার সন্ধান পেলেন। এই কণার নাম হলো মেসন। এর ভর ইলেকট্রন ও প্রোটনের ভরের মাঝামাঝি এবং আধানের পরিমাণ ইলেকট্রনের আধানের সমান, কিন্তু ধনাত্মক বা ঋণাত্মক দুই-ই হতে পারে। ওকাওয়া বললেন যে, এই মেসন কেন্দ্রীনের মধ্যেকার প্রোটন ও নিউট্রনের মধ্যে ক্রমাগত যাতায়াত করছে, শক্তির আদান-প্রদান চলছে, সেই জন্যেই কেন্দ্রীন এত দৃঢ় রয়েছে। এই ঘটনাটাকে একটা সাধারণ উদাহরণ দিয়ে কিছুটা বোঝানো যেতে পারে। দুটি লোক যখন টেনিস খেলছে, বলটা এক ব্যাট থেকে আর এক ব্যাটে খুব তাড়াতাড়ি যাতায়াত করছে। এই সময় ধরে নেওয়া যায় যে, ব্যাট দুটি পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে রয়েছে। বাস্তবিক পক্ষে বিনিময় বলের কোন উদাহরণ নেই। ব্যাট ও বলের উদাহরণটাও একেবারে ঠিক হলো না, কারণ বিনিময় বল কেবলমাত্র অতি নিকটে অবস্থিত দুটি বস্তুর মধ্যে থাকতে পারে। দূরত্ব যদি এক ফের্মি বা $১০^{-১৩}$ সেঃ মিঃ-এর কম হয়, তবে এই বিনিময় বা ক্ষুদ্র দূরত্বে আকর্ষণ বল হবে

৩নং চিত্র
শাঁস বা কোর-এর মত অংশে আধান-ঘনত্ব সবচেয়ে বেশী এবং পরে ধীরে ধীরে কমতে থাকে।

প্রচণ্ড এবং তা এই দূরত্বের কুলম্ব-বিকর্ষণ শক্তির চেয়ে অনেক বেশী। কিন্তু যদি দূরত্ব আড়াই ফের্মি বা তার কাছাকাছি হয়, তখন এই আকর্ষণ বল নগণ্য হয়ে পড়ে।

আমরা দেখলাম যে, পরমাণুর কেন্দ্রীন মোটামুটি নিউট্রন ও প্রোটন দিয়ে তৈরি। কিন্তু নিউট্রন ও প্রোটনগুলি তার মধ্যে কিভাবে রয়েছে, সে সম্বন্ধে সঠিক কিছুই জানা যায় নি। বিজ্ঞানীরা এই সম্বন্ধে বিভিন্ন চিত্র কল্পনা করতে লাগলেন। কখনও পরমাণুর কেন্দ্রীনকে এক ফোঁটা তরল পদার্থের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে, কখনও বা বলা হয়েছে, নিউট্রন ও প্রোটনগুলি কেন্দ্রীনের মধ্যে খোসার মত সাজানো রয়েছে। কিন্তু কোন একটা চিত্রই কেন্দ্রীনের সমস্ত বৈশিষ্ট্য এবং ব্যবহারকে সম্পূর্ণভাবে ব্যাখ্যা করতে পারে নি। যেমন প্রথমে ধরা যাক কেন্দ্রীনের তরল বিন্দু চিত্র। এই চিত্র প্রথমে গ্রহণ করেন বিজ্ঞানী বোর এবং হুইলার। তরল পদার্থের মধ্যে যেমন অণুগুলি পরস্পর আণবিক বলের দ্বারা জোড় বেঁধে থাকে এবং প্রত্যেকে ছুটাছুটি করে বেড়ায়, ঠিক তেমনিভাবে নিউট্রন ও প্রোটনগুলি যেন ক্ষুদ্র দূরত্ব বলের দ্বারা আবদ্ধ রয়েছে এবং ছুটে বেড়াচ্ছে। কেন্দ্রীনের এই চিত্রের দ্বারা কেন্দ্রীন বিভাজনকে (Nuclear fission) অতি সহজেই ব্যাখ্যা করা যায়। আমরা জানি কোন তরলের উপরিতলে অবস্থিত অণুগুলি চারদিকের অণুগুলির দ্বারা আকর্ষিত হতে পারে না, কেবল তরলের ভিতরকার অণুগুলির দ্বারা আকর্ষিত হয়। কাজেই উপরিতলে অবস্থিত অণুগুলি তরলের ভিতর দিকে আকৃষ্ট হয়। আণবিক বলের দ্বারা সৃষ্ট এই বলকে পৃষ্ঠটান বলে। এই বলের দরুণ একবিন্দু তরল সব সময় সবচেয়ে কম পৃষ্ঠতল ধারণ করবার চেষ্টা করে এবং প্রকৃত পক্ষে এর আকার হয় গোলকের মত। কেন্দ্রীনের
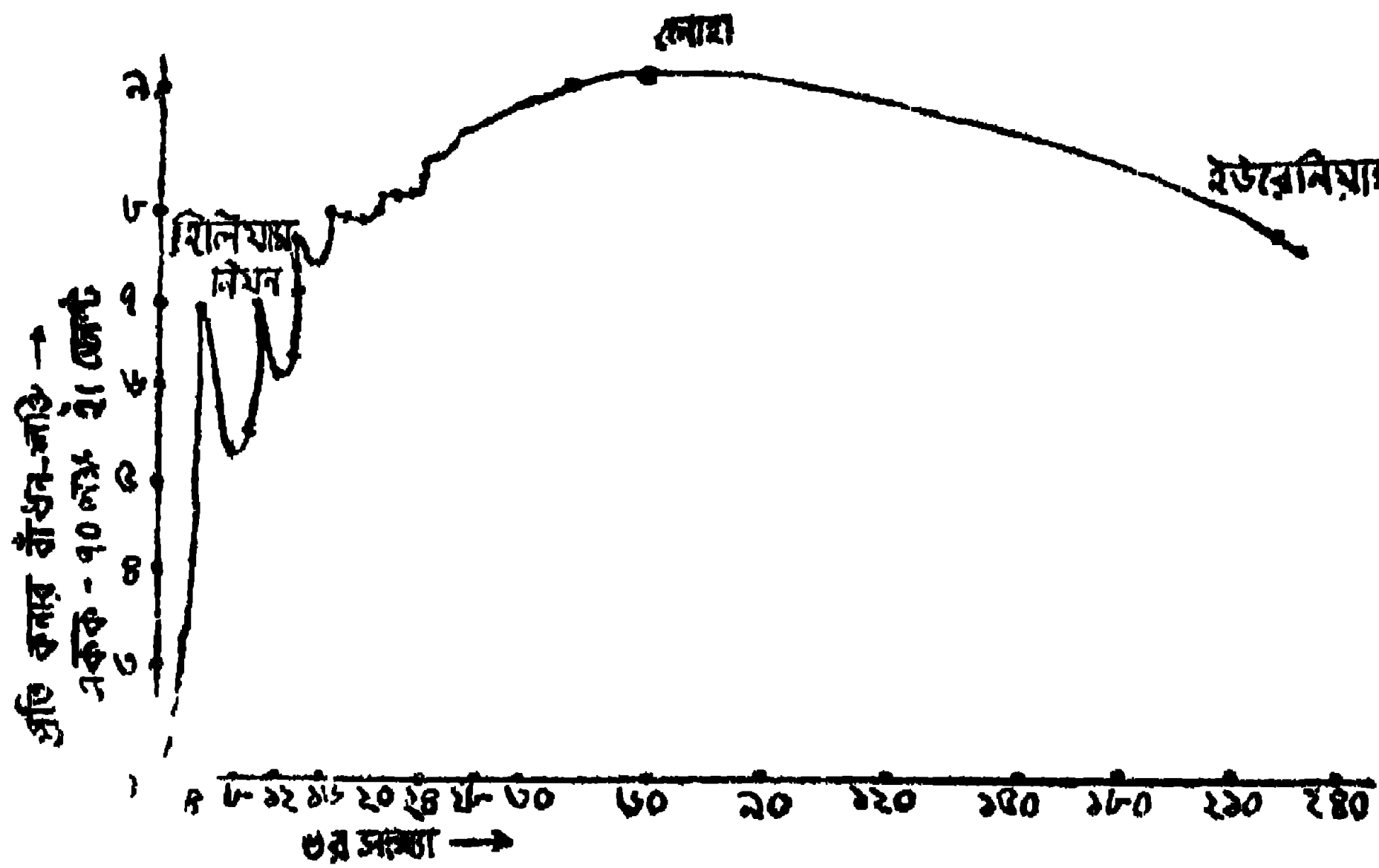
৪নং চিত্র

ভরসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে প্রতিকণার বন্ধন শক্তি ক্রমশঃ বৃদ্ধি পায় এবং লোহার ক্ষেত্রে প্রতি কণার বন্ধন শক্তি সবচেয়ে বেশী। কিন্তু লোহার পরবর্তী মৌলিক পদার্থগুলির ক্ষেত্রে ভরসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে প্রতি কণার বন্ধন শক্তি ক্রমশঃ কমতে থাকে।

উপরিতলে অবস্থিত নিউট্রন ও প্রোটনগুলিও একই প্রকার পৃষ্ঠটানের দ্বারা আকৃষ্ট হয় এবং তাই স্বাভাবিক অবস্থায় পরমাণু কেন্দ্রীনের আকার গোলকের মত থাকে। বোর এবং হুইলার অঙ্ক কষে দেখিয়েছেন যে, সব পরমাণুর কেন্দ্রীনের ভর সংখ্যা ১১০-এর নীচে তাদের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীনের মধ্যে মোট প্রোটন-প্রোটন বিকর্ষণ-জনিত বল মোট পৃষ্ঠটানের চেয়ে কম থাকে।

৫নং চিত্র
কেন্দ্রীনের বিভাজন

কাজেই এই সব পরমাণু কেন্দ্রীন স্বাভাবিক অবস্থায় সম্পূর্ণভাবে গোলকাকার ধারণ করতে পারে। আবার যদি দুটি পরমাণুর কেন্দ্রীন, যাদের মোট ভর সংখ্যা ১১০-এর কম, জুড়ে দেওয়া যায় তবে তারা দিব্যি একটা কেন্দ্রীনে পরিণত হয়ে থাকে, ঠিক যেমন দুটি খুব ছোট্ট তরলবিন্দু জুড়ে গিয়ে একটা বিন্দুতে পরিণত হয়। কিন্তু পরমাণু-কেন্দ্রীনের ভর-সংখ্যা ১১০-এর চেয়ে যত বেশী হবে, ততই মোট বিকর্ষণ বল আকর্ষণ বলের চেয়ে আস্তে আস্তে বাড়তে থাকবে। কারণ তখন প্রোটনের সংখ্যা বৃদ্ধি হয়। এই অবস্থায় পরমাণু-কেন্দ্রীনকে স্থায়ী হতে হলে তার আকার আর ঠিক গোল থাকলে চলবে না, একটু চ্যাপ্টা হতে হবে। যখন কেন্দ্রীনের মধ্যে প্রোটনের সংখ্যা ১০০-এর কাছাকাছি চলে যাবে, তখন কেন্দ্রীনের আকার এত চ্যাপ্টা হয়ে যাবে যে, সেটা তখন ভেঙে দুই টুকরা হয়ে যাবে। অর্থাৎ ১০০ বা তার কাছাকাছি প্রোটন সংখ্যাবিশিষ্ট কোন পরমাণু-কেন্দ্রীন পাওয়া সম্ভব নয় এবং এথেকেই বোঝা যায় যে, কেন পর্যায় সারণীতে (Periodic table) ইউরেনিয়ামের পরে আর কোন স্থায়ী মৌলিক পদার্থ নেই। ৯০ বা তার বেশী প্রোটন-বিশিষ্ট যে কোন কেন্দ্রীনকে যদি আর একটা শক্তিশালী কণার দ্বারা আঘাত করা যায়, তবে কেন্দ্রীনটি উত্তেজিত হয়ে পড়ে এবং তা আর স্থায়ী থাকে না, ভেঙে দুই টুকরা হয়ে যায়। বাইরে থেকে কোন কারণে শক্তি পেয়ে কেন্দ্রীন যখন উত্তেজিত হয়ে পড়ে, তখন কেন্দ্রীনের মধ্যেকার নিউট্রন ও প্রোটনগুলিও উত্তেজিত অবস্থায় থাকে। কেন্দ্রীনের এই উত্তেজিত অবস্থাকে অবশ্য তরলবিন্দু চিত্রের দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায় না। অধ্যাপক বোরের তত্ত্ব অনুসারে পরমাণুর কেন্দ্রের চারদিকে ইলেকট্রনগুলি বিভিন্ন খোসায় বা স্তরে পাক খাচ্ছে এবং প্রথম খোসায় ২টি, ২য় খোসায় ৮টি, ৩য় খোসায় মোট ১৮টি ইলেকট্রন থাকতে পারে। যে সকল পরমাণুর কেন্দ্রীনের চারদিকের এই খোসাগুলি ইলেকট্রন দিয়ে পূর্ণ থাকে, সেগুলি খুব স্থায়ী এবং নিষ্ক্রিয় হয় অর্থাৎ অন্য কোন পরমাণুর সঙ্গে সহজে বিক্রিয়া ঘটায় না। ঠিক সেই রকম দেখা গেছে যে, ২০টি প্রোটনবিশিষ্ট পরমাণু-কেন্দ্রীন খুব স্থায়ী এবং এরকম কেন্দ্রীনবিশিষ্ট অনেক-গুলি স্থায়ী মৌলিক পদার্থ আছে। আরও

দেখা গেল যে, ২,৮,২০,৫০,৮২,১২৬ প্রোটন বা নিউট্রন সংখ্যাবিশিষ্ট কেন্দ্রীন খুব স্থায়ী এবং এই রকম কেন্দ্রীনবিশিষ্ট বহু মৌলিক পদার্থ দেখা যায়; অর্থাৎ যে শক্তি কেন্দ্রীনের কণাগুলিকে একত্র করে রাখে, সেই বন্ধন শক্তি ২,৮,৫০ ইত্যাদি প্রোটন বা নিউট্রনযুক্ত কেন্দ্রীনের

৬নং চিত্র

ক্ষেত্রে খুব বেশী এবং তাই এরা এত স্থায়ী হয়। ৬নং চিত্রের লেখচিত্র থেকে ব্যাপারটা পরিস্কার বোঝা যাবে।

ইউরেনিয়ামের কেন্দ্রীন বিভাজনের ফলে ৫১ ও ৮৩ নিউট্রন সংখ্যাবিশিষ্ট ক্রিপটন ও জেনন কেন্দ্রীন গঠিত হয়। কিন্তু তৈরি হবার একটু পরেই উভয়েই একটা করে নিউট্রন ত্যাগ করে ৫০ ও ৮২ নিউট্রন সংখ্যাবিশিষ্ট কেন্দ্রীনে পরিণত হয়। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, পরমাণু-কেন্দ্রীনগুলির একটা স্বাভাবিক প্রবণতা রয়েছে ২,৮,৫০,৮২,১২৬ প্রোটন বা নিউট্রনবিশিষ্ট কেন্দ্রীনে পরিণত হবার। পদার্থ-বিজ্ঞানে এই সংখ্যাগুলিকে বলে ম্যাজিক সংখ্যা। এথেকে বোঝা গেল যে, কেন্দ্রীনের মধ্যে কেন্দ্রীন-কণা অর্থাৎ নিউট্রন ও প্রোটনগুলি বিভিন্ন স্তরে রয়েছে এবং এক একটা স্তর কতকগুলি নির্দিষ্ট সংখ্যক প্রোটন বা নিউট্রনের দ্বারা পূর্ণ হয়।

এখন দরকার হয়ে পড়লো গাণিতিক সূত্রের সাহায্যে প্রমাণ করা যে, কেন্দ্রীনের মধ্যে নিউট্রন এবং প্রোটনের খোসাগুলি যথাক্রমে ২,৮,৫০,৮২,১২৬ নিউট্রন ও প্রোটনের দ্বারা পূর্ণ হবে। পরমাণুর মধ্যে ঘূর্ণায়মান ইলেকট্রনের স্তরের সঙ্গে কেন্দ্রীনের মধ্যে ঘূর্ণায়মান নিউট্রন ও প্রোটনের স্তরের কতকগুলি তফাৎ আছে। পরমাণুতে ইলেকট্রনগুলি কেন্দ্রের দিকে আকর্ষণকারী কুলম্ব বল অনুভব করে, কারণ ধনাত্মক আধানযুক্ত প্রোটনগুলি রয়েছে পরমাণুর কেন্দ্রে। কিন্তু কেন্দ্রীনের মধ্যে সেরকম কোন কেন্দ্র আকর্ষণকারী বল ক্রিয়া করে না, যার জন্যে গাণিতিক সূত্র তৈরি করা খুব অসুবিধাজনক হয়ে পড়লো। কিন্তু একটা কায়দা করে বিজ্ঞানীরা এই অসুবিধাটাকে দূর করে ফেললেন। আমরা জানি, কেন্দ্রীনে নিউট্রন ও প্রোটনের মধ্যে, প্রোটন ও প্রোটনের মধ্যে এবং প্রোটন ও নিউট্রনের মধ্যে ক্ষুদ্র দূরত্ব আকর্ষণ বল ক্রিয়া করে। কিন্তু একটা কণাকে কেন্দ্রীনের মধ্যেকার সমস্ত কণাগুলিই আকর্ষণ করতে পারে না, মাত্র কাছাকাছি কয়েকটা কণা তাকে আকর্ষণ করতে পারে। এটা খুব স্বাভাবিক, কারণ দূরত্ব একটু বেশী হয়ে পড়লেই ক্ষুদ্র দূরত্ব আকর্ষণ

বল খুব কমে যায়—দূরের কণাগুলির পক্ষে একটা কণাকে আকর্ষণ করা সম্ভব হয় না। কাজেই ধরা যায় যে, কেন্দ্রীনের মধ্যে থাকাকালীন প্রত্যেক কণাগুলি মোটামুটি একই পরিমাণ বল অনুভব করে। এই সাধারণ বল আবার এমন একটা প্রকৃতির হবে, যেন ঠিক কেন্দ্রীনের ব্যাসার্ধের বাইরে বল একেবারে শূন্য হয়ে যায়। এই রকম একটা বলকে ধরে বিজ্ঞানীরা তাঁদের সূত্র খাড়া করলেন এবং তার সমাধান করে এমন কতকগুলি সম্ভাব্য খোসা বা স্তর পেলেন, যাদের নির্দিষ্ট শক্তি একটা সূত্রের সাহায্যে লেখা যায় $\epsilon=\{2(n-1)+l\}\frac{h}{2\pi}w$। এখানে n, l দুটি খুবই পরিচিত চিহ্ন। n, l কে বলা হয় যথাক্রমে মূল কোয়ান্টাম সংখ্যা ও অর্বিটাল অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টাম কোয়ান্টাম সংখ্যা। h হচ্ছে প্লাঙ্কের ধ্রুবক। কোয়ান্টাম তত্ত্ব অনুসারে নিউট্রন ও প্রোটনগুলি কেবলমাত্র $\epsilon=o,\ 1\frac{h}{2\pi}w,\ 2\frac{h}{2\pi}w$ ইত্যাদি শক্তিবিশিষ্ট স্তরে থাকতে পারে—মাঝের কোন স্তরে থাকতে পারে না। আবার উপরের সূত্র থেকে দেখা যায় যে n ও l-এর একজোড়া বিশেষ মানের জন্যেই কেবলমাত্র $\epsilon=o,\ 1\frac{h}{2\pi}w, 2\frac{h}{2\pi}w\ \cdots$ ইত্যাদি শক্তিস্তর পাওয়া যায়। প্রোটন ও নিউট্রন প্রত্যেকেই নির্দিষ্ট স্তরে পাক খাচ্ছে, আবার এদের প্রত্যেকের ব্যবহার থেকে মনে হয় যে, এরা যেন নিজের অক্ষের চারদিকেও পাক ~। এই গতির পরিমাপ করা হয় কৌণিক যায় একক হলো $\frac{h}{2\pi}$। বিভিন্ন ~ব জন্যে কণাগুলির গতির l দিয়ে এবং কণাগুলির নিজের অক্ষের চারদিকের গতির মাপ করা হয় সংখ্যা s দিয়ে। এদের পরিমাণ হবে যথাক্রমে $\frac{lh}{2\pi}$ ও $\frac{sh}{2\pi}$ — নিউট্রন ও প্রোটনের ক্ষেত্রে $s=\frac{1}{2}$ হয়। l, s ইত্যাদি সংখ্যাগুলি দিয়ে কণাগুলির অবস্থার উল্লেখ করা যায় এবং পাউলির সূত্র অনুসারে দুটি কণার অবস্থা কখনও এক রকম হতে পারে না। এই সকল বিভিন্ন উপাত্ত থেকে বিভিন্ন শক্তিস্তরের মধ্যেকার প্রোটন-নিউট্রন সংখ্যা কত হবে, তা বলা যায়। পরবর্তী কালে মিসেস মেয়ার, হাক্সেল, জেনসন ও সুয়েস খোসাতত্ত্ব সম্বন্ধে আর একটা নতুন মত দিলেন। তাঁরা বললেন যে, কণাগুলির স্তরের চারদিকে ঘোরবার ফলে যে গতি $\left(\frac{lh}{2\pi}\right)$ ও নিজের অক্ষের চারদিকে ঘোরবার ফলে যে গতি $\left(\frac{sh}{2\pi}\right)$ তাদের মধ্যে ক্রিয়ার ফলে পূর্বোক্ত খোসাগুলি আবার কয়েকটা খোসায় ভেঙে যায়; অর্থাৎ আরও কিছু প্রোটন ও নিউট্রনের জায়গা তাঁরা করে দিলেন। এই তত্ত্বের সাহায্যে ম্যাজিক সংখ্যাগুলিকে পুরাপুরিভাবে ব্যাখ্যা করা গেল।

পরমাণুর মধ্যে কেন্দ্রীনের চারদিকে কেবলমাত্র ইলেকট্রনের খোসা রয়েছে, কিন্তু কেন্দ্রীনের ভিতর প্রোটন এবং নিউট্রনের আলাদা খোসা রয়েছে। নিউট্রন-প্রোটনের মধ্যে ক্ষুদ্র দূরত্ব আকর্ষণ বলের জন্যে তাদের স্তরগুলিও একে অপরকে প্রভাবিত করবে। বিজ্ঞানী ফের্মি অবশ্য দেখিয়েছেন যে, এই প্রভাব সত্ত্বেও নিউট্রন এবং প্রোটনগুলি তাদের খোসা থেকে বেরিয়ে যাবে না বরং নিজেদের খোসায় ঘুরতে থাকবে। কেন্দ্রীনের উত্তেজিত অবস্থাকেও এই চিত্রের দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায়।

পরমাণু-কেন্দ্রীন একপ্রকার অতি ঘন এবং অস্বচ্ছ বস্তুর দ্বারা গঠিত; কাজেই একটা দ্রুত নিউট্রন কণার পক্ষেও কেন্দ্রীনের মধ্য দিয়ে ছুটে বেরিয়ে যাওয়া সম্ভব নয় বরং নিউট্রন কণাটি কেন্দ্রীনের দ্বারা সম্পূর্ণভাবে শোষিত হয়ে যাবে। কিন্তু বর্তমানে বিভিন্ন পরীক্ষার দ্বারা দেখা গেছে যে, নিউট্রন কণা কেন্দ্রীনের মধ্য দিয়ে যাবার সময় সম্পূর্ণভাবে শোষিত হয় না বরং অনেক ক্ষেত্রে ছুটে বেরিয়ে যায়। তরঙ্গ বল-বিদ্যা অনুসারে আমরা একটা গতিশীল কণাকে গতিশীল তরঙ্গ বলেও ভাবতে পারি এবং এই তরঙ্গের দৈর্ঘ্য নির্ভর করে কণার ভরবেগের উপর। কাজেই আমরা উপরের ঘটনাকে ভাবতে পারি যে, নিউট্রন তরঙ্গ কেন্দ্রীনের মধ্য দিয়ে ছুটে বেরিয়ে যাচ্ছে, ঠিক যেমন একখণ্ড কাচের মধ্য দিয়ে আলোক তরঙ্গ প্রতিসৃত হয়ে বেরিয়ে যায়। দেখা গেছে যে, আলোকের প্রতিসরণের সাধারণ নিয়মগুলিও নিউট্রন তরঙ্গ কেন্দ্রীনের মধ্য দিয়ে প্রতিসৃত হবার সময় মেনে চলে। কিন্তু ঘষা কাচ যেমন কিছু পরিমাণ আলোক শুষে নেয়, তেমনি কেন্দ্রীনও কতকগুলি নিউট্রন তরঙ্গকে শুষে নেয় অর্থাৎ বেরুতে দেয় না। কাজেই এক্ষেত্রে আমরা পরমাণু-কেন্দ্রীনকে ঘষা কাচ বা যে কোন স্ফটিকের তৈরি একটা বলের সঙ্গে তুলনা করতে পারি। অতি সম্প্রতি কেন্দ্রীনের এই চিত্র গ্রহণ করা হয়েছে এবং এর সাহায্যে নিউট্রনের অনেক ব্যবহারকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। স্বাভাবিক অবস্থায় কেন্দ্রীনের আকার যে পুরাপুরি গোলকাকৃতি নয় বরং একটু ডিম্বাকৃতি, তাও কেন্দ্রীনের এই চিত্রের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা যায়।

এই আলোচনা থেকে আমরা দেখলাম যে, পরমাণু-কেন্দ্রীনের সঠিক চিত্র এখনও আমরা পাই নি। প্রত্যেক চিত্রই কেন্দ্রীনের কিছু কিছু ব্যবহারকে হয়তো ব্যাখ্যা করতে পারে, কিন্তু সামগ্রিকভাবে কেন্দ্রীনকে ব্যাখ্যা করবার জন্যে একটি চিত্রের সন্ধান আজও বিজ্ঞানীরা করে চলেছেন। এ-সম্বন্ধে বিজ্ঞানীরা অনেক কিছুই করেছেন বা করছেন। কিন্তু আরও অনেক কিছু করবার বাকী আছে।*

*বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের কার্যালয়ে ২৪শে মার্চের সাপ্তাহিক অধিবেশনে পঠিত।

এপোক্সি রেজিন

এপোক্সি রেজিন নামে ইদানীং এক রকম অদ্ভুত আঠার কথা জানা গেছে, যা দুটি টিউবের মধ্যে ভর্তি করা থাকে। এই আঠা প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান জানিয়েছেন—এই দুটি টিউবের পদার্থ সমপরিমাণে একত্রে মিশ্রিত করলে সেটা এমন শক্ত আঠার মত কাজ করে যে, মাত্র এক কোঁটার মত এই জিনিষের সঙ্গে একটা হুক ধরিয়ে দিলে শুকিয়ে যাবার পর তাতে অনায়াসে একটা গাড়ী ঝুলিয়ে রাখা যায়।

এই আঠার নাম দেওয়া হয়েছে—এপোক্সি রেজিন। জিনিষটা পলিমার কেমিষ্ট্রির অবদান এবং রাসায়নিক আঠা জাতীয় পদার্থ-গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। দুটি পদার্থকে পরস্পরের সঙ্গে জোড়া লাগাবার কাজে এপোক্সি রেজিন এক অপূর্ব দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। এতদিন গৃহস্থালীর কাজে এবং শিল্পক্ষেত্রে নানাবিধ কাজে জৈব উপাদান থেকে তৈরি নানা রকম আঠা ব্যবহৃত হতো। এখন এই নতুন এপোক্সি রেজিন নানাবিধ নির্মাণকার্যে

—এমন কি, আমেরিকান সুপারসনিক এরোপ্লেনের জটিল অংশসমূহ সংযোজনের কাজেও ব্যবহৃত হচ্ছে। রাসায়নিক উপায়ে বা ওয়েল্ডিং প্রক্রিয়ায় ধাতব পদার্থাদি জোড়া লাগাবার ব্যাপারে ১৯৫০ সাল থেকে এই গোষ্ঠীভুক্ত শতাধিক নতুন উপাদান উদ্ভাবিত হয়েছে এবং কতকগুলি পুরাতন আঠা জাতীয় পদার্থেরও উন্নতি সাধিত হয়েছে। যাহোক, এপোক্সি রেজিনের সবচেয়ে অদ্ভুত ব্যাপার হচ্ছে এই যে, এই অদ্ভুত পদার্থটি সংযুক্ত আরব সাধারণতন্ত্রের আবু সিম্বেলের প্রাচীন নুবিয়ান মন্দিরগুলিকে নীল নদের জলস্ফীতি থেকে রক্ষা করবার ব্যাপারেও সহায়তা করেছে।

কিন্তু এই অদ্ভুত নামের পদার্থটি কি এবং তার সাহায্যে আবু সিম্বেলের মন্দিরগুলির রক্ষার ব্যবস্থাই বা কিভাবে হলো?

এই নামটি এসেছে এপোক্সি গোষ্ঠীর রাসায়নিক সঙ্কেতের গ্রীক বর্ণনা থেকে।

$$\begin{array}{c} O \\ / \quad \backslash \\ C \qquad C \end{array}$$
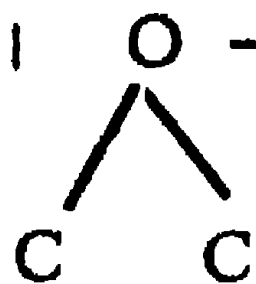
—এটা হলো কার্বনের উপর অক্সিজেন, যাকে সাধারণ গ্রীক ভাষায় বললে বোঝায়—এপোক্সি। তেল অথবা কয়লা থেকে যে মাধ্যমিক রাসায়নিক পদার্থ পাওয়া যায়, তাথেকে এপোক্সি রেজিন তৈরি করাই বোধ হয় সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা। Epichlorohydrin ও Bisphenol-A—এই পদার্থ দুটি দীর্ঘ এবং জটিল প্রক্রিয়ায় একত্রে পরিপক্ক করবার পর এই এপোক্সি রেজিন উৎপন্ন হয়।

প্রথমে ১৯৩৮ সালে সুইজারল্যাণ্ডের পি. ক্যাষ্টান এবং ইউনাইটেড ষ্টেটস্-এর ডাঃ এস. গ্রিনলি তরল রেজিনকে শক্ত রেজিনে পরিবর্তিত করবার উপায় উদ্ভাবন করেন। কিন্তু যুদ্ধের পরবর্তী কাল পর্যন্ত এই ব্যাপারটা রাসায়নিক 'ম্যাজিকে'র পর্যায়েই থেকে যায়।

এপোক্সি রেজিন এক প্রকার তরল পদার্থ (থার্মোপ্লাষ্টিক) এবং এক জায়গায় রেখে দিলে বরাবর প্রায় তরল অবস্থাতেই থাকে। কিন্তু তথাকথিত 'শক্তকারক' (Hardener) কোন পদার্থ যোগ করলে প্রায় দশ ঘণ্টার মধ্যে বিগলনে অক্ষম এমন এক কঠিন পদার্থে পরিণত হয়, যা বরাবর সেই অবস্থাতেই থাকে। এপোক্সি প্রকৃত প্রস্তাবে এপোক্সি রেজিন ও শক্তকারক জেল (Gel)-এর মিশ্রণে তৈরি এক প্রকার থার্মোসেটিং রেজিন। মিশ্রণের সময় পদার্থটা গরম হয়ে ওঠে। কিন্তু একবার শক্ত হয়ে গেলে উত্তাপ প্রয়োগেও আর গলে যায় না—এই কঠিন অবস্থা বরাবর অব্যাহত থাকে। যে কোন দুটি বস্তুর মধ্যস্থলে এই রেজিন রেখে চাপ প্রয়োগ করলে পদার্থ দুটি ওয়েল্ডিং-এর মত পরস্পরের সঙ্গে অবিভাজ্যরূপে জুড়ে যায়।

এথেকেই আবু সিম্বেলের ব্যাপারটা এসে পড়েছে। আসোয়ান বাঁধ নির্মাণ ও কৃত্রিম নাসের হ্রদ সৃষ্টির ফলে নীল নদের যে জলস্ফীতি হবে, তাথেকে আবু সিম্বেলের প্রাচীন মন্দির-গুলিকে কিভাবে রক্ষা করা যায়, সে বিষয়ে অনেক আলোচনা ও পরিকল্পনা করা হয়েছিল। ফরাসী পরিকল্পনায়—আর একটি ছোট বাঁধ নির্মাণ করে মন্দিরগুলিকে রক্ষা করবার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল। বৃটিশ প্রস্তাবে বলা হয়েছিল—মন্দিরগুলি যেমন আছে ঠিক তেমন ভাবেই পরিস্রুত জলের মধ্যে রেখে জলের নীচে গ্যালারী তৈরি করে সেখান থেকে দেখবার ব্যবস্থা করা হোক। ইটালীয়ানরা প্রস্তাব করেন, মন্দিরগুলিকে খণ্ড খণ্ড করে কেটে খণ্ডিত অংশগুলিকে জ্যাকের সাহায্যে উঁচু জায়গায় সরিয়ে নেবার পর পুনঃস্থাপিত করাই হবে সর্বোৎকৃষ্ট ব্যবস্থা।

অবশেষে যান্ত্রিক, আর্থিক ও সৌকুমার্যের দিক থেকে বিবেচনা করে স্থির হলো—বেলে পাথরের সেই তিন হাজার বছরের পুরাতন দ্বিতীয় র‍্যামেসিস এবং তাঁর রাণী নেফারটারির মন্দিরগুলিকে বিচ্ছিন্ন

খণ্ডে কেটে সেই বিরাট খণ্ডগুলি নাসের হ্রদের ভবিষ্যৎ জলপৃষ্ঠ থেকে ২২১ ফুট উঁচু জায়গায় সরিয়ে নেবার পর পুনরায় জুড়ে দিয়ে যেমনটি ছিল ঠিক তেমনটিই করা হবে।

করবার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ইতিমধ্যে যে জলস্ফীতি দেখা দিয়েছিল, তাথেকে এই মন্থুমেন্টগুলিকে রক্ষা করবার জন্যে তাঁরা ১৯৬৪ সালের প্রথম থেকেই ১২০০ ফুট বাঁধ নির্মাণ

৩০০০ বছরেরও বেশী পুরাতন মিশরীয় সম্রাট দ্বিতীয় র‍্যামেসিসের প্রস্তরমূর্তি। প্রস্তরমূর্তির মস্তকের উপর থেকে নীচ পর্যন্ত ছুটি করে ছিদ্র করে তার মধ্যে ইস্পাতের দণ্ড ঢুকিয়ে সেগুলিকে শক্ত করে এঁটে ধরবার জন্যে ছিদ্রের মধ্যে এপোক্সি রেজিন ঢেলে দেওয়া হয়েছে।

এই সব কাজের ভার অর্পণ করা হয় একটি আন্তর্জাতিক নির্মাণকারী সংস্থার উপর। তাঁরা পশ্চিম জার্মেনীর একটি কনষ্ট্রাকসন কোম্পানীর পরিচালনাধীনে এই কাজ সম্পন্ন করেন। বিশাল মূর্তিগুলির উন্মুক্ত অংশ রক্ষা করবার জন্যে হাজার হাজার টন বালি এনে ঢেকে দেওয়া হয়। ছুই ফুট থেকে আড়াই ফুটের দেয়াল ও ছাদ ছাড়া মন্থুমেন্টের চতুর্দিকে জুড়ে

স্তরে সজ্জিত উপরিভাগের মাটি এবং ৫০০০,০০০ ঘনফুট নীরেট চুনাপাথর মন্দিরগাত্র থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়। ১৯৬৫ সালে এই মনুমেন্টের চত্বরের ছাদ সরিয়ে ফেলবার পর সর্বপ্রথম এই বিশাল মূর্তিগুলিকে উন্মুক্ত আলোতে দেখা যায়।

মূর্তিগুলি বিশাল আকৃতির হলেও এতই ভঙ্গুর যে, যে পদ্ধতিতে সেগুলিকে স্থানান্তরিত করবার ব্যবস্থা হয়েছিল, সে ব্যবস্থায় কাজ করা সম্ভব হচ্ছিল না। কারণ নুবিয়ান পাথরে প্রচুর কোয়ার্টস্ মিশ্রিত রয়েছে এবং সেগুলি অনুভূমিক-ভাবে চুন জাতীয় পদার্থের দ্বারা স্তরে স্তরে গ্রথিত। কাজেই তার বন্ধন-শক্তি খুবই দুর্বল। নানা রকমের পরীক্ষার পর ইঞ্জিনিয়ারেরা ৩৩ টন ওজনের প্রত্যেকটি প্রস্তরখণ্ডের উপর থেকে নীচ পর্যন্ত দেড় ইঞ্চি থেকে পৌনে দুই ইঞ্চি ব্যাসের দুটি করে ছিদ্র করে তার মধ্যে ইস্পাতের দণ্ড ঢুকিয়ে দিয়ে ছিদ্রের মধ্যে Araldit Epoxyhard নামে এপোক্সি রেজিন ঢেলে দেন—লৌহদণ্ডগুলিকে শক্ত করে এঁটে ধরবার জন্যে। জেনারেল মিলসমূহের আমেরিকান ফার্ম কর্তৃক এই এপোক্সি রেজিনের কার্যকরী ফর্মুলা তৈরি করা হয়েছে। ২৪ ঘণ্টা ধরে এই এপোক্সি রেজিন জমাট বাঁধবার পর এই ৩০০০ প্রস্তরখণ্ড বিরাট আকারের ক্রেনের সাহায্যে স্থানান্তরিত করা হয়। বিভিন্ন দেশের অনেক লোক এই অদ্ভুত কাজ সম্পাদনে সহায়তা করেছেন। এই নতুন নিরাপদ স্থানে এখন এই আঠার সাহায্যে বালি পাথরের ফাটলগুলি বন্ধ করা, প্রস্তরখণ্ডগুলিকে জোড়া লাগানো এবং মন্দির পুনর্গঠন—ইত্যাদি কাজ চলেছে। মাত্র কয়েক দশক পূর্বে উদ্ভাবিত আধুনিক রসায়নশাস্ত্রের অবদান তিন হাজার বছর পূর্বেকার এই অপূর্ব ভাস্কর্য সংরক্ষণের কাজ সম্ভব করে তুলেছে।

দ্বিতীয় র‍্যামেসিস এবং তার রাণী নেফারটরির প্রস্তরমূর্তিকে এই এপোক্সি রেজিন কত কাল অক্ষুণ্ণ রাখতে পারবে? এই প্রশ্নের উত্তরে ইঞ্জিনীয়ারেরা বলেন—মনুমেন্টের চেয়েও দীর্ঘকাল অটুট থাকবে। একজন বলেছেন—হাজার হাজার বছর পূর্বে যখন এই মূর্তিগুলি একটা গোটা পাহাড় কেটে তৈরি করা হয়েছিল, তখনকার চেয়েও বর্তমান অবস্থায় এগুলি অধিকতর মজবুত এবং শক্ত হয়েছে।

শ্রীঅরবিন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়

কিশোর বিজ্ঞানীর দপ্তর

করে দেখ

রং নেই তবুও রং দেখা

সাদা কাগজের এক খানা গোলাকার চাকৃতির গায়ে কালো কালিতে ধাপে ধাপে কতকগুলি বৃত্তাংশ এঁকে চোখের সামনে সেটাকে :জোরে ঘোরাতে থাকলে বিভিন্ন উজ্জ্বল রঙের কতকগুলি বৃত্তাকার রেখা দেখা যাবে।
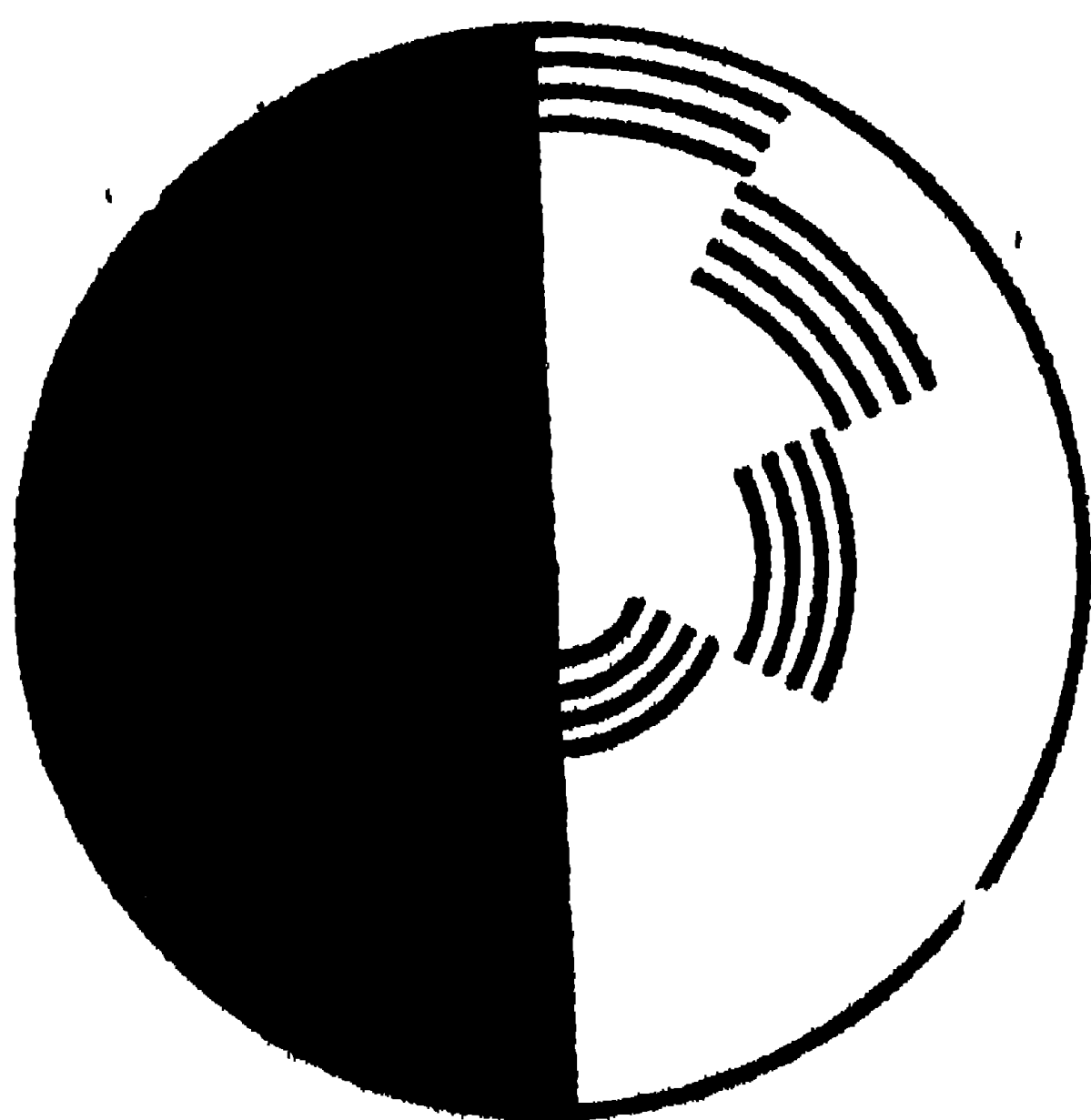
পরীক্ষাটা কিভাবে করতে হবে—বলছি। প্রথমে ছবিটা ভাল করে দেখে নাও। তারপর সাদা কাগজের উপর কালো কালি দিয়ে কম্পাসের সাহায্যে একটি বৃত্ত এঁকে

নাও। বৃত্তের অর্ধেকটা কালো করে দিতে হবে। সাদা দিকটায় ছবির মত করে পর পর ধাপে ধাপে কতকগুলি বৃত্তাংশ এঁকে কাগজখানাকে গোল করে কেটে নিয়ে কার্ডবোর্ডের একটা চাকৃতির উপর এঁটে দাও এবং চাকৃতিটার ঠিক মধ্যস্থলে একটা সরু ছিদ্র করে ছিদ্রের মধ্যে বেশ বড় একটা আলপিন ঢুকিয়ে দাও। এবার আলপিনটাকে ধরে চাকৃতিখানাকে চোখের সামনে ঘোরাতে থাকলেই বিভিন্ন উজ্জ্বল রঙের কতকগুলি বৃত্তাকার রেখা দেখতে পাবে। উল্টো দিকে ঘোরালে বর্ণ-রেখাগুলির অবস্থানও উল্টে যাবে।

উনবিংশ শতাব্দীতে গুস্তভ ফেক্‌নার নামে একজন জার্মান বিজ্ঞানী এই রকমের একটি চাকৃতি তৈরি করে সর্বপ্রথম এই অদ্ভুত ব্যাপারটি লক্ষ্য করেন। পদার্থ-বিজ্ঞানীরা একে বলেন Subjective colour। আজ পর্যন্ত তাঁরা এই ব্যাপারটির প্রকৃত কারণ সম্বন্ধে একমত হতে পারেন নি।

—গ—

বায়ু ও জীবন

আমরা অনবরতই যার মধ্যে চলাফেরা করি, যা সারা পৃথিবীকে ঘিরে উপরে বহুদূর পর্যন্ত ছড়ানো, তাকেই আমরা বায়ু বলে জানি। বায়ু দেখা যায় না, কিন্তু এর অস্তিত্ব নানাভাবে অনুভব করি সব সময়েই। বাতাসে গাছের পাতা নড়লে, গায়ে ঠাণ্ডা বা গরম বাতাস লাগলে কিংবা জানালা বা দরজার পর্দা হাওয়ায় দুল্‌লে আমরা বুঝি বায়ু প্রবাহিত হচ্ছে। এই বায়ু পৃথিবীর আকর্ষণের জন্যে পৃথিবী ছাড়িয়ে যেতে পারে না।

আজ যে উদ্ভিদ ও প্রাণী-জগতের অস্তিত্ব দেখতে পাচ্ছি, তা সম্ভব হয়েছে বায়ুর জন্যেই। প্রাচীন কালে গ্রীকরা বায়ুকে মৌলিক পদার্থ বলে মনে করতেন। অবশ্য ভারতেও পঞ্চভূতের মধ্যে একটাকে বায়ু বলা হয়েছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার এই ধারণা বদ্‌লে দিল। ১৭৫২ খৃষ্টাব্দে বায়ুতে সন্ধান পাওয়া গেল কার্বন ডাইঅক্সাইডের। তার প্রায় কুড়ি-পঁচিশ বছর পরে পাওয়া গেল অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন। তারপর জানা গেল যে, অক্সিজেন ও নাইট্রোজেনই হচ্ছে বায়ুর প্রধান উপাদান। বায়ুর $\frac{1}{5}$ ভাগ হচ্ছে অক্সিজেন ও ভাগ হচ্ছে নাইট্রোজেন। এছাড়া বায়ুর মধ্যে কিছু কার্বন ডাইঅক্সাইড, জলীয় বাষ্প, কিছু বিরল গ্যাস (আর্গন, নিয়ন, হিলিয়াম প্রভৃতি), হাইড্রোজেন, ওজোন ইত্যাদি আছে। এদের

পরিমাণ মোট পরিমাণের এক-শ' ভাগের এক ভাগেরও কম। এখানে বলে রাখা ভাল যে, ওজোন হচ্ছে অক্সিজেনেরই একটা বিশিষ্ট রূপ।

বায়ু চলাচলের সঙ্গে আমাদের স্বাস্থ্যের খুবই নিকট সম্বন্ধ। আগেই বলা হয়েছে যে, বায়ুমণ্ডল না থাকলে উদ্ভিদ ও প্রাণী-জগতের কোনও অস্তিত্ব সম্ভব হতো না।

জীবনধারণের জন্যে অক্সিজেনের একান্ত প্রয়োজন। বায়ুতে অক্সিজেনের অস্তিত্ব না থাকলে জীবজন্তু বাঁচতে পারতো না। অক্সিজেন শ্বাসকার্যের সহায়ক। আমরা শ্বাস গ্রহণের সঙ্গে বায়ু থেকে অক্সিজেন গ্যাস টেনে নিয়ে থাকি আর নিশ্বাসের সঙ্গে কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস ছেড়ে দিই। আবদ্ধ কোনও ঘরে শ্বাসকার্য চালালে ক্রমে ঘরের বায়ুর অক্সিজেন কমতে আরম্ভ করে এবং কার্বন ডাইঅক্সাইড বাড়তে থাকে। ক্রমশঃ বদ্ধ ঘরের বায়ুর অক্সিজেন ফুরিয়ে গিয়ে নাইট্রোজেন, কার্বন ডাইঅক্সাইড প্রভৃতি গ্যাসে ঘর ভরে যায়।

শ্বাসকার্যের মাধ্যমে অক্সিজেন ভিতরে গিয়ে রক্তকে পরিশুদ্ধ করে। বায়ু আমাদের প্রাণস্বরূপ। খাদ্য ছাড়া মানুষ কয়েক সপ্তাহ বাঁচতে পারে বটে; কিন্তু বায়ু ছাড়া মানুষ চার মিনিটের বেশী বাঁচতে পারে না।

রক্তের মধ্যে কিছু পরিমাণ নাইট্রোজেন থাকে। আবার নাইট্রোজেনই হচ্ছে বায়ুর প্রধান উপাদান। শ্বাসকার্যের সময়ে রক্ত প্রয়োজনীয় নাইট্রোজেন বায়ু থেকে টেনে নেয় এবং সমান পরিমাণ পুরনো নাইট্রোজেন বায়ুতে ছেড়ে দেয়। বায়ুতে বেশী পরিমাণ নাইট্রোজেন থাকবার জন্যে অক্সিজেনের তীব্রতা খুব প্রকট হতে পারে না। বায়ুতে নাইট্রোজেন না থাকলে জীবজন্তুর শ্বাসকার্য খুব তাড়াতাড়ি ও অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে যেত। ফলে তাদের পক্ষে বেশীক্ষণ বেঁচে থাকা কষ্টকর হয়ে উঠতো। অপর পক্ষে আবার বায়ুতে অক্সিজেন কম থাকলেও আমাদের প্রয়োজন মিটতো না।

পৃথিবীপৃষ্ঠ থেকে যত উপরের দিকে যাওয়া যায়, বায়ু ততই পাতলা হতে থাকে। দশ-বারো হাজার ফুট উঁচুতে বায়ু খুবই কমে যায়। ফলে সেখানে শ্বাসকার্য ঠিকমত চলে না। ক্রমশঃ আরও উঁচুতে শ্বাসকার্য চালানোই যায় না। তাই উঁচু পাহাড়ে ওঠবার সময় সঙ্গে করে অক্সিজেন নিয়ে যেতে হয়। কৃত্রিম উপগ্রহের মধ্যেও অক্সিজেনের ভাঁড়ার থাকে। বিজ্ঞানীরা বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষায় জানতে পেরেছেন যে, চাঁদে বায়ু নেই। সেজন্যেই চাঁদের বুকে বসবাস করা একটা বিরাট সমস্যা। চাঁদের বুকে বাস করবার জন্যে কৃত্রিম উপায়ে আবহাওয়া তৈরির জন্যে জোর গবেষণা চলছে।

তাহলে বোঝা গেল যে, জীবজগতে বাঁচবার জন্যে উপযুক্ত পরিমাণ মুক্ত বায়ু দরকার। যে সব ঘরে ভালভাবে বায়ু চলাচল করে না, সে সব ঘরে বাস করলে নানারকম কঠিন ব্যাধি হতে পারে। এমন কি, বায়ু চলাচলহীন বদ্ধ ঘরে মানুষের মৃত্যুও ঘটতে

পারে। মুক্ত বায়ু সেবন করলে দেহের ও মনের বল বাড়ে—দীর্ঘজীবন লাভ করা যায়।

বায়ু আবার বিভিন্ন রোগ বীজাণুর বাহকের কাজও করে। রোগের জীবাণু বায়ুতে ভেসে এক দেহ থেকে অন্য দেহে শ্বাসকার্যের মাধ্যমে ঢুকে গিয়ে বিস্তার লাভ করে। সহর বা কলকারখানার অঞ্চলে ধূলা, ধোঁয়া, নর্দমার পচানির গন্ধ বায়ুকে দূষিত করে তোলে। এগুলি দেহে বিভিন্ন রোগের সৃষ্টি করে। তাই উপযুক্ত শ্বাসকার্যের জন্যে উপযুক্ত জায়গায় স্বাস্থ্যসম্মত বাসগৃহ তৈরি করা হয়।

উদ্ভিদ ও প্রাণী উভয়েই শ্বাসকার্যের সময় বায়ু থেকে অক্সিজেন নেয় ও কার্বন ডাইঅক্সাইড ছেড়ে দেয়। তাছাড়া প্রকৃতিতে সব সময়েই বিভিন্নভাবে প্রচুর কার্বন ডাইঅক্সাইড উৎপন্ন হচ্ছে। এই অবস্থা প্রকৃতিতে যদি ক্রমাগতই চলতে থাকে, তাহলে এক সময় অক্সিজেন একেবারেই বায়ু থেকে শেষ হয়ে যাবে; ফলে জীবজগতের অস্তিত্বও লুপ্ত হবে। কিন্তু বায়ুতে অক্সিজেন শেষ হয় না। গাছের পাতার সবুজ রংকে ক্লোরোফিল বলা হয়। গাছপালা সূর্যের আলো ও ক্লোরোফিল দিয়ে বায়ুর কার্বন ডাইঅক্সাইডকে ভেঙ্গে দেয়। ভেঙ্গে কার্বন গ্রহণ করে দেহের পুষ্টি-সাধন করে এবং অক্সিজেন ছেড়ে দেয়। এই অক্সিজেনই বায়ুতে গিয়ে মেশে। কাজেই বায়ুর অক্সিজেন নিঃশেষিত হতে পারে না অর্থাৎ বায়ুতে অক্সিজেন ও কার্বন ডাইঅক্সাইডের সমতা রক্ষা পায়। কার্বন ডাইঅক্সাইডের অভাবে গাছপালার বাঁচা যেমন দায় হতো, তেমনি আবার গাছপালা না থাকলে পৃথিবীতে অক্সিজেন কমে আসতো এবং প্রাণীদের বেঁচে থাকাও দায় হতো

তাহলে বোঝা যাচ্ছে যে, বায়ুর উপরেই জীবন নির্ভর করে। আমরা এই বায়ুর সমুদ্রের মধ্যে বাস করছি। ব্যবহারিক জীবনে অনেক জিনিষের উপর নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা আরোপ করা হয়ে থাকে, কিন্তু বায়ুর উপর সকলের সমান অধিকার।

শ্রীশ্যামসুন্দর দে

প্রশ্ন ও উত্তর

প্রঃ ১। (ক) জোনাকী পোকা জীবিত থাকাকালে তাহাদের গাত্র হইতে আলো নির্গত হয়, কিন্তু মরিয়া গেলে হয় না কেন ?

(খ) জনসাধারণ কালো ছাতা ব্যবহার করে, কিন্তু ট্র্যাফিক পুলিশ সাদা ছাতা ব্যবহার করে কেন ?

কিরণশঙ্কর সোম, বর্ধমান

উঃ ১। (ক) জোনাকী পোকা মরে গেলেই তার দেহ থেকে আর আলো নির্গত হতে পারে না—এই ধারণা ভুল। জোনাকীর আলো বিকিরণকারী যন্ত্রটি থাকে তার শরীরের পশ্চাৎ দিকে। গবেষণাগারে পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, জোনাকী মরে গেলে তার শরীরের ঐ অংশটি চূর্ণ করে তাতে জল ছিটিয়ে দিলেই তাথেকে আলো বিকিরিত হতে থাকে। বিশেষভাবে সংরক্ষণ করতে পারলে চূর্ণগুলিকে দুই-তিন বছর পর্যন্ত এই অবস্থায় রাখা যেতে পারে। তবে মৃত জোনাকীর দেহ থেকে সরাসরি আলোর বিচ্ছুরণ অবশ্য বিশেষ দেখা যায় না। জীবিত অবস্থায় জোনাকী ইচ্ছামত আলো নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। এই নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার জন্যে যে জোনাকীর স্নায়ুতন্ত্র দায়ী, তাতে কোন সন্দেহ নেই। আলো জ্বালবার জন্যে প্রয়োজনীয় অক্সিজেন সরবরাহ করাই এই স্নায়ুযন্ত্রের কাজ বলে বিজ্ঞানীদের বিশ্বাস। জোনাকী মরে গেলে স্নায়ুযন্ত্র বিকল হয়ে যায়। ফলে অক্সিজেন সরবরাহ ঠিকমত হতে পারে না। মৃত জোনাকীর দেহ থেকে আলো নির্গত না হবার কারণ এই বলে মনে হয়।

(খ) মানুষ ছাতা ব্যবহার করে দুই কারণে—রোদ ও বৃষ্টি থেকে রক্ষা পাবার জন্যে। বৃষ্টির ক্ষেত্রে ছাতার রং সাদা বা কালো যাই হোক না কেন, কিছু এসে যায় না। কিন্তু রোদ থেকে নিজেকে বাঁচাবার জন্যে ছাতা বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে সাদা হওয়া উচিত। কারণ যে জিনিষ যত কালো, সে তত বেশী আলোক ও উত্তাপ-তরঙ্গ গ্রহণ ও বিকিরণ করে থাকে। ফলে কালো ছাতা সূর্যরশ্মি থেকে অধিকতর উত্তাপ গ্রহণ ও বিকিরণ করতে বাধ্য। তাই এগুলি ব্যবহারকারীরাও অত্যধিক উত্তাপ অনুভব করে থাকেন। পক্ষান্তরে সাদা জিনিষের উপর আলোক ও উত্তাপ-রশ্মি পড়লে তার প্রায় সবটাই প্রতিফলিত হয়ে যায়। ফলে সাদা ছাতা ব্যবহারকারী ছাতার নীচে অপেক্ষাকৃত অনেক কম উত্তাপ অনুভব করেন। তাই সাদা ছাতা ব্যবহার করাই বিজ্ঞানসম্মত। যে কোন কারণেই হোক, সাধারণ

মানুষ বহুকাল থেকেই কালো ছাতা ব্যবহার করছে। সম্ভবতঃ এ নিয়ে কেউ বিশেষ ভাবেন নি। তাই গতানুগতিকভাবে কালোই চলে আসছে।

তাছাড়া ট্র্যাফিক পুলিশের সাদা ছাতা ব্যবহারের কারণ হয়তো এই যে, ট্র্যাফিক পুলিশকে রাস্তায় চলন্ত যানবাহন নিয়ন্ত্রণ করতে হয়। সাদা জিনিষ সামান্য আলোতেও দূর থেকে নজরে পড়ে, কিন্তু কালো জিনিষ আলোর মধ্যেও দৃষ্টিবিভ্রম ঘটাতে পারে। আকস্মিক কোন দুর্ঘটনা এড়াবার জন্যেই সম্ভবতঃ সাদা ছাতা ব্যবহার করা হয়।

দীপক বসু

বিবিধ

ষষ্ঠ বার্ষিক 'রাজশেখর বসু স্মৃতি' বক্তৃতা

১২ই মে, '৬৭ শুক্রবার অপরাহ্ণ ৫-৩০ মিনিটে ৯২, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোডস্থ সাহা ইনষ্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার ফিজিক্স-এর বক্তৃতা-কক্ষে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ কর্তৃক আয়োজিত ষষ্ঠ বার্ষিক 'রাজশেখর বসু স্মৃতি' বক্তৃতা প্রদান করেন শ্রীইন্দুভূষণ চট্টোপাধ্যায়। বক্তৃতার বিষয়বস্তু ছিল—"ভারতের গো-মহিষ ও তাদের পুষ্টি সমস্যা"। এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন পরিষদের সভাপতি অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু।

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের গ্রন্থাগারে সোভিয়েট দূতাবাসের পুস্তক উপহার

গত ১২ই মে, '৬৭ শুক্রবার ৯২, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোডস্থ সাহা ইনষ্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার ফিজিক্স-এর বক্তৃতা-কক্ষে এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানে কলিকাতাস্থিত সোভিয়েট দূতাবাসের ভাইস-কন্সাল ও সাংস্কৃতিক শাখার প্রধান শ্রীকেলিন্ন যুর্লভ বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের গ্রন্থাগারের জন্যে বিজ্ঞান বিষয়ক অনেকগুলি গ্রন্থ উপহার দেন। পরিষদের পক্ষ থেকে উপহার গ্রহণ করেন পরিষদের সভাপতি অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু।

এই প্রসঙ্গে শ্রীযুর্লভ বিজ্ঞান পরিষদের বিভিন্ন কার্যাবলীর প্রশংসা করে বলেন যে, এই জাতীয় প্রতিষ্ঠান যে কোন দেশের পক্ষেই অত্যাবশ্যক। এই জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানে তাঁর দেশের পক্ষ থেকে যে সামান্য উপহার তিনি দিচ্ছেন, সেটা তাঁর দেশের মানুষের শুভেচ্ছার প্রতীক। তিনি আশা করেন যে, এই ধরণের অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ভারত ও সোভিয়েট ইউনিয়নের মধ্যে বন্ধুত্বের বন্ধন দৃঢ়তর হবে। শ্রীযুর্লভ বাংলা ভাষায় তাঁর ভাষণ দেন।

অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু বলেন যে, সোভিয়েট দূতাবাস তাঁদের পুস্তক উপহারের মধ্য দিয়ে বিজ্ঞান পরিষদের আদর্শ ও উদ্দেশ্যের

প্রতি যে সমর্থন প্রকাশ করেছেন, তার জন্যে তিনি আনন্দিত। যে সোভিয়েট ইউনিয়নে বিজ্ঞানের আজ দ্রুত সম্প্রসারণ ঘটছে, সেখানে বিজ্ঞান ও কারিগরী বিদ্যার সর্বস্তরেই মাতৃভাষার প্রচলন রয়েছে। এটাও সঙ্গে সঙ্গে মনে রাখতে তার উল্লেখ করে অধ্যাপক বসু বলেন যে, পরস্পরকে জানা ও বোঝবার জন্যে এই ধরণের প্রচেষ্টা যথেষ্ট প্রশংসনীয়।

বিজ্ঞান পরিষদের কর্মসচিব ডাঃ জয়ন্ত বসু সোভিয়েট দূতাবাসকে তাঁদের সৌহার্দ্যসূচক

বিজ্ঞান পরিষদের সভাপতি অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু শ্রীফেলিক্স যুর্লোভের নিকট থেকে বিজ্ঞান পরিষদের গ্রন্থাগারে উপহার স্বরূপ প্রদত্ত পুস্তকগুলি গ্রহণ করছেন।

হবে যে, বিভিন্ন দেশের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদান একান্ত আবশ্যক। পরিষদকে সোভিয়েট প্রকাশিত পুস্তক উপহারের অনুষ্ঠানটি সেদিক থেকে তাৎপর্যপূর্ণ। শ্রীযুর্লভ গত পাঁচ বছরের অধ্যবসায়ে বাংলা ভাষাকে যে সুন্দরভাবে আয়ত্ত করেছেন, উপহারের জন্যে পরিষদের পক্ষ থেকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন এবং শ্রীযুর্লভ যে তাঁর কর্মব্যস্ততা সত্ত্বেও অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছেন, সে জন্যে তাঁকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান।

এই সংখ্যার লেখকগণের নাম ও ঠিকানা

১। অসীমা চট্টোপাধ্যায়
বিজ্ঞান কলেজ
কলিকাতা-৯

২। নদীয়াবিহারী অধিকারী
১৬৯, বিবেকানন্দ রোড
কলিকাতা-৬

৩। সুশীলকুমার মুখোপাধ্যায়
বিশ্ববিদ্যালয় বিজ্ঞান কলেজ
৩৫, বালিগঞ্জ সার্কুলার রোড
কলিকাতা-১৯

৪। প্রবীরকুমার মুখোপাধ্যায়
১৩, পটুয়াটোলা লেন
কলিকাতা-৯

৫। অরুণকুমার রায় চৌধুরী
বসু বিজ্ঞান মন্দির
কলিকাতা-৯

৬। কল্যাণকুমার গোস্বামী
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্নাতকে
ছাত্রাবাস
১, বিদ্যাসাগর ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৯

৭। শ্রীশ্যামসুন্দর দে
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
স্নাতকোত্তর ছাত্রাবাস
১, বিদ্যাসাগর ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৯

৮। শ্রীঅরবিন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়
৫/১ নেতাজী সুভাষচন্দ্র রোড
কলিকাতা-

৯। দীপক বসু
ইনষ্টিটিউট অব রেডিও ফিজিক্স
অ্যাণ্ড ইলেকট্রনিক্স
বিজ্ঞান কলেজ,
কলিকাতা-৯

সম্পাদক—শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য
শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস কর্তৃক ২৯৪।২।১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড হইতে প্রকাশিত এবং গুপ্তপ্রেশ
৩৭।৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা হইতে প্রকাশক কর্তৃক মুদ্রিত